কুতুল আখইয়ার

শরহে [বাংলা]

নূরুল আনওয়ার

১ম খণ্ড

মূল :

মাওলানা জামিল আহমদ সকরোডবী

উস্তাযুল হাদীস, দারুল উলূম দেওবন্দ (ওয়াক্‌ফ), ভারত

ভাষান্তর :

মাওলানা হাফিজুর রহমান যশোরী

ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত

আল আকসা লাইব্রেরী

৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

কুতুল আখইয়ার
শরহে বাংলা
নূরুল আনওয়ার (প্রথম খণ্ড)

প্রকাশক ঃ
মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান যশোরী
আল-আকসা লাইব্রেরী

প্রকাশকাল ঃ শাওয়াল ১৪২৭ হি
নভেম্বর ২০০৬ইং

মূল্য ঃ সাদা ৩০০ টাকা মাত্র।
রাফ ২০০ টাকা মাত্র।

বর্ণ বিন্যাস ঃ
জাকিয়া কম্পিউটার
৩৭/১ বাংলাবাজার, ঢাকা।

মুদ্রণ ঃ
মাসুম প্রেস
বাংলাবাজার, ঢাকা।

সূচিপাতা

প্রাসঙ্গিক কথা

মানার ও নূরুল আনওয়ার (মতন ও ব্যাখ্যা) উভয়টি উসূলে ফিকহ বিষয়ক গ্রন্থ। উসূলে ফিকহ অধ্যায়নের পূর্বে কমপক্ষে পাঁচটি বিষয়ে অবগত হওয়া জরুরি।

১. উসূলে ফিকহের সংজ্ঞা বা পরিচিতি।

২. উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

৩. আলোচ্য বিষয়।

৪. উসূলে ফিকহ সংকলন।

৫. মূল গ্রন্থকার ও ব্যাখ্যাকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

উক্ত পঞ্চ বিষয় জানার আবশ্যকতা :

★ কোনো শাস্ত্র অধ্যায়নের পূর্বে উক্ত শাস্ত্রের পরিচিতি বা সংজ্ঞা এজন্য জানা প্রয়োজন যাতে অজ্ঞাত কোনো বস্তুর পিছনে সময় ও শ্রম ব্যয় করা সাব্যস্ত না হয়।

★ উদ্দেশ্য লক্ষ্য জানা জরুরি এ কারণে যে, যাতে অহেতুক ও অনর্থক বিষয় অর্জন করায় শামিল না হয়।

★ এভাবে আলোচ্য বিষয় অবহিত হওয়ার জরুরি এ জন্যে যে, এর দ্বারা এক শাস্ত্র অপর শাস্ত্রের বিষয়বস্তু থেকে পৃথক হয়ে যায়।

★ সংকলন ইতিহাস জানার প্রয়োজনীয়তা এ জন্যে যে, দ্বারা সংকলক সম্পর্কে অবগতি লাভ হয় এবং উক্ত শাস্ত্রের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বোধগম্য হয়।

★ গ্রন্থকারের পরিচিতি জানা জরুরী এ কারণে যে, গ্রন্থকারের মর্যাদা অবগতি লাভের দ্বারা গ্রন্থের মর্যাদা নিরুপিত হয়। কেননা বক্তা যে স্তরের হয় তার বক্তৃতা বা কথা সে স্তরের হয়ে থাকে। যেমন প্রসিদ্ধ আছে كَلَامُ الْمُلُوْكِ مُلُوْكُ الْكَلَامِ। রাজার কথা কথার রাজা অর্থাৎ কথক যে ধরণের মর্যাদাবান ও গাম্ভীর্য সম্পন্ন হয় তার কথাও সে পরিমাণ ভাবগাম্ভীর্যময় ও উচ্চাঙ্গের হয়ে থাকে।

ফায়েদা : تعريف বা সংজ্ঞা বলা হয় مَا يُبَيَّنُ بِهِ حَقِيْقَةُ الشَّيْئِ কে অর্থাৎ যার দ্বারা কোনো বস্তুর মহত্ব ও প্রকৃতি জানা যায়।

★ موضوع (আলোচ্য বিষয়) বলা হয় مَا يُبْحَثُ فِيْهِ عَنْ عَوَارِضِهِ الذَّاتِيَةِ কে) অর্থাৎ যে বস্তুর জাতিগত প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

★ غرض বা উদ্দেশ্য বলা হয় مَايَصْدُرُ الْفِعْلُ عَنِ الْفَاعِلِ لِاَجْلِهٖ কে। অর্থাৎ যার কারণে কর্তা থেকে ক্রিয়া প্রকাশিত হয়।

★ এভাবে غايت বা লক্ষ্য বলা হয় ঐ বিষয়কে যা উক্ত বস্তুর উপর প্রযোজ্য হয়। যেমন– কলম ক্রয় করার জন্য বাজারে গমন করা হলো উদ্দেশ্য, আর কলম ক্রয় করা হলো মূল লক্ষ্য বা غايت

★ تدوين বা সংকলন বলা হয় বিক্ষিপ্ত বিষয়াদি সুবিন্যস্ত করাকে।

উসূলে ফিকহের সংজ্ঞা : উসূলে ফিকহের সংজ্ঞা দুইটি। ১. حدّ اضافى ২. حدّ لقبى

১. حد اضافى বলা হয় মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি-এর ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞায়ন করাকে।

২. حد لقبى বলা হয় উভয়ের সমন্বয়ের একই সংজ্ঞা বর্ণনাকে।

حدّ اضافی **এর সারমর্ম :** أُصُوْل - أَصْلٌ এর বহুবচন। আর اصل শব্দটি কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হয়–

১. যার উপর অন্য বস্তুর বুনিয়াদ বা ভিত্তি রাখা হয়। যেমন ছাদের জন্য দেয়াল হলো اصل এবং সন্তানাদির জন্যে পিতা হলো আছল।

২. راجح (প্রাধান্য প্রাপ্ত) যেমন বলা হয় إِنَّ الْأَصْلَ فِي الْإِسْتِعْمَالِ الْحَقِيْقَةِ অর্থাৎ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে হাকীকতই প্রাধান্য প্রাপ্ত হয়।

৩. قاعده (নীতি) যেমন বলা হয় إِنَّ الْفَاعِلَ مَرْفُوْعٌ هٰذَا اَصْلٌ مِنَ النَّحْوِ অর্থাৎ ফায়েল বা কর্তা رفع বিশিষ্ট হওয়া ইলমে নাহুর একটি নীতি।

৪. **দলিল :** যেমন বলা হয় إِنَّ اٰتُوا الزَّكٰوةَ اَصْلُ وُجُوْبِ الزَّكٰوةِ অর্থাৎ اٰتُوا الزَّكٰوةَ আয়াতটি হলো যাকাত ওয়াজিব হওয়ার দলিল।

৫. اِسْتِصْحَاب : اِسْتِصْحَاب বলা হয় বর্তমান অবস্থাকে পূর্বের অবস্থার উপর অনুমান করাকে। যেমন বলা হয় طَهَارَةُ الْمَاءِ اَصْلٌ অর্থাৎ পানির বর্তমান অবস্থাকে পূর্বের অবস্থার উপর অনুমান করতে হবে। এভাবে যে, বর্তনে পানি রাখার সময় যেহেতু পানি পাক ছিলো। এ কারণে এখনও পাক থাকারই হুকুম আরোপিত হবে। কিন্তু এটা ঐ সময় যখন বর্তমান অবস্থায় পানি পাক বা নাপাক হওয়ার ব্যাপারে কোনো সঠিক জ্ঞান না থাকে। যদি স্বচক্ষে দেখার দ্বারা বা অন্য কোনো ব্যক্তির সংবাদ দেয়ার দ্বারা বা অন্য কোনো উপায়ে পানি নাপাক হওয়া সম্পর্কে জানা যায় তাহলে এক্ষেত্রে ইস্তেসহাবকে দলিল বানিয়ে পানিকে পাক হওয়ার হুকুম লাগানো যাবে না।

فقه : فقه বলা হয় শরীঅতের শাখাগত বিধানাবলীকে যা اَدِلَّةٌ تَفْصِيْلِيَّه দ্বারা অর্জন করা হয়। আমলের সাথে যেসব বিধানের সম্পর্ক থাকে তাকে اَحْكَامِ فرعيّه বলে আর যেসব আমলের সম্পর্ক থাকে আকিদা-বিশ্বাসের সাথে তাকে احكامِ اَصْلى বলা হয়।

হযরত আবু হানীফা (র) বলেন– হালাল-হারাম জায়েয-নাজায়েয জানার নাম হলো فقه আর সুফি সাধকগণের মতে ইলম ও আমলের সমষ্টির নাম হলো فقه

★ **উসূলে ফিকহের** حدّ لقبى : উসূলে ফিকহ এমন নীতিমালা অবগত হওয়ার নাম যার মাধ্যমে ফিকহ পর্যন্ত পৌছানো সম্ভব হয়। অর্থাৎ যেসব নীতিমালা দ্বারা ফিকহর ইলম লাভ হয় উক্ত নীতিমালা অবগত হওয়ার নাম হলো উসূলে ফিকহ।

★ غرض وغايت **(উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য)** : আহকামে শরীয়াকে ادلّه تفصيليّة দ্বারা অবগত হওয়া এবং মাসায়িল ইস্তেমবাত করার নীতিমালা অবগত হওয়া।

★ موضوع **(আলোচ্য বিষয়)** : উসূলে ফিকহের আলোচ্য বিষয় তিনটি। ১. শুধু দলিল প্রমাণাদি। ২. শুধু বিধান। ৩. দলিল ও বিধানের সমষ্টি।

তৃতীয় উক্তিটি পছন্দনীয় অভিমত। তবে এর উপর প্রশ্ন আরোপিত হয় যে, উসূলে ফিকহের আলোচ্য বিষয় যেহেতু দলিল এবং বিধানের সমষ্টি। কাজেই আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে تعدد বা একাধিক সংখ্যক হওয়া সাব্যস্ত হয়। অর্থাৎ উসূলে ফিকহের আলোচ্য বিষয় দুইটি হয়ে গেলো। ১. একটি হলো দলিল এবং অপরটি হলো বিধান। আর নিয়ম আছে যে, আলোচ্য বিষয় একাধিক হওয়ার দ্বারা শাস্ত্র একাধিক হওয়া সাব্যস্ত হয়। অর্থাৎ উসূলে ফিকহের আলোচ্য বিষয় যেহেতু দুইটি। কাজেই শাস্ত্র দুইটি হলো অথচ তা সঠিক নয়।

উত্তর : تعدّد علم - تعدّد موضوع তথা আলোচ্য বিষয় এক হওয়ার দ্বারা শাস্ত্র একাধিক হওয়া ঐ সময়ই সাব্যস্ত হয় যখন উভয় আলোচ্য বিষয়ের মাঝে সত্তাগতভাবে ভিন্নতা থাকে। অথচ এখানে উভয়ের মধ্যে কোনো ভিন্নতা নেই। বরং অভিন্নতা রয়েছে। যদিও আপেক্ষিকভাবে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে।

উভয়ের মধ্যে সত্তাগতভাবে অভিন্নতা এই যে, এখানে আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে اثبات তথা সাব্যস্তকরণ লক্ষ্য রয়েছে। আর اثبات হলো মাসদার। মাসদার কখনো ফায়েলের অর্থে হয়, কখনো মাফউলের অর্থে হয়। অতএব দলিল প্রমাণের বিচারে মাসদারটি مثبت তথা ফায়েলের অর্থে, আর বিধানসমূহের বিচারে مثبت তথা মাফউলের অর্থে। সারকথা এই যে, দলিল ও প্রমাণ হলো সাব্যস্তকারী আর বিধান হলো সাব্যস্ত বিষয়। অতএব দলিল প্রমাণ ও বিধান উভয়ের মধ্যেই اثبات মাসদার ক্রিয়াশীল রয়েছে। তবে এ পার্থক্য রয়েছে যে, দলিলের প্রতি ফায়েলের অর্থে মুযাফ হয়েছে। আর বিধানের প্রতি মাফউলের অর্থে মুযাফ হয়েছে। মোটকথা যখন উভয়ের সাথে এর সম্পর্ক থাকায় সত্তাগতভাবে অভিন্নতা রয়েছে। কাজেই আলোচ্য বিষয় একাধিক হওয়া বিবেচিত হবে না।

সারকথা উসূলে ফিকহের আলোচ্য বিষয় হলো দলিল প্রমাণ ও বিধানের সমষ্টির নাম। অর্থাৎ উসূলে ফিকহের মধ্যে উভয় প্রসঙ্গেই আলোকপাত করা হয়। দলিল প্রমাণের ক্ষেত্রে এ বিচারে যে, তার দ্বারা বিভিন্ন প্রকার বিধান প্রমাণিত করা হয়। আর বিধানসমূহের মধ্যে এ আলোকে যে, দলিল প্রমাণ দ্বারাই বিভিন্ন বিধানকে সুপ্রমাণিত করা হয়।

উসূলে ফিকহের সংকলন

মুজতাহিদ ফুকাহায়ে কেরাম নিজ নিজ ইজতিহাদ মোতাবেক বিভিন্ন মাসআলা বের করেছেন। আর ইজতিহাদী মাসায়িলের বর্ণনা কোন নীতিমালা ছাড়া সম্ভব নয়। হযরত ইমাম আবু হানীফা (র) যিনি ইলমে ফিকহের প্রথম সংকলক ছিলেন। (যেমনটি আশরাফুল হেদায়ার ভূমিকায় অধম আলোকপাত করেছে) ইলমে ফিকহের সংকলনের সময় অবশ্যই তিনি উসূলে ফিকহের নীতিমালা নির্ধারণ করেছিলেন। যেমন তার শিষ্যবৃন্দের মধ্যে থেকে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র) উসূলে ফিকহ বিষয়ক বিভিন্ন কিতাবাদি লিখেছিলেন। তবে বর্তমান সেসবের খোঁজ পাওয়া দুষ্কর। এরপর ইমাম শাফেয়ী (র) মৃত ২০৪ হিজরী উসূলে ফিকহ বিষয়ক একটি কিতাব লিখেছিলেন। যা প্রকৃতপক্ষে তার রচিত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ কিতাবুল উম্ম এর ভূমিকা। এরপর এ শাস্ত্রে বিভিন্ন মুসলিম মণীষী ক্ষুদ্র-বৃহৎ বহু কিতাবাদি লিখে এই শাস্ত্রকে পূর্ণতা দান করেছেন।

লেখক পরিচিতি

মানার গ্রন্থের লেখকের নাম আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে মাহমুদ উপনাম বা কুনিয়াত আবুল বারাকাত, উপাধি হাফিজুদ্দিন নাসাফী। নাসাফ হলো তুরস্কের একটি জেলার অর্ন্তগত এক স্থানের নাম। তার প্রতি সম্বন্ধ করে গ্রন্থকারকে নাসাফী বলা হয়। আবুল বারাকাত নাসাফী স্বীয়যুগের ইমাম ও অদ্বিতীয় আলিম বিবেচিত হতেন। ফিকহ ও উসূলে ফিকহ শাস্ত্রে মুজতাহিদসুলভ যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন।

রচনাবলী : হাদীস ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিতে পূর্ণ দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। তার শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুস সাত্তার কুরদুব, হুমায়েদ উদ্দিন, আদদারীর ও বদরুদ্দিন খাহার জাদা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মানারের মতন ছাড়া বিভিন্নশাস্ত্রে গ্রন্থকারের আরো অনেক সুপ্রসিদ্ধ ও মুল্যবান কিতাবাদি রয়েছে। যেমন– মাদারিকুততানযিল ওয়া হাকায়িকুত্তাবিল, কানযুদ দাকায়েক, ওয়াফি এবং তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ কাফী ও উমদা এবং আকিদায়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত সুবিশেষ প্রসিদ্ধ। গ্রন্থকারের লিখিত কিতাবাদি সর্বস্তরের মানুষের নিকট ব্যাপকভাবে সমাদৃত হওয়ার বিষয়টি এভাবে অনুমান করা যেতে পারে যে, এগুলোর মধ্যে থেকে অধিকাংশটি শতাব্দির পর শতাব্দি আরব ও আজমের বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

উসূলে ফিকহের এই সংক্ষিপ্ত মতন 'মানার' মূলত উসূলে ফখরুল ইসলাম বযদবী ও উসূলে শামসুল আয়িম্মা সরখসি এর সারসংক্ষেপ। যার মধ্যে উসূলে বযদবীর ক্রমধারাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। স্বয়ং মাতিন (র)ও

এ মতনের এক সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা লিখেছিলেন। তার নাম হলো কাশফুল আসরার ফি শরহিল মানার যা অত্যন্ত ব্যাপকতা সম্পন্ন ও সুপ্রমাণিত।

ওফাত : গ্রন্থকার পরিচিতি মূলক বিভিন্ন কিতাবাদি দ্বারা মাতিন (র) এর জন্ম তারিখের ব্যাপারে কোনো কিছু জানা সম্ভব হয়নি। তবে তার মৃত্যু সন উল্লেখিত আছে যে, তিনি ৭১০ হিজরী সনে ইরাকের বাগদাদ নগরে ইন্তেকাল করেন। উল্লেখ্য যে আকায়ীদে নসফীর গ্রন্থকার ভিন্ন ব্যক্তি। তার নাম হলো আবু হাফস উমর ইবনে মুহাম্মদ নসফী। জন্ম ৪৬১ হিজরী ও মৃত্যু ৫৩৭ হিজরী। তিনি মানার গ্রন্থকারের প্রায় ২ শতাধিক বছর পূর্বে অতিবাহিত হয়েছেন। নসফী সম্পর্কে শাব্দিক মিল থাকার কারণে সাধারণত ছাত্রগণ সন্দেহে নিপতিত হয়। এ কারণে বিষয়টি উল্লেখ করা হলো।

ব্যাখ্যাকার পরিচিতি

নূরুল আনওয়ার শরহে আল মানারের সংকলকের নাম হলো শায়খ আহমদ ইবনে আবু সাঈদ কিন্তু স্বাভাবিকভাবে মানুষেরা তাকে শায়খ জিয়ুন বা মোল্লা জিয়ুন উপাধিতে জানেন। ব্যাখ্যাকারের বংশ তালিকা প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) এর সাথে মিলিত হয়। ব্যাখ্যাকারের পূর্ব পুরুষগণের মূল জন্মভূমি হলো পবিত্র মক্কা। অতঃপর তাঁর বংশধর হিন্দুস্থানের লাখনু জেলার রায়ব্রেলী থানার আমিঠি নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন। এখানেই ১০৪৭ হিজরী সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। খুবই অল্প বয়সে তিনি পবিত্র কোরআন হিফয করেছিলেন। এরপর তিনি বিভিন্ন বিদ্যা ও শাস্ত্র অর্জনের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন শহরে গমন করেন। সর্বশেষ ফতেহপুর এলাকার কোরা নামক স্থানের মোল্লাহ লুৎফুল্লাহ কোরী (র) এর নিকট থেকে তিনি সমাপনী সনদ অর্জন করেন। এটা ঐ বরকতময় সময়ের কথা যে সময়ে দেশের চারিদিকে বাদশা আলমগীরের বিদ্যানুরাগ ও বিশেষত উলামায়ে কেরামের জয়জয়কর অবস্থা বিরাজিত ছিলো। তার এ আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে মোল্লা জিয়ুন (র) ও রাজ দরবারে আকৃষ্ট হন। তার জাহেরী ও বাতেনী দক্ষতা ও যোগ্যতায় প্রভাবান্বিত হয়ে বাদশা আলমগীর তাকে যথেষ্ট সম্মান দান করেন। এবং তার সম্মুখে শীষ্যের ন্যায় নতজানু হয়ে থাকতেন। স্বয়ং বাদশা এবং তার পুত্র শাহ আলম প্রমুখ সর্বদা তার ইজ্জত ও সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। মোল্লা জিয়ুন (র) তীক্ষ্ণ স্মৃতির অধিকারী ছিলেন। পাঠ্যকিতাবাদীর বহু পৃষ্ঠা তার মুখস্ত ছিলো। সুবৃহৎ কাব্য একবার শ্রবণ করে মুখস্ত করে নিতেন। ৫৮ বছর বয়সে পবিত্র মক্কা ও মদীনা জিয়ারতে ধন্য হন। এ সফরেই মদীনা মুনাওয়ারা অবস্থান কালে দুমাস সাতদিনে নুরুল আনওয়ারের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ এবং শাস্ত্রীয় উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন। নুরুল আনোয়ার ছাড়াও গ্রন্থকারের আরো বহু মূল্যবান কিতাবাদি রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে التَّفْسِيرَاتُ الْأَحْمَدِيَّةُ فِي بَيَانِ الْآيَاتِ الشَّرْعِيَّةِ। অধিক প্রসিদ্ধ এবং আলিম সমাজের নিকট অতিশয় মাকবুল।

ওফাত : তিনি ১১৩০ হিজরী সনে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে ইন্তেকাল করেন এবং হযরত খাজা বাকিবিল্লাহ (র) এর সন্নিকট সমাধিস্থ হন।

কতিপয় পরিভাষা পরিচিতি

اَلدِّيْنُ : আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত এমন জীবন বিধান, যা বিবেকবানগণকে তাদের প্রশংসিত এখতিয়ার দ্বারা প্রকৃত কল্যাণ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

اصُوْلُ الفقه : এর আভিধানিক অর্থ– ادلة الفقه বা ফিকহশাস্ত্রের প্রমাণাদি। আর শরিআতের পরিভাষায়– اُصُوْلُ الفِقْهِ هُو القَواعِدُ الَّتِيْ يَتَوَصَّلُ بِها الى اِسْتِنْباط الْأَحْكام الشرعية الفرعية অর্থাৎ উসূলে ফিক্‌হ হলো এমন কতিপয় নিয়ম-নীতি, যে সবের মাধ্যমে শরিআতের শাখা-বিধানসমূহ উদ্ভাবন করা যায়।

الكتاب : সেই কুরআনে কারীম, যা নবী করীম (স)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে, গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং নবী করীম (স) হতে সন্দেহাতীতভাবে বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, نظم (শব্দ) ও معنى (অর্থ)-এর সমষ্টিকেই আল-কিতাব (কুরআন) বলা হয়।

السُّنَّة والحديث : সাধারণভাবে নবী করীম (স)-এর কথা, কাজ ও নীরব সম্মতিকে سنت ও حديث উভয় নামেই আখ্যায়িত করা হয়। অবশ্য এ দু'টির মধ্যে পরিভাষাগত কিছু পার্থক্য রয়েছে।

اجماع الامة : উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মুজতাহিদ আলিমগণের কোনো শরয়ী মাসআলায় ঐকমত্য পোষণ করাকে اجماع الامة বলা হয়। এটা শরিআতের অকাট্য দলিলসমূহের একটি। নবী করীম (স) এরশাদ করেছেন– لاتجتمع امتى على الضلالة অর্থাৎ আমার উম্মত গোমরাহীর উপর একমত হবে না।

القياس : কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার সাহায্যে اجتهاد (গবেষণা)-এর মাধ্যমে শরীআতের কোনো বিধান নির্ণয়কে قياس বলা হয়। অথবা حكم ও علت -এর মধ্যে فرع কে اصل-এর সাথে সামঞ্জস্য বিধান করাকে قياس বলা হয়।

الفرد : কোনো একক ব্যক্তি বা বস্তুকে বলা হয়। যথা– খালেদ। এর বহুবচন হলো– افراد।

النوع : এমন كلى বা সমষ্টিবাচক শব্দকে বলে, যার অধীনে একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিশিষ্ট বহু একক থাকে। যেমন– رجل ও امرأة

الجنس : এমন كلى বা সমষ্টিবাচক শব্দকে বলে, যার অধীনে বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিশিষ্ট বহু একক থাকে। যেমন– انسان (মানব) এর অধীনে নারী ও পুরুষ উভয়ই রয়েছে। আর নারী ও পুরুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন।

الامر : افعل তথা বিশেষ শব্দের মাধ্যমে অন্যের ওপর কোনো কাজ অত্যাবশ্যক করে দেওয়াকে امر বলা হয়।

الوجوب : অর্থাৎ অত্যাবশ্যক কর্তব্য, যা পালন না করলে মানুষ অপরাধী ও শাস্তিযোগ্য সাব্যস্ত হবে।

وجوب الاداء : আমরের সীগাহ দ্বারা সাব্যস্ত কর্ম সময়মতো সম্পাদন করাকে وجوب الاداء বলে।

وجوب القضاء : সময়ান্তে وجوب বস্তুর সমতুল্য বস্তু তার প্রাপকের কাছে সমর্পণ করাকে وجوب القضاء বলে।

اداء كامل : যে পদ্ধতিতে বিধান প্রবর্তিত হয়েছে, হুবহু সে পদ্ধতিতে সম্পাদন করাকে اداء كامل (পূর্ণাঙ্গ সম্পাদন) বলা হয়। যেমন– জামাতে নামায পড়া।

اداء قاصر : কোনো কাজ বিধিসম্মত পন্থায় সম্পাদন না করে বরং কোনোরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতির সাথে সম্পাদন করা হয়। যেমন– একাকী নামায পড়া।

اداء شبيه بالقضاء : যে কাজ বাস্তবে اداء কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে قضاء -এর মতো মনে হয়।

قضاء بمثل معقول : যুক্তিসঙ্গত জিনিস দ্বারা কাযা করা। যেমন– রোযার পরিবর্তে রোযা রাখা।

قضاء بمثل غير معقول : যুক্তি বহির্ভূত সদৃশ বস্তুর মাধ্যমে কাযা করা। যেমন– রোযার বিনিময়ে فدية দেওয়া।

قضاء شبيه بالاداء : আদা সদৃশ কাযা করা। যেমন– মুক্তাদীর تكبيرات العيدين রুকুর মধ্যে কাযা করা।

الاداء : امر -এর দ্বারা ওয়াজিব হিসাবে সাব্যস্ত বস্তুকে হুবহু তা তার প্রাপকের নিকট অর্পণ করা।

القضاء : امر -এর দ্বারা যা সাব্যস্ত হয় তার مثل (অনুরূপ বস্তু)-কে তার প্রাপকের নিকট অর্পণ করা।

مامور به : যা করার জন্য আদেশ করা হয় (আদেশকৃত বস্তু) তাকে مامور به বলা হয়।

حسن لعينه : যা স্বয়ং حسن তথা প্রকৃতগতভাবে উত্তম (সুন্দর), তাকে حسن لعينه বলা হয়।

حسن لغيره : যা অন্যের কারণে حسن বা উত্তম সাব্যস্ত হয়েছে তাকে حسن لغيره বলা হয়।

القدرة الممكنة : এমন قدرت বা সামর্থ্য যার দ্বারা বান্দা তার উপর আবশ্যককৃত কার্য সমাধা করতে সক্ষম হয়।

القدرة الميسرة : এমন قدرت বা সামর্থ্য যার দ্বারা বান্দা তার কর্তব্য সহজভাবে তথা অনায়াসে পালন করতে পারে।

النهى : لاتفعل বা নির্দিষ্ট শব্দের দ্বারা কোনো কাজ হতে বিরত থাকার নির্দেশ দানকে نهى বলা হয়। যথা- لا تقم

قبيح لعينه : যা মূলতই (প্রকৃতিগতভাবে) মন্দ, তাকে قبيح لعينه বলা হয়।

قبيح لغيره : যা অন্যের কারণে মন্দ সাব্যস্ত হয়েছে, তাকে لغيره বলা হয়।

المطلق : এমন শব্দ যা শুধু ذات বা সত্তাকে বুঝায়। তার সাথে কোনো وصف বা شرط জড়িত থাকে না।

المقيد : এমন শব্দকে বলা হয়, যা কোনো وصف বা شرط সাহকারে ذات-কে বুঝায়।

القبيح الوضعى : যা সত্তাগতভাবে মন্দ ও বিবেক তার মন্দত্ব অনুধাবন করতে পারে। যেমন- কুফরি করা।

القبيح الشرعى : যেটা সত্তাগত এবং শরিআত উভয় দৃষ্টিতে মন্দ। যেমন- স্বাধীন লোককে বিক্রি করা।

القبيح الوصفى : যেটা আনুষাঙ্গিক ও গুণগত কারণে মন্দ। যেমন- কুরবাণীর দিন রোযা রাখে।

القبيح الجوارى : যা আনুষাঙ্গিক কারণে মন্দ। যেমন- আযানের সময়ে বেচা-কেনা করা।

العام : যে শব্দ একই সময় এক জাতীয় বহু একককে অন্তর্ভুক্ত করে, তাকে عام বলা হয়।

المشترك : যে শব্দ ভিন্ন জাতীয় একাধিক একককে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে শামিল করে।

المؤول : এমন مشترك শব্দ, যার কোনো একটি অর্থ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

الظاهر : এমন শব্দ যা শ্রবণ মাত্রই শ্রবণকারী তার মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারে। যথা- احل الله البيع وحرم الربو

النص : এমন শব্দ বা বাক্যকে বলে যা ظاهر হতেও স্পষ্ট, তবে উক্ত স্পষ্টতা صيغه (শব্দ)- এর কারণে নয়; বরং বক্তার পক্ষ হতে ব্যাখ্যা প্রদানের কারণে হয়।

المفسر : এমন শব্দ বা বাক্যকে বলা হয়, যা نص হতেও এত অধিক স্পষ্ট যে, এটাতে تاويل (ব্যাখ্যা) ও تخصيص (নির্দিষ্ট করণ)-এর কোনো অবকাশ থাকে না। যথা, আল্লাহর বাণী- فسجد الملائكة كلهم اجمعون

المحكم : এমন শব্দকে বলা হয়, যার অর্থ ও ভাব অতি মজবুত ও সুদৃঢ়। এতে نسخ (রহিতকরণ) ও تبديل (পরিবর্তন)-এর কোনো অবকাশ থাকে না। যথা- আল্লাহর বাণী- ان الله بكل شئ عليم

الخفى : এমন বক্তব্যকে বলা হয় যার উদ্দেশ্য কোনো عارض (আনুষঙ্গিক)-এর কারণে অস্পষ্ট থাকে তবে এ অস্পষ্টতা صيغه (শব্দ)-এর কারণে হয় না। যথা- আল্লাহর বাণী- السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما

المشكل : এমন বক্তব্যকে বলা হয়, যা অন্যান্য বক্তব্যের সাথে বিমিশ্রিত থাকে।

المجمل : এমন বক্তব্যকে বলা হয়, যা অনেক অর্থ প্রবিষ্ট হয়ে তার অর্থ এত অধিক হয়ে যায় যে, ইবারতের দ্বারা ভাবার্থ উদ্ধার করা দুঃসাধ্য হয়ে যায়। যথা- আল্লাহর বাণী- اقيموا الصلاة واتوا الزكوة

المتشابه : এটা এমন বক্তব্য যার ভাবার্থ উদ্ধারের মোটেই সম্ভাবনা নেই। যথা- الم - يس

الحقيقة : কোনো শব্দ তার موضوع له-তে ব্যবহৃত হওয়াকে حقيقت বলে।

المجاز : বিশেষ সাদৃশ্যতার কারণে শব্দ তার موضوع له-এর জন্য ব্যবহৃত না হয়ে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হওয়া।

الاستعارة : উলূলবিদগণের মতে আকারগত বা অর্থগত সাদৃশ্যতার কারণে একটি শব্দকে তার মূল অর্থ ছেড়ে অন্য অর্থে প্রয়োগ করাকে استعاره বলে। উসূলবিদগণের মতে استعاره ও مجاز সমার্থক শব্দ।

الصريح : এমন স্পষ্ট শব্দ যা বলা মাত্রই অর্থ বোধগম্য হয়ে যায়।

الكناية : এমন শব্দ যার অর্থ অস্পষ্ট এবং قرينه ব্যতীত তার ভাবার্থ উদ্ধার করা যায় না।

عبارة النص : বাক্যের প্রকাশ্য মর্মার্থ দিয়ে দিলল গ্রহণকে عبارة النص বলে।

اشارة النص : বাক্যের ইঙ্গিত দ্বারা দলিল গ্রহণকে اشارة النص বলে।

دلالة النص : বাক্যের নির্দেশনা দ্বারা দলিল গ্রহণকে دلالة النص বলে।

اقتضاء النص : বাক্যের চাহিদা ও معنى التزامى দ্বারা দলিল গ্রহণকে اقتضاء النص বলে।

الوجوه الفاسدة : এমন দলিলসমূহ যেগুলোকে হানাফীগণ ফাসিদ মনে করেন ও অন্যান্য ইমামগণ দলিল গণ্য করেন।

الرخصة ও العزيمة : শরীআতের কোনো হুকুম ওজর-এর কারণে পরিবর্তিত হলে متغير عنه (যা হতে পরিবর্তন হয়েছে তা)-কে عزيمة এবং متغير اليه (যার দিকে পরিবর্তন হয়েছে তা)- কে رخصت বলা হয়।

এক নজরে উসূলুল ফিকহের মূলনীতি বা দলিলসমূহ
১. اصول الفقه (চার প্রকার)
كتاب الله
কুরআন
سنت رسول
হাদীস
اجماع
ইজমা
قياس
কিয়াস
انواع النظم من حيث الوضع
শব্দের অর্থগত শ্রেণীবিভাগ
انواع البيان بالنظم
শব্দের উদ্দেশ্য
অনুধাবনগত শ্রেণীবিভাগ
انواع استعمال النظم
শব্দের ব্যবহারগত শ্রেণীবিভাগ
انواع الوقوف على مواد النظم
শব্দের গঠনগত শ্রেণীবিভাগ
انواع حروف المعانى
শব্দের বর্ণগত শ্রেণীবিভাগ
خاص
বিশেষ অর্থবোধক
عام
ব্যাপক অর্থবোধক
مشترك
একাধিক অর্থবোধক
مؤول
তাবীলকৃত অর্থবোধক
ظاهر
স্পষ্ট
نص
সুস্পষ্ট
مفسر
অতি স্পষ্ট
محكم
সর্বাধিক স্পষ্ট
خفى
অস্পষ্ট
مشكل
দুর্বোধ্য
مجمل
সংক্ষিপ্ত
متشابه
সংশয়িত
حقيقت
প্রকৃত অর্থ
مجاز
রূপকার্থ
صريح
প্রকাশ্য অর্থ
كناية
অপ্রকাশ্য অর্থ
مخصوص منه البعض
আংশিক নির্দিষ্টকৃত
غير مخصوص عنه البعض
সম্পূর্ণ ব্যাপক
خصوص الجنس
নির্দিষ্ট জাত
خصوص النوع
নির্দিষ্ট প্রকার
خصوص الفرد
নির্দিষ্ট একক
امر
নির্দিষ্ট প্রকার
نهى
নিষেধাজ্ঞা
عبارة النص
নসের মুখ্য অর্থ
اشارة النص
নসের ইঙ্গিতার্থ
دلالة النص
নসের নির্দেশনা
اقتضاء النص
নসের চাহিদা

২. امر (দুই প্রকার)
مامور به
অনির্দিষ্ট বস্তু
حكم الامر اى الوجوب
আদেশাকার হুকুম
اقسام مامور به من حيث الوقت
ওয়াক্তের হিসেবে আদিষ্ট বস্তুর প্রকারভেদ
اقسام مامور به من حيث الحسن
উত্তমতার হিসেবে আদিষ্ট বস্তুর প্রকারভেদ
اداء
মূল বস্তু সোপর্দকরণ
قضاء
সাদৃশ্য বস্তু সোপর্দকরণ
كامل
পূর্ণাঙ্গ
قاصر
অপূর্ণাঙ্গ
شبيه بالقضاء
কাজার সাদৃশ
بمثل معقول
যুক্তিযুক্ত সাদৃশ্য কাজা
بمثل غير معقول
অযৌক্তিক সাদৃশ দ্বারা কাজা
قضاء شبيه بالاداء
আদার সাদৃশ কাজা
مطلق عن الوقت
সময় সীমাহীন
مقيد بالوقت
সময় সীমাবদ্ধ
حسن لعينه
মূল বস্তুর বিচারে উত্তম
حسن لغيره
অন্যের বিচারে উত্তম
لايؤدى الغير به
এটার পালনে অন্যটি পালিত হয় না
يؤدى به
এটার পালনে অন্যটি পালিত হয়
حسن لحسن شرطه
শর্তের উত্তমতার কারণে উত্তম হয়
غير قابل للسقوط
পরিত্যাগ অযোগ্য
قابل السقوط
পরিত্যাগযোগ্য
ملحق لعينه وشبيه لغيره
হাসান লে-আইনিহীর সংশ্লিষ্ট ও লেগাইরিহী সদৃশ
৩. منهى عنه - نهى [নিষিদ্ধ বিষয়] (দুই প্রকার)
قبيح لعينه
মূলতঃই অনুত্তম
قبيح لغيره
অন্যের কারণে অনুত্তম
قبيح وضعى
গঠনগতভাবে মন্দ
قبيح شرعي
শরীআতের বিচারে মন্দ
اداء
ওয়াছফের কারণে মন্দ
قضاء
অন্যের সংস্পর্শে মন্দ
৪. الاحكام المشروعة (দুই প্রকার)
الرخصة
ঐচ্ছিকতা
العزيمة
দৃঢ়-চিত্ততা
حقيقية
مجازية
فرض
واجب
سنت
نفل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ اُصُوْلَ الْفِقْهِ مَبْنًى لِلشَّرَائِعِ وَالْاَحْكَامِ وَاَسَاسًا لِّعِلْمِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَصَيَّرَهَا مُوَثَّقَةً بِالْبَرَاهِيْنِ وَالدَّلَائِلِ وَمُوَشَّحَةً بِالْحُلِيِّ وَالشَّمَائِلِ

অনুবাদ ॥ সমূহ প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার নিমিত্তে, যিনি উসূলে ফিক্হকে শরীআত ও বিধান সমূহের মূল ভিত্তিরূপে এবং হালাল ও হারাম সম্পর্কে অবগতি লাভের বুনিয়াদরূপে স্থির করেছেন। আর ঐসব কার্যাবলি ও বিধানসমূহকে দলিল প্রমাণাদি দ্বারা সুদৃঢ় করেছেন এবং সেগুলোকে অলংকার ও সৌন্দর্য দ্বারা সুসজ্জিত করেছেন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ اَلْحَمْدُ সম্পর্কে ৩টি বিষয় আলোচনা যোগ্য

১. حمد এর শাব্দিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা, ২. مَدْح، حَمْد ও شُكْر এর মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য ও সম্বন্ধ, ৩. اَلْحَمْدُ এর আলিফ লামটি কোন প্রকারের?

১. حَمْد এর শাব্দিক অর্থ-প্রশংসা করা, গুণগান করা, উত্তম গুণাবলি বর্ণনা করা।

حَمْد এর পারিভাষিক অর্থ : هُوَ الثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلٰى جَمِيْلِ الْاِخْتِيَارِى مِنْ نِّعْمَةٍ اَوْغَيْرِهَا ·

এ সংজ্ঞায় ৩টি শব্দ রয়েছে। ১. ثناء ২. جميل اختيارى ৩. نعمة

এখানে তিনোটি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা জরুরি :

ثَنَاء শব্দটি ৩ অর্থে ব্যবহৃত হয়–

১. উত্তমগুণাবলি প্রকাশ করা। নিম্নের হাদীসটি এর সহায়ক। যথা

لَا اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ আমি আপনার গুনগান করে শেষ করতে পারবো না। আপনি তদ্রূপই যেমন আপনি নিজে নিজের গুণ বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসে ثناء এর অর্থ হলো উত্তম গুণাবলি বর্ণনা করা। অতএব হাদীসের অর্থ এই যে, আপনার উত্তম গুণসমূহ বর্ণনা করতে আমি সক্ষম নই। আপনি তেমনই যেমন আপনি নিজেই আপনার উত্তম গুণাবলি বর্ণনা করেছেন।

২. স্বাভাবিক গুণাবলি বর্ণনা করা চাই তা ভালো হোক বা মন্দ। নিম্নের হাদীস দ্বারা এই অর্থের সহায়তা লাভ হয়। مَنْ اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবাকে সম্বোধন করে বললেন তোমরা যার মঙ্গল আলোচনা করো তার জন্য বেহেশত অবধারিত। আর তোমরা যার দুর্নাম আলোচনা করো তার জন্য দোযখ অবধারিত। হাদীসে দোষ-গুণ উল্লেখ করার দ্বারা একথার প্রমাণ বহন করে যে, ثناء এর অর্থ দোষ-গুণ উল্লেখ করা। কারণ ثناء অর্থ যদি শুধু ভালো বা শুধু মন্দ আলোচনা করা হতো তাহলে হাদীসে اَثْنَيْتُمْ শব্দের পরে ভালো বা মন্দের আলোচনা করা দ্বিরুক্তি হতো। অতএব বোঝা গেলো যে, ثناء এর অর্থ হলো কেবল আলোচনা করা।

৩. ثناء এর তৃতীয় অর্থ হলো মুখে উচ্চারণ করা। তৃতীয় অর্থের দিক দিয়ে প্রশ্ন জাগে যে, তাহলে তো حمد এর সংজ্ঞায় ثناء শব্দের পরে بِاللِّسَانِ উল্লেখ করার দ্বারা দ্বিরুক্তি হলো। আর বিশুদ্ধ ভাষায় এর কোনো অবকাশ নেই।

উত্তর : এর উত্তর এই যে, ثناء এর অর্থের মধ্যে তাজরীদ রয়েছে। অর্থাৎ ثناء এর অর্থকে মুখের শর্ত থেকে খালি করা হয়েছে। অতএব এখন তার অর্থ হলো স্বাভাবিক আলোচনা করা। সুতরাং তারপর لسان উল্লেখ করার দ্বারা দ্বিরুক্তি ঘটবে না।

প্রশ্ন : ثناء এর সংজ্ঞায় لسان কে মুখের সাথে শর্তবদ্ধ করা ঠিক নয়। কারণ এক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার প্রতি ثناء শব্দের সম্বন্ধ করা দুরস্ত হয় না। কারণ আল্লাহ তা'আলা জবান থেকে মুক্ত। অতএব আল্লাহ তাআলার প্রতি ثناء শব্দ সম্বন্ধ করার দ্বারা তার জন্য জবান সাব্যস্ত করা বিবেচিত হয়। আর তিনি এ থেকে পবিত্র।

উত্তর : জবান দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ গোশত পিণ্ড নয় যা বাকশক্তির মাধ্যম ঘটে। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বাকশক্তি বা কথা বলার ক্ষমতা। আর কথা বলার ক্ষমতা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে কথা বলার শক্তি উদ্দেশ্য নয়। বরং এর দ্বারা اَلْإِفَاضَةُ وَالْإِعْلَامُ مَعَ شُعُورِ الْفَيْضِ وإرادته অর্থাৎ মনের ভাব এভাবে প্রকাশ করা যার দ্বারা প্রকাশকারী তা অনুভব করতে পারে এবং তার ইচ্ছাও থাকে। আর لسان তথা জবানের এ অর্থ আল্লাহ তা'আলার সত্তার মধ্যেও পাওয়া যায়। কারণ তিনিও অর্থ বা ভাবের প্রকাশ স্বীয় অনুভূতি ও ইচ্ছায় করে থাকেন।

جميل اختياري : حمد এর সংজ্ঞায় দ্বিতীয় শব্দ হলো جَمِيلِ اختياري এর সাথে যেভাবে সত্তা গুণান্বিত হয় তদ্রূপ বিশেষণ বা গুণসমূহও গুণান্বিত হতে পারে। جَمِيلِ اختياري বলার দ্বারা এ সংজ্ঞার উপর প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, হামদের সংজ্ঞায় جميل اختياري বলার দ্বারা বোঝা যায় যে, কেবল ইচ্ছাগত গুণাবলির কারণেই হামদ্ করা হয়। স্রষ্টা কর্তৃক প্রদত্ত গুণের উপর হামদ্ দ্বারা প্রশংসা বোঝায় না। অথচ আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহ তা'আলার صفات ذاتيه তথা সত্তাগত গুণাবলির সত্তাগত কার্যসমূহের উপরও হামদ্ শব্দের প্রয়োগ হয়। যেমন- আল্লাহ তা'আলার হায়াত, কুদরত, ইলম ইত্যাদি।

এর উত্তর এই যে, جميل اختياري দ্বারা এখতিয়ারি কার্যাবলি উদ্দেশ্য নয়। বরং এর অর্থ হলো যে সকল কার্যাবলি স্বয়ং সম্পন্ন কর্তা থেকে প্রকাশ পায়। চাই তা بالاختيار প্রকাশ হোক বা بِالْاِضْطِرَارِ হোক। আর এটা স্পষ্ট যে, জাতিগত সিফাত, হায়াত, কুদরত ইত্যাদির প্রকাশও فاعِلِ مُخْتَار তথা আল্লাহ তা'আলা থেকে প্রকাশ পাচ্ছে। যদিও তা স্ব-এখতিয়ারে প্রকাশ না হোক। অতএব হামদের সংজ্ঞার উপর কোনো প্রশ্নারোপিত হয় না।

نعمة : তৃতীয় শব্দ হলো نعمة-এই শব্দের নূন বর্ণে যের দিয়ে পড়লে তা এনয়াম তথা করুণার অর্থে হবে। আর যবর দিয়ে পড়লে তার অর্থ হবে সুখি সাচ্ছন্দময় করা। আর নূন বর্ণে পেশ দিয়ে পড়লে অর্থ হবে আনন্দ-খুশি। এখানে নূন বর্ণটি যেরযোগে। অতএব حمد এর সংজ্ঞা হবে- কারো অর্জিত গুণাবলির দরুন প্রশংসা করা চাই তা কোনো করুণার পরিপ্রেক্ষিতে হোক বা করুণা বিহীন।

২. حمد، مدح ও شكر এর মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য ও সম্বন্ধ :

সম্বন্ধ বর্ণনা করার আগে مدح ও شكر এর সংজ্ঞা জানা উচিত।

مدح : উত্তম গুণাবলির উপর প্রশংসা করাকে مدح বলে। চাই তা তার অর্জিত গুণাবলির দরুন হোক বা প্রাপ্ত গুণাবলির দরুন হোক।

شكر এর শাব্দিক অর্থ হলো فِعْلٌ يُنْبِئُ عَنْ تَعْظِيمِ الْمُنْعِمِ অর্থাৎ এমন কাজকে শুকর বলা হয় যা করুণাকারীর মর্যাদা বোঝায়। আর পারিভাষিক অর্থ হলো صَرْفُ جَمِيعِ مَا اَنْعَمَ اللّٰهُ بِهِ عَلٰى عَبْدِهٖ اِلٰى مَا خَلَقَ لاجله অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার করুণাসমূহকে তার উদ্দেশ্য অনুপাতে ব্যয় করা।

পারস্পরিক সম্বন্ধ : حمد ও مدح এর মধ্যে عُمُوم خُصُوص مُطْلَق এর সম্বন্ধ রয়েছে। অর্থাৎ حمد শব্দটি খাস, আর مدح হলো আ'ম বা ব্যাপকতা বোধক। অর্থাৎ যেখানেই حمد পাওয়া যাবে সেখানে مدح পাওয়া যাবে।

কিন্তু যেখানে مدح পাওয়া যাবে সেখানে حمد পাওয়া যাওয়া জরুরি নয়। যেমন– مَدَحْتُ خَالِدًا عَلَى حُسْنِه বলা যেতে পারে কিন্তু حمدت خالدا على حسنه বলা যায় না। কারণ সৌন্দর্য কারো এখতিয়ারি বিষয় নয়। অতএব এর দরুন مدح করা সম্ভব; কিন্তু حمد সম্ভব নয়। যদি حمد ও مدح এক দিকে থাকে। আর অপর দিকে شكر শব্দ থাকে তাহলে উভয়ের মাঝে عموم خصوص من وجه এর সম্বন্ধ হবে।

عموم ও خصوص বলা হয় দুই كلى এর মধ্য থেকে প্রত্যেক كلى এর মধ্যে কিছুটা উমূম তথা ব্যাপকতা এবং কিছু খুসূস তথা বিশেষত্ব থাকাকে। আর এ বিষয়টি এখানে বিদ্যমান রয়েছে। কেননা حمد এবং مدح শব্দ দুটি তার সংশ্লিষ্ট বিষয় তথা متعلق এর দিক দিয়ে আ'ম। তা এভাবে যে, উভয়টির متعلق নেয়ামতও হতে পারে বা গায়রে নেয়ামতও হতে পারে। আর مورد তথা প্রকাশস্থলের দিক দিয়ে খাস। তা এভাবে যে, উভয়টি জবান দ্বারাই প্রকাশিত হয়। অন্য কোনো অঙ্গ দ্বারা নয়। কিন্তু شكر শব্দটি এর বিপরীত অর্থাৎ প্রকাশস্থলের দিক দিয়ে আ'ম। কেননা তা জবান দাঁরাও প্রকাশিত হয় এবং অন্তর ও অঙ্গ দ্বারাও প্রকাশিত হয়। আর شكر তার مورد এর দিক দিয়ে খাস। কারণ তা কেবল নেয়ামতের সাথে সংশ্লিষ্ট। গায়রে নেয়ামতের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। উল্লেখ্য যে, عموم ও خصوص من وجه এর সম্বন্ধ পাওয়া যাওয়ার জন্য ৩টি মাদ্দা বা উৎস থাকা জরুরি–

১. যার মধ্যে উভয়টি পাওয়া যায়। যেমন কেউ কাউকে দাওয়াত করলো। দাওয়াতকৃত ব্যক্তি মুখে বললো "আপনার শুকরিয়া" এখানে হাম্‌দ পাওয়া গেলো। কারণ তা জবানের দ্বারা প্রকাশিত হলো এবং শুক্‌রও পাওয়া গেলো। কারণ তা নেয়ামত তথা করুণার পরিপ্রেক্ষেই ঘটেছে। ২. দ্বিতীয় মাদ্দা বা উৎস হলো যেখানে হামদ্ পাওয়া যাবে সেখানে শুক্‌র পাওয়া যাবে না। যেমন আপনি এমনিতেই কারো প্রশংসা করলেন। ৩. তৃতীয় مادہ বা উৎস হলো যেখানে শুক্‌র পাওয়া যাবে সেখানে হামদ্ পাওয়া যাবে না। যেমন আপনি কারো দাওয়াত খেয়ে মুখে প্রশংসা করলেন। হাত ইত্যাদি দ্বারা কিছুই প্রকাশ করলেন না।

উপরোক্ত পার্থক্য ছিলো অর্থের দিক দিয়ে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পার্থক্য এই যে, حمد ও مدح এর বিপরীতে ذم তথা দুর্নাম ব্যবহৃত হয়। আর শুক্‌রের মুকাবিলায় كفر তথা অকৃজ্ঞতা ব্যবহৃত হয়। কারণ حمد ও مدح বলা হয় উত্তম গুণাবলি বর্ণনাকে। আর ذم বলা হয় কুৎসা রটনা বা দোষ ত্রুটি বর্ণনাকে। উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সংঘাত বা ব্যবধান সুস্পষ্ট। শুক্‌র বলা হয় করুণা প্রকাশকে। পক্ষান্তরে কুফর বলা হয়। করুণা গোপন করাকে। আর উভয়টির মধ্যে পূর্বের ন্যায় সংঘাত সুস্পষ্ট।

তৃতীয় বিষয় হলো الحمد শব্দের আলিম লাম কোন প্রকারের :

এ ব্যাপারে প্রথমে এটা বোঝা দরকার যে, আলিফ লাম প্রথমত ২ প্রকার। ১. اسمى ২. حرفى - اسمى ওই আলিফ লামকে বলে যা ইসমে ফায়েল বা ইসমে মাফউলের উপর প্রবিষ্ট হয়ে الذى এর অর্থ দেয়। আলিম লাম حرفى আবার ২ প্রকার। ১. زائد তথা অতিরিক্ত, ২. غير زائد তথা যা অতিরিক্ত নয়। অতিরিক্ত আলিফ লাম দ্বারা যা নামের পূর্বে আসে উক্ত আলিফ লাম উদ্দেশ্য। যেমন الحسن الحسين ইদ্যাদি। আবার غير ائد চার ধরনের। ১. جنسى ২. إستغراقى ৩. عهد ذهنى ৪. عَهْدِ خارجى

এগুলো চার প্রকারে সীমাবদ্ধ হওয়ার দলিল এবং সংজ্ঞা :

যে আলিফ লাম حرفى ও অতিরিক্ত নয় তা দু অবস্থা থেকে খালি নয়। তার দ্বারা বস্তুর সত্তা ও হাকিকত উদ্দেশ্য হবে। অথবা তার افراد তথা একক বস্তুসমূহ উদ্দেশ্য হবে। আলিফ লাম দ্বারা যদি বস্তুর সত্তা উদ্দেশ্য হয় তাহলে তাকে جنسى বলে। আর যদি افراد উদ্দেশ্য হয় তা আবার দুধরনের হবে। হয়তো সকল افراد উদ্দেশ্য হবে বা কিছু সংখ্যক افراد উদ্দেশ্য হবে।

সকল افراد উদ্দেশ্য হলে তাকে আলিফ লামে ইসতেগরাকী বলে। আর যদি কিছু সংখ্যক افراد উদ্দেশ্য হয় তা আবার ২ প্রকার। হয়তো নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক উদ্দেশ্য হবে। অথবা অনির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক উদ্দেশ্য হবে। যদি অনির্দিষ্ট সংখ্যক উদ্দেশ্য হয় তাহলে তাকে আলিফ লামে আহদে যেহনী বলে। আর নির্দিষ্ট সংখ্যক হলে তাকে আলিফ লামে আহদে খারেজী বলে।

جنسى এর উদাহরণ : اَلرَّجُلُ خَيْرٌ مِنَ الْمَرْأَةِ এর মধ্যে الرَّجُل ও المَرْأة শব্দের আলিফ লামটি জিনসী।

استغراقى এর উদাহরণ : যেমন اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ এর মধ্যে الإنسان শব্দের আলিফ লাম।

عهد ذهنى এর উদাহরণ : যেমন اَخَافُ اَنْ يَّاكُلَهُ الذِّئْبُ এর মধ্যে الذِّئْبُ শব্দের আলিফ লাম।

عهد خارجى এর উদাহরণ : যেমন فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ শব্দের মধ্যে الرسول শব্দের আলিফ লাম।

এখানে الرسول শব্দের আলিফ লামটি জিনসী হতে পারে এবং ইসতেগরাকীও হতে পারে। জিনসী হওয়ার ক্ষেত্রে অর্থ হবে হামদ আল্লাহ তা'আলার জন্যেই। আর ইসতেগরাকীর ক্ষেত্রে অর্থ হবে সকল প্রশংসা তথা প্রশংসার যত একক আছে তা সব আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। কারণ যতো মঙ্গল আছে সব কিছুর দাতা আল্লাহ তাআলা। চাই তা আল্লাহ তা'আলা সরাসরি দান করুন বা কারো মাধ্যমে দান করুন। যেমন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন وَمَا بِكُمْ مِنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ তোমাদের উপর যত করুণা আছে তা সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে।

الله : মানুষ যেভাবে আল্লাহ তাআলার জাত-সত্তা ও গুণাবলির ব্যাপারে পেরেশান। তদ্রূপ আল্লাহ শব্দের তাহকীকের ক্ষেত্রেও সকলে পেরেশান। প্রাচীন দার্শনিকগণ আল্লাহ তা'আলার কোনো ইসমেজাতি তথা সত্তাগত নাম থাকাকে অস্বীকার করতেন। যারা ইসমেজাতি থাকার প্রবক্তা তাদের মধ্য হতে কিছু সংখ্যকের ধারণা এই যে, আল্লাহ শব্দটি علم তথা নামবাচক। আর কিছু সংখ্যকের মতে اسم مُشْتَق তথা ভিন্ন শব্দ হতে গঠিত বিশেষ্য। কারো মতে صفت مُشْتَقَّة কারো মতে আল্লাহ শব্দটি ছুরিয়ানী ভাষা।

صفت مُشْتَقَّة ও اسم علم এর মধ্যে পার্থক্য : ইসম তথা বিশেষ্য অংশীদারিত্বের ধারণার পরিপন্থী হবে, বা হবে না। যদি প্রথমটি হয় তাহলে তাকে علم বলে। আর দ্বিতীয়টি হলে তা ২ ধরনের। হয়তো তা দ্বারা সত্তাগতভাবে তা বুঝে আসবে। অর্থাৎ অন্য কোনো অর্থের প্রতি তা সংশ্লিষ্ট হবে না। অথবা সত্তার সাথে সাথে ভিন্ন কোনো গুণবাচক অর্থও বুঝে আসবে। প্রথমটিকে اسم جنس এবং দ্বিতীয়টিকে صفت مشتقة বলে।

অধমের মতে প্রাধান্যযোগ্য মত এই যে, আল্লাহ এমন সত্তার নামবাচক শব্দ যার অস্তিত্ব অবধারিত এবং যিনি সকল উত্তম গুণাবলিতে গুণান্বিত।

الذى হলো اسم موصول - ইসমে মাউসূল এমন ইসমকে বলে যা صله ছাড়া বাক্যের পূর্ণ অংশ হতে পারে না। جعل শব্দটি صير অর্থে। দুই মাফউলের দ্বারা متعدى প্রথম মাফউল হলো اصول الفقه এবং দ্বিতীয় মাফউল হলো مبنى

اُصُوْلُ الْفِقْهِ এর সংজ্ঞা : এর দু ধরনের সংজ্ঞা বর্ণনা করা হয়। (ক) حد اضافى (খ) حدّ لقبى (ক) حد اضافى দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা বর্ণনা করা। আর (খ) حدّ لقبى দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহের সামষ্টিকভাবে একই সংজ্ঞা বর্ণনা করা। মোটকথা حدّ اِضافى এর সার এই যে, اصول শব্দটি اصل এর বহুবচন। এটা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। (১) যার উপর অন্য বস্তু স্থাপিত হয়। যেমন ছাদের জন্য দেয়াল হলো আছল। এভাবে পুত্রের জন্যে পিতা হলো আছল। ২. راجح (প্রাধান্যযোগ্য)। যেমন বলা হয় اِنَّ الْاَصْلَ فِى الْاِسْتِعْمَالِ الْحَقِيْقَةُ অর্থাৎ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে হাকিকতই প্রাধান্য পায়। ৩. কায়দা বা নীতি। যেমন

বলা হয় إِنَّ الْفَاعِلَ مَرْفُوعٌ أَصْلٌ مِنَ النَّحْوِ ফায়েল মারফু হওয়াটা নাহু শাস্ত্রের নীতি। ৪. দলিল। যেমন বলা হয়- وَأْتُوا الزَّكٰوةَ أَصْلٌ وُجُوبِ الزَّكٰوةِ অর্থাৎ যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য اتوا الزكوة আয়াতটি দলিল। ৫. استحباب অর্থাৎ বর্তমান অবস্থাকে পূর্বের অবস্থার উপর কিয়াস বা অনুমান করা। যেমন বলা হয় طهارة الماء اصل অর্থাৎ পানির বর্তমান অবস্থাকে তার পূর্বের অবস্থার উপর কিয়াস করতে হবে। তা এভাবে যে, পাত্রে ঢালার সময় যখন পানি পাক ছিলো। তাহলে এখনও তা পাক হওয়ার বিধানের উপর প্রয়োগ করতে হবে। তবে এটা ঐ সময়ের ব্যাপার যখন বর্তমান অবস্থায় পানি পবিত্র হওয়া বা অপবিত্র হওয়ার নিশ্চিত জ্ঞান না থাকে। অতএব যদি বাস্তব প্রত্যক্ষ ইত্যাদি বা অন্য কোনো উপায়ে পানি অপবিত্র হওয়া জানা যায়। তাহলে এক্ষেত্রে ইস্তিসহাবকে দলিল বানিয়ে পানি পাক হওয়ার বিধান প্রয়োগ করা যাবে না।

فقه : ★ শরয়ী শাখাগত ঐ সকল বিধানকে ফিকাহ বলে যা اَدِلَّةٌ تَفْصِيلِيَّةٌ তথা শরীআতের বিস্তারিত দলিলের মাধ্যমে লাভ হয়। যে বিধানের সম্পর্ক আমলের সাথে থাকে তাহাকে احكام فرعية বলে। আর যে আমলের সম্পর্ক থাকে আকীদার সাথে তাকে احكام اصلية বলে।

★ ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন- হালাল-হারাম ও জায়েয-নাজায়েয অবগত হওয়ার নাম হলো ফিকহ।

★ আর সুফিয়ায়ে কেরামের মতে ইলম ও আমলের সমন্বয়ের নাম হলো ফিকহ।

উসূলে ফিকহর حدّ لقبي তথা পারিভাষিক সংজ্ঞা : উসূলে ফিকহ এমন নীতিমালা অবগত হওয়ার নাম যার মাধ্যমে ফিকহ পর্যন্ত উপনীত হওয়া সম্ভব হয়। অর্থাৎ যে সব নীতিমালা দ্বারা ইলমে ফিকহর জ্ঞান লাভ হয় সেসকল নীতিমালা জানার নাম হলো উসূলে ফিকহ।

شرائع শব্দটি شريعة এর বহুবচন। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত ও নির্ধারিত পছন্দনীয় তরিকাকে শরীআত বলে। এখানে شرائع দ্বারা শরয়ী আকীদা বিশ্বাস উদ্দেশ্য।

احكام - حكم শব্দের বহুবচন। আল্লাহ তা'আলার ঐ সম্বোধন বা নির্দেশকে حكم বলা হয় যা শরীআতের বিধানারোপিত তথা মুকাল্লাফ ব্যক্তির কার্যকলাপের সাথে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সম্বন্ধিত থাকে। কখনো কখনো আল্লাহ তা'আলার বিধান দ্বারা প্রমাণিত বস্তুর উপরও حكم শব্দ প্রয়োগ করা হয়। যেমন ওয়াজিব হওয়া, হারাম হওয়া ইত্যাদি। এখানে احكام শব্দ দ্বারা এই অর্থই উদ্দেশ্য। যদিও شرائع শব্দের অধীনে আহকাম শামিল রয়েছে তথাপি তার প্রতি গুরুত্বারোপের লক্ষ্যে شرائع শব্দের পরে احكام শব্দ উল্লেখিত হয়েছে।

اساس বুনিয়াদ, ভিত্তি। موثقة - توثيق মাসদার থেকে উৎপত্তি। মুহকাম এবং মজবুত করা, ঠিক করা। براهين শব্দটি برهان শব্দের বহুবচন। এমন দলিলকে বলে যা সুনির্দিষ্ট নিশ্চিত বাক্যের সমন্বয়ে গঠিত। دلائل শব্দ دليل এর বহুবচন। দলীল এমন জানা তাসদীকের নাম যা অজানা তাসদীক পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। এখানে براهين শব্দের পরে دلائل শব্দ উল্লেখ করাটা খাস এর পরে আ'ম উল্লেখ করার ন্যায়। এমনও বলা হয়ে থাকে যে, براهين দ্বারা عقلي তথা যুক্তিগত প্রমাণাদি এবং دلائل শব্দ দ্বারা نقلي তথা উক্তিগত প্রমাণাদি উদ্দেশ্য।

موشحة - توشيح মাসদার থেকে গঠিত। অর্থ- পোশাক পরিধান করানো, সজ্জিত করা।

حلي শব্দের ح বর্ণটি পেশ ও ل বর্ণে যের যোগে হবে, حلية এর বহুবচন। সোনা-রূপার অলংকার।

شمائل শব্দটি شملة শব্দের বহুবচন। অর্থ অভ্যাস, চরিত্র। সম্ভাবনা আছে যে, حلي দ্বারা শরয়ী যুক্তিগত দলিলসমূহ উদ্দেশ্য। আর شمائل দ্বারা শরয়ী উক্তিগত দলিলসমূহ উদ্দেশ্য।

وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ اَجْرٰى هٰذِهِ الرُّسُوْمَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ وَاَيَّدَ الْعُلَمَاءَ بِالْاَيْدِ الْمَتِيْنِ وَرَفَعَ دَرَجَاتِهِمْ فِىْ اَعْلٰى عِلِّيِّيْنَ وَشَهِدَ لَهُمْ بِالْفَلَاحِ وَالْيَقِيْنِ وَعَلٰى اٰلِه وَاَصْحَابِهِ الْهَادِيْنَ الْمُهْتَدِيْنَ وَتَابِعِيْهِمْ وَتَبَعِهِمْ مِنَ الْاَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِيْنَ ـ

অনুবাদ॥ অনন্তর পরিপূর্ণ রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের মহান নেতা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি, যিনি শরীআতের এ নীতিমালাকে মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত প্রচলিত করেছেন এবং আলিমদেরকে পর্যাপ্ত সহায়তা দ্বারা শক্তিশালী করেছেন। আর বেহেশতের সর্বোচ্চ স্থানে তাঁদের মর্যাদা সমুন্নত করেছেন এবং তাঁদের সাফল্য ও ঈমানের সাক্ষ্য দান করেছেন। আর (পূর্ণাঙ্গ করুণা ও শান্তি বর্ষিত হোক), তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীগণের প্রতি যাঁরা ছিলেন সুপথ প্রদর্শনকারী ও সুপথপ্রাপ্ত এবং তাঁদের অনুসারীগণের ওপর ও মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্য হতে তাদের অনুসারীগণের প্রতিও সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ اَلصَّلٰوةُ শব্দ সম্পর্কে দুটি উক্তি রয়েছে। ১মটি জুমহুর তথা সংখ্যা গরিষ্ঠ আলিমগণের, দ্বিতীয়টি আল্লামা যমখশরী এর। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমগণের মতে صَلٰوة শব্দটি فَعَلَة এর ওজনে। মূলত صَلَوَة ছিলো। ওয়াও বর্ণটি হরকত বিশিষ্ট এবং তার পূর্বাক্ষর হরফে সহীহ সাকিন। একারণে ওয়াও এর হরকতকে তার পূর্বাক্ষরে দেয়া হয়েছে এবং ওয়াওকে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করে صَلٰوة হয়েছে। যেমন- زَكٰوة শব্দটি মূলত زَكَوَة ছিলো। এই কায়দা অনুযায়ী زَكٰوة হয়েছে। তবে উভয়ের উচ্চারণে تَفْخِيْم তথা মোটা করার ভিত্তিতে ওয়াওসহ লেখা হয়। যাতে বোঝা যায় যে, শব্দটির মূলে আলিফের স্থলে ওয়াও ছিলো। صَلٰوة শব্দটি صَلّٰى থেকে উৎপত্তি। এর শাব্দিক অর্থ হলো দোয়া করা, ডাকা। যেমন হাদীসে আছে

اِذَا دُعِىَ اَحَدُكُمْ اِلٰى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَاِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ وَاِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ

এর মধ্যে فَلْيُصَلِّ শব্দটি فَلْيَدْعُ এর অর্থে অর্থাৎ যখন তোমাদের কাউকে আহার করার জন্য ডাকা হয় সে যেন আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেয়। যদি ইফতারের সময় হয় তাহলে আহ্বানকারীর সাথে বসে ইফতার গ্রহণ করবে। আর রোযাদার হলে রোযাদারের জন্য কল্যাণ ও বরকতের দোয়া করবে। এভাবে وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ আয়াত। "আপনি তাদের জন্য দোয়া করুন। কারণ আপনার দোয়া তাদের জন্য সস্থির কারণ হয়।" অতঃপর মাজাযে মুরসালরূপে বিশেষ রোকনসমূহ পালনের ক্ষেত্রে صَلٰوة শব্দ ব্যবহার হয়। কারণ দোয়া হলো নির্দিষ্ট রোকনের একটি جُزْءٌ (অংশ)। অতএব جزء বলে كُلٌّ (গোটা বস্তু) উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে।

আল্লামা যমখশরী বলেন صَلٰوة শব্দটি صَلّٰى صَلًا থেকে উৎপত্তি হয়েছে। এর অর্থ হলো নিতম্ব হেলানো বা নাড়ানো। অতঃপর রূপক অর্থে সুনির্দিষ্ট রোকনসমূহ তথা নামায আদায় করার অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। কারণ নামাযের মধ্যে নিতম্ব নড়াচড়া করে থাকে।

কোনো কোনো আলিম বলেন- আল্লাহ তা'আলার সালাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পূর্ণাঙ্গ রহমত। আর ফেরেশতাদের সালাত হলো ইসতেগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা। মুমিন ব্যক্তিদের সালাত হলো রহমত কামনা ও দোয়া করা। পশু-পাখীদের সালাত হলো তাসবীহ আদায় করা।

سَيِّد শব্দের বহুবচন হলো سَادَة، سَادَاتٌ، أَسْيَاد، سَيَائِد। অর্থ নেতা, সর্দার। রাসূলুল্লাহ (স) নিজের জন্য শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ এবং অন্যদের ক্ষেত্রেও তেমন ব্যবহার করেছেন। যেমন তিনি আমির হামযা (রা) সম্পর্কে বলেন حَمْزَةُ سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ ফাতেমা (রা) সম্পর্কে বলেছেন فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ এভাবে হাছানাইন সম্পর্কে বলেছেন اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ মুসলমানদের পরিভাষায় হযরত ফাতেমা (রা) এর বংশধরদের জন্য سيد শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

محمد : محمد এবং احمد রাসূলুল্লাহ (স) এর পবিত্র নাম। رسوم দ্বারা শরয়ী প্রথা প্রচলন উদ্দেশ্য। يوم الدين দ্বারা কেয়ামতের দিন উদ্দেশ্য।

تَأْيِيْد : أَيَّدَ الْعُلَمَاءَ অর্থ– শক্তি যোগানো, স্বপক্ষে কথা বলা, শক্তি, মজবুত, সুদৃঢ়, অটল।

أَعْلَى عِلِّيِّيْنَ বেহেশতের সর্বোচ্চ স্থান। সিদরাতুল মুনতাহা হলো আরশে আজিমের ডান পায়া।

وعلى آله وَأَصْحَابِه : آل শব্দটি মূলত কারো কারো মতে أَهْل ছিলো। কারণ নিয়ম আছে যে, কোনো শব্দকে তাসগীরের ওজনে নিলে তার মূল বর্ণসমূহ প্রকাশ পায়। আর آل শব্দটির তাসগীর আসে أُهَيْل মোট কথা أَهْل শব্দের হা বর্ণকে খেলাফে কিয়াস হামযা দ্বারা পরিবর্তন করে امن এর নিয়মে হামযাকে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। ফলে آل হয়েছে।

কারো কারো মতে শব্দটি মূলত أَوَل ছিলো। অতপর ওয়াহ মুতাহাররাক ও তার পূর্বাক্ষর মাফতুহ হওয়ার কারণে ওয়াওকে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে।

آل ও اهل এর ব্যবহারিক পার্থক্য : এখন কথা হলো ব্যবহারিক ক্ষেত্রে آل ও اهل এর মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি না? এর বিবরণ এই যে, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

প্রথম পার্থক্য : آل শব্দটি সাধারণত অভিজাত তথা মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। চাই পার্থিব মর্যাদা হোক যেমন آل فرعون চাই পারলৌকিক মর্যাদা হোক, যেমন آل محمد কারণ রাসূলুল্লাহ (স) উভয় দিক দিয়েই মর্যাদাবান ছিলেন। আর اهل শব্দটি ব্যাপক। অর্থাৎ ইতর ও ভদ্র তথা উঁচু নিচু সর্বক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

দ্বিতীয় পার্থক্য : آل শব্দটি কেবল ذوى العقول তথা বিবেক সম্পন্ন প্রাণীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আর آل শব্দটি বিবেক সম্পন্ন ও বিবেকহীন উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।

তৃতীয় পার্থক্য : কারো কারো মতে آل শব্দটি শুধু পুরুষের ক্ষেত্রে বলা হয়। আর اهل শব্দটি পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য ব্যবহার হয়।

آل শব্দের উদ্দেশ্যের মধ্যেও মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে آل দ্বারা ঐ সকল ব্যক্তি উদ্দেশ্য যাদের জন্য সাদকা গ্রহণ করা হারাম এবং গণিমতের মাল হতে এক পঞ্চমাংশ নির্ধারিত। রাফেযীগণের মতে آل দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হযরত ফাতেমা, আলী, এবং হাসান ও হুসাইন (রা)। আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে নবী করীম (স) এর বিবি সাহেবাগণ এবং তার সন্তানাদি উদ্দেশ্য। কেউ কেউ বলেন প্রত্যেক খোদাভীরু মুমিন ব্যক্তিই রাসূলুল্লাহ (স) এর آل তথা পরিবার। اصحاب শব্দটি হয়তো صَاحِب এর বহুবচন। যেমন اطهار শব্দটি طاهر এর বহুবচন। অথবা صَحِب (হা বর্ণের যের) যেমন أَنْمَار - نَمِر এর বহুবচন। অথবা صَحْب এর বহুবচন। (হা বর্ণের জযম) যেমন أَنْهَار শব্দটি نَهْر শব্দের বহুবচন। কারো মতে صَحِيْب এর বহুবচন। যেমন أَشْرَاف এর বহুবচন আসে شَرِيْف।

যে ব্যক্তি ঈমান অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স) এর সাথে সাক্ষাৎ করেছে এবং ঈমান অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটেছে তাকে সাহাবী বলে।

তাবেয়ী : যে ব্যক্তি কোনো সাহাবীকে ঈমান অবস্থায় দেখা পেয়েছে তাকে তাবেয়ী বলে। আর তাবেয়ীকে যে ঈমান অবস্থায় দেখেছে তাকে তাবে' তাবেয়ীন বলে।

اَلْحَمْدُ وَ بِسْمِ اللّٰهِ দ্বারা শুরু করার কারণ : নুরুল আনওয়ার এর ব্যাখ্যাগ্রন্থকার মোল্লা জয়ুন (র) স্বীয় কিতাবকে বিসমিল্লাহ ও আলহামদু দ্বারা শুরু করেছেন। কারণ এর দ্বারা পবিত্র কোরআনের অনুসরণ করা হয়। কেননা কোরআন মজীদকেও বিসমিল্লাহ ও আলহামদু দ্বারা শুরু করা হয়েছে। উপরন্তু এর দ্বারা হাদীসের উপরও আমল হয়ে যায়। কারণ রাসূলুল্লাহ (স) এরশাদ করেছেন كُلُّ اَمْرٍ ذِيْ بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ فِيْهِ بِسْمِ اللّٰهِ فَهُوَ اَبْتَرُ অপর এক হাদীসে بِسْمِ اللّٰهِ এর স্থলে بِحَمْدِ اللّٰهِ فَهُوَ اَقْطَعُ وَاَجْزَمُ উল্লেখিত হয়েছে। তাছাড়া পূর্ববর্তী আলিমগণেরও এ ধরনের প্রচলন রয়েছে।

প্রশ্ন : এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, একই সময়ে উভয়টি দ্বারা কিভাবে শুরু করা সম্ভব? কারণ শুরু করা বলা হয় কোনো বস্তুকে সবার আগে করাকে। আর তা এক বস্তুর ক্ষেত্রে হতে পারে। দুটি বস্তুর দ্বারা নয়।

উত্তর : এর উত্তর এই যে, اِبْتِدَاء তথা শুরু করা ৩ প্রকার।

১. اِبْتِدَاء حَقِيْقِى ২. اِبْتِدَاء اِضَافِى ৩. اِبْتِدَاء عُرْفِى

১. কোনো বস্তুকে সবার আগে উল্লেখ করা অর্থাৎ যার আগে আর কোনো কিছুই উল্লেখ থাকে না তাকে اِبْتِدَاء حَقِيْقِى বলে।

২. কোনো কিছুকে অপর কিছুর আগে উল্লেখ করা। চাই তার আগে অপর কিছু উল্লেখ হোক বা না তাকে اِبْتِدَاء اِضَافِى বলে।

৩. উদ্দেশ্য ও লক্ষের আগে উল্লেখ করা। যদিও তা উদ্দেশ্য নয় এমন কোনো কিছুর পরেই হোক। এটাকে اِبْتِدَاء عُرْفِى বলে। অতএব বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করাটা اِبْتِدَاء حَقِيْقِى এর উপর প্রযোজ্য হবে। আর আলহামদু দ্বারা শুরু করাটা اِبْتِدَاء اِضَافِى এর উপর প্রযোজ্য হবে। বিসমিল্লাহ এর মধ্যে আল্লাহর জাত মুকাদ্দাম, আর আলহামদু এর মধ্যে সিফত মুকাদ্দাম, আর কারো প্রশংসার ক্ষেত্রে জাত-সত্তা আগে আসে। পরে তার সিফাত বা গুণাবলি উল্লিখিত হয়।

অথবা উভয়টি عُرْفِى এর উপর প্রযোজ্য। কারণ উভয়টি উদ্দেশ্যের আগে উল্লেখিত হয়েছে।

وَبَعْدُ فَلَمَّا كَانَ كِتَابُ الْمَنَارِ اَوْجَزَ كُتُبِ الْاُصُولِ مَتْنًا وَعِبَارَةً وَاشْمَلَهَا نُكْتًا وَدِرَايَةً وَلَمْ يَشْتَغِلْ بِحَلِّهِ اَحَدٌ مِّنَ الشُّرَّاحِ الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالزَّمَانِ وَلَمْ يَعْصِمُوا عَنِ النِّسْيَانِ فَاِنَّ بَعْضَ الشُّرُوحِ مُخْتَصَرَةٌ مُخِلَّةٌ لِفَهْمِ الْمَطَالِبِ وَبَعْضَهَا مُطَوَّلَةٌ مُمِلَّةٌ فِي دَرْكِ الْمَآرِبِ وَقَدِيْمًا كَانَ يَخْتَلِجُ فِي قَلْبِي اَنْ اُشَرِّحَهُ شَرْحًا يَنْحَلُّ مِنْهُ مُغْلَقَاتُهُ وَيُوْضِحُ مُشْكِلَاتُهُ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلْاِعْتِرَاضِ وَالْجَوَابِ وَلَا ذِكْرَ لِمَا صَدَرَ مِنْهُمْ مِنَ الْخَلَلِ وَالْاِضْطِرَابِ وَلَمْ يَتَّفِقْ لِي ذٰلِكَ اِلٰى مُدَّةٍ لِكَثْرَةِ الْمَشَاغِلِ وَضِيْقِ الْمَحَامِلِ - فَاِذَا اَنَا وَصَلْتُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ الْمُنَوَّرَةِ وَالْبَلْدَةِ الْمُكَرَّمَةِ فَقَرَأَ عَلَيَّ الْكِتَابَ الْمَذْكُوْرَ بَعْضُ خُلَّانِي وَخُلَّصُ اِخْوَانِي مِنَ الْخُطَبَاءِ الْمُعَظَّمَةِ لِلْحَرَمِ الشَّرِيْفِ وَالْمَسْجِدِ الْمُنِيْفِ فَاقْتَرَحُوا بِهٰذَا الْاَمْرِ الْعَظِيْمِ وَالْخَطْبِ الْجَسِيْمِ وَحَكَمُوا عَلَيَّ جَبْرًا وَلَمْ يَتْرُكُوا لِي عُذْرًا فَشَرَعْتُ فِي اِسْعَافِ مَامُوْلِهِمْ وَاِنْجَاحِ مَسْئُوْلِهِمْ عَلٰى حَسَبِ مَا كَانَ مُسْتَحْضَرًا لَّدَيَّ فِي الْحَالِ مِنْ غَيْرِ تَوَجُّهٍ اِلٰى مَا قِيْلَ اَوْ يُقَالُ وَسَمَّيْتُهُ بِكِتَابِ نُوْرِ الْاَنْوَارِ فِي شَرْحِ الْمَنَارِ وَاللّٰهُ الْمُوَفِّقُ فِي الْبِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ وَهُوَ حَسْبِي لِلسَّعَادَةِ وَالْهِدَايَةِ وَالْمَسْئُوْلُ عَنْهُ اَنْ يَّجْعَلَهُ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ -

---

অনুবাদ ॥ হামদ ও সালতাতের পর যেহেতু আল্লামা আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) রচিত 'আল্-মানার' গ্রন্থটি উসূলুল ফিকহের কিতাবসমূহের মধ্যে ভাষা ও বক্তব্যের দিক দিয়ে অতি সংক্ষিপ্ত এবং সূক্ষ্মতত্ত্ব ও মর্মোদ্ধারে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। কিন্তু পূর্বেকার কোন ব্যাখ্যাকারই তার ভাবার্থ বিশ্লেষণে উদ্যোগ গ্রহণ করেন নি। কেউ উদ্যোগ নিলেও তারা ভুল-ভ্রান্তি হতে মুক্ত থাকতে পারেন নি। কেননা, কোন কোন ব্যাখ্যাগ্রন্থ এত সংক্ষিপ্ত যে, সেগুলো মর্মার্থ উদ্ধারে বিঘ্নসৃষ্টিকারী। আবার কতেক এত দীর্ঘায়িত যে, সেগুলোর উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গমে বিরক্তিকর। দীর্ঘদিন যাবৎ আমার অন্তরে একটি বাসনা ঘুরপাক খাচ্ছিল যে, আমি এর এমন একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করব, যার দ্বারা এর জটিল মাসয়ালাসমূহ খুলে যাবে এবং তার কঠিন বিষয়গুলো সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। এতে কোন অভিযোগ ও পরমত খণ্ডনের পেছনে পড়ব না এবং পূর্ববর্তী ব্যাখ্যাকারদের থেকে যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশ পেয়েছে, সেগুলোও অবশ্যই আমি উল্লেখ করব। কিন্তু নানাবিধ ব্যস্ততা ও সুযোগের অভাবে দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমার পক্ষে তা আঞ্জাম দেয়া সম্ভব হয় নি।

অবশেষে যখন আমি মদীনা মুনাওয়ারা ও পবিত্র শহর মক্কায় পৌছলাম। তখন হেরেম শরীফ এবং সম্মানিত মসজিদে নববীর বিশিষ্ট খতীবগণের মধ্য থেকে আমার কতিপয় বন্ধু ও একনিষ্ঠ ভাই আমার নিকট উক্ত আল-মানার গ্রন্থটি অধ্যয়ন করলেন। অতপর তাঁরা এ মহা গুরুত্বপূর্ণ কাজের (আল্ মানারের ব্যাখ্যা

লেখার) অনুরোধ জানান। এমনকি তাঁরা আমার ওপর এতো চাপসৃষ্টি করলেন যে, তাঁরা আমার কোন ওযর আপত্তি করার সুযোগ পর্যন্ত রাখেন নি।

অগত্যা আমি তাঁদের চাহিদা পূরণে ও আবদার রক্ষায় তৎক্ষণাৎ আমার স্মৃতিপটে যা কিছু উপস্থিত ছিল, তার ওপর নির্ভর করেই কে কি বলেছে বা বলবে তদপ্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে আমার কাজ শুরু করলাম। আর এর নামকরণ করলাম 'নূরুল আন্ওয়ার ফী শারহিল মানার' নামে।

শুভ সূচনায় ও শুভ সমাপ্তিতে আল্লাহ তা'আলাই তাওফীকদাতা। সৌভাগ্য ও সঠিক পথ প্রদর্শনে তিনিই যথেষ্ট। আর তাঁরই সমীপে বিনীত প্রার্থনা, যেন তিনি এ গ্রন্থটিকে তাঁরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিবেদিতরূপে কবুল করেন। সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত কারো পক্ষে অন্যায় থেকে বিরত থাকার এবং পূণ্য কাজ করার শক্তি-সামর্থ্য নেই।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قَبْلُ، بَعْدُ শব্দ দুটি যরফে জামান ও মাকান উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। যরফে জামানের উদাহরণ যেমন- الْغَدُ بَعْدَ الْيَوْمِ। আগামী আজ এর পরে এবং الْيَوْمُ قَبْلَ الْغَدِ। আজ হলো আগামীকালের পূর্বে। যরফে মাকানের উদাহরণ دَارِیْ بَعْدَ دَارِكَ আমার বাড়ী তোমার ঘরের পরে এবং دَارِیْ قَبْلَ دَارِكَ আমার বাড়ী তোমার ঘরের আগে।

قبل بعد শব্দ দুটি ৩ ভাবে ব্যবহৃত হয়।

১. উভয়টির মুযাফ ইলায়হে উল্লেখ থাকে।

২. উভয়টির মুযাফ ইলায়হের সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত থাকে।

৩. উভয়টির মুযাফ ইলায়হে বিলুপ্ত তবে অন্তরে বিদ্যমান থাকে বা নিয়তের মধ্যে থাকে। প্রথম দু ক্ষেত্রে উভয় শব্দ মু'রাব অর্থাৎ আমিল অনুযায়ী অ'মল গ্রহণ করবে। আর তৃতীয় ক্ষেত্রে পেশের উপর মবনী হবে। তবে শব্দ দুটি পেশের উপর মবনী হওয়ার ক্ষেত্রে ৩টি প্রশ্ন সৃষ্টি হয়। যথা−

১. উভয়টি ইসম। আর ইসম এর মধ্যে মূল হলো মু'রাব হওয়া। কাজেই উভয়টি মু'রাব হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

২. যদি মবনী পড়তে হয় তাহলে মবনীর ক্ষেত্রে মূল হলো সুকুন। কাজেই সুকুনের উপর মবনী হওয়াউ উচিত।

৩. যদি হরকত সহকারে পড়া জরুরি হয় তাহলে যবর যেহেতু সর্বাধিক সহজ হরকত। কাজেই যবরের উপর মবনী হওয়া উচিত। অথচ পেশের উপর মবনী হলো কেন?

উত্তর : প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে, যেসব শব্দ مبنى اصل এর সাথে সামঞ্জস্য রাখে সেগুলো মবনী হয়। মবনী আছল ৩টি। ১. ফে'লে মাজী, ২. আমরে হাযের, ৩. সকল হরফ বা অব্যয়। আর قبل بعد শব্দ দুটি মুযাফ ইলায়হের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকার ক্ষেত্রে তথা পরনির্ভর হওয়ার দিক দিয়ে হরফের সাথে সামঞ্জস্যশীল। অর্থাৎ হরফ যেভাবে অন্য শব্দের সাথে মিশাছাড়া নিজ অর্থ বোঝায় না, তদ্রূপ এ শব্দদুটোও মুযাফ ইলায়হের সাথে না মেশা পর্যন্ত তার প্রকৃত অর্থ বোঝা যায় না। এই সামঞ্জস্যতার কারণেই এই শব্দ দুটোও মবনী হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর : মবনী ২ প্রকার। ১. مبنى بالاصل তথা মৌলিকভাবে মবনী। ২. مبنى بالعارض তথা বিশেষ কোনো কারণে মবনী। উপরোক্ত ৩টি বস্তু হলো মবনী আছল বা মৌলিক মবনী।

আর مبنى بالعارض এমন যা মবনী আসল এর সাথে সামঞ্জস্য রাখে। مبنى بالاصل এর মধ্যে সুকুন হওয়া আসল থাকে। مبنى بالعارض এর ক্ষেত্রে সুকুন হওয়াটা আসল নয়। সুতরাং قبل بعد শব্দ দুটি যেহেতু مبنى بالعارض এই জন্য তার মধ্যে সুকুন আসল নয়

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর : قَبْلُ بَعْدُ শব্দ দুটির জন্য ইযাফত হওয়া জরুরি। তবে শব্দ দুটোর মুযাফ ইলায়হে বিলুপ্ত থাকে। অতএব মুযাফ ইলায়হে বিলুপ্ত হওয়ার কারণে যেহেতু উভয়টির মধ্যে অধিক সহজতা সৃষ্টি হয়। এ কারণে তুলনামূলক কঠিন হরকত তথা পেশ এর উপর মবনী হয়েছে।

مَنَار নূরুল আনোয়ারে মূলমতন এর নাম। أَوْجَزُ শব্দটি وَجِزَ এর ইসমে তাফযীল অর্থ অধিক সংক্ষিপ্ত। অলংকার পূর্ণ বাক্য। مَتْن পিঠ, উঁচু ও শক্ত জায়গা। রূপক অর্থে সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাকে বলে যা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। نُكَتٌ - نُكْتَةٌ এর একবচন। কঠিন বিষয় যা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে অর্জিত হয়। مُمِلَّةٌ - إِمْلَالٌ হতে উৎপত্তি, কষ্টে নিপতিত করা, বিরক্ত করা, مَآرِبُ এর একবচন হলো مَارِبُ প্রয়োজন, উদ্দেশ্য।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ خِلَّانٌ শব্দটি خَلِيْلٌ এর বহুবচন, খাটি বন্ধু, পরম বন্ধু। خُطَبَاءُ এর একবচন হলো خَطِيْبٌ বক্তা, বাগ্মী, اَلْمُنِيْفُ উঁচু, মহান, اِقْتِرَاحٌ চাওয়া, কামনা করা, خَطِيْبٌ جَسِيْمٌ বড়ো কাজ, মহৎ কাজ, اِسْعَافٌ প্রয়োজন পূর্ণ করা, অভাব মেটানো, اِنْجَاحٌ সফল হওয়া, উত্তীর্ণ হওয়া।

নুরুল আনওয়ার গ্রন্থকার মোল্লা জিয়ন (র) বলেন− মানার গ্রন্থটি উসূলে ফিকাহ সংক্রান্ত কিতাবাদির মধ্যে মতনের দিক দিয়ে অতি উত্তম তবে সংক্ষিপ্ত। সূক্ষ্মতত্ত্ব এবং রহস্য উদঘাটনের দিক দিয়ে অত্যন্ত ব্যাপকতা সম্পন্ন। আমার পূর্বে এর ব্যাখ্যা গ্রন্থকারদের মধ্য থেকে কেউই সঠিকভাবে কিতাব আয়ত্তে আনার কাজে লিপ্ত হননি। আর কেউ লিপ্ত হলেও তারা ভুলভ্রান্তি থেকে নিরাপদ থাকতে পারেননি। কারণ কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার অতিসংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে এর উদ্দেশ্য অনুধাবনের ক্ষেত্রে বিফল প্রমাণিত হয়েছেন। আর কোনো কোনোটির মধ্যে এতো দীর্ঘতা এসেছে যে, পাঠকবর্গ তাতে বিরক্তি বোধ করে। আমার আগে থেকেই ইচ্ছা ছিলো যে, এই গ্রন্থের এমন একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখবো যার মধ্যে সকল জটিল বিষয়গুলো সহজরূপে ফুটে উঠবে এবং সকল দুর্বোধ্য মাসআলাসমূহকে এমন ব্যাখ্যা করবো যার মধ্যে প্রশ্নোত্তরের কোনো প্রয়োজন না পড়ে। উপরন্তু তার মধ্যে পূর্বেকার ব্যাখ্যাকারদের সে সকল দোষ-ত্রুটি উল্লেখিত হবে না। যার কারণে মূল উদ্দেশ্য বোধগম্য করায় বিঘ্ন সৃষ্টি হয় এবং ইবারতের মধ্যে পারস্পরিক গরমিল দেখা দেয়। কিন্তু বিভিন্ন ব্যস্ততা ও কর্মলিপ্ততার দরুন দীর্ঘদিন যাবৎ এ গ্রন্থ লেখা সম্ভব হয়নি।

قوله فَإِذَا اَنَا وَصَلْتُ الخ মোল্লা জিয়ন (র) বলেন− হঠাৎ ভাগ্যক্রমে পবিত্র মদীনায় যাওয়ার সৌভাগ্য হলো। সেখানে কতিপয় বন্ধু এ কিতাবের শরাহ লিখার ব্যাপারে আমার কাছে আবেদন পেশ করেন। তারা আমাকে এ পরিমাণ বাধ্য করেন যে, আমার কোনো ওজর আপত্তি তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হলো না। বাধ্য হয়ে আমি তাদের আবেদন মঞ্জুর করলাম এবং অত্র শরাহ গ্রন্থ লিখতে শুরু করলাম। শরাহ লিখার সময় আমি এ বিষয়টির বিশেষ লক্ষ্য রেখেছি যাতে এর মধ্যে বেশি প্রশ্নোত্তর ও নানারূপ মন্তব্য উল্লেখিত না হয়। আমি এ গ্রন্থটির নাম রেখেছি "নুরুল আনওয়ার ফী শরহিল মানার"। শুরু ও শেষে আল্লাহ তাআলাই তওফীক দাতা। তিনি আমার সৌভাগ্য অর্জন ও পথ প্রদর্শনের জন্য যথেষ্ট। তার দরবারে আমার মিনতী এই যে, তিনি যেন অত্র কিতাবকে তার কবুলিয়াতের দরজায় স্থান দেন। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও এরাদা ছাড়া কোনো কাজ সম্ভব নয় এবং কোনো শক্তি কাজে লাগতে পারে না। তিনি অতি মহান, অতি উঁচু।

قَالَ الْمُصَنِّفُ (رح) بَعْدَ مَا تَيَمَّنَ بِالتَّسْمِيَةِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا اِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ فَتَفْسِيْرُ قَوْلِهِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاضِحٌ وَاَمَّا الْهِدَايَةُ فَكَمَا قِيْلَ الدَّلَالَةُ الْمُوْصِلَةُ اِلَى الْمَطْلُوْبِ اَوِ الدَّلَالَةُ عَلٰى مَايُوْصِلُ اِلَى الْمَطْلُوْبِ وَاَجْمَعُوْا عَلٰى اَنَّهُ اِذَا نُسِبَ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى يُرَادُ بِهِ الْاَوَّلُ وَاِذَا نُسِبَ اِلَى الرَّسُوْلِ ﷺ اَوِ الْقُرْاٰنِ يُرَادُ بِهِ الثَّانِى وَقَالُوْا اَيْضًا اِنَّهُ اِذَا عُدِّىَ اِلَى الْمَفْعُوْلِ الثَّانِىْ بِلَا وَاسِطَةٍ يُرَادُ بِهِ الْاَوَّلُ وَاِذَا عُدِّىَ اِلَيْهِ بِوَاسِطَةِ اِلٰى اَوِ اللَّامِ يُرَادُ بِهِ الثَّانِىْ وَهٰهُنَا اِنْ نُظِرَ اِلٰى اَنَّهُ مَنْسُوْبٌ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى يَنْبَغِىْ اَنْ يُرَادَ بِهِ الْاَوَّلُ وَاِنْ نُظِرَ اِلٰى اَنَّهُ عُدِّىَ بِوَاسِطَةِ اِلٰى يَنْبَغِىْ اَنْ يُرَادَ بِهِ الثَّانِىْ فَاِمَّا اَنْ يُقَدَّرَ هَدَانَا رُسُلُهُ اَوْ يُقَالَ كَلِمَةُ اِلٰى مَزِيْدَةٌ لِلتَّاكِيْدِ وَالتَّقْوِيَةِ وَبِالْجُمْلَةِ لَايَخْلُوْ هٰذَا عَنْ تَمَحُّلٍ ـ

মুসান্নিফ (র) এরখুৎবার ব্যাখ্যা

অনুবাদ ॥ আল্-মানার গ্রন্থকার বিস্‌মিল্লাহ দ্বারা বরকত লাভের পর বললেন, ***সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্যে নিবেদিত, যিনি আমাদেরকে সরল পথের দিকে পথ প্রদর্শন করেছেন।*** গ্রন্থকারের উক্তি اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এর বিশ্লেষণ সুস্পষ্ট। তবে هداية শব্দটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। (এর দু'টি সংজ্ঞা রয়েছে) যেমন বলা হয়েছে যে– ১. এমনভাবে পথ নির্দেশ করা, যা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দেয়। ২. অথবা এমন বিষয়ের প্রতি পথ নির্দেশ করা, যা দ্বারা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। (প্রথমটিকে اِيْصَالُ اِلَى الْمَطْلُوْبِ ও দ্বিতীয়টিকে اِرَاءَةُ الطَّرِيْقِ বলা হয়)। আলিমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, هداية শব্দটি যখন আল্লাহ তা'আলার প্রতি সম্বন্ধিত হয় তখন তা দ্বারা প্রথমোক্ত অর্থটি উদ্দেশ্য হবে। আর যখন রাসূল (স) অথবা কুরআনের দিকে সম্পর্কিত হয়, তখন তা দ্বারা দ্বিতীয় অর্থটি উদ্দেশ্য হবে। তাঁরা আরো বলেন যে, هداية শব্দটি দ্বিতীয় مفعول এর প্রতি কোন মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি متعدّى হলে, প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য হবে। আর দ্বিতীয় مفعول এর দিকে الى অথবা لام হরফে জারের মাধ্যমে متعدى হলে দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য হবে। এ স্থলে যদি, هداية শব্দটি আল্লাহ তা'আলার প্রতি সম্বন্ধিত হওয়ার প্রতি লক্ষ রাখা হয়। তাহলে প্রথম অর্থ (ايصال الى المطلوب) গ্রহণ করাই সমীচীন হবে। আর যদি هداية শব্দটি الى হরফে জারের মাধ্যমে متعدى হওয়ার প্রতি লক্ষ করা হয়। তাহলে দ্বিতীয় অর্থটি (اراءة الطريق) গ্রহণ করা সঙ্গত হবে। (দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করলে) هدانا এর পরে رسله শব্দ উহ্য মানতে হবে। অথবা (প্রথম অর্থটি গ্রহণ করলে) বলতে হবে যে, الى হরফে জারটি তাকীদ ও বলিষ্ঠ করনের নিমিত্তে অতিরিক্ত হয়েছে। তবে যাই হোক এটা কৃত্রিমতা মুক্ত নয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ গ্রন্থকারের ভাষ্য قَالَ الْمُصَنِّفُ رح بَعْدَ مَا تَيَمَّنَ بِالتَّسْمِيَةِ দ্বারা একথার দিকে ইঙ্গিত বোঝায় যে, বিস্‌মিল্লাহ মূল মতনের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরকত লাভের উদ্দেশ্যে আগে বিস্‌মিল্লাহ উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ مَا بِهِ التَّيَمُّنُ তথা যার মাধ্যমে বরকত লাভ করা হয় তা ماله التيمن তথা যার জন্য বরকত লাভ করা হয় তার আগে এসে থাকে। গ্রন্থকার বলেন– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সুস্পষ্ট।

هدانا শব্দের মধ্যে هدى শব্দটি মাযীর সীগা। এটা هداية শব্দ থেকে গঠিত। هداية শব্দের অর্থের ক্ষেত্রে বিভিন্নজনের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। কারো মতের অর্থ হলো اِيْصَالُ اِلَى الْمَطْلُوْبِ তথা উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া। কারো মতে اِرَاءَةُ الطَّرِيْقِ তথা কেবল রাস্তা দেখিয়ে দেয়া।

উভয় অর্থের মধ্যে পার্থক্য : প্রথমটা আল্লাহ তা'আলার প্রতি সম্বন্ধিত হতে পারে। আর দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে এটা রাসূল (স) ও আল্লাহর কিতাবের প্রতি সম্বন্ধিত হতে পারে। অর্থাৎ প্রথম অর্থে উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া অর্থ হবে। আর দ্বিতীয় অর্থে কেবল পথ প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য হবে।

২. দ্বিতীয় পার্থক্য এই যে, উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার পরে পথভ্রষ্ট হওয়া অসম্ভব। কিন্তু শুধু পথ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে পথভ্রষ্ট হওয়া সম্ভব। উভয় অর্থের উপর প্রশ্ন আরোপিত হয়।

প্রশ্ন : প্রথম ক্ষেত্রে প্রশ্ন এই যে, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন- وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى আমি সামুদ জাতিকে হেদায়েত দান করেছি। কিন্তু তারা হেদায়েতের উপর গুমরাহিকে প্রাধান্য দিয়েছে। অর্থাৎ তারা হেদায়েত পরিত্যাগ করে গুমরাহি অবলম্বন করেছে। অথচ এটা উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছানোর পরিপন্থী। এ কারণে فَهَدَيْنَاهُمْ দ্বারা "আমি তাদেরকে উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছি" এ অর্থ হতে পারে না।

ঠিক এভাবেই পথ প্রদর্শনের অর্থ নিলেও প্রশ্ন জাগে যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (স) কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন- إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ আপনি যাকে পছন্দ করেন তাকে হেদায়েত করতে পারবেন না। কারো কারো মতে হেদায়েতের অর্থ হলো- إِرَاءَةُ الطَّرِيْقِ অর্থাৎ রাস্তা প্রদর্শন করা। তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (স) কে إِرَاءَةُ الطَّرِيْقِ তথা পথ প্রদর্শন করতে নিষেধ করেছেন। অথচ রাসূলুল্লাহ (স) এর প্রেরিত হওয়ার উদ্দেশ্য এই إِرَاءَةُ الطَّرِيْقِ অর্থাৎ মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শন করা। অতএব প্রমাণিত হলো যে, لَا تَهْدِي শব্দ দ্বারা পথ প্রদর্শনের অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

উত্তর : কোনো কোনো ব্যক্তি এর উত্তর দিয়েছেন যে, কাশশাফের টীকায় আল্লামা তাফতাজানি (র) এ নীতি উল্লেখ করেছেন যে, هدايت শব্দটি ২ মাফউলের প্রতি মুতাআদ্দী হয়। প্রথম মাফউলের প্রতি সবসময় মাধ্যমবিহীন মুতাআদ্দী হয়। দ্বিতীয় মাফউলের প্রতি মুতাআদ্দী হওয়ার ক্ষেত্রে কখনো মাধ্যম থাকে না। কখনো ل বা الى এর মাধ্যমে মুতাআদ্দী হয়। هدايت শব্দটি যদি মাধ্যম বিহীন দ্বিতীয় মাফউলের প্রতি মুতাআদ্দী হয় তখন إِيْصَالٌ إِلَى الْمَطْلُوْبِ এর অর্থ হয়। অর্থাৎ উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া। যেমন- اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ এর মধ্যে সিরাতুল মুসতাকীম হলো দ্বিতীয় মাফউল। اهد আমরের সীগাটি মাধ্যম বিহীন তার প্রতি মুতাআদ্দী হয়েছে।

আর ل বা الى এর মাধ্যমে মুতাআদ্দী হলে তখন إِرَاءَةُ الطَّرِيْقِ তথা শুধু পথ প্রদর্শন উদ্দেশ্য হয়। যেমন- إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ এর মধ্যে للتى هى اقوم হলো দ্বিতীয় মাফউল। প্রথম মাফউল الناس উহ্য রয়েছে। মূল ভাষ্য এমন ছিলো إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي النَّاسَ لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ আর الى এর উদাহরণ এভাবে وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ এর মধ্যে إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ হলো দ্বিতীয় মাফউল।

উপরোক্ত নীতির আলোকে উত্তর এই হবে যে, اما ثمود فهديناهم এর মধ্যে هم শব্দটি هَدَيْنَا এর প্রথম মাফউল। এখানে দ্বিতীয় মাফউল إِلَى الْإِسْلَامِ উহ্য রয়েছে। কাজেই মূল ইবারত এমন ছিলো أَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى অতএব এ নীতির আলোকে هَدَيْنَا শব্দটি الى الاسلام দ্বিতীয় মাফউলের প্রতি যেহেতু الى এর মাধ্যমে মুতাআদ্দী হয়েছে। এ কারণে এ আয়াতে হেদায়াতের অর্থ হবে পথ প্রদর্শন করা। আর পথ প্রদর্শনের পরে কারো পথভ্রষ্ট হওয়া অসম্ভব নয়। সুতরাং এই আয়াত সম্বন্ধে প্রশ্ন করা ঠিক হবে না। আর إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ আয়াতে أَحْبَبْتَ হলো تهدى এর দ্বিতীয় মাফউল। এর প্রথম মাফউল উহ্য রয়েছে। মূল ভাষ্য ছিলো إِنَّكَ لَا تَهْدِي إِلَى الْإِسْلَامِ مَنْ أَحْبَبْتَ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হেদায়াত শব্দটি যদি মাধ্যম বিহীন দ্বিতীয় মাফউলের প্রতি মুতাআদ্দী হয় তখন হেদায়েত দ্বারা অর্থ হবে উদ্দেশ্যে পৌঁছে দেয়া। অতএব إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ আয়াতে হেদায়েতের অর্থ হলো উদ্দেশ্যে পৌঁছে দেয়া। কেমন যেন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (স)কে বলছেন আপনি যাকে ইচ্ছে করেন তাকে উদ্দেশ্য পৌঁছে দিতে পারবেন না। আর এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ উদ্দেশ্যে পৌঁছে দেয়া আল্লাহর নিজস্ব কাজ। নবীর কাজ হলো কেবল পথ দেখিয়ে দেয়া। সুতরাং এই আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করা গ্রহণযোগ্য নয়।

উল্লেখ্য যে, আল্লামা তাফতাযানি (র) এর বর্ণিত নীতিতে কিছুটা ত্রুটি রয়েছে। ত্রুটি এই যে, এই নীতিটি পবিত্র কোরআনের কোনো কোনো আয়াতের পরিপন্থী। যেমন وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ আমি মানুষকে ভালো মন্দের পথ প্রদর্শন

করেছি। এই আয়াতে هدينا শব্দটি দ্বিতীয় মাফউলের প্রতি মাধ্যমবিহীন মুতাআদ্দী হয়েছে। অথচ এখানে উদ্দেশ্যে পৌঁছে দেয়ার অর্থ উদ্দেশ্য নয়। কারণ সামনে এরশাদ হয়েছে فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ অর্থাৎ হেদায়েতের পরেও মানুষ ভালো তথা ইসলামের ঘাটিতে প্রবেশ করেনি। দেখুন হেদায়েতের পরেও কল্যাণের نفي করা হয়েছে। এখানে উদ্দেশ্যে পৌঁছে দেয়ার অর্থ হলে মূল গন্তব্যে উপনীত হওয়ার পরে ইসলামে প্রবিষ্ট না হওয়ার অর্থ কি?

দ্বিতীয় আয়াত إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ এর মধ্যে দ্বিতীয় يَهْدِي শব্দটি الى এর মাধ্যমে মুতাআদ্দী হয়েছে। কিন্তু এর দ্বারা উদ্দেশ্য গন্তব্যে পৌঁছে দেয়া। কারণ আল্লাহ তা'আলা لكن দ্বারা নিজের জন্য উক্ত হেদায়েতকে খাছ করে নিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (স) এর ব্যাপারে যে হেদায়েতকে نفي করেছেন। আর এটা স্বীকৃত কথা যে, রাসূলুল্লাহ (স) থেকে إِيْصَالٌ إِلَى الْمَطْلُوْبِ এর নফী করা হয়েছে। অতএব আপনার এ নীতি ঠিক থাকলো না। মোটকথা হেদায়েতের ব্যাপারে কোনো উক্তি ও যুক্তি ত্রুটিমুক্ত নয়। এ কারণে কাযী বায়যাবী (র) হেদায়েতের এমন অর্থ বর্ণনা করেছেন যা উভয় অর্থকেই শামিল করে। তিনি লিখেছেন– হেদায়েতের অর্থ হলো دلالت بلطف তথা আনুগত্যের উপকরণ সৃষ্টি করে পথ প্রদর্শন করা। চাই তা উদ্দেশ্যে উপনীত করার দ্বারা হোক বা পথ প্রদর্শনের দ্বারা হোক।

নুরুল আনওয়ার গ্রন্থকার এই ইবারত দ্বারা মতনের উপর আরোপিত একটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

প্রশ্ন : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدَانَا ভাষ্যে هدا শব্দের ফায়েল তার মধ্যকার উহ্য যমীর এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা উদ্দেশ্য। আর পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, আল্লাহর প্রতি সমন্বিত হলে তার দ্বারা লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়া (ايصال الى المطلوب) উদ্দেশ্য হয়। আর এ কথাও উল্লেখিত হয়েছে যে, হেদায়েত শব্দটি الى এর মাধ্যমে দ্বিতীয় মাফউলের প্রতি মুতাআদ্দী হলে তার দ্বারা পথ প্রদর্শন অর্থ হয়। কাজেই মতনের মধ্যে هدا শব্দটি আল্লাহর প্রতি সম্বন্ধিত হওয়ার দ্বারা এটা ঃ ণিত হয় যে, এখানে হেদায়েত দ্বারা লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়া উদ্দেশ্য। আর দ্বিতীয় মাফউল তথা صراط مستقيم এর প্রতি الى এর মাধ্যমে মুতাআদ্দী হওয়ার দ্বারা বোঝা যায় যে, এখানে হেদায়েত দ্বারা পথ প্রদর্শন উদ্দেশ্য। আর এটা সর্বস্বীকৃত যে, একই সময়ে দু অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

উত্তর : ব্যাখ্যাকার উপরোক্ত প্রশ্নের দুটি উত্তর দিচ্ছেন।

(ক) هَدَا শব্দের ফায়েল বা কর্তা আল্লাহ শব্দ নয়। বরং رُسُلُه যা এখানে উহ্য রয়েছে। মূল ইবারত এমন ছিলো اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدَانَا رُسُلُهٗ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ এক্ষেত্রে হেদায়েতের সম্বন্ধ হবে রাসূলুল্লাহ (স) এর প্রতি। আর রাসূলুল্লাহ (স) এর প্রতি হেদায়েতের দাবি এই যে, হেদায়েত দ্বারা পথ প্রদর্শন উদ্দেশ্য হবে। কাজেই রাসূলুল্লাহ (স) এর প্রতি সম্বন্ধের দ্বারা যখন পথ প্রদর্শনের অর্থ বোঝায়। আর الى দ্বারা মুতাআদ্দী হওয়ার ক্ষেত্রেও পথ প্রদর্শন উদ্দেশ্য হয়। কাজেই এখন কোনো প্রশ্ন থাকবে না।

(খ) هدا শব্দের ফায়েল الله শব্দই। তবে এখানে الى শব্দটি নিছক গুরুত্ব ও শক্তিযোগানের জন্য অতিরিক্ত হয়েছে। অতএব মতনে হেদায়েত শব্দটি মাধ্যম বিহীন দ্বিতীয় মাফউলের প্রতি মুতাআদ্দী বিবেচিত হবে। কাজেই এখনও কোনো প্রশ্ন আরোপিত হবে না।

নুরুল আনওয়ার গ্রন্থকার বলেন– উপরোক্ত উভয় উত্তর ত্রুটিমুক্ত নয়। এ কারণেই উভয় উত্তরের উপর পুনরায় প্রশ্ন আরোপ করা হয়েছে। প্রথম উত্তরের উপর ৩টি প্রশ্ন করা হয়েছে।

১. আপনি এখানে رسله উহ্য মেনেছেন। অথচ কোনো শব্দকে উহ্য মানা নিয়ম বহির্ভূত।

২. رسله শব্দ উহ্য মানলে হেদায়েতের সম্বন্ধ শক্তিশালী (الله) থেকে সরে গিয়ে দুর্বলের (رسول) প্রতি বিবেচিত হয়। অথচ শক্তিশালীর প্রতি সম্বন্ধকে পরিহার করে দুর্বলের প্রতি সম্বন্ধকে অবলম্বন করা বিবেকের পরিপন্থী।

৩. এক্ষেত্রে رسله শব্দটি হেদায়েতের উহ্য ফায়েল হবে। অথচ কাফিয়া গ্রন্থকার বলেন– فَاعِلُ الْفِعْلِ لَا يُحْذَفُ অর্থাৎ ফে'লের ফায়েল উহ্য হয় না।

দ্বিতীয় উত্তরের উপর প্রশ্ন : আপনি الى কে অতিরিক্ত সাব্যস্ত করেছেন। অথচ কোনো শব্দ অতিরিক্ত হওয়াটা নীতি বহির্ভূত।

وَالصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ هُوَ الصِّرَاطُ الَّذِىْ يَكُوْنُ عَلَى الشَّارِعِ الْعَامِّ وَيَسْلُكُهُ كُلُّ واحِدٍ مِّنْ غَيْرِ اَنْ يَّكُوْنَ فِيْهِ الْتِفَاتٌ اِلَى شُعَبِ الْيَمِيْنِ وَالشِّمَالِ وهُوَ الَّذِىْ يَكُوْنُ مُعْتَدِلًا بَيْنَ الْاِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيْطِ وهٰذا صَادِقٌ عَلٰى شَرِيْعَةِ محمّدٍ ﷺ لِاَنَّهَا مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الْاِفْرَاطِ الَّذِىْ فِى دِيْنِ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامِ وَالتَّفْرِيْطِ الَّذِىْ فِىْ دِيْنِ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَام وعَلٰى عَقَائِدِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَاِنَّهَا مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدْرِ وَبَيْنَ الرَّفْضِ وَالْخُرُوْجِ وبَيْنَ التَّشْبِيْهِ وَالتَّعْطِيْلِ الَّذِىْ فِى غَيْرِهَا وعَلٰى طَرِيْقِ سُلُوكٍ جَامِعٍ بَيْنَ الْمُحَبَّةِ وَالْعَقْلِ فَلَايَكُوْنُ عِشْقًا مَحْضًا مُفْضِيًا اِلَى الْجَذْبِ وَلَا عَقْلًا صِرفًا مُوْصِلًا اِلَى الْاِلْحَادِ وَالْفَلْسَفَةِ نَعوْذُ بِاللّٰهِ مِنْه وفِيْه تَلْمِيْحٌ اِلٰى قَوْلِه تَعَالٰى اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ـ

অনুবাদ ॥ الصِّراط الْمُسْتَقِيْم বলতে ঐ রাস্তাকে বুঝায়, যা মহাসড়কের পর্যায়ে হয় এবং ডানে বামে ভ্রুক্ষেপ করা ছাড়া সবাই (সর্ব সাধারণ) অবাধে চলতে পারে। সেটা চরম বাড়াবাড়ি ও অতি সংকোচনের মধ্যবর্তী পথ। এ صراطُ الْمُسْتَقِيْم শরীআতে মুহাম্মদীর ক্ষেত্রে যথার্থরূপে প্রযোজ্য। কেননা, তা মূসা (আ)-এর শরীআতে বিদ্যমান অতি বাড়াবাড়ি এবং ঈসা (আ)-এর শরীআতে প্রচলিত অতি সহজতার ঠিক মাঝামাঝি অবস্থিত।

অনুরূপভাবে الصِّراط الْمُسْتَقِيْم শব্দটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদা বিশ্বাসের ওপর প্রযোজ্য হয়। কেননা, তাঁদের আকীদা জাবরিয়া ও কাদরিয়াদের আকীদা, রাফেযী ও খারেজীদের আকীদা এবং তাশবীহ ও তা'তীলপন্থীদের আকীদার তুলনায় মধ্যপন্থায় অবস্থিত, যা আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের আকীদা ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের আকীদা বিশ্বাসে বিদ্যমান।

অনুরূপভাবে الصراط المستقيم শব্দটি সুলূক তথা ইলমে মারেফাতের ঐ পন্থার ওপর প্রযোজ্য হয়, যা ইশক ও মতব্বত এবং বিবেক-বুদ্ধি উভয়কে শামিল করে। এ কারণেই তা শুধু অন্ধ প্রেম নয়, যা আত্মবিলুপ্তিতে পৌঁছিয়ে দেয়। আর শুধু যুক্তি নির্ভরও নয়, যা নাস্তিকতা ও জড়বাদ দর্শনের দিকে ধাবিত করে। আমরা তার থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি। গ্রন্থকারের উপরোক্ত বক্তব্যে মূলত ঃ আল্লাহ তা'আলার বাণী اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ এর দিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قَوْلُه وَالصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْم : নুরুল আনওয়ার গ্রন্থকার (র) এই ইবারতে সিরাতে মুসতাকীমের অর্থ ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেন–

ক. সিরাতে মুসতাকীম বলা হয় এমন স্পষ্ট ও সুপ্রশস্ত রাস্তাকে যার মধ্যে কোনো বক্রতা থাকে না। যার দরুন যোগ্য অযোগ্য কোনো দিকে বিচ্যুতি ছাড়াই সহজে তার উপর চলতে পারে। বর্তমানে এ ধরনের রাস্তাকে মহাসড়ক, বিশ্বরোড বলে।

খ. কোনো আলিম বলেন– এমন কথা বা কাজকে সিরাতুল মুসতাকীম বলে যা আল্লাহ তা'আলার নিকট পছন্দনীয়। সিরাতুল মুসতাকীমের দ্বারা ৩টি উদ্দেশ্য হতে পারে।

১. রাসূলুল্লাহ (স) এর আনিত পবিত্র শরীআত ও দ্বীনে হানিফ। কেননা এর মধ্যে কোনো অতিরঞ্জন বা অতিসংক্ষেপন নেই। বরং অত্যন্ত সহজ সরল ও মধ্যমপন্থী ধর্ম। এর বিপরীতে মূসা (আ) এর ধর্মে ছিলো অতিরঞ্জন, ও সীমাতিরিক্ত কঠোরতা। যেমন পবিত্রতা লাভের জন্য কাপড়ের নাপাক জায়গা কেটে ফেলা জরুরি ছিলো। এক চতুর্থাংশ মাল যাকাত স্বরূপ দিতে হতো। তাদের খালিস তওবা ছিলো পাপিষ্ঠ ব্যক্তিকে হত্যা করা। কেউ পাপ করলে আল্লাহর তরফ থেকে তা তার গৃহের দরজায় লিখে দেয়া হতো। হত্যার ক্ষেত্রে হন্তার উপর কিসাস ফরয ছিলো। নিহত ব্যক্তির ওলিদের জন্য দিয়াত গ্রহণ বা ক্ষমা করে দেয়ার অনুমতি ছিলো না। ঋতুবতী মহিলাদের সাথে রাত যাপনের অনুমতি ছিলো না। মোটকথা মূসা (আ) এর উম্মতের উপর কঠিন বিধান চাপানো হয়েছিলো।

পক্ষান্তরে ঈসা (আ) এর ধর্মে ছিলো তাফরীত তথা সীমাতিরিক্ত সহজতা। যেমন ঈসা (আ) এর ধর্মে মদ পান হালাল ছিলো। শূকর ও মৃত জন্তুর গোশত হালাল ছিলো। মুশরিক নারীদের সাথে বিবাহ জায়েয ছিলো। নাতাইজুল আফকার গায়াতুল বয়ানের বরাতে উল্লেখ করেন যে, মদ এবং শূকর পূর্বের উম্মতের জন্য এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগে হালাল ছিলো। এরপর বিশেষ করে মুসলমানদের সম্বন্ধ করে তা হারাম ঘোষিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ এবং حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ যেহেতু মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে হারাম করা হয়েছে তাই বিজাতিদের ক্ষেত্রে তা হালাল থাকবে। এভাবে মুশরিক নারীদেরকে বিবাহ করা সবার জন্য হালাল ছিলো। কিন্তু وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ আয়াত দ্বারা মুসলমানদের জন্য তা হারাম ঘোষিত হয়েছে। এভাবে ঈসা (আ) এর ধর্মে স্বেচ্ছায় হত্যা করার ক্ষেত্রে কিসাস ওয়াজিব ছিলো না বরং নিহতের অলিদের উপর তা ক্ষমা করে দেয়া ওয়াজিব ছিলো। কাপড়ে নাপাক লাগলে তা নাপাক হতো না। ঋতুবতী মহিলাদের সাথে সহবাস জায়েয ছিলো।

মোটকথা ঈসা (আ) এর ধর্মে অনেক সহজ বিধান ছিলো। শরীআতে মুহাম্মাদির মধ্যে সীমাতিরিক্ত কঠোরতাও নেই এবং মাত্রাতিরিক্ত সহজতাও নেই। বরং উভয়ের মাঝামাঝি বিধান রয়েছে। এ কারণে এটাকে সিরাতুল মুসতাকীম বলা হয়েছে। এ সম্ভাবনার ক্ষেত্রে সিরাতুল মুসতাকীম صَنْعَتِ بَرَاتِ اِسْتِهْلَال এর পর্যায়ে হবে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কিতাবে এমন শব্দ উল্লেখ করা যার দ্বারা কিতাবের মূল আলোচ্য বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত বোঝায়। কাজেই এখানে সিরাতুল মুসতাকীম উল্লেখে শরীআতে মুহাম্মদী উদ্দেশ্য হবে। যা কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতুর রাসূল (স) দ্বারা অর্জিত হয়। আল মানার গ্রন্থকারের উদ্দেশ্যও এই দুই বিষয়ে আলোকপাত করা। কারণ এ দুটি থেকেই শরীআতে মুহাম্মাদীর মাসআলাসমূহ বের করা হয়েছে।

২. আহলে সুন্নাতে ওয়াল জামায়াতের আকীদাসমূহও সিরাতুল মুসতাকীম। কারণ জাবরিয়া ও কাদরিয়া সম্প্রদায়ের আকীদাসমূহের তুলনায় আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের আকীদাসমূহ মাঝামাঝি। তা এভাবে যে, কাদরিয়াদের আকীদার মধ্যে افراط রয়েছে। তারা মানুষের জন্য অর্জিত ক্ষমতা ও সৃষ্টি করার শক্তি উভয়কেই সাব্যস্ত করে থাকে। তারা বলে যে, বান্দা স্বীয় কার্যকলাপের স্রষ্টা এবং তা আঞ্জামদানকারী। অথচ কোরআন মজীদের আয়াত وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ, বান্দা তার কার্যকলাপের স্রষ্টা হওয়াকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) এরশাদ করেছেন- কাদরিয়া হলো এ উম্মতের অগ্নি উপাসক। এভাবে জাবরিয়া সম্প্রদায়ের আকীদার মধ্যে রয়েছে তাফরীত اَلْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ। তারা বান্দাকে স্থির অনুভূতিহীন জড়পদার্থের ন্যায় গণ্য করে। তাদের মতে বান্দার কোনো কিছু অর্জন বা আঞ্জামদানের ক্ষমতা নেই এবং সৃষ্টিরও ক্ষমতা নেই। এ উভয় সম্প্রদায়ের বিপরীতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা এই যে, বান্দার সৃষ্টির ক্ষমতা নেই। তবে তার كَسب তথা অর্জন ও আঞ্জামদানের ক্ষমতা রয়েছে। অর্থাৎ মানুষ যদিও কোনো কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম নয় তবে আল্লাহর সৃজিত বস্তুরাজির মাধ্যমে তারা

গুরুত্বপূর্ণ সমূহ কাজ আঞ্জাম দিতে সক্ষম। মোটকথা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের আকীদা মধ্যমপন্থী হওয়ার কারণে এটাকে সিরাতুল মুসতাকীম বলা হয়েছে।

★ এভাবে রাফেযী ও খারেজীদের আকীদা বিশ্বাসের তুলনায়ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা বিশ্বাস মধ্যমপন্থী। কারণ রাফেযীগণ অধিকাংশ সাহাবীকে পরিহার করে, হযরত আবু বকর ও ওমর (রা) এর নেতৃত্বকে অস্বীকার করে। মোজার উপর মাসাহ করাকে তারা অস্বীকার করে। আমির মুয়াবিয়া (রা) এবং তাদের সঙ্গীদেরকে গাল মন্দ করে। তারা আলী (রা) এর ইশ্‌ক ও মহব্বতে অতিশয়ো উক্তি তথা বাড়াবাড়ি করে থাকে।

★ পক্ষান্তরে খারিজীগণ হযরত আলী (রা) এর মহব্বতের ক্ষেত্রে অতি নিচু মন্তব্য করে থাকে। এমনকি তারা হযরত আলী (রা) এর সঠিক তরিকা থেকে বর্হিভূত হয়েছে। আলী (রা) এর মুকাবিলায় তারা যুদ্ধও করেছে। রাসূলুল্লাহ (স) এর জামাতাগণকে গালমন্দ করেছে। এদের বিপরীতে আহলে সুন্নাত আল জামাআতের আকীদা এই যে, সকল সাহাবী আদিল তথা ন্যায় ও নিষ্ঠাবান ছিলেন। তারা উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। আবু বকর ও ওমর (রা) এর নেতৃত্ব তাদের কাছে স্বীকৃত এবং জামাতাগণের প্রতি মহব্বত ও ভালোবাসা অপরিসীম।

★ এভাবে মুশাব্বিহা ও মুয়াত্তিলা সম্প্রদায়ের আকায়েদের তুলনায় আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের আকীদা মধ্যমপন্থী। কারণ মুশাব্বিহা সম্প্রদায় আল্লাহ তা'আলাকে মাখলুকের ন্যায় সাব্যস্ত করে থাকে। তারা আল্লাহর জন্য দেহ ও দিক সাব্যস্ত করে। তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বলে মাখলুকের দেহের ন্যায় আল্লাহ তা'আলারও রক্ত-মাংস ও অস্থি বিশিষ্ট দেহ রয়েছে। কেউ বলে আল্লাহর দেহ রয়েছে তবে মানুষের ন্যায় নয়।

★ মুয়াত্তিলা সম্প্রদায়ের লোকেরা বলে আল্লাহ তা'আলা বর্তমান সম্পূর্ণ বেকার বা কর্মহীন। যেমন حكماء তথা দার্শনিকগণ বলে থাকেন যে, আল্লাহ তা'আলা থেকে প্রথমে আকল অতপর দ্বিতীয় আকল অতপর তৃতীয় আকল এভাবে তারা দশম আকল পর্যন্ত প্রকাশিত হওয়ার কথা বলে থাকে। এবং সমগ্র বিশ্ব উক্ত ১০ আকল এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। আল্লাহ নিজে সম্পূর্ণ কর্মহীন (নাউযুবিল্লাহ)। এর বিপরীতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা এই যে, আল্লাহ তা'আলা দেহ ও দিক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সমস্ত মাখলুকের ললাট আল্লাহর কুদরতের মধ্যে।

৩. সিরাতুল মুসতাকীম সুফিসাধকগণের পথ তথা সুলূকের উপরও প্রযোজ্য হয় যা বিবেক ও প্রেম এর সমন্বয়কারী। সুলূক বলা হয় স্বীয় বাহ্যিক দোষসমূহ এবং অন্তরাত্মাকে বিভিন্ন কু-সভাব থেকে পরিশোধিত করাকে। সালিকের প্রাথমিক অবস্থা হলো শরীআতের বিধান অনুযায়ী আমল করা। আর তার সর্বোচ্চ অবস্থা হলো সর্বোত্তম গুণাবলী দ্বারা সজ্জিত হওয়া। মোটকথা সুলূকের রাস্তার উপরও সিরাতুল মুসতাকীমও প্রযোজ্য হয়। কারণ সুলূকের মধ্যে প্রেম ভালোবাসা কার্যশীল থাকে। তার মধ্যে বিবেকেরও বড়ো দখল থাকে। নিছক প্রেম উন্মত্ততা থাকে না। আবার শুধু বিবেক ও যুক্তি কার্যশীল থাকে না। কারণ জ্ঞান বিবেকহীন প্রেম মানুষক পাগলে পরিণত করে। এভাবে প্রেম বিহীন বিবেক ও যুক্তি মানুষকে নাস্তিকে পরিণত করে। অযৌক্তিক বিষয়াদি যেমন কবরের আযাবকে অস্বীকারকারী বানায়। কাজেই প্রেম ও যুক্তির উভয়ের সমন্বয়ের কারণে সুলূকের রাস্তা যেহেতু মাঝামাঝি। এ কারণে তাকে সিরাতুল মুসতাকীম বলা অযৌক্তিক নয়।

ব্যাখ্যাকার বলেন– মাতিনের ভাষ্য اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ এর মধ্যে اهدنا الصراط المستقيم বাক্যের দিকে تلميح বা ইঙ্গিত রয়েছে। تلميح বলা হয় বাক্যে এমন শব্দ ব্যবহার করাকে যার দ্বারা কোনো ঘটনা, কবিতা, দৃষ্টান্ত বা কোরআনের কোনো আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়।

وَالصَّلٰوةُ عَلٰى مَنِ اخْتُصَّ بِالْخُلُقِ الْعَظِيْمِ فتفسير الصّلوة واضح وقوله عَلٰى مَنِ اخْتُصَّ كِنَايَةٌ عَنْ محمد ﷺ تَنْبِيْهًا على أَنَّ كَوْنَهُ مُخْتَصًّا بِالْخُلُقِ الْعَظِيْمِ مِمَّا تَقَرَّرَ فِى الْأَذْهَانِ حَتّٰى لَايَنْتَقِلَ الذِّهْنُ مِنْ هٰذَا الْوَصْفِ اِلٰى غَيْرِه عليه السّلام وَالْخُلُقُ هُو مَلَكَةٌ يُصْدَرُ عَنْهَا الْاَفْعَالُ بِسُهُوْلَةٍ وَالْخُلُقُ الْعَظِيْمُ لَهُ عَلٰى مَاقَالَتْ عائشةُ (رض) هُوَ الْقُرْاٰنُ تَعْنِىْ اَنَّ الْعَمَلَ بِالقُرْاٰنِ كَانَ جِبِلَّةً لَهُ مِنْ غَيْرِ تكلُّفٍ وقيل هُوَ الْجُوْدُ بِالْكَوْنَيْنِ وَالتَّوجُّه اِلٰى خَالِقِهِما وقيل هُو ما اَشَارَ اِلَيْهِ عليه السَّلامُ بِقَوْلِه صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَاَحْسِنْ اِلٰى مَنْ اَسَاءَ اِلَيْكَ وَالْاَصَحُّ اَنَّ الْخُلُقَ الْعَظِيْمَ هُو السُّلُوْكُ اِلٰى ما يَرْضٰى عَنْهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَالْخَلْقُ جَمِيْعًا وهٰذا غَرِيْبٌ جِدًّا وهُوَ تَلْمِيْحٌ اِلٰى قَوْلِهِ تَعَالٰى وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ وهُوَ اِنْ لَّمْ يَدُلَّ عَلٰى الْاِخْتِصَاصِ لٰكِنْ كَمَا كَانَ فِىْ مَحَلِّ الْمَدْحِ اخْتُصَّ بِهٖ -

অনুবাদ ॥ ***আর পরিপূর্ণ করুণা বর্ষিত হোক ঐ মহামানবের প্রতি যিনি মহান চারিত্রিক গুণাবলি দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছেন।*** الصلوة শব্দের ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট। গ্রন্থকারের উক্তি "عَلٰى مَنِ اخْتُصَّ" দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। (রাসূল (স)- এর নাম উল্লেখ না করে ইঙ্গিতসূচক শব্দ এনেছেন) যেন এ ব্যাপারে সতর্কীকরণ হয়ে যায় যে, উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা তাঁর বিভূষিত হওয়া এমন একটি ব্যাপার, যা সকলেরই স্মৃতিপটে এমনভাবে বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, এগুণটি উল্লেখের দ্বারা যেকোন লোকের মনোযোগ হযরত মুহাম্মদ (স) ছাড়া অন্য কারো দিকে ধাবিত হয় না।

خلق এমন প্রকৃতিগত শক্তি ও যোগ্যতাকে বুঝায়, যা দ্বারা যাবতীয় কাজ, সহজে সম্পাদিত হয়। হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণনানুযায়ী আল-কুরআনই হলো তাঁর خلق عظيم উক্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ কোন প্রকার কষ্টবোধ ছাড়া কুরআনের বিধান অনুযায়ী আমল করা তাঁর মজ্জাগত স্বভাব ছিল। কেউ কেউ বলেন যে, خلق عظيم হলো ইহ-পরকালীন বদান্যতা এবং উভয় জগতের স্রষ্টার প্রতি একাগ্রচিত্ততা। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, তা হলো এসব বিষয় যার প্রতি তিনি (স) স্বীয় বাণীতে এ এরশাদ করেছেন।

صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَاَحْسِنْ اِلٰى مَنْ اَسَاءَ اِلَيْكَ -

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তুমি তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন কর। যে তোমার প্রতি অবিচার করে, তুমি তাকে ক্ষমা কর এবং যে তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করে, তুমি তার সাথে সদ্ব্যবহার কর।

সর্বাধিক বিশুদ্ধমত হলো خلق عظيم তথা মহান চরিত্র হলো এমন পন্থা অনুসরণ করা, যার ফলশ্রুতিতে স্রষ্টা ও সৃষ্টি জগত উভয়াই সন্তুষ্ট হয়। তবে এটা অত্যন্ত দুর্লভ গুণ। গ্রন্থকারের উক্ত বক্তব্য দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালার বাণী وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ (অবশ্যই আপনি সুমহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত) এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আয়াতটি যদিও বাহ্যিকভাবে এটা প্রমাণ করে না যে, উক্ত চরিত্রটি কেবলমাত্র নবীর জন্যেই নির্ধারিত; তবে আয়াতটি প্রশংসার স্থলে অবতীর্ণ হওয়ার দ্বারা আমরা বলতে পারি যে, অত্র গুণটি তাঁর জন্যেই সুনির্দিষ্ট।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله والصلوة على من الخ : ইবারতে উল্লিখিত بـ বর্ণটি مُخْتَصّ এর উপর প্রবিষ্ট হয়েছে। مختص به এর উপরে নয়। অর্থাৎ خُلُق عظيم তথা উত্তম চরিত্র হলো مختص আর من اختص অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স) এর উত্তম গুণাবলী সম্বলিত সত্তা হলো مُخْتَصّ به এর উদ্দেশ্য এই যে, রাসূলুল্লাহ (স) এর সত্তার সাথে সুমহৎ চরিত্র সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ এর সাথে কেবল রাসূলুল্লাহ (স)ই গুণান্বিত। তিনি ছাড়া অন্যকোনো মানুষ এ গুণে গুণান্বিত হয়নি এবং হবেও না।

এখানে উত্তম চরিত্রকে রাসূলুল্লাহ (স) এর সাথে খাছ বা নির্দিষ্ট সাব্যস্ত করা সঠিক নয়। কারণ এক্ষেত্রে خلق عظيم তথা উত্তম চরিত্র مختص به হয়। আর রাসূলুল্লাহ (স) এর ব্যক্তিত্ব مختص হয়। এখন উদ্দেশ্য এই হবে যে, রাসূলুল্লাহ (স) উত্তম চরিত্রের সাথে খাছ। অর্থাৎ তার চরিত্রে কেবল উত্তম গুণাবলী পাওয়া যায়। অন্য কোনো গুণ পাওয়া যায় না। অথচ এটা সম্পূর্ণ ভুল। বরং বাস্তবতা এই যে, তাঁর মধ্যে خلق عظيم ছাড়াও অসংখ্য গুণাবলী রয়েছে। যেমন জনৈক কবি বলেন– فِدا ہوں آپ کی کس کس ادا پر * ادائیں لاکھ اوربیتاب دل ایک

খুৎবাতে হাকীমুল ইসলামে খুলক তথা চরিত্রকে ৩ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। ১. خلق حسن ২. خلق كريم ৩. خلق عظيم

خلق حسن হলো অন্যায়ের প্রতিশোধ অন্যায় দ্বারা গ্রহণ করা। خلق كريم হলো অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণ না করা বরং তাকে ক্ষমা করে দেয়া। আর خلق عظيم হলো অন্যায়কারীকে ক্ষমা করে তার উপর দয়ার আচরণ করা। যেমন এক ব্যক্তি আপনাকে কোনো কষ্ট দিলো। আপনি তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন। এটা হলো খুলুকে হাসান। আর যদি তাকে ক্ষমা করে দেন তা হবে খুলুকে কারীম। আর তাকে ক্ষমা করে দিয়ে তার উপর যদি কোনো করুণাও করেন তা হবে খুলকে আযীম। جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا শূরা চতুর্থ রুকু এবং فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ বাকারা, রুকু ২৪।

"অতপর যে তোমার উপর জুলুম করে তুমিও তার উপর সে পরিমাণ জুলুম করো যে পরিমাণ সে তোমার উপর করেছে। এর দ্বারা খুলুকে হাসানের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আর فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ও فَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ (শূরা চতুর্থ রুকু।) "যে সহ্য করলো ও ক্ষমা করে দিলো" দ্বারা খুলকে কারীম শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ (আল ইমরান, রুকু ১৪) এর মধ্যে খুলকে আযীম শিক্ষা দেয়া হয়েছে। কেননা এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, রাগ দমন করাই বড়ো মহত্ত্বের কাজ। কিন্তু তারা রাগ দমন করে এবং অন্যায়সমূহকে ক্ষমাও করে দেয়। উপরন্তু তার উপর করুণাও করে। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)কে খুলকে হাসান দান করেছিলেন। হযরত ঈসা (আ) কে দান করেছিলেন খুলকে কারীম। আর মহানবী (স) কে দান করেছিলেন খুলকে আযীম।

মোটকথা খুলুকে আযীম হলো মহানবী (স) এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এতে অন্য কেউ তার শরীক নয়। নুরুল আনওয়ার গ্রন্থকার (র) বলেন– صلاة শব্দের বিশ্লেষণ সুস্পষ্ট। পূর্বে এর কিছুটা ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছি।

ব্যাখ্যাকার বলেন– মতনের ভাষ্য مَنِ اخْتَصَّ بِالْخُلُقِ الْعَظِيْمِ দ্বারা রাসূলুল্লাহ (স) এর ব্যক্তি সত্ত্বা উদ্দেশ্য। মূল গ্রন্থকার স্পষ্টভাবে রাসূলুল্লাহ (স) এর নাম এই জন্য উল্লেখ করেননি যাতে মানুষে বুঝতে পারে যে, খুলুকে আযীম রাসূলুল্লাহ (স) এর সাথে এমনভাবে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত যে, তা বোঝার জন্যে রাসূলুল্লাহ (স) এর নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন পড়ে না। বরং এমনিতেই তার সত্ত্বা মানুষ বুঝতে পারে। অন্যকেউ বুঝে আসে না। কাজেই খুলুকে আযীম যখন তাঁর ছাড়া অন্য কারো দিকে স্থানান্তরিত হয় না। কাজেই স্পষ্টভাবে তাঁর নাম উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

ব্যাখ্যাকার মোল্লা জুয়ুন (র) খুলুকের সংজ্ঞায় مَلَكَة তথা যোগ্যতা শব্দ উল্লেখ করেছেন। ملكة অন্তরের এমন অবস্থাকে বলে যা ব্যক্তির অন্তরের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে। বাংলায় এর অপর নাম হলো যোগ্যতা। উর্দূতে বলে

مهارت। উক্ত অবস্থা অন্তরে বদ্ধমূল থাকলে তাকে حالى বলে। যেমন- লজ্জার সময় চেহারায় রক্তিমভাব আসা এটা সাময়িক অবস্থা। এখন খুলুকের সংজ্ঞা এই যে, এমন যোগ্যতা যার দ্বারা বিভিন্ন কার্যাবলী সহজে প্রকাশ পায় তাকে খুলুক বলে।

রাসূলুল্লাহ (স) এর খুলুকে আযীম কি ছিলো : এ ব্যাপারে কয়েকটি উক্তি রয়েছে–

১. হযরত আয়েশা (রা) বলেন– নবী করীম (স) এর খুলুকে আযীম ছিলো সরাসরি কোরআন; তবে এ ব্যাপারে প্রশ্ন জাগে যে, কোরআন কি রাসূলুল্লাহ (স) এর সাথে খাছ? হযরত আয়েশা (রা) খুলুকে আযীম দ্বারা উদ্দেশ্য কোরআন বলেছেন। এটাতো কোরআন তাঁর সাথে খাছ হওয়া বোঝায় অথচ তা সঠিক নয়। বরং তা আল্লাহ তা'আলার সাথে খাছ।

নুরুল আনওয়ার গ্রন্থকার এর উত্তর দিয়েছেন যে, কোরআন দ্বারা কোরআনের উপর আমল করা উদ্দেশ্য। নবী করীম (স) এর খুলুকে আযীম ছিলো কোরআন পাকের উপর আমল করা। আর কোরআনে কারীমের উপর আমল করা রাসূলুল্লাহ (স) এর জন্মগত অভ্যাসে পরিণত হয়েছিলো। সারকথা এই যে, কোরআনের মধ্যে যা নির্দেশ হতো তিনি তার উপর আমল করতেন এবং যা তিনি আমল করতেন তা কোরআনে থাকতো। কোরআনের উপর যথাযথ আমল করা রাসূলুল্লাহ (স) এর সাথে খাছ। আল্লাহর সাথে খাছ নয়। অতএব কোনো প্রশ্ন উথাপিত হবে না।

২. কোনো কোনো আলিম বলেছেন খুলূকে আযীম হলো ইহ-পরকালের বদান্যতা এবং আল্লাহর প্রতি রুজু হওয়া। দুনিয়াতে তিনি ইলমে দ্বীন এবং ধন-সম্পদ অবলীলায় দান করেছেন এবং পরকালেও তিনি ইনশাআল্লাহ শাফাআত ও আবে কাউসার দ্বারা তার দানশীলতা প্রদর্শন করবেন।

৩. রাসূল (স) নিজে যা ব্যক্ত করেছেন অর্থাৎ যে সম্পর্ক ছিন্ন করে তার সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করো। যালিমকে ক্ষমা করো। অন্যায় আচরণকারীর সাথে সদাচার করো; এগুলোই রাসূলুল্লাহ (স) এর খুলুকে আযীম।

৪. ব্যাখ্যাকারের ভাষ্যমতে সঠিক বিষয় এই যে, খুলুকে আযীম হলো এমন রাস্তায় চলা যার দ্বারা স্রষ্টা ও সৃষ্টিকুল তার উপর সন্তুষ্ট থাকে। তবে এমনটা দূর্লভ। যে ব্যক্তি এ গুণে গুণান্বিত হবে সে প্রশংসাযোগ্য হবে। ব্যাখ্যাকার বলেন– মাতিনের উক্তি عَلٰى مَنِ اخْتَصَّ بِالْخُلُقِ الْعَظِيْمِ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার এরশাদ وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রশ্ন : এখানে একটা প্রশ্ন জাগে যে, মতনে বলা হয়েছে عَلٰى مَنِ اخْتَصَّ بِالْخُلُقِ الْعَظِيْمِ রাসূলুল্লাহ (স) এর সত্তার সাথে খুলুকে আযীম খাছ। আর আল্লাহ তা'আলার বাণী وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ রাসূলুল্লাহ (স) এর খুলুকে আযীমের সাথে গুণান্বিত হওয়া বোঝায়। তার জন্য খাছ হওয়া বোঝায় না। কাজেই মাতিনের উক্তি এ বিষয়ের দিকে تلميع বা ইঙ্গিত করা কিভাবে সঙ্গত হতে পারে?

উত্তর : এর উত্তর এই যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ প্রশংসার স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ যখন মক্কার মুশরিকরা মহানবী (স) কে পাগল বলতো তখন আল্লাহ তা'আলা দোয়াত, কলম ও লিখিত বস্তুর শপথ করে বলেছেন مَا اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ আপনি আপনার রবের অনুগ্রহে পাগল নন। وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ আপনার জন্য রয়েছে অসীম সওয়াব ও বিনিময় وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ আপনি মহৎ চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এ সকল বাক্য দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সান্তনা দিয়েছেন এবং প্রশংসা করেছেন। এ খুলুকে আযীম দ্বারা বিশেষ প্রশংসা ঐ সময়ই সম্ভব যখন তা তাঁর সাথে খাছ হবে। কারণ প্রশংসা বিশেষভাবে এমন গুণের জন্য করা হয় যে গুণ অন্যকারো মধ্যে পাওয়া যায় না। কাজেই বোঝা গেলো যে, وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ আয়াতও তার সাথে খাছ হওয়ার প্রমাণ বহন করে। সুতরাং মাতিনের উক্তি নির্দ্বিধায় আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর প্রতি ইঙ্গিত জ্ঞাপক হলো। এখন মাতিনের উক্তি এবং আল্লাহ তা'আলার বাণী উভয়ই রাসূলুল্লাহ (স) এর সত্তার সাথে খুলুকে আযীম খাছ হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

وَعَلٰى آلِهِ الَّذِيْنَ قَامُوْا بِنُصْرَةِ الدِّيْنِ الْقَوِيْمِ عطفٌ على قوله على مَنِ اخْتَصَّ وَالْآلُ اَهْلُ بَيْتِهِ اَوْ عِتْرَتُهُ اَوْ كُلُّ مُؤمِنٍ تَقِيٍّ وهو الْاَنْسَبُ هٰهُنَا لِاَنَّ الْمُصَنِّفَ (رحـ) لم يَتعرَّضْ لِذِكْرِ الْاَصْحابِ فِي الصَّلٰوةِ فَكَانَ الْاَوْلٰى هُوَ التَّعْمِيْمُ وَالدِّيْنُ هُو وَضْعٌ اِلٰهِيٌّ سَائِقٌ لِّذَوِى الْعُقُوْلِ بِاِخْتِيَارِهِمُ الْمَحْمُوْدِ اِلَى الْخَيْرِ بِالذَّاتِ وهُوَ يَشْمَلُ الْعَقَائِدَ وَالاعمالَ يُطلَقُ عَلٰى كلِّ دِيْنٍ وَالْاِسْلَامُ هُو الدِّيْنُ الْمَخْصُوصُ لِمُحَمَّدٍ ﷺ ولَعَلَّ فِيْ وَصْفِه بِالْقَوِيْمِ اِشارةٌ اِلَيْهِ لِاَنَّ دِيْنَ الْاِسْلامَ هُوالْمَوْصُوْفُ بِالْاِسْتِقامَةِ ـ

অনুবাদ॥ ***রহমত বর্ষিত হোক তাঁর পরিবার পরিজনের ওপর, যারা শ্বাশত সত্য দ্বীনের সাহায্যার্থে সদা ব্যাস্তছিলেন।*** এ বাক্যটি গ্রন্থকারের পূর্ববর্তী বক্তব্য على من اختص এর ওপর আত্ফ হয়েছে। آل শব্দটি নবীর পরিবার পরিজন, অথবা তাঁর সন্তান-সন্ততি অথবা প্রত্যেক আল্লাহভীরু মুমিন ব্যক্তির ওপর প্রয়োগ হয়। এখানে শেষোক্ত অর্থটি গ্রহণ করা সর্বাধিক প্রযোজ্য। কেননা, আল-মানারের গ্রন্থকার রহমত নিবেদনের ক্ষেত্রে সাহাবীগণের কথা উল্লেখ করেন নি। কাজেই ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করাই উত্তম।

الدين হলো আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রণীত এমন জীবন বিধান, যা বিবেকবানদের তাদের প্রশংসিত মোতাবেক বাস্তব কল্যাণ (তথা আল্লাহর সন্তুষ্টি)র দিকে পরিচালিত করে। دين শব্দটি বিশ্বাস ও কর্ম উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে এবং প্রত্যেক নবীর দ্বীনের ওপর প্রযোজ্য হয়। আর ইসলাম হলো নবী করীম (স)-এর নির্দিষ্ট জীবন ব্যবস্থা। সম্ভবত ঃ গ্রন্থকার কর্তৃক القويم (সুদৃঢ়) শব্দ দ্বারা الدين শব্দের বিশেষণ এনে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ, দ্বীন ইসলামই হলো সুদৃঢ়তার মহৎগুণে বিভূষিত।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ قوله وعلى آلِه الَّذِيْن الخ : ব্যাখ্যাকার এর ভাষ্য وعلى اله الخ পূর্বের ভাষ্য على من اختص الخ এর উপর মা'তুফ। آل শব্দের শাব্দিক ও তার অর্থগত বিশ্লেষণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। মোল্লা জুয়ুন (র) এখানে এর উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন-

১. آل দ্বারা রাসূলুল্লাহ (স) এর আহলে বায়ত অর্থাৎ তাঁর বিবি সাহেবাগণ উদ্দেশ্য। ২. অথবা রাসূলুল্লাহ (স) এর সন্তানাদি উদ্দেশ্য। ৩. অথবা এর দ্বারা সকল মুমিন মুত্তাকী এবং খোদাভীরু ব্যক্তি উদ্দেশ্য। এখানে শেষোক্তটি উদ্দেশ্য নেওয়াই বেশি উপযোগী। কারণ মূল গ্রন্থকার দরূদ ও সালামের স্থলে সাহাবীগণের কথা উল্লেখ করেননি। অথচ তারাও দরূদ ও সালামের অধিকারী। অতএব آل দ্বারা এমন ব্যাপকতা সম্পন্ন অর্থ উদ্দেশ্য নেয়া যা আহলে বায়ত, সাহাবায়ে কেরাম এবং সকল মুমিন মুত্তাকীকে শামিল করে সেটাই উত্তম।

دِيْن **কাকে বলে?** নুরুল আনওয়ারুল গ্রন্থকার دين শব্দের সংজ্ঞায় লেখেন هُوَ وَضْعٌ اِلٰهِيٌّ سَائِقٌ لِّذَوِى الْعُقُوْلِ بِاِخْتِيَارِهِمُ الْمَحْمُوْدِ اِلَى الْخَيْرِ بِالذَّاتِ এর মধ্যে وضع শব্দটি মাসদার। মাফউল অর্থে ব্যবহৃত। من الاله، الهى অর্থে سائق - سوق মাসদার হতে উৎপত্তি। অর্থ তাড়ানো, নিয়ে যাওয়া। المحمود শব্দটি যের সহকারে اختيار এর সিফাত। আর পেশ সহকারে পড়লে وضع এর সিফাত এবং যবর সহকারে পড়লে মাফউলে লাহু হবে। خير بالذات দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি বা তার দীদার উদ্দেশ্য। কারণ সত্তাগতভাবে এবং কোনো মাধ্যম বিহীন আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি এবং তার দীদারই উত্তম। এখন دين এর সংজ্ঞা এই হলো যে, دين এমন বিষয়কে বলে যা

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মনোনীত অর্থাৎ এমন ঐশী বিধান যা বিবেক সম্পন্ন মানুষকে তাদের শক্তি ও এখতিয়ারের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি বা তার দীদার লাভ পর্যন্ত উপনীত করে। সারকথা এই যে, ঐশী বিধানকে বাস্তবায়ন করা এবং তার উপর আমল করা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি এবং দীদার লাভের কারণ।

★ নুরুল আনওয়ারের ব্যাখ্যাকার دين শব্দের সংজ্ঞার উপর প্রশ্ন আরোপ করে বলেন যে, ঈদের রাত্রে যে শিশু ভূমিষ্ট হয় তার পক্ষ থেকেও সাদকায়ে ফিতির আদায় করা হয়। কিন্তু সে এখতিয়ার অক্ষম হওয়ার কারণে তারপক্ষ থেকে আদায়কৃত সাদকায়ে ফিতির দ্বীন হওয়া থেকে খারিজ হয়ে যায়। কারণ এ সংজ্ঞার মধ্যে باختيارهم তথা 'স্বইচ্ছায়' শব্দ উল্লেখ রয়েছে। কাজেই সংজ্ঞা এমন হওয়াই উত্তম هُوَ وَضْعٌ إِلٰهِىٌّ سَائِقٌ لَّنْ تَحَقَّقَ فِيْهِ إِلَى الْخَيْرِ بِالذَّاتِ। অর্থাৎ এমন বিষয়কে দ্বীন বলে যা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সুনির্ধারিত এবং যা সুনিশ্চিতভাবে বান্দাকে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও দীদার পর্যন্ত নিয়ে যাবে। এ সংজ্ঞায় এখতিয়ার করার কথা উল্লেখ নেই। এ কারণে ঈদের রাত্রে ভূমিষ্ট বাচ্চার পক্ষথেকে সাদকায়ে ফিতির আদায় করলে তা আদায় হয়ে যাবে এবং তা দ্বীন গণ্য হবে।

তবে অধমের মতে এই প্রশ্ন ঠিক নয়। কারণ ঈদের রাত্রে ভূমিষ্ঠ শিশুর সাদকায়ে ফিতির তার পিতার উপর ওয়াজিব হয়, শিশুর উপর নয়। আর শিশুর পিতা এখতিয়ার উপযোগী। কাজেই নুরুল আনওয়ার গ্রন্থকারের সংজ্ঞা ঈদের রাত্রে ভূমিষ্ট শিশুর সাদকায়ে ফিতিরের উপর প্রযোজ্য হবে। গ্রন্থকার বলেন– দ্বীন শব্দটি আকীদা ও আমল উভয়কে শামিল করে। এবং সকল ধর্মের উপর তা প্রযোজ্য হয়। যেমন মূসা (আ) এর ধর্ম, ঈসা (আ) এর ধর্ম প্রভৃতি। আর ইসলাম ধর্ম রাসূলুল্লাহ (স) এর সাথে খাছ।

وَلَعَلَّ فِىْ وَصْفِهِ بِالْقَوِيْمِ الخ : এটা একটা প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন : যখন সকল ধর্মের উপর دين শব্দ প্রযোজ্য হয় তাহলে গ্রন্থকারের উক্তি وَعَلٰى آلِهِ الَّذِيْنَ قَامُوْا بِنُصْرَةِ الدِّيْنِ। এর উদ্দেশ্য এই হবে যে, রাসূলুল্লাহ (স) এর ال বা পরিবারের লোক সকল ধর্মের সাহায্যকারী। অথচ ব্যাপারটি তা নয়। বরং তাঁরা কেবল মুহাম্মদ (স) এর দ্বীনের সাহায্যকারী।

উত্তর : ব্যাখ্যাকার এর উত্তর দিচ্ছেন যে, মাতিন (র) دين এর বিশেষণে قويم শব্দ উল্লেখ করেছেন। এর অর্থ হলো সোজা, মধ্যমপন্থী। আর এটা পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, এগুণের সাথে কেবল ইসলাম ধর্মই বিশেষিত। অন্যান্য ধর্মের মধ্যে অতি কঠোরতা বা অতিসহজতা (ইফরাত-তাফরীত) বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই মাতিন (র) এর পক্ষ থেকে قويم বিশেষণ সংযুক্ত করণের দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মতনে দ্বীন দ্বারা দ্বীন ইসলাম উদ্দেশ্য। অতএব রাসূলুল্লাহ (স) এর পরিবার সকল ধর্মের সাহায্যকারী হওয়া বুঝাবে না।

ثُمَّ اعْلَمْ اَنَّ اُصُولَ الْفِقْهِ لَهُ حَدٌّ إِضَافِيٌّ وَحَدٌّ لَقَبِيٌّ وَغَايَةٌ وَمَوْضُوعٌ وَلَمَّا لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ (رح) طَوَيْنَاهُ عَلَى غَرِّهِ وَلٰكِنْ لَا بُدَّ هٰهُنَا مِنْ اَنْ يُّعْلَمَ اَنَّ عِلْمَ اُصُولِ الْفِقْهِ عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ إِثْبَاتِ الْاَدِلَّةِ لِلْاَحْكَامِ فَمَوْضُوعُهُ عَلَى الْمُخْتَارِ هُوَ الْاَدِلَّةُ وَالْاَحْكَامُ جَمِيعًا اَلْاَوَّلُ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ مُثْبِتٌ وَالثَّانِي مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ مُثْبَتٌ ـ

(اصول الشرع-এর প্রকারভেদ)

অনুবাদ ॥ জ্ঞাতব্য: উসূলে ফিকহের (দুটি সংজ্ঞা রয়েছে) একটি সম্বন্ধ পদবাচ্য সংজ্ঞা (حداضافی) ও অন্যটি পদবিমূলক সংজ্ঞা (حد لقبی) এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও আলোচ্য বিষয় রয়েছে। তবে আল-মানার গ্রন্থকার যেহেতু এগুলোর আলোচনা করেন নি, সেহেতু আমরাও এ বিষয়টাকে তাঁরই মুড়িয়ে রাখা অবস্থায় রেখে দিলাম। অবশ্য এখানে এতটুকু জেনে রাখা আবশ্যক যে, ইলমে উসূলে ফিকহ এমন বিদ্যাকে বলা হয়, যাতে শরীআতের আহকাম সাব্যস্ত করার জন্যে দলিল-প্রমাণ উপস্থাপনার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। গ্রহণযোগ্য মতানুসারে দলিলসমূহ ও বিধানাবলি উভয়ই এর আলোচ্য বিষয়। প্রথমটি (আলোচ্য বিষয়) এ হিসেবে যে, এগুলো আহকাম সাব্যস্তকারী। আর দ্বিতীয়টি এ হিসেবে যে, এগুলো দলিল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله ثم اعلم الخ : মোল্লা জুয়ুন (র) বলেন– কোনো শাস্ত্র সংকলনের শুরুতে উক্ত শাস্ত্রের সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য ও আলোচ্য বিষয় উল্লেখ করা জরুরি। বক্ষমান এ কিতাবটি উসূলে ফিকহ শাস্ত্রীয় গ্রন্থ। উসূলে ফিকহ এর সংজ্ঞা ২টি। ১. تعريف اضافى ২. تعريف لقبى - এর একটি উদ্দেশ্যে ও একটি আলোচ্য বিষয়ও রয়েছে। মাতিন তথা মানার গ্রন্থকার যেহেতু এসকল বিষয়ে আলোচনা করেননি। এ কারণে আমিও এগুলো পূর্বের অবস্থায় ছেড়ে দিলাম তবে কমপক্ষে তার পরিচিতি আলোচনা করা উচিত। তা এই যে,

اصول فقه এর পরিচয় : উসূলে ফিকহ এমন শাস্ত্রের নাম যার মধ্যে শরয়ী দলিল প্রমাণাদির দ্বারা শরয়ীবিধানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়।

موضوع বা আলোচ্য বিষয় : এর আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে ৩টি উক্তি রয়েছে। যথা– ১. কেবল দলিল প্রমাণাদি, ২. শরয়ী বিধান ৩. দলিল এবং বিধান উভয়ের সমষ্টি। শেষোক্ত মতটিই প্রাধান্যযোগ্য।

এর উপর প্রশ্ন জাগে যে, উসূলে ফিকহের আলোচ্য বিষয় দলিল এবং বিধানের সমষ্টি হয়ে থাকলে আলোচ্য বিষয় ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। একটি দলিল ও অপরটি বিধান। আর বিষয়বস্তু বিভিন্ন হওয়া শাস্ত্র বিভিন্ন হওয়ার প্রমাণ বহন করে। অথচ তা ঠিক নয়।

উত্তর : এর উত্তর এই যে, আলোচ্য বিষয়ের বিভিন্নতা শাস্ত্রের বিভিন্নতার উপর ঐসময় প্রমাণ বহন করে যখন উভয়ের মধ্যে সত্তাগতভাবে প্রভেদ থাকে। অথচ এখানে দলিল ও বিধান এর মধ্যে সত্তাগতভাবে কোনো প্রভেদ নেই; বরং এক ও অভিন্ন। তবে আপেক্ষিক সামান্য পার্থক্য রয়েছে। সত্তাগতভাবে এভাবে যে, এখানে আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে اثبات তথা প্রমাণিত করা কাম্য। আর اثبات শব্দটি মাসদার। মাসদার কখনো ফায়েলের অর্থে ব্যবহৃত হয়, কখনো মাফউলের অর্থে ব্যবহৃত হয়। অতএব দলিলের দিক দিয়ে اثبات শব্দটি مُثْبِتْ অর্থে। আর বিধানের দিক দিয়ে مُثْبَتْ তথা মাফউলের অর্থে। অর্থাৎ দলিল হলো প্রমাণকারী, আর বিধান হলো প্রমাণের বিষয়।

সারকথা এই যে, দলিল এবং বিধান কায়েম করা উভয়ের ক্ষেত্রেই লক্ষ্য থাকে। কেবল পার্থক্য এতোটুকু যে, ফায়েলের অর্থের দিক দিয়ে দলিলের প্রতি মুযাফ হয়েছে। আর মাফউলের অর্থের দিক দিয়ে আহকামের প্রতি মুযাফ হয়েছে। অতএব উভয়টির মধ্যে যখন اثبات উদ্দেশ্য। কাজেই সত্তাগতভাবে উভয়টিই এক। অতএব আলোচ্য বিষয় বিভিন্ন হওয়া সাব্যস্ত হয় না। আর আলোচ্য বিষয় যেহেতু বিভিন্ন নয়। কাজেই শাস্ত্রও বিভিন্ন হওয়া সাব্যস্ত হয় না।

وَالْمُصَنِّفُ (رحـ) ذَكَرَ اَحْوَالَ الْاَدِلَّةِ فِى صَدْرِ الْكِتَابِ وَاَحْوَالَ الْاَحْكَامِ فِىْ اٰخِرِهٖ بَعْدَ الْفَرَاغِ عَنْهَا فَقَالَ اِعْلَمْ اَنَّ اُصُوْلَ الشَّرْعِ ثَلٰثَةٌ وَالْاُصُوْلُ جَمْعُ اَصْلٍ وَهُوَ مَا يُبْتَنٰى عَلَيْهِ غَيْرُهٗ وَالْمُرَادُ بِهَا هٰهُنَا الادلة والشرع ان كان بمعنى الشارع فاللام فيه لِلْعَهْدِ اَىِ الْاَدِلَّةُ الَّتِىْ نَصَّهَا الشَّارِعُ دَلِيْلًا وَاِنْ كَانَ بِمَعْنَى الْمَشْرُوْعِ فَاللَّامُ فِيْهِ لِلْجِنْسِ اَىْ اَدِلَّةُ الْاَحْكَامِ الْمَشْرُوْعَةِ وَالْاَوْلٰى اَنْ يَكُوْنَ الشَّرْعُ اِسْمًا لِلدِّيْنِ فَلَا يَحْتَاجُ اِلَى التَّاوِيْلِ وَاِنَّمَا لَمْ يَقُلْ اُصُوْلَ الْفِقْهِ لِاَنَّ هٰذِهِ الْاُصُوْلَ كَمَا اَنَّهَا اُصُوْلُ الْفِقْهِ فَكَذٰلِكَ هِىَ اُصُوْلُ الْكَلَامِ اَيْضًا

অনুবাদ ॥ গ্রন্থকার কিতাবের সূচনায় দলিলসমূহের প্রকৃতিগত অবস্থা আলোচনা করেছেন। সেগুলোর আলোচনা শেষ করে কিতাবের শেষাংশে বিধানসমূহের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। এ মর্মে তিনি বলেন, ***জেনে রেখো যে, শরীআতের মূলনীতি তিনটি।*** الاصول শব্দটি الاصل শব্দের বহুবচন। اصل এমন বস্তুকে বলা হয়, যার ওপর অন্য বস্তুর ভিত্তি স্থাপন করা হয়, الاصول দ্বারা এখানে শরীআতের প্রমাণসমূহ উদ্দেশ্য। الشرع শব্দটি যদি شارع তথা শরীআত প্রবর্তক অর্থে হয়, তাহলে এর الف لام টি عهدى তথা নির্দিষ্ট জ্ঞাপক হবে। এক্ষেত্রে اصول الشرع এর অর্থ হবে) ঐ সব প্রমাণসমূহ, যেগুলোকে শরীআত প্রবর্তক প্রমাণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর যদি مشروع (বিধান ও প্রচলিত) অর্থে হয়, তখন الف لام টি جنسى বা জাতিজ্ঞাপক হবে। (এমতাবস্থায় اصول الشرع এর অর্থ হবে) প্রচলিত বিধানসমূহের প্রমাণাদি।

সর্বোত্তম এই যে, الشرع হলো দ্বীন তথা ধর্মের নাম। তাহলে কোনরূপ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন হবে না। মুসান্নিফ (র) اصول الفقه বলেন নি, এ কারণে যে, এগুলো যেভাবে ফিকহ শাস্ত্রের মূলনীতি, তেমনি এগুলো কালাম শাস্ত্রেরও মূলনীতি।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله والمصنف ذكر الخ : ব্যাখ্যাকার (র) এর পসন্দনীয় মত অনুযায়ী উসূলে ফিকহের সংজ্ঞায় দুটি বস্তু উল্লেখ করেছেন। ১. দালায়েল, ২. আহকাম। আর সর্বাগ্রে যেহেতু আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয় এ কারণেই তিনি কিতাবের শুরুতে দলিলসমূহের অবস্থা উল্লেখ করেছেন। কিতাবের শেষে আহকাম সংক্রান্ত বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা করেছেন। দলিলের বিভিন্ন অবস্থাকে আহকামের অবস্থার উপর মুকাদ্দাম করার কারণ এই যে, দলিল হলো উসূল বা মূলনীতির পর্যায়ে। আর আহকাম হলো তার শাখার পর্যায়ে। উসূল শাখার উপর অগ্রগণ্য হয়ে থাকে। এ কারণে তাকে আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

قوله والاصول جمع اصل الخ : মাতিন (র) বলেন– ইসলামী শরিয়াতের উসূল ৩টি। এটা একটা প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন : মতনে اصول الشرع শব্দটি ان এর ইসম হওয়ার কারণে محمول عليه হয়েছে। আর ثلثة খবর হওয়ার কারণে محمول হয়েছে। আর حمل তথা একটি অপরটির উপর প্রযোজ্য হওয়ার জন্য, উভয়ের মাঝে একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন, পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ হওয়ার ক্ষেত্রে এক ধরনের হওয়া আবশ্যক। অথচ এখানে কোনো সমতা বিদ্যমান নেই। কেননা ثلثة শব্দটি বহুবচন। আর اصول শব্দটি একবচন। اصول শব্দটি একবচন এই কারণে যে, এই

শব্দটি قعود ও جلوس এর ওজনে। আর قعود ও جلوس উভয়টি মুফরাদের ওজনে। কাজেই اصول শব্দটি যা মুফরাদের ওজনে সেটিও মুফরাদ হবে।

উত্তর : এর উত্তর এই যে, اصول শব্দটি যেভাবে قعود ও جلوس এর ওজনে, এভাবে فروع শব্দের ওজনেও হয়েছে। এটা বহুবচনের ওজন। অতএব اصول - اصل এর বহুবচন। যেমন فروع - فرع এর বহুবচন। অতএব اصول এবং ثلثة এর মাঝে অভিন্ন হওয়ার প্রশ্ন উত্থাপিত হবে না।

قوله وَهُوَ مَا يُبْتَنٰى الخ : নুরুল আনওয়ার গ্রন্থকার বলেন– অভিধানে اصول এমন বিষয়কে বলে যার উপর অন্য বস্তুর ভিত্তি রাখা হয়। কিন্তু এখানে اصول দ্বারা দলিলসমূহ উদ্দেশ্য। আর দলিল উদ্দেশ্য নেয়ার কারণ এই যে, এই শাস্ত্রের মাসআলাসমূহ দলিলের উপর নির্ভরশীল থাকে ।

قوله وَالشَّرْعُ اِنْ كَانَ الخ : এখান থেকে উহ্য একটি প্রশ্নে উত্তর দিচ্ছেন।

প্রশ্ন : অভিধানে شرع এর অর্থ হলো প্রকাশ করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا অর্থাৎ তিনি তোমাদের জন্য ধর্মের মধ্যে এমন সব বিষয় প্রকাশ করেছেন যার নির্দেশ দিয়েছিলো নূহকে। (সূরা শূরা, রুকু ২) এখন মুসান্নিফ (র) এর ইবারতের অর্থ এই হবে যে, প্রকাশ করার তিনটি উসূল রয়েছে। অথচ উসূলই বিধান প্রমাণিত করার দলিল বর্ণনা করে। বিধান প্রকাশ করার দলিল বর্ণনা করে না।

উত্তর : ব্যাখ্যাকার এর দুটি উত্তর দিয়েছেন–

১. شرع শব্দটি মাসদার। এটা اسم فاعل -شارع অর্থে। যেমন– عدل - عادل অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর الشرع শব্দের আলিফ লামটি عهدى এর দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো রাসূলুল্লাহ (স) এর ইযাফত এ সময় وصول এর প্রতি মুযাফের সম্মানের জন্য হবে। যেমন بيت الله এবং ناقة الله এর মধ্যে মুযাফের সম্মান ও মর্যাদা লক্ষ্য থাকে। এখন ইবারতের অর্থ এই হবে যে, সে সকল দলিল যেগুলোকে শরীআত প্রবর্তক তথা রাসূলুল্লাহ (স) দলিল সাব্যস্ত করেছেন।

২. الشرع শব্দটি মাসদার المشروع অর্থে। আলিফ লাম জিনসের জন্য অর্থাৎ শরীআত প্রবর্তনের বিধান ৩টি।

উভয় উত্তরের সার এই যে, الشرع শব্দটি তার মূল অর্থ অর্থাৎ প্রকাশ করার অর্থে নয় বরং ফায়েল বা মাফউলের অর্থে। অতএব কোনো প্রশ্ন আরোপিত হবে না।

ব্যাখ্যাকার বলেন– উত্তম এই যে, এখানে الشرع শব্দটি মাসদারের অর্থে নয় বরং এটা دين এর اسم جامد। আলিফ লামটি عهدى। এক্ষেত্রে শরীআত দ্বারা দ্বীনে মুহাম্মদী উদ্দেশ্য। তৃতীয় সম্ভাবানটি উত্তম হওয়ার কারণ; এই যে, উপরোক্ত উভয় সম্ভাবনায় মাসদারকে ফায়েল বা মাফউলের অর্থে নেয়ার কারণে রূপক অর্থ গ্রহণ সাব্যস্ত হয়। আর دين এর اسم جامد সাব্যস্ত করলে কোনো রূপক অর্থ গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে না। আর বাক্যকে রূপক মুক্ত রাখাই উত্তম।

اصول الفقه না বলে اصول الشرع বলার কারণ : নুরুল আনওয়ার গ্রন্থকার বলেন– মাতিন (র) উসূলে ফিকহের স্থলে اصول الشرع বলেছেন এ কারণে যে, কিতাবুল্লাহ, সুন্নাহ ও ইজমা তিনোটি যেভাবে ফিকহ শাস্ত্রের উসূল তদ্রূপ ইলমে কালামেরও উসূল। আর الشرع শব্দটি ইলমে কালাম ও আহকামে আমলিয়া তথা ইলমে ফিকহ উভয়কে শামিল করে। আর পরবর্তী আলিমগণের মতে ফিকহ শাস্ত্র আহকামে নজরিয়া তথা ইলমে কালামকে শামিল করে না। অতএব মুসান্নিফ (র) যদি الشرع এর স্থলে الفقه বলতেন তাহলে সন্দেহ হতো যে, কিতাবুল্লাহ, সুন্নাহ ও ইজমা কেবল ইলমে ফিকহের উসূল বা মূল; ইলমে কালামের উসূল নয়। অথচ তা সঠিক নয়। এ কারণে মুসান্নিফ (র) এ সন্দেহ দূর করার জন্যে اصول الفقه না বলে اصول الشرع বলেছেন।

اَلْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَاِجْمَاعُ الْاُمَّةِ بَدَلٌ مِّنْ ثَلٰثَةٍ او بَيَانٌ لَّهُ وَالْمُرَادُ مِنَ الْكِتَابِ بَعْضُ الْكِتَابِ وهُو مِقْدَارُ خُمْسِ مِائَةِ آيَةٍ لِاَنَّهُ اَصْلُ الشَّرْعِ وَالْبَاقِى قَصَصٌ وَنَحْوُهَا وهٰكذا الْمُراد مِن السُّنَّةِ بعضُها وهُو مِقدار ثَلٰثَةِ الافِ عَلٰى مَا قالُوا والْمُرادُ بِاِجْمَاعِ الْاُمَّةِ اِجْمَاعُ اُمَّةِ محمّدٍ ﷺ لِشَرافتِها وكرامتِها سواءٌ كانَ اجماعُ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ او اجماعُ عِتْرَةِ الرّسولِ اواجماعُ الصَّحابَةِ اَوْ نَحْوِهِمْ ـ

অনুবাদ ॥ মূলনীতি তিনটি হলো- *কিতাবুল্লাহ্, সুন্নাতে রাসূল (স) ও ইজমায়ে উম্মত।* এ ভাষ্যটি পূর্বোক্ত ثلاثة শব্দ হতে بدل অথবা عطف بيان হয়েছে। কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কিতাবুল্লাহর অংশ বিশেষ। এর পরিমাণ হলো ৫০০ আয়াত। কেননা, এ পরিমাণ আয়াতই শরীআতের মূলভিত্তি। আর অবশিষ্ট আয়াতসমূহ ঐতিহাসিক ঘটনাবলি ও তৎসদৃশ বিষয়াদি সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে সুন্নাহ দ্বারা তার অংশবিশেষ উদ্দেশ্য। উলামায়ে কেরামের বক্তব্য অনুযায়ী তার পরিমাণ হলো ৩০০০ হাদীস। ইজমায়ে উম্মত দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর উম্মতের ইজমা উদ্দেশ্য। এটা তাঁদের মর্যাদা ও সম্মানের কারণে বিবেচ্য। চাই তা মদীনাবাসীদের ইজমা হোক, কিংবা রাসূলের পরিবার, পরিজনের ইজমা হোক, কিংবা সাহাবায়ে কিরামের ইজমা হোক, অথবা তাঁদের অনুরূপ উলামায়ে কিরামের ইজমা হোক।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قولُه : اَلْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ الخ **الكتاب দ্বারা উদ্দেশ্য :**

মুসান্নিফ (র) বলেন– মানারের ভাষ্য اَلْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ واجماعُ الْاُمَّةِ হলো ثلثة এর বদল বা আতফে বয়ান। এ দুয়ো ক্ষেত্রে অর্থ হবে ইসলামী শরীআতের মূলনীতি তিনটি। উল্লেখ্য যে, এখানে কিতাব দ্বারা কোরআন মজীদ উদ্দেশ্য নয়। বরং কোরআনের আহকাম বিষয়ক ৫০০ আয়াত উদ্দেশ্য। কারণ বাকী আয়াতসমূহ বিভিন্ন কাহিনী, উপদেশ ও দৃষ্টান্ত সংশ্লিষ্ট। কারো কারো মতে কিতাব দ্বারা পূর্ণ কোরআন উদ্দেশ্য। কারণ শরীআতের ভিত্তি হলো ২টি বস্তু। একটি জাহেরী অপরটি বাতেনী। ৫০০ আয়াতে জাহেরী বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। আর বাকী আয়াতসমূহে বাতেনী আহকাম বর্ণিত হয়েছে।

السنة দ্বারা উদ্দেশ্য : সুন্নাহ দ্বারা সকল হাদীস উদ্দেশ্য নয় বরং ৩ হাজার হাদীস উদ্দেশ্য। এর উপারই আহকামের বুনিয়াদ

اجماع الامة দ্বারা উদ্দেশ্য : ইজমায়ে উম্মত দ্বারা রাসূলুল্লাহ (স) এর উম্মতের ইজমা উদ্দেশ্য। আর উম্মত দ্বারাও সকল উম্মত উদ্দেশ্য নয় বরং মুজতাহিদ উম্মত উদ্দেশ্য। এর কারণ হলো উম্মতের মর্যাদা ও সম্মান প্রদান করা। এর দ্বারা শুধু সাহাবায়ে কেরামের ইজমা গ্রহণযোগ্য হওয়া উদ্দেশ্য নয় যেমনটি কেউ কেউ মন্তব্য করে থাকেন। তারা اَصْحَابِىْ كَالنُّجُوْمِ بِاَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ হাদীসের দ্বারা দলিল গ্রহণ করে থাকেন। কারো মতে শুধু মদীনাবাসী উম্মতের ইজমা উদ্দেশ্য। কারণ রাসূলুল্লাহ (স) এরশাদ করেছেন اِنَّ الْمَدِيْنَةَ تَنْفِى خَبَثَهَا كَمَا تَنْفِى الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ অর্থাৎ মদীনা তার দোষ কলুষকে এভাবে দূরীভূত করে যেভাবে কর্মকারের হাফর (বায়ুযন্ত্র) লোহার ময়লা দূরীভূত করে। কারো মতে শুধু রাসূলুল্লাহ (স) এর বংশের লোকের ইজমা গ্রহণযোগ্য। কারণ রাসূলুল্লাহ (স) এরশাদ করেছেন اِنِّىْ تَرَكْتُ فِيْكُمُ الثَّقَلَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا اِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَعِتْرَتِىْ আমি তোমাদের মাঝে ২টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতোক্ষণ তোমরা সে ২টি দৃঢ়রূপে ধারণ করবে ততোক্ষণ গোমরাহ হবে না। সে দুটি হলো- আল্লাহর গ্রন্থ ও আমার আহলে বায়ত।

(অপর পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য)

وَالْاَصْلُ الرَّابِعُ الْقِيَاسُ اى الاَصْلُ الرَّابِعُ بعدَ الثَّلْثَةِ لِلْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ هُوَ الْقِيَاسُ الْمُسْتَنْبَطُ مِنْ هٰذِهِ الْاُصُوْلِ الثَّلْثَةِ وكانَ يَنْبَغِى اَنْ يُقَيِّدَه بِهٰذَا الْقَيْدِ كَمَا قَيَّدَهُ فَخْرُ الْاِسْلام وغيرُه لِيَخْرُجَ القِياسُ الشِّبْهِىُّ والعَقْلِىُّ ولٰكِنَّه اكْتَفى بالشُّهْرَةِ ـ فَنَظِيْرُ القِياسِ الْمُسْتَنْبَطِ مِنَ الْكِتابِ قِياسُ حُرْمَةِ اللِّوَاطَةِ علٰى حُرْمَةِ الوَطْيِ فِىْ حَالَةِ الحَيْضِ بِعِلَّةِ الْاَذٰى الْمُسْتَفادَةِ مِنْ قَوْلِه تَعالٰى وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ـ ونَظِيْرُ القِياسِ الْمُسْتَنْبَطِ مِنَ السُّنَّةِ قِياسُ حُرْمَةِ تَفاضُلِ الجَصِّ وَالنُّوْرَةِ بِعِلَّةِ الْقَدْرِ وَالْجِنْسِ عَلٰى حُرْمَةِ الْاَشْياءِ السِّتَّةِ الْمُسْتَفادَةِ مِن قولِه عليه السلام اَلْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ والتَّمْرُ بِالتَّمْرِ والمِلْحُ بِالمِلْحِ والذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ وَالْفَضْلُ رِبٰوا ـ وَنَظِيْرُ القِياسِ الْمُسْتَنْبَطُ مِنَ الْاِجْمَاعِ قِياسُ حُرْمَةِ اُمِّ الْمَزْنِيَّةِ عَلٰى حُرْمَةِ اُمِّ اَمَتِهِ الَّتِىْ وَطِيَهَا الْمُسْتَفادَةُ مِنَ الْاِجْماعِ بِعِلَّةِ الْجُزْئِيَّةِ وَالْبَعْضِيَّةِ

অনুবাদ॥ *আর চতুর্থ মূলনীতি হলো কিয়াস।* অর্থাৎ উপরোক্ত মূলনীতিত্রয়ের পরে চতুর্থ মূলনীতি হলো ঐ কিয়াস, যা অত্র তিন দলিলের আলোকে উদ্ভাবিত। আল-মানার গ্রন্থকার কর্তৃক কিয়াসকে এ শর্ত দ্বারা (اَلْمُسْتَنْبَطُ مِنْ هٰذِهِ الْاُصُوْلِ الثَّلَاثَةِ তথা ত্রিবিধ দলিলের ভিত্তিতে উদ্ভাবিত) শর্তযুক্ত করা সমীচীন ছিল। যেমন ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদূভী ও অন্যান্য উসূল শাস্ত্রবিদগণ করেছেন। যাতে কিয়াসে শিবহী ও কিয়াসে আকলী (কিয়াসের সংজ্ঞা হতে) বের হয়ে যায়। কিন্তু বিষয়টি অতি প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে তিনি এতটুকু বলাকে যথেষ্ট মনে করেছেন।

কিতাবুল্লাহ থেকে উদ্ভাবিত কিয়াসের দৃষ্টান্ত : হায়েয অবস্থায় নাপাকীর কারণে স্ত্রী সহবাস হারাম হওয়ার ওপর কিয়াস করে গুহ্যদ্বারে সঙ্গম হারাম হওয়ার হুকুম প্রদান করা। যা আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَلَاتَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ (স্ত্রীগণ পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের নিকটবর্তী হয়ো না।)

(পূর্বের বাকী অংশ)

মোটকথা আমাদের নিকট বিশুদ্ধ মত এই যে, ইজমা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য নেককার মুজতাহিদ হওয়াই যথেষ্ট। সর্বকালে সর্বযুগে ও সর্বদেশে তা হতে পারে। মাতিন (র) এখানে কিতাবুল্লাহকে সর্বাগ্রে উল্লেখ করেছেন। কারণ তা সর্বদিক দিয়ে গ্রহণযোগ্য। অতপর সুন্নাহকে উল্লেখ করেছেন। কারণ তা দলিল হওয়া কিতাবুল্লাহ দ্বারা প্রমাণিত। যেমন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا সর্বশেষে তিনি ইজমাকে উল্লেখ করেছেন। কারণ কোরআন ও সুন্নাহর উপরই ইজমাটা দলিল হওয়া মওকূফ। কোরআনের উপর মওকূফ হওয়ার দলিল হলো فَاعْتَبِرُوْا يَا اُوْلِى الْاَبْصَارِ আর সুন্নাহর উপর মওকূফ হওয়ার দলিল হলো مَا رَاٰهُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَسَنًا فَهُوَعِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ এবং অপর এক হাদীসে আছে لَاتَجْتَمِعُ اُمَّتِى عَلَى الضَّلَالَةِ

সুন্নাতে রাসূল থেকে উদ্ভাবিত কিয়াসের দৃষ্টান্ত : পরিমাপ (قدر) ও একজাতীয় (جنس) হওয়ার ইল্লত অনুসারে ছয়টি জিনিসের হারাম হওয়ার ওপর কিয়াস করে সুরকী ও চুনের মধ্যে অতিরিক্ত লেনদেন হারাম হওয়ার হুকুম প্রদান করা। যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর এ বাণী থেকে প্রতীয়মান হয়। বাণীটি হচ্ছে- اَلْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ وَالْفَضْلُ رِبوا الخ অর্থাৎ, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য সমান-সমান, হাতে-হাতে (নগদ) বিক্রি করবে। আর অতিরিক্ত গ্রহণ করা সুদ গণ্য হবে।

ইজমা থেকে উদ্ভাবিত কিয়াসের উদাহরণ : جُزْئِيَّت ও بَعْضِيَّت তথা আংশিকতা ও অংশ বিশেষের ইল্লতের কারণে সঙ্গমিতা ক্রীতদাসীর মা হারাম হওয়ার ওপর ব্যভিচারকৃতা নারীর মা-কে বিবাহ করা হারাম হওয়ার হুকুম প্রদান করা। যা ইজমা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ قوله وَالْأَصْلُ الرَّابِعُ الخ : মুসান্নিফ (র) বলেন উল্লেখিত ৩ দলিলের পরে শরয়ী বিধানের চতুর্থ দলিল হলো কিয়াস যা উল্লেখিত তিন দলিল থেকে গৃহীত।

قوله وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَيِّدَهُ الخ : এর দ্বারা মাতিন (র) এর উপর একটি প্রশ্ন এবং لٰكِنَّهُ اكْتَفٰى بِالشُّهْرَةِ দ্বারা তার উত্তর উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রশ্ন : কিয়াস ৪ প্রকার। যথা- ১. قياس شرعى, ২. قياس لغوى, ৩. قياس شبهى, ৪. قياس عقلى।

قياس شرعى এমন কিয়াসকে বলে যা কিতাবুল্লাহ, হাদীসে রাসূল বা ইজমা থেকে গৃহীত।

قياس لغوى : এমন কিয়াস বলে যার মধ্যে এক জায়গা থেকে এক ইসমকে বিশেষ কোনো মুশতারিক ইল্লতের কারণে স্থানান্তর করা হয়। যেমন خمر শব্দটি مُخَامَرَةُ الْعَقْلِ তথা বিবেক অচেতন হওয়ার কারণে সকল হারাম মদের জন্য বলা হয়ে থাকে।

قياس شبهى : এমন কিয়াসকে বলে যার মধ্যে বাহ্যিক সাদৃশ্যতার কারণে বিধানকে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থার দিকে প্রয়োগ করা হয়। যেমন কোনো ব্যক্তি নামাযের শেষ বৈঠক ফরয না হওয়ার ব্যাপারে দলিল পেশ করতে গিয়ে বললেন- শেষ বৈঠক যেহেতু প্রথম বৈঠকের অনুরূপ। আর প্রথম বৈঠক ফরয নয়। এ কারণে শেষ বৈঠকও ফরয হবে না।

قياس عقلى : এমন নীতি বা উক্তিকে বলে যা এমন কতিপয় বাক্যের সমন্বয়ে গঠিত যেগুলো মানার দ্বারা অপর একটি কথা মেনে নেয়া অপরিহার্য হয়। যেমন- পৃথিবী পরিবর্তনশীল এবং সকল পরিবর্তনশীল বস্তু ক্ষণস্থায়ী। এ দুটি বাক্য মেনে নেয়ার দ্বারা পৃথিবী ক্ষণস্থায়ী মেনে নেয়া অপরিহার্য হয়।

সুতরাং কিয়াস যেহেতু চার প্রকার হলো। আর এখানে কেবল শরয়ী কিয়াস উদ্দেশ্য। অতএব বাকী ৩ কিয়াসকে সংজ্ঞা থেকে খারিজ করার জন্য মতনের মধ্যে القياس শব্দকে الْمُسْتَنْبَطُ مِنْ هٰذِهِ الْأُصُوْلِ الثَّلٰثَةِ বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করা উচিত ছিলো। যেমন আল্লামা ফখরুল ইসলাম বযদবী এবং অন্যান্য মুসান্নিফগণ করেছেন।

মাতিনের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যাকার ওযর পেশ করে বলেন মুসান্নিফ (র) শরয়ী কিয়াস প্রসিদ্ধ হওয়ার উপরে ক্ষান্ত করেছেন। এ কারণে তার কোনো বিশেষণ উল্লেখ করেননি। অর্থাৎ সবাই এ ব্যাপারে অবগত যে, উসূলে ফিকহের কিতাবসমূহে কিয়াসে শরয়ী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। অতএব তা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

এখানে যেহেতু কিয়াসে শরয়ী উদ্দেশ্য। আর শরয়ী কিয়াস বলে যা কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে রাসূল (স) বা ইজমা দ্বারা গৃহীত। এ কারণে ব্যাখ্যাকার তিনোটির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন।

কিতাবুল্লাহ থেকে গৃহীত কিয়াসের উদাহরণ :

হায়েযের সময় সহবাস করা বা সহবাস হারাম হওয়া কিতাবুল্লাহর স্পষ্টভাষ্য يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ وَلَاتَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ দ্বারা প্রমাণিত। "মানুষ আপনার নিকট হায়েযের বিধান সম্পর্কে জানতে চায়। আপনি বলে দিন যে, তা অপবিত্রতা। অতএব তোমরা হায়েযের সময় স্ত্রীর থেকে দূরে থাকো। তাদের নিকটবর্তী হয়ো না যতোক্ষণ না তারা পবিত্র হয়। (বাকারা, রুকু ১২)

এই আয়াত দ্বারা বোঝা গেলো যে, হায়েযের সময় সহবাস হারাম হওয়ার কারণ হলো اذى অর্থাৎ অপবিত্রতা। আর এ কারণ পুরুষের সমকামিতার মধ্যেও পাওয়া যায়। কেননা গুহ্যদ্বার হলো নাজাসাতে গলিযার স্থান। অতএব সমকামিতা এবং হায়েয অবস্থায় সহবাস উভয়টিই علت اذى তথা অপবিত্রতার ক্ষেত্রে শরীক। অতএব হায়েয অবস্থায় সহবাস হারাম হওয়ার উপর সমকামিতা হারাম হওয়াকে কিয়াস করা হয়েছে। অর্থাৎ হায়েয অবস্থায় সহবাস হারাম হওয়া কিতাবুল্লাহর নস তথা স্পষ্টভাষ্য দ্বারা প্রমাণিত। আর সমকামিতা হারাম হওয়া কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত।

প্রশ্ন : এখানে একটা প্রশ্ন জাগে যে, কিয়াস বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য فرع তথা শাখা বিষয়টি منصوص عليه অর্থাৎ কোনো স্পষ্টভাষ্য দ্বারা প্রমাণিত না হওয়া শর্ত। অথচ সমকামিতা হারাম হওয়া নস দ্বারা প্রমাণিত। কারণ পুরুষের সমকামিতা কিতাবুল্লাহ দ্বারা প্রমাণিত। যেমন−

১. আল্লাহ তা'আলা লূত জাতি সম্পর্কে এরশাদ করেছেন اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ (আনকাবুত, রুকু ৩)। "তোমরা পুরুষের প্রতি ধাবিত হচ্ছো এবং পথ রুদ্ধ করে দিচ্ছো" আয়াতে পুরুষের প্রতি ধাবিত হওয়ার দ্বারা লাওয়াতাত তথা সমকামিতা উদ্দেশ্য। এখানে হামযা বর্ণনটি অস্বীকার জ্ঞাপক (نكارى)। অর্থাৎ তোমরা সমকামিতার উদ্দেশ্যে পুরুষের প্রতি ধাবিত হয়ো না।

২. اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِ (নামল: রুকু ৪) "তোমরা নারীদেরকে ছেড়ে কামচরিতার্থে পুরুষদের প্রতি ধাবিত হচ্ছো এই আয়াতের সার একই যে, নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষেরদের থেকে নিজেদের কামচরিতার্থ করো না।

৩. اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِيْنَ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِ (আরাফ : রুকু ৪) "তোমরা এমন নির্লজ্জ কাজ করে থাকে যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউই করেনি। তোমরা নারীদেরকে ছেড়ে কামচরিতার্থে পুরুষের প্রতি ধাবিত হচ্ছো।

৪. وَالَّذَانِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا (নিছা : রুকু ৩) "তোমাদের মধ্য থেকে কোনো দুজন পুরুষ এমন জঘণ্য কাজ করলে তাদেরকে সাজা দাও"। এই আয়াতে সমকামিতার দরুন তাদেরকে সাজা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর হারাম কাজের উপরই সাজা দেয়া হয়ে থাকে। কাজেই এসব আয়াত দ্বারা সমকামিতা হারাম হওয়া প্রমাণিত হলো।

আর فرع তথা মাকীস যদি মহিলাদের সাথে সমকামিতা হয় তাহলে তা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তিরমীযিতে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ (স) এরশাদ করেছেন اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قال لَايَنْظُرُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اِلٰى رَجُلٍ اَتٰى رَجُلًا اَوِ امْرَاَةً فِىْ دُبُرِهَا "আল্লাহ তা'আলা এমন পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না যে কোনো পুরুষ বা মহিলার পায়ুপথে গমন করে।" অর্থাৎ সমকামিতা করে। এই হাদীস দ্বারা মহিলাদের সাথে লাওয়াতাত হারাম হওয়া প্রমাণিত হয়।

কোনো কোনো আলিম বলেন– ইশারাতুন নাস দ্বারা মহিলাদের সাথে লাওতাত হারাম হওয়া প্রমাণিত হয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ -এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ফসল উৎপন্নের স্থান (যোনি) পথে কামচরিতার্থের নির্দেশ দিয়েছেন। আর পায়ুপথ ফসল তথা সন্তান লাভের স্থান নয় বরং তা অপবিত্রতা বের হওয়ার স্থান। কাজেই আল্লাহ যখন ফসল উৎপন্নের স্থানে আগমনের নির্দেশ দিয়েছেন। কাজেই লাওয়াতাত নিষিদ্ধ হওয়া বোঝা যায়। মোটকথা পুরুষ বা নারী উভয়ের সাথে লাওয়াতাত হারাম হওয়া নস দ্বারা প্রমাণিত। অতএব এটাকে হায়েয অবস্থায় সহবাস হারাম হওয়ার উপর কিয়াস করা কিভাবে ঠিক হতে পারে?

হাদীস থেকে গৃহীত কিয়াসের উদাহরণ

হাদীসে ৬টি বস্তু পরস্পরে কম বেশি করে বিক্রি করা হারাম ঘোষিত হয়েছে। উক্ত বস্তু ৬টি এই– ১. গম, ২ যব, ৩. খেজুর, ৪. লবণ, ৫. সোনা ও ৬. রূপা। হানাফীগণের মতে এর কারণ বা ইল্লত হলো قدر ও جنس রাসূলুল্লাহ (স) এর বাণী اَلْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ দ্বারা এ বিষয়টি প্রতীয়মান হয়েছে। এ ইল্লতটি চূনার মধ্যেও বিদ্যমান। অতএব جنس وقدر তথা পরিমাপ ও শ্রেণী এর ইল্লতের মধ্যে শরীক। এ কারণে চূনা বিক্রির ক্ষেত্রে লেনদেনে কম-বেশি করা হারাম হওয়াকে উক্ত ৬জিনিস হারাম হওয়ার উপর কিয়াস করা হয়েছে।

সারকথা এই যে, উপরোক্ত ৬টি বস্তুর মধ্যে পরস্পরে কমবেশি করে বিক্রি করা হারাম হওয়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আর চূনার মধ্যে হারাম হওয়া কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত

ইজমা থেকে গৃহীত কিয়াসের উদাহরণ

সহবাসকৃতা কৃতদাসীর মা সঙ্গমকারীর উপর হারাম হওয়া ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। হারাম হওয়ার ইল্লত হলো جُزْئِيَّتْ وبَعْضِيَّتْ তথা একে অপরের অংশ হওয়া। অর্থাৎ সহবাসের দরুন যে সন্তান ভূমিষ্ট হবে সে যেহেতু সহবাসকারী নারী পুরুষ উভয়েরই অংশ। এ কারণে উক্ত বাচ্চার মাধ্যমে সঙ্গমকারী নারীপুরুষের মধ্যেও পরস্পরে একে অপরের অংশ প্রমাণিত হবে। অর্থাৎ সহবাসকৃতা নারী সহবাসকারী পুরুষের অংশ সাব্যস্ত হবে। এভাবে এর বিপরীতেও অংশ হওয়া এবং পরস্পরের অঙ্গ হওয়ার কারণে সহবাসকারীর উর্ধ্বতন ও নিম্নতম পুরুষ সহবাসকৃতা মহিলার উপর, এভাবে সহবাসকৃতার উর্ধ্বতন ও নিম্নতম বংশ সহবাসকারীর উপর হারাম হবে। কারণ মানুষ তার নিজের অংশের উপর হারাম হয়ে থাকে।

প্রশ্ন : যদি এ কথা বলা হয় যে, সহবাসকারী যেহেতু সহবাসকৃতা নারীর অংশ এবং সহবাসকৃতানারী সহবাসকারী পুরুষের অংশ। আর এক অংশ অপর অংশের উপর হারাম হয়ে থাকে। কাজেই সহবাসকারী নারী-পুরুষ একে অপরের উপর হারাম হওয়া উচিত ছিলো। অথচ সহবাসকারী পুরুষ সহবাকৃতা মহিলার উপর এবং এর বিপরীতে সহবাসকৃতা মহিলা সহবাসকারী পুরুষের জন্য হারাম নয় এর কারণ কি?

উত্তর : উল্লেখিত প্রশ্নটি অবশ্যই যুক্তিযুক্ত। এ হিসেবে একে অপরের জন্য হারাম হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু প্রয়োজন সাপেক্ষে এক্ষেত্রে কিয়াস পরিত্যাজ্য হয়েছে। যাই হোক সহবাসকৃতা দাসীর মা সহবাসকারী পুরুষের উপর একে অপরের অংশ হওয়ার কারণে হারাম। আর একই ইল্লত যেহেতু ব্যাভিচারিণী মায়ের ক্ষেত্রেও পাওয়া যায়। এ কারণে ব্যাভিচারিণীর মাও সহবাসকৃতা দাসীর মা হারাম হওয়ার উপর কিয়াস করে ব্যভিচারী পুরুষের জন্য হারাম হবে। অর্থাৎ ব্যভিচারিণীর মায়ের সাথে ব্যভিচারি পুরুষের বিবাহ হারাম হবে।

সারকথা এই যে, সহবাসকৃতা দাসীর মা সহবাসকারীর জন্য হারাম হওয়া ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। আর এর উপর কিয়াস করে ব্যভিচারিণীর মা ব্যভিচারির জন্য হারাম হওয়া প্রমাণিত হয়েছে।

وَاِنَّمَا اَوْرَدَ بِهٰذَا النَّمَطِ وَلَمْ يَقُلْ اِنَّ اُصُوْلَ الشَّرْعِ اَرْبَعَةٌ اَلْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالاجماعُ وَالْقِيَاسُ لِيَكُوْنَ تَنْبِيْهًا عَلٰى اَنَّ الْاُصُوْلَ الْاُوَلَ قَطْعِيَّةٌ وَالْقِيَاسُ ظَنِّيٌّ - وَهٰذَا بِاعْتِبَارِ الْاَغْلَبِ وَالاكْثَرِ وَاِلَّا فَالعَامُّ الْمَخْصُوْصُ مِنْهُ الْبَعْضُ وَخَبَرُ الْوَاحِدِ ظَنِّيٌّ وَالْقِيَاسُ بِعِلَّةٍ مَنْصُوْصَةٍ قَطْعِيٌّ وَلِاَنَّهُ لَمَّا قَالَ وَالاَصْلُ كَانَ رَدًّا عَلٰى مُنْكِرِى الْقِيَاسِ قَصْدًا وَصَرِيْحًا وَلَمَّا قَالَ الرَّابِعُ كَانَ دَالًّا عَلٰى اَنَّ مَرْتَبَتَهُ بَعْدَ الْاُصُوْلِ الثَّلٰثَةِ فَمَا دَامَ كَانَ الْحُكْمُ مَوْجُوْدًا فِىْ وَاحِدٍ مِّنَ الثَّلٰثَةِ لَمْ يَحْتَجْ اِلَى الْقِيَاسِ

অনুবাদ ॥ আল-মানার গ্রন্থকার মূলনীতিসমূহকে এ পদ্ধতিতে উপস্থাপন করেছেন অথচ তিনি এরূপ বলেন নি যে, শরীআতের মূলনীতিসমূহ চারটি। কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে রাসূল (স), ইজমা ও কিয়াস। যাতে এ বিষয়ের ওপর সতর্কীকরণ হয়ে যায় যে, প্রথমোক্ত তিনটি মূলনীতি قطعى বা অকাট্য দলিল, আর কিয়াস ظنى বা সন্দেহমূলক দলিল। আর এটা অর্থাৎ প্রথমোক্ত তিনটি মূলনীতি অকাট্য হওয়া এবং কিয়াস অকাট্য না হওয়া প্রাধান্য এবং আধিক্যের বিবেচনায় গৃহীত। নতুবা عام مخصوص منه البعض এবং خبر واحد হলো ظنى আর علة منصوصة এর ওপর ভিত্তি করে উদ্ভাবিত قياس হলো قطعى। মুসান্নিফ (র) কিয়াস প্রসঙ্গে الاصل। শব্দটি ব্যবহার দ্বারা ইচ্ছাকৃত ও সুস্পষ্টভাবে কিয়াস অস্বীকারকারীদের মতবাদের প্রত্যাখ্যান হয়ে গেলো। আর الرابع। শব্দ ব্যবহার দ্বারা বোঝা গেল যে, প্রথমোক্ত তিন মূলনীতির পরেই কিয়াসের স্থান। অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত মূলনীতিত্রয়ের যে কোন একটিতে হুকুম বিদ্যমান থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়াসের কোন প্রয়োজন হবে না।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله وَاِنَّمَا اَوْرَدَ بِهٰذَا الخ : নুরুল আনওয়ারের ব্যাখ্যাকার মোল্লা জুয়ুন (র) এই ইবারতের দ্বারা একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্ন : কিয়াস যেহেতু শরীআতের একটি আছল তথা মূল বুনিয়াদ। যেমন মুসান্নিফের ইবারত الاصل الرابع। القياس। দ্বারা প্রতিভাত হয়েছে। তাহলে লেখক উল্লেখিত উসূলসমূহের পদ্ধতিতে এটাকে উল্লেখ করেননি কেন? অর্থাৎ আগে ৩ উসূল উল্লেখ করে কিয়াসকে ভিন্ন উল্লেখ করার কারণ কি?

উত্তর : মুসান্নিফ (র) এর দ্বারা একথার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন যে, পূর্বোক্ত ৩ উসূল অর্থাৎ কিতাবুল্লাহ, সুন্নাহ ও ইজমা অকাট্য ও সুনিশ্চিত। আর চতুর্থ বিষয় অর্থাৎ কিয়াস অকাট্য ও সুনিশ্চিত নয় বরং জন্নী তথা সন্দেহজনক। কাজেই এ চারোটি একত্রে উল্লেখ করে শরয়ী উসূল ৪টি এভাবে বললে সবগুলো একই ধরনের বোঝার সম্ভাবনা ছিলো। অথচ ৪টি একই পর্যায়ের নয়। এ কারণে ভিন্ন পদ্ধতিতে উল্লেখ করেছেন।

قوله وَهٰذَا بِاعْتِبَارِ الْاَغْلَبِ الخ : মুসান্নিফ (র) বলেন যে, পূর্বোক্ত ৩টি বস্তু অকাট্য ও নিশ্চিত হওয়া আর কিয়াস সন্দেহজনক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এমন হয়ে থাকে। নতুবা যে আ'ম তথা ব্যাপকতা বোধক শব্দ থেকে কিছু সংখ্যক এককেকে খাছ করে নেয়া হয়। তা এবং খবরে ওয়াহেদ সন্দেহ জনক হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যে কিয়াসের ভিত্তি ইল্লতে মানসুসা এর উপর হয়। যেমন পূর্বে লাওয়াতাত এর ক্ষেত্রে বর্ণিত

হয়েছে। তা অকাট্য এবং একিনী বিষয় হয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রথম ৩টি উসূল সাধারণত একীনের ফায়দা দেয়। তবে কখনো কখনো এর বিপরীতও হতে পারে। পক্ষান্তরে কিয়াস সাধারণত একীনের ফায়দা দেয় না। বরং তার মধ্যে সন্দেহের অবকাশ থাকে। তবে কখনো কখনো এর বিপরীত একীনেরও ফায়েদা দেয়।

নুরুল আনওয়ারের টিকা লেখক নুরুল আনওয়ারের মুসান্নিফের কথাকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন– প্রথমোক্ত ৩ উসূলকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে একীনের ফায়দা দানকারী এবং কখনো কখনো সন্দেহ জনক সাব্যস্ত করা এবং কিয়াসকে স্বভাবত সন্দেহজনক হওয়া এবং কখনো কখনো একীনের ফায়দা দানকারী সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। বরং কিয়াস তার মূলনীতি অনুযায়ী সবসময়ই সন্দেহজনক থাকে। তবে ইল্লতে মানসুসার কারণে একীনের ফায়দা দেয়। আর প্রথমোক্ত ৩টি উসূল মৌলিকভাবে সবসময়ই একীনের ফায়দা দেয়। কিন্তু বিশেষ কারণের প্রেক্ষিতে সন্দেহজনকও হতে পারে। আর খবরে ওয়াহেদ এককভাবে বর্ণিত হওয়াটাই এর বিশেষ আরেয বা কারণ। অর্থাৎ এর ভিত্তিতেই তা সন্দেহজনক থাকে। অন্যথায় হাদীস মৌলিকভাবে অকাট্য ও একীনি বস্তু।

কিতাবুল্লাহর মধ্যে ব্যবহৃত আ'ম তথা ব্যাপকতা বোধক শব্দ থেকে কিছু একককে খাছ করাটা একটা আরেয। এ কারণে এই অবশিষ্ট অংশ জন্নী বা সন্দেহ জনক হয়ে যায়। অন্যথায় কিতাবুল্লাহর ব্যবহৃত আ'ম শব্দ মৌলিকভাবে অকাট্য ও একীনি।

দ্বিতীয় উত্তর : মাতিন (র) যখন ভিন্নভাবে والاصل বলেছেন। তখন তার এই বাচনভঙ্গি দ্বারা যারা কিয়াসকে অস্বীকার করেন অর্থাৎ কিয়াসকে শরীআতের দলিল মানেন না তাদের কথাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। মুসান্নিফ (র) যদি أُصُولُ الشَّرْعِ أَرْبَعَةٌ اَلْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ বলতেন তাহলে এর দ্বারা কিয়াস অস্বীকারকারীদের ধারণা বা মতবাদ স্পষ্টরূপে প্রত্যাখ্যান বোঝাতো না। একারণেই তিনি وَالْأَصْلُ الخ বলে সুস্পষ্টভাবে তাদের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

এরপর মুসান্নিফ (র) যখন الرابع উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয়েছে যে, কিয়াসের মর্যাদা পূর্বোক্ত ৩ উসূলের পরে। কারণ যতোক্ষণ পর্যন্ত পূর্বোক্ত ৩ উসূলের মাধ্যমে কোনো বিধান জানা যাবে ততোক্ষণ পর্যন্ত কিয়াসের শরণাপন্ন হওয়া বৈধ হবে না।

اصول اربعة তথা শরয়ী মৌলিক ৪ নীতিমালাকে উল্লেখিত পদ্ধতিতে বর্ণনা করার আরো দুটি কারণ :

১. পূর্বোক্ত ৩ উসূল শরয়ী বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করে কিন্তু কিয়াস কোনো বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। বরং তা বিধানকে সুস্পষ্ট করে মাত্র। অতএব প্রথমোক্ত ৩ উসূল ও কিয়াসের এ পার্থক্যের কারণে মুসান্নিফ (র) কিয়াসকে ভিন্ন করে উল্লেখ করেছেন।

২. পূর্বোক্ত ৩ উসূল শরীআতের কোনো বিধান প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে অন্য কোনো কিছুর মুক্ষাপেক্ষী নয়। পক্ষান্তরে কিয়াস পূর্বোক্ত ৩ উসূলের প্রতি মুখাপেক্ষী। একারণে কিয়াসকে اصول ثلثة থেকে ভিন্ন করে উল্লেখ করেছেন।

ثُمَّ لَا بَأْسَ اَنْ تَكُوْنَ هٰذِهِ الْاُصُوْلُ فُرُوْعًا لِشَيْءٍ اٰخَرَ لِاَنَّهَا كُلَّهَا اُصُوْلٌ بِالنِّسْبَةِ اِلَى الْحُكْمِ فَالْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ فَرْعٌ لِلتَّصْدِيْقِ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ وَالْاِجْمَاعُ فَرْعٌ لِلدَّاعِي وَالْقِيَاسُ فَرْعٌ لِلثَّلٰثَةِ ـ وَوَجْهُ الْحَصْرِ فِي هٰذِهِ الْاَرْبَعِ اَنَّ الْمُسْتَدِلَّ لَا يَخْلُوْا اِمَّا اَنْ يَّتَمَسَّكَ بِالْوَحْيِ اَوْ غَيْرِهِ وَالْوَحْيُ اِمَّا مَتْلُوٌّ وَهُوَ الْكِتَابُ اَوْ غَيْرُهُ وَهُوَ السُّنَّةُ وَغَيْرُ الْوَحْيِ اِنْ كَانَ قَوْلُ الْكُلِّ فَالْاِجْمَاعُ وَاِلَّا فَالْقِيَاسُ وَاَمَّا شَرَائِعُ مَنْ قَبْلَنَا فَمُلْحَقَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَتَعَامُلُ النَّاسِ مُلْحَقٌ بِالْاِجْمَاعِ وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ فِيْمَا يُعْقَلُ مُلْحَقٌ بِالْقِيَاسِ وَفِيْمَا لَا يُعْقَلُ مُلْحَقٌ بِالسُّنَّةِ وَالْاِسْتِحْسَانُ وَنَحْوُهُ مُلْحَقٌ بِالْقِيَاسِ ـ

অনুবাদ ॥ অতঃপর, এই মূলনীতিগুলো অন্য বস্তুর প্রাসঙ্গিক বিষয় হওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা, এগুলোর প্রত্যেকটি হুকুমের বিবেচনায় মূলনীতি হিসেবে গণ্য। অতএব, কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল (স) হলো আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের فرع বা প্রাসঙ্গিক বিষয়। আর ইজমা হলো داعى বা প্রয়োজনের فرع বা প্রাসঙ্গিক বিষয়। আর কিয়াস হলো মূলনীতিত্রয়ের فرع বা প্রাসঙ্গিক বিষয়।

(শরয়ী দলিলসমূহ) এই চারটি মূলনীতিতে সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ : দলিল গ্রহণকারী হয়তো وحى দ্বারা কিংবা غير الوحى দ্বারা দলিল উপস্থাপন করবেন। অতপর অহী হয়তো তিলাওয়াতযোগ্য (متلو) হবে। আর তা হলো কিতাবুল্লাহ। অথবা তিলাওয়াতযোগ্য হবে না, এটা হলো সুন্নতে রাসূল। আর গায়রে অহী যদি সকল মুজতাহিদের বক্তব্য হয়, তাহলে তা হলো ইজমা। অন্যথায় তার নাম হলো কিয়াস (যদি তা সকল মুজতাহিদের বক্তব্য না হয়।) আমাদের পূর্ববর্তী শরীআতসমূহ (যা আমাদের শরীআতে অনুমোদিত) কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলের অন্তর্ভুক্ত। মানবগোষ্ঠী পরম্পরায় প্রচলিত বিধানসমূহ ইজমার মধ্যে শামিল। আর সাহাবীদের যুক্তিসঙ্গত কথা কিয়াসের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু যদি তা যুক্তিসঙ্গত ও বোধগম্য না হয়, তবে তা সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত হবে। আর জনকল্যাণমূলক সিদ্ধান্ত ও তদসদৃশ অন্যান্য দলিলসমূহ কিয়াসের অন্তর্ভুক্ত।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله ثُمَّ لَا بَأْسَ اَنْ يَّكُوْنَ الخ : **এখান থেকে একটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।**

প্রশ্ন : কিতাবুল্লাহ, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের উপর উসূল শব্দ প্রয়োগ করা ঠিক নয়। কারণ এগুলোর প্রত্যেকটি অপর বস্তুর فرع বা শাখা। যেমন– কিতাব আল্লাহ তা'আলার فرع বা শাখা। কারণ আল্লাহর অস্তিত্ব ছাড়া তার গ্রন্থের অস্তিত্ব অসম্ভব। কাজেই আল্লাহ আসল এবং কিতাব তার فرع হলো। এভাবে সুন্নাহ রাসূলের فرع। অর্থাৎ রাসূল (স) এর অস্তিত্ব না হলে সুন্নাহ ও হাদীসের অস্তিত্ব হতো না। অতএব রাসূল, আসল এবং সুন্নাহ তার فرع হলো। ইজমা عِلَّتِ مُشْتَقَّة তথা বিশেষ কারণের فرع আর কিয়াস উপরোক্ত তিনোটির فرع। কাজেই এ ৪টি বস্তু যখন অন্য ৪টির فرع হলো কাজেই এগুলোর উপর উসূল শব্দ প্রয়োগ করা কিভাবে সঠিক হতে পারে?

উত্তর : اصل এবং فرع উভয়ই اضافى তথা আপেক্ষিক বিষয়। অর্থাৎ এক বস্তু এক দিক দিয়ে আসলও অপর দিক দিয়ে فرع হতে পারে। যেমন এক ব্যক্তি তার পুত্রের দিক দিয়ে আসল এবং তার পিতার দিক দিয়ে। فرع এভাবে اصول اربعة আহকামের দিক দিয়ে আসল এবং প্রশ্নে উল্লেখিত বস্তু চতুষ্টয়ের দিক দিয়ে فرع আর কোনো বস্তু এক দিক দিয়ে আসল ও অপর দিক দিয়ে فرع হওয়াতে কোনো দোষ নেই।

قوله ووجه الحصر فى هذه الخ : মুসান্নিফ (র) এই ইবারতে উল্লেখিত اصول اربعة এর মাঝে সীমিত হওয়ার কারণ বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন– দলিল পেশকারী ২ অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। হয়তো সে وحى দ্বারা দলিল পেশ করবে। অথবা غير وحى দ্বারা। وحى দ্বারা দলিল পেশ করলে তা দু অবস্থা থেকে খালি নয়। হয়তো وحى متلو হবে অথবা غير متلو হবে। যদি متلو হয় তাহলে তাকে কিতাবুল্লাহ বলে। আর غيرمتلو হলে তা সুন্নতে রাসূল হবে। আর যদি غير وحى দ্বারা দলিল পেশ করে তাহলে তা ২ অবস্থা থেকে খালি নয়। হয়তো তা এক কালের সকল মুজতাহিদের উক্তি হবে। অথবা সকল মুজতাহিদের উক্তি হবে না। প্রথমটি ইজমা, আর দ্বিতীয়টি কিয়াস।

قوله واما شرائع من قبلنا الخ : এ ইবারত দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দেয়া উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন : উসূলকে চারের মধ্যে সীমিত করা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ উল্লেখিত ৪ উসূল দ্বারা যেভাবে শরীআতের বিধান প্রমাণিত হয় তদ্রূপ পূর্বের শরীআত দ্বারাও প্রমাণিত হতে পারে। কাজেই ৪এর স্থলে উসূল ৫টি হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

পূর্বোক্ত শরীআতের উসূল তথা দলিল হওয়ার প্রমাণ : আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন وكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ অর্থাৎ আমি তাদের জন্য তাওরাতে লিখে দিয়েছি যে, জানের বদলায় জান, চোখের বদলায় চোখ, নাকের বদলায় নাক, কানের বদলায় কান, দাঁতের বদলায় দাঁত, এবং জখমের বদলায় সমপরিমাণ জখম। এই আয়াতে উল্লিখিত কিসাসের বিধান যেভাবে ইয়াহুদীদের উপর ওয়াজিব ছিলো তদ্রূপ আমাদের উপরও ওয়াজিব। কাজেই পূর্বের শরীআত দ্বারাও বিধান প্রমাণিত হতে পারে। অতএব উসূলকে ৪ এর মধ্যে সীমিত করা গ্রহণযোগ্য নয়।

উত্তর : আমাদের উপর পূর্বের শরীআত ঐ সময় অবধারিত হবে যখন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (স) তা দ্ব্যর্থহীনভাবে অস্বীকার ছাড়া বর্ণনা করবেন। যদি আল্লাহ এবং রাসূল (স) তা সেভাবে বর্ণনা না করেন। অথবা বর্ণনা করার পরে তা সুস্পষ্টভাবে অকার্যকর ঘোষণা দেন (যেমন তিনি বললেন لَاتَفْعَلُوْا مِثْلَ ذَالِكَ "(তোমরা এমনটি করো না)" অথবা বাক্যের বাচনভঙ্গী দ্বারা তা বর্জনীয় প্রকাশ পায়। যেমন কোনো বিধান বর্ণনার পরে বলা হলো এটা তাদের যুলুমের প্রতিফল। যেমন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِىْ ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَا اِلَّا مَاحَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَا اَوِ الْحَوَايَا وَ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ "আমি ইয়াহুদিদের উপর প্রত্যেক নখর বিশিষ্ট প্রাণী এবং গাভী, বকরির মধ্যে থেকে তাদের চর্বি হারাম করেছিলাম। তবে যা তাদের পিঠে অথবা ভূড়ির সাথে লেগে থাকবে অথবা যে চর্বি হাড়ের সাথে লেগে থাকবে। আমি এমনটি করেছিলাম তাদের অন্যায় আচরণের সাজা স্বরূপ"।

অতএব পূর্বের শরীআত আমাদের উপর অবধারিত নয়। আল্লাহ তা'আলা যখন স্বীয় গ্রন্থে তা বর্ণনা করবেন তখন তা কিতাবুল্লাহরই বিধান গণ্য হবে। এভাবে রাসূল (স) হাদীসের মধ্যে তাদের কোনো বিধান উল্লেখ করে তাকে সমর্থন করলে তা তাঁর সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত হবে। এভাবে পূর্বের শরীআত যখন কিতাবুল্লাহ বা সুন্নাতে রাসূল (স) এর সাথে সম্পৃক্ত হবে তখন তা ভিন্ন দলিল থাকবে না। অতএব শরয়ী দলিল ৪টি হওয়াই সীমিত হলো।

قوله وتعامل الناس الخ : এর দ্বারাও একটি প্রশ্নের উত্তর দেয়া উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন : উসূলকে ৪টির মধ্যে সীমিত করা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ পূর্বের চার উসূল দ্বারা যেভাবে বিধান প্রমাণিত হয়। তদ্রূপ তা تعامل الناس তথা ব্যাপকভাবে মানুষের আমলের কারণেও বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব শরীআতের দলিল ৪টির মধ্যে সীমিত না হয়ে ৫টি হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

উত্তর : تعامل الناس তথা ব্যাপকভাবে মানুষের আমল হওয়া এটা ইজমার অন্তর্ভুক্ত। যেমন– হেদায়া গ্রন্থকার বলেন– যদি কোনো ব্যক্তি মেয়াদ নির্ধারণ না করে বাকীতে কোনো জিনিস নির্মাণ করায় তাহলে ইস্তেহসান স্বরূপ তা

জায়েয হবে। এর দলিল হলো মানুষের ব্যাপকভিত্তিক আমল দ্বারা ইজমা প্রতিষ্ঠিত হওয়া। যদিও পণ্য অনুপস্থিত হওয়ার কারণে কিয়াসের ভিত্তিতে এ বেচাকেনা নাজায়েয। হেদায়া গ্রন্থকারের ভাষ্য দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, تعامل الناس ইজমার অন্তর্ভুক্ত। আর ইজমার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে তা ভিন্ন কোনো দলিলগণ্য হবে না। কাজেই শরয়ী উসূল ৪টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ হলো। সুতরাং উক্ত প্রশ্ন গ্রহণযোগ্য নয়।

قوله وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ الخ : **এটাও একটা প্রশ্নের উত্তর :** প্রশ্ন এই যে, উসূলকে চারের মধ্যে সীমিত করা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ শরয়ী বিধান যেভাবে উল্লেখিত উসূল চতুষ্টয়ের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। তদ্রূপ সাহাবীদের উক্তির দ্বারাও প্রমাণিত হয়। অতএব শরীআতের উসূল চারের স্থলে পাঁচটি হওয়াই শ্রেয়।

উত্তর : সাহাবীর উক্তি যদি কিয়াস ভিত্তিক হয় তাহলে তা কিয়াসের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর কিয়াসও যুক্তি ভিত্তিক না হলে তা সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ কোনো সাহাবী যদি যুক্তি ও কিয়াসের পরিপন্থী কোনো হুকুম বর্ণনা করেন তাহলে অবশ্যই বুঝতে হবে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (স) থেকে শুনেছেন। যদিও তাঁর উক্তিকে রাসূলুল্লাহ (স) এর প্রতি সম্বন্ধ করেননি। অতএব সাহাবীর উক্তি যখন কিয়াস বা সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত হলো। সুতরাং উসূলকে ৪এর মধ্যে সীমিত করা দুরস্ত হলো।

قوله وَالْاِسْتِحْسَانُ الخ : **প্রশ্ন :** উসূলকে ৪এর মধ্যে সীমিত করা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ استحسان দ্বারাও শরয়ী বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়। ইস্তেহ্সান বলে এমন কিয়াসে খফীকে যা সুস্পষ্ট কিয়াসের সাথে সাংঘর্ষিক। যেমন আমরা বললাম হিংস্র পাখির উচ্ছিষ্ট পানি পাক। অথচ কিয়াসে জলির দাবি এই যে, হিংস্র পাখির উচ্ছিষ্ট পানি নাপাক হোক। কেননা তার গোশত হারাম এবং নাপাক। আর লালা গোশত থেকেই সৃষ্টি হয়। অতএব হিংস্র পাখীর গোশত যেহেতু হারাম এবং নাপাক কাজেই তার উচ্ছিষ্টও হারাম এবং নাপাক হওয়া যুক্তিযুক্ত। যেমন হিংস্র পশুর গোশ্ত নাপাক হওয়ার কারণে তাদের উচ্ছিষ্ট নাপাক। অথচ কিয়াসে জলি পরিহার করে ইস্তেহসানস্বরূপ হিংস্র পাখির উচ্ছিষ্ট পানিকে পাক সাব্যস্ত করা হয়েছে।

এখানে استحسان তথা কিয়াসে খফীর দাবী এই যে, পাখিরা চঞ্চু দ্বারা ভক্ষণ করে থাকে। পাখিদের চঞ্চু যেহেতু হাড় বিশেষ। এ কারণে তা পাক। চাই পাখি জীবিত হোক বা মৃত। আর পবিত্র জিনিসের সাথে কোনো কিছুর মিশ্রণ ঘটলে তা নাপাক হয় না। কাজেই পানিও নাপাক হবে না। পক্ষান্তরে হিংস্র প্রাণীরা তাদের জিহ্বার সাহায্যে আহার গ্রহণ করে থাকে। এ কারণে নাপাক লালার সাথে পানি মিশ্রিত হওয়ার কারণে পানি নাপাক হয়ে যাবে। মোটকথা ইস্তেহসান (কিয়াসের খফী) একটি শরয়ী দলিল। কাজেই এখন শরিআতের দলিল ৫টি সাব্যস্ত হলো। সুতরাং উসূলকে চারটির মধ্যে সীমিত করা গ্রহণযোগ্য নয়।

উত্তর : استحسان প্রকৃত পক্ষে কিয়াসের অন্তর্ভুক্ত। এটা কিয়াসে খফীর অপর নাম। অতএব উসূল চারটির মধ্যে সীমিত হওয়াই সঠিক।

যদি বলা হয় যে, উসূলকে চারটির মধ্যে সীমিত করা ঠিক নয়। কারণ প্রবল ধারণা (ظن غالب), অনুসন্ধান (تحرى), সতর্কতা অবলম্বন এবং প্রয়োজন সাপেক্ষেও মাসআলা প্রমাণিত হয়।

এর জবাবে বলবো যে, প্রবল ধারণা تحرى তথা অনুসন্ধানের হুকুমে শামিল। এটা কিয়াসের অন্তর্ভুক্ত। এভাবে احتياط তথা সতর্কতা সুন্নাহর মধ্যে শামিল। কারণ রাসূলুল্লাহ (স) এরশাদ করেছেন دَعْ مَا يُرِيْبُكَ اِلَى مَا لَا يُرِيْبُكَ **অর্থাৎ সতর্কতাবশত সন্দেহজনক বস্তুকে পরিহার করে সন্দেহহীন বস্তুকে গ্রহণ কর। এভাবে** ضرورت **তথা মানবিক প্রয়োজন হলো কিতাবুল্লাহর অন্তর্গত। কারণ আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন** مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ **"ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো কষ্ট রাখা হয়নি"। অতএব এ সকল বিষয় যেহেতু উসূলে আরবাআ এর মধ্যে শামিল। কাজেই উসূল চারটির মধ্যে সীমিত হওয়াই সঠিক।**

ثُمَّ فَصَّلَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) الْاُصُوْلَ الْاَرْبَعَةَ فَقَدَّمَ الْكِتَابَ وَقَالَ اَمَّا الْكِتَابُ فَالْقُرْاٰنُ الْمُنَزَّلُ عَلَى الرَّسُوْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهٰذَا تَعْرِيْفٌ لِّكُلِّ الْكِتَابِ وَاللَّامُ فِيْهِ لِلْعَهْدِ وَالْمَعْهُوْدُ هُوَ الْكِتَابُ السَّابِقُ ذِكْرُهُ الَّذِىْ كَانَ مُضَافًا اِلَيْهِ لِلْبَعْضِ وَالْقُرْاٰنُ اِنْ كَانَ عِلْمًا كَمَا هُوَ الْمَشْهُوْرُ فَهُوَ تَعْرِيْفٌ لَفْظِىٌّ وَابْتِدَاءُ التَّعْرِيْفِ الْحَقِيْقِىِّ مِنْ قَوْلِهٖ الْمُنَزَّلُ اِلٰى اٰخِرِهٖ وَاِنْ كَانَ بِمَعْنَى الْمَقْرُوِّ اَوْ بِمَعْنَى الْمَقْرُوْنِ فَهُوَ جِنْسٌ لَهٗ وَمَا بَعْدَهٗ فَصْلٌ بِلَا تَكَلُّفٍ فَالْمُنَزَّلُ اِحْتِرَازٌ عَنِ الْكُتُبِ الْغَيْرِ السَّمَاوِيَّةِ وَقَوْلُهٗ عَلَى الرَّسُوْلِ اِحْتِرَازٌ عَنْ بَاقِى الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ وَالْمُنَزَّلُ يَجُوْزُ اَنْ يُّقْرَأَ بِالتَّخْفِيْفِ اَىِ الْمُنْزَلُ دَفْعَةً وَاحِدَةً لِاَنَّ الْقُرْاٰنَ نَزَلَ دَفْعَةً وَاحِدَةً مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا اَوَّلًا ثُمَّ نَزَلَ نَجْمًا نَجْمًا وَاٰيَةً اٰيَةً بِحَسْبِ الْمَصَالِحِ وَالْحَوَائِجِ اِلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَوْ لِاَنَّهٗ كَانَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَفْعَةً وَاحِدَةً فِىْ كُلِّ شَهْرِ رَمَضَانَ جُمْلَةً وَيَجُوْزُ اَنْ يُّقْرَأَ بِالتَّشْدِيْدِ لِاَنَّ نُزُوْلَهٗ فِى الْوَاقِعِ كَانَ بِدَفْعَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ فِىْ مُدَّةِ النُّبُوَّةِ ـ

অনুবাদ ॥ ***অতঃপর আল-মানার গ্রন্থকার চারটি মূলনীতির বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করেছেন এবং আল-কিতাবের আলোচনাকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন।*** তিনি বলেন, (সংজ্ঞা:) ***কিতাব হলো ঐ কুরআন মাজীদ, যা রাসূলুল্লাহ (স) এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে।*** এটা সকল আসমানী কিতাবের সংজ্ঞা বুঝায়। তবে الكتاب এর الف لام টি عَهْدِى-এর উদ্দিষ্ট কিতাব হলো পূর্বোল্লিখিত ঐ কিতাব (যা পূর্বের المُرادُ مِن الكتاب بَعْضُ الْكِتاب উক্তিতে) بعض শব্দের مضاف اليه ছিল। القران শব্দটি যদি علم বা নির্দিষ্ট বস্তুবাচক বিশেষ্য হয়, যেভাবে তা প্রসিদ্ধ, তাহলে এটি আল-কিতাবের শাব্দিক সংজ্ঞা হবে এবং حقيقى বা প্রকৃত সংজ্ঞার সূচনা হবে গ্রন্থকারের ভাষ্য المنزل শব্দ হতে শেষ তথা مُتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَةٍ পর্যন্ত। আর যদি القران শব্দটি مقرو (পঠিত) অথবা مقرون (যুক্ত) অর্থে হয়, তাহলে القران শব্দটি جنس বা জাতিবাচক শব্দ হবে এবং তৎপরবর্তী অংশ فصل বা পার্থক্য নির্দেশক বক্তব্য হবে।

সুতরাং المنزل শব্দের দ্বারা ঐসব কিতাব বাদ পড়ে গেছে, যেগুলো আসমানী কিতাব নয়। আর على الرسول দ্বারা কুরআন ছাড়া সকল আসমানী কিতাব বাদ পড়ে গেছে। المنزل শব্দটিকে তাখফীফ তথা সাকিনযোগে পড়া যায়। অর্থাৎ, একত্রে একবারে অবতীর্ণ গ্রন্থ। কেননা, প্রথমতঃ কুরআন মাজীদ লাওহে মাহফুয থেকে দুনিয়ার আকাশে সম্পূর্ণ কিতাব একেবারেই অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে চাহিদা ও প্রয়োজন অনুপাতে অল্প-অল্প করে আয়াত-আয়াত হিসেবে নাযিল হয়েছে। অথবা এজন্যে যে, প্রতি রমযান মাসে পূর্ণাঙ্গ কুরআন রাসূলুল্লাহ (স) এর নিকট একত্রে নাযিল হতো। المنزل শব্দটিকে তাশদীদযোগেও পড়া যায়। কেননা, প্রকৃতপক্ষে কুরআন নবুওয়াতের সময়কালে বহুবারে অল্প-অল্প করে নাযিল হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله ثُمَّ فَصَّلَ الْكِتَابَ الخ : মুসান্নিফ (র) বলেন- মাতিন (র) উসূলে আরবায়াকে সংক্ষেপে আলোচনার পরে ভিন্ন ভিন্নভাবে তার প্রত্যেকটির বিস্তারিত বর্ণনা দিচ্ছেন। কিতাবুল্লাহ যেহেতু সকল উসূলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এ কারণেই এর সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিকে সর্বাগ্রে উল্লেখ করেছেন।

কিতাবুল্লাহর সংজ্ঞা : মাতিন (র) এর ভাষায় কিতাব ঐ কুরআন মজীদের নাম যাকে রাসূলুল্লাহ (স) এর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে। বিভিন্ন কপি আকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ (স) থেকে কোনো প্রকার সন্দেহ ছাড়াই বহুসংখ্যক সাহাবী থেকে বর্ণিত রয়েছে।

قوله وَهٰذَا تَعْرِيْفٌ لِكُلِّ الخ : দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দেয়া উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন : معرف তথা যে বিষয়ের সংজ্ঞা উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ কোরআন মজিদ তার মধ্য থেকে বিশেষ একটি অংশ অর্থাৎ ৫০০ আয়াত এখানে উদ্দেশ্য। কারণ উসূলে আরবায়ার মধ্য থেকে এ অংশটিই ধর্তব্য। পূর্ণ কোরআন ধর্তব্য নয়। অথচ এখানে সংজ্ঞাটি পূর্ণাঙ্গ কিতাবুল্লাহ বোঝাচ্ছে। অতএব উল্লেখিত সংজ্ঞাটি কোরআনের সকল অংশ বোঝানোর কারণে তা مَانِعٌ عَنْ دُخُولِ الْغَيْرِ তথা অন্য বস্তু প্রবিষ্ট হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়। অথচ সংজ্ঞা পূর্ণাঙ্গ হওয়ার জন্য তার সকল একককে বেষ্টনকারী এবং অন্যদেরকে তার মধ্যে শামিল করা থেকে প্রতিবন্ধক হওয়া আবশ্যক। যাকে আরবিতে جَامِعٌ لِلْأَفْرَادِ وَمَانِعٌ عَنْ دُخُولِ الْغَيْرِ বলে। অতএব সংজ্ঞাটি যথোপযুক্ত হয়নি।

উত্তর : এখানে পূর্ণাঙ্গ কিতাবুল্লাহর সংজ্ঞা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এর মধ্যে الكتاب এর আলিফ লামটি আহদে খারীজি। এর দ্বারা কিতাবুল্লাহর বিশেষ অংশ উদ্দেশ্য।

যেমন পূর্বে بعض শব্দের মুযাফ ইলায়হি বানিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, أُصُوْلُ الشَّرْعِ ثَلٰثَةٌ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْمُرَادُ بِالْكِتَابِ بَعْضُ الْكِتَابِ وَهُوَ مِقْدَارُ خَمْسِمِائَةِ اٰيَةٍ অতএব এখানে সংজ্ঞার মধ্যে আলিফ লাম দ্বারা بعض الكتاب এর দিকে ইঙ্গিত বোঝায়। কাজেই এখন কোরআনে উল্লেখিত বিভিন্ন কাহিনী ও দৃষ্টান্তসমূহ সংজ্ঞার মধ্যে শামিল হবে না। সুতরাং সংজ্ঞা যথোপযুক্ত প্রমাণিত হলো।

ব্যাখ্যাকার বলেন–القران শব্দের মধ্যে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। ১. القران কিতাবুল্লাহর علم বা নাম। ২. القران শব্দটি মাসদার। প্রথম সম্ভাবনার ক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আল কোরআন যদি علم বা নাম হয় তাহলে শব্দটি অতিরিক্ত আলিফ-নুন সংযোজন হওয়ার কারণে এবং নামবাচক হওয়ার কারণে গায়রে মুনসারিফ হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেমন عثمان শব্দটি গায়রে মুনসারিফ। অথচ এই শব্দটি সর্বসম্মতিক্রমে মুনসারিফ।

উত্তর : القران শব্দটি ইসমে জিনস্। তবে আলিফ-লামের মাধ্যমে এটা علم হয়েছে। যেমন النجم শব্দটি ইসমে জিনস হওয়া সত্ত্বে আলিফ-লামের মাধ্যমে علم হয়ে গেছে। সুতরাং القران শব্দ যেহেতু ইসমে জিনস্। কাজেই তা গায়রে মুনসারিফ হবে না। মোটকথা যদি قران শব্দকে علم সাব্যস্ত করা হয় যেমন- প্রসিদ্ধ রয়েছে। তাহলে القران এর মাধ্যমে কিতাবুল্লাহর সংজ্ঞায়ন শাব্দিক সংজ্ঞায়ন হবে। আর اَلْمُنَزَّلُ عَلَى الرَّسُوْلِ দ্বারা প্রকৃত সংজ্ঞা শুরু হবে।

تعريف لفظى তথা শাব্দিক সংজ্ঞা বলতে কোনো অপ্রসিদ্ধ শব্দকে প্রসিদ্ধ শব্দ দ্বারা প্রকাশ করাকে বলে। যেমন غضنفر শব্দকে اسد দ্বারা প্রকাশ করা।

দ্বিতীয় সম্ভাবনার ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন হতে পারে যে, القران শব্দটি مُعَرِّف তথা সংজ্ঞা জ্ঞাপক। আর الكتاب শব্দটি مُعَرَّف আর مُعَرَّف.مُعَرِّف এর উপর প্রযোজ্য হয়। অতএব القران মাসদারটি الكتاب এর উপর প্রযোজ্য হওয়া আবশ্যিক হয়। অথচ তা জায়েয নয়।

উত্তর : এর উত্তর এই যে, এখানে আল কোরআন মাসদারটি ইসমে মাফউলের অর্থে। আর এমনটি সচরাচর হয়ে থাকে। যেমন الكتاب শব্দটি مكتوب অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং আল কোরআন মাসদারটি ইসমে মাফউলের অর্থে। অতএব القران শব্দটির উপর মাসদার প্রযোজ্য হওয়া আবশ্যিক হয় না।

এখন একটি কথা এই যে, القران শব্দের ইসমে মাফউল কি হতে পারে? এক্ষেত্রে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। ১. قران শব্দটি মাহমূয হবে অথবা মাহমুয হবে না। মাহমুয হলে এটা قرء يقرء (পড়া) এর মাসদার হবে। তখন مقروء ইসমে মাফউলের অর্থে হবে। আর যদি মাহমুয না হয় তাহলে قرن يقرن (মিলিত হওয়া) এর মাসদার হবে। তখন এটা مقرون ইসমে মাফউলের অর্থে হবে। প্রথম ক্ষেত্রে নামকরণের রহস্য এই যে, কোরআন যেহেতু বারবার পঠিত হয়। এ কারণে তাকে কোরআন নামে নামকরণ রকা হয়েছে। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এ নামে নামকরণের রহস্য এই যে, পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহ যেহেতু একটি অপরটির সাথে মিলিত। এ কারণে তাকে কোরআন বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَهُوَ جِنْسٌ لَهُ الخ : নুরুল আনওয়ার গ্রন্থকার এর দ্বারা সংজ্ঞার فوائد قيود বর্ণনা করেছেন। فوائد قيود দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, সংজ্ঞা جنس ও فصل সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। জিনসের মধ্যে যার সংজ্ঞা বর্ণনা করা হয় তা এবং সে জাতীয় অন্যান্য বস্তু শামিল থাকে। আর فصل বিশেষ করে যার সংজ্ঞা বর্ণনা করা হয় তাকে অন্যান্য থেকে পৃথক করে স্পষ্ট করে দেয়। সুতরাং সংজ্ঞায় উল্লেখিত القران শব্দটি জিনসের পর্যায়ে। কারণ পঠিত সকল কিছুকেই আল কোরআন শব্দে শামিল করে। পরবর্তীতে المنزل শব্দ হলো প্রথম ফসল। এর দ্বারা যেসব কিতাব আসমানী নয়। সেসব খারিজ হয়ে গেলো। على الرسول দ্বারা কোরআন ছাড়া অন্যান্য সকল আসমানী কিতাব খারিজ হয়ে গেলো।

মোল্লা জিয়ন (র) বলেন– المنزل শব্দের ز বর্ণটি তাশদীদ সহকারে বা তাশদীদ বিহীন উভয়রূপে পড়া যায়। তাশদীদ না হলে الانزال মাসদার থেকে উৎপত্তি হবে। আর তাশদীদ হলে التنزيل (একের পর এক অবতীর্ণ করা) থেকে গৃহীত হবে। তাশদীদ বিহীন পড়লে তার কারণ হবে এই যে, পবিত্র কোরআনকে লৌহে মাহফুজ থেকে দুনিয়ার আসমানে একবারই একই সঙ্গে অবতীর্ণ করা হয়েছে। আর তাশদীসহকারে পড়লে তার কারণ এই যে, পূর্ণ বছরে যে পরিমাণ কোরআন শরীফ অবতীর্ণ হতো রমযান মাসে নতুনভাবে একই সঙ্গে সম্পূর্ণটি অবতীর্ণ করা হতো। তাশদীদ সহকারে পড়লে তার বিশেষ কারণ এই যে, পবিত্র কোরআন মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনাদি সাপেক্ষে অল্প অল্প করে বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ করা হয়েছে। মোটকথা উভয়রূপে এটাকে পড়া যায়।

اَلْمَكْتُوْبُ فِى الْمَصَاحِفِ صِفَةٌ ثَانِيَةٌ لِلْقُرْاٰنِ وَمَعْنَى الْمَكْتُوبِ الْمُثْبَتُ لِاَنَّ الْمَكْتُوْبَ فِى الْحَقِيْقَةِ هُوَ النُّقُوْشُ دُوْنَ اللَّفْظِ وَالْمَعْنٰى وَاِنَّمَا هُمَا مُثْبَتَانِ فِى الْمَصَاحِفِ فَاللَّفْظُ مُثْبَتٌ حَقِيْقَةً وَالْمَعْنٰى مُثْبَتٌ تَقْدِيْرًا وَاللَّامُ فِى الْمَصَاحِفِ لِلْجِنْسِ وَلَا يَضُرُّ تَعْمِيْمُهُ لِغَيْرِ الْقُرْاٰنِ لِاَنَّ الْقَيْدَ الْاَخِيْرَ يُخْرِجُهُ اَوْ لِلْعَهْدِ وَالْمَعْهُوْدُ هُوَ مَصَاحِفُ الْقُرَّاءِ السَّبْعَةِ وَهُوَ مُتَعَارَفٌ بَيْنَ النَّاسِ لَا يَحْتَاجُ اِلٰى اَنْ يُّعَرَّفَ فَيُقَالَ هُوَ مَاكُتِبَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ حَتّٰى يَلْزَمَ الدَّوْرُ وَيُحْتَرَزُ بِهٰذَا الْقَيْدِ عَمَّا نُسِخَتْ تِلَاوَتُهُ دُوْنَ حُكْمِهٖ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى "اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ" وَعَنْ قِرَاءَةِ اُبَيٍّ وَنَحْوِهٖ مِمَّا لَمْ يُكْتَبْ فِى الْمَصَاحِفِ السَّبْعَةِ -

---

অনুবাদ ॥ *"এবং যা পাণ্ডুলিপিসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে"।* المكتوب হলো القران শব্দের দ্বিতীয় সিফাত। এর অর্থ হলো المثبت বা প্রতিষ্ঠিত বস্তু। কেননা مكتوب বলতে বাস্তবে বর্ণ প্রতীকসমূহকে বুঝায়, শব্দ ও অর্থকে নয়। আর শব্দ ও অর্থ সহীফাসমূহে বর্ণ প্রতীকের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। সুতরাং শব্দ প্রকৃতই প্রতিষ্ঠিত। আর অর্থ উহ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত।

المصاحف শব্দের الف لام টি جنس এর জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটি কুরআন ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থগুলোকে ব্যাপকভাবে শামিল করাতে কোন ক্ষতি নেই। কারণ শেষোক্ত শর্তটি (المنقول عنه) গায়রে কুরআনকে সংজ্ঞা থেকে বের করে দেয়। অথবা المصاحف এর الف لام টি عهدى তথা নির্দিষ্ট বস্তু বুঝাবার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। এমতাবস্থায় উদ্দেশ্যকৃত বস্তু হচ্ছে সপ্ত কারীর সহীফাসমূহ। সেগুলো মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধ বিধায় সংজ্ঞাদানের কোন প্রয়োজন নেই। সংজ্ঞা দিলে বলতে হবে, সহীফা ঐ বস্তু যাতে কুরআন লিপিবদ্ধ রয়েছে। এতে دور বা পরিক্রমা অনিবার্য হওয়ায়। এ শর্ত (المكتوب فى المصاحف) দ্বারা ঐ সব আয়াতকে কুরআন হতে খারিজ করা হয়েছে, যেগুলোর তিলাওয়াত রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু বিধান বলবৎ রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী- اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা নারী ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তোমরা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত শাস্তি হিসেবে উভয়কে রজম প্রদান কর। আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী ও কুশলী।) অনুরূপভাবে এ قى দ্বারা হযরত উবাই (রা)-এর কিরাত এবং তার অনুরূপ অন্যান্য কিরাত যা সপ্ত সহিফায় লিপিবদ্ধ হয়নি, সেগুলোও কুরআন থেকে বাদ পড়ে গেলো।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قَوْلُهٗ اَلْمَكْتُوْبُ فِى الْمَصَاحِفِ : নূরুল আনওয়ারের মুসান্নিফ (র) বলেন- اَلْمَكْتُوْبُ فِى الْمَصَاحِفِ ভাষ্যটি কোরআন শব্দের দ্বিতীয় সিফাত। وَمَعْنَى الْمَكْتُوْبِ الْمُثْبَتُ দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে।

প্রশ্ন : কোরআন হলো শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টির নাম। যেমন সামনের ইবারত وهو اسم للنظم والمعنى جميعا দ্বারা প্রতিভাত হয়। আর একথাটি স্বীকৃত যে, লিখিত বস্তু শব্দও নয় অর্থও নয়। বরং তা চিত্র বা নকশা

মাত্র। কারণ শব্দের সম্পর্ক জবানের সাথে। আর অর্থের সম্পর্ক অন্তরের সাথে; কেবল শব্দের নকশা লিপিবদ্ধ হয়। অতএব কোরআন যেহেতু শব্দ ও অর্থ উভয়ের নাম। আর তার কোনটি লিখিত হওয়া সম্ভব নয়। অতএব সংজ্ঞার মধ্যে اَلْمَكْتُوْبُ فِى الْمَصَاحِفِ। উল্লেখ করা সঠিক নয়।

উত্তর : المكتوب। শব্দটি المثبت। তথা প্রমাণিত বা সাব্যস্ত হওয়ার অর্থে। এখন অনুবাদ এই হবে যে, কোরআন মাসাহিফ তথা বিভিন্ন কপির মধ্যে সংরক্ষিত হওয়া প্রমাণিত। আর একথা স্বীকৃত যে, শব্দ ও অর্থ যদিও লিখিত হয় না বরং তা মাসাহিফের মধ্যে সংরক্ষিত থাকে। তবে এতোটুকু পার্থক্য রয়েছে যে, শব্দটি প্রকৃতপক্ষে সাব্যস্তকৃত হয়। আর অর্থ পরোক্ষভাবে সাব্যস্ত হয়। কারণ যে চিত্র লিখিত হয় তা কোনো মাধ্যমবিহীন শব্দ বোঝায়। আর শব্দের মাধ্যমেই অর্থ বোঝায়। অতএব শব্দ যা নকশার অধিক নিকটবর্তী। প্রকৃতপক্ষে সেটাই مثبت তথা সাব্যস্ত বিষয় হবে। আর অর্থ যেহেতু নকশা থেকে দূরে। কাজেই তা পরোক্ষভাবে সাব্যস্ত হবে।

গ্রন্থকার বলেন– الْمَصَاحِف। শব্দের আলিফ-লামটি হয়তো জিনসের জন্য কিংবা আহদে খারিজির জন্য। প্রথম ক্ষেত্রে الْمَصَاحِف। শব্দটি কোরআন এবং গায়রে কোরআন সবকিছুকেই শামিল করে। এক্ষেত্রে সংজ্ঞাটি دخول غير বা অন্যবস্তু তার মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া থেকে প্রতিবন্ধক হয় না। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে دور তথা পরিক্রমা অবধারিত হয়। তা এভাবে যে, কোরআনের সংজ্ঞায় আল মাসাহিফ শব্দ উল্লেখ রয়েছে। অতএব কোরআন হওয়া মাসাহিফের উপর মওকুফ। আর যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে, মাসাহিফ কি? তাহলে উত্তরে বলা হবে যে, مَاكُتِبَ فِى الْقُرْاٰنِ অর্থাৎ যা কোরআনে লেখা থাকে। সুতরাং মাসাহিফের সংজ্ঞায় যেহেতু কোরআন উল্লেখ রয়েছে। এ কারণে মাসাহিফ কোরআনের উপর মওকুফ থাকবে। মোটকথা একটি অপরটির উপর মওকুফ থাকা বাঞ্ছনীয় হয়। আর পরিভাষায় এটাকে দাওর বলে।

উত্তর : আলিফ-লামকে جنسى উদ্দেশ্য নেয়ার ক্ষেত্রে المصاحف। গায়রে কোরআনকে শামিল করা কোনো ক্ষতিকর নয়। কারণ সামনে উল্লেখিত اَلْمَنْقُوْلُ عَنْهُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا। গায়রে কোরআনকে কোরআন হওয়া থেকে খারিজ করে দিয়েছে। আর আলিফ-লামকে যদি আলিফ-লামে আহদে খারিজি উদ্দেশ্য নেয়া হয়। তাহলে মাসাহিফ দ্বারা প্রসিদ্ধ ৭ ক্বারী– ১. নাফে মাদানী, ২. ইবনে কাছির আব্দুল্লাহ মক্কী, ৩. আবু আমর বসরী, ৪. ইবনে আমের দামেস্কী, ৫. আছিম কূফী, ৬. হামযা কূফী ও ৭. কাছায়ী আলী কূফী (রহেমাহুমুল্লাহ) এর মাসাহিফ উদ্দেশ্য হবে। তাদের মাসাহিফ যেহেতু সুপ্রসিদ্ধ। অতএব তা সংজ্ঞার মুখাপেক্ষী হবে না। আর সংজ্ঞার মুখাপেক্ষী না হওয়ার কারণে তার মধ্যে দাওর বা পরিক্রমা অবধারিত হবে না। কেননা ঐ সময় দাওর অনিবার্য হয় যখন ماكتب فى القران। দ্বারা মাসাহিফের সংজ্ঞা বর্ণনা করা হয়।

قوله اَلْمَكْتُوْبُ فِى الْمَصَاحِفِ : এর দ্বারা মুসান্নিফ (র) এ قيد উল্লেখের ফায়দা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন– এর দ্বারা সে সকল আয়াত কোরআন হওয়া থেকে খারিজ হয়ে গেছে যেগুলোর তেলাওয়াত মানসূখ হয়েছে কিন্তু তার হুকুম মানসূখ হয়নি। যেমন الشيخ والشيخة الخ। কেননা এ আয়াত বর্তমান কোরআনে লিখিত নেই। এভাবে রমযানের কাযা প্রসঙ্গে হযরত উবায় (রা) এর কেরাত فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ এর মধ্যে এবং কছমের কাফফারায় আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এর কেরাত فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ এর মধ্যে مُتَتَابِعَات শব্দটি মাসাহিফে লিখিত নেই। অতএব متتابعات শব্দটি কোরআন হওয়া থেকে খারিজ হয়ে যাবে।

اَلْمَنْقُوْلُ عَنْهُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَةٍ صِفَةٌ ثَالِثَةٌ لِلْقُرَانِ اَيِ الْمَنْقُولُ عَنِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَةٍ فِي نَقْلِهِ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ مُتَوَاتِرًا عَمَّا نُقِلَ بِطَرِيْقِ الْاَحَادِ كَقِرَاءَةِ اُبَيٍّ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ وَعَمَّا نُقِلَ بِطَرِيْقِ الشُّهْرَةِ كَقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ فِيْ حَدِّ السَّرِقَةِ فَاقْطَعُوْا اَيْمَانَهُمَا وَفِيْ كَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ وَقَوْلُهُ بِلَا شُبْهَةٍ تَاكِيْدٌ عَلٰى مَذْهَبِ الْجُمْهُوْرِ لِاَنَّ كُلَّ مَا يَكُوْنُ مُتَوَاتِرًا يَكُوْنُ بِلَا شُبْهَةٍ

অনুবাদ ॥ (কুরআন ঐ কিতাব) *যা রাসূল (স) থেকে সন্দেহাতীতভাবে ধারাবাহিক বর্ণিত হয়েছে।* এটা القران শব্দের তৃতীয় সিফাত। অর্থাৎ, যা রাসূলুল্লাহ (স) থেকে কোনরূপ সন্দেহ ব্যতীত ধারাবাহিক বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থকারের উক্তি متواترا দ্বারা খবরে ওয়াহিদরূপে বর্ণিত আয়াতগুলো কুরআন থেকে বাদ পড়ে গেছে। যেমন- রমযানের রোযা কাযা করার ব্যাপারে হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা)-এর কিরায়াত "فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ" তদ্রূপ যে সমস্ত আয়াত مشهور পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোও বাদ পড়ে গেছে। যেমন- চুরির শাস্তির ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এর কিরাত فَاقْطَعُوْا اَيْمَانَهُمَا এবং শপথের কাফ্ফারার ব্যাপারে فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ ইত্যাদি।

জুমহুর তথা সংখ্যা গরিষ্ঠ আলিমগণের মত অনুযায়ী গ্রন্থকারের উক্তি بلاشبهة পদটি تاكيد হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, যে সব বর্ণনা মুতাওয়াতির পর্যায়ের সেগুলো সন্দেহমুক্ত হয়ে থাকে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله اَلْمَنْقُوْلُ عَنْهُ الخ : এটা কোরআনের তৃতীয় সিফাত অর্থাৎ কোরআন এমন বাণীকে বলা হয় যা রাসূলুল্লাহ (স) থেকে অসংখ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। মুতাওয়াতির বলে যে কোনো বিষয়ের বর্ণনাকারী প্রত্যেক যুগে এতো বিপুল সংখ্যক হয় যে, স্বভাবতই এতো বিপুল পরিমাণ ব্যক্তিকে একটি মিথ্যা বিষয়ের প্রতি একমত হওয়া বিবেকের কাছে অসম্ভব মনে হয়।

খবরে ওয়াহিদ : যে বর্ণনার মধ্যে মুতাওয়াতির হওয়ার শর্ত পাওয়া না যায়।

খবরে মাশহুর : যে বিষয়ের বর্ণনাকারী প্রথম যুগের পরে মুতাওয়াতিরের পর্যায়ের চলে আসে। খবরে মাশহুর দ্বারা কিতাবুল্লাহর উপর অতিরঞ্জন (হুকুম বৃদ্ধি) করা জায়েয। কিন্তু খবরে ওয়াহিদ দ্বারা অতিরঞ্জন জায়েয নয়। মোটকথা মানার গ্রন্থকার সংজ্ঞার মধ্যে মুতাওয়াতির শব্দ উল্লেখ করে সেসকল আয়াতকে কোরআন হওয়া থেকে খারিজ করে দিয়েছেন যা খবরে ওয়াহিদের পর্যায়ে বর্ণিত। যেমন— রমযানের কাযার ক্ষেত্রে হযরত উবায় (রা) এর কেরাত فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ এর মধ্যে مُتَتَابِعَات শব্দটি তার একক সূত্রে বর্ণিত। এভাবে খবরে মাশহুর সূত্রে বর্ণিত অংশও খারিজ হয়ে যায়। যেমন চুরির দণ্ড প্রসঙ্গে ইবনে মাসউদ (রা)এর কেরাত فَاقْطَعُوْا اَيْمَانَهُمَا এর মধ্যে اَيْمَانَهُمَا শব্দ এবং কছমের কাফফারার ক্ষেত্রে فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ এর মধ্যে مُتَتَابِعَاتٍ শব্দটি মাশহুর সনদ সূত্রে বর্ণিত। এ কারণে তা কোরআন হওয়া থেকে খারিজ হয়ে গেলো।

ব্যাখ্যাকার মোল্লা জুয়ূন (র) বলেন— মাতিনের উক্তি নিঃসন্দেহে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমগণের মাযহাব অনুযায়ী نَقْلًا مُتَوَاتِرًا এর গুরুত্বরোপ স্বরূপ। কারণ যে বস্তু মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয় তার মধ্যে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।

وعِنْدَ الخَصَّافِ هُوَ إِحْتِرَازٌ عَنِ المَشْهُوْرِ لِأَنَّ المَشْهُوْرَ عِنْدَهُ قِسْمٌ مِّنَ المُتَوَاتِرِ لٰكِنَّ مَعَ شُبْهَةٍ وَهٰذَا كُلُّهُ عَلٰى تَقْدِيْرِ اَنْ يَّكُوْنَ اللَّامُ فِى المَصَاحِفِ لِلْجِنْسِ وَاَمَّا اِذَا كَانَ لِلْعَهْدِ فَتَخْرُجُ القِرَاءَةُ الغَيْرُ المُتَوَاتِرَةُ كُلُّهَا بِقَوْلِهِ فِى المَصَاحِفِ وَيَكُوْنُ قَوْلُهُ المَنْقُوْلُ عَنْهُ اِلٰى اٰخِرِهِ بَيَانًا لِلْوَاقِعِ وَقِيْلَ قَوْلُهُ بِلَا شُبْهَةٍ اِحْتِرَازٌ عَنِ التَّسْمِيَةِ لِاَنَّ فِيْهَا شُبْهَةٌ وَلِذَا لَمْ يُكَفَّرْ جَاحِدُهَا وَلَمْ يَجُزِ الْاِكْتِفَاءُ بِهَا فِي الصَّلٰوةِ وَلَمْ تَحْرُمْ تِلَاوَتُهَا لِلْجُنُبِ وَالحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْاَصَحُّ اَنَّهَا مِنَ الْقُرْاٰنِ وَاِنَّمَا لَمْ يُكَفَّرْ جَاحِدُهَا لِوُجُوْدِ الشُّبْهَةِ وَاِنَّمَا لَمْ يَجُزِ الْاِكْتِفَاءُ بِهَا فِى الصَّلٰوةِ لِعَدَمِ كَوْنِهَا اٰيَةً تَامَّةً عِنْدَ البَعْضِ وَاِنَّمَا يَجُوْزُ التِّلَاوَةُ لِلْجُنُبِ وَاُخْتَيْهِ لِقَصْدِ التَّبَرُّكِ لَا بِقَصْدِ التِّلَاوَةِ ـ

অনুবাদ॥ ইমাম খাসসাফ (র)-এর মতে, গ্রন্থকারের উক্তি بلا شبهة দ্বারা মাশ্‌হুর কিরাআতকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। কারণ তাঁর মতে, মাশ্‌হুর কিরাআত متواتر এর এক প্রকার বিশেষ; তবে তাতে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

এ ব্যাখ্যাসমূহ (غير متواتر কিরাআতসমূহের খারিজ করণ) ঐ পরিপ্রেক্ষিতে হবে, যখন المصاحف এর এর الف لام টি جنس হবে। আর الف لام টি عهد এর জন্যে হলে গ্রন্থকারের উক্তি فى المصاحف দ্বারা غير متواتر কিরাআতসমূহ কুরআন থেকে বের হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় গ্রন্থকারের উক্তি المَنْقُوْلُ عنه হতে শেষ পর্যন্ত বাস্তবের বর্ণনারূপে গণ্য হবে। কেউ কেউ বলেন, গ্রন্থকারের উক্তি بلا شُبْهَةٍ দ্বারা বিসমিল্লাহ কুরআনের আয়াত হওয়া থেকে বের হয়ে গেছে। কেননা, বিসমিল্লাহ কুরআনের অংশ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। এজন্যে এর অস্বীকারীকে কাফির বলা যাবে না এবং নামাযে তাসমিয়ার ওপর কিরাআত সীমিত করা বৈধ হবে না। আর এর তিলাওয়াত জুনুবী ব্যক্তি ও হায়েয- নিফাস বিশিষ্ট নারীদের জন্যে হারাম নয়।

বিশুদ্ধতম মত এই যে, তাসমিয়া কুরআনেরই অংশ। তবে সন্দেহ থাকার কারণে এর অস্বীকারকারীকে কাফির বলা হয় না। আর পূর্ণাঙ্গ একটি আয়াত না হওয়ার কারণে নামাযে তার ওপর কিরাআত সীমিত করা জায়েয নয়। কারো কারো মতে, জুনুবী ব্যক্তি ও তার দু'বোন তথা হায়েয-নিফাস বিশিষ্ট নারীদের জন্যে বরকত লাভের উদ্দেশ্যে (দোয়া স্বরূপ) এর তিলাওয়াত জায়েয, তবে তিলাওয়াতের নিয়তে জায়েয নয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ খাস্‌সাফ (র) বলেন- بلا شُبْهَةٍ দ্বারা খবরে মাশহুর কোরআন হওয়া থেকে খারিজ হয়ে যায়। তার মতে খবরে মাশহুর মুতাওয়াতিরের একটি প্রকার। তবে এর মধ্যে সন্দেহের অবকাশ থাকে। আর মুতাওয়াতিরের মধ্যে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এই কারণেই بلا شُبْهَةٍ উল্লেখ করেছেন।

ব্যাখ্যাকার বলেন- نَقْلًا مُتَوَاتِرًا দ্বারা যেসব কেরাত মুতাওয়াতির নয় তা ঐ সময়ই খারিজ হবে যখন المصاحف শব্দের আলিফ-লামটি جنسى হবে। عهد خارجى হলে এবং মাসাহিফ দ্বারা প্রসিদ্ধ ৭ কারীর মাসাহিফ উদ্দেশ্য হলে গায়রে মুতাওয়াতির কেরাতসমূহ আল মাসাহিফ দ্বারা খারিজ হয়ে যাবে। কারণ সেগুলো ৭ ক্বারীর

মাসাহিফে লিখিত নেই। সুতরাং আলিফ-লাম আহদে খারিজী হওয়ার ক্ষেত্রে যখন গায়রে মুতাওয়াতির কেরাতসমূহ আল মাসাহিফ দ্বারা খারেজ হয়ে গেলো তখন المنقول عنه الخ। কয়েদটি احترازى। (খারেজকারী) হবে না। বরং তা اتفاقى। তথা প্রসঙ্গত ধর্তব্য হবে।

কোনো কোনো আলিম বলেন– মাতিন (র) এর উক্তি بلا شبهة দ্বারা বিস্‌মিল্লাহ কোরআন হওয়া থেকে খারিজ হয়ে গেছে। কারণ বিস্‌মিল্লাহ কোরআনের অংশ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। এ কারণে কেউ যদি বিস্‌মিল্লাহ কোরআনের অংশ হওয়াকে অস্বীকার করে তাহলে সে কাফির হয় না। অথচ কোরআন অস্বীকারকারী কাফের বিবেচিত হয়। এভাবে নামাযের মধ্যে শুধু বিস্‌মিল্লাহ যথেষ্ট নয়। অথচ আমাদের মতে কোরআনের যে কোনো একটি আয়াতের উপর ক্ষান্ত করা ফরয আদায় হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এর দ্বারাও বোঝা যায় যে, বিস্‌মিল্লাহ কোরআনের অংশ নয়। এভাবে জানাবাত, হায়েয ও নেফাস অবস্থায় বিস্‌মিল্লাহ পড়া জায়েয। অথচ তাদের জন্য কোরআন পড়া জায়েয নয়। এর দ্বারাও বিস্‌মিল্লাহ কোরআনের অংশ হওয়া থেকে খারিজ হয়ে যায়।

নুরুল আনওয়ার গ্রন্থকার বলেন– সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত এই যে, বিসমিল্লাহ কোরআনের অংশ। বিভিন্ন সূরার মধ্যে পার্থক্যের জন্যে অবতীর্ণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন : বিস্‌মিল্লাহ কোরআনের অংশ হলে তার অস্বীকারকারী কাফির হয় না কেন?

উত্তর : ইমাম মালিক (র) যেহেতু বিস্‌মিল্লাহ কোরআনের অংশ হওয়াকে অস্বীকার করেন। তার এই মতভেদের কারণেই তা কোরআনের অংশ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। আর কোরআনের অংশ হওয়ার ব্যাপারে কোনো কিছু সন্দেহজনক হলে তার অস্বীকারকারী কাফের হয় না।

প্রশ্ন : এখন আর একটি প্রশ্ন জাগে যে, নামাযের মধ্যে শুধু বিস্‌মিল্লাহ পড়লে কেরাতের ফরয আদায় হয় না কেন?

উত্তর : কোনো কোনো আলিমের মতে বিস্‌মিল্লাহ পূর্ণ আয়াত নয়। যেমন উম্মে সালামা (রা) বলেন– রাসূলুল্লাহ (স) সূরা ফাতেহা পড়লেন। বিস্‌মিল্লাহকে আলহামদুর সাথে এক আয়াত গণ্য করলেন। এ কারণে শুধু বিস্‌মিল্লাহর উপর ক্ষান্ত করা জায়েয নয়। আর জুনুবী ও ঋতুবতী মহিলাদের জন্য বিস্‌মিল্লাহ পড়া জায়েয হওয়ার উত্তর এই যে, তারা এটা দোয়া হিসেবে পড়ে। কোরআন তেলাওয়াত হিসেবে পড়লে তা তাদের জন্য নাজায়েয হবে।

ফায়েদা : বিস্‌মিল্লাহ কোরআনের অংশ হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে যেহেতু কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে এ কারণে এ ব্যাপারে আরো একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন বোধ করি।

আল্লামা তাফতাজানী (র) বলেন– পবিত্র কোরআনে দুভাবে বিস্‌মিল্লাহ উল্লেখ করা হয়েছে। ১. সূরায়ে নামলে وَاِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَاِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ২. সূরা সমূহের শুরুতে। সূরায়ে নামলের বিস্‌মিল্লাহ কোরআনের অংশ হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত। সেটা সূরার অংশও বটে। আর বিভিন্ন সূরার শুরুতে যে বিস্‌মিল্লাহ উল্লেখিত হয়েছে। তার ব্যাপারে আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম মালিক (র) বলেন বিস্‌মিল্লাহ কোরআনের অংশই নয়। এ কারণে তার মতে নামাযের মধ্যে উচ্চ স্বরে বা নীরবে বিস্‌মিল্লাহ পাঠের কোনো অনুমতি নেই। হানাফী ও শাফেয়ীগণ বলেন যে, বিস্‌মিল্লাহ কোরআনের অংশ।

এরপর ইখতেলাফ হয়েছে যে, বিস্‌মিল্লাহ সূরাসমূহের অংশ কি না? এ ব্যাপারে হানাফীগণ বলেন যে, বিস্‌মিল্লাহ কোনো সূরার অংশ নয়। এমনকি সূরা ফাতিহার অংশও নয়। আর শাফেয়ীগণের মতে বিস্‌মিল্লাহ সূরা ফাতেহার অংশ। শাফেয়ীগণের মধ্য হতে কারো কারো মতে বিস্‌মিল্লাহ অন্যান্য সূরাসমূহেরও অংশ। আর কারো কারো মতে কেবল সূরা ফাতেহার অংশ।

وَهُوَ اِسْمٌ لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنٰى جَمِيْعًا تَمْهِيْدٌ لِتَقْسِيْمِهِ بعد بيانِ تعريفِه يَعْنِى اَنَّ الْقُرْاٰنَ اسمٌ لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنٰى جَمِيْعًا لا اَنَّهٗ اسمٌ لِلنَّظْمِ فقط كما يُنْبِئُ عَنْه تعريفُه بِالْاِنْزالِ وَالْكتابةِ والنَّقْلِ ولا اَنَّهٗ اسمٌ لِلْمَعْنٰى فَقَطْ كما يُتَوَهَّمُ مِنْ تَجْوِيْزِ اَبِى حَنِيْفَةَ رحمهُ اللّٰهُ لِلْقِراءَةِ الفارِسيَّةِ فِى الصَّلٰوةِ معَ القُدْرَةِ عَلَى النَّظْمِ العَرَبِىِّ وذٰلك لِاَنَّ الْاَوْصاف الْمَذْكُوْرَةَ جارِيَةٌ فِى الْمَعْنٰى تَقْدِيْرًا وجَوازُ الصَّلٰوةِ بالفارسيَّةِ اِنَّما هُوَ لِعُذْرٍ حُكْمِىٍّ وهُوَ اَنَّ حالَةَ الصَّلٰوةِ حالَةُ الْمُناجاةِ مَعَ اللّٰهِ تعالٰى وَالنَّظْمُ العَرَبِىُّ مُعْجِزٌ بَلِيْغٌ فَلَعَلَّهٗ لا يَقْدِرُ عليه اَوْ لِاَنَّهٗ اِنِ اشْتَغَلَ بِالْعَرَبِىِّ يَنْتَقِلُ الذِّهْنُ مِنْهُ اِلٰى حُسْنِ الْبَلاغةِ والبَراعةِ ويَلْتَذُّ بِالْاَسْجاعِ وَالفَواصِلِ ولَمْ يَخْلُصِ الحُضُوْرُ مَعَ اللّٰهِ تعالٰى بَلْ يَكُوْنُ هٰذَا النَّظْمُ حِجابًا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ اللّٰهِ تعالٰى وكانَ اَبُوْ حنيفةَ رحمه اللّٰهُ تعالٰى مُسْتَغْرِقًا فِى بَحْرِ التَّوْحِيْدِ وَالْمُشاهَدَةِ لا يَلْتَفِتُ اِلَّا اِلَى الذَّاتِ فَلا طَعْنَ عَلَيْهِ فِىْ اَنَّهٗ كَيْفَ يُجَوِّزُ القِراءَةَ بِالفارِسِىِّ مَعَ القُدْرَةِ عَلَى العَرَبِىِّ الْمُنَزَّلِ وامَّا فِى مَاسِوَى الصَّلٰوةِ فَهُوَ يُراعِىْ جانِبَهُما جَمِيْعًا ـ

অনুবাদ॥ *আল কুরআন শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টির নাম।* এ উক্তিটি কুরআনের সংজ্ঞা বর্ণনা করার পর তার শ্রেণী বিন্যাসের ভূমিকা স্বরূপ। অর্থাৎ, অবশ্যই কুরআন শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টির নাম। এমন নয় যে, তা কেবল শব্দের নাম। যেমনটা অবতীর্ণ করা, লিপিবদ্ধ করা, বর্ণনা করা ইত্যাদি শব্দ দ্বারা তার সংজ্ঞা প্রদান করায় বাহ্যতঃ প্রতীয়মান হয়। আর এমনও নয় যে, তা কেবল অর্থের নাম। যেমন ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর আরবি ভাষা উচ্চারণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বে নামাযে ফার্সিতে কিরাআত পড়া বৈধ রাখার অভিমত দ্বারা ধারণা জন্মে। এর (শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টি কুরআন হওয়ার) কারণ হলো, উল্লিখিত বিশেষণসমূহ (منزل - مكتوب - منقول) পরোক্ষরূপে অর্থের মধ্যেও বিদ্যমান রয়েছে। (পার্থক্য এতটুকু যে, এ তিনটি সিফাত শব্দের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে, আর অর্থের মধ্যে পরোক্ষভাবে বিদ্যমান রয়েছে)।

ইমাম আবু হানীফা (র) কর্তৃক ফার্সি ভাষায় নামাযে কিরাআতের বৈধতা হুকমী ওযরের কারণে হয়েছে। উক্ত ওযরটি এই যে, নামাযের অবস্থা হলো আল্লাহ তা'আলার সাথে একান্তে কথোপকথন করার অবস্থা। কুরআনের আরবি শব্দাবলি বিস্ময়কর অলংপূর্ণ। ফলে হয়তো মুসল্লী এরূপ ভাষা উচ্চারণ করতে সক্ষম হবে না। (এ আশংকায় তিনি ফার্সিতে কিরাআত জায়েয রেখেছেন) অথবা (এজন্যে যে,) সে যদি আরবি কিরাতে লিপ্ত হয়, তবে তার মনোযোগ নামায হতে সরে ভাষালংকার ও চমৎকার রচনাশৈলীর সৌন্দর্যের প্রতি নিমগ্ন হয়ে পড়বে এবং সে ছন্দময় ও শ্রুতিমধুর শব্দসমূহের সৌন্দর্য উপভোগে নিমজ্জিত হয়ে পড়বে। ফলে আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে তার উপস্থিতি ইখলাস বা নির্ভেজাল হবে না; বরং এ আরবি রচনাশৈলী মুসল্লী ও আল্লাহ তা'আলার মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র) আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর মুশাহাদার মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত ছিলেন। সেজন্যে তিনি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সত্তা ছাড়া অন্য কিছুর দিকে ভ্রূক্ষেপ করতেন না। সুতরাং, তাঁর ওপর এ বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপন করা যাবে না যে, অবতারিত কুরআনের আরবি শব্দমালা উচ্চারণ ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও ফার্সি ভাষায় কিরাআত পড়াকে কিভাবে জায়েয রাখলেন? অবশ্য নামায ব্যতীত অন্যান্য সকল ব্যাপারে তিনি কুরআনের শব্দ ও অর্থ উভয়ের প্রতিই দৃষ্টি রাখতেন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله وَهُوَ اسْمٌ لِلنَّظْمِ الخ : বালাগাত বলা হয় বিশুদ্ধ অলংকারপূর্ণ বাক্য পরিস্থিতির অনুকূলে হওয়াকে। فضيلت، فصاحت، براءت ও سجع এগুলো মানুষের গদ্যভিত্তিক ছান্দিক কথাকে বলে যা বাক্যের শেষে অবলম্বিত হয়। অতপর তার উপযোগী ভিন্ন শব্দও পরবর্তী বাক্যের শেষে উল্লেখিত হয়। যেমন মানারের প্রাথমিক ভাষ্য আলহামদুলিল্লাহ থেকে القويم পর্যন্ত ৩টি বাক্য রয়েছে। প্রত্যেক বাক্যের শেষে মীম বর্ণ রয়েছে। এর দ্বারা তিনি سجع এর প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। পবিত্র কোরআনে এমন ঘটলে তাকে فاصلة বলা হয়। এর বহুবচন হলো فواصل যেমন وَالضُّحٰى সূরার মধ্যে প্রত্যেকটি বাক্য আলিফে মাকছূরার উপর শেষ হয়েছে। ছান্দিক কথা তথা পদ্যের মধ্যে এমন ঘটলে তাকে قافية বলা হয়। যেমন– হক কানপুরি এর কবিতার কয়েকটি ছন্দের প্রত্যেকটি نہیں ہے এর উপর শেষ করা হয়েছে। যথা–

بربادیٔ پیہم کا سبب یاد نہیں ہے * یہ بات کبھی یاد تھی اب یاد نہیں ہے

اس پہلی نظر پہلی ملاقات کا عالم * کچھ کچھ تو مجھے یاد ہے سب یاد نہیں ہے

نظریں رُخِ جاناں سے ہٹائے نہیں ہٹتے * دیوانہ ہوں دیوانہ ادب یاد نہیں ہے

کیا پوچھتے ہو دوستو! روداد محبت * بس لٹ گیا لٹنے کا سبب یاد نہیں ہے

মানার গ্রন্থকার সামনে যেহেতু কোরআনের প্রকারভেদ উল্লেখ করবেন। একারণে ভূমিকা স্বরূপ বলছেন যে, কোরআন প্রকৃতপক্ষে কিসের নাম? এ ব্যাপারে মূলত তিনটি উক্তি রয়েছে। যথা–

১. কোরআন কেবল শব্দের নাম,

২. কোরআন কেবল অর্থের নাম।

৩. অর্থ ও শব্দ উভয়ের সমষ্টির নাম। মাতিন ও শারেহ উভয়ের মতে তৃতীয় উক্তিটি অধিক বিশুদ্ধ। যারা প্রথমটির প্রবক্তা। তাদের দলিল এই যে, পূর্বে কোরআনের সংজ্ঞায় ৩টি সিফাত বা বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে। ১. اَلْمُنَزَّلُ عَلَى الرَّسُوْلِ ২. اَلْمَكْتُوْبُ فِى الْمَصَاحِفِ ৩. اَلْمَنْقُوْلُ عَنْهُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا আর একথা স্বীকৃত যে, অবতীর্ণ করা, লিপিবদ্ধ করা, এবং বর্ণনা করা সবগুলোই শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট। এগুলোর সাথে অর্থ সংশ্লিষ্ট হয় না। অতএব বোঝা গেলো যে, কোরআন হলো শব্দের নাম। কোরআন হওয়ার ক্ষেত্রে অর্থের কোনো দখল নেই।

২. আল্লাহ তা'আলার এরশাদ করেছেন اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا আমি কোরআনকে আরবি ভাষায় অবতীর্ণ করেছি। অর্থাৎ বিশ্বের সর্বাধিক বিশুদ্ধ সম্প্রসারিত ভাষা ভাণ্ডার ও অলংকার মণ্ডিত ভাষায় কোরআন অবতরণ করাকে নির্বাচন করা হয়েছে। আর আরবি হওয়া না হওয়া শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট অর্থের সাথে নয়। অর্থ সকল ভাষায় এক অভিন্ন বস্তু। কারণ অর্থ বলে মনের ভাবকে। অতএব আয়াত দ্বারা বোঝা গেলো যে, কোরআন কেবল শব্দ ভাণ্ডারের নাম।

দ্বিতীয় উক্তির দলিল : ১. নামাযের মধ্যে কোরআন পাঠ করা ফরয। ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে আরবি ভাষায় পড়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নামাযের মধ্যে ফারসি ভাষায় কোরআন পাঠ করার অনুমতি রয়েছে। আর এ কথা সুস্পষ্ট যে, তাতে কোরআনের ভাষা বিদ্যমান থাকে না বরং অর্থ বিদ্যমান থাকে। অতএব বোঝা গেলো শব্দের নাম কোরআন নয়।

২. দ্বিতীয় দলিল : আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন وَاِنَّهُ لَفِىْ زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَ এ কোরআন পূর্বের কিতাবসমূহের মধ্যেও বিদ্যমান ছিলো। আর পূর্বের সকল আসমানী কিতাব যেহেতু অনারবি ছিলো। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, শব্দের নাম কোরআন নয়।

তৃতীয় পক্ষের দলিল : পূর্বের উভয় উক্তির দলিলসমূহ তৃতীয় উক্তিরও দলিল। কারণ প্রথম উক্তির দলিলসমূহ দ্বারা শব্দ কোরআন হওয়া প্রমাণিত হয়েছে। আর দ্বিতীয় উক্তির দলিলসমূহ দ্বারা অর্থ কোরআন হওয়া প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই অর্থ ও শব্দ উভয়টিই কোরআনের অঙ্গ হওয়া প্রমাণিত।

১ম ও ২য় পক্ষের দলিলের উত্তর : প্রথম মতের প্রবক্তাগণ অবতীর্ণ হওয়া, লিপিবদ্ধ হওয়া ও বর্ণনা করা ইত্যাদি গুণে বিশেষিত হওয়াকে যে দলিল সাব্যস্ত করেছেন। তার উত্তর এই যে, এই সকল বিশেষণ শব্দের মধ্যে যেরূপ পাওয়া যায়। শব্দের মাধ্যমে অর্থের মধ্যেও তদরূপ পাওয়া যায়। অতএব শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টি কোরআন হওয়া সাব্যস্ত হবে।

দ্বিতীয় মতের প্রবক্তাগণ যে বলেছেন– আর আবু হানীফা (র) এর মতে আরবি ভাষায় কোরআন পাঠের সক্ষমতা সত্ত্বে ফার্সি ভাষায় কোরআন পাঠ করলেও নামায জায়েয হয়ে যাবে। এটা কোরআন অর্থের নাম হওয়ার আলামত। এর উত্তর এই যে, এ অনুমতি বিশেষ এক কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে দেয়া হয়েছে। তা এই যে, নামাযের অবস্থা হলো আল্লাহ তা'আলার সাথে নিজের গুপ্ত সকল মনের ভাব প্রকাশ করা। অনুনয়-বিনয়, আবেদন-নিবেদন পেশ করা। কাজেই আরবির ন্যায় ব্যাপক ভিত্তিক ভাষা দ্বারা প্রকাশ করা কারো দ্বারা সম্ভব নাও হতে পারে। এ কারণেই ফার্সি ভাষায় কেরাত পাঠ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

★ অথবা এ কারণে যে, কোন নামাযী ব্যক্তি থাকতে পারে যে, যদি আরবি ভাষা পাঠে লিপ্ত হলে তার যেহেন তা থেকে সরে আরবি শব্দের ভাষা শৈলী, অলংকার এবং তার সুনিপুন সৌন্দর্যের প্রতি ধাবিত হতে পারে এবং শুধু ভাষারই আকর্ষণ সে অনুভব করতে পারে। ফলে তার নামাযের একাগ্রতা এবং তন্ময়তার ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে। যার দরুন তা নামাযীও এক আল্লাহর মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে। এ কারণেই তিনি এ ধরনের অনুমতি দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, ইমাম আবু হানীফা (র) কর্তৃক কোরআন ফার্সি ভাষায় পাঠ করার দ্বারা এটা আবশ্যিক হয় না যে, কোরআন কেবল অর্থেরই নাম। এই কারণেই তো নামায ছাড়া অন্যান্য সকল অবস্থায় ইমাম সাহেব (র) শব্দ ও অর্থ উভয়ের প্রতি লক্ষ রাখতেন। তিনি বলেন– জুনুবী ও ঋতুবতীর জন্য ফার্সি ভাষায় কোরআন পাঠ করা এবং ফার্সি ভাষায় অনুদিত কোরআন স্পর্শ করা জায়েয। কোরআন যদি কেবল অর্থের নাম হতো তাহলে তিনি জুনুবী ও ঋতুবতীর জন্য ফার্সি ভাষায় কোরআন পাঠের অনুমতি দিতেন না। এভাবে ফার্সি ভাষায় অনুদিত কোরআন স্পর্শ করাকেও জায়েয বলতেন না।

★ দূররে মুখতার গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, ইমাম সাহেব (র) পরবর্তীতে সাহেবাইনের উক্তির প্রতি রুজু করে আরবি ভাষায় সক্ষমতা সত্ত্বে নামাযে ফার্সি ভাষায় কোরআন পাঠ জায়েয হওয়ার উক্তি থেকে সরে এসেছেন। কাজেই তার উক্তি দ্বারা দলিল পেশ করা গ্রহণযোগ্য নয়।

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا এবং وَاِنَّهُ لَفِىْ زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَ দ্বারা দলিল পেশের উত্তর : কোরআন অর্থ ও শব্দ উভয়ের সমষ্টিকে বলে। আর এ দুই আয়াতে শুধু শব্দ বা শুধু অর্থকে রূপক অর্থে কোরআন বলা হয়েছে। অতএব এর দ্বারা দলিল গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নয়।

অথবা اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ الخ দ্বারা শব্দ কোরআন হওয়া প্রমাণিত হয় এবং وَاِنَّهُ لَفِىْ زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَ দ্বারা অর্থ কোরআন হওয়া প্রমাণিত হয়। অতএব উভয় আয়াতের সমন্বয়ে শব্দ ও অর্থ উভয়টি কোরআনের অংশ হওয়া প্রমাণিত হবে।

وَاِنَّمَا اُطْلِقَ النَّظْمُ مَكَانَ اللَّفْظِ رِعَايَةً لِّلْاَدَبِ لِاَنَّ النَّظْمَ فِى اللُّغَةِ جَمْعُ اللُّؤْلُؤِ فِى السِّلْكِ وَاللَّفْظُ هُوَ الرَّمْىُ وَاِنْ كَانَ النَّظْمُ يُطْلَقُ فِى الْعُرْفِ عَلَى الشِّعْرِ اَيْضًا وَيَنْبَغِىْ اَنْ يُّعْلَمَ اَنَّ النَّظْمَ اِشَارَةٌ اِلَى الْكَلَامِ اللَّفْظِيِّ وَالْمَعْنٰى اِلَى الْكَلَامِ النَّفْسِيِّ وَلٰكِنَّ الْمَعْنَى الَّذِىْ هُوَ تَرْجَمَةُ النَّظْمِ حَادِثٌ كَالنَّظْمِ لِاَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ قِصَّةِ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖ وَعَنْ فِرْعَوْنَ وَغَرْقِهٖ مَثَلًا وَكُلُّ ذٰلِكَ حَادِثٌ ثُمَّ هُوَ دَالٌّ عَلٰى اَمْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَنَهْيِهٖ وَحُكْمِهٖ وَخَبَرِهٖ وَهُوَ قَدِيْمٌ بِلَا رَيْبٍ عِنْدَنَا فَتَنَبَّهْ لَهٗ –

অনুবাদ ॥ মুসান্নিফ (র) (কুরআনের পরিচয়দানে) আদবের প্রতি লক্ষ রেখে لفظ এর স্থলে نظم শব্দ ব্যবহার করেছেন। কারণ অভিধানে نظم শব্দের অর্থ হলো- সূতায় মুক্তা গাঁথা। (যা একটি সম্মানসূচক অর্থ) আর لفظ এর অর্থ হলো নিক্ষেপ করা। (যা বীতশ্রদ্ধাজ্ঞাপক অর্থ) যদিও পরিভাষায় نظم শব্দটি কবিতার ওপরও ব্যবহৃত হয়।

এ কথাটি জেনে রাখা উচিত যে, نظم দ্বারা শাব্দিক বক্তব্য (كلام لفظى) এবং معنى দ্বারা মৌলিক বক্তব্য (كلامِ نَفسى) এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু ঐ অর্থ যা কুরআনী শব্দের অনুবাদ, তা نظم এর ন্যায় নশ্বর। কারণ, উদাহরণ স্বরূপ তা (শব্দ) হযরত ইউসুফ (আ) ও তাঁর ভ্রাতৃবর্গের ঘটনা, ফিরাউন ও তার সলিল সমাধির ঘটনা ইত্যাদির সমষ্টি। আর এই সমুদয় বস্তু নশ্বর। তৎপর শব্দ আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ-নিষেধ, বিধান ও খবর ইত্যাদির প্রতি নির্দেশকারী। আর এগুলো নিঃসন্দেহে আমাদের মতে অবিনশ্বর। অতএব, বিষয়টি ভালভাবে প্রণিধান করুন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله وَاِنَّمَا اُطْلِقَ النَّظْمُ الخ : এটা একটা প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন : لفظ ও نظم একই বিষয় বোঝায়। তবে نظم এর তুলনায় لفظ অধিক প্রসিদ্ধ। আর ইবারতে প্রসিদ্ধ শব্দের ব্যবহারই অধিক বিশুদ্ধ। সুতরাং মাতিন (র) এর জন্য نظم এর স্থলে لفظ ব্যবহার করা উচিত ছিলো। তা না করার কারণ কি?

উত্তর : অভিধানে نظم বলা হয় সূতায় মুক্তা পরানোকে। আর لفظ এর অর্থ হলো– নিক্ষেপ করা। এদিক দিয়ে এ অর্থের তুলনায় প্রথম অর্থটি ভালো। এ কারণেই মাতিন (র) আদব ও সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রেখে لفظ এর স্থলে نظم ব্যবহার করেছেন। কবিতার মধ্যে সূতায় মুক্তাপরানোর ন্যায় বিভিন্ন শব্দকে রীতি অনুযায়ী সাজানো হয়। এ কারণে পরিভাষায় কবিতার উপর نظم শব্দ প্রযোজ্য হয়। যদিও তার দ্বারা খারাপ বিষয়ের দিকেও ইঙ্গিত করা হয়। যেমন বিভিন্ন কবি কবিতার মাধ্যমে বিভিন্নজনকে কটাক্ষ করে থাকেন। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ "কবিদের কথায় তারাই চলে যারা পথভ্রষ্ট"। আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতে কবিদের তিরস্কার করেছেন। এর কারণ হলো– তাদের কবিতা আবৃত্তি। কাজেই কবিগণ যেন নিন্দনীয়। এ কারণে তাদের কবিতাও নিন্দনীয় হবে। গ্রন্থকার বলেন মতনে نظم দ্বারা كلام لفظى এর প্রতি এবং معنى দ্বারা كلام نفسى এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। كلامِ نفسى দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তাআলার সিফাতে কাদীম। তথা অবিনশ্বর গুণাবলী। যা আল্লাহর সত্তার সাথে সদা বিদ্যমান। নীরবতা এবং বাকশক্তিহীনতা এর পরিপন্থী। كلام لفظى এর উপর

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

وَإِنَّمَا تُعْرَفُ أَحْكَامُ الشَّرْعِ بِمَعْرِفَةِ أَقْسَامِهِمَا شُرُوعٌ فِى تَقْسِيمَاتِهِ أَىْ إِنَّمَا تُعْرَفُ أَحْكَامُ الشَّرْعِ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ بِمَعْرِفَةِ تَقْسِيمَاتِ النَّظْمِ وَالْمَعْنٰى فَالاقْسَامُ بِمَعْنَى التَّقْسِيمَاتِ لِاَنَّ هٰهُنَا تَقْسِيمَاتٍ مُتَعَدِّدَةً وَتَحْتَ كُلِّ تَقْسِيمٍ اقْسَامٌ لَا أَنَّ الْكُلَّ اقْسَامٌ مُتَبَايِنَةٌ بِنَفْسِهَا بَلْ تَجْتَمِعُ اقْسَامُ تَقْسِيمٍ مَعَ أَقْسَامِ تَقْسِيمٍ اٰخَرَ - وَإِنَّمَا قَالَ أَقْسَامُهُمَا وَلَمْ يَقُلْ اقْسَامُهُ تَنْبِيْهًا عَلٰى أَنَّ مَنْشَأَ التَّقْسِيمِ هُوَ النَّظْمُ وَالْمَعْنٰى جَمِيعًا فَبَعْضُهُمْ عَلٰى أَنَّ التَّقْسِيمَاتِ الثَّلٰثَةَ الْأُوَلَ لِلنَّظْمِ وَالرَّابِعُ لِلْمَعْنٰى وَبَعْضُهُمْ عَلٰى أَنَّ الدَّلَالَةَ وَالْقَضَاءَ لِلْمَعْنٰى وَالْبَوَاقِىْ لِلنَّظْمِ وَالاصَحُّ أَنَّهُ فِى كُلِّ قِسْمٍ يُرَاعَى النَّظْمُ مَعَ دَلَالَتِهِ عَلَى الْمَعْنٰى -

---

تقسيم وجوه النظم (نظم-এর বিভিন্নরূপ বিভক্তি)

অনুবাদ ॥ ***"কুরআনের শব্দ ও অর্থের শ্রেণী বিন্যাসের পরিচয় লাভের দ্বারা শরীআতের' বিধি-বিধানের পরিচয় লাভ করা যায়"।*** এখান থেকে কুরআনের বিভক্তি বা শ্রেণী বিন্যাস আরম্ভ হয়েছে। অর্থাৎ, কুরআনের শব্দ ও অর্থের শ্রেণী বিন্যাসের পরিচয় দ্বারা হালাল-হারাম সম্পর্কীয় শরীআতের বিধানসমূহ জানা যায়। اقسام শব্দটি تقسيمات (বিভক্ত বা শ্রেণী বিন্যাসসমূহ) অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, কেননা, এখানে একাধিক বিভক্তি রয়েছে। আর প্রত্যেক تقسيم বা বিভক্তির অধীনে একাধিক প্রকার রয়েছে। এমন নয় যে, এর প্রত্যেকটি প্রকার সত্তাগতভাবে পরস্পর বিপরীতধর্মী; বরং এক বিভক্তির প্রকারসমূহ অন্য বিভক্তির প্রকারসমূহের সাথে একত্রিত হয়ে থাকে। اقسامه না বলে اقسامهما বলার কারণ হলো– এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া যে, কুরআনের শব্দ ও অর্থ উভয়টিই শ্রেণী বিন্যাসের উৎস। কোনো কোনো উসূলবিদের মতে, প্রথমোক্ত তিনটি শ্রেণী বিন্যাস বা تقسيم শব্দ কেন্দ্রিক, আর চতুর্থ تقسيم

(পূর্বের বাকী অংশ)

دلالت عقليه এর পর্যায়ে দালালত করে। এটা মনে রাখতে হবে যে, معنى শব্দটি দুই অর্থের উপর বলা হয়। ১. كلام نفسى ২. نظم অর্থাৎ কালামে নফীসকেও معنى দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং نظم এর অর্থের উপরও معنى এর প্রয়োগ হয়। তবে যে অর্থ দ্বারা কালামে নফসীর প্রতি ইশারা করা হয় আমাদের মতে তা কাদীম তথা অবিনশ্বর। কারণ কালামে নফসী হলো আল্লাহর বিশেষণ। আর আল্লাহর সমস্ত বিশেষণ কাদীম। যদিও কিছু কিছু গোমরাহ সম্প্রদায় আল্লাহর যাবতীয় বিশেষণকে حادث তথা নশ্বর বলে থাকেন। আর نظم এর অর্থে যে معنى প্রযোজ্য হয় তা حادث তথা নশ্বর। যেমন ইউসুফ (আ) ও তাঁর ভ্রাতিবর্গ এবং ফেরআউন ও তার সৈন্য সামন্ত নিমজ্জিত হওয়ার কাহিনী। এ ধরনের সকল কাহিনীর বিষয়বস্তু নশ্বর। অতএব বোঝা গেলো যে, نظم এর অর্থও نظم এর ন্যায় নশ্বর। অবশ্য এ বিষয়টি সত্য যে, আল্লাহ তা'আলার আদেশ, নিষেধ, তার বিধান, সংবাদ ইত্যাদির উপর কোরআনের নজম ইঙ্গিত বহন করে। আর আমাদের কাছে এসবগুলো কাদীম অর্থাৎ কুরআনের নজম আল্লাহর যে আমর, নাহী ইত্যাদি বুঝায় তা সব কাদীম। যেমন– আল্লাহর সত্তা কাদীম।

হলো অর্থ কেন্দ্রিক। কারো কারো মতে, دَلَالَةُ النَّصِّ (ভাষ্যের নির্দেশনা) ও اِقْتِضَاءُ النَّصِّ (ভাষ্যের চাহিদা বা দাবী) এ দু প্রকার হলো অর্থ সংশ্লিষ্ট এবং অবশিষ্ট প্রকারসমূহ শব্দ সংশ্লিষ্ট। বস্তুতঃ সর্বাধিক বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, প্রত্যেক প্রকারের মধ্যে অর্থের প্রতি নির্দেশ করার সাথে শব্দেরও লক্ষ রাখা হয়। (অর্থাৎ, সব প্রকারেই نظم ও معنى উভয়ের লক্ষ রাখা হয়।)

আর তা চারটি। অর্থাৎ, পূর্বে উল্লিখিত বিভক্তিসমূহ মোট চারটি। প্রত্যেক বিভক্তির অধীনে রয়েছে একাধিক প্রকার। যেমন শীঘ্রই আসছে। বিভক্তিসমূহ চার প্রকারে সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ (دليل حصر) এই যে, কিতাবুল্লাহর আলোচনা হয়তো শুধু অর্থ সংশ্লিষ্ট হবে, এটা চতুর্থ বিভক্তি। অথবা কেবল শব্দ হবে, এমতাবস্থায় যদি তা শব্দ ব্যবহারের দিক বিবেচনা করে হয়, তাহলে তা তৃতীয় বিভক্তি, অথবা শব্দের অর্থ নির্দেশকরণের দিক বিবেচনা করে হবে। এ ক্ষেত্রে যদি তাতে অর্থের স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতা ধর্তব্য হয়, তাহলে তা দ্বিতীয় নতুবা তা প্রথম বিভক্তি হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ মুসান্নিফ (র) نظم এবং معنى অর্থাৎ কোরআনের ৪টি প্রকারভেদ উল্লেখ করেছেন। প্রথম প্রকারভেদে ৪টি বিষয় রয়েছে। ১. خاص, ২. عام, ৩. مشترك, ৪. مؤول। দ্বিতীয় প্রকারভেদেও ৪টি বস্তু উল্লেখ করেছেন, ১. ظاهر ২. نص, ৩. مُفَسَّر, ৪. مُحْكَم। এ ৪টির বিপরীতমুখী বস্তু হলো– ১. خفى, ২. مشكل, ৩. مُجْمَل ও ৪. مُتَشَابِه। তৃতীয় প্রকারভেদের অধীনে ও চারটি বস্তু উল্লেখ করেছেন। ১. حقيقت ২. مجاز ৩. صريح, ৪. كنايه এভাবে চতুর্থ প্রকারভেদের অধীনে উল্লেখ করেছেন চারটি বস্তু। ১. استدلال بِعِبَارَةِ النَّص ২. استدلال بِاِشَارَةِ النَّص ৩. استدلال بِدَلَالَةِ النَّص, ৪. اِسْتِدْلَال بِاقْتِضَاءِ النَّص সর্বমোট ২০ প্রকার হলো। কিন্তু এ সকল প্রকার পরস্পরে সাংঘর্ষিক নয়। বরং এক প্রকারভেদের বিষয়বস্তু অপর প্রকারভেদের সাথে একত্র হতে পারে। যেমন হাকীকতের সাথে খাছ একত্রিত হতে পারে। এটা মূলত এমন যেমন এক প্রকারভেদের দিক দিয়ে ইসম ২ প্রকার। ১. معرب ২. مبنى আর দ্বিতীয় প্রকারভেদের দিক দিয়েও ইসম ২ প্রকার। ১. معرفه ২. نكره আর معرب ও معرفه একত্রিত হতে পারে। অতএব মতনে اقسام দ্বারা প্রকারভেদ উদ্দেশ্য।

ইবারতের উদ্দেশ্য এই যে, হালাল-হারাম ইত্যাদি যেসব বিধান কোরআন দ্বারা প্রমাণিত তার পরিচয় যেহেতু শব্দ ও অর্থের প্রকারভেদসমূহের পরিচয় জানার উপর মওকুফ। এইজন্য সর্বাগ্রে সেসকল প্রকারভেদের পরিচয় উল্লেখ করা জরুরি। মুসান্নিফ (র) উল্লেখিত প্রকারসমূহের পরিচয় বা সংজ্ঞা উল্লেখ করবেন। অতপর শরিয়তের বিধানসমূহ বর্ণনা করবেন।

প্রশ্ন : এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, اقسامهما এর মধ্যে মুসান্নিফ (র) দ্বিবচন সর্বনাম ব্যবহার করলেন কেন?

উত্তর : এর দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, مقسم তথা যার প্রকারভেদ উল্লেখ করছেন তা শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টি। শুধু শব্দ বা শুধু অর্থ নয়। কারণ কোনো কোনো আলিম বলে থাকেন যে, প্রথম ৩ প্রকার কেবল শব্দের প্রকারভেদ। আর চতুর্থটা শুধু অর্থের প্রকারভেদ। আবার কারো কারো মতে ২০ প্রকারের মধ্য থেকে কেবল ২টি প্রকার অর্থাৎ دلالة النص ও اقتضاء النص অর্থের প্রকারভেদ। আর বাকী সব শব্দের প্রকারভেদ। কিন্তু মুসান্নিফ (র) এর মতে সবগুলোর মধ্যেই শব্দের সাথে সাথে অর্থেরও দখল রয়েছে।

وَ ذٰلِكَ اَرْبَعَةٌ اَىِ الْمَذْكُوْرُ فِيْمَا قَبْلُ وهوَ التَّقْسِيْمَاتُ اربعةُ تَقْسِيْمَاتٍ وتَحْتَ كُلِّ تَقْسِيْمٍ مِّنْهَا اقسامٌ عديْدَةٌ كما سَيَاتِى و ذٰلِك لِاَنَّ البَحْثَ فِيْه اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ عَنِ الْمَعْنٰى وهُوَ التَّقْسِيْمُ الرَّابِعُ اَوْ عَنِ اللَّفْظِ فَاِمَّا بِحَسْبِ اِسْتِعْمَالِه وهُوَ التَّقْسِيْمُ الثَّالِثُ اَوبِحَسْبِ دَلالتِه فَاِنِ اعْتُبِرَ فِيْهَا الظُّهُوْرُ وَالْخَفاء فَهُوَ الثَّانِىْ وَاِلَّا فَهُوَ الْاَوَّلُ -

অনুবাদ ॥ ***"আর তাহলো চারটি"*** অর্থাৎ পূর্বে উল্লেখিত বিভক্তিসমূহ হলো মোট চারটি বিভক্তি। তন্মধ্যে হতে প্রত্যেক বিভক্তির অধীনে কয়েকটি করে প্রকার রয়েছে। যেমন সামনে আসবে। আর এটা এই জন্য যে, কিতাবুল্লায় হয়তো অর্থ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। এটা হলো চতুর্থ বিভক্তি, অথবা শব্দ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। এটা আবার শব্দের ব্যবহারের দিক দিয়ে হবে। এটা হলো তৃতীয় বিভক্তি, অথবা তার দালালতের দিক দিয়ে লক্ষ্য করে এর মধ্যে যদি অর্থ স্পষ্ট ও অস্পষ্ট হওয়া বিবেচনা করা হয় তাহলে তা দ্বিতীয় বিভক্তি হবে। নতুব প্রথম বিভক্তি হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله المذكور فِيْمَا قَبْلُ الخ : এ ভাষ্য দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দেয়া উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন : ذالك এর মুশারুন ইলায়হে হলো– الاقسام আর এটা বহুবচন হওয়ার কারণে واحد مونث এর হুকুমে শামিল। কাজেই ذالك এর স্থলে تلك আনাই যুক্তিযুক্ত ছিলো। এর উত্তর এই যে, এর দ্বারা المذكُوْر فِيْمَا قبل এর প্রতি ইশারা করা হয়েছে। আর এটা مفرد مذكر শব্দ। কাজেই ذالك আনাই সঠিক।

اربعة تقسيمات ভাষ্যে একথা স্পষ্ট করেছেন যে, ذالك اربعة এর মধ্যে اربعة শব্দের তানবীনটি মুযাফ ইলায়হের পরিবর্তে এসেছে। মোটকথা পূর্বে যে সকল প্রকারসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে তা ৪ বিভক্তির মধ্যে শামিল। প্রত্যেক বিভক্তির অধীনে কয়েক প্রকার রয়েছে।

دليل الحصر : এই ৪ বিভক্তিতে সীমিত হওয়ার দলিল এই যে, কিতাবুল্লাহর মধ্যে কেবল অর্থ সম্পর্কে আলোচনা হবে অথবা শব্দ সম্পর্কে। প্রথম প্রকারটি চতুর্থ বিভক্তি। আর দ্বিতীয়টি হলে শব্দের আলোচনা তার ব্যবহারের দিক দিয়ে হবে বা অর্থের প্রতি দালালত করার কারণে হবে। প্রথমটি তৃতীয় বিভক্তি। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তার মধ্যে স্পষ্ট ও অস্পষ্টতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে অথবা না। প্রথমটি দ্বিতীয় বিভক্তি। আর দ্বিতীয়টি প্রথম বিভক্তি।

اَلْاَوَّلُ فِى وُجُوْهِ النَّظْمِ صِيْغَةً وَلُغَةً يعنى اَنَّ التَّقْسِيْمَ الاَوَّل فِىْ طُرُقِ النَّظْمِ مِنْ حَيْثُ الصِّيْغَة واللُّغَةِ وَالطُّرُقُ هِيَ الْاَنْوَاعُ والاَصْنَافُ وَالصِّيْغَةُ هِى الْهَيْاَةُ واللُّغَة وانْ كَانَ يَشْمُلُ المَادَّةَ والهَيْاَةَ كِلَيْهِما لٰكِن اُرِيْدَ بِها هٰهُنا المَادَّةُ لِلْمُقَابَلَةِ فَهُمَا مِنْ حَيْثُ الْمَجْمُوْعِ كِنَايَةٌ عَنِ الْوَضْعِ فَكَانَّه قَالَ اَلْاَوَّلُ فِى اَنْوَاعِ النَّظْمِ مِنْ حيثُ الْوَضْعِ اَىْ مِنْ حيثُ اَنَّه وُضِعَ لِمَعْنًى واحِدٍ اَوْ اَكْثَرَ مَعَ قَطْعِ النَّظْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِه وظُهُورِهِ وانَّما قَدَّمَ الصِّيْغَة عَلٰى اللُّغَةِ لِاَنَّ لِلْعُمُوْمِ وَالْخُصُوْصِ زِيادةُ تَعَلُّقٍ بِالصِّيْغَةِ فى الْاَغْلَبِ -

---

অনুবাদ ॥ تقسيم اول বা প্রথম বিভক্তি হলো শব্দরূপ ও ভাষাগত গঠনের দিক বিবেচনায় শব্দের প্রকারভেদ প্রসঙ্গে। অর্থাৎ, প্রথম বিভক্তি সীগাহ ও ভাষাগত গঠনের দিক দিয়ে শব্দের প্রকারভেদের বর্ণনা প্রসঙ্গে। طرق দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো প্রকারভেদ ও শ্রেণী বিভাগ। صيغة হলো- গঠন প্রাকৃতি (সম্বন্ধিত বর্ণ, হারাকাত ও ওযনের রূপ) আর لغة শব্দটি যদিও মূলধাতু ও গঠন প্রাকৃতি উভয়কে শামিল করে, কিন্তু এখানে সীগার বিপরীতে মূল ধাতু উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ صيغة ও لغة শব্দ দুটি সমষ্টিগতভাবে গঠনের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। মুসান্নিফ (র) যেন এটাই বলেছেন যে, প্রথম বিভক্তি হলো গঠনগত দিক দিয়ে শব্দের প্রকারভেদ প্রসঙ্গে। অর্থাৎ, এ দৃষ্টিকোণ হতে যে, শব্দকে একটি অর্থের জন্যে গঠন করা হয়েছে, না-কি একাধিক অর্থের জন্যে। এতে শব্দের প্রয়োগবিধি ও অর্থের স্পষ্টতা (বা অস্পষ্টতা)-এর প্রতি লক্ষ্য করা হয়নি। কেননা, অর্থের ব্যাপকতা ও নির্দিষ্ট হওয়ার বেশির ভাগ সম্পর্ক সীগার সাথেই সমধিক হয়ে থাকে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله الاوّل فِىْ وُجُوهِ النَّظْمِ الخ : মতনে وجوه শব্দের অর্থ বিভিন্ন প্রকার। صيغة শব্দের বিশেষ ধরনকে বলে যা বিভিন্ন বর্ণ, হরকত ও সাকিনের সমন্বয়ে অর্জিত হয়। কারো কারো মতে সীগা এমন বিশেষ ধরন প্রকৃতির নাম যা শব্দের বিভিন্ন গঠন প্রকৃতির দিক দিয়ে লাভ হয়। لغت শব্দটি মাদ্দা ও আকৃতি উভয়কে শামিল করে তবে এখানে মাদ্দা (উৎস মূল) উদ্দেশ্য। কারণ এখানে এটা সীগার বিপরীতে ব্যবহৃত হয়েছে। আর সীগা দ্বারা শব্দের আকৃতি উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। কাজেই তার বিপরীতে لغت দ্বারা মাদ্দা উদ্দেশ্য হবে। আর আকৃতি ও মাদ্দা উভয়টি দ্বারা কেনায়া স্বরূপ وضع তথা শব্দ গঠন উদ্দেশ্য। অতএব মাতিন (র) যেন এমন বলেছেন যে, প্রথম প্রকারভেদ শব্দের গঠনের দিক দিয়ে তার প্রকারভেদ বর্ণনা প্রসঙ্গে। অর্থাৎ ব্যবহার ও প্রকাশের অর্থ বাদ দিয়ে শব্দকে এক বিশেষ অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে। অথবা একাধিক অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে।

قوله وانّما قَدَّمَ الصِّيْغَةَ الخ : এটা একটা প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন : পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, সীগা দ্বারা শব্দের রূপ বা আকৃতি এবং লুগাত দ্বারা মাদ্দা উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। আর স্বভাবতই মাদ্দা রূপের আগে হয়ে থাকে। কাজেই লুগাতকে আগে আনা উচিত ছিলো।

উত্তর : এখানে খাছ এবং আমের বর্ণনাকে আগে আনা উদ্দেশ্য। আর خصوص, عموم এর সম্পর্ক বিশেষত শব্দের সাথে। মাদ্দার সাথে নয়। যেমন رجل খাছ হওয়া এবং رجال শব্দটি আম হওয়া শাব্দিক দিক দিয়ে বোঝা যায়; মাদ্দার দিক দিয়ে নয়। কারণ উভয়টির মধ্যে মাদ্দা বা মূল অক্ষর একইরূপ। সুতরাং এখানে যেহেতু খাস ও আমের বর্ণনা আগে আনা উদ্দেশ্য এবং আমও খাছ হওয়া সীগার সাথে সংশ্লিষ্ট। এ কারণে মাতিন (র) সীগাকে আগে এনেছেন।

وَهِىَ اربعةُ الْخَاصُّ والعامُّ والْمُشْتَرَكُ والْمُؤَوَّلُ لان اللَّفْظ اِمَّا ان يدُلَّ على معنًى واحدٍ او اكثرَ فَاِنْ كانَ الاولُ فاِمَّا ان يَدُلَّ على الْاِنْفراد عنِ الْاَفْرادِ فهو الخاصُّ او اَنْ يدُلَّ معَ الاشتراكِ بيْنَ الافْرادِ فهُو العامُّ وان كانَ الثّانى فاِمَّا اَنْ يُّتَرَجَّحَ احدُ مَعانِيْه بالتّاويل فهو المُؤَوَّلُ واِلَّا فهُو المُشْتَرَكُ فَالْمُؤَوَّلُ فِى الحقيقة اِنَّما هُوَ مِنْ اَقْسامِ الْمُشْتَرَكِ الَّذى دَلَّ صيغةً ولُغَةً وانْ كانَ مفعولَ فِعْلِ التّاويلِ الّذى مِنْ شَأْنِ الْمُجْتَهِدِ -

অনুবাদ ॥ আর তা চার প্রকার ১. خاص (নির্দিষ্ট অর্থবোধক), ২. عام (ব্যাপকার্থবোধক), ৩. مشترك (দ্বৈত বা যৌথ অর্থবোধক), ৪. مؤول (ব্যাখ্যাপূর্ণ অর্থবোধক)। (دليل حصر বা চারের মধ্যে সীমিত হওয়ার কারণ) শব্দটি হয়তো একটি অর্থ বুঝাবে অথবা একাধিক অর্থ বুঝাবে। যদি তা একটি মাত্র অর্থ নির্দেশ করে, তবে হয়তো তা সংখ্যা থেকে অবমুক্ত হয়ে একক বস্তু বুঝাবে, এটা হলো خاص অথবা একক অর্থবোধক শব্দটি একাধিক সংখ্যক আফরাদের অংশ গ্রহণের অবকাশসহ একাধিক বস্তুকে বুঝাবে, তা হলো عام আর যদি দ্বিতীয়টি হয় (অর্থাৎ, শব্দটি যদি একাধিক অর্থ বুঝায়) তবে হয়তো তার বিভিন্ন অর্থ হতে একটি অর্থকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সাপেক্ষে প্রাধান্য দেয়া হবে, তা হলো مؤول অন্যথায় তার নাম مشترك – সুতরাং, مؤول শব্দটি مشترك এরই এক প্রকার যা শব্দ ও ভাষাগত দিক দিয়ে (একাধিক অর্থ) বুঝায়। যদিও مؤول শব্দটি تاويل ক্রিয়ার কর্ম, যা মুজতাহিদ বা গবেষকের কর্মপরিধির অন্তর্গত।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ মানার গ্রন্থকার বলেন– শব্দ গঠন প্রকৃতির দিক দিয়ে ৪ প্রকার–
১. خاص ২. عام ৩. مشترك ৪. مؤول

دليل الحصر বা চারটির মধ্যে সীমিত হওয়ার দলিল : শব্দ গঠনের দিক দিয়ে এক অর্থ বোঝাবে অথবা একাধিক অর্থ বোঝাবে। প্রথম ক্ষেত্রে অন্যের অংশীদারিত্ববিহীন এক অর্থ বোঝাবে অথবা অন্যের অংশীদারিত্ব থাকবে। অংশীদারিত্ববিহীন এক অর্থ বোঝালে সেটা خاص। আর অংশীদারিত্ব বোঝালে তা عام। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ শব্দ দ্বারা একাধিক অর্থ বোঝালে তা ২ ধরনের হতে পারে। উক্ত অর্থসমূহের মধ্য থেকে কোনো একটি অর্থ তাবীলের ভিত্তিতে প্রাধান্য পাবে কিংবা পাবে না। প্রথমটিকে مؤول। আর দ্বিতীয়টিকে مشترك বলে।

قوله فَالْمُؤَوَّلُ فِى الْحَقِيْقَةِ الخ : এটা একটা প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন : مؤول শব্দটি تاويل এর ইসমে মাফউল। তাবীল বা ব্যাখ্যা করা মূলত মুজতাহিদের কাজ। অতএব গঠনের দিক দিয়ে মুওআওয়ালকে শব্দের প্রকার স্থির করা কিভাবে সঠিক হতে পারে?

উত্তর : مؤول হলো مشترك এর একটি প্রকার। অর্থাৎ গঠনের দিক দিয়ে মুশতারিক যা একাধিক অর্থ বোঝায় তার কোনো একটি অর্থকে প্রাধান্য দেয়া হয় তখন তাকে মুআওয়াল বলে। অতএব এটা মুশতারিকের একটি প্রকার হলো। গঠনের দিক দিয়ে মুশতারিক শব্দের একটি প্রকার। আর কোনো বস্তুর এক প্রকার থেকে আরেকটি প্রকার বের হলে তা তারই প্রকার হয়। অতএব مشترك এর মাধ্যমে مؤول গঠনের দিক দিয়ে مشترك এর প্রকার হবে।

প্রশ্ন : যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, مؤول শব্দের প্রকারভেদের অন্তর্গত। আর مشترك ও শব্দের একটি প্রকার। কাজেই مشترك ও مؤول এর মাঝে দ্বন্দ্ব বা পারস্পরিক সাংঘর্ষিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ একই বিভক্তি অধীনে বিষয়সমূহ একটি অপরটি থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে।

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

وَالثَّانِى فِىْ وُجُوْهِ الْبَيَانِ بِذٰلِكَ النَّظْمِ اَىِ التَّقْسِيْمُ الثَّانِىْ فِىْ طُرُقِ ظُهُوْرِ الْمَعْنٰى وَخَفَائِهِ بِذٰلِكَ النَّظْمِ الْمَذْكُوْرِ فِى التَّقْسِيْمِ الْاَوَّلِ مِنَ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ اَىْ كَيْفَ يَظْهَرُ الْمَعْنٰى مِنَ النَّظْمِ مَسُوْقًا اَوْ غَيْرَ مَسُوْقٍ مُحْتَمِلًا لِلتَّاوِيْلِ اَوْ لَا وَكَيْفَ يَخْفَى الْمَعْنٰى مِنَ اللَّفْظِ خَفَاءً سَهْلًا اَوْ كَامِلًا وَهِىَ اَرْبَعَةٌ اَيْضًا اَلظَّاهِرُ وَالنَّصُّ وَالْمُفَسَّرُ وَالْمُحْكَمُ لِاَنَّهُ اِنْ ظَهَرَ مَعْنَاهُ فَاِمَّا اَنْ يَحْتَمِلَ التَّاوِيْلَ اَوْ لَا فَاِنِ احْتَمَلَهُ فَاِنْ كَانَ ظُهُوْرُ مَعْنَاهُ بِمُجَرَّدِ الصِّيْغَةِ فَهُوَ الظَّاهِرُ وَاِلَّا فَهُوَ النَّصُّ وَاِنْ لَمْ يَحْتَمِلْهُ فَاِنْ قَبِلَ النَّسْخَ فَهُوَ الْمُفَسَّرُ وَاِلَّا فَهُوَ الْمُحْكَمُ فَهٰذِهِ الْاَقْسَامُ كُلُّهَا بَعْضُهَا اَوْلٰى مِنْ بَعْضٍ فَيُوْجَدُ الْاَدْنٰى فِى الْاَعْلٰى وَلَا تَبَايُنَ بَيْنَهَا وَاِنَّمَا التَّبَايُنُ بِحَسْبِ الْاِعْتِبَارِ بِخِلَافِ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ وَالْمُشْتَرَكِ فَاِنَّهَا مُقَابِلَةٌ بِنَفْسِهَا فَلِهٰذَا لَمْ يَذْكُرِ الْمُقَابِلَ فِى التَّقْسِيْمِ الْاَوَّلِ وَذَكَرَ فِى الثَّانِىْ فَقَطْ -

অনুবাদ॥ ***দ্বিতীয় বিভক্তি হলো, উক্ত শব্দের মাধ্যমে বর্ণনার প্রকারসমূহ প্রসঙ্গে।*** অর্থাৎ, বিভক্তি বিন্যাস হলো– خاص ও عام সম্পর্কীয় যেসব শব্দ প্রথম বিভক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, সে সব শব্দের মাধ্যমে অর্থের স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতার প্রকারভেদের আলোচনা প্রসঙ্গে। অর্থাৎ, শব্দ হতে উক্ত অর্থ কিভাবে প্রকাশিত হয়? উদ্দেশ্যগত ব্যবহৃতরূপে, না অন্য কোন উপায়ে? তা ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে, কি না? এবং শব্দের অর্থ কিভাবে অস্পষ্ট থাকে? সাধারন অস্পষ্ট, না পূর্ণাঙ্গ অস্পষ্ট?

এটাও চার প্রকার। ১. ظاهر (স্পষ্ট), ২. النص (ব্যাখ্যাযোগে সুস্পষ্ট), ৩. المفسر (ব্যাখ্যামূলক), ৪. المحكم। মজবুত ও সুদৃঢ়। (চার প্রকারে হওয়ার কারণ এই যে, যদি শব্দের অর্থ স্পষ্ট হয়, তবে হয়তো তা ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখবে, অথবা রাখবে না। যদি ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে আর তার অর্থের স্পষ্টতা কেবল শব্দ দ্বারা অর্জিত হয়, তাহলে তা হলো ظاهر (স্পষ্ট অর্থ জ্ঞাপক)। অন্যথায় তা হলো نص- আর যদি কোনরূপ ব্যাখ্যার সম্ভাবনা না রাখে, আর তা রহিত হওয়াকে গ্রহণ করে, তাহলে তার নাম مفسر (তথা ব্যাখ্যামূলক)। অন্যথায় তা محكم তথা সুদৃঢ় (যদি রহিত হওয়াকে কবুল না করে)

বস্তুতঃ এই প্রকারসমূহের প্রত্যেকটি একটি অপরটি হতে শক্তিশালী। ফলে আপেক্ষিক দুর্বল প্রকারটি উচ্চতর প্রকারের মধ্যে পাওয়া যায় এবং এদের মধ্যে কোনরূপ বৈপরীত্য নেই। বৈপরীত্য শুধু বিবেচনাগত (اعتبارى) কারণে থাকে। তবে خاص - عام ও مشترك এগুলোর বিপরীত। কেননা, এগুলো সত্তাগতভাবে একটি অপরটির বিরোধী। এজন্যে গ্রন্থকার প্রথম বিভক্তিতে বিপরীত প্রকার উল্লেখ করেন নি। কেবল দ্বিতীয় বিভক্তি উল্লেখ করেছেন।

(পূর্বের বাকী অংশ) **উত্তর :** مؤول যেহেতু প্রকৃতপক্ষে মুশতারিকের একটি প্রকার। অতএব উভয় প্রকারের মধ্যে পারস্পরিক ভিন্নতা থাকা জরুরি নয়। কারণ প্রকার এবং যার থেকে প্রকারসমূহ বের হয় তার মধ্যে কোনো সংঘাত থাকে না। মুআওয়ালকে যদি মুশতারিকের প্রকার সাব্যস্ত করা হয়। তাহলে উত্তর এই হবে যে, উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক ভিন্নতা বা বৈপরিত্ব বিদ্যমান রয়েছে। তা এভাবে যে, মুআওয়ালের মধ্যে প্রাধান্য দেয়ার শর্ত রয়েছে। আর মুশতারিকের মধ্যে কোনো একটির প্রাধান্য থাকে না। কাজেই উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য সুস্পষ্ট।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله والثانى فى وجوه البيان الخ : মুসান্নিফ (র) অর্থ স্পষ্ট হওয়ার দিক দিয়ে نظم **তথা শব্দের দ্বিতীয় বিভক্তি উল্লেখ করেছেন।** অর্থাৎ শব্দের অর্থ স্পষ্ট হবে অথবা অস্পষ্ট হবে। স্পষ্ট হলে তা কথা **বলার ক্ষেত্রে হবে অথবা অন্য ক্ষেত্রে।** তাবীল ও তাখসীসের সম্ভাবনা রাখবে অথবা সম্ভাবনা রাখবে না। অর্থ স্পষ্ট হলে তা কোন পর্যায়ের অল্প নাকি বেশি? মোটকথা অর্থ স্পষ্ট হওয়ার দিক দিয়ে শব্দ ৪ ভাগে বিভক্ত।

১. ظاهر .২ نص .৩ مفسر .৪ محكم

دليل حصر **বা ৪টির মধ্যে সীমিত হওয়ার দলিল :** শব্দের অর্থ স্পষ্ট হলে তা ২ অবস্থা থেকে খালি নয়। হয়তো তা তাবীল ও তাখসীসের সম্ভাবনা রাখবে কিংবা রাখবে না। সম্ভাবনা রাখলে পুনরায় তা ২ ধরনের হবে। কারণ অর্থ স্পষ্ট হওয়াটা হয়তো শুধু শব্দের কারণে হবে (উল্লেখিত শব্দটি হয়তো উক্ত অর্থ বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত হবে বা উক্ত অর্থ বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত হবে না। তবে এর জন্য শর্ত এই যে, শ্রোতা একই ভাষার লোক হতে হবে।) অথবা শুধু শব্দ দ্বারাই তার অর্থ স্পষ্ট হবে না। বরং তা স্পষ্ট করার জন্য অন্য শব্দ ব্যবহৃত হবে। যদি শুধু শব্দ দ্বারাই অর্থ স্পষ্ট হয় তাহলে তাকে ظاهر বলে। আর শুধু শব্দ দ্বারা স্পষ্ট না হলে তাকে نص বলে। শব্দটি যদি তাবীল ও তাখসীস এর সম্ভাবনা না রাখে তাহলে তা ২ অবস্থা থেকে খালি নয়। হয়তো রাসূলুল্লাহ (স) এর যুগে তা মানসূখ হবে অথবা মানসূখ হবে না। প্রথমটি مفسر আর দ্বিতীয়টি محكم। অতএব মানসূখ না হওয়া কখনো যুক্তিগতভাবে তার মধ্যে পরিবর্তনের সম্ভাবনা না থাকার কারণে হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব ও একত্ব জ্ঞাপক আয়াতসমূহ অথবা রাসূলুল্লাহ (স) এর ওফাতের কারণে অহী বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মানসূখের সম্ভাবনা থাকে না। প্রথম ক্ষেত্রে محكم لعينه এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে محكم لغيره বলে।

মুসান্নিফ (র) বলেন– উপরোক্ত ৪ প্রকারের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো সংঘাত (تباين) নেই। বরং আপেক্ষিক বৈপরিত্ব (اعتبارى تباين) রয়েছে। এর বিপরীতে প্রথম বিভক্তির সকল প্রকারের মধ্যে প্রকৃত বৈপরিত্ব রয়েছে। জাহির, নস ইত্যাদির মধ্যে আপেক্ষিক বৈপরিত্ব এভাবে যে, জাহিরের মধ্যে عدم سوق كلام তথা বাক্য ব্যবহার না করা ধর্তব্য। আর নস এর মধ্যে سوق كلام তথা বাক্য ব্যবহার ধর্তব্য। মুফাসসার এর মধ্যে নসখ্ কবুল করা ধর্তব্য হয়। আর মুহকামের মধ্যে নসখ্ কবুল না করা ধর্তব্য হয়।

এগুলোর মধ্যে حقيقى تباين তথা প্রকৃত বৈপরিত্ব এজন্য বিদ্যমান নেই যে, স্পষ্টতার দিক দিয়ে মুহকাম মুফাসসার থেকে শক্তিশালী এবং উত্তম। আর মুফাসসার নস থেকে শক্তিশালী। এভাবে নস জাহিরের তুলনায় শক্তিশালী। সুতরাং নস এর মধ্যে যাহির বিদ্যমান থাকবে এবং মুফাসসারের মধ্যে নস বিদ্যমান থাকবে। এভাবে মুহকামের মধ্যে মুফাসসার বিদ্যমান থাকবে। অতএব ২ প্রকার যখন একত্রিত হতে পারে কাজেই তাদের মধ্যে পারস্পরিক বৈপরিত্ব থাকতে পারে না।

প্রথম বিভক্তির প্রকারভেদসমূহ তথা খাছ, আ'ম ইত্যাদির মধ্যে পারস্পরিক বৈপরিত্ব ও দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। এ কারণে মুসান্নিফ (র) তার সাংঘর্ষিক বা বিপরীত প্রকারসমূহ উল্লেখ করেননি। আর দ্বিতীয় বিভক্তির প্রকারসমূহের মধ্যে যেহেতু বৈপরিত্ব (تقابل وتباين) পাওয়া যায় না। এ কারণে তার বিপরীতসমূহের আলোচনা করেছেন।

فقال وَلِهٰذِهِ الاَرْبَعَةِ اَرْبَعَةٌ تُقَابِلُهَا اى لِهٰذِهِ الاَقْسَامِ الاَرْبَعَةِ لِلظُّهُورِ اَقْسَامٌ اَرْبَعَةٌ اُخَرُ تُقَابِلُهَا فِى الْخَفَاءِ فَكَمَا اَنَّ فِى الاَوَّلِ بعضَهَا اَوْلٰى مِنْ بعضٍ فِى الظُّهُورِ كَذٰلِكَ فِى الْمُقَابِلِ بَعْضُهَا اَوْلٰى مِنْ بَعْضٍ فِى الْخَفَاءِ فَيُوْجَدُ الاَدْنٰى فِى الاَعْلٰى وَهِىَ الْخَفِىُّ وَالْمُشْكِلُ وَالْمُجْمَلُ وَالْمُتَشَابِهُ لِاَنَّهُ اِنْ خَفِىَ مَعْنَاهُ فَاِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ خَفَاؤُهُ لِعَارِضٍ غَيْرِ الصِّيْغَةِ فَهُوَ الْخَفِىُّ اَوْ لِنَفْسِ الصِّيْغَةِ فَاِنْ اَمْكَنَ اِدْرَاكُهُ بِالتَّاَمُّلِ فَهُوَ الْمُشْكِلُ وَاِنْ لَّمْ يُمْكِنْ فَاِنْ كَانَ الْبَيَانُ مَرْجُوًّا مِنْ جَانِبِ الْمُتَكَلِّمِ فَهُوَ الْمُجْمَلُ وَاِلَّا فَهُوَ الْمُتَشَابِهُ وَهٰذَا التَّقْسِيْمُ وَكَذَا التَّقْسِيْمُ الرَّابِعُ يَتَعَلَّقُ بِالْكَلَامِ كَمَا اَنَّ التَّقْسِيْمَ الاَوَّلَ وَالثَّالِثَ يَتَعَلَّقُ بِالْكَلِمَةِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ - وَالثَّالِثُ فِى وُجُوْهِ اِسْتِعْمَالِ ذٰلِكَ النَّظْمِ اى التقسيمُ الثَّالِثُ فِى طُرُقِ اِسْتِعْمَالِ ذٰلِكَ النَّظْمِ الْمَذْكُوْرِ سَابِقًا مِنْ اَنَّهُ اسْتُعْمِلَ فِى مَعْنَاهُ الْمَوْضُوْعِ لَهٗ او غَيْرِهِ اَوِ اسْتُعْمِلَ مَعَ انْكِشَافِ مَعْنَاهُ اَوِ اسْتِتَارِهٖ .

অনুবাদ॥ এ মর্মে তিনি বলেন, *এ চার প্রকারের বিপরীতে আরো চারটি প্রকার রয়েছে।* অর্থাৎ স্পষ্টতার বিচারে বিভক্ত চার প্রকারের বিপরীতে অস্পষ্টতার বিচারে অন্য চারটি প্রকার রয়েছে। যেভাবে প্রথমোক্ত চারটি প্রকারের মধ্যে স্পষ্টতার দিক দিয়ে একটি অপরটি হতে উত্তম, তেমনি অস্পষ্টতার বিচারেও প্রতিপক্ষ প্রকারগুলোর একটি অপরটি থেকে অধিক অস্পষ্ট। ফলে ন্যূনতমটি উচ্চতর প্রকারের মধ্যে পাওয়া যাবে।

বিপরীত ৪টি হলো– ১. الخفى *(অস্পষ্ট)*, ২. المشكل *(কষ্টসাধ্য)*, ৩. المجمل (*সংক্ষিপ্ত*), ৪. المتشابه *(দুর্বোধ্য ও মিশ্রিত)।* (এ চার প্রকারের সীমাবদ্ধ হওয়ার) কারণ এই যে, যদি শব্দের অর্থ অস্পষ্ট হয়, তবে হয়তো তার অস্পষ্টতা সীগাহ ব্যতীত অন্য কোন কারণে হয়, তাহলে তাকে خفى বলা হবে। কিংবা মূল সীগার কারণে হবে। যদি চিন্তা-গবেষণা দ্বারা তার অর্থ বোঝা সম্ভব হয়, তাহলে তাকে مشكل বলা হয়। আর (তার অর্থ উদঘাটন করা) সম্ভব না হলে, যদি বক্তার পক্ষ হতে বর্ণনার আশা করা যায়, তাহলে তাকে مجمل বলা হয়। অন্যথায় বলো متشابه।

উল্লেখ যে এই বিভক্তি এবং অনুরূপ চতুর্থ বিভক্তি বাক্যের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন প্রথম ও তৃতীয় বিভক্তি শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমনটা সবারই কাছে স্পষ্ট।

তৃতীয় বিভক্তি হলো উক্ত শব্দের ব্যবহারিক প্রকারসমূহ প্রসঙ্গে। অর্থাৎ, তৃতীয়বিভক্তি হলো ইতঃপূর্বে উল্লিখিত শব্দের প্রয়োগগত প্রকারভেদ সম্পর্কে; এ হিসেবে যে, শব্দটি যে অর্থের জন্যে গঠন করা হয়েছে সে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কি-না? না-কি অণ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? অথবা শব্দটি স্বীয় অর্থের স্পষ্টতাসহ ব্যবহৃত হয়েছে, না-কি অর্থের অস্পষ্টতাসহ ব্যবহৃত হয়েছে?

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ তিনি বলেন যে, অর্থ স্পষ্ট হওয়ার দিক দিয়ে শব্দের উল্লেখিত ৪ প্রকারের জন্য আরো ৪টি প্রকার রয়েছে। অস্পষ্টতার দিক দিয়ে সেগুলো প্রথম ৪টির বিপরীত। সুতরাং প্রথমগুলোর মধ্যে যেভাবে অর্থ স্পষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে ১টি অপরটি থেকে শক্তিশালী ও উত্তম। তদ্রূপ তার বিপরীত প্রকারভেদের মধ্যে অস্পষ্টতার দিক দিয়েও একটি অপরটির থেকে শক্তিশালী এবং উত্তম। উক্ত ৪ প্রকার এই-

১. خفى ২. مشكل ৩. مجمل ৪. متشابه

دليل حصر : এই চার প্রকারে সীমাবদ্ধ হওয়ার দলিল : শব্দের অর্থ যদি অস্পষ্ট হয় তাহলে তা দু ধরনের হতে পারে। হয়তো মূল শব্দের কারণে তার অর্থ অস্পষ্ট হবে অথবা অন্য কোনো কারণে অস্পষ্ট হবে। যদি কোনো কারণ সাপেক্ষে অস্পষ্ট হয় তাহলে তা خفى আর শব্দের কারণে অস্পষ্ট হলে পুনরায় তা ২ ধরনের হবে। শব্দের আগে পরে চিন্তা-ভাবনা করার দ্বারা তার অর্থ বোধগম্য করা সম্ভব হবে কিংবা না। সম্ভব হলে তা مشكل আর সম্ভব না হলে তা আবার ২ ধরনের হবে। বক্তার পক্ষ থেকে তা স্পষ্ট করার সম্ভাবনা থাকবে কিংবা না। প্রথম ক্ষেত্রে তাকে مجمل বলে। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাকে متشابه বলে।

মুসান্নিফ (র) বলেন দ্বিতীয় ও চতুর্থ বিভক্তি উভয়টি বাক্যের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর প্রথম ও তৃতীয় বিভক্তি বাহ্যিকভাবে শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট। দ্বিতীয় ও চতুর্থ বিভক্তি বাক্যের সাথে সংশ্লিষ্ট এভাবে যে, দ্বিতীয় বিভক্তি উদ্দেশ্য প্রকাশের দিক দিয়ে। আর চতুর্থ বিভক্তি مراد তথা উদ্দেশ্যকে প্রমাণিত করার দিক দিয়ে। আর مراد তথা উদ্দেশ্য ২টি শব্দের মধ্যকার পরস্পর সম্বন্ধের নাম। كلام তথা বাক্য এমন শব্দ সমষ্টিকে বলে যা পারস্পরিক সম্বন্ধের সাথে কমপক্ষে দুটি শব্দকে তার মধ্যে শামিল করে। اسناد তথা সম্বন্ধ বলে এক শব্দের সাথে অপর শব্দের সাথে সম্পৃক্ত হওয়াকে। যার দ্বারা শ্রোতা পরিপূর্ণ উপকার লাভ করতে পারে।

সারকথা এই যে, مراد হলো ২ শব্দের মধ্যকার সম্পর্ক। আর كلام ও প্রকৃতপক্ষে সম্পর্কেরই নাম। এ কারণে দ্বিতীয় ও চতুর্থ বিভক্তি উভয়টি كلام সংশিষ্ট হলো। এভাবেও বলা যেতে পারে যে, দ্বিতীয় বিভক্তি দ্বারা স্পষ্ট হওয়া উদ্দেশ্য। আর চতুর্থ বিভক্তি দ্বারা উদ্দেশ্যের অবগতি লাভ হয়। আর উদ্দেশ্য স্পষ্ট হওয়া ও উদ্দেশ্য অবগত হওয়া উভয়টি كلام সংশ্লিষ্ট। একারণে দ্বিতীয় ও চতুর্থ বিভক্তি উভয়টির সম্বন্ধ হলো كلام এর সাথে।

পক্ষান্তরে প্রথম ও তৃতীয় বিভক্তি كلمه (শব্দ) এর সংশ্লিষ্ট এই জন্যে যে, প্রথম বিভক্তি وضع তথা শব্দের গঠনের দিক দিয়ে। আর وضع বলে কোনো শব্দকে অর্থের জন্যে নির্দিষ্ট করাকে। এ নির্দিষ্ট করাটা হলো معنى مفرد - তৃতীয় বিভক্তি শব্দের ব্যবহারের দিক দিয়ে। শব্দের ব্যবহারও معنى مفرد - অতএব উভয়টির মধ্যে معنى مفر লক্ষ্য থাকে। আর معنى مفرد শব্দের হয়ে থাকে; বাক্যের নয়। অতএব উভয়টির সম্বন্ধ শব্দের সাথে হলো।

অর্থ জ্ঞাপক শব্দের তৃতীয় বিভক্তি হলো শব্দ ব্যবহারের দিক দিয়ে অর্থাৎ শব্দটি তার মূল অর্থে ব্যবহৃত হবে কিংবা না। অথবা এভাবে ব্যবহৃত হবে যে, তার অর্থও স্পষ্ট কিংবা অস্পষ্ট।

وَهِيَ أَرْبَعَةٌ أَيْضًا اَلْحَقِيْقَةُ وَالْمَجَازُ وَالصَّرِيْحُ وَالْكِنَايَةُ لانه اِنِ اسْتُعْمِلَ فِىْ مَعْنَاه الْمَوْضُوعِ لَهُ فَهُوَ حَقِيْقَةٌ اَوْ فِىْ غَيْرِ الْمَوْضُوعِ لَهُ فَمَجَازٌ ثُمَّ كُلٌّ مِنْهُمَا اِنِ اسْتُعْمِلَ بِانْكِشَافِ مَعْنَاه فَهُوَ الصَّرِيْحُ وَاِلَّا فَهُوَ الْكِنَايَةُ فَالصَّرِيْحُ وَالْكِنَايَةُ يَجْتَمِعَانِ مَعَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ وَلِذَا قَالَ فَخْرُ الْاِسْلَامِ وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ فِى وُجُوْهِ اسْتِعْمَالِ ذٰلِكَ النَّظْمِ وَجَرَيَانِهِ فِىْ بَابِ الْبَيَانِ فَجَعَلَ الْحَقِيْقَةَ وَالْمَجَازَ رَاجِعٌ اِلَى الْاِسْتِعْمَالِ وَالصَّرِيْحَ وَالْكِنَايَةَ رَاجِعٌ اِلَى الْجَرَيَانِ وَجَعَلَ صَاحِبُ التَّوْضِيْحِ كُلًّا مِنَ الصَّرِيْحِ وَالْكِنَايَةِ قِسْمًا مِنَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ - وَالرَّابِعُ فِىْ مَعْرِفَةِ وُجُوْهِ الْوُقُوْفِ عَلَى الْمُرَادِ اى التَّقْسِيْمُ الرَّابِعُ فِى مَعْرِفَةِ طُرُقِ وُقُوْفِ الْمُجْتَهِدِ عَلَى مُرَادِ النَّظْمِ وَهُوَ وَاِنْ كَانَ فِى الظَّاهِرِ مِنْ صِفَاتِ الْمُجْتَهِدِ لٰكِنَّهُ يَؤُوْلُ اِلَى حَالِ الْمَعْنَى وَبِوَاسِطَتِهِ اِلَى اللَّفْظِ وَلِذَا قِيْلَ اِنَّ هٰذَا التَّقْسِيْمَ لِلْمَعْنَى دُوْنَ اللَّفْظِ

অনুবাদ ॥ *এটাও চার যথা- ১.* حقيقت *(প্রকৃত অর্থবোধক), ২.* مجاز *(রূপক অর্থবোধক), ৩.* صريح *(প্রকাশ্য অর্থবোধক), ৪.* كناية *(ইঙ্গিতমূলক অর্থবোধক।)* চার প্রকারে সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ : কেননা, যদি শব্দটি যে অর্থের জন্যে গঠিত, সে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তবে তাকে حقيقت বলা হয়। অথবা যে অর্থের জন্যে গঠন করা হয়েছে, সে অর্থ ব্যতিরেকে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হলে, তাকে مجاز বলা হয়। এদুটির প্রত্যেকটি যদি তার স্পষ্টতাসহ ব্যবহৃত হয়, তাহলে তাকে صريح বলা হয়। অন্যথায় তাতে كناية বলে। সুতরাং صريح এবং كناية হাকীকত ও মাজাযের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ জন্যেই ইমাম ফখরুল ইসলাম (র) বলেছেন– اَلْقِسْمُ الثَّالِثُ فِىْ وُجُوْهِ اِسْتِعْمَالِ ذٰلِكَ النَّظْمِ وَجَرَيَانِهِ فِىْ بَابِ الْبَيَانِ অর্থাৎ, তৃতীয় বিভক্তি হলো উক্ত শব্দের ব্যবহার প্রক্রিয়াসমূহ ও বর্ণনাক্ষেত্রে তার প্রচলন প্রসঙ্গে। অতএব, তিনি حقيقت ও مجاز কে ব্যবহারের দিকে এবং صريح ও كناية কে প্রচলনের দিকে ধাবিত সম্পৃক্ত করে দিলেন। আর توضيح নামক গ্রন্থ প্রণেতা صريح ও كناية এর প্রত্যেকটিকে হাকীকত ও মাজাযের এক এক প্রকাররূপে স্থির করেছেন। ***চতুর্থ উদ্দিষ্ট অর্থ অনুধাবনের পদ্ধতিসমূহের পরিচিতি প্রসঙ্গে।*** অর্থাৎ, চতুর্থ বিভক্তি হলো মুজতাহিদ কর্তৃক শব্দের উদ্দিষ্ট অর্থ উপলব্ধি করার পদ্ধতিসমূহ অবগত হওয়া প্রসঙ্গে। এ উপলব্ধি যদিও বাহ্যতঃ মুজতাহিদের বিশেষণ বা গুণ, তথাপি তা শব্দার্থের সাথে সম্পৃক্ত, আর অর্থের মাধ্যমে শব্দের সাথে সম্পৃক্ত। এ কারণে বলা হয় যে, এ (চতুর্থ) বিভক্তিটি অর্থ সম্পর্কিত, শব্দ সম্পর্কিত নয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ ব্যবহারিক দিক দিয়ে শব্দ ৪ প্রকার। ১. حقيقت ২. مجاز ৩. صريح ৪. كناية

دليل حصر বা ৪ প্রকারে সীমিত হওয়ার দলিল : শব্দ তার মূল অর্থে ব্যবহৃত হবে বা অন্য কোনো علاقة সূত্রে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হবে। প্রথমটিকে হাকীকত এবং দ্বিতীয়টিকে মাজায বলে। এ ২টির প্রত্যেকটি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে স্পষ্ট হবে অথবা স্পষ্ট হবে না। প্রথমটিকে صريح এবং দ্বিতীয়টিকে كناية বলে। উল্লেখ্য যে, ব্যবহারের আগে কোনো শব্দ হাকীকত বা মাজায, সরীহ বা কেনায়া কোনোটি হয় না।

قوله فَالصَّرِيْحُ وَالْكِنَايَةُ يَجْتَمِعَانِ الخ : এটা একটা প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন : যে কোন বিভক্তির প্রকারসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বৈপরিত্ব থাকে। অথচ উল্লেখিত প্রকারসমূহের মধ্যে কোনো বৈপরিত্ব নেই। বরং صريح ও كناية হাকীকতের সাথে একত্রিত হতে পারে। এভাবে মাজাযের সাথেও একত্রিত হতে পারে।

উত্তর : صريح ও كناية এর মধ্যে ২টি অভিমত রয়েছে। ১. আল্লামা ফখরুল ইসলাম (র) এর অভিমত এই যে, এটা মূলত ১টি বিভক্তি নয় বরং ২টি বিভক্তি। হাকীকত এবং মাজায ব্যবহারিক দিক দিয়ে শব্দের ২টি প্রকার এবং সরীহ ও কেনায়া হওয়ার দিক দিয়ে শব্দের ২টি প্রকার। পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, এক বিভক্তির প্রকারসমূহ অপর বিভক্তির প্রকারসমূহের সাথে একত্রিত হতে পারে। কাজেই সরীহ এবং কেনায়া, হাকীকত এবং মাজাযের সাথে একত্রিত হওয়ায় কোনো দোষ নেই। তবে এক্ষেত্রে কোরআনের মোট ৫টি বিভক্তি হয়ে যায়। ফলে পূর্বে উল্লেখিত ৪ বিভক্তির মধ্যে সীমিত বলা বাতিল সাব্যস্ত হয়।

এর উত্তর এই যে, ১. পূর্বে উল্লেখিত حصر বা সীমিতকরণ حصر استقرائ স্বরূপ عقلي নয়।

২. তাউযীহ গ্রন্থকার সাদরুশ শরীয়ার অভিমত এই যে, সরীহ এবং কেনায়া হাকীকত এবং মাজাযের পারস্পরিক প্রকারভেদ নয়। বরং হাকীকত ও মাজাযের প্রকার। অর্থাৎ প্রথমত শব্দ ২ প্রকার– হাকীকত ও মাজায। এরপর এর প্রত্যেকটি আবার ২ প্রকার সরীহ ও কেনায়া। আর একথা স্বীকৃত যে, এক বিভক্তির সকল প্রকারের মধ্যে পারস্পরিক বৈপরিত্ব থাকা শর্ত। কিন্তু বিভক্তি বা اقسام ও مقسم এর মধ্যে বৈপরিত্ব থাকা শর্ত নয়। অতএব হাকীকত এবং মাজায যেহেতু مقسم এর পর্যায়ে গণ্য হয়। আর সরীহ ও কেনায়া হলো সে ২টির প্রকার। এ কারণে সরীহ ও কেনায়া হাকীকত ও মাজাযের সাথে একত্রিত হওয়ায় কোনো দোষ নেই। কোনো কোনো আলিম এর উত্তর দেন যে, এক বিভক্তির প্রকারসমূহের মধ্যে বৈপরিত্ব থাকা জাতিগতভাবে শর্ত নয়। বরং আপেক্ষিক প্রভেদ বা فرق اعتباري থাকা যথেষ্ট। আর এক্ষেত্রে পরস্পরে আপেক্ষিক পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। তা এভাবে যে, হাকীকতের মধ্যে শব্দ তার মূল অর্থে ব্যবহৃত হওয়া ধর্তব্য হয়। তা স্পষ্ট না কি অস্পষ্ট সেদিকে দৃষ্টি থাকে না। আর মাজাযের মধ্যে মূল অর্থ ছাড়া ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হওয়া লক্ষ্য থাকে। অর্থ স্পষ্ট কি অস্পষ্ট তার প্রতি লক্ষ থাকে না। এভাবে সরীহ এর মধ্যে স্পষ্ট হওয়া ধর্তব্য। চাই তা তার মূল অর্থে ব্যবহৃত হোক বা ভিন্ন অর্থে। কেনায়ার মধ্যে অর্থ অস্পষ্ট থাকা ধর্তব্য হয়। এর মধ্যেও মূল অর্থে বা ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হবার প্রতি দৃষ্টি রাখা হয় না। অতএব এগুলো একটি অপরটির সাথে একত্রিত হওয়ার মধ্যে কোনো দোষ নেই। কারণ পারস্পরিক আপেক্ষিক ব্যবধান থেকেই যায়।

قوله وَالرَّابِعُ فِيْ مَعْرِفَةِ الخ : عبارةالنص، اشارة النص ইত্যাদির মধ্যে নস দ্বারা এমন শব্দ উদ্দেশ্য যা তার অর্থ বোঝায়। এখনে নস দ্বারা দ্বিতীয় বিভক্তিতে জাহিরের বিপরীতে উল্লেখিত নস উদ্দেশ্য নয়। আর অর্থ দ্বারা এটা উদ্দেশ্য হলো যা عبارة النص، اشارة النص، دلالة النص، اقتضاء النص দ্বারা সাব্যস্ত হয়।

মুসান্নিফ (র) বলেন– চতুর্থ বিভক্তি এদিক দিয়ে যে, মুজতাহিদ لفظ ও نظم এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিভাবে অবগত হবেন? এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, চতুর্থ বিভক্তিকে কিতাবুল্লাহর বিভক্তিসমূহের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা ঠিক নয়। কারণ কিতাবুল্লাহর বিভক্তিসমূহ نظم ও معني এর বিভক্তির অনুরূপই। চতুর্থ বিভক্তি হলো وقوف তথা অবগত হওয়া প্রসঙ্গে। আর অবগত হওয়াটা মুজতাহিদের বিশেষণ। কাজেই অবগত হওয়া যেহেতু মুজতাহিদের বিশেষণ এবং চতুর্থ বিভক্তি অবগত হওয়ার বিভক্তি প্রসঙ্গে। কাজেই চতুর্থ বিভক্তিকে কিতাবুল্লাহর বিভক্তিসমূহের অন্তর্গত গণ্য করা কিভাবে সঠিক হতে পারে?

উত্তর : نظم এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হওয়া যদিও দৃশ্যত মুজতাহিদের বিশেষণ। তবে তা অর্থের অবস্থার দিকে ধাবিত হয়। অর্থাৎ মুজতাহিদ দেখবেন যে, অর্থ ও উদ্দেশ্য কিভাবে সাব্যস্ত হয়। عبارة النص দ্বারা নাকি اشارة النص দ্বারা, دلالة النص দ্বারা নাকি اقتضاء النص দ্বারা। অতপর অর্থের মাধ্যমে শব্দের দিকে ধাবিত হয়। মোটকথা মুজতাহিদের অবগতি এবং তার জ্ঞান শব্দ ও অর্থ উভয়টির দ্বারাই লাভ হয়। এ বিভক্তির মধ্যে যেহেতু অর্থই আসল। আর শব্দ হলো তার তাবে' অনুগামী। এ কারণে এ বিভক্তিকে অর্থের বিভক্তি সাব্যস্ত করা হয়েছে।

وَهِيَ أَرْبَعَةٌ أَيْضًا اَلْاِسْتِدْلَالُ بِعِبَارَةِ النَّصِّ وَبِإِشَارَتِهِ وَبِدَلَالَتِهِ وَبِاقْتِضَائِهِ لِأَنَّ الْمُسْتَدِلَّ إِنِ اسْتَدَلَّ بِالنَّظْمِ فَإِنْ كَانَ مَسُوْقًا فَهُوَ عِبَارَةُ النَّصِّ وَإِلَّا فَإِشَارَةُ النَّصِّ وَإِنْ لَّمْ يَسْتَدِلَّ بِالنَّظْمِ بَلْ بِالْمَعْنٰى فَإِنْ كَانَ مَفْهُوْمًا مِنْهُ بِحَسَبِ اللُّغَةِ فَهُوَ دَلَالَةُ النَّصِّ وَإِلَّا فَإِنْ تَوَقَّفَ عَلَيْهِ صِحَّةُ النَّظْمِ شَرْعًا اَوْ عَقْلًا فَهُوَ اقْتِضَاءُ النَّصِّ وَإِنْ لَّمْ يَتَوَقَّفْ عَلَيْهِ فَهُوَ مِنَ الْاِسْتِدْلَالَاتِ الْفَاسِدَةِ عَلٰى مَا سَيَجِيْءُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى -

অনুবাদ ॥ *এটাও চার প্রকার। যথা- ১.* الاستدلال بعبارة النص *(শব্দের বাচনবঙ্গি দ্বারা দলিল গ্রহণ),* ২. الاستدلال باشارة النص *(শব্দের ইঙ্গিত দ্বারা দলিল গ্রহণ),* ৩. الاستدلال باقتضاء النص *(শব্দের উদ্দেশ্যগত অর্থের দ্বারা দলিল গ্রহণ, ৪. এবং* الاستدلال باقتضاء النص *(শব্দের প্রাসঙ্গিক দাবির দ্বারা দলিল গ্রহণ)।*

(এ প্রকার চারে সীমিত হওয়ার) কারণ : দলিল গ্রহণকারী যদি শব্দ দ্বারা দলিল গ্রহণ করেন, তাহলে তা যদি বিশেষ অর্থের জন্যে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নেয়া হয়, তবে তা عبارة النص অন্যথায় (যদি উদ্দেশ্যমূলকভাবে নেয়া না হয়) তা হলো اشارة النص

যদি দলিল গ্রহণকারী শব্দ দ্বারা দলিল গ্রহণ না করেন। বরং মর্মার্থ দ্বারা দলিল গ্রহণ করেন, তাহলে ঐ অর্থটি যদি আভিধানিক দৃষ্টিকোণে শব্দ হতে বোধগম্য হয়, তাহলে তা دلالة النص অন্যথায় যদি উক্ত অর্থের ওপর শরীআতের দৃষ্টিতে অথবা যৌক্তিকতার আলোকে শব্দের শুদ্ধতা নির্ভরশীল হয়, তাহলে সেটা اقتضاء النص হবে। আর যদি তার প্রয়োগ বিশুদ্ধতা ঐ অর্থের ওপর নির্ভর না করে, তাহলে তা استلالات فاسدة বা ভ্রান্ত দলিল গ্রহণের অন্তর্গত হবে, যার বর্ণনা ইনশা আল্লাহ অচিরেই আসছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ এ বিভক্তির অধীনেও ৪টি প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে।

১. استدلال بعبارة النص ২. استدلال باشارة النص ৩. استدلال بدلالة النص ৪. استدلال باقتضاء النص

دليل الحصر **বা সীমিত হওয়ার দলিল :** দলিল পেশকারী প্রথমত: শব্দের দ্বারা দলিল পেশ করবেন কিংবা অর্থ দ্বারা। শব্দের দ্বারা দলিল পেশ করলে তা ২ ধরনের হতে পারে। উক্ত শব্দকে অর্থের জন্য উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহার করেছেন কিংবা না। যদি উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহার করে থাকেন তাহলে এটাকে استدلال بعبارة النص বলে। অন্যথায় তাকে استدلال باشارة النص বলে। আর যদি অর্থের দ্বারা দলিল পেশ করেন তাহলে তা ২ ধরনের হতে পারে। শব্দ দ্বারা উক্ত অর্থটি অভিধানের মাধ্যমে অবগত হবেন কিংবা না। যদি অভিধানের মাধ্যমে অবগত হন তাহলে তাকে استدلال بدلالة النص বলে। আর অভিধানের মাধ্যমে হলে তা ২ ধরনের হতে পারে। উক্ত অর্থের উপর শব্দ প্রযোজ্য সঠিক হওয়া শরীআতের দৃষ্টিতে বা যুক্তিরভিত্তিতে মৌকুফ হবে কিংবা না। প্রথম ক্ষেত্রে তাকে استدلال باقتضاء النص বলে। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাকে استدلالات فاسدة বলে। সামনে এর আলোচনা আসছে।

وَبَعْدَ مَعْرِفَةِ هٰذِهِ الْاَقْسَامِ قِسْمٌ خَامِسٌ يَشْمَلُ الْكُلَّ اى بعدَ معرفةِ هٰذه الْاَقسامِ العِشْرِيْنَ الْحَاصِلَةِ مِنَ التَّقْسِيْمَاتِ الْاَرْبَعَةِ تقسيمٌ خامِسٌ يَشْمُلُ كُلًّا مِّنَ الْعِشْرِيْنَ وَهُوَ اَرْبَعَةٌ اَيْضًا مَعرِفَةُ مَوَاضِعِهَا وَمَعَانِيْهَا وَتَرْتِيْبِهَا وَاَحْكَامِهَا اى هٰذَا التقسيمُ اربعةُ اقسامٍ ايضًا معرفةُ مَواضِعِها اىْ مَاخَذِ اِشْتِقَاقِ هٰذا الْاَقسامِ وهُوَ اَنَّ لَفْظَ الْخَاصِّ مُشْتَقٌّ مِّنَ الْخُصُوصِ وهُوَ الْاِنْفِرَادُ واِنَّ الْعَامَّ مُشْتَقٌّ مِّنَ الْعُمُوْمِ وهُوَ الشُّمُوْلُ وقِسْ عَلَيْهِ وَمَعَانِيْهَا الْمَفْهُومَاتُ الْاِصْطِلَاحِيَّةُ وهِيَ اَنَّ الْخَاصَّ فِي الْاصطلاحِ لَفْظٌ وُضِعَ لِمَعْنًى مَعلومٍ علَى الْاِنْفرادِ والْعَامُّ هو مَا انْتَظَمَ جمعًا مِّنَ الْمُسَمَّيَاتِ وَتَرْتِيْبِهَا اى مَعْرِفَةُ اَنَّ اَيَّهَا يُقَدَّمُ عِنْدَ التَّعَارُضِ مَثَلًا اِذَا تَعَارَضَ النَّصُّ والظَّاهِرُ يُقَدَّمُ النَّصُّ عَلَى الظَّاهِرِ وَاَحْكَامِها اى اَنَّ اَيُّهَا قَطْعِيٌّ وَاَيُّهَا ظَنِّيٌّ وايُّها واجبُ التَّوَقُّفِ فَالْخاصُّ قَطْعِيٌّ والعامُّ الْمَخصوصُ ظَنِّيٌّ والْمُتَشَابِهُ واجبُ التَّوَقُّفِ -

অনুবাদ॥ *এ সমস্ত প্রকারের পরিচিতি লাভের পর পঞ্চম আরেকটি বিভক্তি রয়েছে, যা উপরোক্ত সকল প্রকারকে শামিল করে।* অর্থাৎ এ চারটি বিভক্তি দ্বারা অর্জিত এই বিশটি প্রকারের পরিচয় লাভের পর পঞ্চম আরেকটি বিভক্তি রয়েছে, যা বিশ প্রকারের প্রত্যেকটিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

এটাও চার প্রকার। যথা- ১. উক্ত প্রকারসমূহের উৎপত্তিস্থলের পরিচিতি লাভ করা, ২. এগুলোর অর্থ অনুধাবন করা, ৩. এগুলোর ক্রম-মান প্রসঙ্গে অবহিত হওয়া, ৪. এবং এগুলোর আহকাম বা বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়া। অর্থাৎ, এই বিভক্তিগুলোও চার প্রকার।

প্রথমতঃ উপরোক্ত প্রকারগুলোর উৎসসমূহের পরিচিতি তথা ঐগুলোর مشتق منه বা নিষ্পন্ন হওয়ার স্থল প্রসঙ্গে জানা। যেমন خاص শব্দটি خصوص মাসদার হতে নিষ্পন্ন এর অর্থ হলো পৃথক পৃথক হওয়া। عام শব্দটি عموم মাসদার হতে গঠিত এর অর্থ হলো ব্যাপকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা। এর ওপর অন্যগুলোকে অনুমান করো।

দ্বিতীয়তঃ ঐ প্রকারগুলোর অর্থ বলতে পারিভাষিক উদ্দিষ্ট অর্থকে বুঝায়। যেমন পরিভাষায় خاص এমন শব্দকে বলা হয়, যাকে এককভাবে নির্দিষ্ট অর্থের জন্যে গঠন করা হয়েছে। পরিভাষায় عام এমন শব্দকে বলে, যা একই শ্রেণীভুক্ত একাধিক একককে অন্তর্ভুক্ত করে।

তৃতীয়তঃ ঐগুলোর ক্রম-বিন্যাস সম্পর্কে অবহিত হওয়া। অর্থাৎ, পারিবারিক বিরোধের ক্ষেত্রে তন্মধ্য হতে কোনটি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে, সে মর্মে জ্ঞান লাভ করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, যদি نص ও

ظاهر এর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তাহলে نص ও ظاهر কে ظاهر এর ওপর অগ্রাধিকার দেয়া হবে। চতুর্থতঃ ঐগুলোর বিধান সম্পর্কে অবহিত হওয়া। অর্থাৎ এগুলোর কোনটি قطعى (অকাট্য), কোনটি ظنى (ধারণাপ্রসূত) এবং কোনটির ব্যাপারে توقف বা নীরবতা অবলম্বন অপরিহার্য, সে সম্পর্কে অবগত হওয়া। অতএব, خاص হলো বিধানগত অকাট্য عام مخصوص منه البعض (বিধানগত ধারণাপ্রসূত) এবং متشابه এর ব্যাপারে নীরব থাকা অপরিহার্য।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ قوله وَبَعْدَ مَعْرِفَةِ هٰذِهِ الخ : মানার গ্রন্থকার (র) উল্লেখিত ৪ বিভক্তি দ্বারা অর্জিত ২০ প্রকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের পরে পঞ্চম এক বিভক্তি বর্ণনা করছেন। এর অধীনেও ৪টি প্রকার রয়েছে।

(১) উল্লেখিত ২০ প্রকারের উৎপত্তি স্থল অর্থাৎ مشتق منه এর পরিচয় যেমন خاص শব্দটি خصوص থেকে উৎপত্তি। এর অর্থ হলো একক হওয়া। এভাবে عام শব্দটি عموم হতে উৎপত্তি। অর্থ– শামিল হওয়া। - اشتراك مشترك থেকে উৎপত্তি। অর্থ শরিক হওয়া। বাকীগুলোকেও এ অনুযায়ী অনুমান কর।

(২) উল্লেখিত ২০ প্রকারের অর্থ অর্থাৎ পারিভাষিক সংজ্ঞা যেমন উসূলে ফিকহ এর পরিভাষায় خاص এমন শব্দকে বলে যা এককভাবে এমন অর্থ প্রকাশের জন্য গঠিত যা শ্রোতার জানা থাকে। عام এমন শব্দকে বলে যা একই ধরনের একাধিক একককে একই সময়ে শামিল করে। مشترك এমন শব্দকে বলে যা ভিন্ন ভিন্নভাবে অনেকগুলো একককে শামিল করে। উল্লেখিত ২০ প্রকারের মাঝে ক্রমধারা অনুযায়ী অর্থাৎ দলিল পেশকারী দ্বন্দ্বের সময় প্রাধান্যযোগ্য ও প্রাধান্যহীন এর পরিচয় জেনে প্রাধান্যযোগ্যকে অগ্রাধিকার দিবেন। যেমন জাহির ও নসের মধ্যে দ্বন্দ্ব হলে জাহিরের উপর নসকে অগ্রাধিকার দিবেন। নস ও মুফাসসারের মধ্যে দ্বন্দ্ব হলে মুফাসসারকে অগ্রাধিকার দিবেন। মুফাসসার ও মুহকাম এর মধ্যে تعارض হলে মুহকামকে অগ্রাধিকার দিবেন।

(৩) উল্লেখিত ২০ প্রকারের বিধান। অর্থাৎ কোনটির বিধান অকাট্য? কোনটির বিধান সন্দেহজনক, কোন ক্ষেত্রে নীরব থাকতে হবে বা واجب التوقف।

فَاِذَا ضُرِبَتْ هٰذِهِ الْاَقْسَامُ فِى الْعِشْرِيْنَ تَصِيْرُ الْاَقْسَامُ ثَمَانِيْنَ وَالتَّقْسِيْمَاتُ خَمْسَةٌ وَهٰذَا التَّقْسِيْمُ الْخَامِسُ لَيْسَ فِى الْوَاقِعِ تَقْسِيْمًا لِّلْقُرْاٰنِ بَلْ تَقْسِيْمٌ لِاَسَامِى اَقْسَامِ الْقُرْاٰنِ وَمَوْقُوْفٌ عَلَيْهِ لِتَحْقِيْقِهَا وَلِهٰذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الْجُمْهُوْرُ وَاِنَّمَا هُوَ اِخْتِرَاعُ فَخْرِ الْاِسْلَامِ وَتَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ (رح) وَلٰكِنْ فَخْرُ الْاِسْلَامِ لَمَّا ذَكَرَ هٰذَا التَّقْسِيْمَ فِى اَوَّلِ الْكِتَابِ سَلَكَ فِي اٰخِرِهٖ عَلٰى سُنَّتِهٖ فَذَكَرَ كُلًّا مِّنَ الْمَوَاضِعِ وَالْمَعَانِى وَالتَّرْتِيْبِ وَالْاَحْكَامِ فِىْ كُلٍّ مِّنَ الْاَقْسَامِ وَالْمُصَنِّفُ اِنَّمَا ذَكَرَ الْمَعَانِى وَالْاَحْكَامَ فَقَطْ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَوَاضِعَ اَصْلًا وَذَكَرَ التَّرْتِيْبَ فِىْ بَعْضِ الْاَقْسَامِ فَقَطْ --

---

অনুবাদ॥ এই চার প্রকারকে বিশ দ্বারা গুণ করলে **সর্বমোট, প্রকারসমূহ আশিতে দাঁড়াবে। (২০ × ৪ = ৮০)** আর বিভক্তি সংখ্যা পাঁচ হবে। মূলতঃ এই **পঞ্চম বিভক্তি কুরআনের শ্রেণী বিন্যাস নয়; বরং কুরআনের প্রকারসমূহের** পারিভাষিক নামের শ্রেণী বিন্যাস। **কুরআনের প্রকারসমূহকে কার্যকর করা এর ওপর নির্ভরশীল।** এজন্য জুমহুর তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ **উলামায়ে কিরামএই বিভক্তিটি উল্লেখ করেননি।**

পঞ্চম বিভক্তি কেবল **ইমাম ফখরুল** ইসলাম (র)-এর **উদ্ভাবিত। আল-মানার গ্রন্থকার (র) তাঁরই** অনুসরণ করেছেন কিন্তু **ইমাম ফখরুল ইসলাম (র) যেভাবে এটাকে স্বীয় গ্রন্থ উসূলুল বযদভী (র) এর প্রারম্ভে উল্লেখ** করেছেন, তেমনি তিনি এ গ্রন্থের শেষ **পর্যন্ত স্ব-রীতিতে চলেছেন (অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত** এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।)। **তাই তিনি বিশ প্রকারের প্রত্যেক উৎস, অর্থ, ক্রম-ধারা ও বিধানের** প্রত্যেকটিকে উল্লেখ করেছেন। **আর গ্রন্থকার শুধু অর্থসমূহ ও বিধানাবলি উল্লেখ করেছেন।** তিনি উৎপত্তিস্থলসমূহের কথা আদৌ উল্লেখ করেননি। **আর ترتيب তথা ক্রম-ধারা সম্পর্কে কোন কোন** প্রকারের মধ্যে সামান্য আলোচনা করেছেন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ঃ মোটকথা পঞ্চম বিভক্তির **৪ প্রকারের মধ্যে প্রত্যেকটি প্রকার পূর্বোল্লিখিত ২০ প্রকারের প্রত্যেক প্রকারকে শামিল করে।** এ কারণে পঞ্চম **বিভক্তির ৪ প্রকারকে ২০ দ্বারা গুণ করলে সর্বমোট ৮০ প্রকার হয়। আর বিভক্তি হয় সর্বমোট ৫ টি।**

প্রশ্ন : এ ব্যাপারে প্রশ্ন হতে পারে যে, পূর্বে কোরআনের ৪টি **বিভক্তি উল্লেখ করেছেন। ব্যাখ্যাকার ৪টির মধ্যে** সীমিত হওয়ার দলিলও বর্ণনা করেছেন। এখন বিভক্তি **৫টি উল্লেখের দ্বারা পূর্বের দাবী বাতিল প্রমাণিত হলো।**

উত্তর : পঞ্চম বিভক্তি মূলত কোরআনের ভিন্ন কোনো **বিভক্তি নয়। বরং এটা কোরআনের প্রকারভেদসমূহের নামের বিভক্তি। কোরআনের প্রকারভেদসমূহকে প্রমাণিত করার জন্য এগুলো موقوف عليه এর পর্যায়ে।**

এটা যেহেতু প্রকৃতপক্ষে বিভক্তি নয়। **একারণেই সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমগণ এটাকে উল্লেখ করেননি। তবে আল্লামা ফখরুল** ইসলাম (র) যেভাবে এই বিভক্তিকে **কিতাবের শুরুতে উল্লেখ করেছেন তদ্রূপ কিতাবের শেষেও উল্লেখ করেছেন।** অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত একই পদ্ধতি **অবলম্বন করেছেন। উল্লেখিত ২০ প্রকারের সবগুলোর উৎসমূল, অর্থ, ক্রমধারা ও বিধান বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। আর মানার গ্রন্থকার কেবল অর্থ ও বিধান উল্লেখ করেছেন। উৎসমূল সম্পূর্ণরূপে পরিহার করেছেন। কেনোটির মধ্যে ক্রমধারার উল্লেখ করেছেন কোনোটির মধ্যে করেননি।**

ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) عَنْ بَيَانِ اِجْمَالِ التَّقْسِيْمِ شَرَعَ فِيْ بَيَانِ تَفَاصِيْلِ الْاَقْسَامِ - فَقَالَ : اَمَّا الْخَاصُّ فَكُلُّ لَفْظٍ وُضِعَ لِمَعْنًى مَعْلُوْمٍ عَلَى الْاِنْفِرَادِ - فَقَوْلُهُ كُلُّ لَفْظٍ بِمَنْزِلَةِ الْجِنْسِ لِكُلِّ الْفَاظِ وَالْبَاقِيْ كَالْفَصْلِ فَقَوْلُهُ وُضِعَ لِمَعْنًى يُخْرِجُ الْمُهْمَلَ وَقَوْلُهُ مَعْلُوْمٍ اِنْ كَانَ مَعْنَاهُ مَعْلُوْمُ الْمُرَادِ يَخْرُجُ مِنْهُ الْمُشْتَرَكُ لِاَنَّهُ غَيْرُ مَعْلُوْمِ الْمُرَادِ وَاِنْ كَانَ مَعْنَاهُ معلومُ الْبَيَانِ لم يَخْرُجِ الْمُشْتَرِكُ مِنْهُ وَيَخْرُجُ مِنْ قَوْلِهِ عَلَى الْاِنْفِرَادِ لِاَنَّ مَعْنَاهُ حِيْنَئِذٍ اَنْ يَكُوْنَ الْمَعْنَى مُنْفَرِدًا عَنِ الْاَفْرَادِ وَعَنْ معنًى اٰخَرَ فَيَخْرُجُ عَنْهُ الْمُشْتَرِكُ وَالْعَامُّ جَمِيْعًا -

---

خاص-এর আলোচনা

অনুবাদ ॥ অতঃপর গ্রন্থকার শ্রেণীবিন্যাসের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে অবসর হওয়ার পর প্রকারসমূহের বিস্তারিত বিবরণদান আরম্ভ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, خاص ***এমন প্রত্যেক শব্দকে বলে, যাকে এককভাবে একটি মাত্র সুনির্দিষ্ট অর্থের জন্যে গঠন করা হয়েছে।***

(خاص এর সংজ্ঞায় উল্লিখিত) كل لفظ হলো جنس তথা জাতিবাচক শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত। আর অবশিষ্ট উক্তি فصل তথা পার্থক্যসূচক শব্দের পর্যায়ভুক্ত। গ্রন্থকারের উক্তি وضع (সংজ্ঞা থেকে) অর্থবিহীন শব্দকে বের করে দেয়। আর তাঁর উক্তি معلوم এর অর্থ যদি معلوم المراد তথা উদ্দেশ্য পরিজ্ঞাত হয়, তাহলে খাসের সংজ্ঞা হতে مشترك বের হয়ে যাবে। কেননা, مشترك এর উদ্দেশ্য পরিজ্ঞাত নয়। আর যদি معلوم শব্দের অর্থ معلوم البيان বা বর্ণনা পরিজ্ঞাত হয়, তাহলে এ দ্বারা مشترك (একাধিক অর্থজ্ঞাপক শব্দ) বের হবে না। অবশ্য তা গ্রন্থকারের উক্তি على الانفراد দ্বারা বের হয়ে যাবে। কেননা, তখন এর অর্থ হবে خاص এর উদ্দিষ্ট অর্থটি এককসমূহ এবং অন্য অর্থ হতে মুক্ত হবে। তখন خاص এর সংজ্ঞা থেকে مشترك ও عام উভয় ধরনের শব্দ বের হয়ে যাবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ عَنْ بَيَانِ اِجْمَالِ التَّقْسِيْمِ الخ : মুসান্নিফ (র) সংক্ষিপ্ত বিভক্তি উল্লেখের পর প্রকারভেদসমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা শুরু করেছেন। সর্বাগ্রে তিনি خاص এর আলোচনা উল্লেখ করেছেন। خاص এর সংজ্ঞা বর্ণনায় তিনি বলেন–خاص এমন শব্দকে বলে যাকে এককভাবে কোনো এক অর্থ বোঝানোর জন্য গঠন করা হয়েছে।

প্রত্যেক সংজ্ঞা যেহেতু جنس ও فصل দ্বারা সংযুক্ত হয়। এ কারণে ব্যাখ্যাকার খাছ এর সংজ্ঞায় উল্লিখিত كل لفظ শব্দকে জিনস আখ্যা দিয়েছেন। এর মধ্যে সকল শব্দই শামিল রয়েছে। চাই তা مهمل (অর্থ বিহীন), হোক চাই অর্থ বিশিষ্ট হোক। وُضِعَ لِمَعْنًى হলো প্রথম فصل। এর দ্বারা অর্থবিহীন শব্দসমূহ খারিজ হয়ে গেছে। معلوم হলো দ্বিতীয় فصل। কেননা এর দ্বারা যদি নির্দিষ্ট অর্থ উদ্দেশ্য হয় তাহলে তা معلوم দ্বারা সংজ্ঞা থেকে খারিজ হয়ে গেছে। এভাবে মুশতারিক শব্দও বের হয়ে গেছে। কারণ তার সুনির্দিষ্ট অর্থ জানা থাকে না। আর معلوم দ্বারা যদি معلوم البيان অর্থ হয় অর্থাৎ যে অর্থ শব্দ দ্বারা সুস্পষ্ট তাহলে معلوم শব্দ দ্বারা মুশতারিক শব্দ খারিজ হবে না।

কারণ মুশতারিক শব্দ যে সকল অর্থের জন্য গঠিত সে সকল অর্থ উক্ত শব্দের দ্বারা সুস্পষ্ট হয়। তখন তৃতীয় ফসল على الانفراد দ্বারা মুশতারিক শব্দ খারিজ হয়ে যায়। কারণ এর উদ্দেশ্য হলো খাছ যে অর্থের জন্য গঠিত উক্ত অর্থ সকল একক থেকে ভিন্ন হতে হবে। অতএব খাছ এর অর্থ যেহেতু অন্য অর্থ থেকে ভিন্ন বা একক অর্থাৎ অন্য কোনো অর্থ তার মধ্যে শামিল থাকে না। কাজেই এর দ্বারা মুশতারিক শব্দ খারিজ হয়ে গেলো।

خاص এর অর্থ যেহেতু সকল একক থেকে ভিন্ন থাকে অর্থাৎ একাধিক একককে তার মধ্যে শামিল করে না। আর عام শব্দ এককসমূহ থেকে ভিন্ন হয়না। বরং তার অধীনে সব থেকে যায়। এ কারণে على الانفراد দ্বারা খাছ এর সংজ্ঞা থেকে আ'মও বের হয়ে গেলো।

সারকথা এই যে, لفظ معلوم এর অর্থ যদি معلوم المراد হয় তাহলে معلوم শব্দের দ্বারা খাছ এর সংজ্ঞা থেকে মুশতারিক খারিজ হয়ে যাবে। আর على الانفراد দ্বারা আ'ম খারিজ হয়ে যাবে। আর لفظ معلوم অর্থ নিলে এর দ্বারা মুশতারিক খারিজ হবে না। তখন على الانفراد দ্বারা মুশতারিক ও আ'ম খারিজ হয়ে যাবে।

এখানে ২টি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। একটি মূল মতনের উপর, অপরটি ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যার উপর।

১. মতনের উপর প্রশ্ন এই যে, মাতিনের উল্লিখিত খাছ এর সংজ্ঞা جامع নয়। কারণ এর মধ্যে لمعنى উল্লিখিত হওয়ার কারণে خاص العين (زيد) খারিজ হয়ে যায়। কারণ তা কোনো অর্থের জন্য গঠিত নয়।

উত্তর : অর্থ দ্বারা এখানে معنى مفهوم উদ্দেশ্য। চাই তা কোনো عين (সত্তা) হোক বা অর্থ হোক। অর্থাৎ খাছ এমন শব্দ যা ভিন্নভাবে নির্দিষ্ট কোনো মাফহুম তথা অর্থের জন্য গঠিত। কাজেই معنى দ্বারা مفهوم উদ্দেশ্য হলে তা عين তথা ব্যক্তি সত্তামূলক মাফহুমকেও শামিল করবে।

২. ব্যাখ্যার উপর প্রশ্ন এই যে, ব্যাখ্যাকার كل لفظ কে জিনসের স্থলে এবং বাকী কয়েদসমূহকে ফছলের স্থলে সাব্যস্ত করেছেন। অথচ সংজ্ঞার মধ্যে جنس এবং فصل উল্লেখ হয়ে থাকে। কাজেই এমন বলা উচিত ছিলো كل لفظ হলো جنس। আর অবশিষ্ট কয়েদসমূহ فصل।

উত্তর : হাকীকাত ২ প্রকার। ১. حقيقت نفس الامرى ২. حقيقت اعتبارى প্রথমটির উদাহরণ যেমন মানুষ। দ্বিতীয়টির উদাহরণ যেমন খাছ, আম, মুশতারিক ইত্যাদি। অতএব প্রথমটির মধ্যে জিনস এবং ফছল প্রকৃত অর্থে বিদ্যমান থাকে। আর اعتبارى حقيقت (আপেক্ষিক হাকীকত) এর মধ্যে জিনস ও ফছল اعتبارى তথা আপেক্ষিকভাবে থাকে। সুতরাং খাছ যেহেতু আপেক্ষিক হাকীকত। এ কারণে তার মধ্যে আপেক্ষিক জিনস ও ফছল থাকা যথেষ্ট। আর খাছ এর জিনস ও ফছল যেহেতু اعتبارى তথা আপেক্ষিক; حقيقى (প্রকৃত) নয়। একারণে ব্যাখ্যাকার بمنزلة الجنس এবং كالفصل উল্লেখ করেছেন। শুধু জিনস ও ফছল উল্লেখ করেননি।

وَاِنَّمَا ذُكِرَ اللَّفْظُ هٰهُنَا دُوْنَ النَّظْمِ جَرْيًا عَلَى الْاَصْلِ وَلِاَنَّ الظَّاهِرَ اَنَّ هٰذِهِ الْاَقْسَامَ لَيْسَتْ مُخْتَصَّةً بِالْكِتَابِ بَلْ يَجْرِىْ فِىْ جَمِيْعِ كَلِمَاتِ الْعَرَبِ وَاِنَّمَا ذُكِرَ النَّظْمُ فِى التَّقْسِيْمَاتِ رِعَايَةً لِلْاَدَبِ لِاَنَّ النَّظْمَ فِى الْاَصْلِ جَمْعُ اللُّؤْلُؤِ فِى السِّلْكِ بِخِلَافِ اللَّفْظِ فَاِنَّهُ فِى اللُّغَةِ الرَّمْىُ وَاَمَّا ذِكْرُ كَلِمَةِ "كُلّ" فَاِنَّهُ وَاِنْ كَانَ مُسْتَنْكَرًا فِى التَّعْرِيْفَاتِ فِى اِصْطِلَاحِ الْمَنْطِقِ وَلٰكِنَّ الْقَصْدَ هٰهُنَا لِبَيَانِ الْاِطِّرَادِ وَالضَّبْطِ وَهُوَ اِنَّمَا يَحْصُلُ بِلَفْظِ كُلٍّ -

---

অনুবাদ ॥ মুসান্নিফ (র) এখানে (خاص এর সংজ্ঞার ক্ষেত্রে) نظم শব্দ উল্লেখ না করে لفظ উল্লেখ করেছেন এ কারণে যে, এ ক্ষেত্রে তিনি মূল ভাষার অনুসরণ করেছেন। আর এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, এ প্রকারসমূহ কুরআনের শব্দের সাথে নির্দিষ্ট নয়; বরং আরবদের ব্যবহৃত সকল শব্দাবলিতেও এগুলোর প্রচলন রয়েছে। অবশ্য গ্রন্থকার বিভক্তিসমূহে শিষ্টাচার প্রদর্শনের লক্ষে نظم শব্দ উল্লেখ করেছেন। কেননা, অভিধানে نظم শব্দের অর্থ হলো সূতার মধ্যে মণিমুক্তা গাঁথা। অথচ لفظ শব্দটি এর বিপরীত। কেননা, এর অর্থ হলো নিক্ষেপ করা।

মানতিক শাস্ত্রের পরিভাষায় সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে كل (প্রত্যেক) শব্দ উল্লেখ করা যদিও দোষণীয়, কিন্তু এখানে মূল উদ্দেশ্য হলো- সংজ্ঞাকে অন্যের প্রবিষ্ট হওয়া থেকে পূর্ণাঙ্গ করা ও সংজ্ঞায়িত বস্তুর সকল افراد বা একককে সুসংহত করা। আর এ উদ্দেশ্যটি كل শব্দের দ্বারাই অর্জিত হয়ে থাকে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله وَاِنَّمَا ذُكِرَ اللَّفْظُ الخ : এই ইবারতে ২টি প্রশ্ন ও তার উত্তর উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম প্রশ্ন : মানার গ্রন্থকার খাছ এর সংজ্ঞায় لفظ উল্লেখ করেছেন। অথচ বিভক্তির ক্ষেত্রে لفظ এর স্থলে نظم উল্লেখ করেছেন। এর কারণ কি?

উত্তর : এর ২টি উত্তর রয়েছে। ১. لفظ এর উল্লেখই মূল। এ কারণে তিনি لفظ উল্লেখ করেছেন।

২. এই বিভক্তি কিতাবুল্লাহর সাথে খাছ নয় বরং আরবি সকল শব্দের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। অতএব ব্যাপকতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই نظم এর স্থলে لفظ উল্লেখ করেছেন। কারণ এ সময় বিশেষ আদবের প্রতি লক্ষ রাখা জরুরি নয়। তবে যেহেতু বিভক্তির ভূমিকার ক্ষেত্রে وَهُوَ اسْمٌ لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنٰى কিতাবুল্লাহর সাথে খাছ ছিলো। এই কারণে সেখানে نظم উল্লেখ করেছিলেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : খাছ এর সংজ্ঞায় মূল গ্রন্থকার كل শব্দ উল্লেখ করেছেন যা সকল আফরাদ তথা একককে বেষ্টন করে; অথচ সংজ্ঞা বস্তুর-মাহিয়াত তথা সত্তা সম্পর্কে করা হয়। আর আফরাদের মাধ্যমে সংজ্ঞা উল্লেখ করা হয় না। কাজেই كل শব্দ ব্যবহার করা সঠিক নয়।

উত্তর : সংজ্ঞার মধ্যে كل উল্লেখ করা মানতেকীগণের পরিভাষায় যদিও অপছন্দনীয় তবে সংজ্ঞাকে جامع مانع করার জন্য উসূল শাস্ত্রবিদগণের মতে তা অপছন্দনীয় নয় বরং উত্তম।

وَهُوَ اِمَّا اَن يكونَ خصوصَ الْجِنْسِ او خُصوصَ النَّوْعِ او خُصوصَ العَيْنِ تقسيمٌ لِلْخَاصِّ بعدَ بيانِ تعريْفِه اى الخصوصُ الّذى يُفْهَمُ فِىْ ضِمْنِ الْخاصِّ اِمَّا انْ يَكونَ خُصوْصَ الْجِنْسِ بِاَنْ يَكونَ جِنسُه خاصًّا بِحَسْبِ المَعْنٰى وانْ يَكُنْ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ مُتَعدِّدًا اَوْ خُصوْصَ النَّوْعِ عَلٰى هٰذِهِ الوَتِيْرَةِ او خصوْصَ الْعَيْنِ اى الشَّخْصُ الْمُعَيَّنُ وهٰذَا اَخَصُّ الْخَاصِّ - والجِنْسُ عِنْدَهُمْ عِبَارَةٌ عَنْ كُلِّيٍّ مَقولٍ عَلى كَثِيْرِيْنَ مُخْتَلِفِيْنَ بِالْاَغْرَاضِ دُوْنَ الْحَقَائِق كَمَا ذَهَبَ اِلَيْه الْمَنْطِقِيُّوْنَ وَالنَّوْعَ عِنْدَهُمْ كُلِّىٌّ مَقوْلٌ عَلٰى كَثِيرِيْنَ مُتَّفِقِيْنَ بِالاغْرَاضِ دُوْنَ الْحَقَائِق كَما هو رأىُ الْمَنْطِقِيِّيْنَ فَهُمْ اِنَّما يَبْحَثُوْن عَنِ الْاَغْرَاضِ دُوْنَ الْحَقَائِقِ فرُبَّ نَوْعٍ عِنْدَ الْمَنْطِقِيِّيْنَ جِنْسٌ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ كَمَا ظَهَرَ عَنِ الْاَمْثِلَة الَّتِىْ ذَكَرَهَا بِقَوْلِه كَاِنْسانٍ ورَجُلٍ و زَيْدٍ فَالْاِنْسَانُ نَظِيْرُ خَاصِ الْجِنْسِ فَاِنّه مَقول على كَثِيرِيْن مُخْتلِفِيْن بِالْاَغْرَاضِ فَاِنَّ تَحْتَه رَجُلٌ وامْرَأةٌ والغَرْضُ مِن خِلْقَةِ الرَّجُلِ هوكونُه نبيًّا وَّ امامًا وشاهِدًا فِى الحُدُوْدِ والقِصَاصِ ومُقيمًا لِلجُمُعَةِ والاَعْيادِ ونَحْوِه و الغَرضُ مِن المَرْاةِ كونُها مُسْتَفْرَشَةً اٰتِيَةً بِالْوَلِدِ مُدَبِّرَةً لِحوائج البَيْتِ وغَيْرِ ذٰلِكَ

অনুবাদ ॥ ***আর*** خصوص ***তথা নির্দিষ্টকরণ হয়তো*** خصوص الجنس ***(জাতিগত নির্দিষ্টকরণ), অথবা*** خصوص النوع ***(প্রজাতিগত নির্দিষ্টকরণ); কিংবা*** خصوص العين ***(ব্যক্তি বা বস্তুগত নির্দিষ্ট করণ) হবে।*** خاص এর সংজ্ঞা বর্ণনার পর এখান থেকে তার শ্রেণীবিন্যাস শুরু হয়েছে। অর্থাৎ, خاص শব্দের অধীনে যে নির্দিষ্টতা উপলব্ধি হয়, তা হয়তো ১. خصوص الجنس তথা জাতিগতভাবে নির্দিষ্ট হবে। এভাবে যে, অর্থের দিক দিয়ে তার جنس নির্দিষ্ট হবে। যদিও এর প্রয়োগক্ষেত্রের এককসমূহ একাধিক হয়। ২. অথবা একই পদ্ধতিতে خصوص النوع (প্রজাতিগত নির্দিষ্ট হবে।) (অর্থের দিক বিবেচনায় যদিও তার ব্যবহারক্ষেত্র একাধিক) ৩. কিংবা خصوص العين (নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুবাচক হবে।) অর্থাৎ, যা নির্দিষ্ট ব্যক্তি বুঝায়। আর এটি হলো اخص الخاص তথা সর্বাধিক নির্দিষ্ট শব্দ।

উসূল শাস্ত্রবিদগণের পরিভাষায় جنس এমন كلى বা সমষ্টিবাচক শব্দকে বলে, যা অধিক সংখ্যক আফরাদের উদ্দেশ্য বিশিষ্ট্য ওপর প্রযোজ্য হয়; কিন্তু প্রকৃতি ও তত্ত্বগত পরিচিতির দিক দিয়ে বিভিন্ন নয়। যেমনটি মানতিকীগণ এদিক অবলম্বন করেছেন। তাঁদের নিকট نوع বলতে এমন كلى বা সমষ্টিবাচক শব্দকে বলা হয়, যা অধিক সংখ্যক এককের ওপর প্রযোজ্য হয়, উদ্দেশ্যের অভিন্ন দিক বিবেচনায়; কিন্তু প্রকৃতি ও মূলতত্ত্বের দিক বিবেচনায় অভিন্ন নয়। যেমনটি মানতিকীগণের অভিমত।

সুতরাং, বোঝা গেল যে, উসূল শাস্ত্রবিদগণ (ব্যক্তি বা বস্তুর) উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা করে থাকেন; প্রকৃতি ও মূলতত্ত্ব নিয়ে নয়। ফলে মানতিকীগণের মতানুযায়ী অনেক প্রজাতিবাচক শব্দ (نوع) ফকীহগণের নিকট জাতিবাচক শব্দ (جنس) হিসেবে গণ্য। যেমনটা মুসান্নিফ (র) এর নিম্নের প্রদত্ব উদাহরণ দ্বারা, স্পষ্ট হয়ে যাবে।

উদাহরণ : *যেমন* انسان *(মানুষ),* رجل *(পুরুষ),* زيد *(বিশেষ ব্যক্তি)* এর মধ্যে الانسان শব্দটি خاص الجنس এর উদাহরণ। কেননা, انسان এমন অধিক সংখ্যক এককের ওপর প্রযোজ্য হয়, যাদের উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন : কারণ, এর অধীনে রয়েছে নারী ও পুরুষ। পুরুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো, সে রাসূল, ইমাম, শরয়ী দণ্ড কায়েমের ব্যাপারে সাক্ষ্যদানকারী, জুমুয়া ও উভয় ঈদের নামায প্রতিষ্ঠাকারী ও এ ধরনের অন্যান্য বিধানাবলি প্রচলনকারী হবে। আর নারী-সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো- সে পুরুষের শয্যা সঙ্গিনী, সন্তান প্রসবকারিণী, গৃহ পরিবেশের যাবতীয় প্রয়োজন সম্পন্নকারিণী এবং আরো দায়িত্ব সম্পাদনকারিণী হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله وَهُوَ إِمَّا اَنْ يَكُوْنَ الخ : নুরুল আনওয়ার গ্রন্থকার বলেন- এর মধ্যে وهو اما এর সর্বনাম দ্বারা পূর্বে উল্লেখিত খাছ শব্দের অধীনে যে خصوص পাওয়া যায় তা উদ্দেশ্য। কেমন যেন তিনি খাছ এর সংজ্ঞার পরে তার বিভক্তি উল্লেখ করেছেন। এ মর্মে তিনি বলেন خصوص তিন প্রকার।

১. خصوص جنس অর্থাৎ অর্থের দিক দিয়ে তার জিনস খাছ যদিও তা দ্বারা একাধিক বস্তু বোঝায়।

২. خصوص نوع অর্থাৎ অর্থের দিক দিয়ে তার نوع বা শ্রেণী খাছ হবে। যদিও তা বিভিন্ন বস্তু বোঝায়।

৩. خصوص عين অর্থাৎ নির্দিষ্ট সত্তা বোঝাবে। এটাকে اخص الخاص বলে।

جنس ও نوع এর সংজ্ঞায় মতপার্থক্য : ব্যাখ্যাকার বলেন- উসূল শাস্ত্রবিদ এবং মানতেকীগণের মধ্যে جنس ও نوع এর সংজ্ঞার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যের কারণ এই যে, উসূলবিদগণ শব্দের উদ্দেশ্য ও লক্ষ নিয়ে আলোচনা করেন। আর মানতেকীগণ মূল হাকীকত বা রহস্য নিয়ে আলোচনা করেন। কারণ উসূলীগণের উদ্দেশ্য হলো বিধান জানা। আর মানতেকীগণের উদ্দেশ্য হলো হাকীকত ও রহস্য উদঘাটন করা। এ কারণে উসূলীগণের মতে- جنس এমন কুল্লিকে বলে যা ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য বিশিষ্ট বহুসংখ্যক আফরাদের উপর প্রযোজ্য হয়। আর نوع এমন কুল্লীকে বলে যা একই উদ্দেশ্য বা হাকীকত বিশিষ্ট আফরাদের উপর প্রযোজ্য হয়। মানতেকীগণের পরিভাষায় جنس এমন কুল্লীকে বলে যা ভিন্ন ভিন্ন হাকীকত বিশিষ্ট আফরাদকে শামিল করে। আর نوع এমন কুল্লীকে বলে যা একই হাকীকত বিশিষ্ট আফরাদ বোঝায়।

এ মতপার্থক্যের কারণে বহু ক্ষেত্রে মানতেকীগণের নিকট একটি জিনিস نوع কিন্তু উসূলিগণের কাছে তা جنس যেমন- মানতিকীগণের নিকট মানুষ একটি نوع আর উসূলিগণের নিকট جنس

قوله كَالْاِنْسَانِ وَرَجُلِ الخ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র) উল্লেখিত তিনোপ্রকারের উদাহরণ পেশ করেছেন। তিনি বলেন মানুষ হলো خاص الجنس এর উদাহরণ। এটা এমন এক কুল্লী যা বিভিন্ন উদ্দেশ্য সম্বলিত আফরাদকে শামিল করে। কারণ মানুষের অধীনে নারী-পুরুষ বিদ্যমান রয়েছে। প্রত্যেকের জন্মের উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন। পুরুষ জন্মের উদ্দেশ্য হলো নবী হওয়া, নেতা হওয়া, বিভিন্ন শরয়ী দণ্ড ও কিসাসে সাক্ষী উপযোগী হওয়া, জুম'আ ও ঈদের নামায কায়েমকারী এবং বিভিন্ন শরয়ীবিধান বাস্তবায়নকারী হওয়া ইত্যাদি। আর নারী জন্মের উদ্দেশ্য হলো- সন্তান জন্ম দেয়া, গৃহস্থলি কাজকর্ম আঞ্জাম দেয়া, পুরুষের বাসনা পূরণ করা প্রভৃতি।

وَالرَّجُل نظِيرُ خاصّ النَّوْع فإنه مَقوْلٌ عَلى كثِيرِيْنَ مُتفقِيْن بالاَغْراض فَإنَّ اَفرادَ الرِّجال كُلّهُمْ سَواءٌ فِي الْغرَضِ وزَيْدٌ نَظِيرُ خَاصّ الْعَيْنِ فانّه شخصٌ مُعيّن لا يحتَمِلُ الشّرِكةَ إلاّ بتَعدُّدِ الْاَوْضاعِ - ولمّا فرَغَ الْمُصنِّفُ (رح) عَنْ تعريْفِ الخاصّ وتقسيْمِه شرَعَ فِي بَيانِ حُكْمِهٖ فَقَالَ وَحُكْمُهُ اَنْ يَّتَناوَلَ الْمَخْصُوْصَ قَطْعًا اى اَثرُهُ الْمُترَتّبُ عَلَيْه انَ يّتناوَلَ الْمَخصُوْصَ الّذِىْ هُو مَدْلولُه قطعًا بِحيْثُ يَقْطعُ اِحْتمالَ الْغيْرِ فَإذا قلْنا زيدٌ عالمٌ فزيْدٌ خاصٌّ لاَ يحْتمِلُ غَيْرَه اِحْتمالاً نَاشِيًا عَنْ دليْلٍ وعالمٌ اَيْضًا خاصٌّ لمْ يحْتمِلْ غَيْرَهُ كذٰلك فكُلُّ واحِدٍ مِّنَ الكَلِمتَيْن يَتناوَلُ مَدلُولَه قطعًا فثبَتَ مِنْ مَجْمُوعِ الكلامِ قطعيَّةَ الْحُكمِ بِعَالمٍ علىٰ زيْدٍ بهٰذه الْوَاسِطة وَلا يَحْتَمِلُ الْبيَانَ لِكَوْنِهٖ بيّنًا هٰذا حكمٌ اٰخرُ مُقوّ لِّلحُكمِ الْاوّلِ وكَاَنَّهُمَا مُتّحِدَانِ ولٰكنَّ الْاَوّلَ لِبيانِ الْمَذْهَب وَ الثّانِى لِنفْيِ قَوْلِ الْخَصْمِ و لِتَمْهِيْدِ التَّفْرِيْعاتِ الْاٰتِيَةِ اَىْ لا يحْتمِلُ الخاصُّ بَيانَ التّفسيْرِ لِكَوْنِه بيّنًا بِنَفْسِهٖ فهُوَ مُقابِلٌ لِلْمُجْمَلِ حَيْثُ يَحْتَاجُ الَى بيَانِ الْمُجْمِلِ وتفسيْرِه واَمّا بيانُ التّقريْرِ والتّغيِيْر فيَحتمِلُه الخاصُّ لِاَنَّهٗ لاَ يُنَافِي الْقَطْعِيّةَ فَإنَّ بيَانَ التّقرِيْرِ يُزِيْل الْاِحْتِمالَ النّاشِئ بِلا دليْلٍ فيكُوْنُ مُحْكَمًا كَما يُقَال جاءَنِي زيدٌ زيدٌ وبَيان التّغيِيْر يَحْتَمِلُه كُلُّ كلامٍ قَطْعِيًّا كانَ او ظنِّيًّا كما يُقال اَنْتِ طالِقٌ اِنْ دَخَلْتِ الدّارَ وهٰكذا بيَانُ التّبديل يَحْتَمله الخاصُّ ايضًا -

---

অনুবাদ ॥ ★ رجل শব্দটি হলো خاص النوع এর উদাহরণ। কেননা, এটা এমন অধিক সংখ্যক এককের ওপর প্রযোজ্য হয়, যেগুলোর উদ্দেশ্যে এক ও অভিন্ন। কারণ, رجال এর সকল একক উদ্দেশ্যের বিচারে সমপর্যায়ভুক্ত। زيد শব্দটি خاص العين এর উদাহরণ। কেননা, এটা নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝায়, যার মধ্যে অপরের অংশীদারিত্বের কোন সম্ভাবনা নেই। যদিও ভিন্ন ভিন্ন গঠনের দিক দিয়ে অংশীদারিত্বের সম্ভাবনা থাকে।

মুসান্নিফ (র) خاص এর সংজ্ঞা এবং তার শ্রেণী বিন্যাস বর্ণনা করা থেকে অবসর হওয়ার পর তার বিধান বর্ণনা শুরু করেছেন। তিনি বলেন, خاص *এর বিধান এই যে, তা নির্দিষ্ট বস্তুকে অকাট্যভাবে অন্তর্ভুক্ত করবে।* অর্থাৎ خاص এর যে প্রভাব তন্মধ্যে প্রতিফলিত হয় তা এই যে, উক্ত খাস ঐ উদ্দিষ্ট ও বিশেষিত বস্তুকে অকাট্যরূপে অন্তর্ভুক্ত করবে; এভাবে যে, তার মধ্যে অন্যের অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা থাকবে না।

সুতরাং, আমরা যখন زيد عالم (যায়েদ বিদ্বান) এ বাক্যটি বলি, এ মধ্যস্থিত زيد শব্দটি خاص যা দলিল দ্বারা উদ্ভূত অন্য কিছুর অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা রাখে না। এমনিভাবে عالم শব্দটিও খাস, যা তদ্ব্যতীত অন্য কোন কিছুর সম্ভাবনা রাখে না। অতএব, زيد ও عالم শব্দ দুটির প্রত্যেকটি স্বীয় উদ্দিষ্ট বিষয়কে অকাট্যভাবে

শামিল করে। সুতরাং এর মাধ্যমে বাক্যটির সম্মিলিতরূপ থেকে যায়েদের জন্যে বিদ্বান হওয়ার হুকুম অকাট্যভাবে সাব্যস্ত হয়েছে।

خاص **এর দ্বিতীয় হুকুম :** خاص *স্বয়ং সুস্পষ্ট হওয়ার কারণে কোনরূপ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সম্ভাবনা রাখে না।* এটি خاص এর অপর একটি হুকুম, যা প্রথম হুকুমের জন্যে শক্তিবর্ধক। বস্তুতঃ এ দুটি হুকুম এক ও অভিন্ন। তবে (পার্থক্য এই যে,) প্রথমটি দ্বারা হানাফীদের মাযহাব বর্ণনা করা উদ্দেশ্য, আর দ্বিতীয়টি দ্বারা প্রতিপক্ষের দাবি খণ্ডন করা এবং আগত প্রাসঙ্গিক মাসয়ালাসমূহের ভূমিকা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, খাস بيان تفسير এর সম্ভাবনা রাখে না। কেননা, তা নিজেই সুস্পষ্ট। সুতরাং خاص শব্দ مجمل এর প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত হলো। কারণ مجمل স্থূল শব্দ। এটা বক্তব্যদাতার ব্যাখ্যার প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে।

অবশ্য খাস শব্দ بيان تقرير (দৃঢ়তাসূচক বর্ণনা) এবং بيان تغيير (পরিবর্তনমূলক বর্ণনা)-এর সম্ভাবনা রাখে। কেননা خاص বর্ণনার অকাট্যতার পরিপন্থী নয়। কারণ بيان تقرير দলিলবিহনি সৃষ্ট সম্ভাবনাকে দূরীভূত করে দেয়। ফলে خاص শব্দটি তা দ্বারা محكم (সুদৃঢ়) হয়ে যায়। যেমন বলা হয়- جاء نى زيد زيد আমার নিকট যায়েদ, যায়েদ আসলো। আর প্রত্যেক বক্তব্যই بيان تغيير এর সম্ভাবনা রাখে। চাই বক্তব্যটি অকাট্য হোক কিংবা ধারণামূলক হোক। যেমন বলা হয়- انت طالق ان دخلت الدار তুমি তালাকপ্রাপ্তা, যদি ঘরে প্রবেশ কর। (ان دخلت الدار হলো بيان تغيير) অনুরূপভাবে خاص শব্দ بيان التبديل (পরিবর্তনমূলক বর্ণনা) এরও সম্ভাবনা রাখে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ رجل তথা পুরুষ হলো خاص النوع এর উদাহরণ। কারণ এটা এমন এক কুল্লী যা একই উদ্দেশ্য বিশিষ্ট বিভিন্ন এককের উপর প্রযোজ্য হয়। যেমন- পুরুষের সকল একক বা আফরাদ উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে সমপর্যায়ের।

প্রশ্ন : কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, স্বাধীন পুরুষ ও কৃতদাসের বিধানের মধ্যে অনেক ব্যবধান রয়েছে। এভাবে ব্যবধান রয়েছে পাগল ও সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষের মধ্যেও। কাজেই সকল পুরুষ উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে সমপর্যায়ের হলো কিরূপে?

উত্তর : আমাদের কথা পুরুষের এমন আফরাদ সম্পর্কে যাদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা থাকে। আর তা কেবল স্বাধীন সুস্থ বিবেক সম্পন্ন পুরুষের ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। এদিক দিয়ে সকল পুরুষ সমান। অতএব رجل . خاص النوع এর উদাহরণ হওয়া সঠিক। زيد হলো خاص العين এর উদাহরণ। কারণ যায়েদ একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম। নামকরণের দিক দিয়ে এর মধ্যে কোনো অংশীদারীত্বের সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ পিতা-মাতা যে সন্তানকে বোঝানোর জন্য উক্ত নামে নামকরণ করেছে তার মধ্যে অন্যকেউ শামিল নেই। যদিও ভিন্ন ভিন্ন নামকরণের দিক দিয়ে তাতে অন্য কেউ শরীক থাকার সম্ভাবনা থাকে। যেমন একাধিক ব্যক্তি একই নামে নিজ নিজ পুত্রের নাম রাখলো।

قوله وحُكْمُهُ اَنْ يَتَنَاوَلَ الخ : মুসান্নিফ (র) খাছের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ উল্লেখ করার পর এখন তার বিধান বর্ণনা করছেন।

خاص এর বিধান বা হুকুম

حكم এমন আছর বা ক্রিয়াকে বলে যা কোনো বস্তুর উপর প্রযোজ্য হয়। যেমন বলা হয় حُكْمُ الصَّلٰوةِ سُقُوْطُ الْوَاجِبِ عَنْ ذِمَّةِ الْمُكَلَّفِ بِالْاَدَاءِ فِى الدُّنْيَا وحُصُوْلُ الثَّوَابِ فِى الْاٰخِرَةِ। অর্থাৎ নামাযের হুকুম হলো নামায আদায়ের মাধ্যমে দুনিয়াতে মুকাল্লাফ (শরয়ী হুকুম বর্তিত) ব্যক্তির জিম্মা থেকে ওয়াজিব রহিত হয়ে যাওয়া এবং পরকালে সওয়াব লাভ হওয়া।

خاص এর হুকুম বা আছর এই যে, (ক) خاص তার مخصوص তথা উদ্দেশ্যকে অকাট্যভাবে শামিল করে তার মধ্যে অন্য কোনো প্রকার সম্ভাবনা থাকে না।

উদাহরণ : যেমন আমরা বললাম زيد عالم এর মধ্যে যায়েদ একটি খাছ শব্দ। এটা এমন কোনো সম্ভাবনা রাখে না যা বোঝানোর জন্য কোনো দলিলের প্রয়োজন পড়ে। আলিমও একটি খাছ শব্দ। এটা অন্য কিছুর সম্ভাবনা রাখে না। মোটকথা উভয় শব্দ নিজ নিজ অর্থ ও উদ্দেশ্যকে অকাট্যরূপে শামিল করে। কাজেই পূর্ণ বাক্য দ্বারা যায়েদ জ্ঞানী হওয়া অকাট্যরূপে প্রমাণিত হয়।

قوله وَلاَيَحْتَمِلُ بَيَانَ الخ : (খ) দ্বিতীয় বিধান : মুসান্নিফ (র) خاص এর দ্বিতীয় হুকুম বা বিধান উল্লেখ করছেন যে, তা নিজেই সুস্পষ্ট হওয়ার কারণে কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সম্ভাবনা রাখে না।

দ্বিতীয় এ হুকুমটি প্রথম হুকুমের সহায়ক বা শক্তি বর্ধক। কেমন যেন উভয়টি পরস্পরে এক ও অভিন্ন। কারণ খাছ তার উদ্দেশ্যকে অকাট্যরূপে শামিল হওয়া এ বিষয়কে জরুরি করে যে, তা ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে না। তবে এতোটুকু পার্থক্য রয়েছে যে, প্রথম হুকুম অর্থাৎ ان يتناول المخصوص قطعا হানাফী মাযহাবকে বর্ণনা করার জন্য। কারণ হানাফী আলিমগণের মতে খাছ এর বিধান হলো অকাট্য। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী এবং শায়খ আবু মানছুর মাতুরিদির মতে ظنى তথা সন্দেহজনক। আর দ্বিতীয় হুকুম অর্থাৎ لايحتمل البيان এটা ইমাম শাফেয়ী (র)এর উক্তিকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য। কারণ ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে খাছ শব্দও ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে।

খাছের দ্বিতীয় হুকুমটি সামনের ৭টি শাখা মাসআলার মধ্য হতে প্রথম তিনটির জন্য ভূমিকা স্বরূপ। আর অবশিষ্ট ৪টি শাখা মাসআলা প্রথম বিধান অর্থাৎ ان يتناول المخصوص এর উপর ভিত্তি করে উল্লেখিত হয়েছে। মোটকথা খাছ যেহেতু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সম্ভাবনা রাখে না। এ কারণে এটা মুজমালের পরিপন্থী হলো। কারণ মুজমাল ইজমালকারীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মুখাপেক্ষী হয়।

بيان تفسير ছাড়া আরো ৩ ধরনের বয়ান রয়েছে। ১. بيان تقرير ২. بيان تغيير ৩. بيان تبديل

১. بيان تقرير : বাক্যকে এমন বিষয়ের সাথে গুরুত্বারোপ করা যা মাজায বা খাছ হওয়ার সম্ভাবনাকে দূর করে দেয়। যেমন– جاء زيد نفسه এবং আল্লাহ তা'আলার ফরমান فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ

২. بيان تغيير : এমন বিষয় উল্লেখ করা যা পূর্বের বিধানকে পরিবর্তন করে দেয়। যেমন শর্তারোপ করা, ইস্তেসনা করা ইত্যাদি।

৩. بيان تبديل দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নসখ অর্থাৎ পূর্বের বিধান রহিত করা। কারণ এটা বান্দার ক্ষেত্রে পরিবর্তনযোগ্য হয়ে থাকে। আর শরীআত প্রবর্তকের ক্ষেত্রে মুতলাক বিধানের সময়সীমা বর্ণনা করা গণ্য হয়। মোটকথা খাছ যদিও بيان تفسير এর সম্ভাবনা রাখে না তবে بيان تقرير بيان تغيير و بيان تبديل এর সম্ভাবনা রাখে। কারণ এ তিনোটি বয়ান অকাট্য ও একীনি হওয়ার পরিপন্থী। কেননা بيان تغيير দলিল বিহীন সৃজিত সম্ভাবনাকে দূর করে। অতএব যে খাছের সাথে بيان تقرير মিলিত হবে তা بيان تقرير এর পরে মুহকাম হয়ে যাবে। যেমন جَاءَنِىْ زَيْدٌ زَيْدٌ এর মধ্যে দ্বিতীয় যায়েদ উল্লেখের পূর্বে সম্ভাবনা ছিলো যে, যায়েদ আসেনি বরং তার কোনো বন্ধু এসেছে। রূপক অর্থে যায়েদের বন্ধুকে যায়েদ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। দ্বিতীয়বার যায়েদের নাম উল্লেখ করার দ্বারা এ সম্ভাবনা দূর হয়ে মূল যায়েদ আসার বিষয়টি মুহকাম তথা সুদৃঢ় হয়ে গেছে। আর بيان التغيير এর সম্ভাবনা সকল বাক্যেই থাকে। চাই বাক্যটি অকাট্য হোক বা সন্দেহমূলক হোক। যেমন أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ এর মধ্যে শুধু أَنْتِ طَالِقٌ দ্বারা তাৎক্ষণিক তালাক পতিত হয়। কিন্তু إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ এই বিধানকে পরিবর্তন করে দিয়ে তাৎক্ষণিক তালাক পতিত হতে বাধা প্রদান করেছে। এভাবে بيان تبديل অর্থাৎ মানসূখ হওয়ার সম্ভাবনাও প্রত্যেক বাক্যে থাকে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) এর ওফাতের দ্বারা মানসূখ হওয়ার দরজা বন্ধ হয়ে গেছে।

فَلَا يَجُوْزُ الْحَاقُ التَّعْدِيْلِ بِاَمْرِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ عَلٰى سَبِيْلِ الْفَرْضِ شُرُوعٌ فِى تَفْرِيْعَاتٍ مُخْتَلِف فِيْمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الشَّافِعِىِّ (رح) عَلٰى مَا ذُكِرَ مِنْ حُكْمِ الْخَاصِّ يَعْنِى اِذَا كَانَ الْخَاصُّ لَا يَحْتَمِلُ الْبَيَانَ لِكَوْنِهٖ بَيِّنًا بِنَفْسِهٖ لَا يَجُوْزُ الْحَاقُ تَعْدِيْلِ الْاَرْكَانِ وَهُوَ الطَّمَانِيْنَةُ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَالْقَوْمَةِ بَعْدَ الرُّكُوْعِ وَالْجَلْسَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ بِاَمْرِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَهُوَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا عَلٰى سَبِيْلِ الْفَرْضِ كَمَا اَلْحَقَهٗ بِهٖ اَبُوْ يُوْسُفَ (رح) وَالشَّافِعِىُّ (رح) وَبَيَانُهٗ اَنَّ الشَّافِعِىَّ (رح) يَقُوْلُ تَعْدِيْلُ الْاَرْكَانِ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ فَرْضٌ لِحَدِيْثِ اَعْرَابِىٍّ خَفَّفَ فِى الصَّلٰوةِ فَقَالَ لَهٗ قُمْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ هٰكَذَا قَالَهٗ ثَلٰثًا - وَنَحْنُ نَقُوْلُ اِنَّ قَوْلَهٗ تَعَالٰى وَارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا خَاصٌّ وُضِعَ لِمَعْنًى مَعْلُوْمٍ لِاَنَّ الرُّكُوْعَ هُوَ الْاِنْحِنَاءُ عَنِ الْقِيَامِ وَالسُّجُوْدُ هُوَ وَضْعُ الْجَبْهَةِ عَلَى الْاَرْضِ وَالْخَاصُّ لَا يَحْتَمِلُ الْبَيَانَ حَتّٰى يُقَالَ اِنَّ الْحَدِيْثَ لَحِقَ بَيَانًا لِلنَّصِّ الْمُطْلَقِ فَلَا يَكُوْنُ اِلَّا نَسْخًا وَهُوَ لَا يَجُوْزُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ فَيَنْبَغِى اَنْ تُرَاعٰى مَنْزِلَةَ كُلٍّ مِّنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَمَا ثَبَتَ بِالْكِتَابِ يَكُوْنُ فَرْضًا لِاَنَّهٗ قَطْعِىٌّ وَمَا ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ يَكُوْنُ وَاجِبًا لِاَنَّهٗ ظَنِّىٌّ -

অনুবাদ ॥ ***সুতরাং, রুকূ ও সাজদার হুকুমের সাথে ফরয হিসেবে*** تعديل اركان ***তথা ধীরস্থিরভাবে রুকনসমূহ আদায় করার বিধানকে সংযুক্ত করা বৈধ হবে না।*** এখান থেকে خاص এর উপরোক্ত হুকুমের ভিত্তিতে আমাদের (হানাফীগণ) ও শাফেয়ীগণের মধ্যে মতানৈক্যপূর্ণ বিভিন্ন শাখা মাসআলা বর্ণনা শুরু হয়েছে। অর্থাৎ (১) خاص শব্দ যেহেতু স্বয়ং সুস্পষ্ট হওয়ার কারণে ব্যাখ্যামূলক বর্ণনার সম্ভাবনা রাখে না, সেহেতু রুকূ ও সাজদার মধ্যে তা'দীলে আরকান, রুকূর পরে দাঁড়ানো এবং দু সাজদার মাঝে বসার বিধানকে ফরয হিসেবে সংযুক্ত করা বৈধ হবে না। تعديل اركان হলো- রুকূ এবং সাজদার মধ্যে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা। রুকূ-সাজদার নির্দেশ সম্বলিত আয়াতটি হলো- আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا যেমন ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম শাফেয়ী (র) একে ফরয হিসেবে সংযুক্ত করেছেন।

বিশ্লেষণ : ইমাম শাফেয়ী (র) জনৈক বেদুঈন সম্পর্কিত হাদীসের আলোকে বলেন রুকূ-সাজদার মধ্যে تعديل اركان ফরয। বেদুঈন লোকটি নামাযে তাড়াহুড়া করলে রাসূল (স) তাকে বললেন, قُمْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ (দাঁড়াও এবং পুনরায় নামায পড়ো। কেননা, তুমি নিশ্চিত নামায পড়নি।) এভাবে তিনি তাকে এ কথাটি তিনবার বললেন। আমরা (হানাফীগণ) বলি যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا -এর মধ্যস্থিত ركوع ও سجود শব্দ দুটি خاص যা একটি নির্দিষ্ট পরিজ্ঞাত অর্থের জন্যে গঠিত। ركوع শব্দের অর্থ হলো- দাঁড়ানো থেকে ঝুঁকে পড়া। আর سجود শব্দের অর্থ হলো মাটির ওপর ললাট স্থাপন করা। خاص শব্দ ব্যাখ্যামূলক বর্ণনার (بيان تفسير) সম্ভাবনা রাখে না। সুতরাং, এমতাবস্থায় যদি বলা হয় যে, হাদীসটি কুরআনের نص مطلق (নিঃশর্ত শব্দ) এর জন্যে ব্যাখ্যা হিসেবে সংযুক্ত হয়েছে, তাহলে কুরআনকে মানসূখ করা সাব্যস্ত হবে। অথচ خبر واحد দ্বারা কুরআনকে মানসূখ করা বৈধ নয়। (সুতরাং প্রতীয়মান হলো যে, হাদীসটি আয়াতের بيان নয়)। অতএব, কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতে রাসূলের প্রত্যেকটির স্ব-স্ব মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। সুতরাং كتاب الله দ্বারা যা সাব্যস্ত হয়েছে, তা ফরয গণ্য হবে। কেননা, তা অকাট্য দলিল। আর সুন্নাহ দ্বারা যা সাব্যস্ত হয়েছে, তা ওয়াজিব গণ্য হবে। কেননা, তা ধারণামূলক দলিল। (অর্থাৎ, রুকূ-সাজদা ফরয আর تعديل اركان হলো ওয়াজিব।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله فلايجوز العاق الخ : মুসান্নিফ (র) এখান থেকে খাছ এর বিধান لَا يَحْتَمِلُ الْبَيَانَ لِكَوْنِهِ بَيِّنًا এর ভিত্তিতে এর বিভিন্ন শাখা মাসআলার আলোচনা শুরু করেছেন। হানাফী ও শাফেয়ী আলিমগণের মতে এ বিধানের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। এখানে সর্বপ্রথম মাসআলা এই যে, তা'দীলে আরকান অর্থাৎ রুকূ সাজদা, কওমা ও জালসাকে ধিরস্থিরভাবে আদায় করা তরফাইনের মতে ওয়াজিব; ফরয নয়। অবশ্য আল্লাহ তা'আলার ফরমান وَارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا দ্বারা মূল রুকূ-সাজদা ফরয। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে রুকূ-সাজদার ন্যায় তা'দীলে আরকান তথা রোকনসমূহ ধিরস্থিরভাবে আদায় করা ফরয।

দলিল : দ্বিতীয় পক্ষের দলিল এই যে, খাল্লাদ ইবনে রাফে' নামে জনৈক বেদুঈন ব্যক্তি মসজিদে নববীতে আগমন করলো। রাসূলুল্লাহ (স) তখন মসজিদের এক কোণে উপবিষ্ট ছিলেন। বেদুঈন লোকটি তা'দীলে আরকানের লক্ষ্য না করে তাড়াহুড়া করে নামায শেষ করে রাসূলুল্লাহ (স) কে সালাম করলো। রাসূলুল্লাহ (স) সালামের জবাব দিয়ে বললেন ارْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ফিরে গিয়ে নামায পড়ে এসো। কারণ তুমি নামায পড়োনি। লোকটি দ্বিতীয়বার নামায আদায় করে রাসূলুল্লাহ (স)এর খেদমতে হাজির হয়ে তাঁকে সালাম দিলো। আল্লাহর রাসূল (স) সালামের জবাব দিয়ে বললেন– যাও নামায পড়ে এসো। কারণ তুমি নামায পড়োনি। লোকটি তৃতীয়বার কিংবা তারপরে বললো– হে আল্লাহর রাসূল (স)! আমাকে নামায শিখিয়ে দিন। এরপর রাসূলুল্লাহ (স) এরশাদ করলেন–

اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلاةِ فَاَسْبِغِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَسْتَوِىَ قَائِمًا ثم اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثم اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثم ارْفَعْ حَتّٰى تَسْتَوِىَ قَائِمًا اِفْعَلْ ذَالِكَ فِىْ صَلَاتِكَ كُلِّهَا

যখন তুমি নামাযের ইচ্ছা করো তখন পূর্ণরূপে উযু কর। তারপর কেবলামুখী হয়ে তাকবীর বলে কেরআত পড়ো। এরপর শান্তভাবে রুকূ করো। এরপর মাথা উত্তোলন করে সোজা দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর ধিরস্থিরভাবে সাজদা করো। এরপর সাজদা থেকে মাথা উত্তোলন করে ধিরস্থিভাবে বসো। এরপর শান্তভাবে দ্বিতীয় সাজদা করে পুনরায় মাথা উত্তোলন করো এবং সোজা হয়ে বসো। এভাবেই তোমার পূর্ণ নামায আদায় করো।

এই হাদীসটি তা'দীলে আরকান ফরয হওয়ার প্রমাণ বহন করে। কারণ তা'দীলে আরকান না হওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ (স) বেদুঈন ব্যক্তির নামাযকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। যা ফরয হওয়ার প্রমাণ বহন করে। এর দ্বারা ওয়াজিব কিংবা সুন্নত তরক হওয়া বোঝায় না।

উত্তর : তরফাইনের পক্ষ থেকে এর উত্তর এই যে, আল্লাহ তাআলার বাণী وَارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا হলো খাছ। এটাকে নির্দিষ্ট অর্থ বোঝানোর জন্য গঠন করা হয়েছে। যেমন রুকূর অর্থ হলো দাঁড়ানো অবস্থা থেকে নত হওয়া, আর সাজদার অর্থ হলো ভূমিতে ললাট স্পর্শ করা। আমাদের মতে খাছ যেহেতু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সম্ভাবনা রাখে না। একারণে বেদুঈন লোকটির হাদীস আল্লাহ তা'আলার ফরমান وَارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا এর জন্য بيان تفسير সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। বেশি থেকে বেশি এটা বলা যায় যে, বেদুঈনের হাদীস উক্ত আয়াতকে মানসূখকারী। কিন্তু একথা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এই হাদীস হলো খবরে ওয়াহিদ। আর খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কিতাবুল্লাহর বিধানকে মানসূখ করা জায়েয নয়। অতএব সমীচীন এই যে, কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতে রাসূল (স) এর মধ্যে থেকে প্রত্যেকটির মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখা হোক। অর্থাৎ মূল রুকূ ও সাজদা যা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত তাকে ফরয সাব্যস্ত করা হোক। কেননা কিতাবুল্লাহ হলো অকাট্য দলিল। এর দ্বারা যে বিধান প্রমাণিত হয় তা ফরয হয়ে থাকে। এ কারণে রুকূ সাজদা ফরয হবে। আর খবরে ওয়াহিদ দ্বারা যে তা'দীলে আরকান প্রমাণিত হয় তাকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হবে। কেননা খবরে ওয়াহিদ জন্নী তথা সন্দেহজনক হয়ে থাকে। এর দ্বারা যে বিধান সাব্যস্ত হয় তা ফরয হতে পারে না বরং ওয়াজিব হয় একারণে তা'দীলে আরকান ফরয নয় বরং ওয়াজিব।

وَبَطَلَ شَرْطُ الْوَلَاءِ وَالتَّرْتِيْبِ وَالتَّسْمِيَةِ وَالنِّيَّةِ فِى اٰيَةِ الْوُضُوْءِ هٰذا تفريعٌ ثانٍ عليه عَطْفٌ على قوله فَلَا يَجُوْزُ يَعْنِى اِذا كَانَ الخاصُّ لا يَحْتَمِلُ البَيانَ فَبَطَلَ شَرْطُ الوَلاءِ كَمَا شَرَطَهُ مَالِكٌ (رحـ) وشَرْطُ التّرتيبِ والنيّةِ كما شَرَطَهُمَا الشافعيُّ (رحـ) وشَرْطُ التّسميَةِ كما شَرَطَهُ اَصْحابُ الظّواهِرِ فِىْ اٰيَةِ الْوُضُوْءِ وهو قولُه تعالٰى "فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ" الاٰية وبَيانُ ذٰلك اَنَّ مالِكًا (رحـ) يقولُ اِنّ الوَلاءَ فَرْضٌ فِى الْوُضُوْءِ وهُوَ اَنْ يَغْسِلَ اَعْضاءَهٗ فِى الْوُضُوْءِ مُتَتابِعًا مُتَوالِيًا بِحَيْثُ لَمْ يَجُفَّ الْعُضْوُ الْاَوّلُ لِمُواظَبَةِ النَّبِىِّ ﷺ وَاَصْحابُ الظّواهِرِ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ التَّسْمِيَةَ فرضٌ فِى الْوُضُوْءِ لِقولِه عليه السّلام لا وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ وَالشّافعيُّ (رحـ) يَقُوْلُ اِنَّ التَّرْتِيْبَ والنيّةَ فى الوُضُوْءِ فرضٌ لِقولِه عليه السلام لا يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلٰوةَ امْرِءٍ حتّٰى يَضَعَ الطَّهُوْرَ فِىْ مَواضِعِه فيَغْسِلُ وَجْهَه ثم يَدَه اَلْحَدِيْثَ ولقولِه عليه السلام "اِنَّمَا الْاَعْمالُ بِالنِّيّاتِ" والوضوءُ اَيْضًا عَمَلٌ فلا يَصِحُّ بِدُوْنِ النِّيَّةِ –

অনুবাদ ॥ (২) ***এভাবে উযূ সংক্রান্ত আয়াতের মধ্যে অঙ্গসমূহ পর পর ধৌত করা, ধারাবাহিকতা রক্ষা করা, বিসমিল্লাহ পড়া এবং নিয়্যত করার শর্তারোপ করা বাতিল বলে গণ্য হবে।*** এটা خاص এর হুকুমের ভিত্তিতে দ্বিতীয় শাখা মাসআলা ও এ উক্তিটি গ্রন্থকারের পূর্বোক্ত উক্তির ওপর আত্‌ফ হয়েছে। অর্থাৎ যখন خاص শব্দ ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে না তখন উযুর আয়াতের মধ্যে একেরপর এক ধৌতকরণের শর্তারোপ করা, যা ইমাম মালেক (র) করেন এবং ধারাবহিকতা ঠিক রাখা ও নিয়্যতের শর্তারোপ করা, যা ইমাম শাফেয়ী (র) করেন, এভাবে بسم الله পড়ার শর্তারোপ করা, যা যাহেরপন্থী আলিমগণ করেন, এসব বাতিল গণ্য হবে। উযূর আয়াতটি হলো–

"فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ"

অর্থাৎ, তোমরা নিজ নিজ মুখমণ্ডল ও কনুই পর্যন্ত হস্তযুগল ধৌত করো। আর মাথা মাসেহ করো এবং গ্রন্থি পর্যন্ত পা ধৌত কর।

বিস্তারিত বিবরণ : ইমাম মালেক (র) বলেন, উযূর মধ্যে পরপর অঙ্গসমূহ ধৌত করা ফরয। আর ولاء বলা হয়- উযূ সম্পন্নকারী উযূ করার সময়ে আপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহকে একেরপর এক ধারাবাহিক ধৌত করাকে, যেন (দ্বিতীয় অঙ্গ ধৌত করার পূর্বে) প্রথম বিধৌত অঙ্গটি শুকিয়ে না যায়। এ ব্যাপারে তিনি রাসূল (স)-এর সর্বদা এর উপর আমল করাকে দলিল হিসেবে পেশ করেন। আর اصحاب ظواهر বা যাহেরপন্থী আলিমগণ বলেন যে, উযূর মধ্যে بسم الله পড়া ফরয। কেননা রাসূল (স) বলেছেন- "لا وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ" যে ব্যক্তি বিসমিল্লাহ পড়ে না, তার উযূ শুদ্ধ হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, উযূর মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ও নিয়্যত করা ফরয। কারণ রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন- لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلٰوةَ امْرِءٍ حَتّٰى يَضَعَ الطَّهُوْرَ فِىْ مَوَاضِعِهٖ فَيَغْسِلُ وَجْهَهٗ ثُمَّ يَدَيْهِ
অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা কোন ব্যক্তির নামায ততক্ষণ গ্রহণ করেন না, যতক্ষণ না সে পবিত্রতার প্রক্রিয়াকে স্ব-স্থানে স্থাপন করে। সুতরাং প্রথমতঃ সে মুখমণ্ডল তৎপর হস্তযুগল ধৌত করবে। (এ হাদীসে উল্লিখিত ثُمَّ দ্বারা ধারাবাহিকতা ফরয হওয়া বোঝা যায়) এবং রাসূল (স)-এর বাণী انما الاعمال بالنيات (নিশ্চয়ই আমলসমূহ নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল)। আর উযূও একটি আমল। সুতরাং নিয়্যত ছাড়া তা শুদ্ধ হবে না।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ قوله وبطل شرط الولاء الخ : ২. এ ইবারতে খাছের বিধান সংশ্লিষ্ট দ্বিতীয় শাখা মাসআলা বর্ণনা করেছেন। এটা পূর্বের لا يجوز বাক্যের উপর মাতূফ।

মাসআলার বিশ্লেষণ : ইমাম মালিক (র) এর মতে উযুর মধ্যে একের পর এক অঙ্গ ধৌত করা অর্থাৎ পূর্বের অঙ্গ শুষ্ক হওয়ার আগেই অপর অঙ্গ ধৌত করা শর্ত।

দলিল : রাসূলুল্লাহ (স) সর্বদা এভাবেই উযু করেছেন। অতএব উযু শুদ্ধ হওয়ার জন্যে একের পর এক অঙ্গ ধৌত করা অপরিহার্য।

আছহাবে জাওয়াহিরের মতে উযুর মধ্যে বিসমিল্লাহ বলা ফরয। এ ব্যাপারে দলিল হলো لَاوُضُوْءَ لِمَنْ لَّمْ يُسَمِّ বিস্‌মিল্লাহ ছাড়া উযু শুদ্ধ হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন– উযুর মধ্যে ক্রমধারা এবং নিয়্যত করা ফরয। ক্রমধারা ফরয হওয়ার ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র) এর দলিল لَايَقْبَلُ اللّٰهُ صَلَاةَ امْرِءٍ حَتّٰى يَضَعَ الطَّهُوْرَ فِىْ مَوَاضِعِهٖ فَيَغْسِلُ وَجْهَهٗ ثُمَّ يَدَيْهِ অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা কোনো মানুষের নামায গ্রহণ করেননা যতোক্ষণ পর্যন্ত সে উযুকে স্বস্থানে না রাখে। অর্থাৎ সে তার মুখমণ্ডল ধৌত করবে। অতপর হাত ধৌত করবে। এই হাদীসে ثُمَّ শব্দটি তারতীব তথা ক্রমধারা বোঝায়।

নিয়ত ফরয হওয়ার ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র) এর দলিল : إِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ এ হাদীস দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র) দলিল পেশ করেন যে, আমল শুদ্ধ হওয়া নিয়্যতের উপর মওকূফ। আর উযুও একটা আমল। অতএব উযু শুদ্ধ হওয়া নিয়্যতের উপর মওকূফ হবে। আর নিয়্যতের উপর মওকূফ হওয়া নিয়্যত ফরয হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

وَنَحْنُ نَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَمَرَنَا فِى الْوُضُوْءِ بِالْغُسْلِ وَالْمَسْحِ وَهُمَا خَاصَّانِ وُضِعَا لِمَعْنًى معلوم وهُوَ الْاِسَالَةُ وَالْاِصَابَةُ فَاشْتِرَاطُ هٰذه الْاَشْيَاءِ كَمَا شَرَطَهَا الْمُخَالِفُوْن لا يَكُوْنُ بَيَانًا لِلْخَاصِّ لِكَوْنِه بَيِّنًا بِنَفْسِه فَلا يَكُوْنُ اِلَّا نَسْخًا وهُوَ لَا يَصِحُّ بِاَخْبَارِ الْاٰحَادِ غَايَتُهُ اَنْ تُرَاعٰى مَنْزِلَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَمَا ثَبَتَ بِالْكِتَابِ يَكُوْنُ فرضًا ومَا ثَبَتَ بِالسّنة يَنْبَغِىْ اَنْ يَكُوْنَ واجبًا كما فِى الصَّلٰوةِ لٰكِنْ لَّا واجِبَ فى الْوُضُوْءِ بِالْاِجْمَاعِ لِاَنَّ الْوَاجِبَ كَالْفَرْضِ فِىْ حَقِّ الْعَمَلِ وهُوَ لَا يَلِيْقُ اِلَّا بِالْعِبَادَاتِ الْمَقْصُوْدَةِ فَنَزَلْنَا عَنِ الْوُجُوْبِ اِلَى السُّنِّيَّةِ و قُلْنَا بِسُنِّيَّةِ هٰذه الاشياء فى الوضوء ـ

অনুবাদ॥ আমরা (হানাফীগণ) বলি যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে উযূতে অঙ্গসমূহ ধৌত করার ও মাসাহ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর এ দুটি খাস শব্দ, যেগুলোকে নির্দিষ্ট অর্থের জন্যে গঠন করা হয়েছে। তা হলো যথাক্রমে পানি প্রবাহিত করা ও ভিজা হাত দিয়ে মুছে দেয়া। সুতরাং এসব বিষয়কে শর্তারোপ করা, যেমনটি প্রতিপক্ষগণ করেছেন, خاص এর জন্যে বয়ান হতে পারে না। কেননা তা নিজেই সুস্পষ্ট। ফলে তা নসখ ছাড়া আর কিছু নয়। অথচ খবরে ওয়াহেদ দ্বারা নসখ শুদ্ধ হয় না। অতএব কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহ প্রত্যেকটিকে স্ব-স্ব স্থানে রাখতে হবে। কিতাবুল্লাহ দ্বারা যা সাব্যস্ত হয়েছে, তা ফরযরূপে গণ্য হবে। আর সুন্নাহ দ্বারা যা সাব্যস্ত হয়েছে, তা ওয়াজিব গণ্য হবে। যেমন নামাযের মধ্যে তার দৃষ্টান্ত রয়েছে। তবে ইজমা মতে উযূর মধ্যে কোন ওয়াজিব নেই। কেননা আমলের ক্ষেত্রে ওয়াজিব ফরযের সমতুল্য। আর عبادة مقصودة ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হয় না। যার কারণে আমরা ওয়াজিব হওয়া থেকে সুন্নাত হওয়ার প্রতি নেমে উযূর মধ্যে ঐ সব বিষয়কে সুন্নত বললাম।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ হানাফীগণের পক্ষ হতে উত্তর : উযূ সংক্রান্ত আয়াত اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُؤُسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ এর মধ্যে একের পর এক উযূ করা, বিস্‌মিল্লাহ বলা, ক্রমধারা ঠিক রাখা এবং নিয়ত করার কোনো শর্ত আরোপ করা হয় নি। কাজেই এমন করলে তা বাতিল গণ্য হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা উযূ সংক্রান্ত আয়াতে দুটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন। ১. ধৌত করা, ২. মাসাহ করা। আর উভয়টি খাছ। নির্দিষ্ট অর্থের জন্য শব্দ দুটি গঠিত হয়েছে। গোসলের অর্থ হলো পানি প্রবাহিত করা। আর মাসহের অর্থ হলো সিক্ত হাত বুলানো। কাজেই উল্লেখিত কাজসমূহ শর্ত ও ফরয হওয়ার জন্য প্রতিপক্ষ যে দলিল পেশ করেছেন তার দ্বারা কিতাবুল্লাহর খাছের উপর অতিরঞ্জন করা জরুরি হয়। উপরন্তু এ সকল হাদীস দ্বারা আয়াতের তাফসীর সাব্যস্ত করা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ খাছ শব্দ তা কোন ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না।

এখানে দ্বিতীয় আরো একটি উপায় এই যে, এই সকল হাদীসকে উযুর আয়াতের জন্য নাসিখ গণ্য করা হবে। কিন্তু তাও সম্ভব নয়। কারণ খবরে ওয়াহিদ কিতাবুল্লাহর জন্য নাসিখ হতে পারে না।

পরিশেষে উল্লেখ্য যে, কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহর মধ্য থেকে প্রত্যেকটিকে স্ব স্ব স্থানে রাখা উচিত। কিতাবুল্লাহ দ্বারা যা প্রমাণিত হবে তাকে ফরয সাব্যস্ত করতে হবে। কারণ তা অকাট্য। আর যা হাদীস ও খবরে ওয়াহিদ দ্বারা প্রমাণিত অর্থাৎ একের পর এক উযু করা, বিস্‌মিল্লাহ পড়া, ক্রমধারা ঠিক রাখা ও নিয়ত করা এগুলোকে ওয়াজিব সাব্যস্ত

করতে হবে। যেমন– হাদীস দ্বারা নামাযের মধ্যে তা'দীলে আরকানকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়েছে। তবে যেহেতু উযুর মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে কোনো ওয়াজিব নেই। এই কারণে আমরা ওয়াজিব থেকে নেমে এগুলোকে সুন্নত বলবো।

প্রশ্ন : উযুর মধ্যে ওয়াজিব না থাকার কারণ কি?

উত্তর : এর উত্তর এই যে, আমলের ক্ষেত্রে ফরয এবং ওয়াজিব সমপর্যায়ের। ফরয আদায়কারী যেভাবে সওয়াবের অধিকারী হয় এবং তরক করার দ্বারা সাজার উপযোগী হয়। এভাবে ওয়াজিবের ক্ষেত্রেও। আর ওয়াজিব عبادات مقصوده এর জন্য উপযোগী। আর উযু عبادت مقصوده নয়। এ কারণে উযুর মধ্যে ওয়াজিব নেই।

ফায়েদা : অধম নূরুল আনওয়ার গ্রন্থকারের বর্ণনা মোতাবেক উল্লেখিত মাসআলার ব্যাখ্যা করেছি। অন্যথায় প্রতিপক্ষের পেশকৃত হাদীসমূহের আরো বিভিন্ন উত্তর হানাফীদের কিতাবাদিতে উল্লেখ রয়েছে। যেমন– ইমাম মালিক (র) এর পেশকৃত দলিলের উত্তর এই যে, রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক কোনো আমল সব সময় করতে থাকা তা ওয়াজিব হওয়ার দলিল হয় না। যেমন ই'তেকাফ করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। রাসূলুল্লাহ (স) প্রত্যেক বছর ই'তেকাফ করেছেন কিন্তু তা ওয়াজিব নয়। তবে রাসূলুল্লাহ (স) কোন আমল সবসময়ই করার পর যদি তা বর্জন করার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো তিরস্কার করে থাকেন তখন তা ওয়াজিব হওয়ার দলিল বোঝাবে।

জাহেরীগণের পেশকৃত দলিল لاوضوء لمن لم يسم **এর এক উত্তর :**

১. এর দ্বারা উযু অপূর্ণাঙ্গ হওয়া উদ্দেশ্য। উযু শুদ্ধ হওয়া উদ্দেশ্য নয়। অর্থাৎ সে উযুর সওয়াব পাবে না।

২. দ্বিতীয় উত্তর এই যে, এই হাদীসটি হযরত আবু হুরায়রা, ইবনে মাসউদ ও ইবনে ওমর (রা)এর বর্ণিত। যথা– إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللّٰهِ فَإِنَّهُ يُطَهِّرُ جَسَدَهُ كُلَّهُ وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ لَمْ يُطَهِّرْ إِلاَّ مَوْضِعَ الْوُضُوْءِ অর্থাৎ যে উযু করলো এবং আল্লাহর নাম নিলো এ উযু তার পূর্ণ শরীরকে পবিত্র করবে। আর বিসমিল্লাহ বিহীন উযু করলে কেবল উযুর অঙ্গগুলো পবিত্র হবে। এই হাদীস দ্বারা বোঝা গেলো যে, বিস্মিল্লাহ ছাড়াও উযু হয়ে যায়।

তারতীব ফরয হওয়ার ব্যাপারে পেশকৃত দলিল لَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ الخ **এর উত্তর :** মুহাদ্দিসগণের মতে এই হাদীসটি জয়ীফ। আবু দাউদে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) কোনো এক সময় উযুর মধ্যে মাথা মাসাহ করতে ভুলে গিয়েছিলেন। উযু থেকে অবসর গ্রহণ করার পরে তিনি মাথা মাসাহ করেছিলেন। উযু না দোহরানো তারতীব ফরয না হওয়ার দলিল বহন করে।

নিয়ত ফরয হওয়ার ব্যাপারে إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ **হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণের উত্তর :** হাদীসে اعمال শব্দের পূর্বে ثواب উহ্য রয়েছে। অতএব এর উদ্দেশ্য এই যে, নিয়তের উপর আমলের সওয়াব মওকূফ থাকে। আমলের শুদ্ধতা নিয়তের উপর মওকূফ থাকে না।

মুসান্নিফ (র) এর ইবারতের উপর উত্থাপিত কয়েকটি প্রশ্ন :

১. তিনি প্রতিপক্ষের সকল রেওয়ায়াতকে খবরে ওয়াহিদ বলেছেন। অথচ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ হাদীসটি খবরে মাশহুর বরং কারো কারো মতে মুতাওয়াতির।

২. তিনি সর্বসম্মতিক্রমে উযুর মধ্যে কোনো ওয়াজিব নেই বলেছেন। অথচ ইমাম আহমদ (র) কুলি করা ও নাকে পানি দেয়াকে ওয়াজিব বলেন।

৩. ব্যাখ্যাকার আরো বলেছেন যে, ওয়াজিব কেবল عبادات مقصوده বা মৌলিক ইবাদত এর উপযোগী। আর উযু মৌলিক ইবাদত নয়। অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে, উযুর মধ্যে ফরয প্রমাণিত রয়েছে। অথচ উযুর জন্যে ওয়াজিব উপযুক্ত নয়। তা কিভাবে মেনে নেয়া যায়?

وَالطَّهَارَةُ فِيْ اٰيَةِ الطَّوَافِ عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهِ اَلْوَلَاءِ وَتَفْرِيْعٌ ثَالِثٌ عَلَيْهِ اى اِذَا كَانَ الْخَاصُّ بَيِّنًا بِنَفْسِهِ لَا يَحْتَمِلُ الْبَيَانَ فَبَطَلَ شَرْطُ الطَّهَارَةِ فِيْ اٰيَةِ الطَّوَافِ وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالٰى وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ فَاِنَّ الشَّافِعِيَّ (رح) يَقُوْلُ اِنَّ طَوَافَ الْبَيْتِ لَا يَجُوْزُ بِدُوْنِ الطَّهَارَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلٰوةٌ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلَا لَا يَطُوْفَنَّ بِالْبَيْتِ مُحْدِثٌ وَلَا عُرْيَانٌ وَنَحْنُ نَقُوْلُ اِنَّ الطَّوَافَ لَفْظٌ خَاصٌّ مَعْنَاهُ مَعْلُوْمٌ وَهُوَ الدَّوْرَانُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ فَاشْتِرَاطُ الطَّهَارَةِ فِيْهِ لَا يَكُوْنُ بَيَانًا لَهُ لِكَوْنِهِ بَيِّنًا بِنَفْسِهِ بَلْ يَكُوْنُ نَسْخًا وَهُوَ لَا يَجُوْزُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ غَايَتُهَا اَنْ تَكُوْنَ وَاجِبَةً يَنْقُصُ بِتَرْكِهَا الطَّوَافُ فَيُجْبَرُ بِالدَّمِ فِيْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ وَبِالصَّدَقَةِ فِيْ غَيْرِهِ وَاَمَّا زِيَادَةُ كَوْنِهِ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ وَابْتِدَاؤُهُ مِنَ الْحَجَرِ الْاَسْوَدِ فَلَعَلَّهُ ثَبَتَ بِالْخَبَرِ الْمَشْهُوْرِ وَهِيَ جَائِزٌ بِالْاِتِّفَاقِ -

অনুবাদ॥ (৩) *তাওয়াফের আয়াতে পবিত্রতা অর্জনের শর্তারোপ বাতিল হয়ে যাবে।* এ উক্তিটি গ্রন্থকারের পূর্বোক্ত উক্তি الولاء এর উপর আত্ফ হয়েছে। এটা খাসের হুকুমের উপর তৃতীয় শাখা মাস'আলা। অর্থাৎ خاص শব্দ হওয়ার কারণে যেহেতু স্বয়ং সুস্পষ্ট। তা ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে না, সেহেতু তাওয়াফের আয়াতে পবিত্রতার শর্তারোপ বাতিল বলে গণ্য হবে। তাওয়াফের আয়াতটি হলো وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ অর্থাৎ তারা যেন প্রাচীন মর্যাদাবান গৃহের তাওয়াফ করে।

এ প্রসঙ্গে ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, পবিত্রতা অর্জন (উযূ) ব্যতিত কা'বা ঘর তাওয়াফ করা বৈধ হবে না। কেননা রাসূল (স) বলেছেন اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلٰوةٌ অর্থাৎ কা'বা শরীফের তাওয়াফ নামাযতুল্য। (কাজেই নামাযের ন্যায় তাহারাত শর্ত, সেহেতু তাওয়াফের মধ্যেও তাহারাত শর্ত) রাসূল (স) এর আরেকটি বাণী হলো اَلَا لَا يَطُوْفَنَّ بِالْبَيْتِ مُحْدِثٌ وَلَا عُرْيَانٌ অর্থাৎ সাবধান! উযূবিহীন ও উলঙ্গ ব্যক্তি যেন বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ না করে। (এতে প্রতীয়মান হয় যে, তওয়াফকারীর জন্যে তাহারাত ও সতর আবৃত্ত রাখা জরুরী।)

আমরা (আহনাফ) বলি যে, طواف শব্দটি خاص এর অর্থ পরিজ্ঞাত, নির্দিষ্ট। আর তা হলো বায়তুল্লাহর চতুষ্পার্শ্বে প্রদক্ষিণ করা। অতএব, এর মধ্যে পবিত্রতার শর্তারোপ করা তার ব্যাখ্যা গণ্য হবে না। কারণ তা নিজেই স্পষ্ট। বরং তা রহিতকরণ গণ্য হবে। আর খবরে ওয়াহিদ দ্বারা রহিতকরণ বৈধ নয়। সর্বোচ্চ তা ওয়াজিব গণ্য হবে, যা ছেড়ে দিলে তাওয়াফ অসম্পূর্ণ হবে। ফলে তাওয়াফে যিয়ারতের মধ্যে হলে কুরবানী দ্বারা, আর অন্যান্য তাওয়াফে সদকাহ আদায়ের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ করে নিতে হবে।

তবে طواف এর মধ্যে সাত চক্করের যে শর্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং حجر اسود থেকে তাওয়াফ শুরু করার যে শর্তারোপ করা হয়েছে, সম্ভবতঃ তা خبر مشهور দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। আর খবরে মাশ্হুর দ্বারা (কুরআনের উপর) বিধান বৃদ্ধিকরণ সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ ৩. قوله وَالطَّهَارَةَ فِى آيةِ الخ : এ ইবারতে খাছের বিধান সংশ্লিষ্ট তৃতীয় শাখা মাসআলা উল্লেখিত হয়েছে। অর্থাৎ খাছ যেহেতু নিজেই সুস্পষ্ট। তা কোনোরূপ বর্ণনার অবকাশ রাখে না। এ কারণে وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ তওয়াফ সংক্রান্ত আয়াতে পবিত্রতার শর্তারোপ করা গ্রহণযোগ্য নয়।

ব্যাখ্যা : ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে কা'বা গৃহের তওয়াফের জন্য উযু থাকা শর্ত। উযু বিহীন তওয়াফ করা জায়েয নয়।

দলিল : এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র) ২টি হাদীস থেকে দলিল গ্রহণ করেন। প্রথম হাদীস তিরমীযি শরীফে উল্লেখিত হয়েছে। তা এই যে, عن ابن عباس رض ان النبى صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت مثل الصلاة الا انكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلايتكلم الا بخير বায়তুল্লাহর তওয়াফ নামাযের ন্যায়। পার্থক্য এই যে, তওয়াফকালে তোমরা কথা বলতে পারো। যে ব্যক্তি তওয়াফকালে কথা বলে সে যেন উত্তম কথা বলে। এই হাদীসে তওয়াফকে নামায বা নামাযের মত বলা হয়েছে। আর নামাযের জন্য পবিত্রতা শর্ত। কাজেই তওয়াফের জন্য উযু বা পবিত্রতা শর্ত হবে। দ্বিতীয় হাদীস এই যে, কোনো ব্যক্তি যেন উযু বিহীন এবং বিবস্ত্র হয়ে বায়তুল্লাহ তওয়া না করে। এ হাদীসেও তাওয়াফের জন্য উযুকে জরুরি স্থির করা হয়েছে।

উত্তর : وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ এর মধ্যে তাওয়াফ একটি খাছ শব্দ। এর অর্থ সুনিশ্চিত অর্থাৎ খানায়ে কা'বার আশে পাশে প্রদক্ষিণ করা। অতএব উল্লেখিত হাদীস দ্বারা তওয়াফের জন্য উযুর শর্তারোপ করার দুটি সূরত থাকতে পারে।

(ক) উল্লেখিত হাদীসসমূহকে এই আয়াতের জন্য ব্যাখ্যা সাব্যস্ত করতে হবে। অর্থাৎ আয়াতকে মুজমাল এবং হাদীসগুলোকে তার তাফসীর সাব্যস্ত করতে হবে।

(খ) হাদীসের দ্বারা আয়াতকে মানসুখ বলতে হবে। অথচ এ দুটির কোনোটি এখানে হতে পারে না। প্রথম এ কারণে যে, তওয়াফ একটা খাছ শব্দ। তা নিজেই সুস্পষ্ট হওয়ার কারণে তাফসীরের অবকাশ রাখে না। দ্বিতীয় এ কারণে যে, এ উভয় হাদীস খবরে ওয়াহিদ। আর খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কিতাবুল্লাহকে মানসুখ করা যায় না। সুতরাং আয়াতের কারণে কেবল তাওয়াফ করা ফরয হবে। বেশির বেশি এটা বলা যায় যে, তওয়াফের জন্য উযু করা ওয়াজিব। অন্যথায় তওয়াফের মধ্যে ত্রুটি সৃষ্টি হবে। যে কারণে তওয়াফে জিয়ারতের মধ্যে দম দ্বারা অন্যান্য তওয়াফে সাদকা দ্বারা উক্ত ত্রুটি দূর হয়ে যাবে।

قوله وَامَّا زِيَادَةُ كَوْنِهِ سَبْعَةَ الخ : **এটা একটা প্রশ্নের উত্তর :**

প্রশ্ন : আয়াতে মুতলাকভাবে তাওয়াফ উল্লেখিত হয়েছে। তার মধ্যে ৭ বার প্রদক্ষিণ করা এবং হজরে আসওয়াদ থেকে শুরু করার কোনো কথা নেই। অথচ হানাফীগণ উভয়কে শর্ত বলে থাকেন। কাজেই এর দ্বারা কিতাবুল্লাহর উপর অতিরঞ্জন সাব্যস্থ হয়। সুতরাং আপনাদের এ কথার ন্যায় শাফেয়ীগণের জন্য কিতাবুল্লাহর উপর অতিরঞ্জন করে উযুকে শর্ত সাব্যস্ত করা দুরস্ত হবে না কেন?

উত্তর : মুসান্নিফ (র) কিছুটা নরম ভাষায় এর উত্তর দিয়েছেন যে, তওয়াফের মধ্যে ৭ সংখ্যা এবং হাজরে আসওয়াদ থেকে শুরু করা খুব সম্ভব তা খবরে মাশহুর দ্বারা প্রমাণিত। আর খবরে মাশহুর দ্বারা কিতাবুল্লাহর উপর অতিরঞ্জন সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয। একারণেই ৭ বার প্রদক্ষিণ করার এবং তা হাজরে আসওয়াদ থেকে শুরু করার শর্তারোপ করা হয়েছে।

وَالتَّاوِيْلُ بِالْاَطْهَارِ فِيْ اٰيَةِ التَّرَبُّصِ عطفٌ علٰى قولِهِ شَرْطُ الْوَلاءِ وتفريعٌ رابعٌ عَلَيْه اى اِذَا كَانَ الْخَاصُّ بَيِّنًا بِنَفْسِهِ لَا يَحْتَمِلُ الْبَيَانَ فَبَطَلَ تَاوِيْلُ الْقُرُوْءِ بِالْاَطْهَارِ فِيْ قَوْلِه تَعَالٰى وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ وَبَيَانُه اَنّ قولَه تعالٰى قُرُوْءٌ مُشْتَرِكٌ بَيْنَ مَعْنَى الطُّهْرِ وَالْحَيْضِ فَاَوَّلَهُ الشَّافِعِيُّ (رحـ) بِالْاَطْهَارِ لِقَوْلِه تَعَالٰى فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ عَلٰى اَنّ اللَّامَ لِلْوَقْتِ اى فَطَلِّقُوْهُنَّ لِوَقْتِ عِدَّتِهِنَّ وَهُوَ الطُّهْرُ لِاَنَّ الطَّلَاقَ لَمْ يُشْرَعْ اِلَّا فِى الطُّهْرِ بِالْاِجْمَاعِ - واوّله ابُوْ حنيفةَ (رحـ) بالحيض بدلالة قوله تعالٰى ثَلَاثَةَ لِاَنَّهُ خَاصٌّ لَا يَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ - وَالطَّلَاقُ لَمْ يُشْرَعْ اِلَّا فِى الطُّهْرِ فَاِذَا طَلَّقَهَا فِى الطُّهْرِ وَكَانَتِ الْعِدَّةُ اَيْضًا هِيَ الطُّهْرُ فَلَا يَخْلُو اِمَّا اَنْ يُحْتَسَبَ ذٰلِكَ الطُّهْرُ مِنَ الْعِدَّةِ اَوْ لَا - فَاِنِ احْتُسِبَ مِنْهَا كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ (رحـ) يَكُوْنُ قُرْئَيْنِ وَبَعْضًا مِّنَ الثَّالِثِ لِاَنّ بَعْضًا مِّنْهُ قَدْ مَضٰى وَاِنْ لَّمْ يُحْتَسَبْ مِنْهَا وَيُؤْخَذُ ثَلٰثُ اُخَرُ مَا سِوٰى هٰذَا الْقُرْءِ يَكُوْنُ ثَلٰثًا وَبَعْضًا وَعَلٰى كُلِّ تَقْدِيْرٍ يَبْطُلُ مُوْجَبُ الْخَاصِّ الَّذِيْ هُوَ ثَلٰثَةٌ وَاَمَّا اِذَا كَانَتِ الْعِدَّةُ هِيَ الْحَيْضُ وَالطَّلَاقُ فِى الطُّهْرِ لَمْ يَلْزَمْ شَيْءٌ مِّنَ الْمَحْذُوْرَيْنِ بَلْ تُعَدُّ ثَلٰثُ حِيَضٍ بَعْدَ مُضِيِّ الطُّهْرِ الَّذِيْ وَقَعَ فِيْهِ الطَّلَاقُ -

---

অনুবাদ ॥ (৪) *'আর* وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ الخ ***তথা ইদ্দত পালন সংক্রান্ত আয়াতে*** قروء ***শব্দের ব্যাখ্যা*** اطهار ***দ্বারা করা বাতিল বিবেচিত হবে।'*** এ উক্তিটি গ্রন্থকারের পূর্বোক্ত شرط الولاء উক্তির উপর মা'তূফ হয়েছে। এটা খাসের হুকুমের উপর ভিত্তি করে চতুর্থ প্রাসঙ্গিক মাস'আলা। অর্থাৎ খাস যেহেতু স্বয়ং সুস্পষ্ট। তা ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে না। সেহেতু ইদ্দত সংক্রান্ত আল্লাহ তা'আলার ভাষ্যে উল্লেখিত قروء শব্দটিকে اطهار শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করা বাতিল গণ্য হবে। এ ভাষ্যটি হলো– والمطلقات "يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ" অর্থাৎ, তালাকপ্রাপ্তা মহিলাগণ তিন قروء পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলার বাণীতে ব্যবহৃত قروء শব্দটি طهر ও حيض উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইমাম শাফেয়ী (র) আল্লাহ তা'আলার অপর বাণী فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ কে দলিল হিসেবে গ্রহণ করে قروء এর ব্যাখ্যা اطهار দ্বারা করেছেন; এ পরিপ্রেক্ষিতে যে, لعدتهن এর মধ্যকার لام বর্ণটি সময় অর্থ জ্ঞাপক। অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের স্ত্রীগণকে তাদের ইদ্দতের সময়ে তালাক দাও। আর তা হচ্ছে তুহরের সময়কাল। কেননা, ইমামগণের ঐকমত্যে তালাক طهر এর মধ্যে ছাড়া অন্য সময়ে বৈধ নয়। ইমাম আবু হানীফা (র) আল্লাহ তা'আলার বাণীতে উল্লিখিত ثلاثة শব্দের নির্দেশনার ভিত্তিতে قروء শব্দকে حيض অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন। কেননা, ثلاثة শব্দটি খাস, যা হ্রাস-বৃদ্ধির সম্ভাবনা রাখে না। আর তালাক طهر এর মধ্যে ছাড়া অন্য সময়ে শরীয়ত সিদ্ধ নয়। অতএব, তালাকদাতা যখন স্বীয় স্ত্রীকে طهر এর মধ্যে তালাক দেবে এবং عدت ও তদ্রূপ তুহরই হবে, তখণ এ মাস'আলাটি দু অবস্থা থেকে খালি নয়। (১) হয়তো যে তুহরে তালাক দেয়া হয়েছে, তা ইদ্দতের মধ্যে গণ্য হবে (২) কিংবা তা ইদ্দতের মধ্যে গণ্য হবে না। যদি উক্ত طهر কে ইদ্দতের মধ্যে গণ্য করা হয়, যেমনটি ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মাযহাব, তাহলে ইদ্দত দু তুহর ও

তৃতীয় তুহরের কিছু অংশ হবে। কেননা তৃতীয় তুহরের কিয়দাংশ আগেই অতীত হয়ে গিয়েছে। আর যদি উক্ত طهر কে ইদ্দতের মধ্যে গণ্য করা না হয় এবং উক্ত তুহর ব্যতীত অন্য তিন তুহর ধরা হয়, তাহলে ইদ্দত পূর্ণ তিন তুহর ও চতুর্থ তুহরের কিয়দাংশ হয়ে যাবে। উভয় অবস্থায়ই ثلاثة খাস শব্দের অর্থ বাতিল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে حيض কে ইদ্দত ধরলে এবং طهر এর মধ্যে তালাক দিলে উল্লেখিত দুটি বিপত্তির কোনটাই দেখা যায় না; বরং যে طهر এর মধ্যে তালাক সংঘটিত হয়েছে, তা অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী حيض কে ইদ্দত হিসেবে গণনা করা হবে। (এতে নির্দিষ্ট সংখ্যার উপর আমল হয়ে যাবে।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ قوله والتاويل بالاطهار الخ : এটা খাছের বিধান সংশ্লিষ্ট চতুর্থ শাখা মাসআলা। এটা شرط الولاء এর উপর মা'তূফ হয়েছে। এখানে খাছের বিধান দ্বারা ان يتناول المخصوص قطعا উদ্দেশ্য। পূর্বের ন্যায় لا يحتمل البيان উদ্দেশ্য নয়। যেমন মুসান্নিফ (র) ভুলবশত উল্লেখ করেছেন। সামনের চারোটি মাসআলা ان يتناول المخصوص قطعا বিধান সংশ্লিষ্ট। আর পূর্বের তিনটি ছিলো لا يحتمل البيان সংশ্লিষ্ট।

ব্যাখ্যা : مطلقة مدخول بها ذات الحيض غير حاملة তথা তালাকপ্রাপ্তা সহবাসকৃতা ঋতুবতী গর্ভহীন মহিলার ইদ্দত আমাদের হানাফীদের মতে ৩ হায়েয। আর শাফেয়ীদের মতে ৩ তুহর। উভয় পক্ষের দলিল হলো আল্লাহ তা'আলা বাণী وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা মহিলারা নিজেদেরকে ৩ কুরু পর্যন্ত বিরত রাখবে। قروء শব্দটি হায়েয এবং তুহর উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। কাজেই এটা মুশতারিক। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন আয়াতে قروء দ্বারা তুহর উদ্দেশ্য। আর হানাফীগণের মতে হায়েয উদ্দেশ্য।

দলিল : ইমাম শফেয়ী (র) إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ দ্বারা তুহর উদ্দেশ্য হওয়ার ব্যাপারে এ আয়াত দ্বারা দলিল পেশ করেন। তিনি বলেন– لعدتهن শব্দের লাম বর্ণটি সময় জ্ঞাপক। অর্থাৎ উক্ত মহিলাদেরকে ইদ্দতকালে তালাক দাও। এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইদ্দত এবং তালাক এর একই সময় নির্ধারিত। আর তালাকের বিষয়ে সকলে একমত যে, তুহর অবস্থায় তালাক দিতে হবে। কারণ আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) স্বীয় স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাকে رجعت তথা পুনঃ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সুতরাং বোঝা গেলো যে, হায়েয অবস্থায় তালাক দেয়া বৈধ নয়। আর হায়েয অবস্থায় তালাক দেয়া যেহেতু অবৈধ। সুতরাং তুহর অবস্থায় তালাক দেওয়াই বৈধ। অতএব তালাকের বৈধ সময় হলো তুহর। আর لعدتهن শব্দটি এ বিষয়ের দলিল বহন করে যে, ইদ্দতের সময় এবং তালাকের সময় একই। তালাকের সময় ইজমা মতে তুহর। সুতরাং ইদ্দতের সময়ও তুহর। অতএব والمطلقات আয়াতে قروء দ্বারা উদ্দেশ্য হায়েয নয় বরং তুহর।

আবু হানীফা (র) এর দলিল : ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন আয়াতে উল্লেখিত قروء শব্দটি খাছ। এর সুনির্দিষ্ট অর্থ হলো তিন। আর খাছের বিধান এই যে, তা অকাট্যরূপে তার অর্থকে শামিল করে। তার মধ্যে কোনো কম বেশির অবকাশ থাকে না। এটা ঐ সময়ই সম্ভব যখন قروء দ্বারা হায়েয উদ্দেশ্য নেয়া হয়। কেননা তুহর উদ্দেশ্য নেয়ার ক্ষেত্রে قروء শব্দের উপর কম বেশি ছাড়া আমল করা সম্ভব নয়। কারণ তালাক দেয়ার বৈধ সময় হলো তুহর। কোনো ব্যক্তি যখন তুহুরের মধ্যে তালাক দিবে; আর ইদ্দতও যেহেতু তুহর যেমন ইমাম শাফেয়ী (র) বলে থাকেন। তাহলে যে তুহুরে তালাক পতিত হবে হয়তো উক্ত তুহুরকে ইদ্দতের মধ্যে গণ্য করতে হবে। অথবা তাকে ইদ্দতের মধ্যে গণ্য করা হবে না। প্রথম ক্ষেত্রে ইদ্দতের সময় হবে ২ তুহর এবং অপর তুহরের কিছু অংশ অর্থাৎ তালাক দেয়ার পরের অংশ। কাজেই পূর্ণ ৩ তুহর হলো না। আর যদি উক্ত তুহরকে ইদ্দত গণ্য করা না হয় বরং তালাক দেয়ার পরে পূর্ণ ৩ তুহর ইদ্দত হয় তাহলে ইদ্দতের সময় ৩ তুহর এবং অপর তুহরে কিছু অংশ হলো। কাজেই এক্ষেত্রে খাছ ৩ তুহর পাওয়া গেলো না। বরং কম হয় নতুবা বেশি হয়। পক্ষান্তরে قروء দ্বারা হায়েয উদ্দেশ্য নিলে উল্লেখিত ২টি অসুবিধার কোনোটির সম্মুখীন হতে হয় না। অর্থাৎ তালাকের পরবর্তী ৩ হায়েয ইদ্দত গণ্য হবে। এর মধ্যে কম বেশির কোনো সম্ভাবনা থাকে না। কাজেই খাছ শব্দের উপর পূর্ণাঙ্গরূপে আমল পাওয়া গেলো।

وقَدْ قِيلَ اِنّ هٰذا اْلالزَام عَلى الشّافعِيّ (رحـ) يُمْكِنُ اَنْ يُسْتَنْبطَ مِنْ لَفظِ قُرُوءٍ بِدُوْنِ مُلاحَظةِ قولِه ثَلثٍ لِانّه جَمعٌ واقلّه ثَلثٌ - وهٰذا فاسدٌ لاَنَّ الجَمعَ يَجُوزُ اَنْ يُّذْكَرَ وَيُرَادَ به مادُوْن الثلثِ كمَا فى قوله تعالى اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ بخلاف اسْماء العَدَدِ فَانّها نصٌّ فى مَدْلُوْلاتِها - وامَّا قولُه تعالى فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ فمَعْناه لاَجْلِ عِدَّتِهِنَّ اى طَلِّقُوْهُنَّ بحَيثُ يُمْكِنُ اِحْصاءُ عدّتهن وذلك بِاَنْ يَكُوْنَ فىْ طُهْرٍ لاَ وَطْى فيه لِانّه يُعْلمُ حِيْنَئِذٍ اَنَّها غيرُ حامِلٍ فتَعْتَدُّ بثلثِ حيضٍ بلاَ شُبْهَةٍ وَلا تُطَلِّقُوْا فِى طُهْرٍ وُطِى فيه لِانّه لم يُعلمْ حِيْنَئِذٍ اَنَّها حاملٌ تَعْتَدُّ بوضعِ الْحمْلِ اوْ غيرُ حاملٍ تَعْتَدُّ بالحيضِ وكذا لاَتُطَلِّقوا فى الحيضِ لِاَنَّ هٰذا الحيضَ لمْ يُعْتَبَرْ عِنْدنا وَلا الطُّهْرَ الذى يَلِيه فيَنْبَغِى اَنْ يُّحْتَسَبَ فيه ثَلثُ حِيَضٍ اُخَرَ فتَطُوْلُ العِدّةُ عليها بلا تقريبٍ - ثُمّ لِكُلِّ واحدٍ مِّنا وَمِنَ الشّافعِيِّ فى هٰذا المَقامِ قَرائِنُ تُسْتَنْبطُ مِنْ نَفْسِ الاٰيةِ بوُجُوْهٍ مُتَعدّدٍ قدْ ذكرتُها فى التفسيرات الاَحْمَدِيّةِ بالبَسْطِ والتّفصِيلِ فطَالِعْها اِنْ شِئْتَ -

---

অনুবাদ ॥ কারো কারো মতে, ইমাম শাফেয়ী (র)-এর আপত্তি ثلثة শব্দটির প্রতি লক্ষ না করে কেবল قروء শব্দ দ্বারা ও আরোপ করা সম্ভব। কেননা قروء হলো বহুবচন। আর বহুবচনের সর্বনিম্ন সংখ্যা হলো তিন।

কিন্তু এ বক্তব্যটি সঠিক নয়। কারণ বহুবচন শব্দ উল্লেখ করে তিনের কম সংখ্যা উদ্দেশ্য নেয়াও জায়েয আছে। যেমন- আল্লাহ তা'আলার বাণীতে اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ (এখানে اشهر বহুবচন দ্বারা মাত্র দুমাস দশ দিন উদ্দেশ্যে)। হ্যাঁ, اسم عدد সমূহ এর বিপরীত। কেননা, এগুলো স্বীয় নির্দিষ্ট অর্থ নির্দেশে সুস্পষ্ট (সংখ্যা কোনরূপ হ্রাস-বৃদ্ধির সম্ভাবনা রাখে না)।

আল্লাহ তা'আলার বাণী- فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ এর অর্থ হলো لِاَجْلِ عِدَّتِهِنَّ তোমরা স্ত্রীগণকে তাদের গণনার সুবিধার্থে তালাক দাও। অর্থাৎ তোমরা স্বীয় স্ত্রীগণকে এমনভাবে তালাক দাও, যাতে তাদের ইদ্দত গণনা করা সহজে সম্ভব হয়। আর এর পদ্ধতি হলো (১) তালাক এমন তুহরের মধ্যে দিতে হবে, যাতে সঙ্গম করা হয়নি। কেননা তখন এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাবে যে, স্ত্রী গর্ভবতী নয়। সুতরাং সে দ্বিধাহীনভাবে পূর্ণ তিন হায়েযকাল ইদ্দত পালন করবে। (২) উক্ত তুহরে তাদেরকে তালাক দিওনা, যার মধ্যে সঙ্গম করা হয়েছে। কেননা, তখন তা স্ত্রী গর্ভবতী কি-না জানা সম্ভব হবে না? ফলে সে গর্ভ খালাসের ইদ্দত পালন করবে, কিংবা সে গর্ভবতী নয় যদ্দরুন হায়েয দ্বারা عدت পালন করবে। (৩) অনুরূপ তোমরা হায়েয চলাকালীন অবস্থায় তাদেরকে তালাক দিওনা। কেননা এ হায়েয আমাদের হানাফীদের নিকট عدت

এর মধ্যে ধর্তব্য নয়। আর তৎসংলগ্ন তুহরটি ও ইদ্দত গণ্য হবে না। তখন উক্ত হায়েয ব্যতীত আরো তিন হায়েয গণনা করতে হবে। যার কারণে অনর্থক উক্ত মহিলাটির ইদ্দতকাল দীর্ঘায়িত হয়ে যাবে।

এক্ষেত্রে আমাদের ও শাফেয়ীদের প্রত্যেকের স্বপক্ষে প্রমাণাদি রয়েছে, যা বিভিন্ন পন্থায় আয়াতে কারীমা হতে উদ্ভাবিত হয়। (ব্যাখ্যাকার বলেন) আমি সেগুলো تفسير احمدى গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছি। প্রয়োজনে সেখানে দেখে নিবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ قوله وقد قيل ان هذا الخ : মুসান্নিফ (র) বলেন কোনো কোন ব্যক্তির ধারণা যে, قروء দ্বারা হায়েযের অর্থ নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র) এর মোকাবিলায় যেভাবে ثلثة শব্দ দ্বারা দলিল পেশ করা হয়েছে। তদ্রূপ ثلثة শব্দের প্রতি লক্ষ্য ছাড়াই قروء শব্দ বহুবচন হওয়ার দ্বারাও দলিল পেশ করা সম্ভব। তা এভাবে যে, قروء শব্দটি বহুবচন। এটা কমপক্ষে ৩ সংখ্যক বোঝায়। আর এ কথা উল্লেখিত হয়েছে যে, হায়েযকে ইদ্দত গণ্য করলে ৩ এর উপর আমল করা সম্ভব হয়। তুহরকে ইদ্দত গণ্য করলে তার উপর আমল করা সম্ভব হয় না।

মুসান্নিফ (র) নিজেই বলেন যে, এভাবে দলিল পেশ করা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ বহুবচন শব্দের ব্যবহার যেভাবে তিনের উপর হয় তদ্রূপ তিনের কমের উপরও ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী الحج اشهر معلومات এর মধ্যে اشهر শব্দটি شهر এর বহুবচন। এর দ্বারা শাওয়াল, যীকাদা ও যীলহিজ্জার ১০ দিন উদ্দেশ্য। এ আয়াত দ্বারা বোঝা গেলো যে, তিনের কমের উপরেও বহুবচন শব্দ ব্যবহৃত হয়। কাজেই এর দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র) এর বিপরীতে দলিল পেশ করা গ্রহণযোগ্য নয়। এর বিপরীতে সংখ্যাবাচক ইসমসমূহ তার অর্থের উপরে নছ তথা সুস্পষ্ট। তার মধ্যে কম-বেশির সম্ভাবনা থাকে না। এ কারণে ثلثة শব্দ দ্বারা দলিল গ্রহণ করাই সঠিক।

قوله واما قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن : এটা ইমাম শাফেয়ী (র) এর দলিলের উত্তর।

উত্তরের সার : لعدتهن শব্দের লামটি সময় জ্ঞাপক নয়। বরং তার মেয়াদও ইল্লতের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ فطلقوهن لعدتهن তাদেরকে এভাবে তালাক দাও যাতে তাদের জন্যে ইদ্দত গণনা করা সম্ভব হয়। আর তার উপায় এই যে, এমন তুহরে তালাক দিবে যে তুহরে তার সাথে সঙ্গম করা না হয়। কারণ তখন বোঝা যাবে যে, মহিলা গর্ভবতী নয়। নিসন্দেহে তার ইদ্দত হলো ৩ হায়েয। এমন তুহরে তালাক দিও না যে তুহরে তার সাথে সহবাস করা হয়েছে। কারণ তখন মহিলা গর্ভবতী কি না বোঝা যাবে না। এভাবে হায়েযের সময়ও তাকে তালাক দিবে না। কারণ আমাদের মতে সে সময় তার এ হায়েয ইদ্দত গণ্য হবে না। আর তার পরবর্তী তুহরও ইদ্দত গণ্য হবে না। বরং পরবর্তী ৩ হায়েয ইদ্দত গণ্য হবে। এক্ষেত্রে মহিলার ইদ্দত খামাখা দীর্ঘ হয়ে যায়। যার দরুন তাকে কষ্টে নিপতিত করা সাব্যস্ত হয়।

قوله ثم لكل واحد منا الخ : মুসান্নিফ (র) বলেন– قروء এর উদ্দেশ্য নির্ধারণে হানাফী ও শাফেয়ীগণের মধ্যে প্রত্যেকের কাছে এমন দলিল রয়েছে যা والمطلقات আয়াত থেকে ইসতেমবাত করা সম্ভব। লেখকের গ্রন্থ তাফসীরে আহমদীতে তা সুবিস্তৃত আলোচিত হয়েছে। সংক্ষেপে তা এখানে উল্লেখ করা হলো।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন আয়াত উল্লেখিত ثلثة শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ। আর ৩ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা ব্যবহারের নিয়ম এই যে, معدود (যা গণনা করা হবে তা) পুরুষ লিঙ্গ হলে عدد (সংখ্যা) স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহৃত হয়। এর বিপরীতে معدود স্ত্রীলিঙ্গ হলে عدد পুরুষলিঙ্গ হয়। আর قروء এর অর্থ হায়েয শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ। আর طهر শব্দটি পুরুষলিঙ্গ। অতএব ثلثة শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, قروء এর অর্থ তুহর। কারণ তা পুরুষলিঙ্গ।

উত্তর : নাহু শাস্ত্রবিদগণ শব্দ সম্পর্কে আলোচনা করে থাকেন। অর্থ সম্পর্কে তারা আলোচনা খুব কমই করে থাকেন। আর قروء শব্দটি পুরুষলিঙ্গ যদিও তার অর্থ হায়েয শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ। সুতরাং শব্দের দিকে বিবেচনা করে ثلثة শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র) আরো বলেন যে, تربص শব্দটি বাবে تفعل থেকে উৎকলিত। এ বাবের বৈশিষ্ট্য এই যে, তার মধ্যে تكلف তথা লৌকিকতা প্রদর্শন এর অর্থ থাকে। অর্থাৎ তালাক প্রাপ্ত মহিলারা নিজেদেরকে ইদ্দত কালে সুসজ্জিত করে রাখবে। লৌকিকতা মূলক নিজেদেরকে সংযত রাখা আগ্রহ ও উৎসাহ কালে হয়ে থাকে। আর সহবাসের প্রতি উৎসাহ ও আগ্রহ তুহরের সময় পরিলক্ষিত হয়। হায়েয অবস্থায় সহবাসের প্রতি আগ্রহ থাকে না। বরং অনাগ্রহই থাকে বেশি। কাজেই يتربص শব্দটি একথার দিকে ইশারা করে যে, মহিলারা নিজেদেরকে তুহুরের মাধ্যমে সুসজ্জিত করে রাখবে। অপর কথায় তুহুর দ্বারা ইদ্দত পালন করবে।

উত্তর : হায়েযকালে মহিলাদের সহবাসের প্রতি আগ্রহ যদিও কম থাকে। তবে বিবাহের প্রতি আগ্রহ অবশ্যই থাকে। কোরআন মজীদে মহিলাদেরকে ইদ্দতকালে বিবাহ-শাদীর আলাপ আলোচনা থেকে সংযত রাখার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং يتربص শব্দ দ্বারা قروء অর্থ তুহুর সাব্যস্ত হবে না।

হানাফীগণের দলিল ১. وَالّٰئِىْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ وَّالّٰئِىْ لَمْ يَحِضْنَ আয়াত

"যে সকল মহিলারা হায়েয থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। তোমাদের স্ত্রীদের মধ্য থেকে যদি তোমাদের সন্দেহ থেকে যায় তাহলে তাদের ইদ্দত হবে ৩ মাস। এভাবে তাদেরও যাদের হায়েয আসে না।

আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে গায়রে হায়েযাদের ইদ্দত হায়েয না হওয়ার কারণে ৩ মাস নির্ধারণ করেছেন। কাজেই যাদের হায়েয আসে তাদের ইদ্দতও ৩ মাস হবে। প্রত্যেক মাসকে এক হায়েযের স্থলাভিষিক্ত গণ্য করা হয়েছে। সুতরাং ثلثة قروء দ্বারা হায়েয উদ্দেশ্য হবে তুহুর নয়। কারণ কোরআনের এক অংশ অপর অংশের ব্যাখ্যা হয়ে থাকে। প্রসিদ্ধ আছে اِنَّ الْقُرْاٰنَ يُفَسِّرُ بَعْضُهٗ بَعْضًا

দ্বিতীয় দলিল হলো আয়েশা (রা) এর হাদীস اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طَلَاقُ الْاَمَةِ تَطْلِيْقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ বাঁদীদের তালাক হলো ২টি এবং তাদের ইদ্দত হলো ২ হায়েয। বাঁদীদের অধিকার যেহেতু স্বাধীন নারীদের তুলনায় অর্ধেক সে হিসেবে তাদের তালাক এবং ইদ্দত দেড় দেড় হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু তালাক এবং হায়েয যেহেতু অংশ কবুল করে না। এ কারণেই ২ তালাক এবং ২ হায়েয পূর্ণ করা হয়েছে।

সারকথা এই যে, "বাঁদীরা যখন হায়েয দ্বারা তাদের ইদ্দত পালন করে সুতরাং স্বাধীন মহিলারাও হায়েযের মাধ্যমে ইদ্দত পালন করবে। অতএব হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, قروء দ্বারা তুহুর উদ্দেশ্য নয় বরং হায়েয উদ্দেশ্য।

ثُمَّ اِنَّ الْمُصَنِّفَ (رحـ) ذَكَرَ هٰهُنَا مِنْ تَفْرِيْعَاتِ الْخَاصِّ عَلٰى مَذْهَبِهٖ سَبْعَ تَفْرِيْعَاتٍ اَرْبَعٌ مِّنْهَا مَا تَمَّ الْاٰنَ وَثَلٰثٌ مِّنْهَا مَا سَيَجِيْئُ وَاَوْرَدَ بَيْنَ هٰذِهِ الْاَرْبَعَةِ وَالثَّلٰثَةِ بِاعْتِرَاضَيْنِ لِلشَّافِعِيِّ (رحـ) عَلَيْنَا مَعَ جَوَابِهِمَا عَلٰى سَبِيْلِ الْجُمَلِ الْمُعْتَرِضَةِ فَقَالَ وَمُحَلِّلِيَّةُ الزَّوْجِ الثَّانِيْ بِحَدِيْثِ الْعُسَيْلَةِ لَا بِقَوْلِهٖ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ وَهُوَ جَوَابُ سُوَالٍ مُقَدَّرٍ يَرِدُ عَلَيْنَا مِنْ جَانِبِ الشَّافِعِيِّ (رحـ) وَتَقْرِيْرُ السُّؤَالِ لَا بُدَّ فِيْهِ مِنْ تَمْهِيْدِ مُقَدِّمَةٍ وَهِيَ اَنَّ الزَّوْجَةَ اِنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهٗ ثَلٰثًا وَنَكَحَتْ زَوْجًا اٰخَرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ الثَّانِيْ وَنَكَحَهَا الزَّوْجُ الْاَوَّلُ يَمْلِكُ الزَّوْجُ الْاَوَّلُ مَرَّةً اُخْرٰى ثَلٰثَ تَطْلِيْقَاتٍ مُسْتَقِلَّةٍ بِالْاِتِّفَاقِ وَاِنْ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهٗ مَا دُوْنَ الثَّلٰثِ مِنْ وَاحِدَةٍ اَوْ اِثْنَتَيْنِ وَنَكَحَتْ زَوْجًا اٰخَرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ الثَّانِيْ وَنَكَحَهَا الزَّوْجُ الْاَوَّلُ فَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) وَالشَّافِعِيِّ (رحـ) يَمْلِكُ الزَّوْجُ الْاَوَّلُ حِيْنَئِذٍ مَا بَقِيَ مِنَ الْاِثْنَيْنِ اَوْ وَاحِدٍ يَعْنِيْ اِنْ طَلَّقَهَا سَابِقًا وَاحِدًا فَيَمْلِكُ الْاٰنَ اَنْ يُطَلِّقَهَا اِثْنَيْنِ وَتَصِيْرُ مُغَلَّظَةً وَاِنْ طَلَّقَهَا سَابِقًا اِثْنَيْنِ يَمْلِكُ الْاٰنَ اَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدًا لَا غَيْرَ وَعِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَاَبِيْ يُوْسُفَ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى يَمْلِكُ الزَّوْجُ الْاَوَّلُ اَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلٰثًا وَيَكُوْنُ مَا مَضٰى مِنَ الطَّلْقَةِ وَالطَّلْقَتَيْنِ هَدَرًا لِاَنَّ الزَّوْجَ الثَّانِيْ يَكُوْنُ مُحَلِّلًا اِيَّاهَا لِلزَّوْجِ الْاَوَّلِ بِحِلٍّ جَدِيْدٍ وَيَنْهَدِمُ مَا مَضٰى مِنَ الطَّلْقَةِ وَالطَّلْقَتَيْنِ وَالطَّلْقَاتِ -

অনুবাদ ॥ আল-মানার গ্রন্থকার স্বীয় মাযহাব অনুযায়ী خاص এর প্রশাখামূলক মাস'আলাগুলো হতে এখানে সাতটি মাস'আলা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে চারটি মাস'আলার বিবরণ সমাপ্ত হয়েছে এবং বাকি তিনটির বর্ণনা শীঘ্রই আসছে। এই চারটি মাস'আলা ও আগত তিনটি মাস'আলার মাঝে جملة معترضة হিসেবে আমাদের উপর উত্থাপিত ইমাম শাফেয়ী (র)-এর দুটি আপত্তিও সেগুলোর উত্তর উপস্থাপন করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, *দ্বিতীয় স্বামী বৈধতাদানকারী হওয়া (প্রথম স্বামীর জন্যে)* عسيلة *সংক্রান্ত হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার বাণী* حتى تنكح زوجا غيره *দ্বারা নয়।'*

এ বক্তব্য একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর, যা ইমাম শাফেয়ী (র)-এর পক্ষ হতে আমাদের উপর আরোপিত হয়। এর ব্যাখ্যার জন্যে একটি ভূমিকা জানা আবশ্যক। ভূমিকাটি এই যে, যদি স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করে এবং উক্ত স্ত্রী (ইদ্দত সমাপনান্তে) দ্বিতীয় স্বামীকে বিয়ে করে। পুনরায় দ্বিতীয় স্বামীও (সহবাস করার পর) তাকে তালাক প্রদান করে এবং (ইদ্দত পালনের পর) প্রথম স্বামী তাকে পুনরায় বিয়ে করে, তাহলে ইমামদের সর্বসম্মতিক্রমে প্রথম স্বামী পুনরায় স্বতন্ত্র তিন তালাকের অধিকারী হবে। আর যদি প্রথম স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে তিন অপেক্ষা কম অর্থাৎ, এক বা দু তালাক দেয় এবং সে (ইদ্দত সমাপনান্তে) দ্বিতীয় স্বামী

গ্রহণ করে। অতঃপর দ্বিতীয় স্বামী (সহবাস করার পর) তাকে তালাক দেয় আর প্রথম স্বামী তাকে পুনঃ বিবাহ করে, এমতাবস্থায় ইমাম মুহাম্মদ ও শাফেয়ী (র)-এর মতে, প্রথম স্বামী অবশিষ্ট এক বা দুই তালাকের অধিকারী হবে। অর্থাৎ, যদি সে প্রথমবার এক তালাক দেয়, তাহলে এখন দু তালাক প্রদানের অধিকারী হবে। আর দু তালাক দেয়ার পর স্ত্রী مغلظة (চির হারাম) হয়ে যাবে। যদি প্রথমবার দু তালাক দিয়ে থাকে, তবে সে এখন মাত্র এক তালাক প্রদানের অধিকারী হবে, এর বেশী নয়।

ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, এক্ষেত্রেও প্রথম স্বামী স্ত্রীকে পুনরায় তিন তালাক প্রদানের অধিকারী হবে এবং পূর্বের এক অথবা দু তালাক বাতিল হয়ে যাবে। কেননা দ্বিতীয় স্বামী উক্ত স্ত্রীকে প্রথম স্বামীর জন্যে নতুনভাবে বৈধতাদানকারী সাব্যস্ত হয়েছে। যদ্দরুন পূর্বের এক অথবা দু তালাক নিঃশেষ হয়ে গেছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ قوله ثم ان المصنف ذكر الخ : মুসান্নিফ (র) উল্লেখ করেছেন যে, মানার গ্রন্থকার خاص এর বিধান সংশ্লিষ্ট ৭টি মাসআলা উল্লেখ করেছেন। সেগুলোর মধ্যে থেকে ৪টি মাসআলা স্ববিস্তারে পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। অবশিষ্ট ৩টি অচীরেই উল্লেখ করা হবে। উক্ত ৪টি এবং পরবর্তী ৩টির মাঝে جمله معترضه স্বরূপ ইমাম শাফেয়ী (র)এর পক্ষ থেকে হানাফীগণের উপর কৃত ২টি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রথম প্রশ্নের পূর্বে ভূমিকা স্বরূপ কিছু কথা উল্লেখ করা জরুরি।

ভূমিকা : স্বামী যদি স্বীয় স্ত্রীকে ৩ তালাক দেয়। আর সে ইদ্দত পূর্ণ করে ভিন্ন স্বামী গ্রহণ করে। এরপর দ্বিতীয় স্বামী সহবাসের পরে তাকে তালাক দেয়। এরপর ইদ্দত পেরিয়ে যাওয়ার পরে প্রথম স্বামী তাকে বিবাহ করে। তাহলে সকলের মতে প্রথম স্বামী নতুন করে ৩ তালাক দেয়ার অধিকারী হবে। আর স্বামী যদি ৩ এর কম ২ বা ১ তালাক দেয়। এরপর উক্ত স্ত্রী ইদ্দত পূর্ণ করার পরে অন্য স্বামী গ্রহণ করে। অতঃপর এ দ্বিতীয় স্বামী সহবাসের পরে তাকে তালাক দিলে এবং ইদ্দত পালন করার পরে প্রথম স্বামী তাকে বিবাহ করলে ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে প্রথম স্বামী অবশিষ্ট ২ বা ১ তালাকের মালিক হবে। অর্থাৎ ২ তালাক দিয়ে থাকলে ১ তালাক এবং ১ তালাক দিয়ে থাকলে ২ তালাকের অধিকারী হবে। পরবর্তীকালে ১ তালাক বা ২ তালাক দিলে উক্ত স্বামীর জন্য পুনরায় উক্ত স্ত্রীকে গ্রহণ করা সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে যাবে। অর্থাৎ তালাকে মুগাল্লাযা পতিত হবে। কিন্তু শায়খাইন (র) এর মতে প্রথম স্বামী ৩ তালাকের অধিকারী হবে। পূর্বের ১ তালাক বা ২ তালাক বেকার গণ্য হবে। কারণ দ্বিতীয় স্বামী প্রথম স্বামীর ক্ষেত্রে উক্ত মহিলাকে নতুনভাবে হালালকারী বিবেচিত হবে। কাজেই পূর্বের সকল তালাক নিশ্চিহ্ন ও শেষ হয়ে যাবে।

فَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ (رح) بِاَنَّ التَّمَسُّكَ فِي هٰذَا الْبَابِ هُوَ قَوْلُه تَعَالٰى فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ وكلمةُ حَتّٰى لفظٌ خاصٌّ وُضِعَ لِمَعْنَى الْغَايَةِ وَالنِّهَايَةِ فَيُفْهَمُ اَنَّ نِكَاحَ الزَّوْجِ الثَّانِيْ غَايَةٌ لِلْحُرْمَةِ الْغَلِيْظَةِ الثَّابِتَةِ بِالطَّلَقَاتِ الثَّلٰثِ وَلَا تَاثِيْرَ لِلْغَايَةِ فِيْمَا بَعْدَهَا فَلَمْ يُفْهَمْ اَنَّ بَعْدَ النِّكَاحِ يَحْدُثُ حِلٌّ جَدِيْدٌ لِلزَّوْجِ الْاَوَّلِ فَفِيْ هٰذَا اِبْطَالُ مُوْجَبِ الْخَاصِّ الَّذِيْ هُوَ حَتّٰى فَلَمَّا لَمْ يَكُنِ الزَّوْجُ الثَّانِيْ مُحَلِّلًا فِيْمَا وُجِدَ فِيْهِ الْمُغَيَّا وَهُوَ الطَّلَقَاتُ الثَّلٰثُ فَفِيْمَا لَمْ يُوْجَدِ الْمُغَيَّا وَهُوَ مَا دُوْنَ الثَّلٰثِ اَلْاَوْلٰى اَنْ لَّا يَكُوْنَ مُحَلِّلًا فَلَا يَكُوْنُ الزَّوْجُ الثَّانِيْ مُحَلِّلًا اِيَّاهَا لِلزَّوْجِ الْاَوَّلِ بِحِلٍّ جَدِيْدٍ - فَيَقُوْلُ الْمُصَنِّفُ (رح) فِيْ جَوَابِهٖ مِنْ جَانِبِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) اَنَّ كَوْنَ الزَّوْجِ الثَّانِيْ مُحَلِّلًا اِيَّاهَا لِلزَّوْجِ الْاَوَّلِ اِنَّمَا نُثْبِتُهٗ بِحَدِيْثِ الْعُسَيْلَةِ لَا بِقَوْلِهٖ حَتّٰى تَنْكِحَ كَمَا زَعَمْتُمْ - وَبَيَانُهٗ اَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ جَاءَتْ اِلَى الرَّسُوْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَتْ اِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِيْ ثَلٰثًا فَنَكَحْتُ بِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الزُّبَيْرِ (رض) فَمَا وَجَدْتُهٗ اِلَّا كَهُدْبَةِ ثَوْبِيْ هٰذَا تعني وجدته عنينا فقال عليه السلام اَتُرِيْدِيْنَ اَنْ تَعُوْدِيْ اِلٰى رِفَاعَةَ قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ لَا حَتّٰى تَذُوْقِيْ مِنْ عُسَيْلَتِهٖ وَيَذُوْقَ هُوَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ -

---

অনুবাদ॥ ইমাম শাফেয়ী (র) এ বক্তব্য দ্বারা (শায়খাইনের বিরুদ্ধে) আপত্তি উত্থাপন করে বলেন যে, তাহলীল বা হালালকরণের ব্যাপারে দলিল হচ্ছে- আল্লাহ তা'আলার বাণী- فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره অর্থাৎ, 'যদি স্বামী স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করে, তবে সে উক্ত স্বামীর জন্যে পুনঃবার হালাল হবে না, যতক্ষণ না সে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে' এ আয়াতে حتى অব্যয়টি خاص যা غاية বা প্রান্তসীমার অর্থ প্রদানের জন্যে গঠিত। অতএব, বোঝা যায় যে, দ্বিতীয় স্বামীর বিবাহ حرمت غليظة (প্রগাঢ় নিষিদ্ধতা) এর (শেষসীমা) যা তিন তালাক দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। আর এটা স্বীকৃত যে, غاية এর পরবর্তীর মধ্যে তার কোন প্রভাব থাকে না। কাজেই, একথা বোঝা যায় না যে, বিবাহের পরে প্রথম স্বামীর জন্যে حل جديد (নতুন বৈধতা) সৃষ্টি হবে।

অথচ এতে (حل جديد সাব্যস্তকরণের দ্বারা) حتى খাস শব্দটির অর্থ বাতিল করা হয়। অতএব, যে ক্ষেত্রে مغيا (তিন তালাক) পাওয়া গেছে, সেখানে যখন দ্বিতীয় স্বামী হালালকারী সাব্যস্ত হয়নি। কাজেই যেখানে مغيا (তিন তালাক) পাওয়া যায় না, সেক্ষেত্রে তো নিঃসন্দেহেই দ্বিতীয় স্বামী বৈধতাদানকারী সাব্যস্ত হবে না। মোটকথা, দ্বিতীয় স্বামী প্রথম স্বামীর জন্যে স্ত্রীকে নতুন বৈধতার সাথে হালালকারী হবে না।

মানার গ্রন্থকার ইমাম আবু হানীফা (র)- এর পক্ষ হতে এই আপত্তির উত্তরে বলেন যে, দ্বিতীয় স্বামীর উক্ত মহিলাকে প্রথম স্বামীর জন্যে হালালকারী হওয়া, আমরা حديث العسيلة দ্বারা সাব্যস্ত করি। আল্লাহ তা'আলার বাণী- حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ দ্বারা নয়, যেমনটি আপনাদের ধারণা।

বিস্তারিত বিবরণ : একদা রিফাআ নামক জনৈক ব্যক্তির স্ত্রী রাসূল (স)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললো, রিফাআ আমাকে তিন তালাক প্রদান করেছে। যার কারণে আমি আবদুর রহমান ইবনে যুবাইয়েরের সাথে বিবাহ করেছি; কিন্তু আমি তাঁকে আমার এ কাপড়ের আঁচলের ন্যায় পেয়েছি। এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য হলো- আমি তাঁকে পুরুষত্বহীন পেয়েছি। তখন রাসূল (স) বললেন, তুমি কি রিফাআর নিকট ফিরে যেতে চাও? স্ত্রীলোকটি বললো- হ্যাঁ। নবী করীম (স) বললেন, না- তা হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি তার মধুর স্বাদ উপভোগ করবে, আর সেও তোমার মধুর স্বাদ উপভোগ না করবে। অর্থাৎ তালাকের পূর্বে অবশ্যই তোমাদের যৌনসম্ভোগ হতে হবে। নচেৎ رفاعة এর নিকট ফিরে যেতে পারবে না।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ قوله فَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ الخ : শায়খাইনের উপর ইমাম শাফেয়ী (র) এর পক্ষ থেকে আরোপিত প্রশ্নের সার এই যে, শায়খাইন (র) এর এ কথা বলা যে, দ্বিতীয় স্বামী প্রথম স্বামীর জন্য উক্ত মহিলাকে নতুনভাবে হালাল করে দেয় একথাটি গ্রহণযোগ্য নয়। বরং মহিলাকে হালাল করা প্রসঙ্গে এ আয়াতটি দলিল فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَاتَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ এ আয়াতে তৃতীয় তালাকের বর্ণনা করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এই যে, কোনো পুরুষ যদি তার স্ত্রীকে তৃতীয় তালাক দিয়ে দেয় তাহলে উক্ত মহিলা তার স্বামীর জন্য হালাল হবে না। অর্থাৎ তালাকে মুগাল্লাযা হয়ে যাবে। যতোক্ষণ না উক্ত মহিলা অপর স্বামী গ্রহণ করে। অর্থাৎ দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ দ্বারা হুরমতে গলিযা শেষ হয়ে যাবে। এ আয়াতে উল্লেখিত حَتّٰى تَنْكِحَ শব্দটি খাছ। এটা غايت তথা সীমা বোঝানোর অর্থের জন্য গঠিত। অর্থাৎ حتى এর অর্থ এই যে, এর পূর্বে যে বিষয় উল্লেখিত হয় এরপরে উক্ত বস্তু বা বিষয় শেষ হয়ে যায়। যেমন- কেউ যদি বলে اَضْرِبُكَ حَتّٰى جَاءَ خَالِدٌ আমি তোমাকে খালেদ আসা পর্যন্ত প্রহার করবো। অর্থাৎ খালেদ আসার পরে প্রহার বন্ধ করবো।

সুতরাং حتى শব্দের অর্থের আলোকে আয়াতের উদ্দেশ্য এই হবে যে, "প্রথম স্বামীর ৩ তালাকের দ্বারা যে হুরমতে গলিযা সাব্যস্ত হয়েছিলো দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণের দ্বারা তা শেষ হয়ে যাবে"। حتى শব্দটি একথাই বোঝায় যে, দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিবাহ করার দ্বারা ৩ তালাকের কারণে যে কঠোর হারাম ছিলো তা শেষ হয়ে যাবে। কখনো এমন অর্থ বোঝায় না যে, দ্বিতীয় স্বামী প্রথম স্বামীর জন্য নতুনভাবে হালাল করে দিবে। সুতরাং শায়খাইনের এই উক্তি যে, দ্বিতীয় স্বামী প্রথম স্বামীর জন্য বৈধতা সৃষ্টি করে এটা খাছ তথা حتى শব্দের مقتضى বা দাবিকে বাতিল করে দেয়। আর যেক্ষেত্রে مغيا উল্লেখিত থাকে (অর্থাৎ ৩ তালাকের কারণে হুরমতে গলিযা হওয়া) যখন দ্বিতীয় স্বামী প্রথম স্বামীর জন্য محلل (নতুনভাবে বৈধতা সৃষ্টিকারী) হলো না। তাহলে যে ক্ষেত্রে مغيا ও বিদ্যমান নেই অর্থাৎ ৩ তালাকের কমের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্বামী প্রথম স্বামীর জন্য আরো উত্তমরূপে محلل হবে না।

মোটকথা এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, দ্বিতীয় স্বামী প্রথম স্বামীর জন্য উক্ত মহিলাকে নতুনভাবে محلل হয় না। সুতরাং শায়খাইনের এ উক্তি সঠিক নয়।

قوله فَيَقُولُ الْمُصَنِّفُ فِيْ جَوَابِهِ الخ : এই ইবারত দ্বারা মানার গ্রন্থকার শায়খাইনের পক্ষ থেকে উত্তর দিচ্ছেন যে, আমরা প্রথম স্বামীর জন্য দ্বিতীয় স্বামী মুহাল্লিল তথা দ্বিতীয় স্ত্রী বৈধ করার জন্য উসায়লার হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করে থাকি। حَتّٰى تَنْكِحَ আয়াত দ্বারা নয়। উক্ত আয়াত দ্বারা দলিল গ্রহণ করলে তখন আপনাদের প্রশ্ন করা যুক্তিযুক্ত হতো। সুতরাং আপনার প্রশ্ন যে, দ্বিতীয় স্বামীকে মুহাল্লিল গণ্য করলে তখন حتى খাছ শব্দের দাবি বাতিল হয়ে যায় তা আরোপিত হবে না।

فَهٰذَا الْحَدِيْثُ مَسُوْقٌ لِبَيَانِ اَنَّهُ يُشْتَرَطُ وَطْىُ الزَّوْجِ الثَّانِىْ اَيْضًا وَلَا يَكْفِىْ مُجَرَّدُ النِّكَاحِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ ظَاهِرِ الْاٰيَةِ وَهٰذَا حَدِيْثٌ مَشْهُوْرٌ قَبِلَهُ الشَّافِعِىُّ (رحـ) اَيْضًا لِاَجْلِ اِشْتِرَاطِ الْوَطْىِ وَالزِّيَادَةُ بِمِثْلِهِ عَلَى الْكِتَابِ جَائِزٌ بِالْاِتِّفَاقِ وَهٰذَا الْحَدِيْثُ كَمَا اَنَّهُ يَدُلُّ عَلٰى اشْتِرَاطِ الْوَطْىِ بِعِبَارَةِ النَّصِّ فَكَذَا يَدُلُّ عَلٰى مُحَلِّلِيَّةِ الزَّوْجِ الثَّانِىْ بِاِشَارَةِ النَّصِّ وَذٰلِكَ لِاَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَهَا اَتُرِيْدِيْنَ اَنْ تَعُوْدِىْ اِلٰى رِفَاعَةَ وَلَمْ يَقُلْ اَتُرِيْدِيْنَ اَنْ تَنْتَهِىَ حُرْمَتُكِ وَالْعَوْدُ هُوَ الرُّجُوْعُ اِلَى الْحَالَةِ الْاُوْلٰى وَفِى الْحَالَةِ الْاُوْلٰى كَانَ الْحِلُّ ثَابِتًا لَهَا فَاِذَا عَادَتِ الْحَالَةُ الْاُوْلٰى عَادَ الْحِلُّ وَتَجَدَّدَ بِاسْتِقْلَالِهِ

অনুবাদ ॥ এ হাদীসটি উল্লেখের কারণ এই যে, (তাহলীলের জন্যে) দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গম করা পূর্বশর্ত। নিছক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যথেষ্ট নয়। যেমনটি আয়াতের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা বোধগম্য হয়। আর এটি একটি মাশহুর হাদীস। ইমাম শাফেয়ী (র)ও তাহলীলের ক্ষেত্রে সঙ্গমের শর্তারোপ করার জন্যে এ হাদীসটি গ্রহণ করেছেন এবং এ ধরনের حديث مشهور দ্বারা কিতাবুল্লাহর ওপর বৃদ্ধিকরণ সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ।

এ হাদীসটি যেভাবে عبارة النص (শাব্দিক ভাষাভঙ্গি) দ্বারা তাহলীলের জন্যে সঙ্গমের শর্তারোপ বোঝায় তদ্রূপ এটা اشارة النص (শাব্দিক ইঙ্গিত) দ্বারা দ্বিতীয় স্বামীর হালালকারী হওয়াও বোঝায়। কেননা নবী কারীম (স) তাকে বললেন, তুমি কি রিফাআর নিকট ফিরে যেতে চাও? কিন্তু তিনি তাকে একথা বলেন নি যে, তুমি কি চাও যে, প্রথম স্বামীর সাথে তোমার যে حُرْمَتْ (নিষিদ্ধতা) ছিল তা শেষ হয়ে যাক? হাদীসে ব্যবহৃত عَوْد শব্দের অর্থ হলো- 'প্রথম অবস্থার দিকে প্রত্যাবর্তন করা।' আর প্রথম অবস্থায় স্ত্রী লোকটির জন্যে حلت বা হালাল হওয়া সাব্যস্ত ছিল। অতএব, যখন প্রথম অবস্থায় ফিরে আসবে, তখন حلت (বৈধতা)ও ফিরে আসবে এবং স্বতন্ত্র একটি নতুন حِلَّتْ সৃষ্টি হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ উসায়লার হাদীসের ব্যাখ্যা : রিফা'আ কুরযীর বিবি একবার রাসূলুল্লাহ (স) এর কাছে এসে আরজ করলো– আমার স্বামী রেফা'আ আমাকে ৩ তালাক দিয়েছে। ইদ্দত পালনের পর আমি আব্দুর রহমান ইবনে জুবায়েরের সাথে বিবাহ করেছি। কিন্তু আমি তাকে নপুংশক তথা স্ত্রী ব্যবহারে অক্ষম পেয়েছি। রাসূলুল্লাহ (স) তার এ কথা শুনে বললেন– তুমি কি রেফা'আর কাছে ফিরে যেতে চাও। সে বললো– জী হ্যা, রাসূলুল্লাহ (স) তার এ কথা শুনে বললেন– তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত রেফা'আর কাছে ফিরে যেতে পারবে না যতক্ষণ তুমি আব্দুর রহমানের কিছুটা হলেও মধুর স্বাদ গ্রহণ না করো এবং সে তোমার মধুর স্বাদ গ্রহণ না করে।

এ হাদীস এ বিষয়কে বর্ণনা করার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, হালাল হওয়ার জন্য দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গম করা জরুরি। কেবল বিবাহ যা আয়াত দ্বারা বুঝে আসে তা যথেষ্ট নয়। আর এ হাদীসটি মাশহুর। ইমাম শাফেয়ী (র)ও হালালার জন্য সঙ্গম শর্ত স্থির করার ব্যাপারে এই হাদীস গ্রহণ করেছেন। সুতরাং এ ধরনের মাশহুর হাদীস দ্বারা কিতাবুল্লাহর উপর অতিরঞ্জন সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয। এ হাদীসটি যেভাবে ইবারাতুননস দ্বারা হালালার জন্য সঙ্গম শর্ত হওয়া বোঝায় তদ্রূপ ইশারাতুন নস দ্বারা দ্বিতীয় স্বামীর জন্য বৈধকারী হওয়াও বোঝায়। তা এভাবে যে, রাসূলুল্লাহ (স) উক্ত মহিলাকে বলেছিলেন اَتُرِيْدِيْنَ اَنْ تَعُوْدِىْ اِلٰى رِفَاعَةَ তুমি কি রেফা'র কাছে ফিরে যেতে চাও? তিনি তাকে এ প্রশ্ন করেন নি اَتُرِيْدِيْنَ اَنْ تَنْتَهِىَ حُرْمَتُكِ তুমি কি তোমার হারাম হওয়া শেষ হউক তা চাও? (পরের পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

وَاذا ثَبَتَ بِهٰذا النَّصِّ الحِلُّ فِيما عَدِمَ فِيهِ الحِلُّ وهُو الطَّلقاتُ الثَّلثُ مُطلقًا ففِيما كانَ الحِلُّ ناقصاً وهو ما دُوْن الثلثِ اَوْلٰى انْ يكونَ الزوجُ الثانى مُتَمِّمًا لِلْحِلِّ النَّاقِصِ بِالطَّرِيْقِ الْاَكْمَلِ - ثمّ قال المُصَنِّفُ (رحـ) وَبُطلانُ العِصْمَةِ عَنِ المَسْرُوْقِ بِقَوْلِهِ جَزَاءٌ لا بِقولِه فَاقْطَعُوْا وهٰذا ايضًا جوابُ سُوالٍ مُقدّرٍ يَرِدُ علينا مِن جانِبِ الشّافعيّ (رحـ) وتقريرُ السّوال هٰهُنا ايضًا لا بُدّ فيه مِن تمهيدِ مُقدِّمَةٍ وهى انّ السّارِقَ اذا سَرَقَ شيئًا مِّن اَحَدٍ وقُطِعَ يَدُهُ فيها فانْ كانَ المسروقُ مَوْجُوْدًا فى يَدِ السّارِقِ رُدَّ اِلى الْمَالِكِ بِالْاِتّفاقِ وانْ كانَ هَالكًا فعِنْدَ الشّافِعِىّ (رحـ) يَجِبُ الضّمانُ عليه سَواءٌ هَلَكَ بِنَفْسِه اوْ اسْتَهْلَكَهُ وعِنْدَ ابِىْ حنيفة (رحـ) لا يَجِبُ الضّمانُ قَطُّ اِلاّ عندَ الْاِسْتِهْلاكِ فِىْ رِوايَةٍ -

---

অনুবাদ ॥ এই ভাষ্য দ্বারা যখন তিন তালাকের ক্ষেত্রে حلت সাব্যস্ত হলো, যার মধ্যে حلت সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত, আর তা হলো তিন তালাক। অতএব যার মধ্যে حلت অসম্পূর্ণ অর্থাৎ তিন অপেক্ষা কম সংখ্যক তালাকের ক্ষেত্রে, তাতে অবশ্যই উত্তমপন্থায় দ্বিতীয় স্বামীর অপূর্ণ حلت কে পূর্ণতাদানকারী হবে। অতঃপর মুসান্নিফ (র) বলেন, *'চুরিকৃত মাল হতে মালিকের নিরাপত্তার দায়িত্ব বাতিল হওয়া আল্লাহ তা'আলার বাণী-* جزاء *দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। তাঁর বাণী-* فاقطعوا *দ্বারা নয়।'* এটা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর, যা আমাদের ওপর ইমাম শাফেয়ী (র)-এর পক্ষ হতে করা হয়েছে। প্রশ্নটি আলোচনার জন্যে এখানেও একটি ভূমিকা উল্লেখ করা আবশ্যক। আর তা হলো- চোর যখন কারো কোন বস্তু চুরি করে এবং তজ্জন্য তার হাতকাটা হয়, তখন যদি চোরের হাতে চোরাই মাল বিদ্যমান থাকে, তাহলে ইমামদের সর্বসম্মতিক্রমে তা মালিককে ফেরত দিতে হবে। আর যদি চোরাই মাল নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ইমাম

(পূর্বের বাকী অংশ) মোটকথা রাসূলুল্লাহ (স) এর মধ্যে ان تعودى শব্দ ব্যবহার করেছেন। যার অর্থ হলো পূর্বের অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করা। আর রেফা'আর কাছে থাকাকালে মহিলার ক্ষেত্রে বৈধতা প্রমাণিত ছিলো। অতএব এ মহিলা যখন পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে কাজেই তার বৈধতাও ফিরে আসবে এবং নতুন করে এ বৈধতা সৃষ্টি হবে। এ হাদীস দ্বারা বোঝা গেলো যে, তালাকে মুগাল্লাযা প্রাপ্ত মহিলার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্বামী প্রথম স্বামীর জন্য সম্পূর্ণ নতুনভাবে বৈধকারীগণ্য হয়। অতএব এ হাদীস দ্বারা ঐ ক্ষেত্রে বৈধতা প্রমাণিত হবে যেসময় বৈধতা একেবারেই অনুপস্থিত ছিলো। অর্থাৎ প্রথম স্বামীর ৩ তালাক দেয়ার ক্ষেত্রে যেভাবে সম্পূর্ণরূপে বৈধতা নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। অর্থাৎ যেক্ষেত্রে বৈধতাসম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়নি বরং তা নাকিস ছিলো সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্বামী আরো উত্তমরূপে উক্ত অসম্পূর্ণ বৈধতাকে পূর্ণাঙ্গ করবে। কারণ অনুপস্থিত বস্তুকে উপস্থিত করার তুলনায় অসম্পূর্ণ বস্তুকে পরিপূর্ণ করা সহজ। অতএব প্রমাণিত হলো যে, প্রথম স্বামী তার স্ত্রীকে ৩ তালাক দেয়ার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্বামী প্রথম স্বামীর জন্য যেভাবে বৈধকারী হয় তদ্রূপ ৩ তালাকের কমের ক্ষেত্রে আরো উত্তমরূপে সাব্যস্থ হবে। অর্থাৎ প্রথমস্বামী নতুনভাবে ৩ তালাকের অধিকারী হবে।

শাফেয়ী (র)-এর মতে, চোরের ওপর ক্ষতিপূরণ প্রদান করা ওয়াজিব। চাই মাল আপন-আপনি ধ্বংস হোক, অথবা চোর স্বয়ং তা নষ্ট করুক। আর ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, কোন অবস্থাতেই চোরের ওপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। অবশ্য এক বর্ণনা অনুযায়ী ইচ্ছাকৃতভাবে মাল নষ্ট করার অবস্থায় ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله ثُمَّ قَالَ الْمُصَنِّفُ رح وَبُطْلَانُ الْعِصْمَةِ الخ : মানার গ্রন্থকার ইমাম শাফেয়ী (র) এর পক্ষথেকে আরোপিত দ্বিতীয় একটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। এ প্রশ্নের পূর্বেও ভূমিকা স্বরূপ কিছু কথা অবগত হওয়া জরুরি।

ভূমিকা : চোর কোনো ব্যক্তির মাল চুরি করলে এবং এর প্রতিশোধ স্বরূপ তার হাত কাটা হলে এরপর যদি চোরের কাছে উক্ত মাল বিদ্যমান থাকে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত মাল মালিককে ফেরত দিতে হবে। এভাবে চোর যদি উক্ত মাল বিক্রি করে বা কাউকে দান করে তাহলে চোর ক্রেতা থেকে বা যাকে দান করেছে তার থেকে তা ফেরেত এনে মালিককে ফেরত দেবে। আর মাল যদি চোরের কাছে বিনষ্ট হয়ে যায়। তাহলে ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে চোরের উপর চুরিকৃত মালের ক্ষতিপূরণ দেয়া ওয়াজিব হবে। চাই সে মাল এমনিতেই নষ্ট হয়ে যাক। অথবা চোরে তা বিনষ্ট করুক।

যাহিরুর রেওয়ায়াত অনুযায়ী ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে মোটেই ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। চাই মাল এমনিতেই বিনষ্ট হোক বা চোরে তাকে বিনষ্ট করুক। এ ব্যাপারে নাসায়ী শরীফের একটি হাদীস عن عبد الرحمن بن عوف لا يُغَرَّمُ صَاحِبُ سَرِقَةٍ اذا أُقِيمَ عليه الحَدُّ এর সহায়ক রয়েছে। অর্থাৎ যখন চোরের উপর দণ্ড কায়েম করা হয়। তখন তার উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব করা হবে না। এই হাদীস মুতলাক হওয়ার কারণে একথার প্রমাণ বহন করে যে, চুরির দণ্ড কায়েম করার পর চোর মালের জামিন হবে না। চাই মাল নিজেই বিনষ্ট হোক বা চোর তাকে বিনষ্ট করুক। হযরত আবু হানীফা (র) থেকে হাসান ইবনে জিয়াদের বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, যদি মাল নিজে নিজে বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে চোরের উপর তার ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। আর চোর নিজেই মাল বিনষ্ট করলে তার উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

ইমাম সাহেব (র) এর দলিল : চুরির প্রতিশোধ স্বরূপ যখন চোরের হাত কর্তন করা হলো তখন চুরির অন্যায় শেষ হয়ে গেলো। আর চোরাই মাল চোরের কাছে জেনায়েত বিহীন থেকে গেলো। অতএব চোরের কাছে মালটা আমানতস্বরূপ থাকলো। আর আমানতের ক্ষেত্রে মাল নিজে নিজে নষ্ট হয়ে গেলে আমানতদারের উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না। অবশ্য নিজে বিনষ্ট করলে তখন তার ক্ষতিপূরণ দেয়া ওয়াজিব হয়। কাজেই এখানেও চুরাই মাল নিজে নিজে নষ্ট হলে চোরের উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। আর চোর কর্তৃক তা বিনষ্ট করলে তখন তার উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

وذلك لِاَنّه حِيْن اراد السَّارِقُ السَّرِقَةَ يَبْطُلُ قُبَيْلَ السَّرِقَةِ عِصْمَةُ الْمَالِ الْمَسروق مِنْ يَدِ الْمَالِكِ حَتّٰى يَصِيْر فِىْ حَقِّه مِنْ جُمْلَةِ مَا لَا يَتَقَوَّمُ وَ تَتَحَوَّلُ عِصْمَتُه اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى وهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنْ ضِمَانِ الْمَالِ واِنَّمَا يَجِبُ الرَّدُّ اذا كانَ موجودًا لِاَنّه لم يَبْطُلْ مِلْكُهُ وانْ زالتْ عِصمَتُه فَلِرِعَايَةِ الصُّورةِ قُلنا بِوُجُوْبِ رَدِّ الْمَالِ وَلِرِعَايَةِ الْمَعْنٰى قُلنا بِعَدَمِ ضَمَانِه -

অনুবাদ ॥ ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব না হওয়ার কারণ হলো– চোর যখন চুরি করার ইচ্ছা করে, তখন চুরির কিছুক্ষণ পূর্বে মালিকের হাত হতে চুরিকৃত মালের সংরক্ষণ ক্ষমতা বাতিল হয়ে যায়। এমনকি তার ব্যাপারে এ মাল ঐ সব মালের শ্রেণীভুক্ত হয়ে যায়, যার কোন মূল্য নেই এবং উক্ত মালের সংরক্ষণ দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলার প্রতি স্থানান্তরিত হয়। আর আল্লাহ তা'আলা মালের ক্ষতিপূরণ গ্রহণে অমুখাপেক্ষী নয়। অবশ্য মাল চোরের হাতে বিদ্যমান থাকলে মালিককে তা ফেরত দেয়া ওয়াজিব হবে। কেননা তার মালিকানা বাতিল হয়নি, যদিও তার সংরক্ষণ ক্ষমতা বাতিল হয়ে গেছে। অতএব, আমরা বাহ্যিক অবস্থার বিবেচনা করে বলি যে, মাল ফেরত দেয়া ওয়াজিব। আর অভ্যন্তরীণ দিক বিবেচনা করে বলি যে, ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله وذَالِكَ لِاَنَّه حِيْنَ اَرَادَ الخ : দ্বারা মুসান্নিফ (র) বলেন যাহিরুর রেওয়ায়াত অনুযায়ী সর্বক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব না হওয়ার ব্যাপারে যুক্তি এই যে, ইসমত তথা সংরক্ষণ চোরাই মালের একটি সিফত। শরীআতের পরিভাষায় ইসমতের পরিচয় এই যে, উক্ত মাল এমন পর্যায়ের হবে যে, মালিক বিহীন অন্য কারো জন্য তার মধ্যে কর্তৃত্ব প্রয়োগ করা সম্পূর্ণ হারাম ও নাজায়েয। সুতরাং চুরির আগে চোরাই মালের জন্য ইসমত স্বীকৃত ছিলো। এখন যদি কোনো ব্যক্তি উক্ত মালকে বিনষ্ট করে তাহলে মালিকের জন্য উক্ত ব্যক্তির উপর ক্ষতিপূরণ দেয়া ওয়াজিব হয়।

সারকথা এই যে, চুরির পূর্বে মাল মালিক তথা বান্দার হক হওয়ার কারণে তা হারাম ছিলো। কিন্তু চোর যখন তা চুরি করার ইচ্ছা করলো তখন চুরির পূর্ব মুহূর্তে চোরাই মালের ইসমত ও হেফাযতের দায়িত্ব মালিকের হাত থেকে বাতিল হয়ে যায়। ফলে তার ক্ষেত্রে উক্ত মাল غير متقوم তথা মূল্য বিহীন সাব্যস্ত হয়। তখন উক্ত মালের ইসমত ও হেফাযতের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলার প্রতি স্থানান্তরিত হয়। কেমন যেন চুরির সামান্য পূর্বে আল্লাহর হক হওয়ার কারণে হারাম হয়ে গিয়েছিলো। সুতরাং চুরির এ অন্যায়টি আল্লাহর হকে পাওয়া গেলো। আর আল্লাহ তা'আলা মালের ক্ষতিপূরণ থেকে মুক্ষাপেক্ষীহীন। কাজেই চোর এক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ থেকে মুক্ত হবে। আর বান্দার ক্ষেত্রে এ কারণে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না যে, চুরির আগ মুহূর্তে তার ব্যাপারে মাল মূল্যহীন হয়ে গিয়েছিলো। আর এ ধরনের মালের ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না। কাজেই মাল নিজে নিজে বিনষ্ট হোক বা চোর তা বিনষ্ট করুক উভয় ক্ষেত্রে তার ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব না হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

قوله وَاِنَّمَا يَجِبُ الرَّدُّ الخ : এখান থেকে ভিন্ন একটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

প্রশ্ন : চোরাই মাল যদি মালিকের ক্ষেত্রে মূল্যহীন সাব্যস্ত হয় এবং তা সংরক্ষণের দায়িত্ব মালিকের থেকে আল্লাহ তা'আলার প্রতি স্থানান্তরিত হয় তাহলে যে ক্ষেত্রে চোরের কাছে মাল বিদ্যমান থাকে সেক্ষেত্রেও মালিককে উক্ত মাল ফেরত দেয়া জরুরি হবে না। অথচ এক্ষেত্রে মাল ফেরত দেয়া জরুরি সাব্যস্ত করে কেন?

উত্তর : চোরাই মাল থেকে যদিও মালিকের সংরক্ষণের দায়িত্ব দূরীভূত হয়েছিলো তবে তার মালিকানা বাতিল হয়নি। এই সূত্রে আমরা বলি মাল বিদ্যমান থাকলে তা মালিককে ফেরত দেয়া জরুরি। আর এ বাতেনি অর্থ অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি তার হেফাযতের দায়িত্ব স্থানান্তরিত হওয়ার কারণে আমরা বলি যে, মাল বিনষ্ট হলে বা চোর তা বিনষ্ট করলে তার উপর ক্ষতপূরণ ওয়াজিব হবে না।

وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ (رحـ) بِاَنَّ الْمَنْصُوْصَ عَلَيْهِ فِى هٰذَا الْبَابِ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالٰى وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا" وَالْقَطْعُ لَفْظٌ خَاصٌّ وُضِعَ لِمَعْنًى مَعْلُوْمٍ وَهُوَ الْاِبَانَةُ عَنِ الرُّسْغِ وَلَا دَلَالَةَ لَهُ عَلٰى تَحَوُّلِ الْعِصْمَةِ عَنِ الْمَالِكِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى فَالْقَوْلُ بِبُطْلَانِ الْعِصْمَةِ زِيَادَةٌ عَلٰى خَاصِّ الْكِتَابِ - فَاَجَابَ الْمُصَنِّفُ (رحـ) عَنْ جَانِبِ اَبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى بِاَنَّ بُطْلَانَ الْعِصْمَةِ عَنِ الْمَالِ الْمَسْرُوْقِ وَاِزَالَتَهَا مِنَ الْمَالِكِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى اِنَّمَا نُثْبِتُهُ بِقَوْلِهِ تَعَالٰى "جَزَآءً بِمَا كَسَبَا" لَا بِقَوْلِهِ "فَاقْطَعُوْا" وَذٰلِكَ لِاَنَّ الْجَزَاءَ اِذَا وَقَعَ مُطْلَقًا فِى مَعْرَضِ الْعُقُوْبَاتِ يُرَادُ بِهِ مَا يَجِبُ حَقًّا لِلّٰهِ تَعَالٰى وَاِنَّمَا يَكُوْنُ حَقًّا لِلّٰهِ تَعَالٰى اِذَا وَقَعَتِ الْجِنَايَةُ فِى عِصْمَتِهِ وَحِفْظِهِ وَاِذَا كَانَ كَذٰلِكَ فَقَدْ شُرِعَ جَزَاؤُهُ جَزَاءً كَامِلًا وَهُوَ الْقَطْعُ وَلَا يَحْتَاجُ اِلٰى ضَمَانِ الْمَالِ غَايَتُهُ اَنَّهُ اِذَا كَانَ الْمَالُ مَوْجُوْدًا فِى يَدِهِ يُرَدُّ اِلَيْهِ لِاَجْلِ الصُّوْرَةِ وَلِاَنَّ جَزٰى يَجِيْءُ بِمَعْنٰى كَفٰى فَيَدُلُّ عَلٰى اَنَّ الْقَطْعَ هُوَ كَافٍ لِهٰذِهِ الْجِنَايَةِ وَلَا يَحْتَاجُ اِلٰى جَزَاءٍ اٰخَرَ حَتّٰى يَجِبَ الضَّمَانُ هٰذَا نُبَذٌ مِمَّا ذَكَرْتُهُ فِى التَّفْسِيْرِ الْاَحْمَدِى وَكَفَاكَ هٰذَا -

---

অনুবাদ ॥ ইমাম শাফেয়ী (র) হানাফীদের বক্তব্যের ওপর অভিযোগ করে বলেন– এ ব্যাপারে নস হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী– "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا" অর্থাৎ পুরুষ চোর ও নারী চোর, তাদের কৃত অন্যায়ের দরুন উভয়ের হাত কেটে দাও। এ আয়াতে قطع শব্দটি خاص যা একটি নির্দিষ্ট অর্থের জন্যে গঠিত। তা হলো 'কব্জি হতে হাতকে বিচ্ছিন্ন করা' এর মধ্যে মালিক হতে আল্লাহ তা'আলার দিকে সংরক্ষণ ক্ষমতা স্থানান্তরিত হওয়ার কোন নির্দেশনা নেই। সুতরাং চুরির কিছুক্ষণ আগে মালিকের সংরক্ষণ ক্ষমতা বাতিল হওয়ার কথা বলা কুরআনের خاص শব্দের ওপর অতিরিক্ত বৈ কিছু নয়। গ্রন্থকার ইমাম আবু হানীফা (র)-এর পক্ষ হতে উত্তরে বলেন যে, চুরিকৃত মাল হতে মালিকের সংরক্ষণ ক্ষমতা বাতিল হওয়া এবং তা মালিকের নিকট হতে দূরিভূত হয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রত্যাবর্তিত হওয়াটা আমরা আল্লাহ তা'আলার বাণী جَزَاءً بِمَا كَسَبَا দ্বারা সাব্যস্ত করি فَاقْطَعُوْا দ্বারা নয়।

কারণ : (১) যখন جزاء শব্দটি সাধারণভাবে শাস্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, তখন তদ্বারা এমন বিষয় উদ্দেশ্য হয়, যা আল্লাহ্‌র অধিকার হিসেবে ওয়াজিব হয়ে থাকে। আর جزاء তখনই আল্লাহ্‌র অধিকার বিবেচিত হতে পারে, যখন আল্লাহ্‌র বিশেষ عصمت ও হিফাযতের অধীনে অপরাধ সংঘটিত হয়। আর যখন এটাই সাব্যস্ত হল তখন তার পূর্ণাঙ্গ শাস্তি বিধান করা হয়েছে। আর তা হলো হাত কর্তন করা। অতএব সম্পদের ক্ষতিপূরন দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। বড়জোর এতটুকু বলা যায় যে, যদি চোরের হাতে চুরিকৃত মাল বিদ্যমান থাকে, তাহলে বাহ্যিক অবস্থা বিচারে তা মালিককে ফেরত দিতে হবে।

(২) দ্বিতীয় কারণ : جزء এর আভিধানিক অর্থ হলো- যথেষ্ট হওয়া। অতএব, جزاء শব্দটি একথা বোঝায় যে, চুরির অপরাধের জন্যে হাত কেটে দেয়াই যথেষ্ট। অন্য কোন শাস্তির প্রয়োজন নেই, যদ্দারা ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হতে পারে। আল্লামা মোল্লা জুয়ূন (র) বলেন, আমি تفسير احمدى তে যা উল্লেখ করেছি, এটা তার যৎসামান্য আলোচনা মাত্র। তোমার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله واعترض عليه الشافعي : ইমাম শাফেয়ী (র) এর পক্ষ থেকে আরোপিত প্রশ্নের সার এই যে, চুরি প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার স্পষ্ট ভাষ্য এই والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا এই আয়াতে قطع একটি খাছ শব্দ। নির্দিষ্ট অর্থ বোঝানোর জন্য তাকে গঠন করা হয়েছে। উক্ত অর্থ হলো কব্জি থেকে হাত বিচ্ছিন্ন করা। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, খাছ শব্দ তার অর্থকে অকাট্যরূপে শামিল করে। তার মধ্যে কম বেশির কোনো সম্ভাবনা থাকে না। অর্থাৎ قطع শব্দটি এটা অকাট্যরূপে একথা বোঝায় না যে, চুরাই মাল সংরক্ষণের দায়িত্ব মালিকের থেকে সরে আল্লাহর প্রতি স্থানান্তরিত হয়েছে। সুতরাং হানাফীগণের পক্ষ থেকে একথা বলা যে. চোরাই মাল হেফাযতের দায়িত্ব মালিকের থেকে সরে গিয়ে আল্লাহর দায়িত্বে স্থানান্তরিত হয়। এর দ্বারা কিতাবুল্লাহর خاص বিধানের উপর অতিরঞ্জন সাব্যস্ত হয়। অথচ হানাফীগণের মতে خاص এর বিধানের মধ্যে কোনো কম বেশির অবকাশ থাকে না।

قوله فأجاب المصنف رح عن الخ : এ ইবারত দ্বারা মাতিন (র) আবু হানীফা (র) এর পক্ষ থেকে উল্লেখিত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। উত্তর এই যে, চোরাই মাল সংরক্ষণের দায়িত্ব মালিকের থেকে সরে গিয়ে আল্লাহ তা'আলার দায়িত্বে স্থানান্তরিত হওয়াকে আমরা جزاء بما كسبا আয়াত দ্বারা প্রমাণিত করি। فاقطعوا শব্দ দ্বারা নয়। যেমনটি ইমাম শাফেয়ী (র) মনে করেছেন। جزاء শব্দ দ্বারা প্রমাণিত করার কারণ এই যে, جزاء শব্দটি যখন সাজার ক্ষেত্রে মুতলাকভাবে ব্যবহৃত হয়। তখন তা দ্বারা ঐ বস্তু উদ্দেশ্য হয় যা আল্লাহ তা'আলার হকরূপে ওয়াজিব হয় অর্থাৎ তা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হকরূপে আবধারিত হয়। আর হাকীকত এই যে, প্রতিশোধ আল্লাহর হক হিসেবে ঐ সময়ই গণ্য হয় যখন অন্যায়টাও আল্লাহর ইসমত ও হেফাযতের অধীনে পতিত হয়। সুতরাং বোঝা গেলো যে, চোরাই মাল থেকে মালিকের সংরক্ষণের দায়িত্ব সরে গিয়ে তা আল্লাহর প্রতি স্থানান্তরিত হয় এবং চুরির অন্যায় আল্লাহর হকের মধ্যেই গণ্য হয়। আর যা এমন হয় তা পূর্ণাঙ্গ অন্যায় সাব্যস্ত হয়। আর অন্যায় যেমন হয় তার সাজাও তেমনি হয়ে থাকে। অতএব চুরির সাজা যা শরীয়তে নির্ধারিত রয়েছে। তা পূর্ণাঙ্গ সাজা গণ্য হবে। অর্থাৎ চোরের হাত কর্তন চুরির পূর্ণাঙ্গ সাজা বিবেচিত হবে। কাজেই তার উপর মালের ক্ষতিপূরণ জরুরি সাব্যস্ত করার কোনো অবকাশ নেই। উপরন্তু আল্লাহ তা'আলা যেহেতু সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষীহিন কাজেই তিনি মালের ক্ষতিপূরণ গ্রহণের মুখাপেক্ষী নন। সুতরাং চোরের উপর মালের ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। অবশ্য চুরাই মাল চোরের কাছে বিদ্যমান থাকলে মালিকের জাহিরী মালিকানার দরুন তাকে উক্ত মাল ফেরত দেয়া জরুরি হবে।

দ্বিতীয় কারণ : جزاء শব্দটি كفى অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এর দ্বারা বোঝা গেলো যে, চুরি অন্যায়ের জন্য হাত কর্তন যথেষ্ট। কাজেই তার ক্ষতিপূরণ গ্রহণ ইত্যাদির কোনো প্রয়োজন নেই। সারকথা এই যে, এ ব্যাপারে আমরা جزاء بما كسبا আয়াত দ্বারা দলিল গ্রহণ করি। আর ইমাম শাফেয়ী (র) এর অভিযোগ ছিলো فاقطعوا আয়াতের উপর ভিত্তি করে। মোল্লা জুয়ুন (র) বলেন– এ প্রসঙ্গে আমি যা এখানে উল্লেখ করলাম তা তাফসীরে আহমদিতে যা উল্লেখ করেছি তার সামান্য অংশ মাত্র।

ثمّ ذكر المصنّف رح بعد هذا البيان التفريعات الثلثة الباقية على الحكم فقال لو لذلك صحّ إيقاع الطلاق بعد الخلع اى ولاجل انّ مدلول الخاص قطعيٌّ واجبُ الاتّباع صحّ عندنا إيقاع الطلاق على المرأة بعد ما خالعها خلافا للشافعيّ رحمه الله تعالى وبيانه انّ الشافعيّ رح يقول إنّ الخلع فسخٌ للنّكاح فلايبقى النّكاح بعده وليس بطلاقٍ فلايصحّ الطلاق بعده وعندنا هو طلاق يصحّ إيقاع الطلاق الاخر بعده عملاً بقوله تعالى فإن طلّقها فلا تحلّ له من بعد وذلك لانّ الله تعالى قال اوّلاً الطلاق مرّتان فإمساكٌ بمعروفٍ اوتسريحٌ بإحسانٍ اى الطلاق الرّجعيّ إثنان او الطلاق الشرعيّ مرّة بعد مرّةٍ بالتفريق دون الجمع فبعد ذلك يجب على الزّوج إمّا إمساكٌ بمعروفٍ اى مراجعةٌ بحسن المعاشرة او تسريحٌ بإحسانٍ اى تخليصٌ على الكمال والتّمام - ثمّ ذكر بعد ذلك مسئلة الخلع فقال فإن خفتم ان لّايقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به اى فإن ظننتم يا ايّها الحكّام ان لّايقيمان اى الزّوجان حدود الله بحسن المعاشرة والمروّة فلا جناح عليهما فيما افتدت المرأة به وخلّصتها من الزوج فعلم انّ فعل المرأة في الخلع هو الافتداء وفعل الزّوج هو ماكان مذكورا سابقًا اعني الطلاق لا الفسخ لانّ الفسخ يقوم بالطرفين لا بالزّوج وحده ثمّ قال فإن طلّقها فلاتحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجًا غيره اى فإن طلّق الزوج المرأة ثالثا فلاتحلّ المرأة للزّوج من بعد الثالث حتّى تنكح زوجا غيره ووطيها وطلّقها

অনুবাদ॥ মুসান্নিফ (র) خاص এর হুকুমের ওপর ভিত্তি করে অবশিষ্ট তিনটি শাখা মাসআলা উল্লেখ করেছেন ; তিনি বলেন, *'এজন্যেই খোলা-এর পরে তালাক দেয়া শুদ্ধ হবে।'* অর্থাৎ যেহেতু خاص শব্দের নির্দেশিত অর্থ অকাট্য এবং অবশ্যপালনীয়, সেহেতু আমাদের (হানাফীগণের) মতে, স্ত্রীর সাথে খোলা' করার পর তাকে তালাক দেয়া শুদ্ধ হবে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র) এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন।

বিস্তারিত বিবরণ : ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, خلع (অর্থের বিনিময়ে তালাক প্রদান) বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করারই নামান্তর। সুতরাং خلع এর পর বিবাহ বন্ধন অবশিষ্ট থাকে না। আর خلع কোন তালাক নয়। কাজেই তারপর তালাক প্রদান করা শুদ্ধ হবে না। আমাদের আহনাফের মতে, خلع এক প্রকার তালাক বিশেষ ; তারপর আল্লাহ তা'আলার বাণী অনুযায়ী আমল করত, স্ত্রীকে অন্য তালাক প্রদান করা বৈধ হবে। তা হলো فإن طلّقها فلا تحلّ له من بعد অর্থাৎ, 'যদি স্বামী স্ত্রীকে তালাক (তৃতীয়) দেয় তাহলে এরপর উক্ত স্ত্রী তার জন্যে হালাল হবে না।' কারণ- আল্লাহ তা'আলা প্রথমতঃ ইরশাদ করেছেন- الطلاق مرّتان فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ অর্থাৎ, 'রজঈ তালাক দুটি। শরীআত সম্মত তালাক পৃথকভাবে একটির পর অন্যটি দিতে হয়, এক সাথে নয়। অতঃপর স্বামীর ওপর ওয়াজিব হয়তো সদাচরণের সাথে তাকে রেখে দেয়া, অর্থাৎ উত্তম আচরণসহ পুনঃ প্রত্যাবর্তন করা কিংবা সদ্ব্যবহারের সাথে তাকে বিদায় করে দেয়া অর্থাৎ, পরিপূর্ণভাবে তাকে মুক্ত করে দেয়া।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা দু'তালাকের বর্ণনার পর خلع এর বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ('যদি তোমরা আশংকারোধ কর যে, তারা আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত সীমারেখা রক্ষা করতে পারবে না, তাহলে স্ত্রী কিছু বিনিময় প্রদান করলে এবং স্বামী তা গ্রহণপূর্বক তালাক দিলে তাদের জন্যে দোষণীয় হবে না'। তাহলে স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে অর্থ সম্পদ প্রদান করলে এবং সে স্বামীর বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিলে উভয়ের কোন পাপ হবে না।) অতএব, বোঝা গেল যে, خلع এর মধ্যে কর্তব্য হলো বিনিময় প্রদান করা। আর স্বামীর কাজ হলো তাই যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, তালাক প্রদান করা। এটা فسخ তথা বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করা বিবেচিত হয়। কেননা, ছিন্নকরণ উভয়পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, একা স্বামীর পক্ষ থেকে হয় না। এরপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (যদি স্বামী স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে, তবে এরপর সে স্ত্রী তার জন্যে হালাল হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে অন্য স্বামী গ্রহণ না করে।) অর্থাৎ, স্বামী যদি তা স্ত্রীকে তৃতীয় তালাক দেয়, তবে সে স্বামীর জন্যে বৈধ হবে না, যতোক্ষণ না সে অন্য স্বামীর সাথে বিয়ে করবে। এবং দ্বিতীয় স্বামী তার সাথে সহবাসের পর তাকে তালাক দিবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ قوله ثم ذكر المصنف رح بعد هذا البيان الخ : এ ইবারতে মুতলাকভাবে خاص এর বিধান সংশ্লিষ্ট পঞ্চম মাসআলা এবং প্রথম বিধান أَنْ يَتَنَاوَلَ المخصوصَ قطعًا সংশ্লিষ্ট দ্বিতীয় মাসআলা উল্লেখিত হয়েছে।

মাসআলার বিশ্লেষণ : خلع আমাদের মতে তালাক গণ্য হয়। আর ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে فسخ তথা বিবাহ বিনষ্ট গণ্য হয়।

ইখতেলাফের ফল : কোনো ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে ২ তালাক দিয়ে তার সাথে خلع করে তখন এ ব্যক্তি ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে حلالہ বিহীন উক্ত মহিলার সাথে বিবাহ করতে পারে। আর আমাদের মতে حلالہ বিহীন বিবাহ করা নাজায়েয।

তালাক ও فسخ نكاح এর মধ্যে পার্থক্য : তালাকের পরে পূণরায় তালাক পতিত করা জায়েয। কিন্তু فسخ এরপরে তালাক পতিত করা শুদ্ধ নয়। এ ব্যাপারে উভয় পক্ষের দলিল নিম্নরূপ। তালাক প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা প্রথমে এরশাদ করেছেন اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ অর্থাৎ রজয়ী তালাক ২ বার পর্যন্ত। এমন নয় যেভাবে জাহেলীয়াতের যুগে তালাক দিতো এবং রযআত করতে থাকতো। অথবা শরয়ী তালাক হলো– ২ বার ভিন্ন ভিন্নরূপে, এক সঙ্গে নয়। দ্বিতীয়বারের পরে স্বামীর উপর ওয়াজিব এই যে, সে শরীআত মোতাবেক স্ত্রীকে বহাল রাখবে অথবা উত্তমভাবে তাকে বর্জন করবে।

অর্থাৎ তালাকের পরে আর তাকে পূণগ্রহণ করবে না। যাতে সে ইদ্দত পালনের পর তার বিবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। এরপর খোলা প্রসঙ্গে মাসআলা উল্লেখ করেছেন। এরশাদ হয়েছে فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ "হে মুসলমানগণ! তোমরা যদি এ ব্যাপারে আশংকা করো যে, তারা উভয়ে আল্লাহর সীমারেখা সংরক্ষণ করতে পারবে না। তাহলে তাদের উভয়ের জন্য কোনো দোষণীয় নয় যে, মহিলা কোনো বিনিময় দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিবে এবং স্বামী মাল গ্রহণ করে তাকে তালাক দিবে"। এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, স্ত্রীর কাজ হলো ফিদিয়া (খুলার বিনিময়) দেয়া। আর স্বামীর কাজ হলো মালের বিনিময় তাকে তালাক দেয়া। বিবাহ বিনষ্ট করা স্বামীর কাজ নয়। কারণ এর সম্পর্ক থাকে উভয় পক্ষের সাথে। এরপর আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "স্বামী যদি স্ত্রীকে তৃতীয় তালাক দিয়ে থাকে তাহলে স্বামীর জন্য উক্ত স্ত্রী গ্রহণ করা বৈধ হবে না। যতোক্ষণ না সে ভিন্ন স্বামীর সাথে বিবাহে আবদ্ধ হবে"।

فَالشَّافِعِيُّ رح يَقُوْلُ إِنَّهُ مُتَّصِلٌ بِقَوْلِهِ اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ حَتَّى تَكُوْنَ هٰذِهِ الطَّلْقَةُ ثَالِثَةً وَذِكْرُ الْخُلْعِ فِيْمَا بَيْنَهُمَا جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ لِاَنَّهُ فَسْخٌ لَايَصِحُّ الطَّلَاقُ بَعْدَهُ وَنَحْنُ نَقُوْلُ اِنَّ الفاءَ خاصٌّ وُضِعَ لِمَعْنًى مخصوصٍ وهُوَ التَّعْقِيْبُ وقد عَقَّبَ الطَّلَاقَ بِالْاِفْتِدَاءِ فَيَنْبَغِى اَنْ يَّقَعَ بَعْدَ الخُلْعِ وهُوَ ايضًا طلاقٌ - غايَتُهُ اَنَّهُ يَلزَمُ اَنْ تَكُوْنَ الطَّلَقاتُ اَرْبَعَةً اِثْنَتانِ فِىْ قَوْلِهِ تعالى الطَّلاقُ مَرَّتانِ وَالثَّالِثَةُ اَلْخُلْعُ والرَّابِعَةُ هِىَ هٰذِه ولٰكِنَّه لَابَأْسَ بِهِ فَاِنَّ الخُلْعَ لَيْسَ طلاقًا مُسْتَقِلًّا عَلٰحدةً بَلْ مُنْدَرِجٌ فِى الطَّلْقَتَيْنِ فَكَاَنَّهُ قِيْلَ اِنَّ الطلاقَ مَرَّتانِ سواءٌ كانَتا رَجْعِيَّتَيْنِ فَحِيْنَئِذٍ يَجِبُ اِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اوتَسْرِيْحٌ بِاِحْسانٍ او كانَتا فِىْ ضِمنِ الخُلْعِ فَحِيْنَئِذٍ تَكُوْنُ بائِنَةً فَاِنْ طَلَّقَهَا بعدَ المَرَّتَيْنِ المذكورَتَيْنِ فِيْما قَبْلُ فلاتَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ الاية

অনুবাদ ॥ ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, فَاِنْ طَلَّقَهَا এ বক্তব্যটি আল্লাহ তা'আলার বাণী– الطلاق مرتان এর সাথে সংযুক্ত। ফলে এ তালাকটি তৃতীয় তালাক গণ্য হবে। আর এতদুভয়ের মাঝে خلع এর বর্ণনা جملة معترضة হিসেবে হয়েছে। কেননা خلع হলো বন্ধন ছিন্নকরণ মাত্র, তাই এরপর তালাক সহীহ হতে পারে না। আমরা বলি যে, فان طلقها এর ف অব্যয়টি খাস যা একটি নির্দিষ্ট অর্থের জন্যে গঠিত। তাহলো تعقيب তথা পরে আনয়ন করা। যেহেতু তৃতীয় তালাকটিকে ফিদিয়া প্রদান তথা خلع এর পরে আনয়ন করা হয়েছে, সেহেতু خلع এরপর তালাক সংঘটিত হওয়া সমীচীন। আর خلع ও এক প্রকার তালাক।

(আমাদের উপরোক্ত বক্তব্য অনুসারে) বড়জোর এতটুকু অনিবার্য হবে যে, তালাকের চারে উন্নিত হবে। দুটি তালাক আল্লাহ তা'আলার বাণী- الطلاق مرتان এর মধ্যে, তৃতীয় তালাক خلع এর মধ্যে এবং চতুর্থ তালাক فان طلقها এর মধ্যে রয়েছে। কিন্তু এতে কোন অসুবিধা নেই। কারণ خلع স্বতন্ত্র কোন তালাক নয়, বরং তা দুতালাকেরই অন্তর্ভুক্ত। কেমন যেন এরূপ বলা হয়েছে যে, তালাক দুবার হয়ে থাকে। চাই তা রজয়ী তালাক হোক। এমতাবস্থায় সদাচরণের সাথে তাকে ফিরিয়ে নেয়া। অথবা, উত্তম পন্থায় মুক্ত করে দেয়া স্বামীর ওপর ওয়াজিব। অথবা উক্ত দুটি তালাক خلع এর অধীনে হবে। এমতাবস্থায় তালাকে বায়েনা হবে। অতপর প্রথমোক্ত দুতালাকের পর স্বামী যদি তাকে তালাক দেয়, তবে স্ত্রী তার জন্যে হালাল হবে না, যে পর্যন্ত না সে অন্য স্বামী গ্রহণ করে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন আয়াতে উল্লেখিত فَاِنْ طَلَّقَهَا - اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ এর সাথে সংযুক্ত। আর فَاِنْ طَلَّقَهَا এর মধ্যে তৃতীয় তালাকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উভয়ের মাঝে لع এর আলোচনা جملة معرضه স্বরূপ এসেছে। কারণ خلع হলো বিবাহ বিচ্ছিন্ন করা। আর বিবাহ বিচ্ছিন্ন করার পরে তালাক দেয়া

শুদ্ধ হয় না। সুতরাং খোলা যেহেতু বিবাহ বিচ্ছেদের নাম। আর এর পরে তালাক দেয়া বৈধ নয়। এ কারণে فَإِنْ طَلَّقَهَا কে الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ এর সাথে সম্পৃক্ত করে خلع কে ভিন্ন বাক্য দ্বারা উভয়ের মাঝে আলোচনা করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে আমরা হানাফীগণ বলে থাকি যে, فَإِنْ طَلَّقَهَا এর ف বর্ণটি একটি খাছ শব্দ। এটা সুনির্দিষ্ট অর্থ تعقيب তথা অন্যের পরে বোঝানোর জন্যে গঠিত। আর تعقيب বলা হয় পরবর্তীটা পূর্ববর্তীর সাথে সম্পৃক্ত হওয়াকে। সুতরাং ف যেহেতু একটি খাছ শব্দ তা তার অর্থকে অকাট্যরূপে শামিল করবে। অর্থাৎ ف এর পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তীর সাথে কোনো বিচ্ছিন্নতা ছাড়াই সম্পৃক্ত হবে। এর পূর্বে যেহেতু خلع উল্লেখিত হয়েছে। সুতরাং কেমন যেন তৃতীয় তালাকটা খোলার সাথে সম্পৃক্ত হলো। আর খোলার সাথে সম্পৃক্ততা হওয়া এই যে, খোলার পরে তালাক পতিত হতে পারে। এটা ঐ সময় সম্ভব যখন খোলাকে তালাক গণ্য করা হয়। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, খোলা তালাকেরই অপর নাম। শুধু বিবাহ বিচ্ছিন্ন নয়।

এক্ষেত্রে বেশির থেকে বেশি এ প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, তাহলে তো তালাক ৪টি হয়ে গেলো। الطلاق مرتان দ্বারা ২ তালাক, আর خلع দ্বারা তৃতীয় তালাক এবং فَإِنْ طَلَّقَهَا দ্বারা চতুর্থ তালাক। অথচ তালাক সর্বমোট ৩টি বৈধ।

উত্তর : خلع যদিও তালাক তবে তা ভিন্ন তালাক নয়। বরং الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ এর মধ্যে তা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যেন এমন বলা হয়েছে যে, তালাক ২টি। চাই উভয়টি রজয়ী হোক চাই খোলার অধীনে হোক। যদি রজয়ী তালাক হয় তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রীকে শরীআত মোতাবেক আবদ্ধ রাখবে। অথবা শরীআত মোতাবেক তাকে ছেড়ে দিবে। আর যদি খোলার অধীনে হয় তাহলে স্ত্রী বায়েনা হয়ে যাবে। এ সময় উল্লেখিত দু তালাকের বদলে যদি তৃতীয় তালাক দেয় তাহলে সে আর হালাল হবে না। যতোক্ষণ না অন্য স্বামী গ্রহণ করবে। সুতরাং তালাক ৪টি হওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠে না।

উদাহরণ : এর একটি উদাহরণ এই যে, খালেদ হামেদকে বলল– আমাকে আপনার কলমটি দিন। চাই কোনো বিনিময়ে হোক বা বিনিময় বিহীন। যদি বিনিময় বিহীন দেন তাহলে তাকে ফেরত নিতে পারবেন। আর বিনিময়ে দিলে সর্বাবস্থায় আমি তার মালিক হবো। তখন আপনি তা ফেরত গ্রহণের অধিকারী হবেন না।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, বিনিময়হীন বা বিনিময় সহকারে শব্দ বলার দ্বারা কলম ২টি হয়ে যায় নি। বরং একটিই রয়েছে। এভাবে তালাক ২টিই চাই রজয়ী হোক, চাই খোলার অধীনে বায়েনা হোক। তালাকে রজয়ী হলে তা হবে বিনিময় বিহীন। আর খোলার মাধ্যমে হলে তা হবে বিনিময় সহকারে।

وَعَلٰى هٰذَا التَّقْرِيْرِ انْدَفَعَ مَاقِيْلَ اِنَّهٗ يَلْزَمُ اَنْ يَّكُوْنَ الطَّلَاقُ الَّذِىْ بَعْدَ الْخُلْعِ فَقَطْ حُكْمُهٗ عَدَمُ الْحِلِّ لَا الَّذِىْ لَيْسَ كَذٰلِكَ وَاَنَّهٗ يَلْزَمُ اَنْ لَّايَكُوْنَ الْخُلْعُ اِلَّا بَعْدَ الْمَرَّتَيْنِ عَمَلًا بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى فَاِنْ خِفْتُمْ وَلٰكِنْ يَرِدُ اَنَّ هٰذَا كُلَّهٗ اِنَّمَا يَصِحُّ اِذَا كَانَ التَّسْرِيْحُ بِالْاِحْسَانِ اِشَارَةً اِلٰى تَرْكِ الْمُرَاجَعَةِ كَمَا حَرَّرْتُ وَاَمَّا اِذَا كَانَ اشَارَةً اِلَى الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ عَلٰى مَا رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنَّهٗ قَالَ هُوَ الطَّلَاقُ الثَّلٰثُ فَحِيْنَئِذٍ يَكُوْنُ قَوْلُهٗ تَعَالٰى فَاِنْ طَلَّقَهَا بَيَانًا لِذٰلِكَ وَلَاتَعَلُّقَ لَهٗ بِمَسْاَلَةِ الْخُلْعِ اَصْلًا فَيَكُوْنُ الْمَعْنٰى اَنَّ بَعْدَ الْمَرَّتَيْنِ اِمَّا اِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ بِالْمُرَاجَعَةِ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ بِالطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ فَاِنْ اَثَرَ التَّسْرِيْحِ بِالْاِحْسَانِ فَطَلَّقَهَا ثَالِثًا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدُ الْاٰيَةَ هٰذَا خُلَاصَةُ مَا قَالُوْا وَالْبَسْطُ فِى التَّفْسِيْرِ الْاَحْمَدِىْ -

---

অনুবাদ ॥ এই আলোচনা (خلع স্বতন্ত্র কোন তালাক নয়) দ্বারা এ অভিযোগের অবসান হয়ে গিয়েছে যে-

১. শুধু خلع এরপর যে তালাক সংঘটিত হয়, তার বিধান عدم حلّ তথা হালাল না হওয়া আবশ্যিক হয়ে পড়ে। আর যে তালাক এরূপ (خلع এর পরে) হবে না, তার বিধানও এমনটা (عدم حل) হবে না।

২. এবং এটাও আবশ্যক হয়ে পড়ে যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী- فَاِنْ خِفْتُمْ এর ওপর আমল করে কেবল خلع দুতালাকের পরেই হতে পারে। (অর্থাৎ, এ দুটি অভিযোগ নিরসন হয়ে গিয়েছে) কিন্তু এ আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, এ সমস্ত কথা অর্থাৎ, خلع তালাক হওয়া এবং خلع এর পর তালাক প্রদান সহীহ হওয়া শুধু তখনই শুদ্ধ হবে, যখন تسريحٌ بِاحْسَانٍ দ্বারা পুনঃ গ্রহণ বর্জনের প্রতি ইঙ্গিত হবে। যেমনটি আমি লেখেছি। আর যখন تسريح باحسان দ্বারা রাসূলের বাণী হলো هو الطلاق الثالث সেটা হচ্ছে তৃতীয় তালাকের ভিত্তিতে তৃতীয় তালাকের প্রতি ইঙ্গিত করা হবে, তখন আল্লাহ তা'আলার বাণী- فَاِنْ طَلَّقَهَا টা تسريح باحسان এর ব্যাখ্যা হবে এবং خلع এর মাসআলার সাথে এর (فَاِنْ طَلَّقَهَا) আদৌ কোন সম্পর্ক থাকবে না।

সুতরাং, এর অর্থ হবে দুবার তালাক প্রদানের পর পুনগ্রহণ পূর্বক সদাচারিতার সাথে তাকে রেখে দেবে অথবা তৃতীয় তালাকের মাধ্যমে উত্তম পন্থায় তাকে বিদায় করে দেবে। তারপর স্বামী যদি উত্তম পন্থায় বিদায় করে দেয়াকে অগ্রাধিকার দেয় এবং তাকে তৃতীয় তালাক দেয়, তবে এরপর উক্ত স্ত্রী তার জন্যে হালাল হবে না। এটা উলামায়ে কিরামের মতের সারসংক্ষেপ। এর বিস্তারিত বিবরণ تفسير احمدى তে উল্লিখিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله وعلى هذا التَّقْرِيْرِ اِنْدَفَعَ مَا قِيْلَ الخ : মুসান্নিফ (র) বলেন আমাদের উল্লেখিত উত্তর (তথা খোলা ভিন্ন তালাক নয়) এর উপর ২টি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে।

প্রথম প্রশ্ন : فان طلقها আয়াতে ف বর্ণটি তা'কীবের জন্য হলে এবং ফায়ের পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী অংশের উপর প্রযোজ্য হলে এটা অপরিহার্য হয় যে, তৃতীয় তালাকটি খোলার পরে হবে। তখন স্ত্রীর জন্য হুরমুতে গলিজা সাব্যস্ত হবে। আর যদি খোলার পরে না হয় বরং ২ তালাকে রজয়ীর পরে হয় তাহলে তার দ্বারা হুরমতে গলিযা সাব্যস্ত হবে না। অথচ একথা ভুল। পূর্বের উত্তর দ্বারা এ প্রশ্নটি এভাবে তিরোহিত হয়ে গেলো যে, খোলা ভিন্ন কোনো তালাক নয়। বরং الطلاق مرتان। এর মধ্যে শামিল রয়েছে। সুতরাং হালাল না হওয়া অর্থাৎ হুরমুতে গলিযা ঐ তালাকের বিধান হবে যা ২ তালাকের পরে পতিত হয়। চাই উক্ত দুই তালাক রজয়ী হোক, চাই খোলার অধীনে হোক। অতএব খোলা যখন ভিন্ন কোনো তালাক নয় তাহলে হুরমতে গলিযা বিশেষভাবে খোলার পরে পতিত তালাকের বিধান হবে না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : পবিত্র কোরআনের বাচনভঙ্গি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ২ বার তালাক দেয়ার পরেই খোলা হতে পারে। কেননা খোলার মাসআলা বর্ণনা প্রসেঙ্গ আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন فان خفتم ان لا يقيما الاية। এরমধ্যে ফা বর্ণটি যেহেতু তার'কীবের জন্য। এ কারণে খোলা তার পূর্ববর্তী বাক্য তথা الطلاق مرتان। এর উপর প্রযোজ্য হবে। তখন এ কথা প্রমাণিত হবে যে, ২ তালাকের পরেই কেবল খোলা হতে পারে। তালাকের পূর্বে খোলা হতে পারে না। অথচ একথা ঠিক নয়।

উত্তর : এ প্রশ্নটাও পূর্বের ন্যায় তিরোহিত হয়ে যায় যে, খোলা ভিন্ন কোনো তালাক নয় বরং الطلاق مرتان। এর মধ্যে উল্লেখিত ২ তালাকের মধ্যে শামিল রয়েছে। সুতরাং তা অন্য কিছুর উপরে প্রযোজ্য হওয়ার প্রশ্নই উঠে না।

দ্বিতীয় উত্তর এই যে, আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, ২ তালাকের পরে খোলা হতে পারে। এর মাফহুমে মুখালিফ তথা বিপরীত অর্থ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শুরু থেকে খোলা হতে পারে না। আর একথা স্বীকৃত যে, আমাদের কাছে বিপরীত অর্থের কোনো গ্রহণযোগ্যতাও নেই। সুতরাং এর দ্বারা দলিল গ্রহণ করে শুরু থেকে খোলা পতিত না হওয়ার ব্যাপারে দলিল পেশ করা গ্রহণযোগ্য নয়।

قوله ولٰكِنْ يُرِدْ اَنَّ هٰذَا كُلَّهُ : এর দ্বারা মুসান্নিফ (র) বলেন যে, হানাফীদের মতে خلع তালাক হওয়া এবং خلع এর পরে তালাক পতিত করা শুদ্ধ হওয়া এসব ব্যাখ্যা ঐসময়ই গ্রহণযোগ্য যখন আয়াতের মধ্যে تسريح باحسان দ্বারা পুণগ্রহণ বর্জন করার প্রতি ইঙ্গিত হবে। যেমন পূর্বে উল্লেখ করেছি। এর দ্বারা যদি তৃতীয় তালাকের প্রতি ইঙ্গিত হয় এবং হাদীসের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এক ব্যক্তি তৃতীয় তালাক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলেছিলেন تسريح باحسان ই তৃতীয় তালাক। এ সময় فان طلقها الاية। এর মধ্যে তৃতীয় তালাকের বর্ণনা উদ্দেশ্য হবে না। বরং তা فان طلقها এর বর্ণনা বিবেচিত হবে। خلع এর মাসআলার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। আয়াতের অর্থ এই হবে যে, ২ বার তালাক দেয়ার পরে ন্যায়ানুগভাগে পুনগ্রহণ করা অথবা ন্যায়সঙ্গতভাবে তৃতীয় তালাক দ্বারা তাকে বিদায় করে দেয়া। সুতরাং স্বামী যদি ন্যায় সঙ্গতভাবে বিদায় করাকে প্রাধান্য দেয় তাহলে উক্ত মহিলাকে তৃতীয় তালাক দিবে। এরপরে আর উক্ত মহিলা তার জন্য হালাল থাকবে না। মুসান্নিফ (র) বলেন– এটাই সকল আলিমগণের উক্তির সারমর্ম। এর অতিরিক্ত বিশ্লেষণ আমার কিতাব তাফসীরে আহমদীতে দ্রষ্টব্য।

وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ بِنَفْسِ الْعَقْدِ فِى الْمُفَوَّضَةِ عطفٌ على قوله صَحَّ اِيْقَاعُ الطَّلَاق وتفريعٌ على حُكْمِ الخاصّ اى وَلِاَجْلِ اَنَّ الْعَمَلَ بالخاصّ واجبٌ ولايَحْتَمِلُ الْبيانَ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ بِنَفْسِ الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ تَاْخِيْرِ اِلَى الْوَطْيِ فِى الْمُفَوَّضَةِ وهو اِنْ كَانَ بِكَسْرِ الْوَاوِ فَالْمَعْنَى اَلَّتِىْ فَوَّضَتْ نَفْسَهَا بِلَامَهْرٍ واِنْ كان بِفَتْحِ الواو فَالْمَعْنَى اَلَّتِىْ فَوَّضَهَا وَلِيُّهَا بِلَا مَهْرٍ وهُوَ الاَصَحُّ لِاَنَّ الْاُوْلَى لَا تَصْلُحُ مَحَلًّا لِلْخِلَافِ اِذْ لايَصِحُّ نِكَاحُهَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رح -

অনুবাদ ॥ مفوضة ***তথা বিনা মহরে সমর্পিতা নারীর ক্ষেত্রে কেবল আকদের দ্বারাই*** مهرمثل ***ওয়াজিব হবে।*** এ বাক্যটি গ্রন্থকারের পূর্বোক্ত বক্তব্য صح ايقاع الطلاق এর ওপর আতফ হয়েছে। এটা খাসের হুকুম সংক্রান্ত অপর একটি শাখামূলক মাসআলা। অর্থাৎ, خاص শব্দের মর্মানুযায়ী আমল করা যেহেতু ওয়াজিব এবং তা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না, সেহেতু সমর্পিতা নারীর ক্ষেত্রে সহবাস পর্যন্ত বিলম্ব করা ব্যতীত শুধু আকদের দ্বারাই মহরে মিসল ওয়াজিব হবে। যদি مفوضة শব্দটির واو বর্ণে যের হয়, তখন এর অর্থ হবে– ঐ নারী যে নিজেকে মহরবিহীন কোন ব্যক্তির কাছে সমর্পণ করে। আর واو বর্ণে যবর হলে এর অর্থ হবে- ঐ নারী যাকে তার অভিভাবক বিনা মহরে সমর্পণ করেছে। ব্যাখ্যাকার বলেন, এটিই অধিকতর বিশুদ্ধ। কেননা, প্রথম অর্থে (যের যোগে) শব্দটি মতানৈক্যের ক্ষেত্র হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। কেননা, ইমাম শাফেয়ী (র) এর কাছে তার বিয়ে শুদ্ধ নয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ الخ : এই ইবারত দ্বারা মুতলাকভাবে খাছের বিধান সংশ্লিষ্ট ষষ্ঠ মাসআলা এবং প্রথম বিধান ان يتناول المخصوص সংশ্লিষ্ট তৃতীয় মাসআলা উল্লেখিত হয়েছে।

মাসআলার সার : মতনে উল্লেখিত مفوضة শব্দটি ওয়াও বর্ণে যবর বা যের উভয় রকম হতে পারে। যের সহকারে পড়লে উদ্দেশ্য হবে সে মহিলা যে নিজেকে মহরাবিহীন স্বামীর নিকট অর্পণ করে। আর যবর সহকারে পড়লে অর্থ হবে– যে মহিলাকে তার অভিভাবক মহর বিহীন অর্পণ করে। মুসান্নিফ (র) বলেন এখানে দ্বিতীয় সম্ভাবনাটিই অধিক উপযোগী। কারণ প্রথম ক্ষেত্রে এটা আমাদের এবং ইমাম শাফেয়ী (র)এর মধ্যে মতবিরোধপূর্ণ হয় না। কারণ ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে অভিভাবক বিহীন বিবাহ দূরস্ত নয়। এ কারণে মোহর ওয়াজিব হবে না। আর মহর ওয়াজিব না হলে ইমাম শাফেয়ী এবং আমাদের মধ্যে শুধু আকদের দ্বারা বা সঙ্গমের দ্বারা মোহর ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে কিভাবে মত পার্থক্য হতে পারে? মোটকথা মহর ওয়াজিব হওয়ার সময় তখনই মতবিরোধ হবে যখন বিবাহ শুদ্ধ হবে। অথচ যের সহকারে পড়লে সে ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে বিবাহই বৈধ নয়। অতএব যবর পড়াই অধিক বিশুদ্ধ।

وَ تَحْقِيْقُهُ اَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِى فَوَّضَهَا وَلِيُّهَا بِلاَ مَهْرٍ اَوْ عَلٰى اَنْ لَّا مَهْرَ لَهَا لاَيَجِبُ الْمَهْرُ لَهَا عِنْدَ الشَّافِعِىِّ رح اِلاَّ بِالْوَطْىِ فَلَوْ مَاتَ اَحَدُهُمَا قَبْلَ الْوَطْىِ لاَيَجِبُ الْمَهْرُ لَهَا عِنْدَ الشَّافِعِىِّ رح وَعِنْدَنَا يَجِبُ كَمَالُ مَهْرِ الْمِثْلِ عِنْدَ الْعَقْدِ فِى الذِّمَّةِ وَيَجِبُ اَدَاؤُهُ عِنْدَ الْوَطْىِ وَالْمَوْتِ عَمَلاً بِقَوْلِهِ تَعَالٰى وَاُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ فَقَوْلُهُ "اَنْ تَبْتَغُوْا" بَدْلٌ مِّنْ وَّرَآءِ ذٰلِكُمْ او مَفْعُوْلٌ لَهُ بِتَقْدِيْرِ اللاَّمِ اى اُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَآءَ الْمُحَرَّمَاتِ لِاَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ فَالْبَاءُ لَفْظٌ خَاصٌّ وُضِعَ لِمَعْنًى مَعْلُوْمٍ و هُوَ الْاِلْصَاقُ وَقِيْلَ الْاِبْتِغَاءُ لَفْظٌ خَاصٌّ وُضِعَ لِمَعْنًى مَعْلُوْمٍ وَهُوَ الطَّلَبُ وَعَلٰى كُلِّ تَقْدِيْرٍ يُوْجِبُ اَنْ يَكُوْنَ اِبْتِغَاءُ الْبُضْعِ مُلْصَقًا بِالْمَهْرِ ذِكْرًا فَاِنْ لَّمْ يَذْكُرْ فِى اللَّفْظِ فَلاَ اَقَلَّ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ مُلْصَقًا فِى الْوُجُوْبِ عَلَى الذِّمَّةِ وَلٰكِنْ يُّشْتَرَطُ اَنْ يَّكُوْنَ الْاِبْتِغَاءُ صَحِيْحًا حَتّٰى لَوْ كَانَ بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ يَجِبُ التَّرَاخِىْ اِلَى الْوَطْىِ بِالْاِجْمَاعِ وَكَذَا لَوْكَانَ هٰذَا الْاِبْتِغَاءُ لاَ بِطَرِيْقِ النِّكَاحِ بَلْ بِطَرِيْقِ الْاِجَارَةِ اَوِ الْمُتْعَةِ اَوْ بِطَرِيْقِ الزِّنَا لاَيَحِلُّ ذٰلِكَ الْفِعْلُ وَ لاَ يَجِبُ الْمَالُ اَصْلاً وَاِلَيْهِ يُشِيْرُ قَوْلُهُ تَعَالٰى مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ

অনুবাদ॥ এ মাসআলার বিশ্লেষণ এই যে, যে মহিলাকে তার অভিভাবক মহর ব্যতিত সমর্পণ করে দেয় অথবা তাকে কোন মহর দেয়া হবে না, এমন শর্তে বিবাহ দেয়; তবে ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে এরূপ নারীর জন্যে সহবাস ব্যতীত মহর ওয়াজিব হবে না, সুতরাং যদি সহবাস করার পূর্বে উভয়ের একজন মারা যায়, তাহলে ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে মহর ওয়াজিব হবে না।

আমাদের (হানাফিগণের) মতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সময়ে স্বামীর দায়িত্বে পূর্ণ মহরে মিসল ওয়াজিব হবে এবং সহবাস ও মৃত্যুর সময়ে তা আদায় করা ওয়াজিব হবে। আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَاُحِلَّ لَكُمْ مَاوَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ এর ওপর আমল করতঃ অর্থ হলো- তোমাদের জন্যে পূর্বোক্ত হারামকৃত নারীগণ ব্যতীত অন্যান্য নারীদেরকে বিবাহ করা হালাল করা হয়েছে যে, তোমরা মালের বিনিময়ে তাদেরকে অন্বেষন করবে। আল্লাহ তা'আলার বাণী- اَنْ تَبْتَغُوْا টি وراء ذلكم এর بدل অথবা لام উহ্য থাকার ভিত্তিতে مفعول له হয়েছে। অর্থাৎ, তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ নারীগণ ব্যতীত অন্যান্য নারীদেরকে বৈধ করা হয়েছে, যাতে তোমরা সম্পদের বিনিময়ে তাদেরকে কামনা করতে পার।

এ আয়াতে باء অব্যয়টি خاص শব্দ, যা নির্দিষ্ট অর্থের জন্যে গঠিত হয়েছে। তা হলো 'সংযুক্তকরণ'। আবার কেউ কেউ বলেন, ابتغاء একটি خاص শব্দ, যাকে একটি নির্দিষ্ট অর্থের জন্যে গঠন করা হয়েছে। আর তা হলো 'কামনা' করা। সর্বাবস্থায় এটা ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, নারীর যৌনাঙ্গ কামনা করা মৌখিক আলোচনায় মহরের সাথে যুক্ত থাকবে। যদি মৌখিক আলোচনায় মহরের কথা উল্লেখ না হয়,

তাহলে কমপক্ষে যিম্মায় ওয়াজিব হওয়ার সাথে মিলিত হয়ে থাকবে। কিন্তু এ শর্তে যে, উক্ত কামনা বিশুদ্ধ হতে হবে।

অতএব যদি نكاح فاسد -এর মাধ্যমে যৌনাঙ্গ কামনা করা হয়, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে সহবাস পর্যন্ত মহর বিলম্বিত করা ওয়াজিব হবে। এমনিভাবে যদি এ طلب (কামনা) বিবাহের মাধ্যমে না হয়ে ইজারা বা ভাড়াকরণের মাধ্যমে অথবা متعة এর মাধ্যমে অথবা ব্যভিচারের মাধ্যমে হয়, তাহলে তা বৈধ হবে না এবং মাল প্রদান ওয়াজিব হবে না। আল্লাহ তা'আলার বাণী– مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ এদিকে ইঙ্গিত প্রদান করছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ মাসআলার তাহকীক : যে মহিলাকে তার অলী মহরবিহীন বিবাহ দেয় অথবা এমন শর্তে বিবাহ করে যে, এর কোনো মহর দেয়া হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে সঙ্গমবিহীন উক্ত মহিলার মহর ওয়াজিব হয় না। অর্থাৎ তার মতে শুধু আকদ দ্বারা মহর ওয়াজিব হয় না। বরং সঙ্গম জরুরি। অতএব যদি স্বামী-স্ত্রীর কোনো একজন সঙ্গমের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে তাহলে ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে মহর ওয়াজিব হবে না। আর হানাফীগণের মতে আকদের সময়ই পূর্ণ মহরে মিসল ওয়াজিব হয়। তবে তা পরিশোধ করা সঙ্গমের পরে বা মৃত্যুর সময় ওয়াজিব হয়।

দলিল : এ মাসআলার ব্যাপারে হানাফীগণের দলিল এই যে, أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَالِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوْا بِأَمْوَالِكُمْ অংশটি وَرَاءَ ذَالِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوْا থেকে বদল হয়েছে। অথবা লাম বর্ণ উহ্য থেকে احل এর মাফউলে লাহু হবে। বদলের ক্ষেত্রে অর্থ হবে তোমাদের জন্য মোহরানা ছাড়া সকল মহিলা হালাল করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা তাদেরকে মালের বিনিময়ে গ্রহণ করতে পারো। আর মাফউলে লাহু এর ক্ষেত্রে অর্থ হবে তোমাদের জন্য মোহরানা ছাড়া সকল মহিলা হালাল করা হয়েছে। যাতে তোমরা তাদেরকে নিজেদের মালের বিনিময়ে গ্রহণ কর। এ আয়াতে بأموالكم এর ب বর্ণটি খাছ। এর নির্দিষ্ট অর্থ হলো الصاق তথা মিলিতকরণ। কোনো কোনো আলিম বলেন যে, ابتغاء একটি খাছ শব্দ। কামনা করা বা গ্রহণ করা অর্থে বিশেষভাবে গঠন করা হয়েছে। মোটকথা ب বর্ণের অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে এর উদ্দেশ্য এই হবে যে, স্ত্রীদের লজ্জাস্থান কামনা করা অর্থাৎ বিবাহ করা মাল তথা মহরের সাথে সংযুক্ত। অর্থাৎ ইজাব কবুলের সাথে মহর উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়। আকদের আলাপের সময় মহর উল্লেখিত না হলে কমপক্ষে স্বামীর জিম্মায় মহর ওয়াজিব হওয়াটা লজ্জাস্থান কামনার সাথে সম্পৃক্ত থাকবে। তাহলেই ب বর্ণের খাছ অর্থের উপর আমল হবে। এ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, مفوضة শব্দকে যবর পড়ার ক্ষেত্রে উক্ত মহিলার বিষয়ে স্বামীর উপর কেবল আকদের দ্বারাই মহরে মিসল ওয়াজিব হয়ে যায়। সঙ্গম পর্যন্ত ওয়াজিব হওয়াকে বিলম্ব করলে বিনিময় বিহীন লজ্জাস্থান কামনা সাব্যস্ত হয়। এক্ষেত্রে ب এর অর্থের উপরে আমল হয় না।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, مفوضة এর ক্ষেত্রে স্বামীর উপর কেবল আকদ দ্বারাই সেসময় মহরে মিসল ওয়াজিব হয় যখন বিবাহ শুদ্ধ হয়। বিবাহ যদি ফাসিদ হয় তাহলে তার দ্বারা ইজমা মতে মহর ওয়াজিব হওয়াটা সঙ্গম পর্যন্ত বিলম্বিত হবে। আর লজ্জাস্থান কামনা যদি বিবাহের মাধ্যমে না হয় বরং ইজারা, ব্যভিচার বা অন্য কোনো উপায়ে হয় তাহলে একে তো এ ধরনের কাজই জায়েয নয়। দ্বিতীয়ত এ ধরনের আকদে কখনো বিনিময় ওয়াজিব হবে না। طلب بضع বিশুদ্ধ হওয়ার প্রতি আল্লাহ তা'আলার ফরমান مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ এর মধ্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ احصان এর অর্থ হলো নিজেকে হারাম কাজ থেকে বিরত রাখা। অতএব এর দ্বারা নিকাহে ফাসিদ খারিজ হয়ে গেলো। কারণ শরিআতে তা নিষিদ্ধ। مسافح অর্থ ব্যাভিচারি। সুতরাং غير مسافحين দ্বারা ইজারা মুতআ বা ব্যভিচার ইত্যাদি উপায়ে লজ্জাস্থান কামনা খারিজ হয়ে গেলো।

وَفِى هٰذَا الْمَقَامِ اِعْتِرَاضَاتٌ دَقِيْقَةٌ بَيَّنْتُهَا فِى حَاشِيَةِ التَّفْسِيْرِ الْاَحْمَدِى - وَ
كَانَ الْمَهْرُ مُقَدَّرًا شَرْعًا غَيْرَ مُضَافٍ اِلَى الْعَبْدِ عطفٌ على مَاسَبَقَ وتفريعٌ على
حُكْمِ الْخَاصِّ اى وَلِاَجْلِ اَنَّ الْعَمَلَ بِالْخَاصِّ واجبٌ ولَا يحتمِلُ الْبَيَانَ كَانَ الْمَهْرُ
مُقَدَّرًا مِنْ جانِبِ الشَّارِعِ غَيْرَ مُضَافٍ تَقْدِيْرُهٗ اِلَى الْعِبَادِ وَبَيَانُه اَنَّ تَقْدِيْرَ الْمَهْرِ عِنْدَ
الشَّافِعِيِّ رح مُفَوَّضٌ اِلَى رَأْيِ الْعِبَادِ وَاخْتِيَارِهِمْ فَكُلُّ مَا يَصْلُحُ ثَمَنًا يَصْلُحُ مَهْرًا
عِنْدَهٗ و عِنْدَنَا وَاِنْ كَانَ لَايُقَدَّرُ فِى جَانِبِ الْاَكْثَرِ لٰكِنْ يُقَدَّرُ فِى جانِبِ الْاَقَلِّ وهُوَ اَنْ لَّا
يَكُوْنَ اَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ عَمَلًا بِقولِه تعالٰى قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِى
اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ اى قَدْ عَلِمْنَا مَا قَدَّرْنَا عليهِمْ فِى حَقِّ اَزْوَاجِهِمْ و هُوَ
الْمَهْرُ - فَالْفَرْضُ لفظٌ خَاصٌّ وُضِعَ لِمَعْنَى التَّقْدِيْرِ وكَذٰلِكَ ضَمِيْرُ الْمُتَكَلِّمِ خَاصٌّ
عَلٰى مَاقَالُوا وكَذا الْاِسْنَادُ خَاصٌّ عِنْدَ صَاحِبِ التَّوْضِيْحِ - فَعُلِمَ اَنَّ الْمَهْرَ مُقَدَّرٌ فِى
عِلْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى وقد بَيَّنَهُ النَّبِىُّ ﷺ بقولِهٖ لَا مَهْرَ اَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

অনুবাদ ॥ এ স্থানে অনেক সূক্ষ্ম প্রশ্ন রয়েছে, যা আমি তাফসীরে আহমদীর হাশিয়ায় বা প্রান্তটীকায় বর্ণনা করেছি। *শরয়ীভাবেই মহরের পরিমান নির্ধারিত, এটা বান্দার প্রতি সম্পর্কিত নয়'*। এ বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্য صَحَّ اِيْقَاعُ الطَّلَاقِ এর ওপর আত্‌ফ হয়েছে। এটি খাসের হুকুমের ওপর ভিত্তি করে একটা শাখা মাসআলা। অর্থাৎ, যেহেতু خاص শব্দের মর্মানুযায়ী আমল করা ওয়াজিব এবং তা ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে না, সেহেতু শরীআত প্রণেতার পক্ষ হতে মহরের পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, বান্দার প্রতি তার নির্ধারণ সোপর্দ করা হয় নি।

মাসআলার বিবরণ : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, মহর নির্ধারণ করা বান্দার ইচ্ছা ও মতামতের ওপর অর্পিত হয়েছে। সুতরাং, যে বস্তু মূল্য হওয়ার যোগ্যতা রাখে তার মতে তা মহর হওয়ার যোগ্যতা রাখে। আর আমাদের (হানীফদের) মতে, যদিও মহরের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারিত নয়, কিন্তু মহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। তা হলো মহর দশ দিরহামের কম হবে না। আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর ওপর আমল করার কারণে– قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِى اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ (তাদের ওপর তাদের স্ত্রীগণ ও দাসীদের ব্যাপারে আমি যা নির্ধারণ করেছি, তা আমি অবগত আছি। অর্থাৎ আমার ভালভাবে জানা আছে যা আমি পুরুষদের ওপর তাদের স্ত্রীগণের ব্যাপারে নির্ধারণ করে দিয়েছি। আর তা হলো মহর। এ আয়াতে فرض একটি خاص শব্দ, যাকে নির্ধারণ করার অর্থনির্দেশের জন্যে গঠন করা হয়েছে। এভাবে উলামায়ে কিরামের মতানুসারে نا উত্তমপুরুষ জ্ঞাপক সর্বনামটিও একটি خاص শব্দ। তেমনি তাওযীহ গ্রন্থ প্রণেতার মতে বাক্যের اسناد তথা সম্পর্কও খাস।

অতএব বোঝা গেল যে, মহর আল্লাহ তা'আলার ইলমে নির্ধারিত, যা রাসূল (স) স্বীয় বাণী দ্বারা এভাবে বর্ণনা করেছেন– لَامَهْرَ اَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ মহর দশ দিরহামের কম হতে পারবে না।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ মুসান্নিফ (র) বলেন– এক্ষেত্রে অনেক জটিল প্রশ্ন রয়েছে। আমি তাফসীরে আহমদীর হাশিয়ায় তা উল্লেখ করেছি। সেগুলোর মধ্যে হতে একটি প্রশ্ন এই যে, أُحِلَّ لَكُمْ مَاوَرَاءَ ذَالِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوْا بِأَمْوَالِكُمْ দ্বারা مفوضه এর ক্ষেত্রে কেবল আকদ দ্বারাই স্বামীর জিম্মায় মহরে মিসল ওয়াজিব হওয়ার উপর দলিল পেশ করা ঠিক নয়। কারণ এই আয়াত কেবল এই বিষয়টি বর্ণনা করে যে, বিবাহ তথা طلب بضع মালের বিনিময়ে বৈধ। মালের বিনিময় ছাড়া অবৈধ হওয়া বোঝায় না। বরং আয়াতটি এ বিষয়ে নীরব এবং দলিল কায়েম হওয়ার উপর মওকূফ। আর এ ব্যাপারে দলিল এই যে, মাল বিহীনও বিবাহ বৈধ হয়। কারণ আল্লাহ তা'আলার বাণী فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ এবং مِنْكُمْ أَنْكِحُوا الْأَيَامٰى এর মধ্যে মালের কোনো উল্লেখ নেই। বরং উভয় আয়াত মুতলাক। আর নিয়ম আছে– المطلق يجرى على اطلاقه

উত্তর : এর উত্তর এই যে, যদি মুতলাক ও মুকায়্যাদ উভয়ের বিধান এক হয় এবং ঘটনাও এক হয় তাহলে মুতলাককে মুকায়্যাদের উপর প্রয়োগ করা হয়। অতএব এখানেও এই শর্ত বিদ্যমান থাকার কারণে মুতলাক তথা فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ এবং أَنْكِحُوا الْأَيَامٰى কে أَنْ تَبْتَغُوْا بِأَمْوَالِكُمْ দ্বারা মুকায়্যাদ হওয়ার উপর প্রয়োগ করতে হবে। সুতরাং মালবিহীন বিবাহ অবৈধ হওয়া এবং মালের বিনিময়ে বৈধ হওয়া প্রমাণিত হবে।

ফায়দা : নিকাহে মুতআ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে আশরাফুল হেদায়া চতুর্থখণ্ড দ্রষ্টব্য।

قَوْلُهُ وَكَانَ الْمَهْرُ مُقَدَّرًا شَرْعًا الخ : এ ইবারত দ্বারা মুতলাক খাছের বিধান সংশ্লিষ্ট সপ্তম মাসআলা এবং খাছের প্রথম বিধান أَنْ يَتَنَاوَلَ الْمَنْصُوْصَ قَطْعًا সংশ্লিষ্ট চতুর্থ মাসআলা উল্লেখিত হয়েছে। মুসান্নিফ (র) এটাকেই বলেছেন যে, এ ইবারত পূর্বের বাক্য صَحَّ إِيْقَاعُ الطَّلَاقِ এর উপর মা'তূফ এবং খাছের বিধান সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ খাছ যেহেতু তার অর্থকে অকাট্যরূপে শামিল করে এবং তার উপর আমল করা ওয়াজিব। এ কারণে মহরের পরিমাণ শরীআত প্রবর্তক তথা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত রয়েছে। তা নির্ধারণ ও নির্দিষ্ট করণের ব্যাপারে বান্দার কেনো দখল নেই।

মাসআলার বিশ্লেষণ : ইমাম শাফেয়ী (র)এর মতে মহরের পরিমাণ নির্ধারণ মানুষের পারস্পরিক সিদ্ধান্তের উপর মওকূফ। তারা যা নির্ধারণ করবে তাই মহর গণ্য হবে। তার মতে যে বস্তু অপর বস্তুর মূল্য হতে পারে বিবাহের আকদে তা মহরও হতে পারে। কেমন যেন ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে আকদে নিকাহ হলো عقد معاوضة তথা মাল বেচা-কেনার ন্যায়। পক্ষান্তরে হানাফীগণের মতে শরীআত প্রবর্তক তথা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মহরের সর্বোচ্চ পরিমাণ যদিও নির্ধারিত নয়। তবে সর্বোনিম্ন পরিমাণ নির্ধারিত রয়েছে। আর তা হলো ১০ দিরহাম। অতএব এর কম মহর নির্ধারণ করলে তা শরীআতে গ্রহণযোগ্য হবে না। এ ব্যাপারে দলিল হলো قَدْ عَلِمْنَا مَافَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْ أَزْوَاجِهِمْ وَمَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ আয়াত। "আমি পুরুষদের উপর তাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে যা নির্ধারণ করেছি তা অবগত আছি"। এই আয়াত দ্বারা এভাবে দলিল গ্রহণ করা হয়েছে যে, فَرَضْنَا একটি খাছ শব্দ। নির্দিষ্ট ও নির্ধারণ অর্থের জন্য গঠিত। এ ব্যাপারে দলিল এই যে, فرض শব্দের অধিকাংশ ব্যবহার শরীআতে নির্দিষ্ট অর্থের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। কেমন যেন فرض শব্দটি تقدير এর অর্থে حقيقت عرفيه - বলা হয়ে থাকে فَرَضَ الْقَاضِي النَّفَقَةَ কাজী ভরণ-পোষণ নির্ধারণ করেছেন। এভাবে ওয়ারিশদের ঐ অংশকে ফারায়েজ বলে যা শরীআত কর্তৃক নির্ধারিত।

মোটকথা فرضنا শব্দটি নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট অর্থের ব্যাপারে খাছ। কোনো কোনো আলিমের মতে (فرضنا এর) মুতাকাল্লিমের যমীরও (عليهم) গায়রে মুতাকাল্লিমের দিকে সম্বন্ধিত হওয়ায় খাছ হয়েছে। তাওজীদ গ্রন্থকারের মতে ইসনাদও খাছ। এখন উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন আমি পুরুষের উপর তাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে যা নির্ধারণ করেছি অর্থাৎ মহর সে বিষয়ে আমি অবগত। এর দ্বারা বোঝা গেলো যে, মহর আল্লাহ তা'আলার ইলমে নির্ধারিত রয়েছে। তবে তা مُجمل বা অস্পষ্ট। এ কারণে রাসূলুল্লাহ (স) এর হাদীসে তার বর্ণনা খুঁজতে হবে। রাসূলুল্লাহ (স) এরশাদ করেছেন لَامَهْرَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ১০ দিরহামের নিম্নে মহর হয় না।

وَكَذا نُقِيسُهُ عَلى قَطْعِ اليَدِ لِانَّه ايضًا عِوَضُ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَالتَّقدِيرُ خاصٌّ وَإِنْ كانَ المُقدَّرُ مُجمَلًا مُحتَاجًا الى البَيان وهٰذا فِي اصْطِلاحِ الْفُقَهاءِ وامّا فِي اللُّغَةِ فهُو حَقِيقَةٌ فِي الْإِيجَابِ وَالْقَطعِ وَلِهٰذا قال الشّافِعِيُّ رح اِنّ الفَرضَ ههُنا بِمَعْنى الْإِيجَاب بِقَرِيْنَةِ تَعدِيَتِه بِعَلى وعطفُ مَا مَلكتْ ايمانُهُمْ عَلى أَزْواجِهِمْ لِاَنَّ المَهْرَ لا يُقَدَّرُ فِيْ حَقِّ مَا ملكتْ اَيْمانُهُمْ فيكُوْنُ المُرادُ بِهِ النَّفَقَةُ والكِسْوَةُ وهو وَاجِبٌ فِيْ حَقِّ الْاَزْوَاجِ وَمَا مَلكَتْ اَيْمانُهُمْ جَمِيْعًا - قُلنَا تَعْدِيَتُهُ بِعَلى اِنَّما هُو لِتَضمِيْنِ مَعْنى الْإِيجَابِ و عَطفُ مَا مَلكتْ اَيْمانُهُمْ بِتَقدِيرِ فَرَضْنَا ثانٍ اى وَمَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْمَا مَلكتْ ايمانُهم عَلى اَنْ يَكُوْنَ هٰذا بِمَعْنى اَوْجَبْنَا والاوّلُ بِمَعْنى قَدَّرْنَا هٰكَذَا قَالُوا - ثُمَّ ذَكَرَ المُصَنِّفُ رح دَلائِلَ كُلٍّ مِّنَ المَسائِلِ الثَّلثِ فقَال عَمَلًا بِقَوْلِه تعالى فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلاتَحِلُّ لَهُ وَاَنْ تَبْتَغُوا بِاَمْوَالِكُمْ وَقَدْعَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فقولُه عَمَلًا تعليلٌ لِقولِهِ صَحَّ اه على طَرِيقِ اللَّفِّ والنَّشْرِ المُرَتَّبِ فقولُه فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ ناظِرٌ الى الْمَسْاَلَةِ الْاُوْلى وقولُه تعالى اَنْ تَبْتَغُوا بِاَمْوالِكُمْ نَاظِرٌ الى المَسْئَلَةِ الثّانِيَةِ وقولُه قدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عليهم ناظِرًاالى المَسْالةِ الثّالِثَةِ وقد بَيَّنْتُ كُلَّ ذٰلك بِالتَّفصِيْلِ تحتَ كلِّ مَسْالةٍ فتامّلْ -

---

অনুবাদ ॥ তেমনিভাবে আমরা এ নির্ধারিত পরিমাণকে চুরির অপরাধে 'হাত কাটার' ওপর অনুমান করি। কেননা, হাত কাটাও কমপক্ষে দশ দিরহামের বিনিময়ে হয়ে থাকে। অতএব تقدير তথা فرض শব্দটি খাস। যদিও নির্ধারিত পরিমাণটি মুজমাল, যা ব্যাখ্যার মুখাপেক্ষী। এটা ফকীহগণের পরিভাষা অনুযায়ী হয়েছে।

অভিধানে فرض এর প্রকৃত অর্থ হলো অপরিহার্য করা ও অকাট্যতা। এজন্যে ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, فرض শব্দটি এখানে ايجاب। তথা অপরিহার্য করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা ১. فرض শব্দকে على দ্বারা সকর্মক করা হয়েছে। ২. এবং مَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ বাক্যকে اَزْوَاجِهِمْ এর ওপর আতফ করা হয়েছে। কেননা, দাসীর ব্যাপারে মহর নির্ধারণ করা হয় না। এজন্যে তা দ্বারা শুধু ভরণ-পোষণই উদ্দেশ্য হবে। আর ভরণ–পোষণ স্ত্রী ও দাস-দাসী সকলের ক্ষেত্রে ওয়াজিব। আমরা উত্তরে বলবো যে, فرض শব্দটি على দ্বারা মুতআদ্দি হওয়া ايجاب এর অর্থবোধক হওয়ার কারণে। আর مَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ এর আতফ দ্বিতীয় আর একটি فَرَضْنَا কে উহ্য মানার কারণে হয়েছে। অর্থাৎ فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ এ কারণে যে, এটা اوجبنا এর অর্থ বিশিষ্ট। আর প্রথমটি قدرنا এর অর্থে। হানাফী আলিমগণ এমনই বলেছেন।

মুসান্নিফ (র) তিনোটি শাখা মাসআলার প্রত্যেকটির দলিল উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ***'যাতে আল্লাহ তা'আলার বাণীসমূহ***- ১. فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ ২. وَاَنْ تَبْتَغُوا بِاَمْوَالِكُمْ ৩. قَدْ عَلِمْنَا مَافَرَضْنَا عَلَيْهِمْ ***এর ওপর আমল সংঘটিত হয়'*** গ্রন্থকারের বক্তব্যে عَمَلًا শব্দটি তাঁর পূর্ববর্তী বক্তব্য صَحَّ اِيْقَاعُ الطَّلَاقِ এর ক্রমানুসারে عِلَّتْ বা কারণ বিশেষ।

অতএব তাঁর বক্তব্য فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ হলো প্রথম মাসআলার দলিল (خلع এর পর তালাক প্রদানের বৈধতার দলিল) আর আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَأَنْ تَبْتَغُوْا بِأَمْوَالِكُمْ হলো দ্বিতীয় মাসআলার দলিল। (কেবল আকদের দ্বারাই মহরে মিসল ওয়াজিব হবে।) এবং তাঁর বাণী- قَدْ عَلِمْنَا مَافَرَضْنَا হলো তৃতীয় মাসআলার দলিল (শরীআত প্রণেতা কর্তৃক মহরের নিম্নতম পরিমাণ নির্ধারিত) ব্যাখ্যাকার (র) বলেন, আমি এসব কথা বিস্তারিতভাবে প্রতিটি মাসয়ালার অধীনে বর্ণনা করেছি। কাজেই তুমি ভালভাবে বুঝে নাও।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ এ ব্যাপারে কিয়াসের দাবি এই যে, কমপক্ষে ১০ দিরহাম মহর হোক। কারণ শরীআতে ন্যূনতম ১০ দিরহাম মাল চুরি করার দরুন চোরের সাজা স্বরূপ হাত কর্তনের বিধান রয়েছে। কেমন যেন এক অঙ্গের বিনিময় হলো ১০ দিরহাম। অতএব মহিলাদের বিশেষ অঙ্গ ১০ দিরহামের নিম্নে মূল্যায়ন করা যুক্তিযুক্ত হতে পারে না।

মুসান্নিফ (র) বলেন فرض শব্দটি تقدير তথা নির্ধারিত হওয়ার অর্থ ফকীহগণের পরিভাষা মতে। অভিধানে এর হাকীকী অর্থ হলো ওয়াজিব করা, কর্তন করা। এ কারণে ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন– আয়াতে قَدْعَلِمْنَا এর অর্থ হলো ওয়াজিব করা। এ ব্যাপারে ২টি আলামত রয়েছে। ১. فرضنا শব্দ على দ্বারা মুতাআদ্দী হওয়া। ২. مَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ শব্দ ازواج এর উপর মা'তৃফ হওয়া। কেননা فرض শব্দ যখন على দ্বারা মুতাআদ্দী হয় তখন তার অর্থ হয় ওয়াজিব করা। যেমন فرض عليه বলে اوجب অর্থ নেয়া হয়। আর مَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ যখন أَزْوَاجِهِمْ এর উপর মা'তৃফ তখন مَافَرَضْنَا দ্বারা মোহর উদ্দেশ্য হবে না। কারণ বাঁদীদের ব্যাপারে তাদের মণিবের উপর মহর নির্ধারিত হয় না। অতএব এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে ভরণ-পোষণ। এ ব্যাপারে দাসী এবং স্ত্রী উভয়ই সমপর্যায়ের। অর্থাৎ মনিবের উপর ক্রিতদাসীর এবং স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ওয়াজিব।

সুতরাং বোঝা গেলো যে, مافرضنا দ্বারা মহর নির্ধারিত থাকা অর্থ নয় বরং ভরণ-পোষণ ওয়াজিব করা উদ্দেশ্য। অতএব এই আয়াতের দ্বারা কমপক্ষে ১০ দিরহাম মহর নির্ধারণের ব্যাপারে দলিল গ্রহণ করা গ্রহণযোগ্য নয়।

উত্তর : হানাফীগণের পক্ষ হতে এর উত্তর এই যে, فرضنا শব্দটি على দ্বারা মুতাআদ্দী হওয়া ايجاب এর অর্থ বিশিষ্ট হওয়ার কারণে। এই অর্থের প্রতি লক্ষ রেখে ইবারতটি এমন হবে مَامَلَكَتْ আর مَا فَرَضْنَا مُوجِبًا عَلَيْهِمْ এর ازواجهم এর উপর আতফ হওয়া। ২য় فرضنا উহ্য মানার কারণে বাক্যটি এমন হবে قدعلمنا ايمانهم مافَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْ أَزْوَاجِهِمْ وَ مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ প্রথম فرضنا - قَدَّرْنَا অর্থে। আর দ্বিতীয়টি اوجبنا অর্থে। অর্থাৎ স্বামীদের উপর আমি তাদের স্ত্রীদের যে মহর নির্ধারণ করেছি তা অবগত আছি। আর তাদের দাসীদের ব্যাপারে যে ভরণ-পোষণ ওয়াজিব করেছি তাও। হানাফী আলিমগণ এমনই বলে থাকেন।

ব্যাখ্যাকার هٰكذا قالوا দ্বারা হানাফী আলিমগণের কথাকে এভাবে প্রকাশ করেছেন। তার কারণ এই যে, এতে تضمين গ্রহণ করা এবং দ্বিতীয় فرضنا কে উহ্য মানা অধিক উপযোগী নয় বা অন্তসারশূন্য বলা যেতে পারে। এ কারণেই তিনি নিজের প্রতি এ উত্তরের সম্বন্ধ না করে হানাফী আলিমগণের প্রতি সম্বন্ধ করেছেন।

قوله ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ رح دَلَائِلَ كُلِّ الخ : মানার গ্রন্থকার ইমাম শাফেয়ী (র) এর পক্ষ থেকে আরোপিত প্রশ্ন এবং তার উত্তরসমূহের পরে ৩টি শাখা মাসআলা উল্লেখ করেছেন। এরপর মাসাআলা ৩টির দলিলসমূহ আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন আল্লাহ তা'আলার ফরমান فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ এটা হলো প্রথম মাসআলা صَحَّ إِيْقَاعُ الطَّلَاقِ بَعْدَ الْخُلْعِ এটা তার দলিল। আর أَنْ تَبْتَغُوْا بِأَمْوَالِكُمْ হলো দ্বিতীয় মাসআলা। وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ بِنَفْسِ الْعَقْدِ فِي الْمُفَوَّضَةِ হলো তার দলিল। মুসান্নিফ (র) প্রত্যেক দলিলকে প্রত্যেক মাসআলার অধীনে স্ববিস্তারে আলোচনা করেছেন। কাজেই তা পুনঃউল্লেখ করা জরুরি নয়। এরপর ব্যাখ্যাকার বলেন মাতিন (র) উল্লেখিত তিনো দলিলকে ক্রমানুসারে একের পর এক বর্ণনা করেছেন।

ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ رح عَنْ تعريْفِ الْخَاصِّ وحُكْمِه وتَفْرِيْعَاتِه اراد اَنْ يُبَيِّنَ بَعْضَ اَنْوَاعِهِ الْمُسْتَعْمَلَةِ فِى الشَّرِيْعَةِ كَثِيْرًا وهُو الْاَمْرُ وَالنَّهْىُ فقال وَمِنْهُ الامْرُ وهُو قَوْلُ القَائِلِ لِغَيْرِهِ عَلٰى سَبِيْلِ الْاِسْتِعْلَاءِ اِفْعَلْ اى مِنَ الخَاصِّ الامْرُ يعْنِى مُسَمَّى الْاَمْرِ لَا لَفْظُه لانّه يَصْدُق عَلَيْهِ انّه لفظٌ وُضِعَ لِمَعْنًى مَعلومٍ وهُو الطَّلَبُ عَلَى الْوُجُوبِ والْقَوْلُ مَصْدرٌ يُرَاد بِه المَقُوْلُ لِاَنَّ الْاِسْتِعْلَاءَ يَخْرُج بِه الْاِلْتِمَاسُ والدُّعَاءُ وَبقِىَ فِيْه النَّهْىُ داخلاً فخرَجَ بقولِه اِفْعَلْ والمُراد بقولِه اِفْعَلْ كُلُّ مَا كانَ مُشْتَقًّا مِّنَ المُضَارِعِ على هٰذه الطَّرِيقَةِ سواءٌ كانَ حاضرًا او غائبًا او مُتَكَلِّمًا معروفًا او مجهولاً ولكنْ بِشَرْطِ ان يكونَ المقصودُ منه ايجابُ الْفعلِ ويَعُدُّ القائلُ نفسَه عاليًا سواءٌ كانَ عاليًا فِى الواقِعِ او لاَ ولهٰذا نُسِبَ الى سُوْءِ الادَبِ اِنْ لَّمْ يكنْ عاليًا - وبِمَا ذَكَرْنَا انْدَفَعَ مَا قِيْلَ اِنْ اُرِيْدَبِه اِصْطِلاحُ الْعَرَبِيَّةِ فلا حاجةَ الى قولِه "على سَبِيْلِ الْاِسْتِعْلَاءِ" لِاَنَّ الْاِلْتِمَاسَ والدعاءَ ايضًا اَمْرٌ عندَهُم وان اُرِيد بِه اصطلاحُ الاُصولِ فَيَصْدُقُ على ما اُرِيْد به التَّهْدِيدُ والتَّعْجِيْزُ لانّه ايضًا على سبيلِ الاستعلاءِ وذٰلك لِاَنَّا نَتَكَلَّمُ على اِصْطِلاحِ الاُصُولِ ولَيْسَ المقصودُ مُجَرَّدُ الْاِستعلاءِ بَلِ الزامُ الْفِعْلِ وذا لا يَصْدُقُ اِلاّ على الوُجوبِ بِخلافِ التَّهديدِ والتَّعْجِيْزِ ونحوِهِما -

امر-এর আলোচনা

অনুবাদ ॥ গ্রন্থকার خاص এর সংজ্ঞা, হুকুম ও শাখা মাসয়ালাসমূহ আলোচনা শেষ করে, এখন তিনি শরীআতে বহুল প্রচলিত خاص এর কতিপয় প্রকার বর্ণনা করার ইচ্ছা করছেন, তা হলো امر ও نهى অনন্তর তিনি বলেন, ***আর এর অন্তর্ভুক্ত হলো امر (অনুজ্ঞা), আর তা হলো, বক্তার নিজেকে উচ্চ মনে করে অন্যকে افعل (কর) বলা।*** অর্থাৎ خاص এর অন্তর্ভুক্ত বিষয় হলো امر তথা এমন বিষয় যাকে امر নাম দেয়া হয়, শাব্দিক, امر নয়। কারণ (مُسَمّٰى امر) এর পরিচয় হলো-তা এমন শব্দ যাকে নির্দিষ্ট অর্থের জন্যে গঠন করা হয়েছে, আর তা হলো আবশ্যিকভাবে চাওয়া। القول হলো মাসদার, এর দ্বারা مَقُوْل তথা উক্তি উদ্দেশ্য। কারণ, امر হলো শব্দের প্রকারভুক্ত, قول শব্দটি جنس যা সকল শব্দকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

গ্রন্থকারের উক্তি عَلٰى سَبِيْلِ الْاِسْتِعْلَاءِ দ্বারা اِلْتِمَاس ও دُعَاء - امر হতে বের হয়ে গেছে, তবে نهى তার অন্তর্ভুক্ত থেকে যায়। তবে افعل এর দ্বারা نهى ও বের হয়ে গেল। গ্রন্থকারের উক্তি افعل দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এমন প্রতিটি শব্দ যা (افعل তথা আমরের ছীগা বানানোর পন্থায়) مضارع হতে গঠিত হয়, চাই তা حاضر، غائب কিংবা متكلم হোক অথবা معروف কিংবা مجهول হোক। তবে শর্ত হচ্ছে (امر)-এর মাধ্যমে কাজটি আবশ্যক করে দেয়া উদ্দেশ্য হবে এবং বক্তা নিজেকে উচ্চ মনে করবে। বাস্তবে সে উচ্চ হোক বা না হোক। এ কারণে উচ্চ না হওয়া অবস্থায় (امر বা আদেশ করলে) বেয়াদবী গণ্য হয়। আমরা যে আলোচনা পেশ করলাম এর মাধ্যমে (প্রশ্ন আকারে) যা বলা হয়েছে তা প্রতিহত হয়ে গেলো। (অর্থাৎ এরূপ) যদি امر দ্বারা আরবদের (নিকট প্রচলিত) পরিভাষা উদ্দেশ্য হয় তাহলে বক্তার উক্তি عَلٰى

سَبِيْلِ الْاِسْتِعْلَاء এর প্রয়োজন নেই। কারণ তাদের নিকট التماس এবং دعاء ও امر আর যদি উসূলবিদদের পরিভাষাগত امر উদ্দেশ্য হয়, তা হলে তা, তা تهديد এবং تعجيز এর উপরও প্রযোজ্য হয়। কারণ, এগুলো ও নিজেকে বড় মন করে হয়ে থাকে। (প্রশ্ন বিদূরিত) এজন্যে যে, আমরা উসূলের পরিভাষা নিয়ে কথা বলি এবং এর দ্বারা শুধু নিজেকে বড় মনে করা উদ্দেশ্য নয়, বরং কাজটি আবশ্যক করে দেয়াও উদ্দেশ্য। আর কাজটি আবশ্যক করা وجوب ছাড়া অন্য কিছুর জন্যে প্রযোজ্য নয়। تعجيز، تهديد ও অনুরূপ বিষয়গুলো এর বিপরীত।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ الخ : মুসান্নিফ (র) বলেন মানার গ্রন্থকার (র) খাছ এর সংজ্ঞা, তার বিধান এবং তার শাখা মাসআলা বর্ণনা করে সাথে সাথে খাছ এবং অন্যান্য কয়েকটি প্রকার শরীআতে যার বেশি ব্যবহার রয়েছে তার আলোচনা করতে চাচ্ছেন। সেগুলো হলো. امر এবং نهى।

امر কে আগে উল্লেখের কারণ : মুসান্নিফ (র) এ দুটির মধ্য থেকে আমরকে এ কারণে আগে এনেছেন যে, ১. মানুষ সর্বপ্রথম ঈমানের মুকাল্লাফ হয় অর্থাৎ তার উপর সর্বপ্রথম ঈমান আনার আদেশ অর্পিত হয়।

২. امر এর অর্থ অস্তিত্বমূলক। পক্ষান্তরে نهى এর অর্থ হলো অস্তিত্বহীনমূলক। আর وجودى، عدمى এর উপর মুকাদ্দাম হয়। এ কারণে আমরকে নাহীর আগে এনেছেন।

امر এর সংজ্ঞা : এক ব্যক্তির নিজে নিজেকে উচ্চ মর্যাদাবান মনে করে অপর ব্যক্তিকে افعل তথা কোনো কাজের আদেশ দেয়াকে আমর বলে। ব্যাখ্যাকার বলেন আমর হলো খাছের একটি প্রকার। এর দ্বারা আলিফ, মিম ও রা এর সংযুক্ত امر শব্দ উদ্দেশ্য নয়। বরং তার مِصْدَاق ও مُسَمّى উদ্দেশ্য। যেমন اِضْرِبْ. اُنْصُرْ. اِشْرَبْ ইত্যাদি। এর দলিল এই যে, খাছ এর সংজ্ঞা لَفْظٌ وُضِعَ لِمَعْنًى আমরের مسمّى এর উপর প্রযোজ্য হয়; শব্দের উপর নয়। امر এর নির্দিষ্ট অর্থ হলো কোনো বস্তু অবধারিতরূপে কামনা করা। অথবা ওয়াজিবরূপে কোনো বস্তু করার নির্দেশ দেয়া। অর্থাৎ طلب على الوجوب এর উপর امر (ا - م - ر) শব্দ বোঝায় না। বরং তার مسمى ও উদ্দেশ্য বোঝায়। যেমন– اشرب পান করার নির্দেশ এবং انصر সাহায্যে নির্দেশ বোঝায়।

قوله وَالْقَوْلُ مَصْدَرٌ الخ : এর দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

প্রশ্ন : আমরের সংজ্ঞা هُوَقَوْلُ الْقَائِلِ এর মধ্যে هو যমীরের মারজা হলো আমর। আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আমর এর مسمى যা খাছ এর অন্তর্ভুক্ত। আর খাছ হলো শব্দের একটি প্রকার। এ কারণে مسمى امر এবং مصداق ও শব্দের প্রকার হবে। এক্ষেত্রে শব্দের উপর قول প্রযোজ্য করা কিভাবে সঠিক হতে পারে? কারণ শব্দ হলো مقول তথা কথিত বিষয়।

উত্তর : মুসান্নিফ (র) এর উত্তর দেন যে, মতনে উল্লিখিত قول শব্দটি মাসদার। এর দ্বারা ইসমে মাফউল তথা مقول উদ্দেশ্য। কাজেই এখন আর কোনো প্রশ্ন থাকে না।

এ প্রশ্নকে এভাবেও বলা যেতে পারে যে, هو যমীর জাত বা সত্তার অন্তর্গত। আর قول হলো মাসদার। কাজেই কেমন যেন জাতের উপর মাসদার প্রযোজ্য হচ্ছে। অথচ তা জায়েয নয়। এর উত্তরও একই যে, قول শব্দটি ইসমে মাফউলের অর্থে। সুতরাং কোনো প্রশ্ন থাকে না।

মুসান্নিফ (র) আমরের সংজ্ঞার فَوائِد قُيُود উল্লেখ করে বলেন যে, এর মধ্যে قول القائل হলো জিনস। সকল শব্দ এর মধ্য শামিল রয়েছে। আর على سبيل الاستعلاء হলো প্রথম فصل। এর দ্বারা দোয়া ও التماس তথা আবেদনমূলক সকল শব্দ আমরের সংজ্ঞা থেকে খারিজ হয়ে গেলো। কারণ التماس এর মধ্যে কোনো কাজের কামনা সমপর্যায়ের উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে। আর দোয়ার মধ্য বিনয়ের সাথে কামনা হয়ে থাকে। অথচ আমরের মধ্যে নিজেকে উঁচু জ্ঞান করে কোনো কাজের কামনা করা হয়। অতএব আমরের সংজ্ঞা থেকে التماس، دعاء

বেরিয়ে গেলো। অবশ্য نهي এ সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে। কারণ নিষেধকারীর উক্তিও নিজেকে বড়ো মনে করে হয়ে থাকে। তবে মাতিনের উল্লেখিত افعل দ্বারা নাহীও আমরের সংজ্ঞা থেকে খারিজ হয়ে যায়। কারণ সেখানে বক্তা افعل এর পরিবর্তে لاتفعل শব্দ ব্যবহার করে থাকে। সুতরাং افعل হলো দ্বিতীয় ফসল। এর দ্বারা নাহী খারিজ হয়ে গেলো।

قوله وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ اِفْعَلْ الخ : এটা একটা প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন : মুসান্নিফ (র) এর উল্লেখিত আমরের সংজ্ঞা তার সকল আফরাদকে শামিল করে না। কারণ افعل বলার দ্বারা امرغائب و متكلم খারিজ হয়ে যায়। অথচ এ দুটোও আমরের অন্তর্গত।

উত্তর : মাতিনের ভাষ্য افعل দ্বারা বিশেষভাবে উক্ত শব্দ উদ্দেশ্য নয়। বরং এর দ্বারা مضارع থেকে আমর গঠনের প্রসিদ্ধ নিয়ম উদ্দেশ্য। চাই হাযের হোক বা গায়েব, কিংবা মুতাকাল্লিম এবং মা'রূফ হোক বা মাজহূল। তবে এর জন্য শর্ত এই যে, প্রত্যেকটি দ্বারা বক্তার উদ্দেশ্য কাজ ওয়াজিব করা হতে হবে এবং নিজেকে বড়ো গণ্য করবে। চাই বাস্তবে বড়ো হোক কিংবা না। এ কারণেই যখন বক্তা বড়ো না হওয়া সত্ত্বে افعل শব্দ বলে তখন তা বেয়াদবি গণ্য করা হয়।

সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিম ও কিছু সংখ্যক মু'তাযিলাদের মতে আমরের জন্য বাস্তবে বড়ো হওয়া শর্ত। আর কারো কারো মতে বাস্তবে বড়ো হওয়া শর্ত নয়। এমনকি বড়ো জ্ঞান করাও শর্ত নয়।

গ্রন্থকার বলেন যে, ولٰكِنْ بِشَرْطِ اَنْ يَكُوْنَ الْمَقْصُوْدُ مِنْهُ اِيْجَابُ الْفِعْلِ দ্বারা সে প্রশ্নও নিরসন হয়ে গেলো যা তালবীহ গ্রন্থকার করেছেন। তালবীহ গ্রন্থকার বলেন যে, আমর দ্বারা আরবদের পরিভাষার আমর উদ্দেশ্য নাকি উসূলবিদগণের পারিভাষিক আমর উদ্দেশ্য? আরবগণের পারিভাষিক আমর উদ্দেশ্য হলে সংজ্ঞার মধ্যে على سَبِيْلِ الْاِسْتِعْلاء উল্লেখের কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ তাদের মতে التماس এবং دعا ও আমর। অথচ এ দুক্ষেত্রে على سَبِيْلِ الْاِسْتِعْلاء পাওয়া যায় না। আর যদি উসূলবিদগণের পারিভাষিক আমর উদ্দেশ্য হয় তাহলে تهديد (ধমক) যেমন اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ এবং تعجيز (শ্রোতাকে অক্ষম করা) যেমন فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِه এর উপরও আমরের সংজ্ঞা প্রযোজ্য হয়। কারণ এ দুক্ষেত্রেও على سَبِيْلِ الْاِسْتِعْلاء তথা নিজেকে উঁচু জ্ঞান করা পাওয়া যায়। অথচ বাস্তবে এ দুটি আমর নয়।

উত্তর : এখানে আমাদের উদ্দেশ্য হলো উসূলবিদগণের পারিভাষিক আমর। তবে এর মধ্যে কেবল استعلاء উদ্দেশ্য হয় না। বরং এর সাথে সাথে কাজটি আবশ্যিক করাও উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু تهديد ও تعجيز এর মধ্যে তা পাওয়া যায় না।

আমরের মধ্যে এ কারণে পাওয়া যায় যে, এর দ্বারা امر তথা নির্দেশদাতা অন্যের উপর কোনো কাজকে অপরিহার্য করে থাকে। কিন্তু تهديد ও تعجيز এর মধ্যে কোনো কাজ কামনা করা মোটেই উদ্দেশ্য থাকে না; অপরিহার্য করাতো দূরের কথা। বরং কেবল ধমক দেয়া ও অক্ষম করা উদ্দেশ্য থাকে। অতএব لٰكِنْ بِشَرْطِ اَنْ يَكُوْنَ الْمَقْصُوْدُ مِنْهُ اِيْجَابُ الْفِعْلِ দ্বারা তালবীহ গ্রন্থকারের প্রশ্ন তিরোহিত হয়ে গেলো।

ফায়েদা : امر حاضر এমন আমরকে বলে যার দ্বারা সম্বন্ধিত ব্যক্তি থেকে কোনো কাজ কামনা করা হয়। امر غائب এমন আমরকে বলে যার দ্বারা অনুপস্থিত ব্যক্তি থেকে কোনো কাজ কামনা করা হয়। যেমন ليضرب আর امر متكلم এমন আমরকে বলে যার দ্বারা মুতাকাল্লিম নিজের থেকে কাজ তলব করে। যেমন - امر معروف لاضرب এমন আমরকে বলে যার মধ্যে কাজ কর্তার প্রতি সম্বন্ধিত হয়। আর مجهول বলে যে কাজ মাফঊলের প্রতি সম্বন্ধিত হয়।

وَيُخْتَصُّ مُرَادُهُ بِصِيغَةٍ لَازِمَةٍ بَيَانٌ لِكَوْنِ الْأَمْرِ خَاصًّا يَعْنِى يُخْتَصُّ مُرَادُ الْأَمْرِ وَهُوَ الْوُجُوبُ بِصِيغَةٍ لَازِمَةٍ لِلْمُرَادِ وَالْغَرَضُ مِنْهُ بَيَانُ الْإِخْتِصَاصِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ اى لَا يَكُونُ الْأَمْرُ إِلَّا لِلْوُجُوبِ وَلَا يَثْبُتُ الْوُجُوبُ إِلَّا مِنَ الْأَمْرِ دُونَ الْفِعْلِ فَيَكُونُ نَفْيًا لِلْإِشْتِرَاكِ وَالتَّرَادُفِ جَمِيعًا - وَذٰلِكَ بِأَنْ يُقَالَ إِنَّ دُخُولَ الْبَاءِ هٰهُنَا عَلَى الْمُخْتَصِّ عَلَى طَرِيقَةِ قَوْلِهِمْ خَصَّصْتُ فُلَانًا بِالذِّكْرِ فَتَكُونُ الصِّيغَةُ مُخْتَصًّا بِالْوُجُوبِ دُونَ الْإِبَاحَةِ وَالنَّدْبِ - وَهٰذَا نَفْيُ الْإِشْتِرَاكِ وَيَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ لَازِمَةٍ أَنَّ الصِّيغَةَ لَازِمَةٌ لِلْمُرَادِ وَلَا تَنْفَكُّ عَنْهُ وَلَا يَكُونُ الْمُرَادُ مَفْهُومًا مِنْ غَيْرِ الصِّيغَةِ وَهُوَ الْفِعْلُ وَهٰذَا نَفْيُ التَّرَادُفِ أَوْ يُقَالُ إِنَّ الْبَاءَ دَاخِلَةٌ عَلَى الْمُخْتَصِّ بِهِ كَمَا هُوَ أَصْلُهَا اى لَا يُفْهَمُ هٰذَا الْمُرَادُ بِغَيْرِ الصِّيغَةِ وَهُوَ الْفِعْلُ فَيَكُونُ هُوَ نَفْيًا لِلتَّرَادُفِ

অনুবাদ ॥ *আর আমরের উদ্দেশ্য* صيغة لازمة *এর সাথে খাস।* এটা হচ্ছে, امر খাস হওয়ার বর্ণনা। অর্থাৎ امر এর উদ্দেশ্য তথা وجوب এমন صيغة এর সাথে খাস যা উদ্দেশ্যের জন্যে আবশ্যকীয়। একথার লক্ষ্য হচ্ছে, দুদিক থেকে খাস হওয়ার বর্ণনা দেয়া। অর্থাৎ امر টি وجوب ছাড়া কিছুর জন্যে হয় না, আর وجوب ও امر ছাড়া فعل দ্বারা সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং مشترك এবং مرادف উভয়ের জন্যে نفى (নেতিবাচক) হলো। এটা এভাবে বলা যায় যে, مختص (খাসকৃত বিষয়)-এর সাথে باء যুক্ত হওয়ার ব্যাপারটি আরবদের কথা বলার ধরন অনুসারে হয়েছে। তারা বলে, خَصَّصْتُ فُلَانًا بِالذِّكْرِ (আমি অমুককে খাস করে উল্লেখ করেছি। এক্ষেত্রে صيغة টি وجوب এর সাথে খাস হবে। ندب বা اباحة এর সাথে নয়। আর এটাই مشترك হওয়ার জন্যে نفى হলো। বক্তার উক্তি لازمة এর অর্থ হলো উদ্দেশ্যের জন্যে صيغة জরুরী হওয়া। এই সীগা কখনো উদ্দেশ্য থেকে আলাদা হয় না। আর উদ্দেশ্যটি কখনো صيغة ব্যতীত فعل হতে বোঝা যায়না। তাই এর দ্বারা مرادف হওয়ার نفى হলো। অথবা বলা হবে যে, باء অব্যয়টি مختص به এর উপর প্রবিষ্ট হয়েছে। যেমনটি তার মূল ব্যবহার। অর্থাৎ ছীগা ছাড়া এ উদ্দেশ্য বোধগম্য হবে না। কাজেই তা مرادف হওয়ার নফী হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله وَيُخْتَصُّ مُرَادُهُ بِصِيغَةٍ الخ : মুসান্নিফ (র) এর ইবারত বোধগম্য করার পূর্বে ভূমিকা স্বরূপ কিছু কথা যেনে রাখা জরুরি।

ভূমিকা : কখনো কখনো শব্দ তার অর্থের সাথে নির্দিষ্ট হয়। অর্থাৎ উক্ত অর্থ ছাড়া অন্য কোনো অর্থ বোঝায় না। কিন্তু অর্থ উক্ত শব্দের সাথে খাছ থাকে না। বরং একই অর্থের বিভিন্ন শব্দ হতে পারে। যেমন–مرادف তথা সমার্থবোধক শব্দের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। উদাহরণস্বরূপ لَيْثٌ এবং أَسَدٌ শব্দদ্বয় أَسَدٌ শব্দটি (বাঘ), হিংস্র প্রাণীর জন্য

খাছ। কিন্তু হিংস্র প্রাণী বোঝানোর জন্য এ শব্দটি খাছ নয়। বরং একই অর্থে لَيْثٌ ও غَضَنْفَرٌ শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়। আবার কখনো এর বিপরীত হয়। অর্থাৎ উক্ত শব্দ ছাড়া ভিন্ন কোনো শব্দ দ্বারা অর্থ বোঝা যায় না। কিন্তু শব্দটা উক্ত অর্থের সাথে খাছ থাকে না। বরং অর্থ যেমন উক্ত শব্দের দ্বারা বোঝা যায় তদ্রূপ উক্ত অর্থ ছাড়া অন্য অর্থও উক্ত শব্দ দ্বারা বোঝা যায়। যেমন মুশতারিক শব্দসমূহের ক্ষেত্রে। উদাহরণত قرء শব্দটি হায়েয ও তুহুর অর্থে মুশতারিক। যেমন পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু قرء শব্দটি حيض এর জন্য খাছ নয়। বরং قرء শব্দ দ্বারা যেমন বোঝা যায় তদ্রূপ তুহুরও قرء শব্দের অর্থ হয়। কখনো উভয় পক্ষ থেকে খাছ হয়। অর্থাৎ শব্দ অর্থের জন্য খাছ হয় এবং অর্থ শব্দের সাথে খাছ হয়। যেমন مُتَبَايِنَةٌ (বিপরীত অর্থমূলক) শব্দসমূহের ক্ষেত্রে। উদাহরণস্বরূপ انسان ও فَرَسٌ - اِنسان হলে حيوانِ ناطق এর সাথে খাছ। এভাবে حيوان ناطق ও انسان এর সাথে খাছ। এভাবে فرس শব্দটি حيوانِ ناهِق এর সাথে খাছ। আর حيوان ناهق - فرس এর সাথে খাছ।

উপরোক্ত ভূমিকার পরে মুসান্নিফ (র) বলতে চান যে, আমরের সীগা এবং তার উদ্দেশ্য অর্থাৎ ওয়াজিবের মধ্যে উভয় পক্ষ থেকে خصوص রয়েছে। অর্থাৎ তিনি একথাকে প্রমাণিত করছেন যে, আমরের সীগা কেবল ওয়াজিব বোঝানোর জন্য আসে। মুবাহ বা মুস্তাহাব ইত্যাদি বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় না। আর ওয়াজিব হওয়াটা কেবল আমরের সীগার সাথে খাছ। রাসূলুল্লাহ (স) এর আমল দ্বারা ওয়াজিব প্রমাণিত হবে না। এ খাছ হওয়াকে সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্য হলো مشترك হওয়া এবং مرادف হওয়ার অভিমতকে প্রত্যাখ্যান করা। অর্থাৎ যারা বলেন যে, আমরের সীগা وجوب، اباحت ও ندب এর এর মধ্যে মুশতারিক। সাথে সাথে তিনি যারা আমরের সীগা এবং রাসূলুল্লাহ (স) এর আমল দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত করেন তাদের অভিমতকেও এর দ্বারা প্রত্যাখ্যান করেছেন। এর জন্য মুসান্নিফ (র) দুটি আলোচনা এনেছেন।

প্রথম আলোচনার সার এই যে, মানারের ইবারত وَيَخْتَصُّ مُرَادُه بِصِيغَةٍ لَازِمَةٍ এর মধ্যে با বর্ণটি مختص এর উপর দাখিল হয়েছে। যেমন خَصَّصْتُ فُلَانًا بِالذِّكْر এর মধ্যে با বর্ণটি مختص এর উপর প্রবিষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ আমরের সীগা হলো مختص এবং তার উদ্দেশ্য ওয়াজিব হওয়া হলো مختص به অর্থাৎ আমরের সীগা ওয়াজিব হওয়ার সাথে খাছ। এর দ্বারা মুবাহ ও মুস্তাহাব প্রমাণিত হবে না। সুতরাং আমরের সীগা যেহেতু কেবল ওয়াজিব বোঝায়। কাজেই এর দ্বারা মুশতারিক হওয়াকে প্রত্যাখ্যান করা হলো।

মাতিন (র) এর উক্তি لازمة এর অর্থ এই যে, আমরের সীগা তার উদ্দেশ্য অর্থাৎ وجوب বোঝানোর জন্য নির্দিষ্ট। সীগা কখনো ওয়াজিব হওয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। আর তার উদ্দেশ্য অর্থাৎ ওয়াজিব হওয়াটা আমরের সীগা ছাড়া নবী করীম (স) এর আমল দ্বারা সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং এর দ্বারা আমরের সীগা এবং নবী করীম (স) এর আমলের মধ্যে ترادف হওয়াকে নফী করা হলো।

ثُمَّ قولُه لَازِمَةٌ إِنْ حُمِلَ عَلَى اللَّازِمِ الْأَعَمِّ فَيَكُونُ هو ايضًا نَفْيًا لِلتَّرَادُفِ لِأَنَّ الْمَلْزُومَ لَا يُوجَدُ بِدُونِ اللَّازِمِ فَلَا يُفْهَمُ نَفْيُ الْإِشْتِرَاكِ قَطُّ - فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ اللَّازِمُ عَلَى اللَّازِمِ الْمُسَاوِيْ اي لا يُوجَدُ الْمُرَادُ بِدُونِ الصِّيغَةِ وَلَا الصِّيغَةُ بِدُونِ الْمُرَادِ فَقَدْ فُهِمَ حِيْنَئِذٍ نَفْيُ التَّرَادُفِ وَالْإِشْتِرَاكِ جَمِيعًا كِنَايَةً -

অনুবাদ॥ গ্রন্থকারের উক্তি لازمة কে যদি لازم اعمّ তথা ব্যাপকার্থে لازم ধরা হয়, তাহলেও مرادف হওয়াকে نفى করে দেয়। কারণ, لازم ছাড়া ملزوم পাওয়া যায় না। তবে এ থেকে কখনো مشترك টি نفى হওয়া বোঝা যাবে না। অতএব এখন لازم কে لازم مساوى অর্থে ব্যবহার করা উচিত। অর্থাৎ صيغة ছাড়া উদ্দেশ্য পাওয়া যাবে না এবং উদ্দেশ্য ছাড়া صيغة পাওয়া যাবে না। তখনি مشترك ও مرادف হওয়া ইঙ্গিত দ্বারা বোঝা যাবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ قوله أَوْ يُقَالُ إِنَّ الْبَاءَ الخ : দ্বিতীয় আলোচনার সার এই যে, با বর্ণটি مختص به এর উপর দাখিল হয়। যেমন এর আছল বা মূলনীতি রয়েছে। অর্থাৎ আমরের উদ্দেশ্য (ওয়াজিব হওয়া)টা হলো مختص আর সীগা হলো مختص به অর্থাৎ ওয়াজিব হওয়াটা আমরের সীগার সাথে খাছ। অন্য কোনো সীগা দ্বারা ওয়াজিব বোঝাবে না। নবী করীম (স) এর আমল দ্বারাও ওয়াজিব প্রমাণিত হবে না। আর ওয়াজিব হওয়াটা যখন কেবল আমরের সীগা দ্বারা বোঝা যায়; রাসূলুল্লাহ (স) এর আমল দ্বারা বোঝা যায় না। কাজেই আমরের সীগা এবং রাসূলুল্লাহ (স) আমলের মধ্যে ترادف হওয়া প্রমাণিত হলো না।

এরপর মাতিন (র)এর উক্তি لازمة এর উদ্দেশ্য যদি আ'ম হয় অর্থাৎ আমরের সীগা لازم عام হবে আর ওয়াজিব হওয়াটা ملزوم হবে। তাহলে এর দ্বারাও ترادف হওয়া প্রমাণিত হয় না। কারণ ملزوم - لازم عام ছাড়া পাওয়া যায়। কিন্তু ملزوم কখনো لازم عام ছাড়া পাওয়া যায় না। যেমন حيوان হলো মানুষের জন্য لازم عام সুতরাং মানুষ ছাড়াও حيوان পাওয়া যাওয়া সম্ভব। কিন্তু মানুষ حيوان ছাড়া পাওয়া যাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং وجوب যা ملزوم তা لازم عام ছাড়া অর্থাৎ আমরের সীগা ছাড়া পাওয়া যাবে না। যদিও সীগাটা لازم عام হওয়ার কারণে ওয়াজিব হওয়া ছাড়াই অর্থাৎ ملزوم ছাড়াই পাওয়া যেতে পারে। وجوبটা সীগা ছাড়া রাসূলুল্লাহ (স) এর আমল দ্বারা বোঝা যায় না।

সুতরাং আমরের সীগা এবং রাসূলুল্লাহ (স) এর আমল উভয়টি مرادف হওয়া প্রমাণিত হয় না। তবে এর দ্বারা মুশতারিক না হওয়া বোঝা যায় না। لازم দ্বারা যদি لازم مساوى উদ্দেশ্য হয়। অর্থাৎ সীগা হলো لازم আর ওয়াজিব হওয়া হলো ملزوم আর উভয়টির মধ্যে যদি সমতা থাকে তাহলে মুরাদিফ এবং মুশতারিক হওয়া উভয়টি ইঙ্গিতস্বরূপ (كناية) নফী হয়ে যায়। তা এভাবে যে, لازم مساوى কখনো ملزوم ছাড়া পাওয়া যায় না। আর ملزوم টা لازم مساوى ছাড়া পাওয়া যায় না। যেমন ناطق হলো মানুষের لازم مساوى অতএব তা মানুষ ছাড়া অন্য কারো মধ্যে পাওয়া যাবে না। এভাবে মানুষ ও ناطق বিহীন পাওয়া যায় না। একইভাবে وجوب আমরের সীগা বিহীন পাওয়া যাবে না। এবং আমরের সীগাও وجوب ছাড়া পাওয়া যাবে না। সুতরাং وجوب যখন আমরের সীগা ছাড়া পাওয়া যায় না। অর্থাৎ নবী করীম (স) এর আমল দ্বারা وجوب সাব্যস্ত হয় না। কাজেই مرادف হওয়ার নফী হয়ে গেলো। আর আমেরর সীগা যখন وجوب ছাড়া পাওয়া যায় না। অর্থাৎ আমরের সীগা দ্বারা কেবল ওয়াজিবই বোঝা যায়। কাজেই মুবাহ বা মুস্তাহাব ইত্যাদি হওয়া বোঝা যাবে না। এর দ্বারা আমরের সীগা মুশতারিক হওয়ারও নফী হয়ে গেলো।

মোটকথা لازم عام উদ্দেশ্যে নেয়ার ক্ষেত্রে শুধু مرادف তথা সমার্থবোধক হওয়াকে নফী করা হলো। কিন্তু মুশতারিক হওয়াকে নফী করা হলো না। আর لازم مساوى উদ্দেশ্য নেয়ার ক্ষেত্রে مرارف। হওয়া এবং মুশতারিক হওয়া উভয়টির নফী হয়ে যায়। কাজেই لازم দ্বারা لازم مساوى উদ্দেশ্য নেয়াই উত্তম।

ثُمَّ صَرَّحَ بَعْدَ ذٰلِكَ بِنَفْيِ التَّرَادُفِ قَصْدًا فَقَالَ حَتّٰى لَا يَكُوْنَ الْفِعْلُ مُوْجِبًا اى اِذَا كَانَ الْمُرَادُ مَخْصُوْصًا بِالصِّيْغَةِ لَا يَكُوْنُ فِعْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُوْجِبًا عَلَى الْاُمَّةِ مِنْ غَيْرِ مُوَاظَبَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ خِلَافًا لِبَعْضِ اَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ رح فَاِنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ فِعْلَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَيْضًا مُوْجِبٌ اِمَّا لِاَنَّهُ اَمْرٌ وَكُلُّ اَمْرٍ لِلْوُجُوْبِ وَاِمَّا لِاَنَّهُ مُشَارِكٌ لِلْاَمْرِ الْقَوْلِيِّ فِيْ حُكْمِ الْوُجُوْبِ وَهٰذَا الْخِلَافُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فِيْ كُلِّ مَالَمْ يَكُنْ سَهْوًا مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا طَبْعًا لَهُ وَلَا مَخْصُوْصًا بِهِ وَاِلَّا فَعَدَمُ كَوْنِهِ مُوْجِبًا بِالْاِتِّفَاقِ لِلْمَنْعِ عَنِ الْوِصَالِ وَخَلْعِ النِّعَالِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ حَتّٰى لَا يَكُوْنَ الْفِعْلُ مُوْجِبًا وَحُجَّةٌ لَنَا اى لِمَنْعِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَصْحَابَهُ عَنْ صَوْمِ الْوِصَالِ وَخَلْعِ النِّعَالِ رُوِيَ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاصَلَ فَوَاصَلَ اَصْحَابُهُ فَاَنْكَرَ عَلَيْهِمُ الْمُوَافَقَةَ فِيْ وِصَالِ الصَّوْمِ فَقَالَ اَيُّكُمْ مِثْلِيْ يُطْعِمُنِيْ رَبِّيْ وَيَسْقِيْنِيْ يَعْنِيْ اَنْتُمْ لَاتَسْتَطِيْعُوْنَ الصِّيَامَ مُتَوَالِيَةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَلِيْ قُوَّةٌ رُوْحَانِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ تَعَالٰى اُطْعَمُ عِنْدَهُ وَاُسْقٰى مِنْ شَرَابِ الْمَحَبَّةِ

অনুবাদ ॥ অতঃপর মুসান্নিফ (র) ইচ্ছা করেই স্পষ্টাকারে مرادف না হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, *কাজেই* فعل *(ক্রিয়া) আবশ্যক হবে না।* অর্থাৎ, যেহেতু (امرএর) উদ্দেশ্য صيغة এর সাথে খাস, সেহেতু রাসূল (স)-এর আমল বা কাজ উম্মতের জন্যে আমল ওয়াজিবকারী নয়, তবে তাঁর নিয়মিত কাজগুলো (ওয়াজিবকারী হবে)। *এটা ইমাম শাফেয়ী (র)-এর কোন কোন অনুসারীর মতের বিপরীত।* কারণ, তাঁরা বলেন রাসূল (স)-এর কাজও ওয়াজিবকারী। হয়তো এ জন্যে যে, فعلও এক প্রকার امر – আর প্রত্যেক امر ই وجوب এর জন্যে আসে। অথবা এ কারণে যে, وجوب এর হুকুমের দিক থেকে এটা امر قولی এর সাথে অংশীদার। এ মতপার্থক্য আমাদেরও তাদের মাঝে এমন সব ক্ষেত্রে যা রাসূল (স) থেকে ভুলক্রমে প্রকাশ পায়নি, অথবা তাঁর স্বভাবজাত বিষয় নয়; কিংবা তার জন্যে খাস নয়। অন্যথায় সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিবকারী হবে না।

صوم وصال *(ইফতার বিহীন একটানা রোযা রাখা) ও জুতা খুলতে নিষেধ করার কারণে।* এ উক্তিটি حَتّٰى لَا يَكُوْنَ الْفِعْلُ مُوْجِبًا এর সাথে متعلق হয়েছে। এটা আমাদের দলিল। অর্থাৎ, রাসূল (স) কর্তৃক তার সাহাবীদেরকে صوم وصال ও জুতা খোলা থেকে নিষেধ করার কারণে (فعل ওয়াজিব নয়)। বর্ণিত আছে যে, রাসূল (স) صوم وصال করেছিলেন, তাই তাঁর সাহাবীগণও صوم وصال শুরু করলেন, তখন তিনি এ ব্যাপারে তাদেরকে তাঁর অনুরূপ করাকে অপছন্দ করলেন। তিনি বললেন, তোমাদের কে আছে আমার মতো? আমার রব আমাকে খাওয়ান ও পান করান। অর্থাৎ, তোমরা একটানা দিনে ও রাতে রোযা রাখতে সক্ষম নও। কারণ, আমার আল্লাহর পক্ষ হতে আত্মিক শক্তি রয়েছে, আমাকে তাঁর পক্ষ থেকে খাওয়ানো হয় ও প্রেমের সুধা পান করানো হয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله ثم صرح بعد ذالك الخ : মুসান্নিফ (র) কেনায়া স্বরূপ اشتراك ও ترادف কে নফী করার পরে এখানে ইচ্ছা করেই স্পষ্টভাবে তা মুরাদিফ হওয়ার নফী করছেন। তিনি বলেন– ওয়াজিব হওয়া যখন আমরের সীগার সাথে খাছ হলো। কাজেই সর্বদা একই আমলের উপর অটল থাকা ছাড়া রাসূলুল্লাহ (স) এর স্বাভাবিক আমল দ্বারা ওয়াজিব প্রমাণিত হবে না।

মুসান্নিফ (র) এর ভাষ্য দ্বারা আরো জানা যায় যে, নবী করীম (স) এর আমল যদি সবসময় একই ধরনের পরিলক্ষিত হয় তাহলে তার দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হবে। অথচ একথা ঠিক নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (স) সবসময় ই'তেকাফ করেছেন। অথচ তা ওয়াজিব নয় বরং সুন্নতে মুয়াক্কাদা। হ্যা, তিনি যদি সবসময়ই একই আমল করার সাথে সাথে তা বর্জন করার ব্যাপারে তিরস্কার করেন তাহলে নিঃসন্দেহে উক্ত কাজ ওয়াজিব হওয়া সাব্যস্ত হবে। তবে এক্ষেত্রেও শুধু আমল দ্বারাই ওয়াজিব সাব্যস্ত হয় না বরং তা তরক করার ব্যাপারে তিরস্কার দ্বারাই ওয়াজিব সাব্যস্ত হবে। কেননা কোনো কাজ তরক করার দরুন তিরস্কার করা কেমন যেন উক্ত কাজ করার আদেশ বোঝায়। আর আদেশ বা আমরের দ্বারা ওয়াজিব হওয়া সাব্যস্ত হয়। সুতরাং আমল বর্জনের দরুন তিরস্কার করার দ্বারাও ওয়াজিব সাব্যস্ত হবে।

মোটকথা নবী করীম (স) এর আমল দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয় না। যদিও কিছু সংখ্যক শাফেয়ী উলামা এব্যাপারে আমাদের সাথে মতবিরোধ করেন। তারা বলেন আমরের সীগার ন্যায় রাসূলুল্লাহ (স) এর আমলও ওয়াজিব সাব্যস্তকারী। শাফেয়ী (র) এর শিষ্যগণ এ বিষয়টি প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে দুটি দলিল পেশ করেন।

১. রাসূলুল্লাহ (স) এর فعل (কাজ) ও امر। কারণ امر দু প্রকার। ১. قول ২. فعل আর প্রত্যেক امر ওয়াজিব বোঝায়। অতএব রাসূলুল্লাহ (স) এর উক্তির ন্যায় তার আমলও ওয়াজিব সাব্যস্ত করবে।

২. فعل (আমল) যদিও আমরের ভিন্ন কোনো প্রকার নয় তবে তা ওয়াজিবের অর্থ প্রকাশে আমরের ন্যায়। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (স) এর কাজও ওয়াজিব সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে আমরের ন্যায় গণ্য হবে। অতএব امر قولى তথা উক্তিগত নির্দেশের ন্যায় فعل দ্বারাও ওয়াজিব সাব্যস্ত হবে।

তবে একথাটি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, আমাদের এবং শাফেয়ীগণের মধ্যে এ মতবিরোধ সবক্ষেত্রে নয় বরং ঐ সময় যখন উক্ত কাজ রাসূলুল্লাহ (স) থেকে ভুলবশত প্রকাশিত না হবে এবং তা তার মানবিক কাজ না হবে। যেমন পানাহার করা ইত্যাদি। এবং তার সাথে খাছ না হবে। যেমন– ৪ এর অধিক স্ত্রী রাখা এবং তাহাজ্জুদ নামায। কেননা রাসূলুল্লাহ (স) থেকে কোনো কাজ ভুলবশত প্রকাশিত হলে অথবা তার মানবিক কাজ হলে বা তাঁর সাথে কোনো কাজ খাছ হলে সর্বসম্মতিক্রমে তা ওয়াজিব বোঝাবে না। এব্যাপারে হানাফী ও শাফেয়ী সকল আলিম একমত।

قوله للمنع عن الوصال الخ : এ ভাষ্য দ্বারা রাসূলুল্লাহ (স) এর فعل দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত না হওয়ার ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলিলসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। যথা–

১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) ইফতারবিহীন রাত দিন একাধারে রোজা রেখেছেন। রাসূলুল্লাহ (স) কে দেখে সাহাবীগণও এ ধরনের রোযা রাখতে শুরু করলেন। তিনি সাহাবীদেরকে এ ব্যাপারে নিষেধ করলেন। জনৈক ব্যক্তি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স) আপনি তো ইফতার গ্রহণ ছাড়াই একাধারে রোযা রাখেন। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন তোমাদের কে আছে আমার মতো? আল্লাহ তা'আলা আমাকে পানাহার করান। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমার উপর এমনভাবে তার করুণা বর্ষণ করেন যার দরুন আমি ক্ষুধা অনুভব করি না এবং পিপাসাও অনুভব করি না। আল্লাহ তা'আলা আমাকে ইবাদত করার শক্তি ও সামর্থ্য দান করেছেন। সারকথা এই যে, তোমাদের মধ্যে ইফতারবিহীন একাধারে রোযা রাখার শক্তি নেই।

كَمَا قَالَ قَائِلٌ - شِعْرٌ : وَذِكْرُكَ لِلْمُشْتَاقِ خَيْرُ شَرَابٍ * وَكُلُّ شَرَابٍ دُوْنَهُ كَسَرَابٍ وَلِهٰذَا تَرَى الْأُمَّةَ الْمُجَاهِدِيْنَ يُفْطِرُوْنَ بِشُرْبِ قَطْرَةٍ فِى أَرْبَعِيْنَاتٍ لِيَخْرُجَ عَنْ حَدِّ الْكَرَاهَةِ وَهٰذَا فِى صَوْمِ الْفَرْضِ وَالنَّفْلِ سَوَاءٌ و رُوِىَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يُصَلِّى بِاَصْحَابِهِ اِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَخَلَعُوْا نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضٰى صَلَاتَهُ قَالَ مَاحَمَلَكُمْ عَلٰى اِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ قَالُوْا رَأَيْنَاكَ اَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ قَالَ اِنَّ جِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَام اَخْبَرَنِىْ اَنَّ فِيْهِمَا قَذَرًا اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَنْظُرْ فَاِنْ رَأى فِىْ نَعْلَيْهِ قَذَرًا فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيْهِمَا ، هٰذِهِ تَمَسُّكَاتُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح - و اَمَّا الشَّافِعِىُّ رح فَقَالَ تَارَةً عَلٰى سَبِيْلِ التَّنَزُّلِ اِنَّ الْفِعْلَ لِلْوُجُوْبِ كَالْاَمْرِ لِاَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام شُغِلَ عَنْ اَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقَضَاهُنَّ مُرَتَّبَةً و قَالَ صَلُّوْا كَمَا رَاَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّىْ فَجَعَلَ مُتَابَعَةَ اَفْعَالِهِ لَازِمَةً لِاُمَّتِهِ فَاَجَابَ عَنْهُ الْمُصَنِّفُ رح بِقَوْلِهِ وَالْوُجُوْبُ اُسْتُفِيْدَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَام صَلُّوْا كَمَا رَاَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّىْ لَا بِالْفِعْلِ اِذْ لَوْ كَانَ الْفِعْلُ مُوْجِبًا لَا تَبِعُوْهُ بِمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الْفِعْلِ وَلَمْ يَحْتَاجُوْا اِلَى هٰذَا الْقَوْلِ اَصْلًا

অনুবাদ ॥ যেমন কোন কবি বলেছেন- প্রিয়তম ব্যক্তির জন্যে তোমার স্মৃতিচারণ উৎকৃষ্টতম শরবত। আর এ ছাড়া যত শরবত আছে, সবই মরীচিকা তুল্য।

এ কারণেই তুমি দেখতে পাবে, আল্লাহর সাধকগণ রোযার চিল্লা পূরণার্থে চল্লিশ দিনের মধ্যে, সামান্য কিছু পান করে ইফতার করেন নিষেধাজ্ঞার সীমারেখা হতে রেব হয়ে আসার জন্যে। আর এটা (وصال- নিষেধ হওয়া) ফরয ও নফল উভয় রোযার ক্ষেত্রে সমান। বর্ণিত আছে যে, রাসূল (স) তাঁর সাহাবীদের নিয়ে নামায পড়ছিলেন। হঠাৎ তিনি তাঁর জুতা দুটি খুলে ফেললেন, ফলে তাঁরাও তাদের জুতা খুলে ফেললেন। নামায শেষ করে, তিনি সুধালেন, জুতা খুলে ফেলতে কিসে তোমাদেরকে বাধ্য করলো? তারা বললেন, আমরা আপনার জুতা খুলতে দখে আমাদের জুতা খুলেছি। তিনি বললেন, জিবরাইল (আ) আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, জুতা দুটির মধ্যে ময়লা রয়েছে। যখন তোমাদের কেউ মসজিদে আসে, তখন সে যেন তার জুতা দেখে নেয়, যদি তাতে ময়লা দেখতে পায়, তাহলে যেন তা মুছে ফেলে এবং সেগুলো নিয়েই নামায পড়ে। এগুলো হলো ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলিল।

ইমাম শাফেয়ী (র) কখনো নমনীয় অবলম্বন করে বলেন– রাসূল (স) এর فعل ও امر এর ন্যায় وجوب বুঝায়। কেননা তিনি খন্দক যুদ্ধে ৪ ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে গেলে ধারাবাহিকভাবে তা পড়ে নেন। অতঃপর বলেন– তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখেছ তদরূপ নামায পড়। এর দ্বারা তিনি উম্মতের জন্য তার فعل কে জরুরী করলেন। মুসান্নিফ (র) এর উত্তর দিচ্ছেন যে, এখানে وجوب *সাব্যস্ত হচ্ছে* صلوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّىْ *দ্বারা, ফে'ল দ্বারা নয়।* কেননা فعل ই যদি ওয়াজিবকারী হতো তাহলে فعل দেখার দ্বারাই তারা তার অনুসরণ করতেন। এ কথার কোন জরুরত হতো না।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ রাসূলুল্লাহ (স) যেহেতু صوم وصال তথা একাধারে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। একারণে অনেক আলিম এবং সুফীব্যক্তিগণ তাদের চিল্লার মধ্যে দু'এক ফোটা পানি পান করে ইফতার গ্রহণ করেন। যাতে রোযা মাকরূহ না হয়ে যায়। ইফতারবিহীন একাধারে রোযা রাখা ফরয ও নফল উভয়ের মধ্যেই সমভাবে নিষিদ্ধ।

লক্ষ্য করার বিষয় যে, রাসূলুল্লাহ (স) নিজে صوم وصال এর উপর আমল করেছেন। কিন্তু সাহাবীগণ যখন এর উপর আমল করতে শুরু করেছেন তখন তিনি তাদেরকে নিষেধ করেছেন। অতএব রাসূলুল্লাহ (স) এর فعل যদি ওয়াজিবকারী হতো তাহলে তাঁর সুস্পষ্ট বাণী বা কথার ন্যায় فعل দ্বারাও ওয়াজিব সাব্যস্ত হতো। তিনি সাহাবীদেরকে এব্যাপারে নিষেধ করতেন না। তার এ নিষেধ করা এবং নিজে তার উপর আমল করা একথার পরিচায়ক যে, রাসূলুল্লাহ (স) এর আমল বা فعل ওয়াজিবকারী নয়।

২. দ্বিতীয় দলিল এই যে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীদেরকে নিয়ে নামায পড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি তার জুতা খুলে ফেললেন। সাহাবায়ে কেরামও নামাযের মধ্যে স্ব স্ব জুতা খুলে ফেললেন। নামায শেষ করার পর রাসূলুল্লাহ (স) বললেন– তোমরা কি কারণে তোমাদের জুতা খুলে ফেললে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন আমরা আপনারকে জুতা খুলতে দেখে আমাদের নিজ নিজ জুতা খুলে ফেলেছি। রাসূলুল্লাহ (স) তখন বললেন জীবরাঈল (আ) আমাকে অবহিত করলো যে, জুতায় নাপাক রয়েছে। জিব্রাঈলের সংবাদের দরুন আমি আমার জুতা খুলে ফেলেছি। শোনো! তোমরা যখন মসজিদে আসবে তখন তোমরা লক্ষ্য করবে তোমাদের জুতায় কোনো নাপাক লেগে আছে কিনা? নাপাক লেগে থাকলে তা মুছে ফেলে জুতা পরিহিত অবস্থায় নামায আদায় করো।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, রাসূলুল্লাহ (স) নিজে যে আমল করেছেন সাহাবীদেরকে তা করতে নিষেধ করলেন। কাজেই রাসূলুল্লাহ (স) এর আমল যদি ওয়াজিবকারী হতো তাহলে তিনি তাঁদেরকে নিষেধ করতেন না। এর দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, রাসূলুল্লাহ (স) এর আমল দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয় না। অবশ্য এ দু' ব্যাপারে বলা যেতে পারে যে, সাওমে বেসাল রাসূলুল্লাহ (স) এর সাথে খাছ ছিলো এবং জিব্রাঈল (আ) এর সংবাদের ভিত্তিতে নামাযের মধ্যে জুতা খুলে ফেলাও রাসূলুল্লাহ (স) এর সাথে খাছ ছিলো। আর পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) এর সাথে কোনো কাজ বা আমল খাছ হয়ে থাকলে সর্বসম্মতিক্রমে তা উম্মতের জন্য ওয়াজিব সাব্যস্তকারী হয় না। কাজেই উভয় ঘটনা দ্বারা ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলিল পেশ করা ঠিক নয়।

قوله وَ أَمَّا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ : শাফেয়ী মাযহাবের কিছু সংখ্যক আলিম রাসূলুল্লাহ (স) এর আমল ওয়াজিব সাব্যস্তকারী হওয়ার ব্যাপারে দুটি দলিল উল্লেখ করে থাকেন। মুসান্নিফ (র) তার উত্তর দিচ্ছেন।

১. প্রথম দলিলের সার এই যে, রাসূলুল্লাহ (স) এর আমল যদিও সরাসরি নির্দেশ বা আমর নয় তবে তা আমরের ন্যায় ওয়াজিব সাব্যস্তকারী। কারণ যখন খন্দক যুদ্ধে মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ এবং পরিখা খননে রত থাকার কারণে তাঁর ৪ ওয়াক্ত নামায (যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা) ফউত হয়ে গিয়েছিলো। এরপর তিনি ক্রমধারা মোতাবেক ৪ ওয়াক্ত নামাযের কাযা আদায় করেছিলেন। এবং সাহাবীগণকে বলেছিলেন তোমরাও এভাবে নামায কাযা হয়ে গেলে তা আদায় করবে যেভাবে আমাকে আদায় করতে দেখলে। অর্থাৎ কাযা নামাযের মধ্যেও তারতীবের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। দেখুন! নবী করীম (স) এ কথার দ্বারা উম্মতের জন্য তাঁর আমলের অনুসরণকে জরুরি সাব্যস্ত করলেন। অতএব নবী করীম (স) এর আমল যদি ওয়াজিব সাব্যস্তকারী না হতো তাহলে তিনি তাঁর অনুকরণ করার নির্দেশ দিতেন না। অতএব এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাঁর আমলও ওয়াজিব সাব্যস্তকারী।

উত্তর : মুসান্নিফ (র) এর উত্তরে বলেন যে, কাযা নামাযসমূহের মধ্যে তারতীব ওয়াজিব হওয়া হুজুর (স) এর আমল দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি। বরং তাঁর নির্দেশ صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা তাঁর আমল যদি ওয়াজিব সাব্যস্তকারী হতো তাহলে তিনি সাহাবায়ে কেরামকে তাঁর অনুসরণ করার নির্দেশ দিতেন না। বরং সাহাবায়ে কেরাম এমনিতেই তা বুঝতে পারতেন। কাজেই প্রমাণিত হলো যে, রাসূলুল্লাহ (স) এর আমল ওয়াজিব সাব্যস্তকারী নয়। বরং তাঁর নির্দেশেই وجوب সাব্যস্ত হয়।

وَقَالَ تَارَةً عَلَى سَبِيْلِ التَّرَقِّيْ إِنَّ الْفِعْلَ قِسْمٌ مِّنَ الْأَمْرِ لِأَنَّ الْأَمْرَ نَوْعَانِ - قَوْلٌ وَفِعْلٌ لِأَنَّهُ أَطْلَقَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَفْظَ الْأَمْرِ عَلَى الْفِعْلِ فِيْ قَوْلِهِ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ اى فِعْلُهُ لِأَنَّ الْقَوْلَ لَا يُوْصَفُ بِالرَّشِيْدِ وَإِنَّمَا يُوْصَفُ بِالسَّدِيْدِ فَاجَابَ الْمُصَنِّفُ رح عنه بِقَوْلِهِ وَسُمِّيَ الْفِعْلُ بِهِ لِأَنَّهُ سَبَبُهُ اى سُمِّيَ الْفِعْلُ بِلَفْظِ الْأَمْرِ لِأَنَّ الْأَمْرَ سَبَبٌ لِّلْفِعْلِ فَيَكُوْنُ مِنْ بَابِ الْمَجَازِ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي الْحَقِيْقَةِ -

অনুবাদ ॥ আবার কখনো তিনি অনমনীয়তার পন্থায় বলেন, فعلও এক প্রকার امر - কারণ امر দুপ্রকার- قول এবং فعل - কেননা আল্লাহ তা'আলা امر কে فعل এর অর্থে ব্যবহার করেছেন। যেমন- তাঁর বাণী وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ এর মধ্যে امر অর্থ তার فعل বা কাজ। কারণ قول কখনো رشيد শব্দ দ্বারা বিশেষিত হয় না; বরং سديد এর দ্বারা বিশেষিত হয়।গ্রন্থকার এর জবাবে বলেছেন যে, ***فعل কে এভাবে امر নাম দেয়া হয়েছে যে, তা فعل এর سبب তথা কারণ।*** অর্থাৎ, فعل কে امر শব্দের মাধ্যমে নামকরণ করা হয়েছে এ জন্যে যে, امر হলো فعل এর سبب আর এটা مجازی বিষয়। আর আমাদের আলোচনা চলছে حقيقة নিয়ে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ ২. قوله وقال تارة على الخ : শাফেয়ী (র) এর কোনো কোনো শিষ্যের দ্বিতীয় দলিলের সার এই যে, امر দু প্রকার। ১. قولى উক্তিগত, ২. فعلى আমলগত। কেমন যেন তাঁর আমলও আমর বা নির্দেশ। আর আমর ওয়াজিবের জন্য ব্যবহৃত হয়। অতএব তার আমলও ওয়াজিব সাব্যস্ত করবে। আর কাজ বা আমল আমর হওয়ার দলিল এই যে, আল্লাহ তা'আলা وما مرفرعون برشيد এর মধ্যে কাজের উপরও امر শব্দ প্রয়োগ করেছেন। অর্থ এই দাঁড়ালো যে, ফেরাউনের কাজ বা আমর সঠিক ছিলো না। আয়াতের মধ্যে امرকে رشيد গুণে গুণান্বিত করা হয়েছে। অথচ امر বা কথা رشد গুণে গুণান্বিত হয় না। বরং তা سديد গুণে গুণান্বিত হয়। অবশ্য فعل رشيد গুণে গুণান্বিত হয়। অতএব আয়াতে رشيد শব্দটি امر দ্বারা কাজ উদ্দেশ্য হওয়া বোঝায়। এর দ্বারা বোঝা গেলো যে, فعل আমরের একটি প্রকার। আর আমর ওয়াজিবের জন্যে ব্যবহৃত হয়। কাজেই فعل ওয়াজিব সাব্যস্ত করবে।

দলিলের উত্তর : আয়াতে امر দ্বারা কাজ উদ্দেশ্য। আর কাজকে আমর শব্দ দ্বারা এ জন্য প্রকাশ করা হয়েছে যে, আমরই কাজের কারণ হয়। কেমন যেন سبب বলে مسبب উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। আর এমনটা জায়েযও বটে। সুতরাং এটা মাজাযের অন্তর্ভুক্ত হলো। আর এখানে আলোচনা হলো- হাকীকত সম্পর্কে। এ কারণে এ আয়াত দ্বারা দলিল পেশ করা গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় উত্তর : আমরা একথা স্বীকার করি না যে, আয়াতে আমর দ্বারা কাজ উদ্দেশ্য বরং তা দ্বারা তাঁর কর্ম-পদ্ধতি বা তরিকা সঠিক না হওয়া উদ্দেশ্য। অথবা আমর দ্বারা কথা উদ্দেশ্য। পূর্বের فَاتَّبَعُوْا أَمْرَ فِرْعَوْنَ বাক্য দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, মানুষেরা ফেরাউনের কথার আনুগত্য করলো যা সে নির্দেশ দিয়েছিলো। অথচ ফেরাউনের নির্দেশ দেয়া সঠিক ছিলো না। কাজেই কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হয় না। তবে এর উপর একটি প্রশ্ন জাগে যে, قول শব্দ رشيد গুণে গুণান্বিত হয় না। অথচ এখানে তেমনটি হচ্ছে।

এর উত্তর এই যে, এটা وَصْفُ الشَّيْءِ بِوَصْفِ صَاحِبِ الشَّيْءِ এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ কখনো বস্তুকে বস্তুর মালিকের গুণে গুণান্বিত করা হয়। যেমন عَذَابٌ أَلِيْمٌ এর মধ্যে عذاب কে اليم গুণে গুণান্বিত করা হয়েছে। অথচ اليم আযাবপ্রাপ্ত ব্যক্তির গুণ। এভাবে আয়াতে امر কে رشيد এর সিফাত বানানো হয়েছে। অথচ তা কথা নয় বরং কথকের গুণ হয়ে থাকে।

وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ نَفْيِ التَّرَادُفِ قَصْدًا شَرَعَ فِيْ نَفْيِ الْاِشْتِرَاكِ قَصْدًا فقال ومُوجَبُه الْوُجُوْبُ لَا النَّدْبُ وَالْاِبَاحَةُ وَالتَّوَقُّفُ يَعْنِي اَنَّ مُوْجَبَ الْاَمْرِ الْوُجُوْبُ فقط عِنْدَ الْعَامَّةِ لا النَّدْبُ كما ذَهَبَ اليه بعضٌ ولا الْاِبَاحَة كما ذَهَبَ اليه بعضٌ ولا التَّوَقُّفُ كما ذهب اليه بعضٌ ولا الْاِشْتِرَاكُ لفظًا او معنًى بَيْنَ الثَّلٰثَةِ او الْاِثْنَيْنِ كما ذَهَبَ اليه اٰخَرُوْنَ ولم يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ رح لِاَنَّهٗ يُفْهَمُ مِمَّا ذَكَرَه اِلْتِزَامًا فَاَهْلُ النَّدْبِ يَقُوْلُوْنَ الْاَمْرُ لِلطَّلَبِ فلا بُدَّ ان يكونَ جانبُ الفعلِ فيه راجحًا حتّى يُطْلَبَ واَدْنَاه النَّدْبُ وهٰذا كقوله تعالى فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا واَهْلُ الْاِبَاحَةِ يقولون اِنَّ معنى الطَّلَبِ اَنْ يَكُوْنَ مَاذُوْنًا فيه ولا يَكُوْنَ حَرَامًا واَدْنَاهُ هُوَ الْاِبَاحَةُ وهٰذا كقوله تعالى فَاصْطَادُوْا والْمُتَوَقِّفُوْنَ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ الامْرَ يُسْتَعْمَلُ لِسِتَّةَ عَشَرَ معنًى كالْوُجُوْبِ والاباحةِ والنَّدْبِ والتَّهْدِيْدِ والتَّعْجِيْزِ وَالْاِرْشَادِ والتَّسْخِيْرِ وغَيْرِ ذٰلِكَ فما لم تَقُمْ قَرِيْنَةٌ عَلٰى اَحَدِهَا لم يُعْمَلْ بِه فَيَجِبُ التَّوَقُّفُ حتّى يتعيَّنَ الْمُرَادُ وعِنْدَنَا الْوُجُوْبُ حقيقةُ الامرِ فَيُحْمَلُ عليه مُطْلَقًا ما لم تَقُمْ قَرِيْنَةٌ خِلَافَه واذا قَامَتْ قَرِيْنَةٌ يُحْمَلُ عليه عَلٰى حَسْبِ الْمَقَامِ -

অনুবাদ ॥ মুসান্নিফ (র) উদ্দেশ্যগতভাবে امر টি مرادف না হওয়ার বিষয় থেকে অবসর হয়ে তিনি উদ্দেশ্যগতভাবে نفى اشتراك (مشترك না হওয়ার বিষয়) এর আলোচনা শুরু করেছেন। এ মর্মে তিনি বলেন, *امر এর কাঙ্ক্ষিত বিষয় হলো وجوب (ওয়াজিব হওয়া) ندب (মুস্তাহাব), إباحة (বৈধতা প্রদান) অথবা توقف (নিরবতা অবলম্বন) নয়।* অর্থাৎ, অধিকাংশ ফিক্‌হবিদের মতে, امر এর কাঙ্ক্ষিত বিষয় হলো وجوب বা আবশ্যকীয় হওয়া। এর হুকুম ندب নয়, যেমন- কারো কারো অভিমত এবং اباحة ও নয়। যেমনটা কেউ কেউ মত দিয়েছেন। আবার নিরবতা অবলম্বনও নয়। যেমনটা কারো কারো অভিমত। শব্দগত কিংবা অর্থগতভাবে (উপরোক্ত) দুটি কিংবা তিনটির মধ্যে مشترك ও নয়, যেমনটা অন্যান্যরা মত প্রকাশ করেছেন। তবে গ্রন্থকার এটা (مشترك হওয়ার বিষয়টি) উল্লেখ করেননি। কারণ, প্রাসঙ্গিকভাবে তিনি যা উল্লেখ করেছেন, তা থেকে বোঝা যায়। ندب এর প্রবক্তাগণ বলেন, امر হচ্ছে طلب এর জন্যে। সুতরাং এক্ষেত্রে কাজ করার দিকটি প্রাধান্য পাবে, যেন طلب করা যায়। এর সর্বনিম্ন পর্যায় হলো ندب তথা মুস্তাহাব হওয়া। এটা আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর সাথে সামঞ্জস্যশীল فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا (তোমরা তাদের সাথে লিখিত চুক্তি করতে পার যদি কল্যাণ মনে কর।) আর اباحة এর প্রবক্তাগণ বলেন- طلب এর অর্থ হচ্ছে- কাজটি অনুমোদিত হওয়া এবং হারাম না হওয়া। এর কাছকাছি বিষয় হলো- اباحة আর এটা আল্লাহর এ বাণীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। فَاصْطَادُوْا (তোমরা শিকার করো)। توقف এর প্রবক্তাদের বক্তব্য এই যে, امر ১৬টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- وجوب (আবশ্যকতা) اباحة (বৈধতা) ندب (ভাল মনে করা) تهديد (ধমকানো) تعجيز (অক্ষম করা) ارشاد (পথ দেখানো) تسخير (উপহাস করা) ইত্যাদি। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন একটির আলামত পাওয়া না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত امر এর ওপর আমল করা হবে না। সুতরাং নিরবতা অবলম্বন করা আবশ্যক, যতক্ষণ না উদ্দেশ্য স্থির হবে। আর আমাদের মতে, وجوب হলো امر এর প্রকৃত অর্থ। তাই স্বাভাবিক অবস্থায় এ অর্থেই ব্যবহৃত হবে; যতক্ষণ পর্যন্ত বিপরীত কোন অর্থের আলামত পাওয়া না যাবে। অন্য কোন অর্থের আলামত পাওয়া গেলে অবস্থানুসারে ব্যবহার করতে হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ نَفْيِ الخ : মুসান্নিফ (র) পূর্বে আমর ও ফে'লের মধ্যে مرادف হওয়াকে অস্বীকার করেছিলেন; এখানে তিনি ওয়াজিব হওয়া না হওয়ার মধ্যে মুশতারিক হওয়াকে স্ব-ইচ্ছায় প্রত্যাখ্যান করছেন। তবে এর পূর্বে কয়েকটি বিষয় অবহিত হওয়া জরুরি। প্রথম হলো– وجوب، ندب ও اباحت এর পরিচয়।

১. وجوب **এর সংজ্ঞা :** কোনো কাজ জায়েয হওয়া এবং তা পরিহার করা হারাম হওয়াকে وجوب বলে। অর্থাৎ কোনো কাজ যদি জায়েয হয় এবং তা তরক করা হরাম হয় তাহলে উক্ত কাজটি ওয়াজিব হয়।

ندب : কাজ করা এবং না করা যদি উভয়টি জায়েয হয় তবে করাটা উত্তম এবং না করাটা অনুত্তম হয় তাহলে তাকে مندوب বা মুস্তাহাব বলে।

اباحت : কোনো কাজ করা না করা উভয়ই জায়েয হয়; আর কোনোটির প্রাধান্য না থাকে তাহলে তাকে মুবাহ বলে।

২. اشتراك তথা অংশীদারিত্ব দু প্রকার। ১. اشتراك لفظى ২. اشتراك معنوى

اشتراك لفظى : একই শব্দ বিভিন্ন অর্থের জন্য ভিন্ন ভিন্ন গঠন করা হলে তাকে اِشْتَراكِ لفظى বলে। যেমন عين শব্দ চোখ, স্বর্ণ, ইত্যাদি অর্থের জন্যে ভিন্ন ভিন্নরূপে গঠিত হয়েছে।

اشتراك معنوى : কোনো শব্দ এক কুল্লি ও বিভিন্ন আফরাদ বোঝানোর জন্য গঠিত হলে তাকে اشتراك معنوى বলে। যেমন মানুষ বাকশক্তি সম্পন্ন প্রাণী বোঝানের জন্য গঠিত। এর অনেক আফরাদ বা একক রয়েছে।

৩. موجب ও مقتضى (দাবি বা চাহিদা) حكم তিনোটি সমার্থবোধক শব্দ।

মূল মাসআলা : আমরের موجب তথা বিধানের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ১. কারো মতে আমরের বিধান হলো ندب তথা মুস্তাহাব হওয়া। ২. কারো মতে মুবাহ হওয়া। ৩. কারো মতে توقف তথা আমল থেকে বিরত থাকা। ৪. কারো মতে وجوب ও ندب এর মধ্যে শাব্দিক বিচারে মুশতারিক। ৫. কারো মতে অর্থের বিচারে মুশতারিক অর্থাৎ আমর কোনো কাজ তলব করার জন্য গঠিত। চাই তা ওয়াজিবরূপে হোক বা মুস্তাহাবরূপে। ৬. কারো মতে وجوب ও اباحت، ندب এর মধ্যে শাব্দিক বিচারে মুশতারিক। ৭. কারো মতে তিনোটির মধ্যে অর্থের বিচারে মুশতারিক; অর্থাৎ আমর অনুমতি বোঝানোর জান্য গঠিত। আর উক্ত তিনো ক্ষেত্রে অনুমতি বোঝা যায়। ৮. হানাফীগণের মতে আমর কেবল ওয়াজিব বোঝানোর জন্য গঠিত। এর মধ্যে মুস্তাহাব, মুবাহ ইত্যাদি নেই।

قوله وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ الخ : দ্বারা মুসান্নিফ (র) একটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। প্রশ্ন এই যে, মানার গ্রন্থকার যেভাবে ندب – اباحت ও توقف কে নফী করেছেন তদ্রূপ اشتراك তথা মুশতারিক হওয়াকে নফী করেননি কেন?

উত্তর : এর উত্তর এই যে, তা মাতিন (র) এর পূর্বের আলোচনার দ্বারা এক পর্যায়ে এটা বোঝা যায়। কেননা পূর্বে তিনি আমর দ্বারা মুস্তাহাব ও মুবাহ্ হওয়াকে নফী করেছেন। অতএব বোঝা গেলো যে, আমর ঐ সকল অর্থে মুশতারিক নয়। এভাবে তিনি যখন আমর কেবল ওয়াজিব সাব্যস্তকারী বলেছেন তার দ্বারা বোঝা গিয়েছে যে, অর্থের দিক দিয়েও ২-৩ অর্থে মুশতারিক নয়। কারণ ওয়াজিব হওয়া এবং মুস্তাহাব হওয়ার মাঝে মুশতারিক হওয়ার ক্ষেত্রে আমরের বিধান হবে কাজ তলব করা। আর وجوب، ندب اباحت এর মধ্যে অর্থের দিক দিয়ে মুশতারিক হওয়ার ক্ষেত্রে আমরের موجب বা বিধান হবে اذن তথা অনুমতি দান করা।

যারা বলে থাকেন আমরের বিধান হলো اباحت (মুস্তাহাব হওয়া) তাদের দলিল : আমর কোনো কাজ তলবের জন্যে আসে। আর কোনো কাজ তলব করার জন্য কাজের অস্তিত্ব হওয়া প্রাধান্য পায়। যার দ্বারা তা তলব করা সম্ভব হয়। আর প্রাধান্য পাওয়ার সর্বনিম্ন স্তর হলো মুস্তাহাব হওয়া। কারণ মুবাহর মধ্যে উভয় দিক সমান থাকে। ওয়াজিবের মধ্যে কাজ বর্জন করা নিষিদ্ধ ও হারাম হয়ে থাকে। আর নিষিদ্ধ বা হারাম হওয়াটা প্রাধান্য পাওয়ার উপরের স্তরের।

অতএব প্রাধান্য পাওয়ার সর্বনিম্ন স্তর (মুস্তাহাব হওয়া) আমরের বিধান সাব্যস্ত হবে। একথার স্বপক্ষে আল্লাহ তাআলার বাণী وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ পেশ করাতে পারে। অর্থ : যে সকল লোকেরা তাদের দাস-দাসীর সাথে আকদে কিতাবাত করার ইচ্ছুক হয় তোমরা যদি তাদের মধ্যে কোনো মঙ্গল অনুভব করো অর্থাৎ মাল আদায় করার সক্ষমতা দেখ তাহলে তাদেরকে মুকাতাব বানিয়ে দাও"। এই আয়াতে মুকাতাব করার বিষয়টি মুস্তাহাবের পর্যায়ে। অর্থাৎ জরুরি নয়। কাজেই বোঝা গেলো যে, আমরের বিধান হলো ندب বা মুস্তাহাব হওয়া।

قوله وَاَهْلُ الْاِبَاحَةِ الخ : **আমরের বিধান اباحت তথা মুবাহ হওয়ার প্রবক্তাদের দলিল :** আমরের অর্থ হলো তলব করা। আর তলবের অর্থ হলো উক্ত কাজের অনুমোদন থাকা এবং তা হারাম না হওয়া। এর সর্বনিম্ন স্তর হলো মুবাহ হওয়া। কারণ এক্ষেত্রে কাজের অনুমোদন এবং তা নিষিদ্ধ ও হারাম না হওয়া বোঝায়। কাজেই বোঝা গেলো যে, আমরের বিধান হলো মুবাহ হওয়া। নিম্নের আয়াতে এর প্রমাণ মিলে–

وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا অর্থাৎ যখন তোমরা এহরাম থেকে বের হও তখন শিকার করো। এ কথা স্বীকৃত যে, শিকার করা ওয়াজিব বা মুস্তাহাব নয় বরং মুবাহ।

আমরের বিধান توقف প্রবক্তাদের দলিল : আমর এর সীগা ১৬ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা–

১. وجوب যেমন اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ

২. اباحت যেমন اِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا

৩. ندب যেমন فَكَاتِبُوْهُمْ

৪. تهديد (কাউকে রাগ ও ক্রোধভরে সম্বোধন করা।) যেমন اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ

৫. تعجيز সম্বোধিত ব্যক্তিকে কোনো কাজের ব্যাপারে অক্ষম প্রকাশ করা। যেমন فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ

৬. ارشاد (পার্থিক কল্যাণের লক্ষ্যে কোনো কাজের পথ প্রদর্শন করা।) যেমন وَاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ

৭. تسخير যেমন كونوا قردة خاسئين ৮. امتنان (দয়া প্রদর্শন করা।) যেমন كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ

৯. اكرام যেমন اُدْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ اٰمِنِيْنَ

১০. اهانت যেমন فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا

১১. تسوية (দুই বস্তুর মাঝে সমতা প্রকাশ করা।) যেমন اِصْبِرُوْا اَوْلَا تَصْبِرُوْا

১২. دعا যেমন اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ

১৩. تمنى যেমন يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ (হে মালেক! কতই ভালো হতো যদি তোমার প্রতিপালক আমাদের বিষয়টি শেষ করে দিতেন।

১৪. احتقار (সম্বোধিত ব্যক্তিকে হেয়প্রতিপন্ন করা।) যেমন মূসা (আ) এর উক্তি ফেরাউনের জাদুকরদেরকে হেয় করার উদ্দেশ্যে اَلْقُوْا مَا اَنْتُمْ مُلْقُوْنَ

১৫. تكوين কোনো বস্তুকে নাস্তি থেকে অস্তিত্বে আনা। যেমন كن

১৬. تاديب যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ (স) এর উক্তি كُلْ مِمَّا يَلِيْكَ বর্ণিত রয়েছে। তোমার নিকট থেকে খাও।

মোটকথা امر যেহেতু ১৬ অর্থে ব্যবহৃত হয় কাজেই কোনো এক অর্থের ব্যাপারে দলিল প্রমাণ ছাড়া তার উপর আমল করা সম্ভব নয়। সুতরাং বিরত থাকাই বাঞ্ছনীয়। মুসান্নিফ (র) বলেন আমাদের মতে আমরের হাকীকি অর্থ হলো ওয়াজিব হওয়া। অতএব মুতলাক আমর হলে তা দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হবে। তবে ওয়াজিব হওয়ার বিপরীতে কোনো দলিল থাকলে তখন সে অনুযায়ী অর্থ গৃহীত হবে।

سَوَاءٌ كَانَ بَعْدَ الْحَظْرِ اَوْقَبْلَهُ متعلق بقوله وموجبه الْوُجُوبُ وَرَدٌّ على مَنْ قَالَ اِنَّ الْاَمْرَ بَعْدَ الْحَظْرِ لِلْاِبَاحَةِ وقبله للوجوب على حسب ما يقتضيه الْعَقْلُ وَالْعَادَةُ كقوله تعالى وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ونحن نقول اِنَّ الْوُجُوْبَ بَعْدَ الْحَظْرِ اَيْضًا مستعمل في القران كقوله تعالى فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَالْاِبَاحَةُ فِي قوله تعالى وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا لَمْ يُفْهَمْ من الْاَمْرِ بل من قوله تعالى وَاُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمِنْ اَنَّ الامر بالاصطياد اِنَّمَا وَقَعَ مِنَّةً ونفعا للعباد واذا كان فرضا فيكون حرجا عليهم فينبغي ان يكون الْاَمْرُ عِنْدَ الْاِطْلَاقِ لِلْوُجُوْبِ وانما يحمل على غيره بالقرائن والمجاز -

ثم شرع فِيْ بَيَانِ دلائل الوجوب فقال لِانْتِفَاءِ الْخِيَرَةِ عَنِ الْمَأْمُوْرِ بِالْاَمْرِ بِالنَّصِّ اى اِنَّمَا قُلْنَا اِنَّ مُوْجَبَهُ الْوُجُوْبُ لِانْتِفَاءِ الْاِخْتِيَارِ عَنِ الْمَأْمُوْرِيْنَ الْمُكَلَّفِيْنَ بِالْاَمْرِ بِالنَّصِّ وهو قوله تعالى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ

অনুবাদ ॥ *চাই তা নিষেধাজ্ঞার পরে হোক কিংবা আগে।* একথাটি وموجبه الوجوب এর সাথে যুক্ত। এটা তাদের বক্তব্যের জবাব, যারা বলেন যে, নিষেধাজ্ঞার পরে امر টি اباحة এর জন্যে এবং নিষেধাজ্ঞার পূর্বে وجوب এর জন্যে হবে। যা আকল ও স্বাভাবিক অবস্থার চাহিদানুসারে হবে। যেমন- আল্লাহ তা'আলার বাণী وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا অর্থাৎ, আর যখন তোমরা হালাল হও তখন শিকার কর। (এখানে اِصْطَادُوْا আমরটি মুবাহ অর্থে ব্যবহৃত) আমরা বলি যে, নিষেধাজ্ঞার পরেও কুরআনে امر টি وجوب এর জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, আল্লাহর বাণী فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ (যখন হারাম মাসসমূহ চলে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে, হত্যা করবে।) আর আল্লাহর বাণী- وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا এর মধ্যে اباحة এর বিষয়টি امر থেকে বোঝা যায় নি; বরং আল্লাহর বাণী اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ থেকে বোঝা যাচ্ছে। এটা এ থেকেও বোঝা যায় যে, শিকারের বিষয়ে নির্দেশ প্রদান হলো- বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ ও তাদের উপকারের জন্যে। যদি তা ফরয করা হয় তাহলে তাদের ওপর কঠোরতা আরোপ হয়ে যাবে। সুতরাং সাধারণ অবস্থায় امر টি وجوب এর জন্যে হবে। আর আলামতের ভিত্তিতে অন্যান্য অর্থে ব্যবহৃত হবে রূপকভাবে।

মুসান্নিফ (র) وجوب এর দলিলসমূহ বর্ণনা শুরু করে বলেন *نص এর মাধ্যমে বর্ণিত امر দ্বারা আদিষ্ট ব্যক্তির ইখতিয়ার বাতিল করে দেয়ার কারণে,* অর্থাৎ, আমরা বলি যে, امر এর হুকুম হলো, وجوب - এটা এ জন্যে যে, শরীআতের আদেশপ্রাপ্ত (মুকাল্লাফ) ব্যক্তিদের ইখতিয়ার نص এ বর্ণিত امر এর মাধ্যম বাতিল করে দেয়া হয়েছে। আর তা হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ (মু'মিন নারী-পুরুষদের কোন অধিকার নেই, যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন امر দ্বারা সিদ্ধান্ত দেবেন যে, তারা তাদের امر এর বিষয়ে ইখতিয়ার প্রয়োগ করবে।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله سَوَاءٌ كَانَ بَعْدَ الْحَظْرِ الخ : এই ইবারতে ঐ সকল ব্যক্তিদের অভিমত খণ্ডন করা হয়েছে যারা বলে থাকেন যে, আমর দ্বারা مانعت তথা নিষিদ্ধ হওয়ার পর মুবাহ হওয়া বোঝায়। আর নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে তা ওয়াজিব সাব্যস্ত করে। যেমন বুদ্ধি বিবেকের দাবি।

দলিল : এ ব্যাপারে তারা وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا আয়াত দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন। কারণ শিকার করা হালাল ও মুবাহ। কিন্তু ইহরামের কারণে তা হারাম ও নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো। সুতরাং ইহরামমুক্ত হওয়ার পরে আল্লাহ তা'আলা যখন فَاصْطَادُوْا নির্দেশ করেছেন। তখন এর উদ্দেশ্য এই যে, শিকার হারাম হওয়ার কারণ যেহেতু শেষ হয়ে গেছে কাজেই মূল অবস্থার উপর বিধান প্রত্যাবর্তন করবে এবং ইহরামমুক্ত হওয়ার পরে শিকার করা মুবাহ ও হালাল হবে। অতএব প্রমাণিত হলো যে, আমরের বিধান হলো নিষিদ্ধতার পর তা মুবাহ হওয়া।

হানাফীদের উত্তর : এ ব্যাপারে আমরা বলে থাকি যে, আমর যেভাবে নিষিদ্ধতার পূর্বে ওয়াজিবের জন্য আসে। তদ্রূপ নিষিদ্ধতার পরেও ওয়াজিবের জন্য আসে। নিষিদ্ধতার পরে ওয়াজিব হওয়ার জন্য আমরের ব্যবহার কোরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ "যখন হারাম মাসসমূহ অতিবাহিত হয় তখন মুশরিকদেরকে হত্যা কর যেখানেই তাদেরকে পাও"। হারাম মাস হলো রজব, যীকা'দা, যিলজিজ্জা ও মুহাররম। এই ৪ মাসে যুদ্ধ করা নিষেধ। এই ৪ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরে নিষিদ্ধতা উঠে যায়। এ কারণে فَاقْتُلُوا দ্বারা যুদ্ধ করাকে ওয়াজিব করা হয়েছে। অতএব প্রমাণিত হলো যে, আমর দ্বারা নিষিদ্ধতার পরে ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হয়।

وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا **আয়াতের উত্তর :** শিকার করা মুবাহ হওয়া আমরের সীগা দ্বারা বোঝা যায় না। বরং তা ভিন্ন قرينه দ্বারা বোঝা যায়। এখানে قرينة لفظية ও عقلية উভয়টি বিদ্যমান রয়েছে। قرينةُ لفظية এই যে, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ তোমাদের জন্য পবিত্রবস্তুসমূহ হালাল করা হয়েছে। পবিত্র বস্তুর মধ্য থেকে শিকার করাও একটি। অতএব শিকার করাও হালাল হয়েছে। আর হালাল শব্দ মুবাহ হওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। ওয়াজিব বোঝানোর জন্য নয়। সুতরাং فَاصْطَادُوْا দ্বারা শিকার করা মুবাহ হওয়া প্রতীয়মান হয়।

قرينةُ عقلية এই যে, শিকার করার নির্দেশ উল্লেখিত আয়াতে কেবল আল্লাহর করুণা ও বান্দাদের উপকারের লক্ষ্যে। আর তা মুবাহ হওয়ার মাধ্যমেই সম্ভব। ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। কারণ ইহরামমুক্ত হওয়ার পরপরই যদি শিকার করা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয় তাহলে মানুষ বিপদে পড়ে যেতো। অথচ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বিপদে ফেলতে চান না। অতএব উপকার সাধনের দাবি এই যে, শিকার করা ওয়াজিব না হয়ে মুবাহ হোক।

মোটকথা উত্তম এই যে, امر যদি মুতলাক হয় তাহলে তা দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হবে। আর যদি অন্য কোনো অর্থের ব্যাপারে বিশেষ কোনো দলিল বা আলামত থাকে তখন উক্ত অর্থ গৃহীত হবে।

قوله ثُمَّ شَرَعَ فِيْ بَيَانِ دَلَائِلِ الْوُجُوْبِ الخ : পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, হানাফীগণের মতে আমরের বিধান হলো ওয়াজিব হওয়া। হানাফীগণ আমর এবং ফে'লের মধ্যে মুরাদিফ হওয়ার প্রবক্তা নয়। এভাবে اباحت، ندب ও وجوب ইত্যাদির মাঝে মুশতারিক হওয়ারও প্রবক্তা নয়।

মুসান্নিফ (র) এখানে আমরের বিধান ওয়াজিব হওয়ার স্বপক্ষে ভিন্ন দলিল পেশ করছেন।

১. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (স)কে নির্দেশ করার পরে নির্দেশিত কোনো কাজ এবং কাজের দায়িত্ব অর্পিত (মুকাল্লাফ) ব্যক্তি উক্ত কাজ করা না করার এখতিয়ার রাখে না। বরং তা তার উপর অপরিহার্য হয়ে যায়।

لِاَنَّ مَعْنَاهُ اِذَا حَكَمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُه بِاَمْرٍ فَلَا يَكُوْنُ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْاِخْتِيَارُ مِنْ اَمْرِهِمَا اى اِنْ شَاءُوْا قَبِلُوا الْاَمْرَ وَاِنْ شَاءُوْا لَمْ يَقْبَلُوْا بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْاِئْتِمَارُ بِاَمْرِهِمَا ولا يَكُوْنُ ذٰلِكَ اِلَّا فِى الْوَاجِبِ وقِيْلَ النَّصُّ هُو قولُه تعالٰى مَا مَنَعَكَ اَنْ لَا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ خِطَابًا بِالابليسِ اللَّعِيْنِ اى ما بَقِىَ لكَ الْاِختيارُ بَعْدَ اَنْ اَمَرْتُكَ فَلِمَ تركتَ السُّجُوْدَ - وَاسْتِحْقَاقُ الْوَعِيْدِ لِتَارِكِه عطفٌ علٰى قولِه اِنْتِفَاءِ الْخِيَرَةِ اه اَىْ اِنَّمَا قُلْنَا اِنَّ مُوْجِبَه الْوُجُوْبُ لِاسْتِحْقَاقِ الْوَعِيْدِ لِتَارِكِ الْاَمْرِ بِالنَّصِّ وهُو قولُه تعالٰى فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِه اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ اَىْ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِ الرَّسُوْلِ عليه السَّلام وَيَتْرُكُوْنَه اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ فِى الدُّنْيَا اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِى الْاٰخِرَةِ وهٰذا الْوَعِيْدُ لا يَكُوْنُ اِلَّا بِتَرْكِ الْوَاجِبِ ولٰكِنْ يَرِدُ عليهِ اَنَّهُ مَوقوفٌ علٰى ان يَّكُوْنَ هٰذا الاَمْرُ ايضًا لِلْوُجُوْبِ وهُو مَمْنُوْعٌ وانّه لَم لا يَجُوْزُ اَنْ تَكُوْنَ الْمُخَالَفَةُ علٰى وَجْهِ الاِنكارِ دُوْنَ التَّرْكِ وَالْجَوَابُ اَنَّ سِيَاقَ الْكَلَامِ دَالٌّ علٰى اَنَّ هٰذا الاَمْرَ لِلْوُجُوْبِ بِدُوْنِ اِحْتِيَاجٍ الٰى بُرْهَانٍ وَمُصَادَرَةٍ علٰى الْمَطْلُوْبِ و اَنَّ الْمُخَالَفَةَ فِى اسْتِعْمَالِهِم اِنَّمَا تُطْلَقُ علٰى تَرْكِ الْعَمَلِ بِه فَتَأَمَّلْ -

---

অনুবাদ ॥ কেননা, এর অর্থ হলো– যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল امر এর মাধ্যমে কোন নির্দেশ দেবেন, তখন মু'মিন নর-নারীর জন্যে নিজেদের ব্যাপারে কোন ইখতিয়ার থাকবে না। অর্থাৎ, ইচ্ছে হলে তারা امر টি কবুল করবে, অথবা ইচ্ছা হলে কবুল করবে না এমন নয় বরং তাদের কর্তব্য হলো আল্লাহ ও রাসূল (স)-এর আদেশ পালন করা। আর এমনটা ওয়াজিব ছাড়া অন্য কিছুতে হয় না।

আবার বলা হয়ে থাকে যে, এক্ষেত্রে نص হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী- مَا مَنَعَكَ اَنْ لَا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ (এ আয়াত) যা অভিশপ্ত ইবলিসকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে। অর্থাৎ, আমি তোমাকে আদেশ করার পর তোমার কোন এখতিয়ার অবশিষ্ট ছিল না, সুতরাং কি কারণে তুমি সাজদা পরিত্যাগ করলে?

আর امر বা আদেশ পরিত্যাগকারীর জন্যে শাস্তির হুমকি প্রযোজ্য হওয়ার কারণে'। এ ইবারতটি انتفاء الخيرة এর ওপর عطف হয়েছে। অর্থাৎ, আমরাতো বলছি যে, امر এর হুকুম হলো وجوب কারণ, نص এর মাধ্যমে امر পরিত্যাগকারীর জন্যে শাস্তির হুমকি প্রযোজ্য হয়েছে। আর তাহলো আল্লাহর বাণী فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِه اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ অর্থাৎ, 'তাদের সতর্ক হওয়া উচিত যারা রাসূলের আদেশের বিরোধিতা করে এজন্যে যে, তাদেরকে দুনিয়ায় বিপদাপদে পাবে এবং পরকালে পাবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।' অর্থাৎ যারা রাসূলের امر এর বিরোধিতা করে তা পরিত্যাগ করে, তাদের ভয় করা উচিত এ বিষয়কে যে, তাদেরকে দুনিয়ায় বিপদাপদে পাবে, আর পরকালে পাবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এ শাস্তির হুমকি ওয়াজিব পরিত্যাগ ছাড়া অন্য কিছুর জন্যে নয়। কিন্তু এর ওপর প্রশ্ন জাগে যে, এ বিষয়টি নির্ভর করছে امر টি (ليحذر) وجوب এর জন্যে হওয়ার ওপর। অথচ এটা নিষিদ্ধ (অর্থাৎ ليحذر টি وجوب এর জন্যে নয়)। আর مخالفة (বিরোধিতা) পরিত্যাগের ভিত্তিতে না হয়ে,

অস্বীকৃতির ভিত্তিতে হওয়া ঠিক নয় কেন? এর উত্তর এই যে, বাক্যের পরবর্তী অংশ নির্দেশ করছে যে, এ امر টিও وجوب এর জন্যে। ফলে কাম্য বিষয়ে কোন যুক্তি প্রমাণের প্রয়োজন নেই। আর আরবদের ব্যবহারে مخالفة বলতে আমল পরিত্যাগই বুঝায়। অতএব গভীর চিন্তা করে দেখ।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ সুতরাং আমর দ্বারা মুকাল্লাফ ব্যক্তির এখতিয়ার দূরীভূত হওয়া এবং নির্দেশিত কাজ আঞ্জাম দেয়া তার জন্য জরুরি হওয়াটা আমর দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হওয়ার প্রমাণ বহন করে। কেননা اباحت ও ندب এর ক্ষেত্রে বান্দার এখতিয়ার থেকে যায়। সে তা করতেও পারে নাও করতে পারে।

কোনো কোনো আলিম বলেন - মতনে উল্লেখিত নস দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলার বাণী مَا مَنَعَكَ أَنْ لَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ আয়াত। এ আয়াত দ্বারা এভাবে দলিল সাব্যস্ত হয় যে, আয়াতে لا অব্যয়টি অতিরিক্ত। এতে অভিশপ্ত ইবলিসকে সম্বোধন করা হয়েছে। সার এই যে, আল্লাহ তা'আলা যখন ফেরেশতামণ্ডলী এবং ইবলিসকে আদম (আ) এর সাজদার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু ইবলিস সাজদা করেনি। কাজেই ইবলিসকে তিরস্কার করে বলেছেন যে, আমার নির্দেশ সত্ত্বে সাজদা করতে তোমাকে কিসে বিরত রাখলো? অর্থাৎ তোমার সাজদা করা না করার এখতিয়ার ছিলো না। বরং সাজদা করাই জরুরি ছিলো। আর এমনটা ওয়াজিবের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। অতএব বোঝা গেলো যে, আমর দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়। তবে প্রথম আয়াত যেহেতু স্পষ্ট আকারে এখতিয়ার দূরীভূত হওয়া বোঝায়। আর দ্বিতীয় আয়াত অস্পষ্টভাবে এখতিয়ার দূরীভূত হওয়া বোঝায়। এ কারণে দ্বিতীয় আয়াতের তুলনায় প্রথম আয়াতটিই দলিলের জন্য অধিক শক্তিশালী।

قوله واستحقاق الوعيد الخ : **দ্বিতীয় দলিল :** আল্লাহ তা'আলা فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ আয়াতের মাধ্যমে আদেশ অমান্যকারীকে সাজাযোগ্য স্থির করেছেন। কেননা তিনি রাসূলুল্লাহ (স) এর আদেশ অমান্যকারী এবং অগ্রাহ্যকারীদের ব্যাপারে দুনিয়ায় ফেতনায় লিপ্ত করার এবং পরকালে শাস্তি দেয়ার ভয় দেখিয়েছেন। আর একথা সর্বস্বীকৃত যে, ওয়াজিব তরকের ক্ষেত্রেই ভীতি প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। মুবাহ ও মুস্তাহাব তরককারীকে ভীতি প্রদর্শন করা হয় না। অতএব বোঝা গেলো যে, امر দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়। আর রাসূলুল্লাহ (স) এর নির্দেশ পালন করা যদি ওয়াজিব হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালন করা আরো উত্তমরূপে ওয়াজিব হবে।

قوله وَلٰكِنْ يَّرِدُ عَلَيْهِ الخ : মাতিন (র) উল্লেখিত দলিলের উপর আরোপিত দুটি প্রশ্ন এবং তার উত্তর উল্লেখ করেছেন।

প্রথম প্রশ্ন : উল্লেখিত দলিলে مُصَادَرَة عَلَى الْمَطْلُوْب সাব্যস্ত হয়। অথচ তা নাজায়েয। مُصَادَرَة عَلَى المطلوب এর অর্থ হলো দাবিকে দলিল বানিয়ে পেশ করা। অর্থাৎ দাবি এবং দলিল এক হওয়া। উল্লেখিত দলিলে এভাবে مصادرة সাব্যস্ত হয়েছে যে, হানাফীদের দাবি হলো امر দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হওয়া। আর দলিল এই যে, فليحذر আমরের সীগাটা ওয়াজিবের জন্য অর্থাৎ আদেশ অমান্যকারীকে ভীতি প্রদর্শন করা ওয়াজিব। সুতরাং যাকে দলিল বানানো হয়েছে। অর্থাৎ فليحذر আমরের সীগা ওয়াজিবের জন্যে হওয়া কখনো এটা স্বীকৃত নয়। বরং এটা নিজেই দলিলের মুখাপেক্ষী।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : আয়াতে يخالفون শব্দ উল্লখিত হয়েছে। আর مخالفت বা বিরোধিতা আমল তরক করার ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে তদ্রূপ অস্বীকারের মাধ্যমেও হয়ে থাকে। অতএব আমরা বলে থাকি যে, আয়াতে অস্বীকারের ভঙ্গিতে বিরোধিতা করা উদ্দেশ্য। আর আয়াতে রাসূলুল্লাহ (স) এর হুকুম অস্বীকারীদের ক্ষেত্রে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। আমল বর্জনকারীদের ব্যাপারে নয়। রাসূলুল্লাহ (স) এর নির্দেশ লংঘনকারী নিশ্চিত কাফের। অতএব কেমন যেন এ ভীতি প্রদর্শন কাফিরদের ক্ষেত্রে বিবেচিত। কাজেই আমল তরককারীদের ব্যাপারে তা বিবেচেতি হবে না। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত করা যায় না যে, আমর ওয়াজিব সাব্যস্ত করে। (পরের পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

وَلِدَلَالَةِ الْاِجْمَاعِ وَالْمَعْقُوْلِ عَطْفٌ عَلٰى مَاقَبْلَه وفِىْ بَعْضِ النُّسَخِ وكَذَا دَلَالَةُ الْاِجْمَاعِ والْمَعْقُولِ يَدُلَّانِ عَلَيْه فَحٍ هُوَ جُمْلَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ مَعْطُوفَةٌ عَلٰى مَضْمُوْنِ سَابِقِهَا وحَاصِلُه اَنَّ دَلَالَةَ الْاِجْمَاعِ تَدُلُّ عَلٰى اَنّ الاَمْرَ لِلْوُجُوبِ لِاَنَّهُمْ اَجْمَعُوْا عَلٰى اَنَّ كُلَّ مَنْ اَرَادَ اَنْ يَطْلُبَ فِعْلًا مِنْ اَحَدٍ لَا يَطْلُبُ اِلَّا بِلَفْظِ الْاَمْرِ والْكَمَالُ فِى الطَّلَبِ هُوَ الْوُجُوبُ وَالْاَصْلُ نَفْىُ الْاِشْتِرَاكِ - فَتَعَيَّنَ اَنَّ مُوْجِبَه الْوُجُوْبُ وَاِنَّمَا قَالَ دَلَالَةِ الْاِجْمَاعِ لِاَنَّ نَفْسَ الْاِجْمَاعِ لَمْ يَنْعَقِدْ عَلٰى اَنَّ مُوْجِبَه الْوُجُوبُ لِاَنَّه مُخْتَلَفٌ فِيْهِ بَلْ اِنَّمَا الْاِجْمَاعُ عَلٰى شَىْءٍ يَدُلّ عَلَيْه وكَذَا الدَّلِيلُ الْمَعْقُولُ يَدُلّ عَلٰى اَنّ الْاَمْرَ لِلْوُجُوبِ وهُوَ اَنَّ تَصَارِيْفَ الْاَفْعَالِ كُلَّهَا كَالْمَاضِىْ وَالْمُسْتَقْبَلِ وَالْحَالِ دَالٌّ عَلٰى مَعْنًى مَخْصُوصٍ - فَيَنْبَغِى اَنْ يَكُوْنَ الْاَمْرُ كَذَالِكَ دَالًّا عَلٰى مَعْنَى الْوُجُوبِ ولَيْسَ هٰذَا لِاِثْبَاتِ اللُّغَةِ بِالْقِيَاسِ بَلْ لِاِثْبَاتِ كَوْنِ الْاَصْلِ عَدَمُ الْاِشْتِرَاكِ وقِيْلَ الْمَعْقُولُ هُوَ اَنّ السَّيِّدَ اِذَا اَمَرَ غُلَامَه بِفِعْلٍ ولَمْ يَفْعَلْ اِسْتَحَقَّ الْعِقَابَ فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْاَمْرُ لِلْوُجُوبِ لَمَا اسْتَحَقَّ ذٰلِكَ وقَدْ نُقِلَ فِى بَيَانِ النُّصُوصِ وَالْمَعْقُولِ وُجُوْهٌ اُخَرُ تَرَكْتُهَا لِلْاِطْنَابِ -

---

অনুবাদ ॥ *'আর* اجماع *এবং* دليل عقلى *তথা যুক্তিগত দলিলের নির্দেশনা মতেও'।* এ ইবারতটি তার পূর্বের ওপর عطف হয়েছে। তবে কোন কোন কপিতে وَكَذَا دَلَالَةُ الْاِجْمَاعِ وَالْمَعْقُولِ يَدُلَّانِ عَلَيْه রয়েছে এমতাবস্থায় একে স্বতন্ত্র বাক্য ধরা হবে, যা পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর ওপর عطف হয়েছে। সারকথা এই যে, اجماع এর নির্দেশনা প্রমাণ করে যে, امر টি وجوب এর জন্যে। কারণ, আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, যদি কোন ব্যক্তি কারো কাছ থেকে কোন কাজ তলব করে, সে امر ছাড়া অন্য কোন শব্দ দ্বারা তলব করে না। আর তলবের মধ্যে পরিপূর্ণতা হচ্ছে وجوب এবং শব্দের আছল বা মৌলিক বিষয় হলো مشترك না

(পূর্বের বাকী অংশ) **প্রথম প্রশ্নের উত্তর :** হানাফী এবং তাদের বিরোধীগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব এ ব্যাপারে যে, امر দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয় নাকি অন্য কিছু? কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই যে, امر ওয়াজিবের জন্য ব্যবহৃত হয়। যারা امر দ্বারা ওয়াজিব ছাড়া অন্য কিছু সাব্যস্ত করে তারাও একথা মানেন যে, আলামত সাপেক্ষে امر দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়। অতএব উল্লেখিত আয়াতের বাচনভঙ্গি দ্বারা বোঝা যায় যে فليحذر আমরের সীগাটি ওয়াজিবের জন্য। কারণ অপছন্দনীয় এবং ক্ষতিকর বস্তু থেকে ভীতি প্রদর্শন করা মুস্তাহাব ও মুবাহ নয় বরং ওয়াজিব। অতএব فَلْيَحْذَرْ আমরের সীগাটি ওয়াজিব বোঝানোর জন্য হওয়া কোনো দলিল বা দাবির উপর মওকুফ নয়। অতএব এর দ্বারা مُصَادَرَةٌ عَلَى الْمَطْلُوْب সাব্যস্ত হয় না।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর : مُخَالَفَتْ শব্দটি আরবদের পরিভাষায় আদেশ লংঘনের ক্ষেত্রে বলা হয়। অস্বীকারের ক্ষেত্রে নয়। কেননা مخالفت শব্দটি مُوَافَقَت শব্দের বিপরীত। আর موافقت বলা হয় নির্দেশ পালন করাকে। কাজেই موافقت যখন নির্দেশ পালন করাকে বলা হয়। তাহলে এর বিপরীতে নির্দেশ লংঘন করাকে মুখালাফাত বলা হবে। আর নির্দেশ লংঘনকে মুখালাফাত বললে আমল বর্জন করার দরুন ভীতি প্রদর্শন সাব্যস্ত হবে। আমল অস্বীকারের জন্য নয়। কাজেই প্রশ্নকারীর এ উক্তি যে, আয়াতে রাসূলুল্লাহ (স) এর আদেশ অমান্যকারীদের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে তা সঠিক নয়।

হওয়া। সুতরাং, নিশ্চিত হয়ে গেল যে, امر এর হুকুম হলো وجوب - গ্রন্থকার دلالة الاجماع বলেছেন, কারণ امر এর হুকুম وجوب এর ব্যাপারে বাস্তবে ইজমা সংঘটিত হয় নি। কেননা, এ বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। তবে এমন বিষয়ের ওপর اجماع হয়েছে যা এ কথা প্রমাণ করে (যে, امر টি وجوب এর জন্যে)।

এভাবে عقلى দলিলও নির্দেশ করে যে, امر টি وجوب এর জন্যে হোক। কারণ প্রত্যেক فعل এর রূপান্তর যেমন, ماضى، مستقبل ও حال নির্দিষ্ট অর্থ বুঝায়।

তদরূপ امر ও নির্দিষ্টভাবে وجوب বুঝানো উচিত। আর এটা قياس দ্বারা ভাষা সাব্যস্ত করার মতো নয়; বরং مشترك না হওয়া সাব্যস্ত করার জন্যে। এমনো বলা হয়েছে যে, عقلى দলিল এভাবে দেয়া যায় যে, যখন কোন মণিব তার গোলামকে কোন কাজের আদেশ করে, আর সে তা না করে, তা হলে সে শাস্তিযোগ্য হয়। امر যদি وجوب এর জন্যে না হতো, তাহলে গোলাম শাস্তিযোগ্য হতো না। এ ব্যাপারে আরো অনেক দলিল ও যুক্তি রয়েছে। বর্ণনা দীর্ঘ হবে বিধায় তা পরিত্যাগ করলাম।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ قوله وَلِدَلَالَةِ الْإِجْمَاعِ وَالْمَعْقُوْلِ الخ : امر দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে মুসান্নিফ (র) আরো দুটি দলিল উল্লেখ করেছেন। এ ইবারত উল্লেখিত لانتفاء الخيرة; অংশের উপরে মা'তুফ। কোনো কোনো নুসখায় ইবারত এমন রয়েছে وَكَذَا دَلَالَةُ الْإِجْمَاعِ وَالْمَعْقُوْلِ يَدُلَّانِ عَلَيْهِ এ নুসখা অনুযায়ী ইবারতটি ভিন্ন বাক্য হবে। আর পূর্বের বাক্য اِسْتِحْقَاقُ الْوَعِيْدِ لِتَارِكِهِ এর বিষয়বস্তুর উপর আতফ হবে। এ নুসখা অনুযায়ী পূর্বের বাক্য اِسْتِحْقَاقُ الْوَعِيْدِ لِتَارِكِهِ এর শব্দের উপর আতফ হবে না যে, وَكَذَا دَلَالَةُ الْإِجْمَاعِ, وَالْمَعْقُوْلِ يَدُلَّانِ عَلَيْهِ হলো مركب تام আর اِسْتِحْقَاقُ الْوَعِيْدِ لِتَارِكِهِ لِانْتِفَاءِ الْخِيَرَةِ এর লাম হরফে জারের অধীনে হওয়ার কারণে مركب ناقص হয়েছে। আর মুরাক্কাবে তামকে মুরাক্কাবে নাকেসের উপর আতফ করা নাজায়িয। কারণ এটা মুফরাদের হুকুমে গণ্য হয়। তবে যেহেতু اِسْتِحْقَاقُ الْوَعِيْدِ لِتَارِكِهِ এর বিষয়বস্তু হলো মুরাক্কাবে তাম। এ কারণে وَكَذَا دَلَالَةُ الْإِجْمَاعِ الخ এর তার উপর আতফ করা বিশুদ্ধ। اِسْتِحْقَاقُ الْوَعِيْدِ لِتَارِكِهِ বাক্যের বিষয়বস্তু এই যে, নির্দেশ অমান্যকারীর ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করা নস দ্বারা প্রমাণিত। আর মুরাক্কাবে তাম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুখাতাবকে পূর্ণরূপে ফায়দা পৌছানো।

মোটকথা এই ইবারতে উল্লেখিত ২ দলিলের মধ্য হতে প্রথম দলিলটি হলো دلالت اجماع এর সারকথা এই যে, আমর ওয়াজিব সাব্যস্ত করে। একথা একারণে বোঝায় যে, অভিধানবেত্তা ও পরিভাষা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের ইজমা মতে যদি কারো কোনো ব্যক্তি থেকে কোনো কাজ কামনা করতে হয় তাহলে সে আমরের সীগা ছাড়া অন্য কোনো শব্দ দ্বারা তা করতে পারে না। আর পূর্ণাঙ্গ তলব وجوب এর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। কারণ নির্দেশিত বা কাম্য কাজ তরক করার অনুমতি না থাকার ক্ষেত্রেই পূর্ণ তলব লাভ হয়। যেখানে নির্দেশিত কাজ তরক করার অনুমতি থাকে তা ওয়াজিব হতে পারে না। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, আমরের সীগা দ্বারা তলবকৃত কাজ নির্দেশ প্রাপ্ত ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হয়ে থাকে।

প্রশ্ন : যদি একথা বলা হয় যে, আমরা স্বীকার করি যে, আমর দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয় তবে আমরা একথাও বলি যে, ওয়াজিব ছাড়া মুস্তাহাব, মুবাহ ইত্যাদিও সাব্যস্ত হয়।

উত্তর : এর উত্তর এই যে, আমরা মূলত মুশতারিক হওয়াকে অস্বীকার করি। অর্থাৎ কোনো শব্দ যদি বিভিন্ন অর্থ বোঝায়। আর তার মধ্যে এমন সম্ভাবনা থাকে যে, এ শব্দটি উক্ত অর্থ সমূহের মধ্যে মুশতারিক। আর এ সম্ভাবনাও থাকে যে, সে সব অর্থের একটি হাকিকী আর অবশিষ্টগুলো মাজাযী। তাহলে উক্ত শব্দকে হাকীকাত ও মাজাযের উপর প্রয়োগ করতে হবে। মুশতারিক হওয়ার উপর প্রয়োগ করা যাবে না।

সুতরাং دلالت اجماع দ্বারা যখন বোঝা গেলো যে, আমরের সীগা দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়। আর মুশতারিক না হওয়াটা মূল। একথা স্বীকৃত। কাজেই امر দ্বারা কেবল ওয়াজিব সাব্যস্ত হওয়া প্রমাণিত হলো। যদি কোথাও বিভিন্ন আলামতের কারণে امر দ্বারা অন্যান্য অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহলে তা মাজায হবে হাকীকত নয়।

প্রশ্ন : মানার গ্রন্থকার الاجماع, না বলে دلالة الاجماع বললেন কেন?

উত্তর : امر দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কারণ এ মাসআলাটি ইমামগণের নিকট মতবিরোধপূর্ণ বরং এ ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, امر দ্বারা ওয়াজিবও সাব্যস্ত হয়। মোটকথা সরাসরি ইজমা মতে امر দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত না হওয়ার কারণে মুসান্নিফ (র) الاجماع, না বলে دلالة الاجماع বলেছেন।

امر দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হওয়ার যুক্তিগত দলিল :

সকল ফে'ল যেমন মাযী, মুস্তাকবিল, হাল ইত্যাদি খাছ অর্থ বোঝায়। মাযী অতীতকাল বোঝায়, মুস্তাকবিল ভবিষ্যতকাল বোঝায়, এবং হাল বর্তমানকাল বোঝায়। কাজেই সমস্ত ফে'ল যেহেতু খাছ অর্থ বোঝায়। আর আমরও একটি ফে'ল। কাজেই আমরও একটি খাছ অর্থ বোঝাবে। আর তা হলো وجوب (ওয়াজিব হওয়া)। কাজেই যুক্তি এবং কিয়াসের আলোকেও আমর দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হওয়া প্রমাণিত হয়।

وَلَيْسَ هٰذَا لِإِثْبَاتِ اللُّغَةِ بِالْقِيَاسِ الخ : এটা একটা প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন : امر দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হওয়া একটি শাব্দিক ব্যাপার। আর আপনি এটাকে যুক্তি ও কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত করেছেন। অতএব এর দ্বারা যুক্তির মাধ্যমে শাব্দিক অর্থ প্রমাণিত করা সাব্যস্ত হয়। অথচ কিয়াস বা যুক্তি দ্বারা ভাষা বা আভিধানিক অর্থ সাব্যস্ত করা গ্রহণযোগ্য নয়।

উত্তর : এখানে কিয়াস দ্বারা আভিধানিক অর্থ সাব্যস্ত করা হয়নি। বরং এ বিষয়টি সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, শব্দের মূল হলো মুশতারিক না হওয়া। অর্থাৎ যেভাবে সকল ফে'ল খাছ অর্থ বোঝায়। আর সেগুলো বিভিন্ন অর্থে মুশতারিক নয়। এভাবে আমরও খাছ অর্থ তথা ওয়াজিব বোঝাবে। অন্য অর্থে মুশতারিক হবে না। কাজেই এখানে কিয়াস দ্বারা ভাষা বা আভিধানিক অর্থ সাব্যস্ত করার কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হয় না।

কোনো কোনো আলিম বলেন যে, المعقول, তথা যুক্তিগত দলিলের উদ্দেশ্য এই যে, মণিব যদি স্বীয় গোলামকে কোনো কাজ করার নির্দেশ দেয় তাহলে গোলাম তা না করলে সে সাজার উপযোগী হয়। অতএব আমর যদি ওয়াজিব না বোঝাত তাহলে গোলাম সাজাযোগ্য হতো না। অতএব একথাটি দলিল বহন করে যে, আমর দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়। মুস্তাহাব বা মুবাহ সাব্যস্ত হয় না। কেননা সে ক্ষেত্রে মানুষ সাজা উপযোগী হয় না।

মুসান্নিফ (র) বলেন– আমর দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে আরো বহু আকলী ও নকলী দলিল রয়েছে। আমি দীর্ঘ হওয়ার ভয়ে এখানে তা পরিহার করেছি।

ফায়েদা : নকলী একটি দলিল এই যে, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْكَعُوْا الاٰيَة لا يركعون অর্থাৎ কাফেরদেরকে রুকু করার কথা বললে তারা রুকু করতো না। আল্লাহ তা'আলা রুকুর নির্দেশ সত্ত্বে তা লংঘন করার কারণে কাফেরদের দুর্নাম বর্ণনা করেছেন। এটা এ বিষয়ের দলিল যে, আমর দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়। কারণ মুবাহ বা মুস্তাহাব কাজ না করলে কাউকে তিরস্কার বা দুর্নাম করা হয় না।

আকলী বা যুক্তিভিত্তিক দলিল : আমর শব্দটি মুতাআদ্দী (স্বকর্ম ক্রিয়া) এর লাজিম হলো إِيْتِمَار। যেমন বলা হয় أَمَرْتُهُ فَائْتَمَرَ আমি তাকে হুকুম দিয়েছি সে তা আমলে এনেছে। যেমন– كَسَرْتُهُ فَانْكَسَرَ আমি তা ভেঙে ফেলেছি এবং তা ভেঙে গেছে। আমরের লাজিম শব্দ إِيْتِمَار। আসা একথা দাবি করে যে, আমর إِيْتِمَار। তথা তামিল ছাড়া অস্তিত্ব লাভ করে না। যেমন كسر - إِنْكِسَار ছাড়া পাওয়া যায় না। এটাও একথার স্পষ্ট দলিল যে, আমর সম্বোধিত ব্যক্তির উপর إيتمار। তথা আমল করাকে ওয়াজিব করে। অতএব প্রমাণিত হলো যে, আমর দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়।

ثُمَّ شَرَعَ الْمُصَنِّفُ رح فِى بَيَانِ اَنَّهُ اِذَا لَمْ يُرِدْ بِالْاَمْرِ الْوُجُوْبَ فَمَاذَا حُكْمُهُ فَقَالَ وَاِذَا اُرِيْدَتْ بِهِ الْاِبَاحَةُ اَوِ النَّدْبُ اَىْ اِذَا اُرِيْدَتْ بِالْاَمْرِ الْاِبَاحَةُ اَوِ النَّدْبُ وَعُدِلَ عَنِ الْوُجُوْبِ فَحِيْنَئِذٍ اُخْتُلِفَ فِيْهِ فَقِيْلَ اِنَّهُ حَقِيْقَةٌ لِاَنَّهُ بَعْضُهُ اَىْ اَنَّ الْاَمْرَ حَقِيْقَةٌ فِى الْاِبَاحَةِ وَالنَّدْبِ اَيْضًا لِاَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَعْضُ الْوُجُوْبِ وَبَعْضُ الشَّئِ يَكُوْنُ حَقِيْقَةً قَاصِرَةً لِاَنَّ الْوُجُوْبَ عِبَارَةٌ عَنْ جَوَازِ الْفِعْلِ مَعَ حُرْمَةِ التَّرْكِ وَالْاِبَاحَةُ هِىَ جَوَازُ الْفِعْلِ وَالنَّدْبُ هُوَ جَوَازُ الْفِعْلِ مَعَ رُجْحَانِهِ فَيَكُوْنُ كُلٌّ مِّنْهُمَا مُسْتَعْمَلًا فِى بَعْضِ مَعْنَى الْوُجُوْبِ وَهُوَ مَعْنَى الْحَقِيْقَةِ الْقَاصِرَةِ الَّتِىْ اُرِيْدَتْ بِلَفْظِ الْحَقِيْقَةِ وَهُوَ مُخْتَارُ فَخْرِ الْاِسْلَامِ

অনুবাদ ॥ অতঃপর মুসান্নিফ (র) আলোচনা শুরু করেছেন যে, যদি امر দ্বারা وجوب উদ্দেশ্য না হয়, তাহলে তার হুকুম কি হবে? এ ব্যাপারে, তিনি বলেন, ***যদি*** امر ***এর দ্বারা*** اباحة ***অথবা*** ندب ***উদ্দেশ্য হয়,*** অর্থাৎ যদি امر দ্বারা اباحة অথবা ندب উদ্দেশ্য নেয়া হয় এবং وجوب হতে তা পরিবর্তিত হয়ে যায়, তখন এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। ***বলা হয়েছে যে, এটা হাকীকী অর্থ হবে। কারণ, এটা*** (وجوب) ***এরই অংশ*** অর্থাৎ اباحة এবং ندب এর ক্ষেত্রে امر টি হাকীকী অর্থ হিসেবে আসবে। কারণ এ দুটির প্রত্যেকটি وجوب এর অংশ, আর কোন জিনিসের অংশ তার حقيقة قاصرة হয়। কেননা وجوب এর অর্থ হচ্ছে, جَوَازُ الْفِعْلِ مَعَ حُرْمَةِ التَّرْكِ (কাজ করা বৈধ হওয়া এবং পরিত্যাগ করা হারাম হওয়া) আর اباحة হচ্ছে جَوَازُ الْفِعْلِ (কাজ করা বৈধ হওয়া) আর ندب হলো جَوَازُ الْفِعْلِ مَعَ رُجْحَانِهِ (অগ্রাধিকারের সাথে কাজ করা বৈধ হওয়া)। সুতরাং প্রত্যেকটি وجوب এর একাংশ অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। আর এটাই حقيقة قاصرة এর অর্থ যা حقيقة শব্দের মাধ্যমে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। এটা আল্লামা ফখরুল ইসলাম বযদবীর পছন্দনীয় মত।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله ثُمَّ شَرَعَ الْمُصَنِّفُ فِى بَيَانِ الخ : মুসান্নিফ (র) আমর দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হওয়ার বিস্তারিত আলোচনার পরে বর্ণনা করছেন যে, আমর দ্বারা যদি ওয়াজিব সাব্যস্ত না হয় বরং মুবাহ বা মুস্তাহাব উদ্দেশ্য হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরের বিধান কি হবে? অর্থাৎ এ সময় আমরের ব্যবহার হাকিকী অর্থে হবে নাকি মাজাযী?

আল্লামা ফখরুল ইসলাম (র) এর পছন্দনীয় মত এই যে, সে ক্ষেত্রেও আমরের ব্যবহার হাকীকত হবে তবে তা হাকীকাতে كاملة নয় বরং قاصرة হবে। এর দলিল এই যে, মুবাহ ও মুস্তাহাব হওয়ার মধ্য থেকে প্রত্যেকটি ওয়াজিব হওয়ার অর্থের একটি অংশ। কেননা ওয়াজিব হওয়ার অর্থ হলো جَوَازُ الْفِعْلِ مَعَ حُرْمَةِ التَّرْكِ আর মুবাহ হওয়ার অর্থ হলো جَوَازُ الْفِعْلِ مَعَ جَوَازِ التَّرْكِ এভাবে মুস্তাহাব হওয়ার অর্থ হলো جَوَازُ الْفِعْلِ مَعَ رُجْحَانِ الْفِعْلِ

সারকথা এই যে, وجوب অর্থের দুটি অংশ রয়েছে। ১. কাজ জায়েয হওয়া, ২. বর্জন হারাম হওয়া। আর কাজ জায়েয হওয়া মুবাহ ও মুস্তাহাবের অর্থের ক্ষেত্রেও পাওয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয়টি এ দুই অর্থের মধ্যে পাওয়া যায় না। অতএব কেমন যেন মুবাহ এবং মুস্তাহাব হওয়া দুটির মধ্য থেকে প্রত্যেকটি ওয়াজিব হওয়ার অর্থের এক অংশে ব্যবহৃত হলো। আর কোনো কিছুর অংশ তা তার মূলের حقيقت قاصرہ হয়ে থাকে। সুতরাং ওয়াজিব হওয়াটাই আমরের সীগার পূর্ণ হাকীকত হবে। আর মুবাহ ও মুস্তাহাব হওয়া حقيقت قاصرة বিবেচিত হবে। মতনে উল্লেখিত হাকীকত দ্বারা حقيقت قاصرة উদ্দেশ্য। ১. حقيقت كاملہ ২. حقيقت قاصرہ

ফায়েদা : হাকীকতকে كاملة ও قاصرة এ দু ভাগে বিভক্ত করার পরে শব্দের মোট ৩টি প্রকার হলো। مجاز বা রূপক। কোনো শব্দ যদি মূল অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহলে তা পূর্ণ হাকীকত হবে। আর মূল অর্থের অংশ বোঝালে তা হাকীকতে কাছেরা বা অসম্পূর্ণ হাকীকাত হবে। আর যদি শব্দ দ্বারা বিশেষ কোনো কারণে মূল অর্থ ছাড়া অন্য কোনো অর্থ বোঝায় তাহলে তা মাজায বা রূপক অর্থ হবে।

وَقِيْلَ لَا لِاَنَّهُ جَاوَزَ اَصْلَهُ اى قِيْلَ اِنَّهُ لَيْسَ بِحَقِيْقَةٍ حِيْنَئِذٍ بل مَجَازٌ لِاَنَّهُ قَدْ جَاوَزَ اَصْلَهُ وهُو الْوُجُوْبُ لِاَنَّ الْوُجُوْبَ هُو جَوازُ الْفِعْلِ مَعَ حُرْمَةِ التَّرْكِ والْاِبَاحَةُ جَوَازُ الْفِعْلِ مَعَ جَوازِ التَّرْكِ والنَّدْبُ هُو رُجْحانُ الْفِعْلِ مع جَوازِ التَرك فَالْحَاصِلُ اَنَّ مَنْ نَظَرَ اِلى الْجِنْسِ الَّذِىْ هُو جَوازُ الْفِعْلِ فقَط ظَنَّ اَنَّهُ مُسْتَعمَل فِىْ بَعْضِ مَعْناه فيكونُ حقيقةً قاصرةً ومَنْ نَظَرَ الى الجِنْس والفَصْلِ جميعًا ظَنَّ اَنَّ كُلًّا مِّنْهُمَا مَعانٍ مُتبايِنَةٌ واَنْوَاعٌ عَلَيحِدَةٍ فلا يكُونُ اِلَّا مَجازًا واَمَّا تَحْقِيْقُ اَنَّ هٰذَا الْاِخْتِلاف فِىْ لفظِ الْاَمْرِ اَوْ فِىْ صِيَغِ الْاَمْرِ فَمَذكُورٌ فِى التَّلوِيْحِ بِمَا لَا مزِيْدَ عَلَيْهِ -

অনুবাদ ॥ *আবার বলা হয়েছে যে, এমনটা নয়, কারণ এটা তার* اصل *কে অতিক্রম করেছে।* অর্থাৎ বলা হয়েছে যে, তখন حقيقة হবে না (যখন اباحة তথা ندب অর্থে আসে) বরং মাজায বা রূপক হবে ; কারণ, এটা তার প্রকৃত অবস্থা اصل অতিক্রম করেছে, আর اصل হলো, وجوب কেননা وجوب হচ্ছে جَوَازُ الْفِعْلِ مَعَ حُرْمَةِ التَّرْكِ আর اباحة হচ্ছে جَوَازُ الْفِعْلِ مَعَ جَوَازِ التَّرْكِ এভাবে ندب হলো رُجْحَانُ الْفِعْلِ مَعَ جَوازِ التَّرْكِ

সারকথা এই যে, যে ব্যক্তি শুধু جنس তথা جواز الفعل এর প্রতি লক্ষ করে, সে মনে করবে, এটা (ندب বা اباحة) তার (وجوب এর) আংশিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং حقيقة قاصرة হবে। আর যে ব্যক্তি جنس এবং فصل (পৃথক পরিচয়)-এর দিকে লক্ষ করে; সে মনে করে, এগুলোর প্রত্যেকটি বিপরীতার্থ বোধক এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। তাই مجاز ছাড়া কিছু নয়। এ মতপার্থক্য امر শব্দ না-কি امر এর সীগা নিয়ে সে বিষয়ে تلويح গ্রন্থে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে, যার চেয়ে বেশি আলোচনা হতে পারে না।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله وَقِيْلَ لِاَنَّهُ جَاوَزَ الخ : শায়খ অবুল হাসান কারখী, শায়খ আবু বকর জাসসাস এবং অধিকাংশ ফকীহগণের মত এই যে, আমরের সীগাটি মুবাহ বা মুস্তাহাবের জন্য ব্যবহৃত হলে তা হাকীকত হবে না বরং মাজায গণ্য হবে। কেননা মুবাহ ও মুস্তাহাবের মধ্য থেকে প্রত্যেকটি আমরের প্রকৃত অর্থ অর্থাৎ وجوب থেকে অতিক্রম করে গেছে। আর এ কারণেই মাজায বলে যা মূল অর্থ থেকে অতিক্রম করে যায়। মুবাহ ও মুস্তাহাব হওয়া আমরের মূল অর্থ তথা وجوب থেকে এ কারণে অতিক্রম করে যায় যে, وجوب এর মধ্যে ২টি বিষয় লক্ষ থাকে। ১. কাজ জায়েয হওয়া, ২. বর্জন নিষিদ্ধ হওয়া। আর উভয়ের সমষ্টির নাম হলো وجوب - সুতরাং এ দুই অর্থে যেহেতু আমর ব্যবহৃত হওয়া প্রকৃত অর্থে নয় বরং রূপক অর্থে এ কারণেই তাকে মাজায বলে।

মুসান্নিফ (র) উভয় উক্তির সারমর্ম বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন– আল্লামা ফখরুল ইসলাম যেহেতু وجوب এর উল্লেখিত সংজ্ঞার শুধু জিনস তথা কাজ জায়েয হওয়ার প্রতি দৃষ্টি রেখেছেন। এ কারণে তিনি ধারণা করেছেন যে, اباحت ও ندب এর প্রত্যেকটি وجوب এর আংশিক অর্থ অর্থাৎ কাজ জায়েয হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত। সুতরাং اباحت ও ندب অর্থে আমরের ব্যবহার হাকীকতে কাছিরা গণ্যহবে। আর শায়খ আবুল হাসান কারখী প্রমুখ যেহেতু وجوب-এর উল্লেখিত সংজ্ঞার جنس ও فصل এর সমষ্টির প্রতি দৃষ্টি রেখেছেন এই কারণে তারা ধারণা করেছেন যে, اباحت ও ندب এর মধ্য থেকে প্রত্যেকটির অর্থ وجوب - কাজেই اباحت ও ندب অর্থে আমরের ব্যবহার হাকীকত হবে না বরং মাজায হবে।

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ رح عن بَيَانِ الْمُوْجَبِ وحُكْمِه ارادَ ان يُبَيِّنَ اَنَّهُ هَلْ يَحْتَمِلُ التَّكْرَارَ اوْ لَا فقال وَلا يَقْتَضِى التَّكْرَارَ وَلا يَحْتَمِلُهُ اى لا يَقْتَضِى الْاَمْرُ بِاعْتِبَارِ الوُجُوْبِ التَّكرار كَمَا ذَهَبَ اِلَيْه قومٌ ولا يَحْتَمِلُه كَمَا ذَهَبَ اِلَيْه الشَّافِعِيُّ رح يَعْنِى اِذا قِيْلَ مَثَلاً صَلُّوْا كانَ معناه اِفْعَلُوْا الصَّلٰوةَ مَرَّةً ولا يَدُلُّ على التَّكرارِ عِنْدَنا اصلًا وَذَهَبَ قومٌ الى اَنَّ مُوجَبَه التَّكرارُ لِانَّه لَمَّا نَزَلَ الامْرُ بِالحجّ قال اَقْرَعُ بْنُ حابِسٍ اَ لِعَامِنَا هٰذا يارسولَ اللّٰه ﷺ امْ لِلْاَبَدِ ففَهِمَ التَّكرار مَعَ اَنَّهُ كانَ مِن اَهْلِ اللِّسانِ ثم لَمَّا عَلِمَ انّ فيه حَرَجًا عظيمًا اُشْكِلَ عليه فسَأل وذَهَبَ الشافعيُّ رح الى اَنَّ مُحْتَمَلَهُ التَّكرارُ لِانَّ اِضْرِبْ مُخْتَصَرٌ مِّن اَطْلُبُ مِنْكَ ضَرْبًا وهُوَ نَكِرَةٌ و النَّكِرَةُ فى الْاِثْبَاتِ تَخُصُّ لٰكِنَّها تَحْتَمِلُ العُمُوْمَ فيُحْمَل عليه بِقَرِيْنَةٍ تَقْتَرِنُ بها والفَرْقُ بَيْنَ المُوْجَبِ وَالمُحْتَمَل اَنَّ المُوْجَبَ يَثْبُتُ بِلا نِيَّةٍ و المُحتمَلُ يَثْبُت بِالنِّيَّةِ و دَلِيْلُنا سَيَاتِى -

---

অনুবাদ॥ মুসান্নিফ (র) امر এর موجب ও হুকুম এর আলোচনা শেষ করে তিনি امر তাকরার চায় কি-না এবং তাকরারের সম্ভাবনা রাখে কিনা তা আলোচনা করতে চাচ্ছেন। তিনি বলেন امر ***তাকরার চায়না এবং এর সম্ভাবনাও রাখে না*** অর্থাৎ وجوب এর দিক থেকে امر তাকরার চায়না, যেমন কতিপয় লোক বলে থাকেন। امر তাকরারের সম্ভাবনাও রাখে না, যেমন ইমাম শাফেয়ী (র) বলে থাকেন। অর্থাৎ যখন উদাহরণ স্বরূপ صَلُّوا (তোমরা নামায পড়) বলা হয়, তখন এর অর্থ হয় اِفْعَلُوا الصَّلٰوةَ مَرَّةً তোমরা একবার নামায আদায় কর। আমাদের মতে, মূলত তাকরার বুঝায় না। আর একদল বলেছেন, امر এর موجب হলো তাকরার। কারণ, যখন হজ্জের বিষয়ে امر (আদেশ) অবতীর্ণ হলো তখন আকরা ইবনে হাবেস (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (স) এটা কি আমাদের এ বছরের জন্যে নাকি আজীবনের জন্যে? তিনি (امر এর মধ্যে) তাকরার বুঝেছিলেন, আর তিনি একজন আরবি ভাষী। অতপর যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, এর মধ্যে বেশ অসুবিধা রয়েছে তখন তার কাছে ব্যাপারটি সমস্যাপূর্ণ মনে হলো, তাই প্রশ্ন করলেন। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন যে, امر তাকরারের সম্ভাবনা রাখে। কারণ اضرب কথাটি اطلب منك ضربا এর সংক্ষিপ্ত রূপ, আর ضربا হলো نكرة এবং اثبات এর ক্ষেত্রে خصوصية (নির্দিষ্ট হওয়া)-এর অর্থ প্রদান করে। তবে عمومية-এর সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং এর সাথে যুক্ত কোন নিদর্শনের কারণে সে অর্থে (عمومية তথা تكرار) ব্যবহৃত হতে পারে। موجب ও محتمل এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, موجب সাব্যস্ত হয় নিয়্যত ছাড়া। আর محتمل সাব্যস্ত হয় নিয়্যতের মাধ্যমে। আমাদের দলিল অচিরেই আসছে।

(পূর্বের বাকী অংশ) মুসান্নিফ (র) বলেন– এ বিষয়ের বিশ্লেষণ এই যে, আল্লামা ফখরুল ইসলাম শায়খ আবুল হাসান কারখী প্রমুখের উল্লেখিত মতভেদ আমরের শব্দের ক্ষেত্রে নাকি সীগার ক্ষেত্রে এর বিস্তারিত বিবরণ তালবীহ গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। এখানে এতোটুকু আলোচনা করা যাচ্ছে যে, কারো মতে উল্লেখিত মতভেদ আমরের শব্দ তথা امر এর ব্যবহার ندب অর্থে যেমন– فكاتبوهم এবং اباحت অর্থে যেমন كلوا واشربوا হাকীকত নাকি মাজায হবে? আর কারো কারো মতে উল্লেখিত মতভেদ হলো আমর শব্দের মিসদাক তথা আমরের সীগার ব্যাপারে অর্থাৎ ندب ও اباحت অর্থে আমরের সীগার ব্যবহারটা হাকীকত নাকি মাজায?

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ رح عَنْ بَيَانِ الخ : মুসান্নিফ (র) আমরের موجب (সাব্যস্ত বিষয়) এবং বিধান বর্ণনা থেকে অবসর হওয়ার পর এখন বর্ণনা করতে চাচ্ছেন যে, আমরে মুতলাক (অর্থাৎ যা উমুম ও খুসুস এর আলামত থেকে খালি) تكرار এর সম্ভাবনা রাখে কি না?

আমরে মুতলাক تكرار এর সম্ভাবনা রাখা না রাখার ক্ষেত্রে মতভেদ :

এ ব্যাপারে ৩টি মত রয়েছে। ১. হানাফীগণ বলেন যে, মুতলাক আমর ওয়াজিব হওয়ার দিক দিয়ে তাকরার তথা দ্বিরুক্তির দাবি করে না এবং তা তাকরার ও উমুমের সম্ভাবনাও রাখে না। যেমন– "নামায পড়ো" বলা হয়। এর অর্থ হলো একবার নামায আদায় করো।

২. আবু ইসহাক ইসফ্রায়ী প্রমুখ বলেন যে, আমর দ্বারা تكرار ই সাব্যস্ত হয়। অর্থাৎ আমর تكرار ই বোঝায়।

৩. হযরত ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন আমর تكرار এর দাবি করে না তবে এর সম্ভাবনা রাখে।

দলিল : হানাফীগণের দলিল সামনে উল্লেখ করা হবে। আর যারা বলেন যে, আমর تكرار এর দাবি করে তাদের দলিল এই যে, যখন হজ্বের নির্দেশ নাযিল হলো এবং রাসূলুল্লাহ (স) বললেন– يا ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج তখন আকরা ইবনে হাবিস (রা) বললেন – হে আল্লাহর রাসূল (স)! আমাদের উপরকি এই বছরের হজ্বই ফরজ নাকি প্রত্যেক বছরই হজ করা ফরয? লক্ষ্য করুন হযরত আকরা যিনি আরবিভাষী হওয়া সত্ত্বে হজ্বের নির্দেশ দ্বারা تكرار তথা বারবার করা বুঝেছিলেন। তবে যেহেতু প্রত্যেক বছর হজ ফরয হওয়ার মধ্যে উম্মতের কষ্টের কথা স্মরণ হলো। তাই তিনি রাসূলুল্লাহ (স) এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন। আল্লাহর রাসূল (স) বললেন– আমি যদি نعم অর্থাৎ হ্যা বলতাম তাহলে প্রতি বছর হজ্ব করা ফরয হয়ে যেতো। আর তেমনটি হলে তোমরা তার উপর আমল করতে সক্ষম হতে না। হজ্ব একবারই ফরয, এর অতিরিক্ত নফল। কাজেই বোঝা গেলো যে, আমর তাকরার এর দাবি করে। অন্যথায় হযরত আকরা ইবনে হাবিস (রা) এ ব্যাপারে প্রশ্ন করতেন না।

উত্তর : হানাফীগণের পক্ষ থেকে এর উত্তর এই যে, হযরত আকরা ইবনে হাবিস (রা) এর প্রশ্ন আমর দ্বারা তাকরার বোঝার কারণে নয়। বরং তিনি জানতেন যে, সকল ইবাদত বিভিন্ন সবাবের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন নামায সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট, রোযা রমযান মাসের সাথে সংশ্লিষ্ট। কাজেই হজ্বও এমন হতে পারে। কারণ হজ্বের সম্পর্ক হলো বায়তুল্লাহর সাথে। আর বায়তুল্লাহর تكرار হয় না। এ দিক দিয়ে বার বার ফরয নাও হতে পারে। কিন্তু সময়ের প্রতি লক্ষ করলে বার বার হজ্বের মাস আসার কারণে তা বারবার ওয়াজিব হতে পারে। এই দ্বিধা দ্বন্দ্বের কারণে তিনি এ প্রশ্ন করেছিলেন। অতএব এর দ্বারা আমর تكرار দাবি করার ব্যাপারে দলিল গ্রহণ করা গ্রহণযোগ্য নয়।

ইমাম শাফেয়ী (র) এর দলিল : ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন– আমরের সীগাটি উদাহরণ স্বরূপ اضرب এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এর মূল ইবারত اُطْلُبْ مِنْكَ ضَرْبًا এর মধ্যে ضربا শব্দটি নাকেরা। অতএব এটা সংক্ষিপ্তরূপ তথা اضربকে শামিলকারী হবে। আর হা বাচক বাক্যে নাকেরা যদিও খাছ হয়ে থাকে তবে عموم এর সম্ভাবনা রাখে। এ কারণে اضرب আমরের সীগার মধ্যে تكرار এর সম্ভাবনা থাকবে। আমরের সীগাকে عموم ও تكرار এর উপর প্রয়োগ করা সম্ভব। যখন মুতাকাল্লিম এ ধরনের নিয়ত করবে অথবা কোনো আলামত বিদ্যমান থাকবে। কারণ موجب ও محتمل এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, موجب নিয়ত ছাড়াই সাব্যস্ত হয়। আর محتمل নিয়তের দ্বারা সাব্যস্ত হয়। মুসান্নিফ (র) বলেন– আহনাফের মতে আমর তাকরারের দাবিও করে না এবং তার সম্ভাবনাও রাখে না। এর বিবরণ সামনে উল্লেখ করা হবে।

سَوَاءٌ كَانَ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ اَوْ مَخْصُوصًا بِوَصْفٍ اَوْ لَمْ يَكُنْ رَدٌّ عَلٰى بَعْضِ اَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فَاِنَّهُمْ ذَهَبُوْا اِلٰى اَنَّهُ اِذَا كَانَ الْاَمْرُ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ كَقَوْلِهِ تَعَالٰى وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا او مخصوصًا بوَصْفٍ كقوله تعالى السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الشَّرْطِ وَالْوَصْفِ فَاِنَّ الْغُسْلَ يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْجَنَابَةِ وَالْقَطْعُ يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ السَّرِقَةِ و عِنْدَنَا الْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ وغيره وكذا الْمَخْصُوْصُ بِالْوَصْفِ وغيره سواءٌ فى اَنَّهُ لا يَدُلُّ عَلَى التَّكْرَارِ ولا يَحْتَمِلُهُ

অনুবাদ॥ ***চাই তা (امر) شرط এর সাথে যুক্ত থাকুক, অথবা কোন বিশেষণের সাথে বিশেষিত থাকুক অথবা না-ই থাকুক।*** এটা ইমাম শাফেয়ী (র)-এর কোন কোন অনুসারীর বক্তব্যের প্রতিউত্তর। কেননা তাদের মতে যদি امر টি শর্তের সাথে যুক্ত হয়, যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا এর মধ্যে অথবা وصف (বিশেষণ)-এর সাথে খাস হয়, যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী- السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا এর মধ্যে তাহলে شرط ও وصف তাকরারের সাথে (امر ও) তাকরার বুঝাবে। তাই অপবিত্রতার তাকরারের সাথে সাথে গোসলেরও তাকরার হবে, আর চুরি তাকরারের সাথে সাথে হাতকাটাও তাকরার হবে। আর আমাদের মতে, আমর কোনন شرط এর সাথে যুক্ত থাকুক বা না থাকুক এবং وصف এর সাথে খাস হোক, অথবা না হোক, তা একই পর্যায়ের যে, তা তাকরার বুঝাবে না এবং এর সম্ভাবনাও রাখবে না।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ قوله سَوَاءٌ كَانَ مُعَلَّقًا الخ : মুসান্নিফ (র) এই ইবারতের মাধ্যমে কিছু সংখ্যক শাফেয়ী আলিমের অভিমত খণ্ডন করছেন। তাদের মত এই যে, আমর কোনো শর্তের সাথে গ্রথিত থাকলে যেমন وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا এর মধ্যে তহারাত জানাবাতের গোসলের শর্তের সাথে সম্পৃক্ত। অথবা বিশেষ কোনো সিফাতের সাথে খাছ হলে যেমন اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا এর মধ্যে হাত কর্তন করা وصف سرقة এর সাথে খাছ। এসব ক্ষেত্রে শর্ত এবং وصف বারবার পাওয়া যাওয়ার দ্বারা আমরও বারবার পাওয়া যাবে। যেমন- একাধিকবার জানাবাত পাওয়া গেলে একধিকবার গোসল পাওয়া যাবে এবং একাধিকবার চুরি পাওয়া গেলে একাধিকবার হাত কর্তন করতে হবে।

দলিল : وصف হলো শর্ত এর ন্যায়, আর শর্ত হলো ইল্লতের ন্যায়। আর ইল্লতের তাকরার দ্বারা বিধানের তাকরার ঘটে। অতএব শর্ত ও وصف এর তাকরার দ্বারাও বিধানের তাকরার ঘটবে।

উত্তর : হানাফীগণ উত্তরে বলেন- শর্ত ইল্লতের মত নয়। কারণ ইল্লত معلل এর অস্তিত্বের দাবি করে। কিন্তু শর্ত مشروط এর অস্তিত্ব দাবি করে না। সুতরাং শর্ত যেহেতু ইল্লতের মত নয়। অতএব শর্তকে ইল্লতের উপর কিয়াস করাও ঠিক হবে না। মোটকথা মুসান্নিফ (র) শাফেয়ী আলিমগণের এ মতকে খণ্ডন করা প্রসঙ্গে বলেন যে, হানাফী আলিমগণের মত এই যে, امر চাই কোনো শর্তের সাথে সম্পৃক্ত থাক বা কোনো وصف এ সাথে খাছ থাক, অথবা এর কোনোটিই না হোক। কোনো ক্ষেত্রেই امر তাকরার বোঝায় না। এমনকি এর সম্ভাবনাও রাখে না।

لٰكِنَّهٗ يَقَعُ عَلٰى اَقَلِّ جِنْسِهٖ وَيَحْتَمِلُ كُلَّهٗ اِسْتِدْرَاكٌ مِّنْ قَوْلِهٖ وَلَا يَحْتَمِلُهٗ كَاَنَّ قَائِلًا يَقُوْلُ لَمَّا لَمْ يَحْتَمِلِ الْاَمْرُ التَّكْرَارَ عِنْدَكُمْ فَكَيْفَ يَصِحُّ عِنْدَكُمْ نِيَّةُ الثَّلٰثِ فِيْ قَوْلِهٖ طَلِّقِيْ نَفْسَكِ فَيَقُوْلُ اِنَّ الْاَمْرَ يَقَعُ عَلٰى اَقَلِّ جِنْسِهٖ وَهُوَ الْفَرْدُ الْحَقِيْقِيُّ وَيَحْتَمِلُ كُلَّ الْجِنْسِ وَهُوَ الْفَرْدُ الْحُكْمِيُّ اَىِ الطَّلَّقَاتُ الثَّلٰثُ لَا مِنْ حَيْثُ اَنَّهٗ عَدَدٌ بَلْ مِنْ حَيْثُ اَنَّهٗ فَرْدٌ وَلَا مِنْ حَيْثُ اَنَّهٗ مَدْلُوْلٌ بَلْ مِنْ حَيْثُ اَنَّهٗ مَنْوِيٌّ وَاِلَيْهِ اَشَارَ بِقَوْلِهٖ حَتّٰى اِذَا قَالَ لَهَا طَلِّقِيْ نَفْسَكِ اَنَّهٗ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدَةِ اِلَّا اَنْ يَنْوِيَ الثَّلٰثَ لِاَنَّ الْوَاحِدَةَ فَرْدٌ حَقِيْقِيٌّ مُتَيَقَّنٌ وَالثَّلٰثُ فَرْدٌ حُكْمِيٌّ مُحْتَمَلٌ وَلَا تَعْمَلُ نِيَّةُ الثِّنْتَيْنِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ الْمَرْأَةُ اَمَةً اَىْ لَا تَصِحُّ نِيَّةُ الثِّنْتَيْنِ فِيْ قَوْلِهٖ طَلِّقِيْ نَفْسَكِ لِاَنَّهٗ عَدَدٌ مَحْضٌ لَيْسَ بِفَرْدٍ حَقِيْقِيٍّ وَلَا حُكْمِيٍّ وَلَيْسَ مَدْلُوْلًا لِلَّفْظِ وَلَا مُحْتَمِلًا لَهٗ اِلَّا اِذَا كَانَتْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ اَمَةً لِاَنَّ الثِّنْتَيْنِ فِيْ حَقِّهَا كَالثَّلٰثَةِ فِيْ حَقِّ الْحُرَّةِ فَهُوَ وَاحِدٌ حُكْمِيٌّ كَالثَّلٰثِ فِيْ حَقِّهَا

অনুবাদ ॥ *তবে* امر *তা জিনসের সর্বনিম্ন এককের ওপর পতিত হবে এবং পরিপূর্ণ এককের সম্ভাবনা রাখবে।* এ বক্তব্য গ্রন্থকারের উক্তি ولا يحتمله থেকে বিপরীত হুকুমধারী। কেমন যেন কোন কথক বলছে যেহেতু আপনাদের (হানাফীদের) মতে, امر তাকরারের সম্ভাবনা রাখে না। সেহেতু আপনাদের মতে স্বামীর উক্তি طلقى نفسك এর মাধ্যমে তিন তালাকের নিয়্যত করা কিভাবে সঠিক হয়? গ্রন্থকার (এর জবাবে) বলেন, امر টি তার সর্ব নিম্ন এককের ওপর পতিত হয়। আর তা হলো فرد حقيقى তথা প্রকৃত একক। আর পরিপূর্ণ جنس তথা একক সমস্ত সম্ভাবনা রাখে। আর তা হচ্ছে فرد حكمى বা বিধানগত একক। অর্থাৎ তিন তালাক, এ দিক থেকে নয় যে, এটা সংখ্যা বরং এ দিক থেকে যে, এটা একক। এবং এভাবে নয় যে এটা (امر এর) নির্দেশিত বিষয় (مدلول) বরং এভাবে যে, এটা আমার দ্বারা নিয়্যতকৃত বিষয়।

গ্রন্থকার এ ইবারতের মাধ্যমে এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, ***যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে*** طلقى نفسك ***তাহলে কথাটি এক তালাকের জন্যে প্রযোজ্য হবে, যদি না তিন তালাকের নিয়্যত করে।*** কারণ, واحد হলো فرد حقيقى যা ধর্তব্য বিষয়। আর তিন হলো فرد حكمى যা সম্ভাব্য বিষয়।

দু তালাকের নিয়্যত কার্যকরী হবে না, যদি স্ত্রীলোকটি ক্রীতদাসী হয়। অর্থাৎ, স্বামীর উক্তি طَلِّقِىْ نَفْسَكِ এর মধ্যে দু তালাকের নিয়্যত করা ঠিক হবে না। কারণ, এটা হচ্ছে নিছক সংখ্যা, فرد حقيقى বা فرد حكمى নয়। আর طلقى শব্দের নির্দেশিত ও সম্ভাব্য বিষয়ও নয়। তবে যদি সে দাসী হয় (তাহলে দু তালাকের নিয়্যত ধর্তব্য হবে) কারণ দাসীর ক্ষেত্রে দু তালাক স্বাধীন নারীর ক্ষেত্রে তিন তালাকের মতো। আর স্বাধীন নারীর তিন তালাকের ন্যায় এটা (দু তালাক) তার জন্যে فرد حكمى

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قَوْلُهُ لٰكِنَّهُ يَقَعُ عَلٰى اَقَلِّ جِنْسِهِ : মানার গ্রন্থকার এ ইবারত দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

প্রশ্নের সার এই যে, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, امر তাকরারের দাবি করে না এমনকি এর সম্ভাবনাও রাখে না। অথচ হানাফীগণের মতে স্বামী যদি তার স্ত্রীকে طلقي نفسك বলে ৩ তালাকের নিয়ত করে তাহলে তার এ নিয়ত বৈধ হয়। অতএব স্ত্রী নিজেকে ৩ তালাক দিলে স্বামীর নিয়তের কারণে ৩ তালাক হয়ে যাবে। অথচ ৩ এর মধ্যে সংখ্যাধিক্য ও তাকরার রয়েছে। কাজেই এর দ্বারা বোঝা যায় যে, আমর তাকরারের সম্ভাবনা রাখে।

উত্তর : এর উত্তর এই যে, সংখ্যা এবং (فرد) এককের মধ্যে বৈপরিত্ব রয়েছে। فرد বলা হয় যা افراد দ্বারা مركب নয়। আর عدد বা সংখ্যা বলা হয় যা বিভিন্ন আফরাদ দ্বারা مركب হয়। এরপর فرد ২ প্রকার। ১. حقيقى ২. حكمى

فرد حقيقى বলা হয় যার নীচে আর কোনো সংখ্যা না থাকে। যেমন – ১ হলো ফরদে হাকিকী। এটাকে اقل جنس ও বলা হয়। অর্থাৎ জিনসের সর্বনিম্ন মিসদাক। আর فرد حكمى বলা হয় যা সম্পূর্ণের সমষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ ৩ তালাকের সমষ্টি হলো ফরদে হুকমী। আমরের সীগাটি মাসদার শামিল হওয়ার কারণে اقل جنس তথা ফরদে হাকিকীর উপর প্রযোজ্য হয় এবং كل جنس তথা ফরদে হুকুমী এরও সম্ভাবনা রাখে। কেমন যেন ফরদে হাকিকী হলো আমরের موجب আর ফরদে হুকুমী হলো আমরের محتمل - আর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, موجب নিয়তবিহীন সাব্যস্ত হয়। আর محتمل নিয়ত দ্বারা সাব্যস্ত হয়। অতএব স্বামীর উক্তি طلقي نفسك দ্বারা ফরদে হাকিকী অর্থাৎ নিয়ত ছাড়াই ১ তালাক হয়ে যাবে। আর ফরদে হুকুমী তথা ৩ তালাকের সমষ্টির নিয়ত করলে তা সাব্যস্ত হবে।

এটা মনে রাখতে হবে যে, طَلِّقِيْ نَفْسَكِ শব্দ দ্বারা তিন তালাকের সমষ্টি عدد হওয়ার দিকদিয়ে পতিত হয় না। বরং ফরদ হওয়ার দিক দিয়ে পতিত হয়। এভাবে ৩ তালাকের সমষ্টি طلقى শব্দের অর্থ হওয়ার কারণে পতিত হয় না। বরং স্বামীর নিয়ত করার দ্বারা পতিত হয়। যেমন মাতিন (র) উল্লেখ করেছেন যে, কোনো স্বামী যদি তার স্ত্রীকে طلقي نفسك বলে। আর স্বামী কোনো নিয়ত না করে তাহলে স্ত্রী নিজেকে ১ তালাক দেয়ার অনুমতি প্রাপ্তা গণ্য হবে। কারণ ১ হলো ফরদে হাকিকী। আর স্বামী যদি ৩ তালাকের নিয়ত করে তাহলে স্ত্রী ৩ তালাক দেয়ার অনুমতি প্রাপ্ত হবে। কারণ ৩ তালাকের সমষ্টি হলো ফরদে হুকুমী। আর শব্দ এর সম্ভাবনা রাখে। তবে স্বামী যদি ২ তালাকের নিয়ত করে তাহলে স্ত্রী নিজেকে ২ তালাক দেয়ার অনুমতিপ্রাপ্তা হবে না এবং স্বামীর ২ তালাকের নিয়ত করাও সঠিক হবে না। কারণ ২ সংখ্যাটি عدد محض এবং خالص عدد এটা طلقى শব্দের ফরদে হাকিকীও নয় ফরদেও হুকুমীও নয়। আর طلقى শব্দটি ২ বোঝায় না। এবং এর সম্ভাবনাও রাখে না। সুতরাং ২ সংখ্যাটি যেহেতু عدد রদ محض হলো। আর আমরের সীগা সংখ্যা ও তাকরার বোঝায় না এবং এর সম্ভাবনাও রাখে না। এ কারণে طلقى দ্বারা ২ তালাকের নিয়ত করা ঠিক হবে না। স্ত্রী যদি বাঁদী হয় তখন স্বামীর طلقى শব্দ দ্বারা ২ তালাকের নিয়ত করা বৈধ হবে। কারণ বাঁদীর ক্ষেত্রে ২ তালাকই সম্পূর্ণ তালাক। এর দ্বারাই সে মুগাল্লাযা বায়েনা হয়ে যায়। অতএব স্বাধীন মহিলাদের ক্ষেত্রে ৩ তালাকের সমষ্টি যেরূপ ফরদে হুকমী তদ্রূপ বাঁদীর ক্ষেত্রে ২ তালাকের সমষ্টি হলো ফরদে হুকমী। সুতরাং ফরদে হুকমীর নিয়ত করা বৈধ। যেমন পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

وَامَّا اِذَا قَالَ طَلِّقِى نَفْسَكِ ثِنْتَيْنِ فحِيْنَئِذٍ انّما يَقَعُ ثِنْتَانِ لِاَجْلِ اَنَّهُ بَيَانُ تَغْيِيْرٍ لِمَا قَبْلَهُ لَا بَيَانُ تَفْسِيْرٍ لَهُ لِاَنَّ طَلِّقِى لَا يَحْتَمِلُ ثِنْتَيْنِ حَتّٰى يَكُونَ بَيَانًا لَهُ - ثُمَّ اَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ رح دَلِيْلًا عَلٰى مَاهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَهُ فَقَالَ لِاَنَّ صِيْغَةَ الْاَمْرِ مُخْتَصَرَةٌ مِنْ طَلَبِ الْفِعْلِ بِالْمصدرِ الّذِى هُوَ فردٌ اى انّما لا يَقْتَضِى الامرُ التّكرارَ لِاَنَّه مختصرٌ مِّنْ طَلَبِ الفِعْلِ بِالْمَصدرِ فقَوْلُكَ اِضْرِبْ مُخْتصرٌ مِّن اَطْلُبُ مِنْكَ الضَّرْبَ وقولُه صَلُّوْا مختصرٌ مِّن اَطْلُبُ مِنْكُمُ الصَّلٰوةَ وقولُه طَلِّقِى مختصرٌ مِّن اِفْعَلِى فِعلَ الطّلاقِ والمصدرُ الْمُخْتَصَرُ منه فردٌ لا يَحْتَمِلُ العددَ وكيفَ يحتَمِلُه ومَعْنَى التَّوَحُّدِ مُرَاعًى فِى اَلْفَاظِ الْوُحْدَانِ فالفعلُ المختصرُ منه اَوْلٰى اَن لَّا يَحْتَمِلَ الْعَدَدَ بِهٰذَا الْقَدْرِ تَمَّ الدليلُ عَلَى الْاَصْلِ الْكُلِّيِّ ثمّ قولُه وذٰلِكَ بِالْفَرْدِيَّةِ وَالْجِنْسِيَّةِ وَالْمُثَنّٰى بِمَعْزَلٍ عَنْهُمَا بيانٌ لِلْمِثَالِ الْمُخْتَصِّ اَعْنِى قولَه طَلِّقِى نَفْسَكِ لاَنَّ الطلاقَ هُوَ الذى يَتَّصِفُ بِالنِّسْبَةِ والفَرْدِ الحُكْمِىِّ ومَعْزَلِيَّةِ الْمُثَنّٰى وامّا ماسواه فلا يُعْلَمُ فيه الفردُ الحُكْمِىُّ اِلَّا فِى اٰخِرِ الْعُمْرِ -

---

অনুবাদ ॥ আর সে যদি বলে طَلِّقِىْ نَفْسَكِ ثِنْتَيْنِ তাহলে দু তালাক পতিত হবে শুধু এজন্যে যে, এটা (ثِنْتَيْنِ) হচ্ছে তার পূর্ববর্তী অংশের بَيَانُ تَغْيِيْرٍ (বিপরীত ব্যাখ্যা), তার بَيَانُ تَفْسِيْرٍ নয়। কারণ طَلِّقِى শব্দটি দু তালাকের সম্ভাবনা রাখে না যে, (ثِنْتَانِ) তার ব্যাখ্যা হতে পারে।

অতপর গ্রন্থকার তার পছন্দনীয় মতের ওপর দলিল পেশ করে বলেন, *কেননা, امر এর সীগা হচ্ছে مصدر এর মাধ্যমে কাজ চাওয়ার সংক্ষিপ্ত উপায় যা একবচন।* অর্থাৎ, আমর তাকরার চায় না, কেননা এটা হচ্ছে মাসদারের সাহায্যে কাজ চাওয়ার সংক্ষিপ্ত পন্থা। সুতরাং তোমার উক্তি اِضْرِبْ হলো اَطْلُبُ مِنْكَ الضَّرْبَ এর সংক্ষিপ্ত রূপ। আবার তার উক্তি صَلُّوْا হচ্ছে اَطْلُبُ مِنْكُمُ الصَّلٰوةَ এর সংক্ষিপ্ত রূপ। স্বামীর উক্তি طَلِّقِىْ হলো اِفْعَلِىْ فِعْلَ الطَّلَاقِ এর সংক্ষিপ্তরূপ। আর যে মাসদার হতে সংক্ষিপ্ত করা হয় তা একবচন; তা সংখ্যার সম্ভাবনা রাখে না। কাজেই امر কিরূপে সম্ভাবনা রাখবে?

(আর امر কিভাবে তাকরারের সম্ভাবনা রাখবে, অথচ) *একক অর্থ একক শব্দগুলোর মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়।* সুতরাং, মাসদার হতে সংক্ষিপ্ত فعل অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সংখ্যার সম্ভাবনা রাখবে না। এ মূলনীতির মাধ্যমে দলিল সমাপ্ত হলো।

গ্রন্থকারের উক্তি- وذٰلِكَ بِالْفَرْدِيَّةِ والْجِنْسِيَّةِ والْمُثَنّٰى بِمَعْزَلٍ عَنْهُمَا *(এটা এককতা ও জাতীয়তার ভিত্তিতে এবং দ্বি-বচন ঐ দুটি হতে আলাদা)।* এটা নির্দিষ্ট উদাহরণের ব্যাখ্যা। অর্থাৎ, স্বামীর উক্তি طَلِّقِى نَفْسَكِ হলো নির্দিষ্ট উদাহরণ। কেননা طلاق এমন বিষয় যা جنسية ও فرد حكمى এর বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন এবং مُثَنّٰى (দ্বিবচন) কে বাদ দিয়ে দেয়। তবে এটা (طلاق) ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে فرد حكمى জীবনের শেষ লগ্ন ছাড়া জানা যাবে না।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله واما اذا قال طلقي نفسك ثنتين الخ : এটা একটা প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন : আপনি উল্লেখ করেছেন যে, ২ সংখ্যাটি عدد محض এটা طلقي এর ফরদে হাকিকীও নয় এবং তার فرد حكمي ও নয় এবং তার مدلولও নয়। অথচ স্বামী যদি স্ত্রীকে طَلِّقِي نَفْسَكِ ثِنْتَيْنِ বলে। তাহলে স্ত্রী নিজেকে ২ তালাক দিলে ২ তালাকই পতিত হয়। কারণ ثنتين শব্দটি طلقي এর তাফসীর গণ্য হয়। আর তাফসীর এমন বিষয়কে বলে শব্দ যার সম্ভাবনা রাখে। অতএব বোঝা গেলো যে, طَلِّقِي ثِنْتَيْنِ শব্দটি ২ এর সম্ভাবনা রাখে। কাজেই আপনার এ উক্তি যে, ثنتين হলো طلقي এর محتمل কথাটি ঠিক নয়।

উত্তর : طَلِّقِي نَفْسَكِ ثِنْتَيْنِ বাক্যের মধ্যে ثنتين শব্দটি طلقي نفسك এর তাফসীর নয়। বরং তার بيان تغيير - এটা تفسير নয় এ কারণে যে, طلقي শব্দটি ২ এর সম্ভাবনা রাখে না। অথচ মুফাসসার এমন বস্তুর সম্ভাবনা রাখে যা بيان تفسير হয়। মোটকথা ثنتين শব্দটি طلقي এর بيان تغيير হলো। আর এটা পূর্বের বিধানকে পরিবর্তন করে দেয়। সুতরাং এ বাক্যে তালাক শব্দটি মওসূফ। উহ্য ثنتين এর। মূল ইবারত এমন হবে تَطْلِيقَتَيْنِ ثِنْتَيْنِ সুতরাং ثنتين শব্দটি طلقي শব্দের محتمل হবে না।

قوله ثم اورد المصنف دليلا الخ : মাতিন (র) এই ইবারত দ্বারা তার পছন্দনীয় মতের স্বপক্ষে দলিল পেশ করেছেন।

দলিলের সার : امر তাকরার দাবি করে না। এর দলিল এই যে, আমরের সীগাটি মাসদার দ্বারা কাজ তলব করার সংক্ষিপ্তরূপ। যেমন– اضرب হলো اطلب منك الضرب এর সংক্ষিপ্তরূপ। এভাবে صلوا হলো أَطْلُبُ مِنْكُمُ الصَّلٰوةَ এর সংক্ষিপ্ত রূপ। অতএব আমরের সীগা হলো مختصر এবং মাসদার হলো مختصر منه আর مختصر منه অর্থাৎ মাসদার হলো فرد আর فرد - عدد বা সংখ্যার সম্ভাবনা রাখে না। সুতরাং মাসদার সংখ্যার সম্ভাবনা কিভাবে রাখবে? অথচ মাসদার যা فرد তা হলো একবচন শব্দ। আর একবচন শব্দে توحد তথা একক হওয়ার অর্থ লক্ষ্য থাকে। সুতরাং মাসদার যখন সংখ্যার সম্ভাবনা রাখে না। তাহলে তা থেকে গঠিত এবং সংক্ষিপ্ত আমরের সীগাও উত্তমরূপে সংখ্যার সম্ভাবনা রাখবে না।

قوله وبهذا القدر تم الخ : নুরুল আনওয়ার গ্রন্থকার বলেন– উল্লেখিত ভাষ্য দ্বারা আমাদের দাবি পূর্ণ হয়ে গেলো। এব্যাপারে অতিরিক্ত আলোচনার প্রয়োজন নেই। সামনে মাতিন (র) এর উল্লেখিত উদাহরণ طَلِّقِي نَفْسَكِ এর আলোকপাত প্রসঙ্গে বলেন– তালাকের فرد হাকিকীও হয় এবং فرد হুকুমীও হয়। ফরদে হাকিকী এবং ফরদে হুকমী উভয় ক্ষেত্রে توحد সুস্পষ্ট হয়। ফরদে হাকিকীর ক্ষেত্রে توحد পাওয়া যাওয়া সুস্পষ্ট। ফরদে হুকমীর মধ্যে তা এভাবে পাওয়া যায় যে, সম্পূর্ণের সমষ্টিকে ফরদে হুকমী বলে। আর কোনো বস্তুর সকল একককের সমষ্টি হলো এক বচনের হুকুমে। অতএব সকলের সমষ্টি তথা ফরদে হুকমীর মধ্যে توحد এর অর্থ পাওয়া গেলো। সুতরাং তালাকের ফরদে হাকিকী ও হুকমী উভয়ের মধ্যে যখন توحد এর অর্থ বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই طَلِّقِي نَفْسَكِ দ্বারা স্ত্রী নিজেকে ১ তালাক দেয়ার অনুমতি রাখবে। আর ৩ তালাক (ফরদে হুকমী) দেয়ারও অনুমতি রাখে যখন স্বামী ৩ তালাকের নিয়ত করবে। আর ২ তালাক ফরদের হাকিকীও নয় ও ফরদে হুকমীও নয়। এ কারণে তা পতিত হবে না। তবে তালাক ছাড়া চুরি, নামায, ইত্যাদির ফরদে হুকমী কেবল জীবনের শেষ লগ্নে বোঝা যায়। কারণ আগে জানা যায় না যে, সে জীবদ্দশায় কি পরিমাণ চুরি করবে এবং কি পরিমাণ নামায পড়বে। কাজেই মৃত্যুর পূর্বে যেহেতু সকল চুরি ও নামায আদায়ের ব্যাপারে অবগত হওয়া সম্ভব নয়। এ কারণে তার ফরদে হুকমী অবগত হওয়াও সম্ভব নয়।

বি: দ্র: মতনে উল্লেখিত فرديت দ্বারা ফরদে হাকিকী এবং جنسيت দ্বারা ফরদে হুকমী উদ্দেশ্য।

وَمَا تَكَرَّرَ مِنَ الْعِبَادَاتِ فَبِاَسْبَابِهَا لَا بِالْاَوَامِرِ جوابُ سُوالٍ يَرِدُ عَلَيْنَا وهُوَ اَنَّ الْاَمْرَ اذا لَمْ يَقْتَضِ التَّكْرَارَ ولَمْ يَحْتَمِلْهُ فَبِاَيِّ وَجْهٍ تَتَكَرَّرُ الْعِبَادَاتُ مِثْلُ الصَّلٰوةُ وَالصِّيَامُ وغَيْرُ ذٰلِكَ؟ فَيَقُوْلُ اِنَّ مَاتَكَرَّرَ مِنَ الْعِبَادَاتِ لَيْسَ بِالْاَوَامِرِ بَلْ بِالْاَسْبَابِ لِاَنَّ تَكْرَارَ السَّبَبِ يَدُلُّ عَلٰى تَكْرَارِ الْمُسَبَّبِ فَبِاَنْ وُجِدَ الْوَقْتُ وَجَبَ الصَّلٰوةُ وَمَتٰى يَاتِىْ رَمَضَانُ يَجِبُ الصِّيَامُ ومَهْمَا قَدَرَ عَلٰى مِلْكِ الْمَالِ وَجَبَتِ الزَّكٰوةُ وَلِهٰذَا لَمْ يَجِبِ الحَجُّ فِى الْعُمْرِ اِلَّا مَرَّةً لِاَنَّ الْبَيْتَ وَاحِدٌ لَاتَكْرَارَ فِيْهِ

অনুবাদ॥ *আর ইবাদতের মধ্য থেকে যেগুলোর তাকরার হয় সেগুলো* مسبب *এর কারণে,* امر *এর কারণে নয়।*

এটা আমাদের আহনাফের উপর আরোপিত একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি এই যে, امر যেহেতু তাকরার চায়না এবং এর সম্ভাবনাও রাখে না, তাহলে নামায, রোযা ইত্যাদি কিভাবে তাকরার হয়? গ্রন্থকার বলেন ইবাদতের মধ্যে যেগুলোর তাকরার হয় সেগুলো امر এর কারণে নয়, বরং سبب এর কারণে। কেননা, سبب এর তাকরার مسبب এর তাকরার বোঝায়। তাই যখনই সময় পাওয়া যাবে তখনই নামায ওয়াজিব হবে, যখন রমযান আসবে তখন রোযা রাখা ওয়াজিব হবে, যখনি সম্পদের ওপর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে, তখনি যাকাত ওয়াজিব হবে। এ জন্যেই জীবনে একবারের বেশি হজ্জ ওয়াজিব হয় না। কেননা, بيت الله (কা'বা ঘর) একটি, এর মধ্যে কোন তাকরার নেই।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ قوله وَمَاتَكَرَّرَ مِنَ الْعِبَادَاتِ الخ : এই ইবারতে মাতিন (র) ঐ সকল ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে আরোপিত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন যারা বলে থাকেন যে, امر তাকরার দাবি করে।

প্রশ্নের সার : হানাফীগণের মতে امر যেহেতু তাকরার দাবি করে না এবং এর সম্ভাবনাও রাখে না তাহলে নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদি ইবাদত বার বার করতে হয় কেন? অর্থাৎ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ দ্বারা নামায এবং اٰتُوا الزَّكٰوةَ দ্বারা যাকাতকে ও كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ দ্বারা রোযাকে ফরয করা হয়েছে। আপনাদের উক্তি মতে امر তাকরার দাবি করে না এবং তার সম্ভাবনাও রাখে না। সুতরাং প্রত্যেক দিন নামায পড়া, প্রতি বছরে রমযানে রোযা রাখা এবং প্রত্যেক বছর যাকাত দেয়া ওয়াজিব হয় কেন? জীবনে একবার আমল করলেই তো হয়ে যেতো।

উত্তর : এসকল ইবাদতে আমরের সীগা দ্বারা তাকরার হচ্ছে না। বরং তার সবাবের মধ্যে তাকরার সূচিত হওয়ার কারণে মুসাব্বাবের তাকরার হচ্ছে। যেমন— নামাযের সবাব হলো ওয়াক্ত হওয়া। সুতরাং যখনই ওয়াক্ত পাওয়া যাবে তখনই নামায ওয়াজিব হবে।

রমযানের আগমন হলো রোযার সবাব। কাজেই যখনই রোযার মাস আসবে তখনই রোযা ওয়াজিব হবে।

এভাবে যাকাতের নিসাব হলো যাকাতের সবাব। কাজেই যখনই নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হবে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। এ কারণেই জীবনে হজ্জ একবার ওয়াজিব হয়। কেননা এর সবাব হলো বায়তুল্লাহ। আর বায়তুল্লাহ একই। এর মধ্যে কোনো তাকরার হয় না। সুতরাং আপনাদের প্রশ্ন ঠিক নয়।

لَا يُقَالُ اِنَّ الْوَقْتَ سَبَبٌ لِنَفْسِ الْوُجُوْبِ وَالاَمْرُ اِنَّمَا هُوَ سَبَبٌ لِّوُجُوْبِ الْاَدَاءِ فَكَيْفَ يَكُوْنُ السَّبَبُ مُغْنِيًا عَنِ الْاَمْرِ لِاَنَّا نَقُولُ اِنَّ عِنْدَ وُجُوْدِ كُلِّ سَبَبٍ يَتَكَرَّرُ الاَمْرُ تَقْدِيْرًا مِنْ جَانِبِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَكَانَ تَكْرَارُ الْعِبَادَاتِ بِتَكَرُّرِ الْاَوَامِرِ الْمُتَجَدِّدَةِ حُكْمًا -

وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رح لَمَّا احْتَمَلَ التَّكْرَارَ تَمْلِكُ اَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا ثِنْتَيْنِ اِذَا نَوَى الزَّوْجُ بَيَانٌ لِخِلَافِ الشَّافِعِيِّ رح فِى اَصْلٍ كُلِّيٍّ عَلٰى وَجْهٍ يَتَضَمَّنُ الْخِلَافَ فِى الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُوْرَةِ يَعْنِى اَنَّ عِنْدَهُ لَمَّا احْتَمَلَ كُلُّ اَمْرٍ التَّكْرَارَ سَوَاءٌ كَانَ اَمْرُ الشَّارِعِ اَوْ غَيْرِهِ تَمْلِكُ الْمَرْاَةُ فِى قَوْلِهِ طَلِّقِى نَفْسَكِ اَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا ثِنْتَيْنِ اِذَا نَوَى الزَّوْجُ ذٰلِكَ وَاِنْ لَمْ يَنْوِ اَوْ نَوَى وَاحِدَةً فَلَهَا اَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا وَاحِدَةً -

ثُمَّ اَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ رح بِتَقْرِيْبِ بَيَانِ الْاَمْرِ بَيَانَ اِسْمِ الْفَاعِلِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِى عَدَمِ اِحْتِمَالِ التَّكْرَارِ فَقَالَ وَكَذَا اِسْمُ الْفَاعِلِ يَدُلُّ عَلَى الْمَصْدَرِ لُغَةً وَلَا يَحْتَمِلُ الْعَدَدَ نَقُوْلُهُ يَدُلُّ بَيَانٌ لِوَجْهِ التَّشْبِيْهِ وَلَا يَحْتَمِلُ عَطْفٌ عَلَيْهِ

অনুবাদ ॥ একথা বলা যাবে না যে, প্রকৃত وجوب এর জন্যে সময় হচ্ছে سبب আর আদায় হওয়ার জন্যে سبب হচ্ছে امر। - সুতরাং কিভাবে سبب টি امر হতে মুখাপেক্ষীহীন হতে পারে? (এ জন্যে বলা যাবে না) কারণ, আমরা বলে থাকি যে, প্রত্যেকটি سبب পাওয়া যাওয়ার সময় امر পরোক্ষভাবে আল্লাহর পক্ষ হতে তাকরার হয়। কেমন যেন হুকুমগতভাবে নতুন করে امر এর তাকরারের ফলেই ইবাদতসমূহ তাকরার হচ্ছে।

আর ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, যেহেতু امر টি তাকরারের সম্ভাবনা রাখে, সেহেতু স্ত্রী নিজেকে দু তালাক দেয়ার অধিকার লাভ করবে যদি স্বামী নিয়্যত করে। এটা মূলনীতি এর বিষয়ে ইমাম শাফেয়ী (র)-এর বিরোধিতার বর্ণনা এমনভাবে যে, উল্লিখিত সমস্যাটি মত পার্থক্যের আওতাভুক্ত। (উল্লেখিত মাসয়ালাটি ইখতেলাফী মাসয়ালা) অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ী (র) মতে, যেহেতু সব امر ই তাকরারের সম্ভাবনা রাখে চাই সেটা শরীআত প্রণেতার امر হোক অথবা অন্য কারোর। যেহেতু ঐ মহিলা, স্বামীর উক্তি طلقى نفسك এর মাধ্যমে নিজেকে দু তালাক দেয়ার অধিকার পাবে। যদি স্বামী ঐরূপ (দু তালাকের) নিয়্যত করে থাকে। আর যদি নিয়্যত না করে, অথবা এক তালাকের নিয়্যত করে, তাহলে তার নিজেকে এক তালাক গ্রহণ করার অধিকার থাকবে।

اسم فاعل –ইসমে ফায়েল বিষয়ক আলোচনা

মুসান্নিফ (র) امر এর বর্ণনার পাশাপাশি اسم فاعل এর বর্ণনা পেশ করেছেন। কারণ, তাকরারের সম্ভাবনা না থাকার বিষয়ে এ দুটি পরস্পর অংশীদার। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, *অনুরূপভাবে اسم فاعل (আভিধানিক অর্থে مصدر বুঝায় এবং সংখ্যার সম্ভাবনা রাখে না।* গ্রন্থকারের উক্তি يدل হলে وجه تشبيه -এর ব্যাখ্যা। আর لا يحتمل তার ওপর عطف হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ প্রশ্ন : কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, ওয়াক্ত হলো ইবাদত ওয়াজিব হওয়ার সবাব। আর আমরের সীগা হলো আদায় ওয়াজিব হওয়ার সবাব। সুতরাং আমর থেকে সবাবকে কিভাবে অস্বীকার করা যেতে পারে? অর্থাৎ ওয়াক্ত (সবাব) এর তাকরার দ্বারা মূল ওয়াজিব হওয়ার মধ্যে তাকরার হবে। কিন্তু وجوب ادا যেহেতু আমর দ্বারা সাব্যস্ত। এ কারণে وجوب ادا এর তাকরারও আমর দ্বারা সাব্যস্ত হবে। আর তখন এ বিষয়টিও সাব্যস্ত হবে যে, আমর তাকরার দাবি করে।

উত্তর : এর উত্তর এই যে, প্রত্যেক সবাবের অস্তিত্বের সময় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পরোক্ষভাবে আমর বা নির্দেশ পাওয়া যায়। অর্থাৎ যখনই নামাযের সময় হয় তখনই আল্লাহ তা'আলা বলেন أَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ যখন যাকাতের সময় আসে তখন বলেন اٰتُوا الزَّكٰوةَ যাকাত আদায় করো। সুতরাং প্রত্যেক সবাবের সময় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পরোক্ষভাবে ইবাদতের নির্দেশ করা হয়। কাজেই ইবাদতের ক্ষেত্রে এই নতুন নতুন নির্দেশের কারণে তা পালন করা ওয়াজিব হয়। সহজ কথায়– একবার নির্দেশ দ্বারা একবারই নামায ওয়াজিব হয়। এভাবে রোযা, যাকাত ইত্যাদির ক্ষেত্রেও।

قوله وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رح لَمَّا احْتَمَلَ الخ : এ ইবারতের দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতবিরোধকে স্পষ্ট করা উদ্দেশ্য যা হানাফী এবং তাদের মাঝে মূলনীতির ক্ষেত্রে সূচিত হয়েছে। মূলনীতির মধ্যে মতভেদের কারণে মতনে উল্লেখিত মাসআলায়ও মতভেদ হয়েছে। তা এভাবে যে, ইমাম শাফেয়ী (র) এর নিকট আমর তাকরারের সম্ভাবনা রাখে। চাই তা শরীআত প্রবর্তকের আমর হোক বা অন্য কারো। সুতরাং স্বামীর এ উক্তি طلقى نفسك এর ক্ষেত্রে স্ত্রী নিজের উপর ২ তালাক পতিত করারও অনুমতি রাখে যখন স্বামী তার নিয়ত করে। আর হানাফীগণের মতে আমর যেহেতু তাকরারের সম্ভাবনা রাখে না। এ কারণে তাদের মতে উল্লেখিত মাসআলায় স্ত্রী নিজের উপর ২ তালাক পতিত করার অনুমতি রাখে না। যদিও স্বামী তার নিয়ত করে। স্বামী যদি কোনো নিয়তই না করে অথবা কেবল ১ তালাকের নিয়ত করে সে ক্ষেত্রে স্ত্রী নিজের উপর ১ তালাক কার্যকর করার অধিকার রাখে। যেমন হেদায়া গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে যে, যদি কেউ নিজ স্ত্রীকে طلق نفسك বলে এবং কোনো নিয়ত না করে অথবা ১ তালকের নিয়ত করে। আর উত্তরে স্ত্রী طلقت نفسى বলে তাহলে তার উপর ১ তালাকে রজয়ী পতিত হয়। কারণ এক্ষেত্রে স্বামী যে তালাক সোপর্দ করেছিলো তা ছিলো صريح আর صريح তালাকে রজয়ী পতিত হয়। অতএব উপরোক্ত ক্ষেত্রেও রজয়ী তালাক পতিত হবে।

قوله ثُمَّ أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ بِتَقْرِيْبِ الخ : আমর এবং ইসমে ফায়েল তাকরারের সম্ভাবনা না রাখার ব্যাপারে যেহেতু উভয়টি মুশতারিক। এ কারণে মুসান্নিফ (র) আমরের পরে ইসমে ফায়েলের আলোচনা উল্লেখ করেছেন। মুসান্নিফ (র) বলেন– আমরের ন্যায় ইসমে ফায়েলও শাব্দিক দিক দিয়ে মাসদারের অর্থ বোঝায় এবং تكرار عدد এর সম্ভাবনা রাখে না। সারকথা এই যে, ইসমে ফায়েল হলো مشبه এবং আমরের সীগা হলো مشبه به - يَدُلُّ عَلَى الْمَصْدَرِ لُغَةً বাক্যটি لَا يَحْتَمِلُ الْعَدَدَ এর উপর মা'তুফ হয়েছে। উভয়টি মিলে وجه تشبيه অর্থাৎ ইসমে ফায়েল ২ দিক দিয়ে আমরের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। ১. শাব্দিক দিক দিয়ে মাসদারের অর্থ বোঝানোর ক্ষেত্রে। ২. সংখ্যা ও তাকরারের সম্ভাবনা না রাখার ক্ষেত্রে।

وَفِى بَعْضِ النُّسَخِ لَا يَحْتَمِلُ بِدُوْنِ الْوَاوِ فَيَكُونُ هُوَ بَيَانُ وَجْهِ التَّشْبِيهِ وقوله يَدُلُّ وقع حَالًا اى كَذَا إِسْمُ الْفَاعِلِ لا يَحْتَمِلُ الْعَدَدَ حال كَوْنِهِ يَدُلُّ عَلَى الْمَصْدَرِ لغةً فَهُوَ اِحْتِرَازٌ عَنْ إِسْمِ الفاعِلِ الَّذِى يَدُلُّ عليه اقتضاءً مِثْلُ قَوله أَنْتِ طَالِقٌ فَإِنَّه خَارِجٌ عَمَّا نَحْنُ فِيهِ وَسَيَأْتِي بَيَانُه - حَتّٰى لَا يُرَادُ بِآيَةِ السَّرِقَةِ إِلَّا سَرِقَةٌ واحِدَةٌ وبِالْفِعْلِ الْوَاحِدِ لَا تُقْطَعُ إِلَّا يَدٌ وَاحِدَةٌ تفريعٌ على عَدَمِ اِحْتِمَالِ إِسْمِ الفاعِلِ التَّكْرَارَ وَإِلْزَامٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ رح فِيمَا ذَهَبَ اِلَيْهِ بَيَانُه أَنَّ الشافعيَّ رح يقولُ إِنَّ السَّارِقَ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنٰى أَوَّلًا ثُمَّ رِجْلُهُ الْيُسْرٰى ثَانِيًا ثُمَّ يَدُهُ الْيُسْرٰى ثَالِثًا ثم رِجْلُه الْيُمْنٰى رابعًا لِقَولِه عليه السَّلام مَنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوْهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوْهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوْهُ - وَعِنْدَنَا لَا تُقْطَعُ الْيَدُ الْيُسْرٰى فِى الثَّالِثَةِ بَلْ يُخَلَّدُ فِى السِّجْنِ حَتّٰى يَتُوْبَ لِأَنَّ السَّارِقَ إِسْمُ فاعِلٍ يَدُلُّ عَلَى الْمَصْدَرِ لُغَةً والمَصْدَرُ لا يُرَادُ به إِلَّا الْوَاحِدُ اَوِ الْكُلُّ وكُلُّ السَّرِقَاتِ لا يُعْلَمُ إِلَّا فِى اٰخِرِ الْعُمُرِ فصارَ الواحدُ مُرَادًا بِيَقِيْنٍ وبِالْفِعْلِ الْوَاحِدِ لا تُقْطَعُ إِلَّا يَدٌ واحِدَةٌ وايضًا فَاقْطَعُوا دَالٌّ عَلَى الْقَطْعِ وهُوَ أَيْضًا لا يَحْتَمِلُ العَدَدَ فلا تَثْبُتُ الْيَدُ الْيُسْرٰى مِنَ الْآيَةِ

অনুবাদ ॥ কোন কোন নুসখায় لا يحتمل শব্দটি واو ব্যতীত উল্লেখ আছে। তখন এটা وجه التشبيه এর ব্যাখ্যা হবে ; গ্রন্থকারের উক্তি يدل হবে حال বা অবস্থাজ্ঞাপক। অর্থাৎ একইভাবে اسم فاعل সংখ্যার ধারণা দেয় না এমতাবস্থায় যে, তা (اسم فاعل) আভিধানিকভাবে مصدر নির্দেশ করে। এর দ্বারা ঐ اسم فاعل হতে আলাদা করা হয়েছে যা اقتضاء। তথা চাহিদাগতভাবে تكرار বুঝিয়ে থাকে। যেমন- স্বামীর উক্তি أنت طالق কেননা আমরা যা নিয়ে আলোচনা করছি এটা তা হতে আলাদা। এর ব্যাখ্যা সামনে আসছে।

ফলে চুরির আয়াতে একবার চুরি ছাড়া (বেশি) উদ্দেশ্য নেয়া যাবে না এবং একই কাজের দরুন এক হাতই কাটতে হবে। এটা اسم فاعل। তাকরারের সম্ভাবনা না রাখার বিষয়ে শাখা মাসআলা এবং ইমাম শাফেয়ী (র)-এর অনুসৃত মাযহাবের বিরুদ্ধে উত্থাপিত একটি আপত্তি।

ইবারতের ব্যাখ্যা : ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন প্রথমে চোরের ডান হাত কাটতে হবে, অতপর দ্বিতীয়বার বাম পা, তৃতীয়বার বাম হাত এবং চতুর্থবার ডান পা। কারণ, রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি চুরি করে তাকে কেটে দাও, যদি আবার করে তবে আবার কাট, যদি এরপরও চুরি করে তবে আবারও কাট, যদি আবার করে তবে আবারও কাট। আমাদের আহনাফের মতে, দ্বিতীয়বারে বাম পা কাটা হবে না। বরং একাধারে তাকে জেলে আটকে রাখা হবে তওবা না করা পর্যন্ত। কারণ, سارق শব্দটি اسم فاعل যা আভিধানিকভাবে مصدر বুঝায়। আর مصدر দ্বারা একটি فرد বা একক অথবা সবগুলো একক ছাড়া উদ্দেশ্য নেয়া যায় না। আর চোরের সকল চুরি তার জীবনের শেষ লগ্ন ছাড়া জানা সম্ভব নয়। তাই নিশ্চিতভাবে একটি (চুরি) উদ্দেশ্য হবে ও একটি কাজের অপরাধের জন্যে একটি হাত ছাড়া কিছু কাটা যায় না। আর فاقطعوا শব্দটিও قطع (কর্তন) বুঝায়, সেটাও সংখ্যা বুঝায় না। সুতরাং, আয়াত দ্বারা বাম হাত সাব্যস্ত হয় না।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ কোনো কোনো নুসখায় يَحْتَمِلُ ওয়াও বিহীন উল্লেখ রয়েছে। এ সময় এ শব্দটি وجه تشبيه বর্ণনার জন্য হবে এবং يَدُلُّ عَلَى الْمَصْدَرِ لُغَةً ফায়েলের যমীর থেকে হাল হবে। পূর্ণ বাক্যের উদ্দেশ্য এই হবে যে, এভাবে ইসমে ফায়েলও সংখ্যার সম্ভাবনা রাখে না। এ অবস্থায় যে, তা শব্দের দিক দিয়ে মাসদারের অর্থ প্রকাশ করবে।

নূরুল আনওয়ার গ্রন্থকার বলেন– মতনে উল্লেখিত لغة দ্বারা ইসমে ফায়েল বের হয়ে গেলো যা মাসদারের উপর اقتضاء স্বরূপ দালালত করে। উদাহরণ স্বরূপ انت طالق এর মধ্যে طالق শব্দটি ইসমে ফায়েল। শাব্দিকভাবে ঐ তালাক বুঝায় যে তালাক মহিলার সিফত। কিন্তু تطليق এর অর্থে যে তালাক এবং পুরুষের ক্রিয়া তার উপর طالق শব্দ اقتضاء স্বরূপ বোঝায়। আর তা শরীআতের দৃষ্টিকোণে চাহিদাগতভাবে সাব্যস্ত হয় শাব্দিকভাবে নয়। طالق শব্দটি চাহিদাগতভাবে এ কারণে تطليق বোঝায় যে, স্বামীর উক্তি انت طالق ঐ সময়ই বিশুদ্ধ হবে যখন এর মধ্যে تطليق উহ্য মেনে নেয়া হয়। কেননা স্বামীর উক্তি انت طالق এর দ্বারা সে স্ত্রীকে তালাক প্রাপ্তা হওয়ার সংবাদ দিচ্ছে। আর এ সংবাদ ঐ সময়ই সঠিক হতে পারে যখন তার পক্ষ থেকে تطليق বা তালাক দেয়া পাওয়া যায়। সুতরাং স্বামীর উক্তি انت طالق এ বিষয়ের দাবি করে যে, স্বামীর পক্ষ থেকে আগে تطليق বা তালাক দেয়া বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, طالق শব্দটি চাহিদাগতভাবে تطليق বোঝায়। আর যে ইসমে ফায়েল চাহিদাগতভাবে মাসদার বোঝায় তা আমাদের আলোচনা বর্হিভূত। এটাকে বের করার জন্যই মাতিন (র) لغة শব্দ বৃদ্ধি করেছেন। এর বিস্তারিত বর্ণনা সামনে আসছে।

قوله حتى لايراد باية السرقة الخ : নূরুল আনওয়ার গ্রন্থকার বলেন– মতনের ইবারত দ্বারা এ মাসআলা পেশ করা হয়েছে যে, আমর তাকরারের সম্ভাবনা রাখে না। ইমাম শাফেয়ী (র) যেহেতু তাকরারের প্রবক্তা। এ কারণে এই ইবারত দ্বারা তার উপর الزام কায়েম করাও এ উদ্দেশ্য। এর ব্যাখ্যা এই যে, ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে একবার চুরি করলে চোরের ডানহাত কাটতে হবে। এরপরে যদি সে চুরি করে তাহলে তার বাম পা কাটতে হবে। এরপরও চুরি করলে বাম হাত কাটতে হবে। চতুর্থবার চুরি করলে তার ডান পা কাটতে হবে।

দলিল : ইমাম শাফেয়ী (র) এ ব্যাপারে নিম্নের হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন مَنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوْهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوْهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوْهُ আল্লামা ইবনুল হুমাম ফতহুল কাদীর গ্রন্থে বলেন– এই হাদীসটি দারকুতনী গ্রন্থে এভাবে বর্ণিত হয়েছে قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ فَاقْطَعُوْا يَدَهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوْا رِجْلَهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوْا يَدَهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوْا رِجْلَهُ আমাদের মতে বাম পা কাটার পর যদি চতুর্থবার চুরি করে তাহলে তার বাম পা কাটা যাবে না। বরং তাকে জেলখানায় আবদ্ধ করতে হবে। যতোক্ষণ না সে তওবা করে বা মৃত্যুবরণ করে।

দলিল : আল্লাহ তা'আলা চোরের সাজা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন– اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا এই আয়াতে سارق শব্দটি ইসমে ফায়েল। আর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শাব্দিক দিক দিয়ে ইসমে ফায়েল মাসদারের অর্থ বোঝায়। আর মাসদার যেহেতু ইসমে জিনস। এ কারণে তার দ্বারা হয়তো ফরদে হাকিকী (১) উদ্দেশ্য হবে অথবা ফরদে হুকমী (সকল চুরির সমষ্টি) উদ্দেশ্য হবে; কিন্তু সকল চুরি মৃত্যুর পূর্বক্ষণে জানা যায়। এর পূর্বে তা অবগত হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই আয়াতে যদি ফরদে হুকমী উদ্দেশ্য নেয়া হয় তাহলে উদ্দেশ্য এই হবে যে, চোরের হাত কর্তন তার জীবনের শেষলগ্ন পর্যন্ত মওকূফ থাকবে। কারণ সে সময়ই তার সম্পূর্ণ চুরি অবগত হওয়া যাবে। আর মৃত্যুর পূর্বক্ষণেই তার হাত কর্তন করতে হবে। অথচ এটা ইজমা মতে গ্রহণযোগ্য নয়। মোটকথা চুরির ফরদে হুকমী উদ্দেশ্য নেয়া বাতিল। কাজেই ফরদে হাকিকী নিশ্চিতভাবে উদ্দেশ্য হবে। অর্থাৎ আয়াতে চুরি দ্বারা এক চুরি উদ্দেশ্য হবে। আর এক চুরি দ্বারা একই হাত কাটা হবে। কাজেই আয়াত দ্বারা বাম হাত কাটা সাব্যস্ত হবে না। এটা এভাবেও সাব্যস্ত করা যেতে পারে যে, আয়াতে فاقطعوا আমরের সীগাটি قطع মাসদার বোঝায়। আর মাসদার যেহেতু সংখ্যার সম্ভাবনা রাখে না। এ কারণে আয়াত দ্বারা কেবল ডান হাত কাটা সাব্যস্ত হবে।

لَا يُقَالُ فَيَنْبَغِي اَنْ لَا تُقْطَعَ الرِّجْلُ الْيُسْرَى فِي الْكَرَّةِ الثَّانِيَةِ اَيْضًا لِاَنَّا نَقُولُ اِنَّ الرِّجْلَ غَيْرُ مُتَعَرِّضَةٍ بِهَا فِي الْاٰيَةِ فَلَا بَأْسَ اَنْ يَثْبُتَ بِنَصٍّ اٰخَرَ وَالْيَدُ لَمَّا كَانَتْ مُتَعَرِّضَةً بِهَا فِي الْاٰيَةِ وَتَعَيَّنَ الْيُمْنَى مُرَادًا مِنْهَا لَا يَجُوزُ اَنْ تَثْبُتَ الْيُسْرَى بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الَّذِي لَاتَجُوزُ الزِّيَادَةُ بِهِ عَلَى الْكِتَابِ لِاَنَّهُ لَمْ يَبْقَ الْمَحَلُّ الْمُعَيَّنُ الَّذِي تَعَيَّنَ بِالْاِجْمَاعِ بِخِلَافِ الْجَلْدِ فَاِنَّهُ كُلَّمَا يَزْنِي غَيْرُ الْمُحْصِنِ يُجْلَدُ لِاَنَّ الْبَدَنَ صَالِحٌ لِلْجَلْدِ دَائِمًا -

অনুবাদ ॥ একথা বলা যাবে না যে, দ্বিতীয়বার (চুরির কারণে) বাম পাও না কাটা উচিত। কেননা, আমরা বলে থাকি যে, আয়াতের মধ্যে পায়ের বিষয়টি আলোচিত হয় নি। তাই অন্য দলিলের মাধ্যমে তা সাব্যস্ত করাতে কোন দোষ নেই। আর হাতের বিষয়টি যেহেতু আয়াতে আলোচিত হয়েছে এবং উদ্দেশ্যগতভাবে ডান হাত নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। সেহেতু খবরে ওয়াহিদের মাধ্যমে বাম হাত সাব্যস্ত করা বৈধ হবে না। যার দ্বারা كتاب الله এর ওপর অতিরিক্ত করা বৈধ নয়। কেননা, নির্দিষ্ট করার মত আর কোন ক্ষেত্র বাকি নেই যা اجماع এর মাধ্যমে স্থির হয়েছে।

তবে বেত্রাঘাত করার বিষয়টি স্বতন্ত্র, সুতরাং যখনি অবিবাহিত ব্যক্তি যিনা করবে তখনি তাকে বেত্রাঘাত করা হবে। কেননা মহল বা শরীর সর্বদাই বেত্রাঘাত গ্রহণের উপযোগী।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله لَا يُقَالُ فَيَنْبَغِي الخ : এর দ্বারা ব্যাখ্যাকার একটি প্রশ্ন এবং তার উত্তর দিচ্ছেন।

প্রশ্ন : قطع শব্দটি যেহেতু মাসদার। আর মাসদার তাকরারের সম্ভাবনা রাখে না। তাহলে দ্বিতীয়বার চুরি করলে এবং তার দরুন বাম পা কাটলে সে ক্ষেত্রে তো قطع এর মধ্যে তাকরার ও عدد পাওয়া গেলো। অথচ আপনারা এর প্রবক্তা নন।

উত্তর : উল্লেখিত আয়াতে পায়ের কোনো উল্লেখই নেই। অবশ্য হাত উল্লেখিত হয়েছে। আর ইজমা এবং قولى ও فعلى হাদীস মতে এর দ্বারা ডান হাত উদ্দেশ্য নেয়া সুনির্দিষ্ট।

قولى **হাদীস :** ইবনেমাযা গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রা) থেকে মাখযুমিয়া এক মহিলার ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) চুরির দরুন তার ডান হাত কর্তনের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

فعلى **হাদীস :** সাফওয়ান ইবনে উইয়াইনা থেকে দারকুতনী গ্রন্থে বর্ণিত আছে- রাসূলুল্লাহ (স) জনৈক চোরের ডান হাতের কব্জি থেকে কেটে দিয়েছিলেন। এভাবে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)এর কেরআতে ايديهما এর স্থলে ايمانهما রয়েছে। এসবগুলো দলিল দ্বারা আয়াতে ডান হাত উদ্দেশ্য হওয়াই সুনিশ্চিত। কাজেই আয়াতে যেহেতু হাত উল্লেখ রয়েছে। পায়ের কোনো উল্লেখই নেই। অতএব সম্ভাবনা আছে যে, বাম পা কর্তন করা এ আয়াত ছাড়া ভিন্ন কোনো নস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। আর তা যখন ভিন্ন নস দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং আয়াতে উল্লেখিত اقطعوا আমরের সীগার দ্বারা সংখ্যা ও তাকরার বোঝা গেলো না।

উপরোক্ত উত্তরের উপর বলা যেতে পারে যে, আয়াতে যেভাবে বাম পায়ের উল্লেখ নেই। তার জন্য বাম হাতেরও উল্লেখ নেই। সুতরাং যেভাবে ভিন্ন নস দ্বারা বাম পা কর্তন করা প্রমাণ করা শুদ্ধ। তদ্রূপ ভিন্ন নস দ্বারা বাম হাত কর্তন প্রমাণিত করাও শুদ্ধ হবে। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করা অনর্থক।

এর উত্তর এই যে, বাম পা কর্তন করা ভিন্ন নস দ্বারা প্রমাণিত করার বিষয়টি ঠিক নয়। যেমন ব্যাখ্যাকার (র) বলেছেন– বরং সঠিক বিষয় এই যে, দ্বিতীয়বার চুরি করার দ্বারা বাম পা কর্তন করা ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। যেমন আল্লাম ইবনুল হুমাম (র) উল্লেখ করেছেন। বাকী তৃতীয়বার চুরি করার দরুন বাম হাত কর্তন করা খবরে ওয়াহিদ দ্বারা প্রমাণিত করা জায়েয নয়। কারণ এর দ্বারা কিতাবুল্লাহর উপর অতিরঞ্জন সাব্যস্ত হয়। আর তা জায়েয নয়। আর খবরে ওয়াহেদ দ্বারা বাম পা কর্তন করাকে প্রমাণিত করা এ কারণে নাজায়েয যে, ডান হাত কর্তনের পর সে ক্ষেত্র অবশিষ্ট থাকে না যা ইজমা ও হাদীস মতে নির্দিষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ ডান হাত অবশিষ্ট থাকে না।

قوله بِخِلَافِ الْجَلْدِ الخ : এর দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দেয়া উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন : اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا এর মধ্যে الزاني، الزانية শব্দ দুটি ইসমে ফায়েল। আর ইসমে ফায়েল عدد এর সম্ভাবনা রাখে না। এভাবে فاجلدوا আমরের সীগাও عدد এর সম্ভাবনা রাখে না। অতএব গায়রে মুহসান ব্যক্তি যিনায় লিপ্ত হওয়ার কারণে তাকে কেবল একবারই বেত্রাঘাত করা উচিত। এরপর তাকে বেত্রাঘাত করা উচিত নয়। অথচ শরয়ী বিধান এর বিপরীত। কারণ দ্বিতীয়বার যিনা করলেও তাকে বেত্রাঘাত করতে হবে এভাবে চতুর্থ, পঞ্চম প্রতিবারই বেত্রাঘাত করতে হবে।

উত্তর : বেত্রাঘাতের ক্ষেত্র হলো মানুষের শরীর। আর ব্যক্তি বেচে থাকা পর্যন্ত শরীর বেত্রাঘাতের যোগ্যতা রাখে। এ কারণেই গায়রে মুহান ব্যক্তি যতোবার যিনা করবে ততোবার তাকে বেত্রাঘাত করতে হবে। সুতরাং এখানে مسبب (বেত্রাঘাত) এর তাকরার سبب (যিনা) এর তাকরারের কারণে হচ্ছে এবং محل তথা শরীর তা গ্রহণের যোগ্যতা রাখছে। আর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সবাব বারবার পাওয়া গেলে মুসাববাবও বারবার পাওয়া যায়। কিন্তু চুরি এর বিপরীত। কারণ চুরির মধ্যে কর্তনের ক্ষেত্র ইজমা মতে ডান হাত। প্রথমবার চুরি দ্বারা হাত কর্তনের ফলে পরবর্তীতে তার ক্ষেত্র বাকী থাকে না। এ কারণে হাত কর্তনের বিধানে তাকরার সম্ভব নয়।

وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ رح عَنْ بَيَانِ التَّكْرَارِ وَعَدَمِهِ شَرَعَ فِى تَقْسِيمِ الْوُجُوْبِ فَقَالَ وَحُكْمُ الاَمْرِ نَوْعَانِ اداءٌ وهُوَ تَسْلِيْمُ عَيْنِ الْوَاجِبِ بِالاَمْرِ يعنى مَا ثبتَ بِالاَمْرِ وهُو الوُجوبُ نَوْعَانِ وجوبُ اداءٍ و وُجوبُ قضاءٍ فَالْاَداءُ هُوَ تَسْلِيْمُ عَيْنِ مَا وَجَبَ بِالاَمْرِ يَعْنِى إِخْرَاجَه مِن العَدَمِ الَى الْوُجُوْدِ فِى الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ لَهُ و هٰذا هُو معنى التَّسْلِيْمِ وَاِلاَّ فَالْاَفْعَالُ اَعْرَاضٌ لا يُتَصَوَّرُ تسليمُهَا - وقدْ ذُكِرَ فى اُصُول فخرِ الْاسلام وغيره تسليمُ نفسِ الوَاجِبِ بِالاَمْرِ فَاعْتُرِضَ عليه بِاَنَّ نَفْسَ الْوُجوبِ لا يكونُ بِالاَمْرِ بَلْ بِالْوَقْتِ اُجِيبَ بِاَنَّ قولَه بِالاَمْرِ مُتَعَلِّقٌ بالتَّسْلِيْمِ لا بِالواجب ولهٰذا بَدَّلَ الْمُصَنِّفُ رح قولَه نَفْسَ الْوَاجِبِ بقوله عَيْنِ الْوَاجِبِ لِيُعْلَمَ اَنَّ نَفْسَ الْوَاجِبِ او عَيْنَه كِنَايَةٌ عَنْ اِتْيَانِهِ فِى الْوَقْتِ فلاَ حاجَةَ الَى زِيَادَةِ قَولِهِ فِىْ وقتِه كما زَادَ الْبَعْضُ وكذَا اِلَى قَوْلِهِ الَى مُسْتَحِقِّه لِاَنَّ قولَه بِالاَمْرِ يَدُلُّ علٰى اَنَّ الْاَمِرَ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ -

اداء وقضاء সংক্রান্ত আলোচনা

অনুবাদ ॥ গ্রন্থকার (র) امر দ্বারা تكرار হওয়া ও না হওয়ার আলোচনা থেকে অবসর হয়ে ওয়াজিবের শ্রেণী বিভাগের আলোচনা আরম্ভ করেছেন। তিনি বলেন, امر ***এর হুকুম দু প্রকার। (ক) এক প্রকার হলো*** اداء। اداء ***হলো- আমর দ্বারা যা ওয়াজিব হয়েছে, সে ওয়াজিবকে হুবহু সমর্পণ করা।*** অর্থাৎ, আমর দ্বারা যা সাব্যস্ত হয়, তাই ওয়াজিব। তা দুপ্রকার। ১. প্রথম প্রকার হলো আদা ওয়াজিব হওয়া,২. দ্বিতীয় প্রকার হলো কাযা ওয়াজিব হওয়া। সুতরাং আদা হলো- আমর দ্বারা যা ওয়াজিব হয়েছে, তা হুবহু সমর্পণ করা। অর্থাৎ, বস্তুকে তার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বের দিকে বের করে আনা। আর এটাই সমর্পণের অর্থ, অন্যথায় সমস্ত কাজই اعراض (ক্ষণস্থায়ী)। সেগুলো সমর্পণের কল্পনা করা যায় না।

আল্লামা ফখরুল ইসলাম বযদবী (র)-এর উসূলের কিতাবে এবং অন্যান্য উসূলের কিতাবে উল্লেখ রয়েছে যে, (আদা হলো) আমর দ্বারা মূল ওয়াজিবকে সমর্পণ করা। এ বক্তব্যের উপর এ প্রশ্নারোপ করা হয়েছে যে, মূল ওয়াজিব আমর দ্বারা সাব্যস্ত হয় না। বরং সময়ের দ্বারাই সাব্যস্ত হয়ে থাকে। এর উত্তর এভাবে দেয়া হয়েছে যে, গ্রন্থকারের উক্তি بالامر শব্দটি তাসলীমের সাথে সংশ্লিষ্ট; ওয়াজিবের সাথে নয়। আর এ কারণেই গ্রন্থকার (র) তার উক্তি نفس الواجب কে তার অন্য উক্তি عين الواجب দ্বারা পরিবর্তন করেছেন। যাতে এটা বুঝা যায় যে, মূল ওয়াজিব অথবা হুবহু ওয়াজিব যথাসময়ে কার্য আদায় করার প্রতি ইঙ্গিতসূচক। সুতরাং فى وقته বৃদ্ধি করার কোন প্রয়োজন নেই। যেমনটি কোন কোন মনীষী করেছেন। তদ্রূপ 'الى مستحقه' এ কথাটিও যোগ করার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, গ্রন্থকারের উক্তি 'بالامر' এ বিষয়ের ইঙ্গিত বহন করে যে, আদেশকর্তাই এর অধিকারী বা হকদার।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله ولـمّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ رح عَنْ بَيَانِ التَّكْرَارِ الخ : নুরুল আনওয়ার গ্রন্থকার মোল্লা জিয়ন (র) বলেন– মুসান্নিফ (র) তাকরার হওয়া না হওয়ার আলোচনা শেষ করার পরে وجوب এর প্রকারভেদ বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন– আমরের বিধান ২ প্রকার। ১. اداء, ও ২. قضاء। আমরের বিধান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আমর থেকে সাব্যস্ত বিষয়। আর আমর দ্বারা وجوب সাব্যস্ত হয়। কাজেই কেমন যেন وجوب ২ প্রকার হলো। ১. وجوب اداء .২ وجوب قضاء

وجوب اداء-এর সংজ্ঞা : আমর দ্বারা যা সাব্যস্ত হয় হুবহু তা সমর্পণ করা। অর্থাৎ اِخْرَاجُهٗ مِنَ الْعَدَمِ اِلَى الْوُجُوْدِ এর দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে।

প্রশ্ন : وجوب اداء এর সংজ্ঞায় تسليم শব্দ উল্লেখ রয়েছে। আর তাসলীম বলে কোনো বস্তুকে নিজের থেকে অন্যের কাছে স্থানান্তর করাকে। আর ওয়াজিব হলো একটি বিশেষণ বা وصف যা কারো জিম্মায় হয়ে থাকে। আদায় করা একটা ফে'ল বা কাজ। আর তা হলো افعال এর অন্তর্গত যা স্থানান্তর কবুল করে না। সুতরাং ওয়াজিবকে আদায় করা যখন ফে'ল, আর ফে'ল হলো عرض আর اعراض স্থানান্তর কবুল করে না। সুতরাং وجوب اداء এর সংজ্ঞায় تسليم শব্দ উল্লেখ করা কিভাবে সঠিক হতে পারে?

উত্তর : تسليم এর অর্থ হলো বস্তুকে তার নির্ধারিত সময়ে নাস্তি থেকে অস্তিত্বে আনা। আর এ অর্থ وجوب اداء এর মধ্যেও পাওয়া যায়। কেননা মুকাল্লাফ ব্যক্তি ওয়াজিব ক্রিয়াকে তার নির্ধারিত সময়ে নাস্তি থেকে অস্তিত্বে আনে। সুতরাং সংজ্ঞায় তাসলীম শব্দ উল্লেখ করা সঠিক।

قوله وقَدْ ذُكِرَ فِىْ اُصُوْلِ الخ : নুরুল আনওয়ার গ্রন্থকার বলেন উসূলে ফখরুল ইসলাম এবং অন্যান্য কিতাবাদিতে اداء এর সংজ্ঞা এভাবে উল্লেখিত হয়েছে تَسْلِيْمُ نَفْسِ الْوَاجِبِ بِالْاَمْرِ অর্থাৎ আমর দ্বারা মূল ওয়াজিবকে সোপর্দ করা। সারকথা এই যে, উক্ত কিতাবাদিতে عين ما وجب এর স্থলে نفس الواجب শব্দ উল্লেখ হয়েছে। তবে এর উপর প্রশ্ন এই যে, আমর দ্বারা نفس وجوب সাব্যস্ত হয় না। বরং ওয়াক্ত দ্বারা সাব্যস্ত হয়। অথচ এর সংজ্ঞা দ্বারা বোঝা যায় যে, আমর দ্বারা نفس وجوب সাব্যস্ত হয়?

উত্তর : تسليم نفس الواجب بالامر এর মধ্যে بالامر তাসলীমের সাথে মুতাআল্লিক; ওয়াজিবের সাথে মুতাআল্লিক নয়। এখন উদ্দেশ্য এই হবে যে, মূল ওয়াজিবকে আমর দ্বারা অর্পণ করার নাম হলো اداء অর্থাৎ মূল ওয়াজিব যা অর্থ দ্বারা সাব্যস্ত হয় তাকে আমর দ্বারা সোপর্দ করা। এক্ষেত্রে আমর দ্বারা وجوب اداء হাসিল হবে نفس وجوب দ্বারা নয়।

মোটকথা উসূলে ফখরুল ইসলাম ইত্যাদিতে উল্লেখিত وجوب اداء এর সংজ্ঞার উপর যেহেতু প্রশ্ন উত্থাপিত হয়; এ কারণে মুসান্নিফ (র) نفس واجب এর স্থলে عين واجب উল্লেখ করেছেন।

ব্যাখ্যাকার বলেন– وجوب اداء এর সংজ্ঞায় نفس واجب বা عين واجب যে শব্দই হোক উভয় দ্বারা কেনায়া স্বরূপ উদ্দেশ্য হলো ওয়াজিবকে নির্ধারিত সময়ে আদায় করা। সুতরাং وجوب اداء এর সংজ্ঞায় فى وقته বৃদ্ধি করে এমন বলার কোনো প্রয়োজন নেই যে, تَسْلِيْمُ عَيْنَ مَاوَجَبَ بِالْاَمْرِ فِىْ وَقْتِهٖ যেমন কোনো কোনো আলিম করেছেন। কোনো কোনো ব্যক্তি اِلٰى مُسْتَحِقِّهٖ বৃদ্ধি করে وجوب اداء এর সংজ্ঞা এভাবে করেছেন تَسْلِيْمُ عَيْنِ الْوَاجِبِ بِالْاَمْرِ فِىْ وَقْتِهٖ اِلٰى مُسْتَحِقِّهٖ অর্থাৎ "হুবহু ওয়াজিবকে আমর দ্বারা তার নির্ধারিত সময়ে পাওনাদারের কাছে অর্পণ করা" কিন্তু এরও মোটেই প্রয়োজন নেই। কারণ সংজ্ঞায় بالامر শব্দ উল্লেখ রয়েছে। এটা এ কথা বোঝায় যে, নির্দেশকারী ব্যক্তিই অধিকারী হয়ে থাকে। কারণ নির্দিষ্ট বিষয়ের অধিকারী নির্দেশকারীই হয়। অন্য কেউ নয়। আর যে তার অধিকারী হয় তার নিকটই তা সোপর্দ করা হয়। সুতরাং اِلٰى مُسْتَحِقِّهٖ-এর কোনো প্রয়োজন নেই।

وَقَضَاءٌ وَهُوَ تَسْلِيْمُ مِثْلِ الْوَاجِبِ بِهِ عطفٌ على قوله أداءٌ بِمَعْنَى وُجُوبِ قضاء وَهُوَ تَسْلِيْمُ مِثْلِ الْوَاجِبِ بِالْأَمْرِ لَا عَيْنِهِ اى تَسْلِيْمُ ذٰلِكَ الْوَاجِبِ الَّذِىْ وَجَبَ أَوَّلًا فِى غَيْرِ ذٰلِكَ الْوَقْتِ وكانَ يَنْبَغِىْ اَنْ يُقَيِّدَهُ بِقوله مِنْ عِنْدِهِ لِيَخْرُجَ اداءُ ظُهْرِ الْيَوْمِ قضاءٌ عَنْ ظُهْرِ اَمْسِهِ لِاَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عِنْدِهِ بَلْ كِلَاهُمَا لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالقضاءُ اِنَّمَا هُوَ صَرْفُ النَّفْلِ الَّذِىْ كَانَ حَقًّا لَهُ اِلَى الْقَضَاءِ الَّذِىْ كَانَ عَلَيْهِ وَاِنَّمَا لَمْ يُقَيِّدْهُ بِهِ لِشُهْرَةِ اَمْرِه وكَوْنِه مَدْلُولًا عَلَيْهِ بِالْاِلْتِزَامِ - وَاَمَّا النَّفْلُ فَاِنَّمَا يُقْضٰى اِذَا لَزِمَ بِالشُّرُوْعِ و حِيْنَئِذٍ لَمْ يَبْقَ نَفْلًا بَلْ صَارَ وَاجِبًا وَلٰكِنَّهُ يُؤَدّٰى مَعَ اَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَيَنْبَغِىْ اَنْ يُرَادَ بِقَوْلِهِ عَيْنِ الْوَاجِبِ الثَّابِتِ لِيَعُمَّ النفل هٰكذا قِيْلَ وَفِيْهِ وُجُوهٌ اُخَرُ-

অনুবাদ ॥ (খ) *কাযা আর কাযা হলো ওয়াজিব সাদৃশ্য বস্তু সমর্পণ করা।* এটা গ্রন্থকারের উক্তি "اداء" এর উপরে আতফ হয়েছে। এ অর্থে যে, উজুবের কাযা হলো- আমর দ্বারা ওয়াজিবের অনুরূপ বস্তু সমর্পণ করা, হুবহু ওয়াজিব নয়। অর্থাৎ, (আমর দ্বারা) যা প্রথমতঃ ওয়াজিব হয়েছে ঐ ওয়াজিবটি ঐ সময় ব্যতীত অন্য সময়ে কার্যে পরিণত করা।

কাযার সংজ্ঞায় من عنده কথাটি যুক্ত করা সমীচীন ছিল। যাতে অদ্যকার যোহরের আদা গতকালের যোহরের কাযাকে (সংজ্ঞা থেকে) বের করে দেয়। কেননা, আজকের যোহরের আদা মুকাল্লাফের পক্ষ থেকে নয়, বরং উভয়টি আল্লাহ তা'আলারই পক্ষ থেকে। আর কাযা হলো- যে নফলটি তার (মুকাল্লাফের) দায়িত্বে ছিল, সে নফলকে রূপান্তরিত করা ঐ কাযার দিকে, যা তার উপরে ওয়াজিব ছিল। এটা প্রসিদ্ধির কারণে এবং আনুষঙ্গিকভাবে তা বোধগম্য হওয়ার কারণে মুসান্নিফ (র) এটাকে শর্তযুক্ত করেননি।

আর নফল (তখনই) কাযা হয়ে থাকে, যখন আরম্ভ করার দ্বারা তা আবশ্যক হয়। এ সময় নফল নফল হিসেবে বাকি থাকে না, বরং তা ওয়াজিব হয়ে যায়। কিন্তু তা ওয়াজিব না হওয়া সত্ত্বেও তা আদায় করা হয়। সুতরাং গ্রন্থকারের উক্তি- عين الواجب দ্বারা عين الثابت উদ্দেশ্য নেয়া উচিত, যাতে নফলও এর অন্তর্ভুক্ত হয়। কেউ কেউ অনুরূপ বলেছেন। এ বিষয়ে আরো অনেক উক্তি রয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله وَقَضَاءٌ وَهُوَ تَسْلِيْمُ بِمِثْلِ الْوَاجِبِ الخ : মতনের এই ইবারত পূর্বের اداء বা مثل واجب بالامر - وجوب قضاء এর উপর মা'তূফ। সারকথা এই যে, وَهُوَ تَسْلِيْمُ عَيْنِ الْوَاجِبِ بِالْاَمْرِ এর উপর মা'তূফ। সারকথা এই যে, অনুরূপ অর্পণ করাকে বলে। হুবহু ওয়াজিব বস্তু অর্পণ করাকে বলে না। অর্থাৎ প্রথমত যে বস্তু ওয়াজিব হয়েছে তাকে তার সুনির্ধারিত সময় ছাড়া তার অধিকারীর নিকট সোপর্দ করাকে قضاء বলে।

قوله وَكَانَ يَنْبَغِىْ اَنْ يُقَيِّدَهُ الخ : এটা একটা প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন: মতনে উল্লেখিত قضاء এর সংজ্ঞা دخول غير (অন্য বস্তু প্রবেশ) থেকে প্রতিবন্ধক নয়। কারণ قضاء এর সংজ্ঞা আজ আদায়কৃত যোহরের উপরও প্রযোজ্য হয়। তা এভাবে যে, এক ব্যক্তি গতকাল যোহরের নামায আদায় করতে পারেনি। আজ সে আদায় করছে। তাহলে আজকের যোহরের নামায গতকালের যোহরের নামাযের ন্যায় হলো। আর গতকালের যোহরের নামাযটি আমরের দ্বারা ওয়াজিব হয়েছিলো। সুতরাং আজকের যোহরের নামযের উপর একথা প্রযোজ্য হয় যে, এ ব্যক্তি আমর দ্বারা ওয়াজিবের ন্যায় (আজকের যোহর) কে সোপর্দ করছে। আর ওয়াজিবের ন্যায় বস্তু সোপর্দ করাকে কাযা বলে। সুতরাং আজকে যোহরের নামায আদায় করার উপর কাযার

সংজ্ঞা প্রযোজ্য হচ্ছে। অতএব কাযার সংজ্ঞা دخول غير এর مانع (প্রতিবন্ধক) থাকলো না। অথচ সংজ্ঞার জন্যে مانع عن دخول الغير হওয়া আবশ্যক।

উত্তর : কাযার সংজ্ঞায় من عنده শব্দ উহ্য রয়েছে। অতএব এখন সংজ্ঞা এমন হবে– আমর দ্বারা ওয়াজিবের অনরূপ বস্তু নিজের নিকট থেকে সোপর্দ করা অর্থাৎ আজকের যোহরের اداء এবং গতকালকের যোহরের قضاء উভয়টি مامور তথা নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরয। কিন্তু মামূর ব্যক্তি আদায়ের উপর যে সময় ব্যয় করে তা আল্লাহর হক ছিলো অর্থাৎ আল্লাহই তাকে এ সময় এ ফরয আদায় করার জন্য নির্ধারণ করেছেন। ওয়াক্ত যেহেতু আল্লাহর হক। আর আজকের যোহর আদায় করার জন্য তা নির্ধারণ করেছেন। অতএব আজকের যোহর আদায় করা মামূর ব্যক্তির নিজ পক্ষ থেকে সোপর্দ করা এবং আদায় করা সাব্যস্ত হবে না। অবশ্য মামূর ব্যক্তি যে সময় কাযা আদায় করে সে সময়টা তার হক। সে সময় নির্দেশিত ব্যক্তি নফল আদায় করতে পারে বা বিশ্রামও করতে পারে।

মোটকথা সে সময়টা হলো নির্দেশিত ব্যক্তি বা বান্দার হক। কিন্তু সে ঐ সময়কে কাযা আদায় করার মধ্যে ব্যয় করলো যা তার উপর ওয়াজিব ছিলো। সুতরাং কেমন যেন মামূর ব্যক্তি কাযাকে নিজের পক্ষ থেকে সোপর্দ করলো।

সারকথা এই যে, নির্দেশিত ব্যক্তি নিজের পক্ষ থেকে কাযাকে সোপর্দ করে। আর আদায়টা নিজের পক্ষ থেকে সোপর্দ করে না। সুতরাং কাযার সংজ্ঞায় مِنْ عِنْدِه ধর্তব্য করার পরে আদায়ের উপর কাযার সংজ্ঞা প্রযোজ্য হয় না এবং তা دخول غير থেকে প্রতিবন্ধক হবে।

প্রশ্ন : যদি কেউ এ প্রশ্ন করে যে, কাযার সংজ্ঞায় যখন مِنْ عِنْدِه ধর্তব্য তাহলে সংজ্ঞা বর্ণনার সময় মতনে তা উল্লেখ করা হলো না কেন?

উত্তর : এর দুটি উত্তর রয়েছে– ১. একথা সুপ্রসিদ্ধ যে, মামূর তথা নির্দেশিত ব্যক্তির নিজের পক্ষ থেকে কাযা আদায় করে। এই প্রসিদ্ধতার কারণে এটা উল্লখ করা হয়নি।

২. কাযার সংজ্ঞায় উল্লেখিত مثل শব্দটি (التزاما) এ বিষয়টি বোঝায়। কারণ مثل শব্দের উদ্দেশ্য এই যে, যা ছুটে যাওয়া বস্তুর পরিবর্তে সাব্যস্ত হয়। আর একথা স্বীকৃত যে, কোনো কিছুর বিনিময় বা পরিবর্তে আদায়কৃত বিষয়টি নিজের পক্ষ থেকেই অর্পণ করে। সুতরাং مثل শব্দ যা مِنْ عِنْدِه এর উপর দালালাত করে তাকে স্পষ্ট আকারে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।

قوله وَأَمَّا النَّفْلُ فَإِنَّمَا الخ : এটা একটা প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন : কাযার সংজ্ঞা তার সকল افراد কে শামিলকারী নয়। কারণ নফল শুরু করার পূর্বে যদি কেউ তা নষ্ট করে, এরপর সে তা কাযা করে তাহলে তার উপর কাযার সংজ্ঞা প্রযোজ্য হয় না। কেননা কাযা হলো আমর দ্বারা ওয়াজিব বিষয়ের মিসলকে সোপর্দ করা। আর নফল যেহেতু ওয়াজিব নয়। সুতরাং তার উপরে এই সংজ্ঞা ফিট হয় না। অতএব এই সংজ্ঞা جامع নয়।

উত্তর : নফল শুরু করার সাথে সাথে ওয়াজিব হয়ে যায়। এরপর তা নষ্ট করলে সে যেন ওয়াজিব জিনিসকেই নষ্ট করলো। আর ওয়াজিব নষ্ট করলে তার কাযা ওয়াজিব হয়ে যায়। অতএব যেহেতু ওয়াজিবেরই কাযা করা হচ্ছে। সে হিসেবে ওয়াজিবের মিসলকেই যেন সোপর্দ করা হচ্ছে। সুতরাং কাযার সংজ্ঞা جامع প্রমাণিত হলো।

قوله وَلٰكِنَّهُ يُؤَدِّي مَعَ أَنَّهُ الخ : এটাও একটা প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন : নফল আদায় করাও এক পর্যায়ে اداء। কিন্তু তার উপর اداء এর সংজ্ঞা প্রযোজ্য হয় না। কারণ اداء এর সংজ্ঞার মধ্যে হুবহু ওয়াজিব বিষয়কে সোপর্দ করা হয়। অথচ কারোর মতেই নফল ওয়াজিব নয়। সুতরাং নফল আদায় করার উপর যেহেতু হুবহু ওয়াজিবকে সোপর্দ করা সাব্যস্ত হচ্ছে না। কাজেই নফল আদায় করা আদায়ের সংজ্ঞা থেকে বের হয়ে গেলো। ফলে সংজ্ঞাটি جامع হলো না।

উত্তর : সংজ্ঞায় ওয়াজিব দ্বারা ثابت উদ্দেশ্য। এখন আদায়ের সংজ্ঞা এমন হবে– যে বস্তু প্রমাণিত রয়েছে হুবহু তাকে সোপর্দ করার নাম হলো আদা। আর সকল মুবাহ ও নফল যেহেতু প্রমাণিত। কাজেই নফল আদায়ের উপরও

(পরের পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

وَيُسْتَعْمَلُ اَحَدُهُمَا مَكَانَ الْاٰخَرِ مَجَازًا حَتّٰى يَجُوْزَ الْاَدَاءُ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ وَبِالْعَكْسِ اى يُسْتَعْمَلُ كُلٌّ مِّنَ الْاَدَاءِ وَالْقَضَاءِ مَكَانَ الْاٰخَرِ بِطَرِيْقِ الْمَجَازِ حَتّٰى يَجُوْزَ الْاَدَاءُ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ بِاَنْ يَّقُوْلَ نَوَيْتُ اَنْ اَقْضِىَ ظُهْرَ الْيَوْمِ - وَيَجُوْزُ الْقَضَاءُ بِنِيَّةِ الْاَدَاءِ بِاَنْ يَقُوْلَ نَوَيْتُ اَنْ اُوَدِّىَ ظُهْرَ الْاَمْسِ وَاسْتِعْمَالُ الْقَضَاءِ فِى الْاَدَاءِ كَثِيْرٌ كَقَوْلِهِ تَعَالٰى فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ اى اِذَا اُدِّيَتْ صَلٰوةُ الْجُمُعَةِ لِاَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تُقْضٰى وَلِذَا ذَهَبَ فَخْرُ الاسلامِ اِلٰى اَنَّ الْقَضَاءَ عَامٌّ يُسْتَعْمَلُ فِى الْاَدَاءِ وَالْقَضَاءِ جَمِيْعًا لِاَنَّهٗ عِبَارَةٌ عَنْ فَرَاغِ الذِّمَّةِ وَهُوَ يَحْصُلُ بِهِمَا فَكَانَ فِىْ مَعْنَى الْحَقِيْقَةِ بِخِلَافِ الْاَدَاءِ فَاِنَّهٗ يُنْبِئُ عَنْ شِدَّةِ الرِّعَايَةِ وَهُوَ لَيْسَ اِلَّا فِى الْاَدَاءِ كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ : اَلذِّئْبُ يَادُوْ لِلْغَزَالِ يَاْكُلُهٗ * اى يَخْتِلُهٗ وَيَغْلِبُ عَلَيْهِ

অনুবাদ ॥ *আদা ও কাযার একটিকে অপরটির স্থলে রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়। এমনকি কাযার নিয়্যতে আদা জায়েয আছে এবং আদার নিয়তে কাযা জায়েয আছে।* অর্থাৎ, আদা এবং কাযার প্রত্যেকটিকে অপরটির স্থলে রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং কাযার নিয়্যতে আদা জায়েয আছে। এভাবে যে, কেউ বললো– আমি অদ্যকার যোহরের নামায কাযা করার নিয়্যত করলাম। (তাহলে তা বৈধ।) আর আদার নিয়্যতে কাযা জায়েয আছে, এভাবে যে, কেউ বললো, আমি গতকল্যের যোহর নামায আদায় করার নিয়্যত করলাম। অবশ্য আদার ক্ষেত্রে কাযার ব্যবহার অনেক বেশী। যেমন- মহান আল্লাহর উক্তি, 'যখন নামায আদায় হয়ে যায়, তখন তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড়'। অর্থাৎ, যখন জুমুয়ার নামায আদায় করা হয়। কেননা, জুমুয়ার নামায কাযা করা যায় না। এ কারণে, ইমাম ফখরুল ইসলাম বযদবী (র) এদিকে তার মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, কাযা হলো عام -এটা আদা-কাযা উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কেননা কাযার অর্থ হলো দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়া।

আর উক্ত অর্থ উভয়ের মাধ্যমে অর্জিত হয়। সুতরাং এটা প্রকৃত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু আদা এটার বিপরীত। কেননা, এটা কঠোরভাবে সকল দিক বিবেচনা করার অর্থ প্রদান করে। আর তা আদা ভিন্ন অন্যত্র নেই। যেমন কবির ভাষায় – اَلذِّئْبُ يَادُوْ لِلْغَزَالِ يَاْكُلُهٗ এর মধ্যে يادو শব্দটি অর্থাৎ 'চিতাবাঘ হরিণকে ভক্ষণ করার জন্যে প্রতারণা করছে'। অর্থাৎ, হরিণকে প্রতারিত করছে এবং তার ওপর জয়ী হচ্ছে।

(পূর্বের বাকী অংশ)

ادا প্রযোজ্য হবে। তবে এ উভয়টির উপরে প্রশ্নারোপিত হয় যে, সংজ্ঞায় بالامر শব্দ দ্বারা বোঝা যায় যে, আদার মধ্যে নির্দেশের দরুন তা পালন করা হয়। অথচ নফলের ব্যাপারে কোন নির্দেশ থাকে না। সোপর্দ বা পালন করা আমর দ্বারা হয় না। সুতরাং ওয়াজিবকে সাবেত করার অর্থ নেয়া সত্ত্বে নফল আদায় করার উপর আদায়ের সংজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না। এবং আদায়ের সংজ্ঞা সকল আফরাদকে জামে' হবে না।

উত্তর : নফল আদায় করার উপর আদায়ের প্রয়োগ মাজায বা রূপক অর্থে; বাস্তব অর্থে নয়। আর মাজাযের উপর প্রশ্ন আরোপিত হয় না। কাজেই নফলের ক্ষেত্রে আদায় শব্দ প্রয়োগ করলে আদায়ের সংজ্ঞা জামে হওয়ার উপর প্রশ্ন উত্থাপিত হয় না।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ الخ اداء ও قضاء এর সংজ্ঞার পরে গ্রন্থকার বলেন যে, اداء ও قضاء এর মধ্য থেকে প্রত্যেকটি অপরের স্থলে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। সুতরাং اداء এর নিয়তে قضاء জায়েয। এভাবে قضاء এর নিয়তে اداء জায়েয হবে। যেমন কেউ আজকের যোহর আদায় করার সময় বলল "আমি আজকের যোহরের নামায কাযা করার নিয়ত করছি"। তাহলে 'আজ' এর আলামতের দ্বারা আদায়ের নিয়ত করা উদ্দেশ্য হবে। এভাবে কেউ যদি বলে "আমি গতকালের যোহর আদায় করার নিয়ত করছি"। তাহলে 'গতকাল' এর আলামত দ্বারা গতকালের যোহরের কাযা করার নিয়ত উদ্দেশ্য হবে।

একথার দ্বারা এর সহায়তা মিলে যে, কেউ যদি যোহরের শেষ সময়ে ধারণা করে যে, যোহরের সময় শেষ হয়ে গেছে। অতএব কাযার নিয়ত করে যোহরের নামায পড়ে অথচ বাস্তবে যোহরের সময় ফউত হয়নি। তাহলে এরদ্বারা তার যোহরের নামায আদায় হয়ে যাবে। মোটকথা একটির স্থলে অপরটির ব্যবহার মাজাযরূপে শুদ্ধ হবে। তবে আদার অর্থে কাযার ব্যবহার বেশি। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا এর মধ্যে قُضِيَتْ শব্দটি أُدِيَتْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

দলিল : এর দলিল এই যে, জুমআর নামায কেবল আদায়ই হয়ে থাকে, এর কাযা হয় না। সুতরাং জুমআর নামাযের কাযা না হওয়া আয়াতে কাযা শব্দ দ্বারা আদায়ের অর্থ উদ্দেশ্য হওয়ার দলিল বোঝায়। একারণে আল্লামা ফখরুল ইসলাম (র) বলেন– কাযা শব্দটি আ'ম। আদা ও কাযা উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। কেননা কাযার অর্থ হলো জিম্মাদারী থেকে অবসর হওয়া বা দায়িত্ব মুক্ত হওয়া। আর আদা ও কাযা উভয় দ্বারা মানুষ দায়িত্ব মুক্ত হয়।

অতএব কাযা শব্দ যখন এমন অর্থ বোঝাবে যা কাযা ও আদা উভয় দ্বারাই অর্জিত হয় তখন قضاء শব্দের ব্যবহার اداء এর অর্থে হাকীকত হবে। এর বিপরীতে اداء শব্দ شِدَّتِ رِعَايَت তথা অধিক লক্ষ্য রাখার অর্থ বোঝায়। এ অর্থ কেবল اداء এর মধ্যেই পাওয়া যায়। যেমন কবির ভাষায় الذِّئْبُ يَأْدُو لِلْغَزَالِ يَأْكُلُهُ অর্থাৎ চিতাবাঘে হরিণকে ধোকায় ফেলে তার উপর বিজয়ী হয় এবং তাকে খেয়ে ফেলে।

সারকথা এই যে, اداء এর অর্থ হলো ধোকা দেয়া এবং বিজয়ী হওয়া। ধোকবাজের জন্য কঠোরভাবে লক্ষ রাখা এবং বড়ই সতর্কতার সাথে কাজ করা জরুরি হয়। সুতরাং সাব্যস্ত হলো যে, اداء শব্দটি কঠোর লক্ষ্য রাখার অর্থ বোঝায়। আর এটা আদায়ের মধ্যে পাওয়া যায়। সুতরাং اداء শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হওয়াই তার হাকীকত হবে। আর قضاء অর্থে ব্যবহার হলে তা মাজায হবে।

وَاَمَّا اِذَا صَامَ شَعْبَانَ بِظَنِّ اَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ فَلَا يَجُوْزُ لِاَنَّهُ اَدَاءٌ قَبْلَ السَّبَبِ وَاِنْ صَامَ شَوَّالَ بِظَنِّ اَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ يَجُوْزُ لَا لِاَنَّهُ قَضَاءٌ بِنِيَّةِ الْاَدَاءِ بَلْ لِاَنَّهُ اَدَاءٌ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ وَاِنَّمَا الْخَطَأُ فِىْ ظَنِّهِ وَهُوَ مَعْفُوٌّ -

অনুবাদ ॥ আর যদি কেউ শাবান মাসে উক্ত মাসকে রমযান মনে করে রোযা রাখে, তবে তা জায়েয হবে না। কেননা, তা সববের পূর্বে আদা হিসেবে গণ্য। আর যদি কেউ শাওয়াল মাসে ঐ মাসকে রমযান মাস মনে করে রোযা রাখে, তবে এটা জায়েয হবে। আদার নিয়্যতে কাযার বিবেচনায় নয়। বরং এ কারণে যে, এটা কাযার নিয়্যতে আদা। তার ধারণার মধ্যে ভুল হয়েছে এটা ক্ষমার যোগ্য।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله وَاَمَّا اِذَا صَامَ شَعْبَانَ الخ : এটা একটা প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন : আল্লামা ফখরুল ইসলাম (র) বলেন اداء শব্দটি رعايت شدت বা কঠোর লক্ষ্য রাখার অর্থ বোঝায়। অতএব যদি কোনো ব্যক্তি শা'বান মাসে রমযানের রোযা মনে করে রোযা রাখে তাহলে তা জায়েয হওয়া উচিত, কারণ এক্ষেত্রে কঠোর পর্যায়ের সাবধানতা এবং সতর্কতা রয়েছে। অথচ ফকীহগণ তাকে নাজায়েয বলেন কেন?

উত্তর : রমযানের রোযার সবাব হলো রমযান মাস প্রত্যক্ষ করা। আর শা'বান মাসে রমযানের রোযা মনে করে রোযা রাখা সবাবের আগেই আদায় করা সাব্যস্ত হয়। আর সবাবের আগে আদায় করা বৈধ গণ্য হয় না। সুতরাং শা'বান মাসে রমযানের রোযা মনে করে রোযা রাখলে তা জায়েয হবে না।

এ প্রশ্নকে এভাবে বলা যেতে পারে যে, اداء এবং قضاء উভয়টি একটি অপরটির স্থলে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর রূপকের জন্য حقيقت অসম্ভব হওয়া জরুরি। সুতরাং কোনো ব্যক্তি শা'বানে রমযান মনে করে রোযা রাখলে তা আদায় অসম্ভব হয়ে যায়। অতএব اداء যখন অসম্ভব হলো কাজেই আপনার মাজায তথা কাযার অর্থের প্রতি ধাবিত হতে হবে। অর্থাৎ শা'বান মাসে রমযান মনে করে যে রোযা রাখা হয়েছে তা যদি আদা না হতে পারে তাহলে কাযা হওয়া উচিত ছিলো। অথচ আপনাদের মতে তা আদা এবং কাযা কোনটি নয়।

উত্তর : এ রোযা যেহেতু সবাবের আগেই রাখা হয়েছে। এ কারণে তা আদায় হবে না। আর কাযার উপরেই আদায়ের ভিত্তি হয়ে থাকে। সুতরাং কাযাও হবে না। অতএব এ যোযা যখন আদা বা কাযা কোনোটিই হতে পারে না। কাজেই কেমন যেন তা নাজায়েয হবে।

قوله وَاِنْ صَامَ شَوَّالَ الخ : এটাও একটা প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন : সময়ের পূর্বে যেভাবে আদায় করা জায়েয নয়। তদ্রূপ সময়ের পরেও জায়েয নয়। অথচ আপনারা বলে থাকেন যে, কেউ যদি শাওয়াল মাসে রমযান মনে করে রোযা রাখে যদিও এটা সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরে হলো তথাপি তা জায়েয গণ্য হবে। তা কিভাবে সম্ভব?

উত্তর : শাওয়াল মাসে রমযানের রোযা মনে করে রোযা রাখা জায়েয হওয়া একারণে নয় যে, এটা আদায়ের নিয়্যতে কাযা। বরং তা এইজন্য যে, এটা আদা এর নিয়্যতে আদা গণ্য হচ্ছে। অর্থাৎ সে আদাই উল্লেখ করছে এবং উদ্দেশ্যও তাই নিচ্ছে; কেবল তার ধারণার মধ্যে ভুল হয়েছে। অতএব তার এ ভুল ক্ষমা যোগ্য।

ফায়েদা : নূরুল আনওয়ার এর কোনো কোনো নুসখায় لِاَنَّهُ اَدَاءٌ بِنِيَّةِ الْاَدَاءِ রয়েছে এবং কোনোটিতে بنية القضاء রয়েছে। প্রথম নুসখা মোতাবেক ইবারত স্পষ্ট ও সহজ। আর দ্বিতীয় নুসখা মোতাবেক কাযা দ্বারা আদা উদ্দেশ্য হবে। আর এমনটা হয়েও থাকে।

ثُمَّ إِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ أَنَّ سَبَبَ الْقَضَاءِ هُوَ الَّذِى كَانَ سَبَبًا لِلْاَدَاءِ اَمْ لَابُدَّ لَهُ مِنْ سَبَبٍ عَلٰحِدَةٍ فَبَيَّنَهُ الْمُصَنِّفُ رح بِقَوْلِهِ وَالْقَضَاءُ يَجِبُ بِمَا يَجِبُ بِهِ الْاَدَاءُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِيْنَ مِنْ عَامَّةِ الْحَنَفِيَّةِ خِلَافًا لِلْعِرَاقِيِّيْنَ مِنْ مَشَائِخِنَا وَعَامَّةِ اَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ رح فَاِنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ لَابُدَّ لِلْقَضَاءِ مِنْ سَبَبٍ جَدِيْدٍ سِوٰى سَبَبِ الْاَدَاءِ وَالْمُرَادُ بِهٰذَا السَّبَبِ النَّصُّ الْمُوْجِبُ لِلْاَدَاءِ لَا السَّبَبُ الْمَعْرُوْفُ اَعْنِى الْوَقْتَ -وَحَاصِلُ الْخِلَافِ يَرْجِعُ اِلٰى اَنَّ عِنْدَنَا النَّصَّ الْمُوْجِبُ لِلْاَدَاءِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالٰى اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَقَوْلُهُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ دَالٌّ بِعَيْنِهِ عَلٰى وُجُوْبِ الْقَضَاءِ لَا حَاجَةَ اِلٰى نَصٍّ جَدِيْدٍ يُوْجِبُ الْقَضَاءَ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ نَامَ عَنْ صَلٰوةٍ اَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهِ اِذَا ذَكَرَهَا فَاِنَّ ذٰلِكَ وَقْتُهَا وَقَوْلُهُ تَعَالٰى فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ بَلْ اِنَّمَا وَرَدَا لِلتَّنْبِيْهِ عَلٰى اَنَّ الْاَدَاءَ بَاقٍ فِىْ ذِمَّتِكُمْ بِالنَّصَّيْنِ السَّابِقَيْنِ لَمْ يَسْقُطْ بِالْفَوَاتِ لِاَنَّ بَقَاءَ الصَّلٰوةِ وَالصَّوْمِ فِىْ نَفْسِهِ لِلْقُدْرَةِ عَلٰى مِثْلٍ مِنْ عِنْدِهِ وَسُقُوْطُ فَضْلِ الْوَقْتِ لَا اِلٰى مِثْلٍ وَضَمَانٍ لِلْعَجْزِ عَنْهُ اَمْرٌ مَعْقُوْلٌ فِىْ نَفْسِهِ

অনুবাদ ॥ অতঃপর উসূলবিদগণ এ ব্যাপারে মতানৈক্য করেছেন যে, কাযার সবাব কি এটাই, যা আদার জন্যে সবাব ছিল? না কি এর জন্যে কোন স্বতন্ত্র সবাব থাকা আবশ্যক?

সম্মানিত গ্রন্থকার (র) এ বিষয়ে বর্ণনা করেন যে, *মনীষীদের মতে, কাযা ওয়াজিব হয় ঐ সবব দ্বারা, যে সবাব দ্বারা আদা ওয়াজিব হয়ে থাকে। কেউ কেউ এ মতের বিরোধিতা করেছেন।* অর্থাৎ, হানাফী মনীষীদের মতে কাযা ঐ সবব দ্বারা ওয়াজিব হয়, যে সবব দ্বারা আদা ওয়াজিব হয়ে থাকে। আমাদের হানাফীয় ইরাকী মনীষীগণ এবং ইমাম শাফেয়ী (র)-এর অধিকাংশ অনুসারী এর বিপরীত মতামত ব্যক্ত করেছেন। তারা বলেন, আদার সবাব ব্যতীত কাযার জন্যে নতুন সবাব আবশ্যক। এই সবব দ্বারা সেই নস উদ্দেশ্য যা আদাকে ওয়াজিবকারী। প্রসিদ্ধ সবাব তথা, সময় উদ্দেশ্য নয়।

উল্লিখিত মতপার্থক্যের সারসংক্ষেপ এই যে, আমাদের মতে যে নসটি আদা ওয়াজিবকারী, যেমন আল্লাহ তা'আলার কালাম, اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ (তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর) এবং كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ (তোমাদের ওপর রোযা ফরয করা হয়েছে) হুবহু এমনই কাযা ওয়াজিব হওয়ার প্রতি নির্দেশকারী। এমন কোন নতুন নসের আবশ্যকতা নেই যা কাযাকে ওয়াজিব করবে। যেমন রাসূল (স)-এর হাদীস-

مَنْ نَامَ عَنْ صَلٰوةٍ اَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا فَاِنَّ ذٰلِكَ وَقْتُهَا

(কোন ব্যক্তি নামাযের সময় ঘুমিয়ে থাকলো কিংবা নামাযের কথা ভুলে গেলো সে যেন তা স্মরণে আসার পরই পড়ে নেয়, কেননা, তার জন্যে এটাই নামাযের সময়।) এবং আল্লাহ তা'আলার বাণী, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ (অনন্তর তোমাদের মধ্যে যে রোগগ্রস্ত অথবা মুসাফির, তার জন্যে এটা অন্য সময় পালনীয়।) বরং এ শেষোক্ত নস দুটি এ কথার প্রতি সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বর্ণিত হয়েছে যে, পূর্ববর্তী নস দুটির মাধ্যমে তোমাদের ওপর যা ওয়াজিব হয়েছিল, তা এখনও তোমাদের যিম্মায় বহাল রয়েছে। সময় অতীত হয়ে যাওয়ার কারণে তা দূরীভূত হয়ে যায় নি। এর কারণ এই

যে, মূলতঃ নামায ও রোযার হুকুম মুকাল্লাফের ওপর বহাল থাকার কারণ হলে مثل বা সদৃশ আদায়ে তার সামর্থ্য বিদ্যমান থাকা। আর মুকাল্লাফের অক্ষমতাজনিত কারণে সদৃশ বা প্রতিবিধান ব্যতিরেকে ওয়াক্তের ফযীলত থেকে বঞ্চিত হওয়া, একটি যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাপার।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ قوله ثُمَّ اَنَّهُمْ اخْتَلَفُوْا فِيْمَا بَيْنَهُمْ الخ : উসূল শাস্ত্রবিদগণের মধ্যে এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে যে, কাযা এবং আদা উভয়ের সবাব এক কি না? অধিকাংশ হানাফী, হাম্বলী এবং কিছু সংখ্যক শাফেয়ীগণের মতে আদা এবং কাযা উভয় ওয়াজিব হওয়ার সবাব এক। পক্ষান্তরে হানাফী আলিমগণের মধ্যে থেকে মাশাইখে ইরাক ও অধিকাংশ শাফেয়ী উলামা এবং মু'তাযিলাদের মতে, উভয়ের সবাব ভিন্ন ভিন্ন।

নুরুল আনওয়ার গ্রন্থকার বলেন– এখানে সবাব দ্বারা ওয়াক্ত উদ্দেশ্য নয়। বরং যে নস দ্বারা আদা ওয়াজিব হয় তা উদ্দেশ্য। কেননা ওয়াক্‌ত وجوب اداء এর সবাব হয় না। বরং তা نفس وجوب এর সবাব হয়।

মতানৈক্যের সার : আমাদের মতে যে নস আদায় ওয়াজিব করে হুবহু তা কাযাকেও ওয়াজিব করে। এরজন্য নতুন কোনো নসের প্রয়োজন নেই। উদাহরণ স্বরূপ اقيموا الصلوة আয়াত যেভাবে নামায আদায় করাকে ওয়াজিব করে একইভাবে নামাযের কাযাকেও ওয়াজিব করে। এর জন্য ভিন্ন কোনো নসের প্রয়োজন হয় না। এভাবে كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ আয়াত যেরূপ রোযা আদায় করাকে ওয়াজিব করে তদ্রূপ রোযার কাযাকেও ওয়াজিব করে। কিন্তু শাফেয়ীগণের মতে কাযা ওয়াজিব করার জন্য ভিন্ন নতুন নস আবশ্যক। তাদের মতে নামায আদায় করার জন্য اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ আয়াত রয়েছে। আর নামাযের কাযা ওয়াজিব করার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) এর হাদীস রয়েছে যে, যে ব্যক্তি নামাযের সময় ঘুমিয়ে যায়। ফলে নামায আদায় করতে পারে না কিংবা নামায ভুলে যায়। তার যখন নামাযের কথা স্মরণ আসবে তখনই সে নামায পড়বে। এটাই তার নামাযের ওয়াক্ত। এভাবে রোযা আদায় ওয়াজিবকারী হলো كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ আয়াত। আর কাযা ওয়াজিবকারী হলো مَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ আয়াত।

উত্তর : হানাফীগণের পক্ষ থেকে এর উত্তর এই যে, উভয়টি (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا ও مَنْ نَامَ عَنْ صَلٰوةٍ) নামায এবং রোযা কাযা করা ওয়াজিব করার জন্য বর্ণিত হয়নি। বরং এ ব্যাপারে সতর্ক করার জন্য বর্ণিত হয়েছে যে, নামায এবং রোযার আদা পূর্বের উভয় নস দ্বারা তোমাদের জিম্মায় বহাল রয়েছে। সময় পেরিয়ে যাওয়ার কারণে জিম্মা থেকে সরে যায়নি। কারণ আদা হলো মুকাল্লাফ ব্যক্তির উপর আল্লাহর একটা হক। যার উপর হক ওয়াজিব হয় উক্ত হক আদায় করার দ্বারাই তার জিম্মা থেকে সরে যায়। অথবা তার অক্ষমতার দ্বারা সরে যায়। কিন্তু এখানে ৩টির কোনোটিই বিদ্যমান নেই। কারণ من عليه الحق হকদারের হক আদায় করেনি এবং সে তা আদায় করতে অক্ষমও নয়। কেননা মুকাল্লাফ ব্যক্তি যদিও ওয়াক্তের ফযিলত লাভে সক্ষম নয়। কিন্তু মূল ইবাদতের উপর সক্ষম। এভাবে صاحب حق (আল্লাহ তা'আলা) তার অধিকার ছেড়ে দেয়নি। কারণ আল্লাহ তা'আলা (সাহিবে হক) এর পক্ষ থেকে হক ছেড়ে না দেয়া সুস্পষ্ট বিদ্যমান নেই। এবং ইঙ্গিতরূপেও বিদ্যমান নেই। কারণ এখানে সময় পেরিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো কিছু বিদ্যমান নেই। আর সময় পেরিয়ে যাওয়া সাহিবে হকের হক রহিত করে না। এভাবে সে আদায় করা থেকে অক্ষমও নয়। কারণ সে নামায ও রোযার মিসল আদায়ে সক্ষম। এ কারণে নামায ও রোযা তার জিম্মায় বহাল থাকবে। তবে আদায় করার ক্ষেত্রে সে ফযিলত লাভে সক্ষম। এর কোন মিসল বিদ্যমান নেই। এ কারণেই ওয়াক্তের ফযিলত কোনো মিসল বা ক্ষতিপূরণ ছাড়াই মুকাল্লাফ ব্যক্তির জিম্মা থেকে রহিত হয়ে যাবে।

সারকথা এই যে, উল্লেখিত নস দুটি (আয়াত ও হাদীস) নামায ও রোযা কাযা ওয়াজিব করার জন্য বর্ণিত হয়নি। যেমন শাফেয়ীগণ বলে থাকেন। বরং তা এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বর্ণিত হয়েছে যে, সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর যদিও সময়ের ফযিলত নষ্ট হয়ে যায় তবে নামায এবং রোযা মুকাল্লাফ ব্যক্তির দায়িত্বে বহাল থেকে যায়। কেমন যেন নামায এবং রোযার কাযা এ নস ২টির দ্বারা ওয়াজিব হয়েছে যার দ্বারা আদা ওয়াজিব হয়েছিলো। আর مَنْ صَامَ عَنْ صَلٰوةٍ ও فَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا কেবল ব্যক্তিকে তা স্মরণ করিয়ে দেয় মাত্র।

فَعِدَّيْنَا حُكْمَ الْقَضَاءِ اِلَى مَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصٌّ وَهُوَ الْمَنْذُورُ مِنَ الصَّلٰوةِ وَالصِّيَامِ وَالْاِعْتِكَافِ -وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رح لَا بُدَّ لِلْقَضَاءِ مِنْ نَصٍّ جَدِيْدٍ مُوْجِبٍ لَهُ سِوٰى نَصِّ الْاَدَاءِ فَقَضَاءُ الصَّلٰوةِ وَالصَّوْمِ عِنْدَهُ لَا بُدَّ اَنْ يَكُوْنَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ مَنْ نَامَ عَنْ صَلٰوةٍ اَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا فَاِنَّ ذٰلِكَ وَقْتُهَا وَقَوْلُهُ تَعَالٰى فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ وَمَالَمْ يَرِدِ النَّصُّ فِيهِ اِنَّمَا يَثْبُتُ الْقَضَاءُ بِسَبَبِ التَّفْوِيْتِ الَّذِي يَقُوْمُ مَقَامَ نَصِّ الْقَضَاءِ فَلَا تَظْهَرُ ثَمْرَةُ الْخِلَافِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ اِلَّا فِي الْفَوَاتِ فَعِنْدَنَا يَجِبُ الْقَضَاءُ فِي الْفَوَاتِ وَعِنْدَهُ لَا وَقِيْلَ الْفَوَاتُ اَيْضًا قَائِمٌ مَقَامَ النَّصِّ كَالتَّفْوِيْتِ وَلَا تَظْهَرُ ثَمْرَةُ الْخِلَافِ اِلَّا فِي التَّخْرِيْجِ - فَعِنْدَنَا يَجِبُ فِي الْكُلِّ بِالنَّصِّ السَّابِقِ وَعِنْدَهُ يَجِبُ بِالنَّصِّ الْجَدِيْدِ اَوْ بِالْفَوَاتِ وَالتَّفْوِيْتِ وَقَضَاءُ الْحَضَرِ فِي السَّفَرِ اَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَقَضَاءُ السَّفَرِ فِي الْحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ وَقَضَاءُ الْجَهْرِ فِي النَّهَارِ جَهْرًا وَقَضَاءُ السِّرِّ فِي اللَّيْلِ سِرًّا يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْنَا وَقَضَاءُ الصَّحِيْحِ صَلٰوةَ الْمَرَضِ بِعُنْوَانِ الصِّحَّةِ وَقَضَاءُ الْمَرِيْضِ صَلٰوةَ الصِّحَّةِ بِعُنْوَانِ الْمَرَضِ يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرَهُ -ثُمَّ هٰهُنَا سُوَالٌ مَشْهُوْرٌ لَهُمْ عَلَيْنَا وَهُوَ اَنَّهُ اِنْ نَذَرَ اَحَدٌ اَنْ يَعْتَكِفَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَصَامَ وَلَمْ يَعْتَكِفْ لِمَرَضٍ مَنَعَ مِنَ الْاِعْتِكَافِ لَا يَقْضِي اِعْتِكَافَهُ فِي رَمَضَانٍ اٰخَرَ بَلْ يَقْضِيْهِ فِي ضِمْنِ صَوْمٍ مَقْصُوْدٍ وَهُوَ صَوْمُ النَّفْلِ -

---

অনুবাদ ॥ সেহেতু আমরা কাযার হুকুমকে ঐ সমস্ত বিষয়ের প্রতি ধাবিত করেছি যার ব্যাপারে কোন নস অবতারিত হয়নি। যেমন, মান্নতের নামায, মান্নতের রোযা ও মান্নতের ই'তেকাফ প্রভৃতি। ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, কাযা ওয়াজিব হওয়ার জন্যে আদার নস ছাড়া কাযার জন্যে নতুন নসের অবশ্যই প্রয়োজন। সুতরাং তার মতে নামায ও রোযার কাযা সাব্যস্ত হয়েছে- রাসূল (স) এর এ হাদীস দ্বারা 'যে ব্যক্তি নামাযের সময়ে ঘুমিয়ে থাকে, অথবা নামাযকে ভুলে যায়, সে যেন তা আদায় করে নেয়, যখন তা স্মরণ হয়। কেননা, এটাই নামাযের ওয়াক্ত।' এবং আল্লাহ তা'আলার বাণী 'তোমাদের মধ্য থেকে যদি কেউ রোগাক্রান্ত হয় অথবা কেউ সফরে থাকে, তবে সে অন্য সময়ে রোযা পালন করবে।' আর যে ক্ষেত্রে কোন নস অবতীর্ণ হয়নি, সে ক্ষেত্রে কাযা ওয়াজিব হবে ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করার কারণে। যা কাযার নসের স্থলাভিষিক্ত হবে। সুতরাং আমাদের এবং শাফেয়ী (র) এর মধ্যে মত পার্থক্যের ফলাফল প্রকাশিত হবে না, কেবল فوات তথা পরিত্যাগ হওয়ার ক্ষেত্র ছাড়া। সুতরাং আমাদের মতে, কাযা ওয়াজিব হবে فوات বা পরিত্যক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে। আর ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, পরিত্যক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে নয়। কেউ কেউ বলেন পরিত্যক্তও নসের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে تفويت তথা ইচ্ছাকৃতভাবে ত্যাগ করার পর্যায়ে গণ্য। মতপার্থক্যের

ফলাফল মাসআলা উদ্ভাবন ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যত্র প্রকাশ পাবে না। সুতরাং আমাদের মতে, সকল ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত নসের দ্বারা কাযা ওয়াজিব হয়। আর ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, নতুন নসের মাধ্যমে কাযা ওয়াজিব হয়। অথবা, পরিত্যক্ত হওয়ার মাধ্যমে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করার মাধ্যমে কাযা ওয়াজিব হয়।

সফর অবস্থায় মুকীম অবস্থার কাযা হবে চার রাকাত। আর মুকীম অবস্থায় ভ্রমণ অবস্থার কাযা হবে দুরাকাত। আর স্বশব্দে জাহরী নামাযের কাযা দিনের বেলায় স্বশব্দে কাযা করতে হবে। সিররী বা নিঃশব্দে পঠিতব্য নামাযের কাযা রাত্রিবেলায় নিঃশব্দে করতে হবে। এ সকল মাসাআলা আমরা যা উল্লেখ করেছি, এটাকে শক্তিশালী করে। সুস্থ ব্যক্তির কাযা নামায রুগ্ন অবস্থায় সুস্থ লোকের মত পড়তে হবে। রুগ্ন ব্যক্তির কাযা নামায সুস্থ অবস্থায় রুগ্ন লোকের ন্যায় পড়তে হবে। এ মাসআলা দুটো আমাদের উল্লিখিত ঐ বিষয়কে শক্তিশালী করে। এখানে আমাদের বিরুদ্ধে শাফেয়ীদের একটি প্রসিদ্ধ প্রশ্ন রয়েছে। তা এই যে, যদি কেউ রমযান মাসে ইতিকাফ করার মান্নত করে, অতঃপর সে রোযা রাখে, কিন্তু এমন কোন রোগের কারণে ইতিকাফ করেনি যা তাকে ইতিকাফ করতে বাধা দেয়। তবে সে অন্য রমযান মাসে তার ইতিকাফের কাযা করবে না। বরং সে ইচ্ছাকৃত কোন নফল রোযার অধীনে এর কাযা করবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ قوله فعدينا حكم القضاء إلى ما لم يرد فيه الخ : মুসান্নিফ (র) এখানে বর্ণনা করতে চাচ্ছেন যে, মূল নামায ও রোযার মিসল আদায় করতে সক্ষম হওয়ার কারণে মুকাল্লাফ ব্যক্তির জিম্মায় বাকি থাকা যুক্তিনির্ভর বিষয়। আর যুক্তিনির্ভর বিষয়ের উপর অন্য কিছুকে কিয়াস করা শুদ্ধ নয়। অতএব নামায ও রোযা যার ব্যাপারে নতুন নস (من نام এবং فمن كان) বর্ণিত হয়েছে। তার উপর ঐ বিষয়কেই কিয়াস করতে হবে যে বিষয়ের কাযার জন্য নতুন নস বর্ণিত হয়নি। যেমন মান্নতের নামায, মান্নতের রোযা, ইতেকাফের মান্নত ইত্যাদি। অর্থাৎ যেভাবে নামায রোযার মধ্যে যে নস আদা ওয়াজিব করে উক্ত নসই কাযাকে ওয়াজিব করবে। এভাবে মান্নতের ক্ষেত্রে যে নস তা আদা ওয়াজিবকারী উক্ত নসই তার কাযা ওয়াজিবকারী হবে।

প্রশ্ন : এখানে কেউ প্রশ্নকরতে পারে যে, যে বিষয়ের কাযার জন্য নতুন নস বর্ণিত হয়নি। অর্থাৎ মান্নত কিয়াস দ্বারা তা কাযা জরুরি সাব্যস্ত হবে। আর কিয়াস আদা ওয়াজিবকারী হওয়া ছাড়া নতুন একটি সবাব। অর্থাৎ আপনার কথা অনুযায়ী মান্নতকৃত বিষয় আদায় করা وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ নস দ্বারা ওয়াজিব হয়েছে। আর তার কাযা কিয়াস দ্বারা ওয়াজিব হয়েছে। সুতরাং কেমন যেন আদা ওয়াজিব হওয়ার সবাব ভিন্ন এবং কাযা ওয়াজিব হওয়ার সবাব ভিন্ন। অথচ এটা হানাফীগণের মতের পরিপন্থী।

উত্তর : কিয়াস কেবল مظهر তথা বিধান স্পষ্টকারী مثبت নয় অর্থাৎ নতুন কোনো বিধান সাব্যস্ত করে না। এ কারণে মান্নতের মধ্যে এ নস দ্বারাই কাযা ওয়াজিব হয়েছে যার দ্বারা আদা ওয়াজিব হয়েছিল। তবে তা কিয়াস দ্বারা জাহির হয়েছে। কাজেই কোনো প্রশ্ন থাকে না।

নুরুল আনওয়ার গ্রন্থকার বলেন– ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে কাযার জন্য আদায়ের নস ছাড়া যেহেতু ভিন্ন নস থাকা জরুরি। এ কারণে তার মতে أَقِيمُوا الصَّلٰوةَ দ্বারা নামায আদায় করা ওয়াজিব হবে। আর مَنْ نَامَ عَنْ صَلٰوةٍ হাদীস দ্বারা তার কাযা ওয়াজিব হবে। রোযা আদায় করা ওয়াজিব হবে كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ আয়াত দ্বারা এবং তার কাযা ওয়াজিব হবে فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا দ্বারা। আর যে জিনিসের কাযার জন্য নতুন নস অবতীর্ণ হয়নি তার কাযা ওয়াজিব হওয়ার সবাব হবে تفويت তথা ফউত করা। কারণ এটা মুকাল্লাফের পক্ষ থেকে জুলুম ও অলসতা প্রমাণ করে। যার দ্বারা ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়। অতএব تفويت ও ক্ষতিপূরণ কাযার সবাব হবে। এবং নস কাযার স্থলাভিষিক্ত হবে। সুতরাং আমাদের এবং শাফেয়ীদের মধ্যে মতপার্থক্যের ফল কেবল ছুটে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রকাশ

পাবে। যেমন এক ব্যক্তি মান্নতের দিনে অসুস্থ হয়ে গেলো বা পাগল হয়ে গেলো। ফলে নামায আদায় করতে পারলো না। কাজেই আমাদের মতে কাযার সবাব যেহেতু হুবহু আদার সবাব-ই। একারণে ফউত হওয়ার কারণে কাযা ওয়াজিব হবে। আর শাফেয়ীগণের মতে কাযার জন্য যেহেতু নতুন নস বা ফউত করা জরুরি। আর ফউত করার ক্ষেত্রে কোনোটি পাওয়া গেলো না। এ কারণে কাযা ওয়াজিব হবে না। কোনো কোনো শাফেয়ী আলিমের মতে فوات ও تفويت এর ন্যায় নসের স্থলাভিষিক্ত। অর্থাৎ যেভাবে কাযার জন্য নতুন নস না থাকার ক্ষেত্রে تفويت কাযার সবাব হয় তদ্রূপ ফউত হওয়াও কাযার সবাব হবে। সুতরাং এক্ষেত্রে পারস্পরিক মতানৈক্যের ফল কেবল বিধান বের করার ক্ষেত্রে জাহির হবে। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে কাযার জন্য নতুন নস কিংবা تفويت বা فوات হোক সকল ক্ষেত্রে পূর্বের নস দ্বারা কাযা ওয়াজিব হবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে কাযার জন্য নতুন নস থাকলে সেটাই কাযার সবাব হবে। অন্যথায় تفويت বা فوات সবাব হবে।

قوله وقضاء الحضرفي السفر الخ : মুসান্নিফ (র) এই ইবারত দ্বারা উভয় পক্ষের বিভিন্ন সহায়ক দলিল উল্লেখ করেছেন। দুটি মাসআলা হানাফীদের মাযহাবের শক্তিযোগায়।

১. যদি কোনো ব্যক্তি মুকীম থাকা অবস্থায় তার চার রাকআত বিশিষ্ট নামায নষ্ট হয়ে যায়। আর সে সফর অবস্থায় তা কাযা করতে চায় তাহলে চার রাকআতই পড়বে। অথচ সফরে ৪ রাকআত নামায ২ রাকআত পড়তে হয়। অতএব নতুন সবাবের কারণে যদি কাযা ওয়াজিব হয়ে থাকে তাহলে সফরে ২ রাকআত নামায ওয়াজিব হতো। অথচ ৪ রাকাআত ওয়াজিব হয়। সুতরাং বোঝা গেলো যে, মুকীম অবস্থায় যা আদার সবাব ছিলো সফরে সেটাই কাযার সবাব হচ্ছে। এভাবে যদি কোনো ব্যক্তির সফরে ৪ রাকআত নামায ফউত হয়ে যায়। আর মুকীম অবস্থায় তা কাযা করতে চায় তাহলে ২ রাকআতই কাযা করবে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, আদার সবাবই কাযার সবাব।

২. কারো যদি জাহরী নামায যেমন মাগরিব, ও ইশা ফউত হয়ে যায়। আর সে দিনে তা কাযা করতে চায় তাহলে স্ব-রবে কেরাত পড়বে। জামাতের সাথে কাযা করতে চাইলে ইমামের জন্য জাহরী কিরআত ওয়াজিব। আর মুনফারিদ কাযা করতে চাইলে তার জন্য জাহরী করা উত্তম। ঠিক এর বিপরীতে একই বিধান। পক্ষান্তরে কারো সিররী নামায যেমন যোহর বা আসর ছুটে গেলে সে যদি রাতে তা কাযা করতে চায় তাহলে ইমাম হোক বা মুনফারিদ উভয়ের জন্য সিররী কেরআত ওয়াজিব। এ মাসআলাও এ বিষয়ের সহায়তা দান করে যে, আদার সবাবই কাযার সবাব।

২টি মাসআলা ইমাম শাফেয়ী (র) এর স্ব-পক্ষে সহায়তা দান করে। ১. যে ব্যক্তির কিয়াম ও রুকু সাজদা করতে সক্ষম নয় এমন ব্যক্তির নামায ছুটে গেলো সে যদি সুস্থ অবস্থায় তা কাযা করতে চায় তাহলে সে সুস্থকালে যেভাবে আদায় করতে হয় সে ভাবে সে নামায কাযা করবে। অর্থাৎ রুকু সাজদা ও কিয়ামসহ কাযা করবে।

২. কোনো অসুস্থ ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম নয় এমন ব্যক্তি সুস্থ অবস্থায় ছুটে যাওয়া নামায কাযা করতে চাইলে রুগীর নামাযের তরিকায় দাঁড়ানো ছাড়াই কাযা নামায পড়বে। এ উভয় মাসআলায় আদা এবং কাযা উভয়ই যেহেতু পৃথক এ কারণে বোঝা গেলো যে, কাযার সবাব আদার সবাবের ভিন্ন। উভয়ের সবাব এক হলে উভয় নামাযের মধ্যে পার্থক্য হতো না।

قوله ثُمَّ هٰهُنَا سُؤَالٌ الخ : মোল্লা জুয়ুন (র) এই ইবারতে শাফেয়ীদের পক্ষথেকে হানাফীগণের উপর আরোপিত একটি প্রশ্ন নকল করেছেন।

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি নির্দিষ্ট এক রমযান যেমন ১৪০৮ সালের রমযানের ইতেকাফের মান্নত করেছিলো। এরপর সে উক্ত রমযানের রোযা রাখলো কিন্তু কোনো কারণে ইতেকাফ করতে পারেনি। তার বিধান এই যে, এই ব্যক্তি ১৪০৯ হিজরী সনের রমযানে তার ইতেকাফ কাযা করবে না। বরং রমযান ছাড়া অন্য দিনে নফল রোযার মাধ্যমে ইতেকাফ কাযা করবে।

(পরের পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

وَلَوْ كَانَ الْقَضَاءُ وَاجِبًا بِالسَّبَبِ الَّذِى اَوْجَبَ الْاَدَاءَ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ لَوَجَبَ اَنْ يَصِحَّ الْقَضَاءُ فِى الرَّمَضَانِ الثَّانِى كَمَا صَحَّ الْاَدَاءُ فِى الرَّمَضَانِ الْاَوَّلِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ زُفَرَ رح اَوْ يَسْقُطُ الْقَضَاءُ اَصْلًا لِعَدَمِ اِمْكَانِ الصَّوْمِ الَّذِى هُوَ شَرْطُهُ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ اَبِى يُوسُفَ رح - فَعُلِمَ اَنَّ سَبَبَ الْقَضَاءِ التَّفْوِيتُ وَالتَّفْوِيتُ مُطْلَقٌ عَنِ الْوَقْتِ فَيَنْصَرِفُ اِلَى الْكَامِلِ وَهُوَ الصَّوْمُ الْمَقْصُوْدُ -

---

অনুবাদ ॥ আর যদি কাযা ওয়াজিব হয়- এমন সবাব দ্বারা যার আদা ওয়াজিব হয়েছে, তা হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী 'তাঁরা যেন তাদের মান্নতসমূহ পূর্ণ করে' দ্বিতীয় রমযানে কাযা আদায় করা বিশুদ্ধ হওয়া ওয়াজিব হবে। যেমনিভাবে প্রথম রমযানে আদায় করা বিশুদ্ধ ছিল। এটা ইমাম যুফার (র)-এর অভিমত অথবা, সম্পূর্ণভাবেই রোযা না পাওয়ার সম্ভাবনার কারণে কাযা রহিত হয়ে যাবে, যা (রোযা) ইতিকাফের জন্যে শর্ত ছিলো। যেমন ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর অভিমত। সুতরাং বুঝা গেল যে, কাযার সবাব হলো- تفويت তথা ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করা। আর ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করা কোন সময়ের সাথে খাস নয়। কাজেই তা পূর্ণাঙ্গ রোযার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। আর তা হলো صوم مقصود বা নফল রোযা।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ মোটকথা হানাফী মুহাক্কিক আলিমগণের মতে ইতেকাফের কাযা রহিত হয় না। আবার অপর রমযানে তা কাযা করা ঠিক হয় না। অতএব বোঝা গেলো যে, ইতেকাফের কাযার সবাব হলো تفويت (ফউত করা) আর تفويت কাযা ওয়াজিব হওয়ার সবাব হলো مطلق عن الوقت অর্থাৎ এর জন্য কোনো সময় নির্দিষ্ট নেই। تفويت যখন مطلق عن الوقت তাহলে তার ফরদে কামিল অর্থাৎ নফল রোযার প্রতি রুজু করতে হবে। অর্থাৎ উল্লেখিত ইতেকাফের কাযা নফল রোযার মাধ্যমে ওয়াজিব হবে। এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, মান্নতকৃত ইতেকাফের রোযা যে সবাব দ্বারা আদায় করা ওয়াজিব হয় উক্ত সবাব দ্বারা কাযা ওয়াজিব হয় না। বরং আদায় করার সবাব হলো وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ আয়াত। আর কাযার সবাব হলো تفويت

(পূর্বের বাকী অংশ) লক্ষ্য করুন! মান্নতের ইতেকাফের কাযার সবাব যদি আদার সবাবই হতো অর্থাৎ وَلْيُوفُوا نذورهم যেমন হানাফীগণ বলে থাকেন। তাহলে পরবর্তী ১৪০৯ এর রমযানে তা কাযা করা ঠিক হওয়ার কথা ছিলো। যেমন পূর্বের অর্থাৎ ১৪০৮ হিঃ রমযানে আদায় করা ঠিক ছিলো। ইমাম যুফার (র) এর মাযহাব এটাই। তার দলিল এই যে, দ্বিতীয় রমযান প্রথম রমযানের مثل কারণ উভয় রমযানে রোযা ওয়াজিব। অথবা তার কাযা সম্পূর্ণরূপে রহিত হয়ে যেতো। কারণ উল্লেখিত মাসআলায় মান্নতের ইতেকাফ এর শর্ত চলতি রমযানের অর্থাৎ ১৪০৮ হিজরী সনের রমযানের রোযা রয়েছে। কিন্তু এ রমযান অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে তা ফিরে আসা সম্ভব নয়। আর ভিন্ন রোযা ওয়াজিব করা ওয়াজিবকারী বিহীন গণ্য হয়। অথচ موجب তথা ওয়াজিবকারীবিহীন কোনো ওয়াজিব সাব্যস্ত হয় না। আর একথাও স্বীকৃত যে, রোযা ছাড়া ইতেকাফ শুদ্ধ নয়। কাজেই প্রথম রমযান যখন চলে গেলো। আর দ্বিতীয় রমযানের রোযা موجب বিহীন ওয়াজিব করা যেতে পারে না। আবার রোযা ছাড়া ইতেকাফও বৈধ নয়। অতএব অক্ষম হওয়ার দরুন ইতেকাফের কাযা রহিত হয়ে যাবে। এটা আবু ইউসুফ (র) এর অভিমত।

فَاجَابَ الْمُصَنِّفُ رح عَنْهُ بِقَوْلِهِ وفِيمَا إِذَا نَذَرَ انْ يَّعْتَكِفَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَصَامَ وَلَمْ يَعْتَكِفْ إِنَّمَا وَجَبَ الْقَضَاءُ بِصَوْمٍ مقصودٍ لِعَوْدِ شَرْطِهِ إِلَى الْكَمَالِ لا لِأَنَّ الْقَضَاءَ وَجَبَ بِسَبَبٍ اٰخَرَ يعني فِيْ صُوْرَةِ نَذْرٍ انْ يَّعْتَكِفَ هٰذَا الرَّمَضَانَ الْمَعْهُوْدَ فصام ولم يَعْتَكِفْ لِمَانِعِ مَرَضٍ اِنَّما وَجَبَ الْقَضَاءُ بِصَوْمٍ مقصودٍ وهُوَ النَّفْلُ لِعَوْدِ شرطِ الْاِعْتِكَافِ الَى الْكَمَالِ وهُوَ صومُ النَّفْلِ لا لِاَنَّ القضاءَ وَجَبَ بِسَبَبٍ اٰخَرَ كما زَعَمْتُمْ وتَقْرِيْرُهُ اَنَّ الاعتكافَ لا يَصِحُّ اِلاَّ بالصَّوْمِ فَاِذا نَذَرَ بِالْاِعْتِكَافِ فقد نَذَرَ بِالصَّوْمِ فكانَ يَنْبَغِيْ اَنْ يَجِبَ الصَّوْمُ الْمَقْصُوْدُ اِبْتِدَاءً بِمُجَرَّدِ نَذْرِ الْاِعْتِكَافِ ولٰكِنْ شَرَفُ الرَّمَضَانِ الْحَاضِرِ عَارَضَهُ لِاَنَّ الْعِبَادَةَ فِي رَمَضَانَ اَفْضَلُ مِنَ الْعِبَادَةِ فِي غَيْرِهِ فَانْتَقَلْنَا مِنَ الصَّوْمِ الْاَصْلِيِّ الْمَقْصُوْدِ الٰى صومِ رمضانَ لِهٰذا الشَّرَفِ الْعَارِضِ ولَمَّا فَاتَ شَرَفُ رَمَضَانَ عَادَ الصَّوْمُ الٰى كمالِهِ وَهُوَ الصَّوْمُ الْمَقْصُوْدُ الْاَصْلِيُّ اَعْنِيْ صومُ النَّفْلِ فكانَّه صَدَرَ حُكْمٌ مِّنَ اللّٰهِ تَعَالٰى اَنْ صُوْمُوا النَّفْلَ وَاعْتَكِفُوْا فِيْهِ وَالْحَيٰوةُ الٰى الرَّمَضَانِ الثَّانِي مَوْهُوْمٌ لِاَنَّه وقتٌ مديدٌ يَسْتَوِيْ فِيْهِ الْحَيٰوةُ وَالْمَمَاتُ ثُمَّ اذا لَمْ يَصُمْ صَوْمَ مقصودٍ وَجَاءَ الرَّمَضَانُ الثَّانِيْ لَمْ يَنْتَقِلْ حكمُ اللّٰهِ تعالٰى الٰى هٰذا الرَّمَضَانِ الثَّانِيْ وانَّما قال فَصَامَ ولَمْ يَعْتَكِفْ لِاَنَّهَ إذا لَمْ يَصُمْ لِمَرَضٍ مَنَعَ مِنَ الصَّوْمِ فَحِيْنَئِذٍ يَجُوْزُ الْاِعْتِكَافُ فِيْ قَضَاءِ رَمَضَانَ اَلْبَتَّةَ –

অনুবাদ ॥ মুসান্নিফ (র) উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন যে, *কেউ যদি রমযান মাসে ইতিকাফ করার মান্নত করে, এবং রোযা রাখে, কিন্তু ইতিকাফ করলো না, তবে এমতাবস্থায় পূর্ণত্বের প্রতি তার শর্তের প্রত্যাবর্তনের কারণে উদ্দেশ্যমূলক রোযা দ্বারা কাযা ওয়াজিব হবে, এটা এজন্যে নয় যে, অন্য সবাব দ্বারা কাযা ওয়াজিব হয়েছে।*

অর্থাৎ কেউ নির্দিষ্ট রমযান মাসে ইতিকাফ করার মান্নত করলো, অতঃপর রোযা রাখলো, কিন্তু কোন রোগের প্রতিবন্ধকতার কারণে ইতিকাফ করেনি। তাহলে কাযা পূর্ণত্বের দিকে ইতিকাফের শর্তের প্রত্যাবর্তনের কারণে صوم مقصود এর মাধ্যমে কাযা ওয়াজিব হয়েছে। আর صوم مقصود হলো নফল রোযা। এটা এ কারণে নয় যে, অন্য কোন সবাবের দ্বারা কাযা ওয়াজিব হয়েছে। যেমনটি আপনারা ধারণা করেছেন, এর বিস্তারিত বিবরণ এই যে, ইতিকাফ রোযা ব্যতীত শুদ্ধ হয় না। সুতরাং কেউ যদি ইতিকাফের মান্নত করে, তখন প্রকারান্তরে সে যেন রোযারও মান্নত করল। সুতরাং এটাই সমীচীন যে, শুরুতেই শুধুমাত্র ইতিকাফের মান্নতের দ্বারাই তার ওপর صوم مقصود ওয়াজিব হবে। কিন্তু বর্তমান রমযানের মাহাত্ম্য তার সাথে যুক্ত হয়েছে। কেননা, রমযান মাসের ইবাদত অন্য মাসের ইবাদত থেকে উত্তম। সুতরাং আমরা এ আনুষঙ্গিক মাহাত্ম্যের কারণে মূল صوم مقصود থেকে রমযানের রোযার প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছি।

অতঃপর যখন রমযান মাসের ফযিলত তিরোহিত হয়ে গেল, তখন রোযা তার পূর্ণত্বের প্রতি প্রত্যাবর্তন করলো। আর তা হলো মৌলিক উদ্দেশ্যমূলক রোযা। অর্থাৎ, নফল রোযা। সুতরাং কেমন যেন আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ হয়েছে যে, তোমরা নফল রোযা রাখ এবং এর মধ্যে ইতিকাফ করো। আর দ্বিতীয় রমযান পর্যন্ত বেঁচে থাকা সন্দেহজনক ব্যাপার। কেননা, এটা সুদীর্ঘ সময়। এতে জীবন-মরণ সমান।

এরপর যদি নফল রোযা না রাখে এবং ইতোমধ্যে দ্বিতীয় রমযান এসে যায়, তবে মহান আল্লাহর হুকুম এই দ্বিতীয় রমযানের প্রতি স্থানান্তরিত হবে না। গ্রন্থকার বলেন, যদি মান্নতকারী রোযা না রেখে থাকে, এমন কোন রোগের কারণে যা রোযা পালনে বাধা প্রদানকারী, তখন নিঃসন্দেহে রমযানের রোযা কাযার সময় ইতিকাফ জায়েয হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله فَاجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ الخ : উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর এই যে, যদি কোনো ব্যক্তি নির্দিষ্ট ইতেকাফের মান্নত করে। আর সে উক্ত রমযানের রোযা রাখল কিন্তু ইতেকাফ করলো না তাহলে নফল রোযা সহকারে সে ইতেকাফের কাযা করবে। এটা ওয়াজিব হওয়ার কারণ এই যে, ইতেকাফের শর্ত অর্থাৎ রোযা রাখা তার পূর্ণতার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। (অর্থাৎ নফলের প্রতি ধাবিত হয়েছে) এমন নয় যে, অন্য কোনো সবাবে কাযা ওয়াজিব হয়েছে। যেমন প্রশ্নকারী ধারণা করেছিলেন।

قوله وَتَقْرِيْرُهُ اَنَّ الْاِعْتِكَافَ الخ : বিশ্লেষণ : রোযাবিহীন ইতেকাফ বৈধ নয়। কারণ হাদীসে উল্লেখ আছে لَا اِعْتِكَافَ اِلَّا بِصَوْمٍ (দারকুতনী) তবে এখানে ইতেকাফ দ্বারা ওয়াজিব ইতেকাফ উদ্দেশ্য। সারকথা এই যে, ওয়াজিব ইতেকাফের জন্য রোযা শর্ত। এখন কোনো ব্যক্তি যদি ইতেকাফের মান্নত করে তাহলে অর্থ এই হবে যে, সে রোযার ও মান্নত করলো। কারণ مشروط কে নিজের ওপর ওয়াজিব করার দ্বারা শর্তও ওয়াজিব হয়ে যায় সুতরাং ইতেকাফের মান্নত করার দ্বারা রোযা অপরিহার্য হবে। অতএব ইতেকাফের মান্নত করার দ্বারা উচিত ছিলো যে, সূচনা থেকেই রোযা ওয়াজিব হয়ে যাক। কিন্তু বর্তমান রমযানে অর্থাৎ যে রমযানে ইতেকাফ মান্নত করেছিলো তার মর্যাদা ও ফযিলত নফল রোযার সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে গেলো। অর্থাৎ এর উপর প্রাধান্য লাভ করলো। কেননা রমযানের ইবাদত অন্য সময়ের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম ও মর্যাদাপূর্ণ। মোটকথা এ অতিরিক্ত মর্যাদার কারণে আমরা নফল রোযার থেকে রমযানের রোযার প্রতি ধাবিত হয়েছি। অর্থাৎ ইতেকাফের মান্নতকালে নফল রোযার পরিবর্তে রমযানের রোযার হুকুম দেয়া হয়েছে। কিন্তু যখন রমযানের রোযা রাখা এবং ইতেকাফ না করার কারণে রমযানের মর্যাদা ফউত হয়ে গেলো কাজেই রোযা তার পূর্ণতার প্রতি ধাবিত হবে। আর রোযার পূর্ণতা হলো صوم مقصود তথা নফল রোযা। সুতরাং রমযান অতিক্রান্ত হওয়ার পরে কেমন যেন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হুকুম জারি হলো যে, নফল রোযা রাখো এবং তার দ্বারা ইতেকাফ করো।

সারকথা এই যে, সূচনা থেকে নফল রোযা ওয়াজিব ছিলো। আর ইতেকাফের কাযাও নফল রোযার মধ্যে ওয়াজিব হয়েছে। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, ইতেকাফ আদায়ের যে সবাব ছিলো ইতেকাফের কাযারও একই সবাব। আর ইতেকাফ আদায়ের সবাব যখন কাযারও সবাব হলো। অতএব প্রশ্নকারীর প্রশ্ন যথার্থ হবে না। এখানে ভিন্ন আরেকটি প্রশ্ন হতে পারে যে, বর্তমান রমযানের মর্যাদা যদিও ফউত হয়ে গিয়েছিলো। তবে পরবর্তী রমযানের অপেক্ষা করে তা লাভ করা সম্ভব।

এর উত্তর এই যে, আগামী রমযান পর্যন্ত বেচে থাকা সন্দেহজনক। কারণ এটা একটা দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার। এর মধ্যে বেচে থাকা ও মৃত্যুবরণ করা সমান সম্ভাবনাময়।

قوله ثُمَّ اِذَا لَمْ يَصُمْ صَوْمًا مَقْصُوْدًا الخ : নুরুল আনওয়ার গ্রন্থকার বলেন– যদি দ্বিতীয় রমযান আসার পূর্বে সে নফল রোযার মাধ্যমে ইতেকাফের কাযা না করে বরং পরবর্তী রমযান এসে যায় তাহলে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ ইতেকাফের কাযার হুকুম দ্বিতীয় রমযানের দিকে ধাবিত হবে না। কারণ পরবর্তী রমযান পূর্বের রমযানের স্থলাভিষিক্ত নয় এবং মান্নত ইতেকাফের ক্ষেত্রেও নয়। কারণ মান্নতের ইতেকাফের ক্ষেত্র ছিলো প্রথম রমযান। কাজেই পরবর্তী রমযানে তা কাযা করা দুরস্ত হবে না।

ব্যাখ্যাকার বলেন– মাতিন (র) যে বলেছেন فَصَامَ وَلَمْ يَعْتَكِفْ এর কারণ এই যে, মান্নতকারী যদি কোনো ওযরের কারণে রোযা না রাখতে পারে তাহলে নিঃসন্দেহে সে রমযানের কাযার সময় ইতেকাফের কাযা করতে পারে। কেননা বিধানগতভাবে রমযানের রোযার সাথে ইতেকাফের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। অতএব ইতেকাফের শর্ত (রোযা) তার পূর্ণতা তথা নফল রোযার প্রতি প্রত্যাবর্তিত হবে না।

ثُمَّ شَرَعَ الْمُصَنِّفُ رح فِيْ بَيَانِ تَقْسِيْمِ الْاَدَاءِ وَالْقَضَاءِ اِلَى اَنْوَاعِهِمَا فَقَالَ وَالْاَدَاءُ اَنْوَاعٌ كَامِلٌ وَقَاصِرٌ وَمَا هُوَ شَبِيْهٌ بِالْقَضَاءِ وفي هٰذَا التَّقْسِيْمِ مُسَامَحَةٌ لِاَنَّ الْاَقْسَامَ لا تُقَابِلُ فِيْمَا بَيْنَهَا وَيَنْبَغِي اَنْ يَقُوْلَ والاداءُ انواعٌ اداءٌ مَحْضٌ وهو نَوْعَانِ كَامِلٌ وقاصرٌ واداءٌ هُوَ شَبِيْهٌ بالقضاءِ ويُعْنَى بالاداءِ الْمَحْضِ مَا لَا يَكُوْنُ فِيْهِ شِبْهٌ بالقضاءِ بِوَجْهٍ مِّنَ الْوُجُوْهِ لا مِنْ حَيْثُ تَغَيُّرِ الْوَقْتِ ولا مِنْ حَيْثُ اِلْتِزَامِهٖ وَيُعْنَى بِالشَّبِيْهِ بالقضاءِ مَا فِيْهِ شِبْهٌ بِهٖ مِنْ حَيْثُ اِلْتِزَامِهٖ ويُعْنَى بِالْكَامِلِ مَا يُؤَدّٰى عَلَى الْوَجْهِ الَّذِيْ شُرِعَ عَلَيْهِ -وبالقاصرِ مَا هُوَ خِلَافُهٗ

অনুবাদ॥ অতঃপর সম্মানিত গ্রন্থকার (র) اداء ও قضاء এর বিভক্তির আলোচনা শুরু করেছেন। তিনি বলেন, اداء কয়েক প্রকারে- যথা- ১. كامل তথা পূর্ণাঙ্গ, ২. قاصر তথা অপূর্ণাঙ্গ এবং অন্য প্রকারটি হলো- اداء شبيه بالقضاء তথা এমন আদা যা কাযার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। গ্রন্থকারের এ বিভক্তির মধ্যে বিচ্যুতি রয়েছে। কেননা, এ সকল প্রকার এমন যে, এগুলোর মধ্যে কোন বৈপরীত্য পাওয়া যায় না। গ্রন্থকারের এরূপ বলা উচিৎ ছিল যে, আদার অনেক প্রকার রয়েছে। اداء محض নিছক আদা; এটা আবার দু প্রকার, كامل বা পূর্ণাঙ্গ এবং قاصر বা অপূর্ণাঙ্গ। অন্য এক প্রকার আদা হলো- যা কাযার সাথে সাদৃশ্য রাখে। অর্থাৎ, اداء محض দ্বারা বুঝানো হয়েছে- যার মধ্যে যে কোন দিক থেকে কাযার কোন সাদৃশ্যতা নেই; না সময়ের পরিবর্তনের বিবেচনায়, আর না উক্ত পরিবর্তনের لازم তথা আনুষঙ্গিক আবশ্যকতার বিবেচনায়। কাযার সাদৃশ্যতা বলতে ঐ কাযাকে বুঝানো হয়েছে, যার মধ্যে আনুষঙ্গিক আবশ্যকতার দিক থেকে সাদৃশ্যতা বিদ্যমান। আর পূর্ণাঙ্গ দ্বারা উদ্দেশ্য, তা সেভাবেই আদায় করা যেভাবে শরীআতে প্রবর্তিত হয়েছে। আর اداء قاصر বা অপূর্ণাঙ্গ আদা হলো যা اداء كامل বা পূর্ণাঙ্গ আদার বিপরীত।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ قوله ثُمَّ شَرَعَ الْمُصَنِّفُ رح فِيْ بَيَانِ تَقْسِيْمِ الْاَدَاءِ الخ : মুসান্নিফ (র) এখান থেকে اداء ও قضاء এর প্রকারভেদ বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন اداء ৩ প্রকার। ১. اداء كامل ২. اداء قاصر ৩. اداء مشابه بالقضاء ব্যাখ্যাকার (র) বলেন- মাতিনের বর্ণিত বিভক্তির মধ্যে কিছুটা ত্রুটি রয়েছে। কারণ একই বিভক্তির প্রকারসমূহের মধ্যে পরস্পর ভিন্নতা থাকা জরুরি। অথচ এখানে তা নেই। কারণ যে আদাটা مشابه بالقضاء (কাযার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ) তার মধ্যে যদি নামাযের সকল হকের প্রতি লক্ষ রাখা হয় তাহলে তা আদায় কামিল গণ্য হবে। আর সকল হকের প্রতি খেয়াল না রাখলে তা হবে আদায়ে কাছির। সারকথা এই যে, তৃতীয় প্রকার আদা প্রথম ২ প্রকারের মধ্যে শামিল রয়েছে। তৃতীয় প্রকার যখন উভয় প্রকারের শামিল রয়েছে কাজেই এগুলোর মধ্যে পারস্পরিক ভিন্নতা থাকলো না।

নূরুল আনওয়ার গ্রন্থকার সংশোধনের ভঙ্গিতে বলেন- মুসান্নিফ (র) এর জন্য এমন বলা উচিত ছিলো যে, اداء প্রথমত ২ প্রকার। ১. اداء محض ও ২. اداء مشابه بالقضاء এরপর اداء محض ২ প্রকার। ১. اداء كامل ও ২. اداء قاصر এক্ষেত্রে আদা এর প্রথম ২ প্রকারের মধ্যে পারস্পরিক ভিন্নতা রয়েছে। কারণ اداء محض দ্বারা উদ্দেশ্য আদার মধ্যে কোনোদিক দিয়ে কাযার সাথে সামঞ্জস্যতা না থাকা। সময়ের পরিবর্তনের দিক দিয়েও নয়, আদা জরুরি হওয়ার দিক দিয়েও নয়। অর্থাৎ اداء محض এর মধ্যে এমন হয় না যে, اداء এর التزام এক দিক দিয়ে করবে। আর তার আদা অপর দিক দিয়ে করবে। আর اداء مشابه بالقضاء দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, আদার মধ্যে التزام তথা লাজিম হওয়ার দিক দিয়ে কাযার সাথে সামঞ্জস্যতা বিদ্যমান থাকবে। অর্থাৎ এর মধ্যে আদায় লাজেম হওয়া এক দিকে হয়ে থাকে। আর তার আদায় করা অন্য দিক দিয়ে হয়ে থাকে। এভাবে اداء محض এর উভয় প্রকার কামিল ও কাসিরের মধ্যেও ভিন্নতা রয়েছে। কারণ আদায়ে কামিল বলে যা এমনভাবে আদায় করা হয় যেভাবে আদায় করা শরীআতের চাহিদা বা দাবি। আর তার খেলাপ করা হলো আদায়ে কাসির।

كَالصَّلٰوةِ بِجَمَاعَةٍ مِثَالٌ لِلْاَدَاءِ الْكَامِلِ فَاِنَّهُ اَدَاءٌ عَلٰى حَسْبِ مَا شُرِعَ فَاِنَّ الصَّلٰوةَ مَا شُرِعَتْ اِلَّا بِجَمَاعَةٍ لِاَنَّ جِبْرَئِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَّمَ الرَّسُوْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْجَمَاعَةِ فِىْ يَوْمَيْنِ وَالصَّلٰوةُ مُنْفَرِدًا مِثَالٌ لِلْاَدَاءِ الْقَاصِرِ فَاِنَّهُ اَدَاءٌ عَلٰى خِلَافِ مَا شُرِعَ عَلَيْهِ وَلِهٰذَا يَسْقُطُ وُجُوْبُ الْجَهْرِ فِى الْجَهْرِيَّةِ عَنِ الْمُنْفَرِدِ - وَفِعْلُ اللَّاحِقِ بَعْدَ فَرَاغِ الْاِمَامِ حَتّٰى لَا يَتَغَيَّرَ فَرْضُهُ بِنِيَّةِ الْاِقَامَةِ مِثَالٌ لِلْاَدَاءِ الشَّبِيْهِ بِالْقَضَاءِ فَاِنَّ اللَّاحِقَ هُوَ الَّذِىْ اِلْتَزَمَ الْاَدَاءَ مَعَ الْاِمَامِ مِنْ اَوَّلِ التَّحْرِيْمَةِ ثُمَّ سَبَقَهُ الْحَدَثُ فَتَوَضَّأَ وَاَتَمَّ بَقِيَّةَ الصَّلٰوةِ بَعْدَ فَرَاغِ الْاِمَامِ فَاِنَّ هٰذَا الْاِتْمَامَ اَدَاءٌ مِنْ حَيْثُ بَقَاءِ الْوَقْتِ وَشَبِيْهٌ بِالْقَضَاءِ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ لَمْ يُؤَدِّ كَمَا الْتَزَمَ وَلَمَّا كَانَ مَعْنَى الْاَدَاءِ مِنْ حَيْثُ الْاَصْلِ وَمَعْنَى الْقَضَاءِ مِنْ حَيْثُ التَّبْعِ جُعِلَ اَدَاءٌ شَبِيْهًا بِالْقَضَاءِ وَلَمْ يُجْعَلْ قَضَاءٌ شَبِيْهًا بِالْاَدَاءِ -

অনুবাদ ॥ *যেমন- জামাআতের সাথে নামায পড়া পূর্ণাঙ্গ আদার উদাহরণ।* কেননা এটা প্রবর্তিত পদ্ধতিতে পালিত হয়েছে। এ জন্যে যে, জামাআতের পদ্ধতিতেই নামাযের বিধান প্রবর্তিত হয়েছে জিবরাইল (আ) রাসূল (স) কে দু'দিন জামাআতের সাথে নামায আদায়ের শিক্ষা দিয়েছেন। *আর একাকীভাবে নামায আদায় করা হলো* اداء قاصر *বা অপূর্ণাঙ্গ আদার উদাহরণ।* কেননা এটা শরীআত বিবর্জিত পদ্ধতিতে আদায় হয়েছে। এ কারণে জাহরী নামাযে উচ্চস্বরে ক্বেরাত পড়ার আবশ্যকতা একাকী নামায আদায়কারী থেকে রহিত হয়ে যায়।

আর ইমামের নামায শেষ করার পর লাহিক তথা মধ্যবর্তী সময়ে শামিল মুক্তাদীর কাজ, এমনকি ইকামতের নিয়্যতের মাধ্যমে আদায় করা তার ফরয পরিবর্তন হবে না। এটা কাযা সদৃশ আদার উদাহরণ। লাহিক হলো ঐ ব্যক্তি যে প্রথম তাকবীরে তাহরীমা থেকে ইমামের সাথে নামায আদায় করাকে অপরিহার্য করে নিয়েছে, অতঃপর তাকে অপবিত্রতায় পাওয়ায় সে উযূ করেছে; এবং ইমামের নামায শেষ হওয়ার পর অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করেছে। কেননা এ পূর্ণতা সময়ের মধ্যে সমাপ্ত হিসেবে আদা এবং এ দিক থেকে কাযার অনুরূপ যে, যেভাবে সে এটাকে নিজের জন্যে অত্যাবশ্যক করে নিয়েছিল সেভাবে আদায় করেনি। আর যেহেতু এর মধ্যে আদার অর্থ মৌলিকভাবে এবং কাযার অর্থ আনুষঙ্গিক হিসেবে রয়েছে, তাই এটাকে কাযা সদৃশ্য আদা বলা হয়েছে। এমন কাযা বলা হয়নি যা আদার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله كَالصَّلٰوةِ بِجَمَاعَةٍ مِثَالٌ لِلْاَدَاءِ الخ : মুসান্নিফ (র) এখান থেকে তিন প্রকার اداء এর উদাহরণ পেশ করছেন। اداء كامل **এর উদাহরণ** : মাতিন (র) বলেন– পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআতের সাথে আদায় করা হলো আদায়ে কামিলের উদাহরণ। কারণ এটা নামায আদায়ের সঠিক তরিকা।

নামায জামাআতের সাথে مشروع (প্রবর্তিত) হওয়ার দলিল : হযরত জিব্রাইল (আ) নবী করীম (স) কে নামাযের পদ্ধতি জামাআতের সাথে ২ দিন শিক্ষা দিয়েছিলেন। ইমাম তিরমিযী (র) এর বর্ণনা মোতাবেক ইবনে আব্বাস (রা) বলেন- হুজুর (স) এরশাদ করেছেন, জিব্রাইল (আ) বায়তুল্লাহ শরীফে ২ বার আমার ইমামতি করেছেন। এটা জানা কথা যে, ইমামতি জামাআতের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। অতএব বোঝা যায় যে, নামায জামাআতের সাথেই প্রবর্তিত হয়েছে।

اداء قاصر এর উদাহরণ : একাকী নামায আদায় করা হলো اداء قاصر এর উদাহরণ। কারণ তা শরীআত প্রবর্তিত পদ্ধতির খেলাপ। এ কারণে মুনফারেদ থেকে জাহরী নামাযের মধ্যে জোরে কেরাআত ওয়াজিব হওয়া রহিত হয়ে যায়। এটা এ বিষয়ের দলিল যে, মুনফারিদের নামায আদায় করাটা অপূর্ণাঙ্গ। কারণ জাহরী নামাযে উচ্চস্বরে কেরাআত পড়া-ই পূর্ণাঙ্গতার পরিচায়ক। এর কারণ এই যে, ইমাম যদি জাহরী নামাযে নীরবে কেরাআত পড়ে তাহলে তার উপর সহু সাজদা ওয়াজিব হয়। সুতরাং উচ্চস্বরে কেরাআত পড়া যখন পূর্ণাঙ্গতার পরিচায়ক, কাজেই তা রহিত হয়ে যাওয়া অপূর্ণাঙ্গতার আলামত হবে। এভাবে একাকী নামাযের মধ্যে যেহেতু উচ্চ স্বরে কেরাআত পড়া রহিত হয়ে গেছে। একারণে একাকী নামায আদায় করা অপূর্ণাঙ্গ বিবেচিত হবে।

اداء مشابه بالقضاء এর উদাহরণ : ইমামের নামায শেষ করার পরে লাহিক মুক্তাদি যদি মুসাফির হয় তাহলে মুকীম হওয়ার নিয়ত করার দ্বারা তার ফরয পরিবর্তন হয় না। এটা اداء مشابه بالقضاء এর উদাহরণ। কেননা যে ব্যক্তি প্রথম তাহরিমার সাথেই ইমামের সাথে নামাযে শরিক হয় এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইমামের সাথে নামায আদায় করার নিয়ত করে কিন্তু নামাযের মাঝে তার উযু নষ্ট হয়ে গেলো। এরপর উযু করে এসে অবশিষ্ট নামায ইমামের নামায শেষ করার পরে পূর্ণ করলো। তাহলে তার এ নামায পূর্ণ করা এক দিক দিয়ে আদায় সাব্যস্ত হবে। কারণ তখনও নামাযের সময় বাকী আছে। কিন্তু লাহিক ব্যক্তি যেভাবে নামায জামাআতের সাথে আদায় করা নিজের উপর জরুরি করে নিয়েছিলো সেভাবে তা পূর্ণ করতে পারলো না। এ কারণে এ আদায় করাটা কাযা এর সামঞ্জস্য হলো।

قوله وَلَمَّا كَانَ مَعْنَى الْأَدَاءِ مِنْ حَيْثُ الخ : এই ইবারতে একটা প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে।

প্রশ্ন : তৃতীয় প্রকার আদাকে اداء مشابه بالقضاء নাম রাখার কারণ কি? এর পরিবর্তে قَضَاءٌ مُشَابِهٌ بِالْأَدَاءِ নাম রাখা হলো না কেন?

উত্তর : এই তৃতীয় প্রকারে আদার অর্থটাই মূল। আর কাযার অর্থটা তার অনুগামী বা তাবে'। তা এভাবে যে, লাহিক ব্যক্তির উল্লিখিত নামায যেহেতু নামাযের সময়ের মধ্যেই পাওয়া গেছে। এ কারণে এ নামায মূলের দিক দিয়ে আদায় সাব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু গুণগত দিক দিয়ে এ নামায কাযা গণ্য হবে। কেননা সে যেভাবে নিজের উপর জরুরি করে নিয়েছিলো সেভাবে সে তা আদায় করতে পারেনি। (কারণ ইমামের সাথে পূর্ণ নামায আদায় করাকে নিজের জন্য জরুরি করে নিয়েছিলো। অথচ ইমামের নামায শেষ হওয়ার পরে একাকী নামায পূর্ণ করলো।) অতএব وصف التزام ছুটে যাওয়ার কারণে লাহিকের নামায কাযা হয়ে গেলো। আর وصف যেহেতু অনুগামী হয়ে থাকে। এ কারণে লাহিকের উল্লেখিত নামাযের মধ্যে কাযার অর্থটা তাবে' এবং আদার অর্থটা আছল হবে। আর নাম রাখার বিষয়ে আছলই ধর্তব্য হয়। এই কারণে এ নামকরণ করা হয়েছে।

وثَمَرَةُ كَوْنِه اداءً ظَاهِرَةٌ ولِهٰذا لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا وثَمرَةُ كونِه شبيهًا بالقضاءِ هِيَ اَنَّهٗ لَا يتغيَّر فرضُه حينئذٍ بِنِيَّةِ الْاِقامةِ بِاَنْ كانَ هٰذا اللّاحِقُ مُسافرًا اِقْتَدٰى بِمُسافِرٍ ثُمَّ اَحْدَثَ فذهبَ الٰى مِصْرِه لِلتَّوضّي اوْ نَوَى الْاِقامَةَ فِيْ مَوْضَعِها ثمّ جاءَ حتّٰى فَرَغَ الامامُ ولَمْ يَتكلَّمْ وشَرَعَ فِيْ تَمامِ الصَّلٰوةِ فلا يُتِمُّ اَرْبَعًا بَلْ يُصَلّي رَكعتَيْنِ كمَا اِذَا كَانَ قضاءً مَحْضًا لا يتغيَّرُ فرضُه بِنِيَّةِ الْاِقامةِ فكَذَا هٰذا فانْ لَمْ يَقْتَدِ بِمُسافِرٍ بَلْ بِمُقيْمٍ او لَمْ يَفْرَغِ الامامُ بَعْدُ او تكلَّمَ ثمّ اسْتَانَفَ اوْ كانَ مِثْلُ هٰذا فِي الْمَسْبُوقِ دُوْنَ اللّاحِقِ يَصِيْرُ فَرْضُهُمْ اَرْبَعًا بِنِيَّةِ الْاِقامةِ -

---

অনুবাদ ॥ এটা আদা বিবেচিত হওয়ার ফলাফল সুস্পষ্ট। এ কারণে গ্রন্থকার (র) এটাকে উল্লেখ করেননি : এটা কাযা সদৃশ হওয়ার ফলাফল এই যে, তখন ইকামাত বা মুকীম হওয়ার নিয়্যত করার কারণে তার ফরয পরিবর্তন হবে না। তা এভাবে যে, উক্ত লাহেক ব্যক্তিটি মুসাফির ছিল। সে অন্য একজন মুসাফিরের পেছনে ইক্তেদা করলো। অতঃপর উক্ত মুসাফির ব্যক্তিটি উযূ নষ্ট হওয়ায় সে নিজ শহরে উযূ করার জন্যে গেলো; অথবা সে স্থানেই ইকামাতের নিয়্যত করলো। অতঃপর ইমাম নামায শেষ করে ফেলেছেন। এ সময়ের মাঝে সে কোন কথা-বার্তা বলেনি। তারপর সে নামায পূর্ণ করতে শুরু করলো। তাহলে সে চার রাকাত নামায আদায় করবে না, বরং দুরাকআত নামায আদায় করবে। যেমন যদি قضاء محض বা নিছক কাযা হয়, তবে ইকামাতের নিয়্যতের কারণে তার ফরয পরিবর্তন হবে না। আর তেমনি এ অবস্থায়ও (কাযার ন্যায় দুরাকআত আদায় করা হবে)। আর যদি সে মুসাফিরের পেছনে ইক্তেদা না করে, বরং কোন মুকীমের পেছনে ইক্তেদা করে, অথবা ইমাম তখনো নামায শেষ করেননি, অথবা মধ্যবর্তী সময়ে মুক্তাদী কথা বলে ফেলে, অতঃপর নতুনভাবে আরম্ভ করে, অথবা এ অবস্থা মাসবুকের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে, লাহেক মুক্তাদী ব্যতীত; তবে তাদের ফরযসমূহ ইকামতের নিয়্যতের কারণে চার রাকআত হয়ে যাবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله وَثَمَرَةُ كَوْنِهِ اَدَاءً ظَاهِرَةٌ الخ : মাতিন (র) বলেন- ইমামের নামায শেষ করার পরে লাহিকের নামাযের কাজটা اداء مُشَابَه بِالْقَضَاءِ হওয়ার ফলাফল সম্পূর্ণ স্পষ্ট। অর্থাৎ ইমামের নামায শেষ করার পরে লাহিকের নামায আদায় হয়ে যাওয়া স্পষ্ট বিষয়। কারণ এর দ্বারা সে দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যায়। দায়িত্ব মুক্ত নাহলে সময় থাকার কারণে দ্বিতীয়বার তা নতুনভাবে আদায় করার নির্দেশ দেয়া হতো। তাকে দ্বিতীয়বার নতুনভাবে নামায পড়ার আদেশ না দেয়া এ বিষয়ের দলিল যে, ইমামের নামায শেষ করার পরে লাহিকের নামায আদায় হয়ে গেছে। এবং সে দায়িত্ব মুক্ত হয়ে গেছে। মোটকথা এ বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার কারণে মাতিন (র) এটা উল্লেখ করেননি।

قوله وَثَمَرَةُ كَوْنِهِ شَبِيْهًا بِالْقَضَاءِ : مُشَابَه بِالْقَضَاءِ **হওয়ার ফল** : লাহিক ব্যক্তি যদি মুসাফির হয় তাহলে ইমামের নামায শেষ হওয়ার পরে তার মুকীম হওয়ার নিয়ত করার দ্বারা ফরয পরিবর্তন হতো না। যেমন- قضاء محض এর ক্ষেত্রে মুসাফিরের মুকীম হওয়ার নিয়ত দ্বারা ফরয পরিবর্তন হয় না। এর ব্যাখ্যা এই যে, কোনো এক মুসাফির অপর কোনো মুসাফিরের ৪ রাকআত বিশিষ্ট নামাযের একতেদা করলো। অতপর মুসাফির

মুকতাদির নামায অবস্থায় উযু নষ্ট হয়ে গেলো সে উযু করার জন্যে নিজের বাড়িতে গেলো, অথবা সে ঐ জায়গায়ই মুকীম হওয়ার নিয়ত করলো। এরপর নিজের নামায পূর্ণ করার জন্য এমন সময় আসলো যখন ইমাম নামায শেষ করে ফেলেছেন। এ সময়ের মধ্যে সে কোনো কথাও বলেনি। এভাবে সে নামায পূর্ণ করতে লাগলো। এক্ষেত্রে লাহিক মুসাফির ৪ রাকআত নামায আদায় করবে না। বরং ২ রাকআত আদায় করবে। যেমন قضاء محض এর ক্ষেত্রে মুসাফিরের ফরয নামায ইকামাতের নিয়ত দ্বারা পরিবর্তন হয় না। তদ্রূপ এক্ষেত্রেও ইকামাতের নিয়ত দ্বারা তার ফরয পরিবর্তন হবে না। অর্থাৎ যদি কারো উপর সফর অবস্থায় ৪ রাকআত নামাযের কাযা ওয়াজিব হয়ে যায়। এমতাবস্থায় সে ইকামতের নিয়ত করে কিংবা নিজ বাড়িতে চলে আসে। তাহলে ইকামাতের নিয়ত দ্বারা বা নিজ বাড়িতে আসার দ্বারা তার ফরয পরিবর্তন হয় না। বরং ২ রাকআত নামাযের কাযা ওয়াজিব হয়। এভাবে লাহিক মুসাফিরও যদি ইমামের নামায শেষ করার পরে ইকামাতের নিয়ত করে অথবা উযু করার উদ্দেশ্যে নিজ শহরে প্রবেশ করে তাহলে তার ফরয পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ তার উপর ২ রাকআত নামাযই পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়। সুতরাং এটা قضاء محض এর مشابه হলো। এই কারণেই مشابه بالقضاء নাম রাখা হয়েছে।

قوله فَإِنْ لَمْ يَقْتَدِ بِمُسَافِرِ الخ : এই ইবারত দ্বারা ঐ সকল বিষয়ের উপকারীতা উল্লেখ করা হয়েছে যে সকল قيد - اداء مشابه بالقضاء এর উদাহরণে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, লাহেক মুসাফির যদি অপর কোনো মুসাফিরের একতেদা না করে বরং মুকীমের একতেদা করে। আর নামাযের মাঝে উযু নষ্ট হওয়ার কারণে উযু করার উদ্দেশ্যে নিজ বাড়ি গমন করে কিংবা একামাতের নিয়ত করে। এরপর ইমামের নামায শেষ করার পরে ফিরে আসে। আর পথিমধ্যে কারো সাথে কথাবার্তা না বলে। তাহলে এ লাহিক মুসাফির ৪ রাকআত নামায পূর্ণ করবে। তবে মনে রাখতে হবে যে, এ ৪ রাকআত নামায ইমামের নামায শেষ করার পরে ইকামাতের নিয়ত দ্বারা জরুরি হয়নি। বরং শুরুতে মুকীমের পিছনে তাহরীমা দ্বারা তার উপরে অবধারিত হয়েছে। আর লাহিক মুসাফির যদি উযু করে ইমামের নামায শেষ করার আগে ফিরে এসে ইমামের সাথে নামায পড়তে শুরু করে তাহলে তার নিজ বাড়িতে কিংবা একামাতের নিয়ত করার কারণে তার ফরয ৪ রাকআত হয়ে যাবে। কারণ লাহিকের কাজের মধ্যে কাযার সামঞ্জস্যতা ইমামের নামায শেষ করার পরে সূচিত হয়েছে। আর এখানে ইমামের নামায শেষ করা পাওয়া যায়নি। কাজেই اقامت আদার উপর আরোপিত হলো কাযার উপর নয়। আর আদায়টা ইকামাতের নিয়ত দ্বারা ২ রাকআত থেকে ৪ রাকআতের প্রতি পরিবর্তন হয়ে যাবে। এ কারণে এক্ষেত্রে লাহিক মুসাফির ৪ রাকআত পূর্ণ করবে। আর লাহিক মুসাফির যদি ইমামের নামায শেষ করার পরে কথাবার্তা বলে তাহলেও সে ৪ রাকআত নামায পূর্ণ করবে। কেননা কথা বলার দ্বারা তার নামায নষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং সে নতুনভাবে নামায আদায় করবে। অতএব ইকামাতের নিয়ত আদার উপর অরোপিত হয়েছে। আর আদায় করা ২ রাকআত থেকে ৪ রাকআতের প্রতি পরিবর্তন হয়ে যায়। এ কারণে এ নামাযও ইকামাতের নিয়তের দ্বারা পরিবর্তন হয়ে যাবে।

যদি মাসবুকের ক্ষেত্রে এ অবস্থা পেশ আসে অর্থাৎ এক মুসাফির অন্য মুসাফিরের পেছনে ৪ রাকআত বিশিষ্ট নামাযের ওয়াক্তের মধ্যেই ইমামের ১ রাকআত পড়ার পরে ইকতেদা করে। এরপর যখন ইমামের নামায পূর্ণ হয়ে গেলো। তখন মুসাফির মুকতাদি ইকামাতের নিয়ত করলো। তাহলে এ মুসাফির মুকতাদি ৪ রাকআত পূর্ণ করবে। কেননা ইকামাতের এ নিয়ত মুসাফির মুকতাদির অবশিষ্ট নামাযের উপর আরোপিত হবে। আর সে অবশিষ্ট নামাযে সর্বদিক দিয়েই আদায়কারী বিবেচিত। কারণ সময় বাকী রয়েছে এবং সে এ পরিমাণ ইমামের পিছনে আদায় করাকে জরুরি করে নেয়নি যে, তার খেলাপ করার কারণে কাযাকারী গণ্য হবে। কাজেই ইকামাতের নিয়ত যখন আদার উপর আরোপিত হলো। আর ইকামাতের নিয়ত দ্বারা আদা পরিবর্তন হয়ে যায়। সুতরাং মাসবুক মুসাফিরের ফরযও ইকামাতের নিয়ত দ্বারা ২ রাকআত থেকে ৪ রাকআতের প্রতি পরিবর্তন হয়ে যাবে।

ثُمَّ اَنَّ هٰذَا الْاَقْسَامَ الثَّلٰثَ كَمَا تَجْرِىْ فِىْ حُقُوْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى تَجْرِىْ فِىْ حُقُوْقِ الْعِبَادِ اَيْضًا فَقَالَ وَمِنْهَا رَدُّ عَيْنِ الْمَغْصُوْبِ اَىْ وَمِنْ اَنْوَاعِ الْاَدَاءِ رَدُّ عَيْنِ الشَّيْءِ الَّذِىْ غَصَبَهُ عَلَى الْوَصْفِ الَّذِىْ غَصَبَهُ اِلَى الْمَالِكِ بِدُوْنِ اَنْ يَكُوْنَ الْمَغْصُوْبُ مُشْتَغِلًا بِالْجِنَايَةِ اَوْ بِالدَّيْنِ وَبِدُوْنِ اَنْ يَكُوْنَ نَاقِصًا بِنُقْصَانٍ حِسِّىٍّ فَهٰذَا نَظِيْرُ الْاَدَاءِ الْكَامِلِ لِاَنَّهُ اَدَاءٌ عَلَى الْوَصْفِ الَّذِىْ غَصَبَهُ مِنْ غَيْرِ فُتُوْرٍ وَمِثْلُهُ تَسْلِيْمُ عَيْنِ الْمَبِيْعِ اِلَى الْمُشْتَرِىْ وَتَسْلِيْمُ بَدَلِ الصَّرْفِ وَالْمُسْلَمُ فِيْهِ اِلَيْهِ عَلَى الْوَصْفِ الَّذِىْ وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ

অনুবাদ॥ এ তিনো প্রকার যেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার হক তথা অধিকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তেমনি বান্দার অধিকারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়। অতঃপর গ্রন্থকার (র) বলেন, اداء ***এর প্রকারসমূহের একটি হলো আত্মসাৎকৃত-বস্তু হুবহু প্রত্যার্পণ করা।*** অর্থাৎ, আদার প্রকারসমূহের মধ্যে একটি এই যে, যে وصف বা গুণের উপর বস্তুটি আত্মসাৎ হয়েছে বস্তুটি উক্ত وصف বা গুণের উপরে মালিকের কাছে প্রত্যার্পণ করা। এ অবস্থায় যে, আত্মসাৎকৃত বস্তু কোন অপরাধে জড়িত হয়নি এবং কোন ঋণে জড়িত হয়নি। এরূপে কোন দৃশ্যমান ত্রুটিযুক্ত হয়নি, যার ফলে তা অপূর্ণাঙ্গ হয়েছে। এটা হলো পূর্ণাঙ্গ আদার উদাহরণ। কেননা, তা ঐ গুণের উপর আদায় হয়েছে, যে গুণের অবস্থায় তা কোন প্রকার ত্রুটি ব্যতীত আত্মসাৎ করা হয়েছে। এভাবে হুবহু বিক্রিত বস্তুকে ক্রেতার কাছে সোপর্দ করা এবং বদলে সরফ ও মুসলাম ফীহ তথা যে বস্তুর মধ্যে আকদে সালাম সংঘটিত হয়েছে, তাকে যে গুণের মধ্যে কারবার সংঘটিত হয়েছে সে অবস্থায় সোপর্দ করা।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ قوله ثُمَّ اِنَّ هٰذِهِ الاَقْسَامَ الخ : ব্যাখ্যাকার বলেন ৩ প্রকার আদা। যথা- ১. اداء كامل ২. اداء قاصر ৩. اداء مشابه بالقضاء যে ভাবে আল্লাহর হকের মধ্যে কার্যকর হয় যেমন পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে তদ্রূপ বান্দার হকের মধ্যেও প্রযোজ্য হয়। গ্রন্থকার (র) বলেন- কোনো ছিনতাইকারী যদি ছিনতাইকৃত দ্রব্য হুবহু মালিকের নিকট ফেরত দেয় তাহলে এটা আদায়ে কামিল গণ্য হবে। হুবহু ফেরত দেয়ার অর্থ এই যে, ছিনতাইকৃত দ্রব্য যদি গোলাম হয় তাহলে গোলাম ছিনতাইকারীর কব্জায় আসার পরে সে এমন কোনো অন্যায় করেনি যার কারণে সে কিসাসের উপযোগী হয়। এভাবে সে এমন কোনো মাল বিনষ্ট করেনি যার ক্ষতিপূরণ তার দায়িত্বে অর্পিত হয়। এভাবে তার মধ্যে জাহরী কোনো ক্রটিও সুস্পষ্ট হয়নি। অর্থাৎ তার কোনো অঙ্গহানি হয়নি।

মোটকথা ছিনতাইকৃত গোলাম ছিনতাইকারীর কব্জায় থাকাকালে কোনো অন্যায়ে লিপ্ত না হয় এবং এমন কোনো কাজ না করে যার দরুন তার উপর ক্ষতিপূরণ জরুরি হয়। এবং তার মধ্যে কোনো বাহ্যিক ক্রটিও সৃষ্টি না হয় তাহলে মালিকের কাছে এমন গোলাম হস্তান্তর করা আদায়ে কামিল গণ্য হবে।

এভাবে বিক্রেতা যদি হুবহু পণ্য ক্রেতার নিকট অর্পণ করে। আর عقد صرف এর মধ্যে কোনো এক পক্ষ হুবহু بدل صرف তথা মূল্য অপর জনের নিকট অর্পণ করে যে পণ্যের উপর আকদে সরফ সংঘটিত হয়েছে। আর আকদে সালামের মধ্যে مسلم اليه হুবহু مسلم فيه রব্বুস সালামের নিকট অর্পণ করে। যার উপর আকদে সালাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। তাহলে এসবও আদায়ে কামিলের দৃষ্টান্ত হবে।

ফায়েদা : بيع তথা বেচা-কেনা কয়েক প্রকারের আছে। ১. بيع مطلق ২. بيع مقايضه ৩. بيع صرف ৪. بيع سلم ও بيع مطلق হলো- بَيْعُ الْعَيْنِ بِالدَّيْنِ

(পরের পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

وَ رَدُّهٗ مَشْغُوْلًا بِالْجِنَايَةِ نظيرٌ لِلاداءِ القاصِرِ اى رَدُّ الشَّئِ الْمَغْصُوْبِ حَالَ كَوْنِهٖ مَشْغُوْلًا بِالْجِنَايَةِ اَوْ بِالدَّيْنِ بِاَنْ غَصَبَ عَبْدًا فارغًا ثم لَحِقَهُ الدَّيْنُ او الجِنَايَةُ فِىْ يَدِ الْغَاصِبِ ومِثْلُهٗ تَسْلِيْمُ الْمَبِيْعِ حالَ كونِهٖ مَشْغُوْلًا بِالجِنَايَةِ اَوْ بِالدَّيْنِ او بِالمَرَضِ ففِىْ هٰذا كلِّهٖ اِنْ هَلَكَ الْمَغْصُوْبُ والْمَبِيْعُ فِىْ يَدِ الْمَالِكِ والْمُشْتَرِىْ بِاٰفةٍ سَمَاوِيَّةٍ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الغاصِبِ والبائِعِ لِكَوْنِهٖ اداءً ولَوْ دَفَعَهُ المالِكُ الى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ او بِيْعَ فِى الدَّيْنِ رَجَعَ الْمَالِكُ عَلَى الْغَاصِبِ بِالْقِيْمَةِ والْمُشْتَرِىْ عَلَى البائِعِ بالثَّمَنِ -

অনুবাদ ॥ ***আত্মসাৎকৃত বস্তুকে অপরাধে অভিযুক্ত অবস্থায় প্রত্যার্পণ করা, ইহা*** اداء قاصر এর উদাহরণ। অর্থাৎ, আত্মসাৎকৃত বস্তুকে এভাবে প্রত্যার্পণ করা যে. তা কোন অপরাধের সাথে অথবা ঋণের সাথে জড়িত। এভাবে যে, সে এমন একটি দাসকে আত্মসাৎ করেছে যে অপরাধ থেকে মুক্ত। অতঃপর আত্মসাৎকারীর হাতেই তার ওপর (দাসের) কোন ঋণের বোঝা অথবা, কোন অপরাধের অভিযোগ সংযুক্ত হয়েছে।

তদ্রূপ বিক্রীত বস্তুকে অপরাধে জড়িত থাকা অবস্থায় অথবা, রোগগ্রস্ত অবস্থায় সোপর্দ করা, (اداء قاصر এর উদাহরণ) সুতরাং উল্লেখিত ক্ষেত্রসমূহে যদি আত্মসাৎকৃত বস্তু এবং বিক্রিত বস্তু কোন প্রাকৃতিক দুর্ঘটনাজনিত কারণে মালিকের হাতে বা ক্রেতার হাতে ধ্বংস হয়, তবে আদা সম্পূর্ণ হওয়ার কারণে আত্মসাৎকারীর এবং বিক্রেতার কোন দায়িত্ব থাকবে না।

আর যদি মালিক উক্ত বিক্রীত বস্তু বা আত্মসাৎকৃত বস্তু অপরাধে জড়িত ব্যক্তির নিকটে অর্পণ করে অথবা ঋণের পরিবর্তে উক্ত বিক্রিত বস্তু বা আত্মসাৎকৃত বস্তুকে বিক্রি করে দেয়, তবে মালিক আত্মসাৎকারীর নিকট থেকে মূল্য আদায় করবে এবং ক্রেতা-বিক্রেতা থেকে বিক্রিত বস্তুর প্রদত্ত বিনিময় আদায় করে নিবে।

(পূর্বের বাকী অংশ) তথা হুবহু বস্তুকে সোনা-রূপার পরিবর্তে বিক্রি করা। এ বেচা-কেনায় নির্দিষ্ট বস্তু পণ্য হওয়া এবং دين তথা সোনা-রূপার মূল্য হওয়া নির্দিষ্ট।

★ بيع مُقَايَضَه হলো بَيْعُ الْعَيْنِ بِالْعَيْنِ অর্থাৎ হুবহু কোনো বস্তুকে অপর কোনো বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি করা। যেমন গমের পরিবর্তে কাপড় বিক্রি করা।

★ بَيْع صَرْف হলো بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ অর্থাৎ ثمن কে ثمن এর পরিবর্তে বিক্রি করা। এ ২ প্রকারের মধ্যে عوضين এর প্রত্যেকটি ثمن (মূল্য) হতে পারে আবার পণ্যও হতে পারে।

★ بَيْع سَلم হলো بَيْعُ اٰجِلٍ بِعَاجِلٍ অর্থাৎ বাকী বস্তুকে নগদ অর্থে বিক্রি করা। যে ব্যক্তি নগদ বস্তু আদায় করবে তাকে رَبُّ السَّلَمِ এবং নগদ বস্তুকে رَأْسُ الْمَالِ বলে। আর যে ব্যক্তি বাকী বস্তু পরিশোধ করে তাকে مسلم اليه এবং বাকী বস্তুকে مُسْلَمٌ فِيْهِ বলে। এটাও লক্ষ্য রাখা দরকার যে, بيع صرف এর মধ্যে ক্রেতা বিক্রেতা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে عوضين করায়ত্ত করা শর্ত। আর بيع سلم এর মধ্যে رأسُ المال করায়ত্ত করা শর্ত।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله و رَدُّهُ مَشْغُولًا بِالْجِنَايَةِ الخ : হুকুকুল ইবাদে ادائے قاصر এর দৃষ্টান্ত : কোনো এক ব্যক্তি এমন এক গোলাম অপহরণ করলো যে, جنايت دين এবং বাহ্যিক ত্রুটি সবকিছু থেকে মুক্ত অর্থাৎ সে এমন কোনো অন্যায়ে জড়িত হয়নি এবং তার উপর কোনো মালের জরিমানা আরোপিত হয়নি। আর তার মধ্যে কোনো বাহ্যিক দোষ-ত্রুটি জাহির হয়নি। তবে অপরহরণকারীর করায়ত্তে থাকাকালে সে নির্দোষ কোনো ব্যক্তিকে স্বেচ্ছায় হত্যা করেছিলো। ফলে তার উপর কিসাস ওয়াজিব হয়েছিলো। অথবা কোনো ব্যক্তির মাল বিনষ্ট করেছিলো। ফলে তার উপর জরিমানা আরোপিত হয়েছিলো। কিংবা তার মধ্যে বাহ্যিক কোনো দোষ-ত্রুটি সৃষ্টি হয়েছিলো। এমতাবস্থায় যদি এ গোলামকে মণিবের নিকট অর্পণ করা হয় তাহলে এটা আদায়ে কাসির গণ্য হবে। কেননা যে বৈশিষ্ট্যের উপর গোলামকে অপহরণ করা হয়েছিলো সে অবস্থায় তাকে ফেরত দেয়া হয়নি।

একইভাবে কোনো বিক্রিত গোলাম বিক্রয়কালে যদি দোষ-ত্রুটি মালের জরিমানা বা রোগ ইত্যাদি সকল কিছু থেকে মুক্ত থাকে কিন্তু ক্রেতার নিকট তাকে অর্পণ করার সময় সে কোনো অন্যায় জড়িত হয়েছিলো বা তার উপর জরিমানা আরোপিত হয়েছিলো। অথবা কোনো রোগ বা দোষে আক্রান্ত হয়েছিলো তাহলে এটাও আদায়ে কাসির বিবেচিত হবে।

ادائے قاصر এর বিধান : اَدَائِے قَاصِرٌ এর বিধান এই যে, অপরহরণকৃত গোলাম যদি মালিকের করায়ত্বে এবং বিক্রিত দ্রব্য ক্রেতার করায়ত্তে থাকাকালে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুন নষ্ট হয়ে যায়। তাহলে অপহরণকারী এবং বিক্রেতার দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যাবে। কারণ তার পক্ষ থেকে সোপর্দ করা হলো আদা। যদিও এটা আদায়ে কাসির। আর আদার দ্বারা আদায়কারীর দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যায়। অতএব এখানেও দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। আর মালিক এবং ক্রেতা যদি উল্লেখিত গোলাম নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদেরকে দিয়ে দেয়, অথবা তার উপর আরোপিত মাল অথবা জরিমানা আদায় করার জন্য তাকে বিক্রি করে তাহলে মালিক অপহরণকারী থেকে গোলামের মূল্য আদায় করবে এবং ক্রেতা বিক্রেতা থেকে তার অর্পিত মূল্য উসূল করে নিবে। কেননা মালিকের করায়ত্ত অপহৃত গোলাম থেকে এবং ক্রেতার করায়ত্ব ক্রয়কৃত গোলাম থেকে এমন সবাবের দরুন বিনষ্ট হয়েছে যে সবাবটি অপরহরণকারী এবং বিক্রেতার করায়ত্ত থাকাকালে সূচিত হয়েছিলো। অতএব এটা এমন হলো যেন মালিক এবং ক্রেতা করায়ত্ত করেনি। আর করায়ত্ত না করার কারণে অপরহরণকারী থেকে মালিকের জন্য মূল্য ফেরত নেয়া এবং ক্রেতার জন্য বিক্রেতা থেকে মূল্য ফেরত নেয়ার অধিকার থাকে। অতএব এ ক্ষেত্রেও মালিকের অপহরণকারী থেকে মূল্য ফেরত নেয়ার অধিকার থাকবে। এভাবে ক্রেতার জন্য বিক্রেতা থেকে মূল্য ফেরত নেয়ার অধিকার থাকবে।

ফায়েদা : বাজার দর এবং বিনিময়কে মূল্য বলে। আর ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে নির্ধারিত বিনিময়কে আরবিতে ثمن বলে। ثمن মূল্যের সমানও হতে পারে এবং কম-বেশিও হতে পারে।

وَإِمْهَارَ عَبْدِ غَيْرِهِ وَتَسْلِيمُهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ نَظِيرُ لِلْأَدَاءِ الشَّبِيهِ بِالْقَضَاءِ اى أَمْهَرَ رَجُلٌ عَبْدَ الْغَيْرِ فِي نِكَاحِ اِمْرَاتِهِ ثُمَّ سَلَّمَهُ الَيْهَا بَعْدَ الشِّرَاءِ فَهُوَ أَدَاءٌ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ سَلَّمَ عَيْنَ الْعَبْدِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ وَشَبِيهُ بِالْقَضَاءِ مِنْ حَيْثُ أَنَّ تَبَدُّلَ الْمِلْكِ يُوجِبُ تَبَدُّلَ الْعَيْنِ حُكْمًا فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ مَمْلُوكًا لِلْمَالِكِ كَانَ شَخْصًا أُخَرَ ثُمَّ إِذَا اشْتَرَاهُ الزَّوْجُ كَانَ شَخْصًا أُخَرَ وَإِذَا سَلَّمَهُ إِلَيْهَا كَانَ شَخْصًا أُخَرَ - وَالْحُجَّةُ فِي هٰذَا الْبَابِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى بَرِيرَةَ يَوْمًا فَقَدَّمَتْ إِلَيْهِ تَمْرًا وَكَانَ الْقِدْرُ يَغْلِي مِنَ اللَّحْمِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَلَا تَجْعَلِينَ لَنَا نَصِيبًا مِنَ اللَّحْمِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّهُ لَحْمٌ تُصُدِّقَ عَلَيَّ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَكِ صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ يَعْنِي إِذَا أَخَذْتِهِ مِنَ الْمَالِكِ كَانَ صَدَقَةً عَلَيْكِ وَإِذَا أَعْطَيْتِهِ إِيَّانَا تَصِيرُ هَدِيَّةً لَنَا فَعُلِمَ أَنْ تَبَدُّلَ الْمِلْكِ يُوجِبُ تَبَدُّلًا فِي الْعَيْنِ وَعَلَى هٰذَا يَخْرُجُ كَثِيرٌ مِنَ الْمَسَائِلِ -

অনুবাদ ॥ (এভাবে) ***অপরের ক্রীতদাসকে মহর সাব্যস্ত করা এবং ক্রয় করার পর তা অর্পণ করা, তা কাযা সদৃশ আদার উদাহরণ।*** অর্থাৎ, কোন ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীর বিবাহে অপরের ক্রীতদাসকে মহর ধার্য করলো। অতঃপর ক্রয় করার পর উক্ত ক্রীতদাসকে সে স্বীয় স্ত্রীর কাছে অর্পণ করলো। উক্ত ব্যক্তির এ কাজটি এ দিক থেকে আদা যে, সে হুবহু সে ক্রীতদাসকেই অর্পণ করেছে, যার ওপর عقد প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটা এ দিক থেকে কাযা সদৃশ্য যে, মালিকানার পরিবর্তন হুকুমের দিক থেকে (পরোক্ষভাবে) মূল বস্তুর পরিবর্তনকে অত্যাবশ্যক করে।

অতএব ক্রীতদাসটি যখন মালিকের মালিকানাধীন ছিল, তখন সে এক ব্যক্তি ছিল। অতঃপর যখন তাকে ক্রয় করেছে, তখন সে অন্য ব্যক্তি হয়ে গেছে। আর যখন স্বামী স্ত্রীর কাছে তাকে অর্পণ করলো, তখন সে অন্য ব্যক্তি হয়ে গেছে।

দলিল এই যে, এ ব্যাপারে একদা হযরত রাসূল (স) হযরত বারীরা (রা)-এর নিকট গমন করেন। হযরত বারীরা (রাঃ) রাসূল (স)-এর খেদমতে কিছু খেজুর পেশ করেন। অথচ তখন গোশতের পাতিল (চুলায়) টগবগ করছিল। তখন রাসূল (স) বললেন, তুমি কি গোশত থেকে একাংশ আমাকে প্রদান করবে না? হযরত বারীরা (রা) তখন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! গোশত আমাকে সাদকা হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। তখন রাসূল (স) বললেন, এটা তোমার জন্যে সাদকা, আর আমার জন্যে হাদিয়া। অর্থাৎ, যখন তুমি তা মালিক থেকে গ্রহণ করেছ, তখন তা তোমার জন্যে সাদকা ছিল, আর যখন তা আমাকে প্রদান করবে, তখন তা আমার জন্যে হাদিয়া হয়ে যাবে।

সুতরাং, বুঝা গেল যে, মালিকানার পরিবর্তন মূল বস্তুর পরিবর্তনকে অত্যাবশ্যক করে। এর ওপর ভিত্তি করে বহু মাসআলা উদ্ভাবিত হয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله وَامْهَارُ عَبْدِ غَيْرِه الخ : **হুকুকুল ইবাদে** اداء مشابه بالقضاء **এর দৃষ্টান্ত :** উদাহরণস্বরূপ এক ব্যক্তি বিবাহের সময় তার স্ত্রীর মোহর খালেদ নামক ব্যক্তির নির্দিষ্ট কোন গোলাম স্থির করলো। এরপর খালেদ থেকে তাকে ক্রয় করে স্ত্রীর নিকট অর্পণ করলো। উক্ত ব্যক্তির এ কাজটি এ কারণে আদা গণ্য হবে যে, সে হুবহু উক্ত গোলামকেই অর্পণ করলো যার উপর বিবাহ বন্ধন হয়েছিলো। এটা مشابه بالقضاء এ কারণে যে, মালিকানা পরিবর্তনের দ্বারা বিধানগতভাবে বস্তুর সত্তা পরিবর্তন হয়ে যায়। অতএব উপরোক্ত গোলাম যখন খালেদের মালিকানাধীন ছিলো সে যেন অন্য ব্যক্তি ছিলো। কিন্তু যখন তাকে স্বামী ক্রয় করে নিলো তখন মালিকানা পরিবর্তনের কারণে সে ভিন্ন ব্যক্তি হয়ে গেলো। অতপর যখন তাকে নিজ স্ত্রীর নিকট অর্পণ করলো তখন মালিকানা পরিবর্তন হয়ে ভিন্ন ব্যক্তি হয়ে গেলো। সারকথা এই যে, লোকটি যে গোলামকে মোহর স্থির করেছিলো সে তাকে অর্পণ করেনি বরং বিধানগতভাবে উক্ত গোলামের মিসল বা অনুরূপ গোলাম সোপর্দ করলো। আর ওয়াজিবের মিসল সোর্পদ করার নামই কাযা। অতএব এটা কাযা এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

মালিকানা পরিবর্তন দ্বারা বিধানগতভাবে মূল বস্তু পরিবর্তনের কারণ : এর কারণ এই যে, একবার রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আয়েশা (রা) এর আযাদকৃত দাসী হযরত বারীরা (রা) এর নিকট গেলেন। বারীরা আপ্যায়নের লক্ষে রাসূলুল্লাহ (স) এর খেদমতে কিছু খেজুর পেশ করলেন। মেশকাতের বর্ণনা মোতাবেক রুটি এবং তরকারি পেশ করেছিলেন। অথচ হাড়িতে তখন গোশত রান্না করা হচ্ছিলো। রাসূলুল্লাহ (স) মজাক স্বরূপ বললেন- ব্যাপারকি এ গোশতের মধ্যে কি আমার কোনো অংশ নেই? হযরত বারীরা বললেন- হে আল্লাহর রাসূল (স)! আপনার উপর আমার মাতা পিতা উৎসর্গ হোক! এটাতো সাদকার গোশত যা আপনার জন্য হালাল নয়। রাসূলুল্লাহ (স) এরশাদ করলেন তোমার জন্য সাদকা তবে আমার জন্য হাদিয়া। অর্থাৎ তুমি যখন মালিকের নিকট থেকে তা গ্রহণ করেছিলে তখন তা সাদকা ছিলো। কিন্তু তুমি যখন আমাকে দিবে তখন তা হাদিয়ায় পরিণত হবে।

এ হাদীসের দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, মালিকানা পরিবর্তনের দ্বারা বিধানগতভাবে মূল বস্তুর সত্তা পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ রাসূলুল্লাহ (স) এর বাণীর উদ্দেশ্য এই যে, মালিকের মালিকানা থেকে বেরিয়ে যখন বারীরার মালিকানাধীন হয়েছে তখন তা সাদকা ছিলো। কিন্তু যখন আমার মালিকানায় আসবে তখন তা হাদিয়ায় পরিণত হবে। অথচ আপনার জানা আছে যে, সাদকা এবং হাদিয়ার বিধান সম্পূর্ণ পৃথক। এ নীতির আলোকে অনেকগুলো মাসআলা বের করা হয়। যেমন-

১. কোনো ফকির যাকাতের মাল গ্রহণ করলো। অতপর সে উক্ত যাকাতের মাল কোনো হাশেমী ধনী ব্যক্তিকে দান করলো। অথবা সে তা বিক্রি করলো। তাহলে এ মাল তার জন্য হালাল হবে। কারণ মালিকানা পরিবর্তনের দ্বারা বস্তুর সত্তা পরিবর্তন হয়ে যায়।

২. এক ব্যক্তি তার নিজস্ব কোনো আত্মীয়কে কিছু মাল সাদকা করলো। এরপর যাকে সাদকা করেছিলো লোকটি মারা গেলো। অতপর মীরাছ স্বরূপ সাদকাকারী উক্ত সাদকার মালের অধিকারী হলো তাহলে সে তার মালিক হয়ে যাবে। এতে তার সাদকার সওয়াব বিনষ্ট হবে না।

ফায়েদা : বনী হাশিম এবং তাদের আযাদকৃত গোলাম বাঁদীর উপর যাকাত-সাদকার মাল গ্রহণ করা হরাম। কিন্তু আয়েশা (রা) যেহেতু বনি হাশেমী ছিলেন না। এ কারণে তার আযাদকৃত বাঁদী বারীরা (রা) এর উপর সাদকা গ্রহণ হারাম ছিলো না।

حَتّٰى تُجْبَرَ عَلَى الْقَبُوْلِ تفريعٌ على كَوْنِهِ اداءً اى تُجْبَرُ الْمَرْأَةُ عَلٰى قَبُوْلِ ذٰلِكَ الْعَبْدِ الْمَهُوْرِ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ وهُوَ مِنْ عَلَامَةِ كَوْنِهِ اداءً وهٰذا بِخِلَافِ مَا اِذَا بَاعَ عَبْدًا وَاسْتُحِقَّ الْعَبْدُ ثُمَّ اشْتَرَاهُ الْبَائِعُ مِنَ الْمُسْتَحِقِّ حَيْثُ لَا يُجْبَرُ عَلٰى تَسْلِيْمِهِ الَى الْمُشْتَرِى لِاَنَّهُ بِالْاِسْتِحْقَاقِ ظَهَرَ اَنَّ الْبَيْعَ كَانَ مَوْقُوْفًا عَلٰى اِجَازَةِ الْمَالِكِ فَاِذَا لَمْ يُجِزْهُ بَطَلَ وَانْفَسَخَ بِخِلَافِ النِّكَاحِ فَاِنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ بِاسْتِحْقَاقِ الْمَهْرِ وَلَا بِانْعِدَامِهِ -

অনুবাদ ॥ *ফলে স্ত্রীকে গ্রহণে বাধ্য করা হবে।* এটা ঐ কথার ওপর শাখা মাসআলা যে, উল্লিখিত অর্পণ আদা হবে। অর্থাৎ, সোপর্দের পর মহররূপে সাব্যস্ত উক্ত ক্রীতদাসটিকে গ্রহণ করার জন্যে স্ত্রীকে বাধ্য করা হবে। এ অর্পণ আদা হওয়ার জন্যে আলামত স্বরূপ। এটা ঐ মাসআলার বিপরীত যে, যদি কোন ব্যক্তি একটি ক্রীতদাসকে বিক্রি করে, কিন্তু ঐ ক্রীতদাসে অন্য কারো মালিকানা সাব্যস্ত হয়; অতঃপর বিক্রেতা তাকে হকদার থেকে ক্রয় করে নেয়। এ ক্ষেত্রে ক্রেতার কাছে ক্রীতদাস সোপর্দ করার ব্যাপারে বাধ্য করা যাবে না। কেননা হকদার হওয়ার কারণে এ কথা প্রকাশ পেয়েছে যে, অন্যের এ ক্রয়-বিক্রয় প্রকৃত মালিকের অনুমতির ওপর নির্ভরশীল ছিল। সুতরাং যদি সে অনুমতি প্রদান না করে, তবে উক্ত ক্রয়-বিক্রয় বাতিল ও রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু বিবাহের ক্ষেত্রে এরূপ নয়। কেননা, মহরে কারো মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া এবং একেবারেই মহর না হওয়া অবস্থায় বিবাহ রহিত হয় না।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله حَتّٰى تُجْبَرَ عَلَى الْقَبُوْلِ الخ : এ ইবারতে এ মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে যে, পূর্বোক্ত গোলামকে অর্পণ করা হলো আদা অর্থাৎ বিবাহিতা স্ত্রীকে গোলাম অর্পণের পরে তাকে উক্ত গোলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে বাধ্য করা হবে যে গোলামকে তার বিবাহে মহর নির্ধারণ করা হয়েছিলো। এটা এ বিষয়ের আলামত যে, উল্লেখিত গোলাম অর্পণ করা হলো আদা। কারণ কোনো ব্যক্তি যখন কারো হক আদায় করে তখন সাহিবে হক কে তা কবুল করার ব্যাপারে বাধ্য করা হয়। তবে কোনো এক ব্যক্তি যদি একটি গোলাম ক্রয় করে। এরপর উক্ত গোলামকে অন্য কেউ তার গোলাম প্রমাণিত করে নিয়ে নেয়। এরপর বিক্রেতা উক্ত হকদার থেকে এ গোলামকে ক্রয় করে। তাহলে বিক্রেতা এ গোলামকে ক্রেতার কাছে অর্পণ করার ব্যাপারে বাধ্য হবে না। কারণ হকদ্বার ব্যক্তির নিজস্ব হক প্রমাণিত করার দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, এ বেচা-কেনাটা মালিক (হকদার) এর অনুমতির উপর মওকুফ ছিলো। হকদারের থেকে বিক্রেতার ক্রয়করাটা এ বিষয়ের আলামত যে, সে পূর্বের বেচা-কেনার অনুমতি দেয়নি। কাজেই মালিক যখন অনুমতি দিলো না তখন বেচা-কেনা বাতিল গণ্য হয়েছে। আর বেচা-কেনা যখন বাতিল হলো তাহলে সে সূত্রে বিক্রেতার জন্য ক্রেতার কাছে অর্পণ করার ব্যাপারে তাকে বাধ্য করার কোনো প্রশ্নই হতে পারে না। কিন্তু বিবাহের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা মহরের উপর অন্য কারোর হক প্রমাণিত করার দ্বারা বিবাহ বাতিল হয় না। এভাবে মহর নিশ্চিন্ন হওয়ার দ্বারা বিবাহ নষ্ট হয় না। সুতরাং বেচা-কেনাকে বিবাহের উপর কিয়াস করা ঠিক হবে না।

وَيَنْفُذُ اِعْتَاقُهُ فِيْهِ دُوْنَ اِعْتَاقِهَا تفريعٌ على كَوْنِهِ شَبِيْهًا بِالْقَضَاءِ يَعْنِى يَنْفُذُ اِعْتَاقَ الزَّوْجِ اِيَّاهُ قَبْلَ تَسْلِيْمِهِ اِلَى الْمَرْاَةِ لِاَنَّ الْمَرْاَةَ لَا تَمْلِكُهُ اِلَّا اِذَا سَلَّمَ اِلَيْهَا قَبْلَ التَّسْلِيْمِ هُوَ مِلْكُ الزَّوْجِ كَمَا اَنَّ قَبْلَ الشِّرَاءِ كَانَ مِلْكًا لِّلْغَيْرِ ولَمَّا كَانَتْ ذَاتُ الْعَبْدِ مَوْجُوْدَةً فِى كِلَا الْحَالَيْنِ وَوَصْفُ الْمَمْلُوْكِيَّةِ مُتَغَيِّرٌ فِيْهِمَا جُعِلَ اَدَاءً شَبِيْهًا بِالْقَضَاءِ ولم يُجْعَلْ قضاءً شبيهًا بالاداءِ رِعَايَةً بِجَانِبِ الذَّاتِ وَالْاَصْلِ -

অনুবাদ ॥ ***আর এরূপ ক্ষেত্রে স্বামীর আযাদ করণ কার্যকরী হবে, কিন্তু স্ত্রীর আযাদকরণ কার্যকরী হবে না।*** এটা আদা কাযার সদৃশ হওয়ার ব্যাপারে শাখা মাসআলা। অর্থাৎ, স্ত্রীর কাছে তাকে (ক্রীতদাস) অর্পণ করার পূর্বে স্বামী কর্তৃক ঐ ক্রীতদাসকে আযাদ করে দেয়া কার্যকরী হবে। কেননা স্ত্রী ঐ ক্রীতদাসের মালিক হবে না। তবে তখন কার্যকরী হবে যখন তাকে স্ত্রীর কাছে অর্পণ করা হবে।

সুতরাং, অর্পণের পূর্বে ক্রীতদাসটি স্বামীর মালিকানায় ছিল। যেমন- ক্রয় করার পূর্বে সে অন্যের মালিকানাধীন ছিল। আর যেহেতু ক্রীতদাসের অস্তিত্ব উভয় অবস্থায় বিদ্যমান ছিল এবং উভয় অবস্থায় মালিকানার গুণাগুণ পরিবর্তিত ছিল; তাই ক্রীতদাসের সত্তা এবং মূলের দিক বিবেচনা করে, এটাকে এমন আদা হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে, যা কাযার সদৃশ্য। এমন কাযা সাব্যস্ত করা হয়নি যা আদা সদৃশ।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله وينفذ اعتاقه فيه الخ : এই ইবারতে এ মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে যে, পূর্বোক্ত গোলামটি অর্পণ করা কাযার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা মহর বাবদ গোলামকে স্ত্রীর কাছে অর্পণ করার আগে স্বামী যদি তাকে আযাদ করে দেয় তাহলে গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। আর স্ত্রী আযাদ করলে আযাদ হবে না। এর কারণ এই যে, স্ত্রী তখনই গোলামের মালিক হবে যখন সে তাকে করায়ত্ত করবে। কাজেই তার করায়ত্ত করার পূর্বে সে স্বামীর গোলাম থেকে যায়। যেমন- ক্রয় করার পূর্বে অন্য ব্যক্তির মালিকানাধীন ছিলো।

সারকথা এই যে, যতোক্ষণ পর্যন্ত গোলামকে স্ত্রীর নিকট অর্পণ করা না হয় ততোক্ষণ পর্যন্ত সে তার মালিক হয় না। আর যে কোনো কিছুর মালিক নয় তাকে আযাদ করার অনুমতিও থাকে না। কারণ রাসূলুল্লাহ (স) এরশাদ করেছেন لا عِتْقَ فِيْمَا لا يَمْلِكُهُ ابْنُ آدَمَ মানুষ যার মালিক নয় সে তাকে আযাদ করতে পারে না।

মোটকথা এই গোলাম ক্রয়ের পূর্বে সে যেহেতু অন্যের অর্থাৎ মালিকের মালিকানাধীন ছিলো এবং ক্রয়ের পরে স্বামীর মালিকানাধীন হলো। আর এটা উল্লেখিত হয়েছে যে, মালিকানা পরিবর্তনে বিধানগতভাবে মূলবস্তু পরিবর্তন হয়ে যায়। তাহলে কেমন যেন স্বামীর উপর যে গোলামকে স্ত্রীর নিকট অর্পণ করা ওয়াজিব ছিলো সে তাকে অর্পণ করেনি বরং তার অনুরূপ অর্পণ করেছে। এটাকেই পরিভাষায় "কাযা" বলা হয়। অতএব স্বামী কর্তৃক এ গোলামকে স্ত্রীর নিকট অর্পণ করা একদিক দিয়ে আদা হওয়ার কারণে যদিও তা বাস্তবে কাযা নয়। তবে কাযার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, উল্লেখিত গোলামকে স্ত্রীর নিকট অর্পণ করা اداء مشابه بالقضاء

প্রশ্ন : এটাকে اداء مشابه بالقضاء নাম রাখা হলো কেন? এবং قضاء مشابه بالاداء নাম রাখা হলো না কেন?

উত্তর : এর উত্তর এই যে, গোলামের সত্তা বিবাহের আকদের সময়ও বিদ্যমান ছিলো এবং স্ত্রীর নিকট অর্পণ করার সময়ও বিদ্যমান রয়েছে। তবে ২ ক্ষেত্রে মালিকানাধীনের গুণ পরিবর্তন হয়ে গেছে। তা এভাবে যে, বিবাহের আকদের সময় গোলামটি মালিকের মালিকানাধীন ছিলো। আর অর্পণ করার সময় স্বামীর মালিকানাধীন হয়েছে। সুতরাং গোলামের সত্তার দিক দিয়ে এই অর্পণ করাটা আদা বিবেচিত। আর মালিকানাধীন হওয়ার গুণের দিক দিয়ে এটা কাযা।

নাম রাখার ক্ষেত্রে যেহেতু মূলের প্রতি লক্ষ রাখা হয়; গুণের প্রতি নয়। এ কারণে এ অর্পণ করাকে اداء مشابه بالقضاء নাম রাখা হয়েছে এবং قضاء مشابه بالاداء নাম রাখা হয়নি।

وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ أَنْوَاعِ الْأَدَاءِ شَرَعَ فِيْ تَقْسِيْمِ الْقَضَاءِ فَقَالَ وَالْقَضَاءُ أَنْوَاعٌ أَيْضًا بِمِثْلٍ مَعْقُولٍ وَبِمِثْلٍ غَيْرِ مَعْقُولٍ وَمَا هُوَ فِيْ مَعْنَى الْأَدَاءِ وَفِيْ هٰذَا التَّقْسِيْمِ أَيْضًا مُسَامَحَةٌ فَكَأَنَّهُ قِيْلَ وَالْقَضَاءُ أَنْوَاعٌ قَضَاءٌ مَحْضٌ وَهُوَ إِمَّا بِمِثْلٍ مَعْقُولٍ أَوْ بِمِثْلٍ غَيْرِ مَعْقُولٍ وَقَضَاءٌ فِيْ مَعْنَى الْأَدَاءِ وَيُعْنٰى بِالْقَضَاءِ الْمَحْضِ مَا لَا يَكُوْنُ فِيْهِ مَعْنَى الْأَدَاءِ أَصْلًا لَا حَقِيْقَةً وَلَا حُكْمًا وَبِمَا هُوَ فِيْ مَعْنَى الْأَدَاءِ أَنْ يَكُوْنَ بِخِلَافِهِ -

অনুবাদ ॥ সম্মানিত গ্রন্থকার (র) اداء এর প্রকারভেদের আলোচনা থেকে অবসর হয়ে قضاء এর প্রকারভেদের আলোচনা শুরু করেছেন। তিনি বলেন, ***কাযারও অনেক প্রকার রয়েছে। (যেমন)*** مثل معقول ***(সঙ্গত সাদৃশ্য) দ্বারা কাযা ও*** مثل غير معقول ***(অসঙ্গত সাদৃশ্য) দ্বারা কাযা এবং এমন কাযা যা আদার অর্থে ব্যবহৃত।*** এ বিভক্তির মধ্যেও ত্রুটি রয়েছে। কেমন যেন এটা বলা হয়েছে যে, কাযার অনেক প্রকার আছে। (যেমন) قضاء محض বা নিছক কাযা, তা হয়তো مثل معقول দ্বারা কাযা হবে, অথবা, مثل غير معقول দ্বারা কাযা হবে এবং ঐ কাযা যা আদার অর্থে হবে। قضاء محض দ্বারা ঐ কাযাকে বুঝানো হয়, যার মধ্যে আদার অর্থ মোটেই পাওয়া যায় না। হাকীকত হিসেবেও নয় এবং মাজায হিসেবেও নয়। আর যা তার বিপরীত তা হবে আদার অর্থে কাযা।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله ولَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ أَنْوَاعِ الْأَدَاءِ الخ : মুসান্নিফ (র) আদার সকল প্রকার বর্ণনা শেষ করে এখান থেকে কাযার বিভক্তি বর্ণনা করছেন।

قضاء এর প্রকারভেদ : কাযা ৩ প্রকার। ১. قضا بمثل معقول ২. قضاء بمثل غير معقول ৩. قضاء في معنى الاداء

নূরুল আনওয়ার গ্রন্থকার (র) বলেন– اداء এর বিভক্তির ন্যায় এই বিভক্তির মধ্যেও ত্রুটি ঘটেছে। কারণ এক বিভক্তির সকল প্রকারের মধ্যে পারস্পরিক প্রভেদ থাকা শর্ত। অথচ এখানে তা নেই। কারণ اداء এর অর্থে যে قضاء আসে তা ২ অবস্থা থেকে খালি নয়। হয়তো তা বোধগম্য করা জ্ঞান দ্বারা সম্ভব, অথবা সম্ভব নয়। প্রথম ক্ষেত্রে সেটি قضاء এর প্রথম প্রকার। অর্থাৎ قضاء بمثل معقول এর অন্তর্ভুক্ত। আর দ্বিতীয়টি দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ قضاء بمثل غير معقول এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আদার অর্থে যে কাযা আসে তা কাযার কোনো এক প্রকারের মধ্যে শামিল রয়েছে। অতএব এ দুটোর পরস্পরের মধ্যে কোনো বৈপরিত্ব নেই। সুতরাং মুসান্নিফ (র)এর জন্য এমন বলাই সমীচীন ছিলো যে, কাযা ২ প্রকার। ১. قضائ محض ২. قضاء في معنى الاداء অতপর قضائ محض ২ প্রকার। ১. مثل معقول ২. مثل غيرمعقول এক্ষেত্রে ২ টি বিভক্তি হতো এবং প্রত্যেক বিভক্তির প্রকারসমূহের মধ্যে পারস্পরিক ভিন্নতা পাওয়া যেতো।

قضائ محض দ্বারা উদ্দেশ্য : যার মধ্যে আদার অর্থ মোটেই থাকে না। বাস্তব অর্থেও নয় এবং বিধানগত অর্থেও নয়।

قضاء في معنى الاداء দ্বারা উদ্দেশ্য : যার মধ্যে আদার অর্থ বিদ্যমান থাকে।

وَالْمُرَادُ بِالْمِثْلِ الْمَعْقُوْلِ اَنْ تُدْرَكَ مُمَاثَلَتُهٗ بِالْعَقْلِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنِ الشَّرْعِ وَبِغَيْرِ الْمَعْقُوْلِ اَنْ لَّا تُدْرَكَ الْمُمَاثَلَةُ اِلَّا شَرْعًا وَيَكُوْنُ الْعَقْلُ قَاصِرًا عَنْ دَرْكِ كَيْفِيَّتِهٖ لَا اَنَّ الْعَقْلَ يُنَاقِضُهٗ وَهٰذَا الْقَضَاءُ لَابُدَّ فِيْهِ مِنْ سَبَبٍ جَدِيْدٍ بِالْاِتِّفَاقِ وَاِنَّمَا الْخِلَافُ فِى الْقَضَاءِ بِمِثْلٍ مَعْقُوْلٍ كَالصَّوْمِ لِلصَّوْمِ هٰذَا نَظِيْرٌ لِلْقَضَاءِ بِمِثْلٍ مَعْقُوْلٍ اَىْ كَقَضَاءِ الصَّوْمِ لِلصَّوْمِ فَاِنَّهٗ اَمْرٌ مَعْقُوْلٌ لِاَنَّ الْوَاجِبَ لَا يَسْقُطُ عَنِ الذِّمَّةِ اِلَّا بِالْاَدَاءِ اَوْ بِاِسْقَاطِ صَاحِبِ الْحَقِّ وَمَا لَمْ يُوْجَدْ اَحَدُهُمَا يَبْقٰى فِىْ ذِمَّتِهٖ ـ

অনুবাদ ॥ مثل معقول **তথা সঙ্গত** সাদৃশ্য দ্বারা এটা বুঝানো হয়, যার সাদৃশ্যতা শরীআতের **বিবেচনা** ছাড়াও বিবেক-বুদ্ধি **দ্বারা অনুমিত হয়।** আর غير معقول তথা অসঙ্গত **সাদৃশ্য দ্বারা** এটা বুঝানো **হয় যার** সাদৃশ্যতা **শরীআতের দিক বিবেচনা** ব্যতীত অনুমিত হয় না। বিবেক-বুদ্ধি তার **অবস্থা অবহিত** হওয়া থেকে অপারগ; তবে এর অর্থ এমন নয় যে, বিবেক-বুদ্ধি তার বিরোধী।

আর এ কাযার মধ্যে সর্বসম্মতভাবে নতুন সবাব পাওয়া যাওয়া জরুরী। মতপার্থক্য কেবল قضاء بمثل معقول এর ক্ষেত্রে। *যেমন রোযার কাযা রোযা।* এটা قضاء بمثل معقول এর উদাহরণ। অর্থাৎ, যেমন রোযা দ্বারা রোযার কাযা করা। এটা যুক্তিসঙ্গত কাজ। কেননা আদায় করা অথবা হকদার কর্তৃক রহিতকরণ ছাড়া ওয়াজিব থেকে দায়িত্ব মুক্ত হয় না। এ দু'টোর কোন একটি পাওয়া না গেলে তা তাঁর দায়িত্বে থেকে যায়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قضاء بمثل معقول **দ্বারা উদ্দেশ্য :** শরীআত ছাড়া শুধু জ্ঞান দ্বারা তা অনুরূপ হওয়া বোঝা যায়।

قضاء بمثل غير معقول **দ্বারা উদ্দেশ্য :** শরীআত ছাড়া জ্ঞান দ্বারা তার অনুরূপ হওয়া বোঝা যায় না এবং বিবেকে তার ধরন অনুধাবন করতে অপারগ। এমন নয় যে, বিবেকে তার مماثلت অস্বীকার করে। এবং এ সিদ্ধান্ত করে যে, قضائ واجب এর কোনো مماثل নেই। কারণ বিবেকও শরীআতের একটি দলিল। আর শরীআতের দলিলসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বৈপরিত্ব থাকে না।

মোল্লা জুয়ুন (র) বলেন– قضاء بمثل غير معقول এর জন্য সকলের মতে আদার সবাব ছাড়া নতুন একটি সবাব থাকা জরুরি। অধিকাংশ হানাফী আলিম এবং অধিকাংশ শাফেয়ীগণের মধ্যে قضاء بمثل معقول এর সবাবের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। পূর্বে এর আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে।

قوله كالصوم للصوم الخ : قضاء بمثل معقول **এর উদাহরণ :** এর উদাহরণ হলো কাযা রোযা। রোযার কাযা স্বরূপ রোযাকে স্থির করা একটি যুক্তিযুক্ত **বিষয়। কারণ** যে জিনিস জিম্মায় ওয়াজিব হয় তা আদায় **করার দ্বারা** তা জিম্মা থেকে সরে যায়। কিংবা হকদারের হক ছেড়ে দেয়ার দ্বারা তা থেকে **জিম্মামুক্ত** হয়। এ দুই পন্থা ছাড়া তা থেকে জিম্মামুক্ত হওয়ার অন্য কোনো উপায় নেই। অতএব আদা রোযার এবং কাযা রোযার মধ্যে যেহেতু বাহ্যিকভাবেও مماثلت এবং অর্থগতভাবে সামঞ্জস্যতা রয়েছে। এ কারণে সহজভাবে বিবেক এটাকে অনুধাবন করতে পারে। আর যে সামঞ্জস্যতা বিবেকে বুঝতে সক্ষম নয় তাকে مثل معقول বলা হয়। অতএব রোযার কাযা স্বরূপ রোযাকে সাব্যস্ত করা مثل معقول গণ্য হবে।

وَ الْفِدْيَةِ لَهُ هٰذا نَظِيْرٌ لِلْقَضَاءِ بِمِثْلٍ غَيْرِ مَعْقولٍ فَاِنَّ الْفِدْيَةَ بِمُقَابَلَةِ الصَّوْمِ لَا يُدْرِكُهُ عَقْلٌ اِذْ لَا مُمَاثَلَةَ بَيْنَهُمَا صورةً وهو ظَاهِرٌ وَلَا معنًى لِاَنَّ الصَّوْمَ تَجْوِيْعُ النَّفْسِ وَالْفِدْيَةُ اِشْبَاعٌ و هٰذه الْفِدْيَةُ لِكُلِّ يَوْمٍ هُو نِصْفُ صَاعٍ مِّنْ بُرٍّ اَوْ دَقِيْقَةٍ اَوْ سَوِيْقَةٍ او زَبِيْبٍ اَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ اَوْ شَعِيْرٍ لِلشَّيْخِ الْفَانِىْ الَّذِىْ يَعْجِزُ عَنِ الصَّوْمِ لِاَجْلِ قولِهِ تعالٰى وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ عَلٰى اَن تكونَ كَلِمَةَ لَا مُقَدَّرَةً اى لَا يُطِيْقُوْنَهُ اَوْ تكونَ الهَمْزَةُ فِيْهِ لِلسَّلْبِ اى يُسْلَبُوْنَ الطَّاقَةَ لِيَدُلَّ عَلَى الشَّيْخِ الْفَانِىْ و اَمَّا اذا حُمِلَتْ عَلٰى ظَاهِرِهَا فَهِىَ مَنْسُوْخَةٌ عَلٰى مَاقِيْلَ اِنَّ فِىْ بَدْءِ الْاَسْلَامِ كَانَ الْمُطِيْقُ مُخَيَّرًا بَيْنَ اَنْ يَصُوْمَ وَبَيْنَ اَنْ يَفْدِىَ ثُمَّ نُسِخَ بِدَرَجَاتٍ عَلٰى مَا حَرَّرْتُهُ فِى التَّفْسِيْرِ الْاَحْمَدِىِّ -

অনুবাদ ॥ ***আর ফিদিয়া দ্বারা রোযার কাযা করা,*** قضاء بمثل غير معقول ***তথা অসঙ্গত সাদৃশ্যমূলক কাযার উদাহরণ।*** কেননা রোযার পরিবর্তে ফিদিয়া প্রদান করা এমন একটি কাজ, যা বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। কেননা উভয়ের মধ্যে বাহ্যিকভাবে কোন সাদৃশ্যতা নেই। এটা স্পষ্ট এবং অপ্রকাশ্য নয়। কারণ রোযার অর্থ হলো নিজেকে ক্ষুধার্ত রাখা, অথচ ফিদিয়ার অর্থ হলো পেট ভর্তি করে ভক্ষণ করানো। আর এ ফিদিয়া প্রত্যেক দিনের রোযার পরিবর্তে অর্ধ সা' গম, অথবা আটা, অথবা ছাতু, অথবা কিসমিস, অথবা এক সা' খেজুর, অথবা যব প্রদান করা হয় অতি বৃদ্ধের জন্য যে রোযা রাখতে অক্ষম। তা হলো- আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর কারণে- 'যারা রোযা রাখতে অক্ষম তাদের কর্তব্য হলো মিসকীনকে খাদ্য প্রদানের মাধ্যমে ফিদিয়া দেয়া। এ আয়াতে لا শব্দ উহ্য ধরে নিতে হবে। অর্থাৎ যাদের ক্ষমতা নেই। অথবা এ উক্তির মধ্যে হামযাটি سلب তথা উৎস বিলুপ্তি অর্থে হবে। অর্থাৎ 'যারা ক্ষমতা হারিয়েছে' যাতে এ উক্তিটি شيخ فانى এর ওপরে প্রযোজ্য হয়। আর যদি আয়াতটিকে তার বাহ্যিক অর্থের ওপরে প্রয়োগ করা হয়, তবে এ আয়াতটি মানসূখ গণ্য হবে। যেমন- বর্ণিত আছে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে সক্ষম ব্যক্তিকে রোযা রাখা এবং ফিদিয়া দেয়ার মাঝে এখতিয়ার ছিল। অতঃপর ক্রমান্বয়ে তা মানসূখ হয়েছে। এ ব্যাপারে আমি তাফসীর আহমদীতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله وَالْفِدْيَةُ لَهُ هٰذَا الخ : এটা قضاء بمثل غير معقول এর উদাহরণ। মুসান্নিফ (র) বলেন- রোযা না রেখে এক রোযার পরিবর্তে এক ফিদিয়া দেয়া এটা قضاء بمثل غير معقول এর উদাহরণ। রোযার পরিবর্তে ফিদিয়া এটা অযৌক্তিক মিসল। কেননা রোযার মোকাবেলায় ফিদিয়া এমন বস্তু যা বিবেকে বোধগম্য করতে পারে না। কারণ রোযা এবং ফিদিয়ার মধ্যে বাহ্যিক দিক দিয়ে এবং অর্থগত দিক দিয়ে কোনো সামঞ্জস্যতা নেই।

বাহ্যিক সামঞ্জস্যতা না থাকা সুস্পষ্ট। আর অর্থগত সামঞ্জস্যতা নেই এ কারণে যে, রোযার অর্থ হলো নফসকে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত রাখা এবং কামরিপু অবদমন করা। আর ফিদিয়ার অর্থ হলো উদর পূর্তি করা। সুতরাং উভয়ের

মধ্যে বৈপরিত্ব রয়েছে। কারণ উভয়ের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্যতা নেই। নূরুল আনওয়ার গ্রন্থকার বলেন– শায়খে ফানী এবং বৃদ্ধ যে রোযা রাখতে সক্ষম নয় সে-রোযার পরিবর্তে ফিদিয়া দিবে।

ফিদিয়ার পরিমাণ : প্রতিদিন একজন মিসকীনকে অর্ধ সা' গম বা আটা বা ছাতু অথবা শুকনো আঙ্গুর বা কিসমিস দিবে। অথবা এক সা' খেজুর অথবা যব দান করবে। এর দলিল আল্লাহ তা'আলার বাণী وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ

দলিল গ্রহণের প্রক্রিয়া : ১. আয়াতে لا উহ্য রয়েছে। মূল ইবারত এমন হবে لَا يُطِيْقُوْنَهُ যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا এর মধ্যে لا উহ্য রয়েছে। মূল ইবারত لِاَنْ لَا تَضِلُّوْا এভাবে আল্লাহ তা'আলার বাণী وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ এর মধ্যে لا উহ্য রয়েছে। মূল বাক্য এমন لِاَنْ لَا تَمِيْدَ بِكُمْ অর্থ হবে যারা রোযা রাখতে সক্ষম নয় তারা মিসকীনকে ফিদিয়া দিবে।

২. দ্বিতীয় সম্ভাবনা এই যে, আয়াতে يطيقونه শব্দটি اطاقة মাসদার থেকে গঠিত। আর বাবে ইফআলের হামযাটি سلب তথা উৎস দূর করার অর্থ প্রদান করে। অর্থাৎ যে সকল লোকের ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। তারা রোযার ফিদিয়া দান করবে। এ ২ ক্ষেত্রে আয়াতের উদ্দেশ্য হলো শায়খে ফানী তথা অতিশয় বৃদ্ধ।

৩. আর আয়াত যদি বাহ্যিক অর্থের উপর প্রযোজ্য হয় অর্থাৎ لا উহ্য না থাকে এবং হামযাটি سلب ماخذ এর জন্য না হয়। তখন এ আয়াত মানসূখ বিবেচিত হবে। তখন বলা হবে যে, এটা ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় ছিলো। এমনকি শক্তি থাকা সত্ত্বেও রোযা না রেখে ফিদিয়া দেয়া অধিকার ছিলো। কিন্তু পরবর্তীকালে فمن شهد منكم الشهر فليصمه আয়াত দ্বারা এখতিয়ারের হুকুম মানসূখ হয়ে গেছে। তখন শায়খে ফানীর ব্যাপারে ফিদিয়া ওয়াজিব হওয়া সাহাবায়ে কেরামের ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত হবে।

নূরুল আনওয়ার গ্রন্থকার বলেন– রোযা একবারেই ফরয করা হয়নি বরং ধাপে ধাপে তা ফরয হয়েছে। ফলে বার বার পূর্বের বিধান মানসূখ হয়েছে।

তাফসীরে আহমদীতে এর বিশ্লেষণ উল্লিখিত রয়েছে এই যে, সর্বপ্রথম বছরে একদিন অর্থাৎ আশুরার রোযা ফরয ছিলো। এরপর প্রত্যেক মাসে আইয়ামে বীয তথা ১৩, ১৪, ১৫ তারিখের রোযা ফরয হয়েছিলো। এর দ্বারা পূর্বের রোযা মানসূখ হয়ে গিয়েছিলো। অতপর রমযানের রোযা ফরয হওয়ার দ্বারা আইয়ামে বীযের ৩ রোযাও মানসূখ হয়ে রমযানের রোযা ইখতিয়ারসহ ফরয হয়েছিলো। অর্থাৎ রোযা না রেখে ফিদিয়া দেওয়ারও অধিকার ছিলো। যেমন وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ আয়াতের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা বোঝা যায়। অতঃপর ফিদিয়া না দিয়ে রোযা রাখাই উত্তম এ বিষয়ে নাযিল হলো وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ তারপর فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ এর দ্বারা এখতিয়ারও মানসূখ হয়ে গেলো। তখন দিন ও রাতে রোযা ফরয হয়েছিলো। অর্থাৎ সূর্যাস্তের পর থেকে ইশার নামায পর্যন্ত পানাহার নিষিদ্ধ ছিলো। তারপরে পরবর্তী দিনের সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও সহবাস হারাম ছিলো। عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْاٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ আয়াত দ্বারা রাতের রোযা মানসূখ হয়ে যায় এবং সর্বশেষ সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযা ফরয করা হয়। কেয়ামত অবধি এটাই বহাল থাকবে।

وَقَضَاءُ تَكْبِيْرَاتِ الْعِيْدِ فِى الرُّكُوْعِ هٰذَا نَظِيْرٌ لِلْقَضَاءِ الَّذِىْ هُوَ شَبِيْهٌ بِالْاَدَاءِ يَعْنِىْ اَنَّ مَنْ اَدْرَكَ الْاِمَامَ فِىْ صَلٰوةِ الْعِيْدِ فِى الرُّكُوْعِ وَ فَاتَتْ عَنْهُ التَّكْبِيْرَاتُ الْوَاجِبَةُ فَاِنَّه يُكَبِّرُ فِى الرُّكُوْعِ عِنْدَنَا مِنْ غَيْرِ رَفْعِ يَدٍ لِاَنَّ الرُّكُوْعَ فَرْضٌ وَالتَّكْبِيْرَاتُ وَاجِبَةٌ فَيُرَاعٰى حُكْمُهُمَا عَلٰى حَسَبِ مَا يُمْكِنُ وَاَمَّا رَفْعُ الْيَدِ فِى التَّكْبِيْرَاتِ وَ وَضْعُهَا عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِى الرُّكُوْعِ فَكِلَاهُمَا سُنَّةٌ لَا يُتْرَكُ اَحَدُهُمَا بِالْاٰخَرِ وَهٰذَا قَضَاءٌ مِنْ حَيْثُ الذَّاتِ لِاَنَّ مَحَلَّهَا الْقِيَامُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ وَقَدْ فَاتَ لٰكِنَّهٗ شَبِيْهٌ بِالْاَدَاءِ لِاَنَّ الرُّكُوْعَ يَشْبَهُ الْقِيَامَ لِقِيَامِ النِّصْفِ الْاَسْفَلِ عَلٰى حَالِهٖ وَلِاَنَّ مَنْ اَدْرَكَ الْاِمَامَ فِى الرُّكُوْعِ فَقَدْ اَدْرَكَ الرَّكْعَةَ مَعَ جَمِيْعِ اَجْزَائِهَا مِنَ الْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ تَقْدِيْرًا -

---

অনুবাদ ॥ ***এবং রুকূর মধ্যে ঈদের (অতিরিক্ত) তাকবীরসমূহ কাযা করা।*** قضاء شبيه بالاداء এর উদাহরণ। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈদের নামাযে ইমামকে রুকূর মধ্যে পায় এবং তার ওয়াজিব তাকবীরসমূহ ছুটে যায়। আমাদের মতে, সে রুকূর মধ্যে হাত উত্তোলন ব্যতীত তাকবীর বলবে। কেননা রুকূ করা ফরয এবং তাকবীর হলো ওয়াজিব।

সুতরাং যথাসম্ভব উভয়ের অবস্থা বিবেচনা করতে হবে। আর তাকবীরের মধ্যে হাত উঠানো এবং রুকূর মধ্যে হাতকে হাঁটুর ওপরে রাখা উভয়টি সুন্নত। কোন একটিকে অপরটির কারণে বর্জন করা যায় না। এটা মৌলিক বিচারে কাযা। কেননা তাকবীরের স্থান হলো রুকূর পূর্বে দণ্ডায়মান হওয়া; আর তা ফউত হয়ে গেছে। কিন্তু তা আদা সদৃশ। কারণ রুকূ নিম্নাঙ্গ স্বীয় অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকার কারণে কিয়াম সদৃশ। এ কারণেও যে, যে ব্যক্তি ইমামকে রুকূর মধ্যে পায়, সে পরোক্ষভাবে রাকাআতকে তার সমস্ত অংশ যথা– কিরাত এবং কিয়ামসহ পায়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله وَقَضَاءُ تَكْبِيْرَاتِ الْعِيْدِ الخ : قضاء مشابه بالاداء **এর উদাহরণ** : এক ব্যক্তি ঈদের নামাযে রুকূর সময় ইমামের সাথে শরীক হলো। তার ওয়াজিব তাকবীর ফউত হয়ে গেলো। হানাফীদের মতে এলোকটি হাত না উঠিয়ে রুকূ অবস্থায় পূর্বের ছুটে যাওয়া তাকবীরসমূহ বলবে। তবে এর জন্য শর্ত এই যে, তার এমন আশংকা থাকতে হবে যে, যদি সে দাঁড়ানো অবস্থায় তাকবীর বলে তাহলে ইমাম রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে নিবে। যদি এমন আশংকা না থাকে তাহলে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলবে। অতঃপর রুকূতে শরীক হবে। কারণ রুকূ হলো ফরয, আর ঈদের তাকবীর হলো ওয়াজিব। অতএব যথাসম্ভব উভয়ের লক্ষ্য রাখতে হবে। আর রুকূর তাসবীহ যেহেতু মুস্তাহাব। এ কারণে ওয়াজিব তাকবীরের কারণে তাসবীহ বর্জন করবে। এভাবে ঈদের তাকবীরে কান পর্যন্ত হাত উঠনো যেহেতু সুন্নত। আর রুকূ অবস্থায় তার জন্য হাঁটুতে হাত রাখা সুন্নত। এ কারণে একটিকে অপরটির কারণে ত্যাগ করা যায় না।

قوله وهٰذا قَضَاءٌ مِنْ حَيْثُ الذَّاتِ : রুকূ অবস্থায় ঈদের তাকবীর বলা প্রকৃতপক্ষে কাযা। কারণ তাকবীর স্বস্থানে অর্থাৎ দাঁড়ানো অবস্থায় বলা হয়নি। অতএব কেমন যেন ঈদের তাকবীর তার নির্দিষ্ট সময়ের পরে আদায় করা হয়েছে। আর এটাকেই কাযা বলে। তবে এটা আদায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা রুকূ হলো কেয়ামের সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ রুকূ অবস্থায় শরীরের নিচের অর্ধাঙ্গ স্বঅবস্থায় বহাল থাকে। অতএব নিচের অর্ধাঙ্গ কিয়াম অবস্থায় থাকার কারণে রুকূর মধ্যে এক পর্যায়ের কিয়াম পাওয়া গেলো। এ কারণেই তা কিয়ামের মুশাবাহ হলো।

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

فَالْاَحْتِيَاطُ اَنْ يُّؤتَى بِهَا فِيْهِ وعِنْدَ اَبِى يُوْسُفَ رح لَا تُقْضَى هٰذِهِ التَّكْبِيْرَاتُ فِى الرُّكُوْعِ لِاَنَّهٗ قَدْ فَاتَ مَحَلُّهَا كَمَا لَا تُقْضَى الْقِرَاءَةُ وَالْقُنُوْتُ فِيْهِ وَ وُجُوْبُ الْفِدْيَةِ فِى الصَّلٰوةِ لِلْاحْتِيَاطِ جوابُ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ تقريره اَنَّ الفِدْيَةَ فِى الصَّوْمِ لِلشَّيْخِ الفَانِىْ لَمَّا كَانَتْ ثَابِتَةً بِنَصٍّ غَيْرِ مَعقولٍ يَنْبَغِىْ اَنْ تَقْتَصِرُوْا عليه ولَمْ تَقِيْسُوْا عَلَيْهِ مَنْ مَاتَ وعَلَيْهِ صَلٰوةٌ مَعَ اَنَّكُمْ قُلْتُمْ اِنَّه اِذا مَاتَ وَعَلَيْهِ صلٰوةٌ وَاَوْصٰى بِالْفِدْيَةِ يَجِبُ عَلَى الْوَارِثِ اَنْ يَفْدِىَ بِعِوَضِ كُلِّ صلٰوةٍ مَا يُفْدٰى لِكُلِّ صَوْمٍ عَلَى الْاَصَحِّ -فَاَجَابَ بِاَنَّ وُجُوبَ الْفِدْيَةِ فِى قَضَاءِ الصَّلٰوةِ لِلْاحْتِيَاطِ لَا لِلْقِيَاسِ وذٰلك لِاَنَّ نَصَّ الصَّوْمِ يَحْتَمِلُ اَنْ يَكُوْنَ مَخْصُوْصًا بِالصَّوْمِ وَيَحْتَمِلُ اَنْ يَكُوْنَ مَعْلُوْلًا لِعِلَّةٍ عَامَّةٍ تُوْجَدُ فِى الصَّلٰوةِ اَعْنِى الْعِجْزَ وَالصَّلٰوةُ نَظِيْرُ الصَّوْمِ بَلْ اَهَمُّ مِنْهُ فِى الشَّانِ وَالرِّفْعَةِ فَاَمَرْنَا بِالْفِدْيَةِ عَنْ جَانِبِ الصَّلٰوةِ فَاِنْ كَفَتْ عَنْهَا عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى فَبِهَا وَاِلَّا فَلَهٗ ثَوَابُ الصَّدَقَةِ ولِهٰذا قال محمدٌ رح فِى الزِّيَادَاتِ تُجْزِيْهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَالْمَسَائِلُ الْقِيَاسِيَّةُ لَا تُعَلَّقُ بِالْمَشِيْئَةِ قَطُّ كَمَا اِذَا تَطَوَّعَ بِهِ الْوَارِثُ فِى قَضَاءِ الصَّوْمِ مِنْ غَيْرِ اِيْصَاءٍ نَرْجُو الْقَبُوْلَ مِنْهُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَكَذَا هٰذا كَالتَّصَدُّقِ بِالْقِيْمَةِ عِنْدَ فَوَاتِ اَيَّامِ التَّضْحِيَةِ اى كَوُجُوْبِ التَّصَدُّقِ بِقِيْمَةِ الشَّاةِ اِنْ نَذَرَهَا الْفَقِيْرُ اَوِ اشْتَرَاهَا وَاسْتَهْلَكَهَا اَوْ بِعَيْنِ الشَّاةِ اِنْ بَقِيَتْ حَيَّةً عِنْدَ فَوَاتِ اَيَّامِ التَّضْحِيَةِ اَيْضًا لِلْاحْتِيَاطِ كَالْفِدْيَةِ لِلصَّلٰوةِ -

অনুবাদ ॥ সুতরাং সতর্কতা এই যে, ছুটে যাওয়া তাকবীরগুলো রুকুর মধ্যেই কাযা করে নিবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, রুকূর মধ্যে কাযা করা হবে না। কেননা এগুলোর ক্ষেত্র ছুটে গেছে। যেমনিভাবে কিরাত এবং দোয়ায়ে কুনূত রুকুর মধ্যে কাযা করা যায় না।

আর নামাযের ক্ষেত্রে ফিদিয়া ওয়াজিব হওয়া সতর্কতার উদ্দেশ্যে। এটা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। এর বিস্তারিত বিবরণ এই যে, যখন غير معقول নসের দ্বারা অতি বৃদ্ধের জন্যে রোযার ক্ষেত্রে ফিদিয়া প্রদান

(পূর্বের বাকী অংশ) দ্বিতীয় কারণ এই যে. যে ব্যক্তি রুকুর মধ্যে ইমামের সাথে শরীক হয় বিধানগতভাবে সে পূর্ণ রাকআত কিয়াম, কেরআত ইত্যাদিসহ পেয়েছে গণ্য হয়। এটা এ কথার পরিচায়ক যে, রুকুর জন্য কিয়ামের হুকুম সাব্যস্ত রয়েছে। অতএব রুকু অবস্থায় ঈদের তাকবীরসমূহ বলা একদিক দিয়ে কিয়াম অবস্থায় বলারই নামান্তর। সুতরাং প্রকৃত কিয়াম অবস্থায় তাকবীরসমূহ বলা যেহেতু সর্ব দিক দিয়েই আদা। অতএব এক পর্যায়ে কিয়াম অবস্থায় তাকবীর বলা আদা হবে না বরং আদার সামঞ্জস্যপূর্ণ গণ্য হবে।

করা সাব্যস্ত হয়েছে, তখন এটাই সমীচীন যে, উহা তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাক। এর ওপর ঐ ব্যক্তিকে কিয়াস করা যাবে না; যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছে, অথচ তার যিম্মায় কাযা নামায ছিল। তা সত্ত্বেও তোমরা হানাফীগণ বলো যে, সে যদি মৃত্যুবরণ করে, আর তার যিম্মায় ফরয নামায থেকে যায়, আর সে ব্যক্তি ফিদিয়ার ব্যাপারে অসিয়ত করে যায়, তবে বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে উত্তরাধিকারীদের ওপরে ওয়াজিব হবে, প্রত্যেক নামাযের পরিবর্তে এ পরিমাণ ফিদিয়া দেয়া, যা রোযার পরিবর্তে দেয়া হয়।

মুসান্নিফ (র) এর উত্তর দিচ্ছেন যে, নামাযের কাযার ক্ষেত্রে ফিদিয়া ওয়াজিব হওয়ার হুকুম সতর্কতামূলক ভাবেই প্রদত্ত হয়েছে, রোযার ওপরে কিয়াস করে নয়। আর এটা এ কারণে যে, রোযা সম্পর্কিত নস রোযার সাথে নির্দিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এবং তা কোন সাধারণ ইল্লতের সাথে معلول হওয়ারও সম্ভাবনা রাখে যা নামাযে পাওয়া যেতে পারে; অর্থাৎ অক্ষমতা। আর ইবাদত হিসেবে নামায রোযার সমকক্ষ। বরং মর্যাদার দিক থেকে তা রোযা থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে আমরা নামাযের পরিবর্তে ফিদিয়া প্রদানের আদেশ করেছি। তা যদি মহান আল্লাহর সমীপে নামাযের জন্যে যথেষ্ট হয়, তবে তো ভালই। অন্যথায় সে সাদকার প্রতিদান তো পাবেই।

এ কারণে ইমাম মুহাম্মদ (র) 'যিয়াদাত' গ্রন্থে বলেছেন যে, যদি আল্লাহ তা'আলা চান তবে তা যথেষ্ট হবে। অথচ কিয়াসী মাসাআলাগুলো কখনো আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সংযুক্ত হয় না। যেমন উত্তরাধিকারীগণ যদি রোযার কাযার ক্ষেত্রে বিনা অসিয়তে নফল হিসেবে ফিদিয়া আদায় করে, তবে ইনশাআল্লাহ- আমরা কবুল হওয়ার আশা রাখতে পারি।

তদ্রূপ এ মাসআলায়ও আমরা ফিদিয়া কবুল হওয়ার আশা পোষণ করি। যেমন- কুরবানীর দিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার কারণে মূল্য দ্বারা সাদকা করা। অর্থাৎ যেমন বকরীর মূল্য সাদকা করা ওয়াজিব হয় কোন দরিদ্র ব্যক্তি তা কুরবানী করার মান্নত করলে, অথবা তা কুরবাণীর নিয়তে ক্রয় করলে অথবা নিজেই তা নষ্ট করে ফেললে, অথবা হুবহু উক্ত বকরী সাদকা করা যদি কুরবানীর দিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার সময়ে বকরীটি জীবিত থাকে, এটাও নামাযে ফিদিয়া দানের মতো সতর্কমূলক ব্যবস্থামাত্র।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ এ কারণেই সাবধানতাবশত ছুটে যাওয়া তাকবীরসমূহ রুকুর মধ্যে কাযা করতে হবে। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন– রুকুর মধ্যে ঈদের তাকবীর কাযা করা যাবে না। কারণ তার স্থান অর্থাৎ কিয়াম বাকী নেই। যেভাবে কেরাআতও দোয়ায়ে কুনূত ছুটে গেলে তা রুকুর মধ্যে কাযা করা হয় না। তদ্রূপ ঈদের তাকবীরও রুকুর মধ্যে কাযা করা যাবে না।

قوله وَوُجُوْبُ الْـفِـدْيَـةِ فِى الصَّلٰوةِ الخ : মুসান্নিফ (র) এই ইবারত দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

প্রশ্ন : শায়খে ফানীর জন্য রোযার পরিবর্তে ফিদিয়া দেয়া যুক্তি ও কিয়াস বিরোধী। এটা وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। যেমন পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। আর যে জিনিস খেলাফে কিয়াস নস দ্বারা প্রমাণিত হয় তার উপর অন্য কিছুকে কিয়াস করা যায় না। অতএব রোযার ফিদিয়ার উপর কিয়াস করে নামাযের ফিদিয়া ওয়াজিব করা বৈধ হবে না। অথচ হানাফীগণ বলে থাকেন– যদি কোনো ব্যক্তি মারা যায়। আর তার জিম্মায় ফরয নামায থেকে যায়। তাহলে লোকটি অছিয়ত করে গেলে তার ওয়ারিশদের উপর মাইয়েতের পক্ষ থেকে প্রত্যেক নামাযের পরিবর্তে এক ফিদিয়া দেয়া ওয়াজিব। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। কারো কারো মতে এক দিন এক রাতের সকল নামাযের এক ফিদিয়া দিবে।

সারকথা এই যে. বিশুদ্ধ উক্তি মতে এক ওয়াক্ত নামায এক রোযার সমপরিমাণ। কারো মতে এক দিন ও রাতের পাঁচ ওয়াক্ত নামায এক রোযার পরিমাণ। মোটকথা আপনারা নামাযকে রোযার উপর কিয়াস করে রোযার যা ফিদিয়া ওয়াজিব হয় নামাযের ব্যাপারেও তাই ওয়াজিব করে থাকেন। অথচ রোযার ফিদিয়া খিলাফে কিয়াস সাব্যস্ত হয়েছে। আর খিলাফে কিয়াস বিষয়ের উপর অন্য কিছুকে কিয়াস করা যায় না।

উত্তর : কাযা নামাযের ফিদিয়া احتياطا। তথা সতর্কতার কারণে ওয়াজিব করা হয়েছে। কিয়াসের কারণে ওয়াজিব করা হয়নি। আর এটা এই জন্য যে, শায়খে ফানীর ব্যাপারে যে নস তথা وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ নাযিল হয়েছে তার মধ্যে এমনও সম্ভাবনা রয়েছে যে, তা রোযার সাথে খাছ। অর্থাৎ ফিদিয়ার বিধান এমন ইল্লতের সাথে সম্পৃক্ত যা রোযার সাথেই খাছ। আর এমনও সম্ভাবনা রয়েছে যে, এমন ইল্লতের সাথে সম্পৃক্ত যা রোযার সাথে খাছ নয়। বরং অন্যের মধ্যেও পাওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ এর দ্বারা মুতলাকভাবে অক্ষমতা উদ্দেশ্য। আর খাছ হলে তার দ্বারা কেবল রোযার অক্ষমতা উদ্দেশ্য হবে। অতএব রোযা আদায় করা থেকে অক্ষম হওয়ার ক্ষেত্রে যেহেতু ফিদিয়ার বিধান রাখা হয়েছে। অতএব নামায আদায় করা থেকে অক্ষম হওয়ার ক্ষেত্রেও ফিদিয়ার বিধান থাকবে।

সারকথা এই যে, প্রথম সম্ভাবনার ভিত্তিতে নামাযের ফিদিয়া ওয়াজিব হয় না। আর দ্বিতীয় সম্ভাবনার ভিত্তিতে নামাযের ফিদিয়া ওয়াজিব হয়। সুতরাং সতর্কতার উপর আমল করার দরুন নামাযের ফিদিয়া ওয়াজিব করা হয়েছে। ব্যাখ্যাকার সতর্কতার বিষয়টি এভাবে পেশ করেছেন যে, নামায হলো রোযার নজির। কারণ উভয়টি ইবাদতে বদনিয়া মাকসূদা। বরং নামায তার উচ্চ মর্যাদার কারণে রোযা থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা নামায কোনো মাধ্যম বিহীন একটি উত্তম কাজ। আর রোযা আল্লাহর দুষমন নফসে আম্মারাকে পরাভূত ও দমন করার জন্য উত্তম জ্ঞান করা হয়েছে। অন্যথায় প্রকৃতপক্ষে রোযা কোনো উত্তম কাজ নয়। কারণ এর দ্বারা নিজেকে ক্ষুধার্ত রাখা হয় এবং আল্লাহ তা'আলার নে'মত থেকে বিরত রাখা হয়। অতএব তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত থেকে অক্ষমতার ক্ষেত্রে যেহেতু ফিদিয়া দেয়া ওয়াজিব। অতএব সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত নামাযের ফিদিয়া আদায় করা উত্তমরূপে ওয়াজিব হওয়া বাঞ্ছনীয়। সুতরাং নামাযের ফিদিয়া যদি আল্লাহ তা'আলার দরবারে নামাযের ব্যাপারে যথেষ্ট হয় তা হলে তা মঙ্গল। অন্যথায় কমপক্ষে সাদকার সওয়াবতো লাভ হবে।

নামাযের ফিদিয়া যেহেতু সতর্কতার দরুন ওয়াজিব; কিয়াসের কারণে নয়। এ কারণে ইমাম মুহম্মদ (র) জিয়াদাত গ্রন্থে লিখেন– ইনশাআল্লাহ নামাযের ফিদিয়া মৃত ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট হবে। অথচ কিয়াসী মাসআলা আল্লাহর مشيئة এর উপর কখনো ঝুলন্ত থাকে না। সুতরাং ইমাম মুহাম্মদ (র) এর নামাযের ফিদিয়াকে আল্লাহর مشيئة এর উপর ঝুলন্ত করা এ বিষয়ের দলিল যে, নামাযের ফিদিয়ার ভিত্তি হলো সতর্কতার উপর, কিয়াসের উপর নয়। এর উদাহরণ যেমন– কোন ওয়ারিশ মাইয়্যেতের পক্ষ থেকে তার অছিয়ত ছাড়াই কাযা রোযার ফিদিয়া দিলো। এটা যেমন আল্লাহর দরবারে গ্রহণ করার আশা করা যায়। অতএব আমাদেরও আশা রয়েছে ইনশাআল্লাহ মুর্দারের পক্ষ থেকে নামাযের ফিদিয়া গ্রহণযোগ্য হবে।

قوله كَالتَّصَدُّقِ بِالْقِيْمَةِ عِنْدَ فَوَاتِ الخ : মানার গ্রন্থকার বলেন– কাযা নামাযের জন্য যেরূপ ফিদিয়া ভিত্তি সতর্কতার উপর। এভাবে কোনো ব্যক্তি যদি যার উপর কোরবাণী করা ওয়াজিব নয় নির্দিষ্ট কোনো পশু কোরবাণী করার মান্নত করে বা কোরবাণী করার নিয়ত করে পশু খরিদ করে। তারপর কোনো কারণে কোরবাণীর দিনসমূহ অতিবাহিত হয়ে যায় ফলে সে কোরবাণী করতে না পারে। তাহলে তার মান্নতকৃত পশু জীবিত থাকলে হুবহু উক্ত পশুকে সতর্কতামূলক সাদকা করা ওয়াজিব। আর উক্ত পশু মরে গেলে তার সমপরিমাণ মূল্য সাদকা করা সতর্কতামূলক ওয়াজিব।

فَهُوَ تَشْبِيْهٌ بِالْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَجَوَابٌ عَنْ سُوَالٍ مُقَدَّرٍ تَقْرِيْرُهُ أَنَّ مَا لَا يُعْقَلُ شَرْعًا لَا يَكُوْنُ لَهُ قَضَاءٌ وَخَلَفٌ عِنْدَ الْفَوَاتِ وَالتَّضْحِيَةُ اَىْ اِرَاقَةُ الدَّمِ فِى اَيَّامِ النَّحْرِ غَيْرُ مَعْقُوْلَةٍ لِاَنَّهُ اِتْلَافُ الْحَيْوَانِ فَيَنْبَغِى اَنْ لَا يَجُوْزَ قَضَاءُهَا بِالتَّصَدُّقِ بِعَيْنِ الشَّاةِ اَوْ بِالْقِيْمَةِ بَعْدَ فَوَاتِ اَيَّامِهَا - فَاَجَابَ بِاَنَّ وُجُوْبَ التَّصَدُّقِ بِالْقِيْمَةِ اَوْ بِالشَّاةِ بَعْدَ فَوَاتِ الْاَيَّامِ لِلْاِحْتِيَاطِ لَا لِلْقَضَاءِ وَذَالِكَ لِاَنَّ التَّضْحِيَةَ فِىْ اَيَّامِهَا تَحْتَمِلُ اَنْ تَكُوْنَ اَصْلًا بِنَفْسِهَا وَتَحْتَمِلُ اَنْ تَكُوْنَ خَلَفًا بِاَنْ يَكُوْنَ التَّصَدُّقُ بِعَيْنِ الشَّاةِ اَوْ بِقِيْمَتِهَا اَصْلًا

অনুবাদ ॥ সুতরাং এ মাসআলাটি পূর্ববর্তী মাসআলার সদৃশ। এ ইবারতটি একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা এই যে, শরীআতের দৃষ্টিতে যা যুক্তিযুক্ত নয়, তা ছুটে গেলে তার কোন কাযা হয় না এবং কোন স্থলাভিষিক্ত হয় না। আর কুরবানী করা অর্থাৎ কুরবাণীর দিনগুলোতে রক্ত প্রবাহিত করা যুক্তিযুক্ত কাজ নয়। কারণ এটা হলো জীবহত্যা বিশেষ। সুতরাং এটাই সমীচীন যে, কুরবাণীর সময় পেরিয়ে গেলে মূল বকরী অথবা মূল্য সাদকা করার মাধ্যমে তার কাযা করা জায়েয না হউক।

মুসান্নিফ (র) এর উত্তর দিচ্ছেন যে, কুরবানীর দিনসমূহ পেরিয়ে যাওয়ার পর মূল্য অথবা হুবহু বকরী সাদকা করা ওয়াজিব হওয়া; সতর্কতামূলক মাত্র; কাযা হিসেবে নয়। কেননা নির্ধারিত তারিখে কুরবানী করা তা স্বয়ং মৌলিক বিষয় হওয়ার সম্ভাবনা রাখে এবং স্থলাভিষিক্ত হওয়ারও সম্ভাবনা রাখে; এভাবে যে, হুবহু বকরী অথবা তার মূল্য সাদকা করা মৌলিক বিষয় হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله فَهُوَ تَشْبِيْهٌ بِالْمَسْأَلَةِ الخ : নূরুল অনওয়ার গ্রন্থকার বলেন– এ মাসআলাটি পূর্বের মাসআলা অর্থাৎ কাযা নামাযের ফিদিয়া ওয়াজিব হওয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেমন যেন মুসান্নিফের উক্তি كَالتَّصَدُّقِ بِالْقِيْمَةِ এর মধ্যে কাফ বর্ণটি مشبه এর উপর দাখিল হয়েছে। তবে টীকাকার বলেন– উত্তম এই যে, এই কাফটি কেবল قران তথা মিলিত করণের জন্যে, সামঞ্জস্যতা বোঝানোর জন্য নয়। উভয় মাসআলার ভিত্তি সতর্কতার উপর, কিয়াসের উপর নয়। মোটকথা মাতিন (র) এর এই ইবারতটি একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর।

এর ব্যাখ্যা এই যে, যে বস্তু শরীআতে অযৌক্তিক তা ছুটে যাওয়ার পরে তার কোনো কাযা বা স্থলাভিষিক্ত থাকে না। আর এ মাসআলায় অর্থাৎ কোরবাণীর দিনসমূহে কোরবাণী দ্বারা রক্তপাত ঘটানো একটি অযৌক্তিক বিষয়। কারণ এর দ্বারা পশু বিনষ্ট করা হয় এবং পশুদেরকে কষ্ট দেয়া হয়। আর কোনো পশুকে শাস্তি দেয়ার মধ্যে আল্লাহর নৈকট্য ও সওয়াবের প্রশ্নই উঠে না। অতএব বোঝা গেলো যে, নির্দিষ্ট দিনসমূহের মধ্যে কোরবাণী করা অযৌক্তিক বিষয়। এটা জনৈক উর্দু কবি এভাবে বর্ণনা করেছেন–

یہ عجیب ماجرا ہے کہ بروز عید قرباں * وہی قتل بھی کرے ہے وہی لے ثواب الٹا

মোটকথা কোরবাণী করা যেহেতু অযৌক্তিক বিষয়। অতএব মুনাসিব এই যে, কোরবাণীর দিনসমূহ পেরিয়ে যাওয়ার পর তার কাযা হুবহু উক্ত বস্তু বা তার মূল্য সাদকা করা দ্বারা জায়েয হবে না।

قوله فَاَجَابَ بِاَنَّ الخ : গ্রন্থকার এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন– কোরবাণীর দিনসমূহ পেরিয়ে যাওয়ার পরে হুবহু উক্ত পশু কিংবা তার মূল্য সাদকা করা সতর্কতামূলক ওয়াজিব। কিয়াস বা শরয়ী ফায়সালারূপে নয়। সতর্কতার কারণ এই যে, কোরবাণীর দিনসমূহে কোরবাণী করা এমন সম্ভাবনা রাখে যে, এটাই মূল বিধান। আবার এমনও সম্ভাবনা রয়েছে যে, কোরবাণী করা স্থলাভিষিক্ত হবে। আর হুবহু উক্ত পশু অথবা তার মূল্য সাদকা করাই আসল বিধান হবে।

وَاِنَّمَا انْتَقَلَ اِلَى التَّضْحِيَةِ بِعَارِضِ الضِّيَافَةِ لِاَنَّ النَّاسَ اَضْيَافُ اللّٰهِ تَعَالٰى فِىْ هٰذِهِ الْاَيَّامِ وَالضِّيَافَةُ اِنَّمَا تَكُوْنُ بِاَطْيَبِ الطَّعَامِ وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ اللَّحْمُ الْمُذَكّٰى الْمُرَاقُ مِنْهُ الدَّمُ لِيَكُوْنَ اَوَّلُ تَنَاوُلِ النَّاسِ مِنْ طَعَامِ الضِّيَافَةِ الْمُكَرَّمَةِ فَمَا دَامَ كَانَتِ الْاَيَّامُ مَوْجُوْدَةً قُلْنَا اِنَّ التَّضْحِيَةَ اَصْلٌ بِرَأْسِهَا وَعَمِلْنَا بِالْمَنْصُوْصِ وَاِذَا فَاتَتِ الْاَيَّامُ صِرْنَا اِلَى الْاَصْلِ وَقُلْنَا اِنَّ التَّصَدُّقَ بِعَيْنِ الشَّاةِ اَوْ بِالْقِيْمَةِ هُوَ الْاَصْلُ فَحَكَمْنَا بِهِ ثُمَّ اِذَا جَاءَ الْعَامُ الثَّانِىْ لَمْ تَنْتَقِلْ مِنْ هٰذَا الْحُكْمِ وَلَمْ نَقُلْ بِقَضَائِهَا عَلٰى مَا كَانَ فِى الْعَامِ الْاَوَّلِ - ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ رح مِنْ بَيَانِ اَنْوَاعِ الْقَضَاءِ فِىْ حُقُوْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى شَرَعَ فِىْ بَيَانِ اَنْوَاعِهِ فِىْ حُقُوْقِ الْعِبَادِ فَقَالَ وَمِنْهَا ضَمَانُ الْمَغْصُوْبِ بِالْمِثْلِ وَهُوَ السَّابِقُ اَوْ بِالْقِيْمَةِ اى مِنْ اَنْوَاعِ الْقَضَاءِ ضَمَانُ الشَّئِ الْمَغْصُوْبِ بِالْمِثْلِ فِيْمَا اِذَا غَصَبَ مِثْلِيًّا وَاسْتَهْلَكَ و وَجَدَ الْمِثْلَ فِيْمَا بَيْنَ النَّاسِ اَوْ بِالْقِيْمَةِ فِيْمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ او كَانَ لَهُ مِثْلٌ وَلٰكِنِ انْصَرَمَ عَنْ اَيْدِى النَّاسِ -

অনুবাদ ॥ অতএব যে পর্যন্ত কুরবানীর দিন বাকী থাকবে, আমরা বলবো সে পর্যন্ত কুরবানী করাই মৌলিক বিষয়। আর এ ব্যাপারে আমরা নস অনুযায়ী আমল করবো। আর যদি কুরবাণীর দিনসমূহ অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে আমরা মৌলিক বিষয়ের প্রতি প্রত্যাবর্তন করবো এবং বলবো হুবহু বকরী দ্বারা এবং (তার) মূল্য দ্বারা সাদকা করাই মৌলিক বিষয়। সুতরাং আমরা এ মৌলিক বিষয়ের হুকুম প্রদান করবো। এরপর যখন দ্বিতীয় বছর আসবে, তখন এ হুকুম স্থানান্তরিত হবে না এবং আমরা পূর্ববর্তী বছর যা হুকুম ছিল তা কাযা করার কথা বলবো না। আর কুরবাণী করার প্রতি স্থানান্তর করা হয়েছে যিয়াফত তথা মেহমানের আতিথেয়তার প্রতি লক্ষ করে। কারণ মানুষ হলো আল্লাহর মেহমান। আর এ সব দিনে আতিথেয়তা উত্তম খাদ্য দ্বারা হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর মহান আল্লাহর কাছে তা হলো কুরবাণীর পবিত্র গোশত, যা থেকে রক্ত প্রবাহিত করা হয়েছে। যাতে সেদিনের প্রথম খাদ্য সম্মানিত মেহমানদারির খাদ্য দ্বারা হতে পারে।

মুসান্নিফ (র) হুকুম সংক্রান্ত কাযার প্রকারভেদের আলোচনা শেষ করে হুকূকুল ইবাদ তথা বান্দার অধিকার সংক্রান্ত কাযার প্রকারভেদের আলোচনা শুরু করেছেন। তিনি বলেন, قضاء *এর প্রকারসমূহের একটি হলো সাদৃশ্য বস্তু দ্বারা ছিনতাই বা আত্মসাৎকৃত বস্তুর ক্ষতিপূরণ প্রদান করা, আর এটাই গ্রহণযোগ্য। অথবা মূল্য দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ দেয়া।* অর্থাৎ কাযার প্রকারসমূহের মধ্যে এটাও একটা যে, যদি সাদৃশ্য বস্তু ছিনতাই করে তা ধ্বংস করে। আর মানুষের কাছে উক্ত সাদৃশ্য বস্তুটি পাওয়া যায়, তবে উক্ত বস্তুর ক্ষতিপূরণ সাদৃশ্য বস্তু দ্বারা প্রদত্ত হবে। আর যদি সাদৃশ্য না থাকে অথবা সাদৃশ্য আছে, কিন্তু তা মানুষের হাতে নেই, তবে এক্ষেত্রে মূল্য দ্বারা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ কোরবাণী করার প্রতি কেবল আল্লাহর মেহমানদারী কারণে স্থানান্তরিত হয়েছে। কেননা এটা হলো আল্লাহর মেহমানদারী। আর কোনো মহৎ ব্যক্তি যখন মেহমানদারী করেন তখন উত্তম আহার সামগ্রীর ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ তা'আলার দরবারে উত্তম খাদ্য হলো পবিত্র জবাইকৃত পশুর গোশত। কেননা সাদকার মাল সাদকাকারীর গোণাহসমূহ দুরীভূত করার কারণে ময়লা আবর্জনার ন্যায়। আল্লাহ তা'আলার বাণী خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ

صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ এদিকে ইঙ্গিত বহন করে। এ কারণে নবী করীম (স) এবং তার বংশধর ও তাদের আযাদকৃত গোলাম বাঁদীর উপর সাদকার মাল গ্রহণ করা হারাম ছিলো। আর ধনী ব্যক্তিদের উপর তার মুখাপেক্ষী না হওয়ার কারণে হারাম করা হয়েছে। আল্লাহর ন্যায় মহান সত্তার জন্য এটা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নয় যে, তিনি ময়লা আবর্জনা এবং খারাপ মাল দ্বারা তাঁর বান্দাদের মেহমানদারী করবেন। সুতরাং আমরা পশু কিংবা তার মূল্য সাদকা করার স্থলে পশু জবাই করার নির্দেশ দিয়েছি। যাতে অপবিত্রতা রক্তের প্রতি ধাবিত হয়। আর গোশ্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থেকে যায়। এবং এর দ্বারা আল্লাহর তরফ থেকে স্বীয় বান্দাদের মেহমানদারী হয়ে যায়।

এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহর মেহমান সর্বপ্রথম উত্তম খাদ্য গ্রহণ করবে। এ ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, যতক্ষণ কোরবাণীর দিনসমূহ বিদ্যমান থাকবে। ততক্ষণ পর্যন্ত কুরবাণী করাই মূল। এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (স) এর হাদীস ضَحُّوا فَإِنَّهَا سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ এর উপর আমল হয়ে যাবে। আর কুরবাণীর দিনসমূহ অতিবাহিত হলে তখন আমরা মূল্যের প্রতি রুজু করবো এবং বলবো হুবহু কুরবাণীর পশু কিংবা তার মূল্য সাদকা করাই আসল; কিন্তু কুরবাণীর দিবসসমূহ অতিক্রমের পরে এ নীতি অনুযায়ী নির্দেশ দেবো। এরপর যদি দ্বিতীয় বছরের কোরবাণীর দিন এসে যায়। এর মধ্যে লোকটি কোরবাণীর পশু কিংবা তার মূল্য সাদকা করতে না পারে। তখন আমরা উক্ত বিধান তথা সাদকা ওয়াজিব হওয়া থেকে কোরবাণীর করার প্রতি স্থানান্তরিত করবো না এবং এমনও বলবো না যে, পূর্বের বছর যে নির্দেশ ছিলো সে মোতাবেক কোরবাণীর কাযা করতে হবে। অর্থাৎ পরবর্তী বছর কোরবাণীর দিনসমূহে গতবছরের পশুর কাযা স্বরূপ কোরবাণী করার বিধান দেবো না। বরং তা সাদকা করাই ওয়াজিব হবে।

মোটকথা যখন এমনও সম্ভাবনা রয়েছে যে, কোরবাণীর দিনসমূহে কোরবাণী করাই আসল এবং এমনও সম্ভাবনা রয়েছে যে, পশু কিংবা মূল্য সাদকা করাই আসল। অতএব প্রথম কোরবাণীর দিনসমূহ অতিক্রম করার পরে প্রথম সম্ভাবনার ভিত্তিতে উক্ত পশু কিংবা তার মূল্য সাদকা করা তার কাযা এবং স্থলাভিষিক্ত হবে। আর দ্বিতীয় সম্ভাবনার ভিত্তিতে তা কাযা হবে না বরং আছল হবে। সুতরাং প্রথম সম্ভাবনার ভিত্তিতে নিশ্চিতরূপে পশু কিংবা তার মূল্য সাদকা করা নাজায়েয। কারণ এ কোরবাণী যা এক অযৌক্তিক বিষয় তার কাযা। আর অযৌক্তিক বিষয়ের কোন কাযা কিংবা তার স্থলাভিষিক্ত হয় না। তবে দ্বিতীয় সম্ভাবনার ভিত্তিতে সাদকা করা ওয়াজিব। কারণ যে পশু কোরবাণীর মান্নত করেছিলো, কিংবা কোরবাণীর নিয়তে খরিদ করেছিলো তা সাদকা করাই আছল। জবাই করার নির্দেশ কেবল আল্লাহর মেহমানদারীর কারণে দেয়া হয়েছিলো। অতএব এক্ষেত্রে পশু কিংবা তার মূল্য সাদকা করা যেহেতু ওয়াজিব। একারণেই সতর্কতামূলক সাদকা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সারকথা এই যে, কোরবাণীর দিনসমূহ অতিক্রম করার পরে কেরবাণীর পশু কিংবা তার মূল্য সাদকা করা কাযা এবং কিয়াস স্বরূপ নয় বরং তা সতর্কতামূলক।

قوله ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ مِنْ بَيَانِ الخ : ব্যাখ্যাকার (র) বলেন– قضاء এর প্রকারভেদ। ১. قضاء بمثل معقول ২. قضاء بمثل غير معقول ৩. قضاء مشابه بالاداء যেভাবে হুকুকুল্লাহর মধ্যে পাওয়া যায়। তদ্রূপ হুকুকুল ইবাদের মধ্যেও পাওয়া যায়। হুকুকুল্লাহর বিষয়ে আলোচনা সমাপ্ত হয়েছে। এখান থেকে তিনি হুকুকুল ইবাদ সংক্রান্ত কাযার প্রকারভেদ বর্ণনা শুরু করছেন।

ব্যাখ্যাকার বলেন– قضاء এর প্রকারসমূহের মধ্য থেকে এক প্রকার অর্থাৎ قضاء بمثل معقول এর উদাহরণ এই যে, যদি কোনো ব্যক্তি ذوات الامثال তথা যার অনুরূপ বস্তু আছে তার মধ্য থেকে কোনো বস্তু ছিনতাই করে তা বিনষ্ট করে। কিন্তু সে ধরনের জিনিস বাজারে পাওয়া যায় তাহলে ছিনতাইকারীর উপর তার مثل তথা অনুরূপ বস্তুসহ জরিমানা ওয়াজিব হবে। ছিনতাইকৃত বস্তু যদি ذات القيم তথা যার মূল্য আছে অথবা ذات الامثال তথা সাদৃশ্যবস্তু আছে। কিন্তু বাজারে তার مثل পাওয়া যায় না এমন হয়। সেক্ষেত্রে অপহরকের উপর তার মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব। মোটকথা ১ম ক্ষেত্রে مثل এবং ২য় ক্ষেত্রে মূল্য ওয়াজিব হওয়া হুকুকুল ইবাদের মধ্যে مثل এর উদাহরণ।

فَهٰذَا نَظِيرُ الْقَضَاءِ بِمِثْلٍ مَعْقُولٍ لِاَنَّ الْمِثْلَ وَالْقِيمَةَ كِلَاهُمَا مِثْلٌ معقولٌ اَمَّا الاولُ فظاهِرٌ اِذْ هُوَ مِثْلٌ صُورَةً ومعنىً وَاَمَّا الثَّانِى فَهُوَ اَيْضًا مِثْلٌ معنىً وان لَم يَكُنْ صُورَةً وَلٰكِنَّ الْاَوَّلَ كَامِلٌ وَالثَّانِى قَاصِرٌ ولِهٰذَا قال وهُوَ السَّابِقُ اى الْمِثْلُ الصُّورِى سَابِقٌ عَلَى الْمِثْلِ الْمَعْنَوِى فَمَادَامَ وُجِدَ الْمِثْلُ الصُّورِى لم يَنْتَقِلِ الَى الْمِثْلِ الْمَعْنَوِى فَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى اَنَّ الْقَضَاءَ بِمِثْلٍ مَعْقُولٍ نَوْعَانِ كَامِلٌ وَقَاصِرٌ لَايُقَالُ مِثْلُ هٰذَا مُتَحَقِّقٌ فِى حُقُوقِ اللّٰهِ تَعَالٰى اَيْضًا فَاِنَّ قَضَاءَ الصَّلٰوةِ بِالْجَمَاعَةِ كَامِلٌ وَقَضَاءَهَا مُنْفَرِدًا قَاصِرٌ فَلِمَ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ لِاَنَّا نَقُولُ عِنْدَهُم قَضَاءُ الصَّلٰوةِ مُنفَرِدًا كَامِلٌ وَبِالْجَمَاعَةِ اَكْمَلُ وَلَا يُقِيسُونَ حَالَ الْقَضَاءِ عَلٰى حَالِ الْاَدَاءِ -

---

অনুবাদ॥ সুতরাং ইহা হলো قضاء بمثل معقول তথা সাদৃশ্য বস্তু দ্বারা কাযার উপমা। কেননা সাদৃশ্য বস্তু এবং মূল্য উভয়টি মিসলে মা'কূল তথা সঙ্গত সাদৃশ্যের আওতাভুক্ত। আর প্রথমটিতো সুস্পষ্ট। কেননা তা বাহ্যিকভাবে এবং অভ্যন্তরীণভাবে সাদৃশ্য। আর দ্বিতীয়টি অভ্যন্তরীণভাবে সাদৃশ্য, যদিও রূপগত দিক দিয়ে সাদৃশ্য নয়। প্রথমটি হলো مثل كامل এবং দ্বিতীয়টি হলে مثل قاصر

এ কারণেই গ্রন্থকার (র) বলেছেন- যে এটাই অগ্রগণ্য। অর্থাৎ বাহ্যিক সাদৃশ্য অভ্যন্তরীণ সাদৃশ্যের ওপর অগ্রগণ্য। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত বাহ্যিক সাদৃশ্য পাওয়া যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ সাদৃশ্যের প্রতি প্রত্যাবর্তন করা যাবে না।

বস্তুত এর মধ্যে এ কথার দিতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, قضاء بمثل معقول দুপ্রকার। كامل এবং قاصر এখানে (এ কথা) বলা যাবে না যে, মহান আল্লাহর অধিকারের মধ্যে হুকুম এর দৃষ্টান্ত তো বিদ্যমান রয়েছে। কেননা জামাআতের সাথে নামাযের কাযা করা كامل বা পূর্ণাঙ্গ। আর একাকী কাযা করা قاصر বা অপূর্ণাঙ্গ। এখানে এ প্রশ্ন করা যাবে না যে, حقوق الله এর মধ্যেও (র) এর উদাহরণ রয়েছে। কেননা জামাতের সাথে কাযা নামায পড়া হলো كامل আর একাকী পড়া হলো قاصر সুতরাং মুসান্নিফ (র) তা নিয়ে আলোচা করেন নি কেন? কেননা আমরা বলবো- উসূলবিদদের নিকট একাকী নামাযের কাযা করা পূর্ণাঙ্গ। আর জামাতের সাথে আদায় করা অধিক পূর্ণাঙ্গ। ফকীহগণ কাযার অবস্থাকে আদার অবস্থার ওপর কিয়াস করতেন না।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ কেননা مثل এবং মূল্য উভয়টি ছিনতাইকৃত বস্তুর যুক্তিযুক্ত বা সঙ্গত مثل আর قضاء مثل معقول এর মধ্যে مثل ছিনতাইকৃত বস্তুর مثل হওয়া একেবারেই স্পষ্ট। কারণ ذوات الامثال এর মধ্যে ছিনতাইকৃত বস্তুর জরিমানা বাহিক্যকভাবে ও ছিনতাইকৃত বস্তুর অনুরূপ এবং অর্থগতভাবেও তার অনুরূপ।

বাহ্যিকভাবে এ কারণে যে, জরিমানাস্বরূপ যে বস্তু দেয়া হচ্ছে তা ছিনতাইকৃত বস্তুর সমজাতীয়। যেমন গমের জরিমানা গম দ্বারা দিলো। আর অর্থগতভাবে অনুরূপ এ কারণে যে, ছিনতাইকৃতবস্তু এবং জরিমানাস্বরূপ প্রদত্ত বস্তু উভয়টি মূল্যের দিক দিয়ে নিকটবর্তী। যেমন- ছিনতাইকৃত বস্তু হলো এক কুইন্টাল গম। আর তার জরিমানাও এক

কুইন্টাল গম নির্ধারিত হলো। তাহলে উভয়টি মাল হওয়ার ক্ষেত্রে নিকটবর্তী। কেমন যেন এক জাতীয় দু বস্তুর মাল হওয়ার দিক দিয়ে নিকটবর্তী হওয়াটা مثل معنوى

সারকথা জরিমানাস্বরূপ প্রদত্ত বস্তু যখন ছিনতাইকৃত বস্তুর বাহ্যিক দিক দিয়েও অনুরূপ এবং অর্থগত দিক দিয়েও অনুরূপ। সুতরাং তা مثل معقول হওয়াটা সুস্পষ্ট।

আর দ্বিতীয় বিষয় অর্থাৎ জরিমানাস্বরূপ ছিনতাইকৃত বস্তুর মূল্য আদায় করা যদিও বাহ্যিক مثل নয়। তবে অর্থগতভাবে তা অনুরূপ বস্তু। বাহ্যিকভাবে এ কারণে مثل নয় যে, জরিমানা স্বরূপ যে বস্তু দেয়া হচ্ছে অর্থাৎ মূল্য তা ছিনতাইকৃত দ্রব্যের সমজাতীয় নয়। আর অর্থগতভাবে مثل এ কারণে যে, ছিনতাইকৃত দ্রব্য এবং তার মূল্য মাল হওয়ার দিক দিয়ে নিকটবর্তী। তবে এতটুকু বিষয় অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, مثل معنوى ও مثل صورى উভয়টি যদিও مثل معقول কিন্তু مثل صورى অনুরূপ হওয়ার দিক দিয়ে পূর্ণাঙ্গ। আর مثل معنوى অপূর্ণাঙ্গ। এ পার্থক্যের কারণে মুসান্নিফ (র) وهو السابق উল্লেখ করেছেন।

এর উদ্দেশ্য এই যে, مثل صورى - مثل معنوى এর উপর অগ্রগামী। অতএব যতোক্ষণ পর্যন্ত ছিনতাইকারী مثل صورى এর মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে সক্ষম হবে। ততোক্ষণ পর্যন্ত مثل معنوى দ্বারা ক্ষতিপূরণ আদায় করার অনুমতি থাকবে না। কারণ এর দ্বারা মালিকের অধিকার আদায় করা উদ্দেশ্য। আর মালিকের ছিনতাইকৃত বস্তুর বাহ্যিক এবং গুণগত উভয় বিষয়ের সাথে তার অধিকার সংশ্লিষ্ট। অতএব যথাসম্ভব উভয়টি লক্ষ্য রাখতে হবে।

ছিনতাইকারী যদি অনুরূপবস্তু আছে এমন কোনো বস্তু ছিনতাই করে তা নষ্ট করে তাহলে ছিনতাইকারীর উপর অনুরূপবস্তু দ্বারাই তার ক্ষতিপূরণ আদায় করা ওয়াজিব হবে। তবে শর্ত এই যে, সে তার উপর সক্ষম হতে হবে। এমনকি مثل صورى এর উপর সক্ষমতা সত্ত্বে সে যদি তার মূল্য (مثل معنوى) দ্বারা ক্ষতিপূরণ আদায় করে তাহলে মালিক তা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে না।

মোটকথা এ বর্ণনা দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, হুকুকুল ইবাদের মধ্যে قضاء بمثل معقول ২ প্রকার। ১. মিসলে কামিল, ২. মিসলে কাসির। অর্থাৎ مثل صورى হলো মিসলে কামিল। আর مثل معنوى হলো মিসলে কাসির।

قوله لَايُقَالُ مِثْلُ هٰذَا الخ : এর দ্বারা একটি প্রশ্ন উল্লেখ করা হচ্ছে। প্রশ্নের সার এই যে, হুকুকুল ইবাদে যেভাবে قضاء بمثل معقول কামিল ও কাসির এ ২ভাগে বিভক্ত হয় তদ্রূপ হুকুকুল্লাহর মধ্যেও হয়ে থাকে। যেমন– জামাআতের সাথে নামায কাযা পড়া হলো مثل معقول كامل আর একাকী কাযা পড়া হলো مثل معقول قاصر সুতরাং মুসান্নিফ (র) এর আলোচনা করলেন না কেন?

উত্তর : كمال বলা হয় শরীআতে যেভাবে কোনো কাজ প্রবর্তন করা হয়েছে সে মোতাবেক আমল করাকে। জিব্রাইল (আ) জামাআতের সাথে কাযা আদায়ের শিক্ষা দেননি। বরং সময় মত নামায আদায়ের শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব জামাআতের সাথে আদায় করাটা পূর্ণাঙ্গ বিবেচিত। আর জামাআত বিহীন অপূর্ণাঙ্গ তথা কাসির বিবেচিত। আর কাযা কামিল ও কাসির হতে পারে না। জামাআতের সাথে হলে তথাপি তা মিসলে কামিল হবে। আর একাকী পড়লেও মিসলে কামিল হবে। অবশ্য এতটুকু বলা যেতে পারে যে, জামাআতবদ্ধ হয়ে কাযা নামায পড়া অধিক পূর্ণাঙ্গ। আর একাকী পড়া সেই তুলনায় কিছুটা অপূর্ণাঙ্গ। মোটকথা নামায আদায় করা যখন জামাআতের সাথে প্রবর্তিত হয়েছে। আর কাযা নামায জামাতের সাথে পড়া শরিআতে প্রবর্তিত হয়নি। অতএব কাযার অবস্থাকে আদায় অবস্থার উপর কিয়াস করা কিভাবে বৈধ হতে পারে?

وَضَمَانُ النَّفْسِ وَالْاَطْرَافِ بِالْمَالِ هٰذَا نَظِيرٌ لِلْقضَاءِ بِمِثْلٍ غَيْرِ مَعْقُولٍ فَإِنَّ ضَمَانَ النَّفْسِ الْمَقْتُوْلَةِ خَطَاءً بِكُلِّ الدِّيَةِ وَالْاَطْرَافِ الْمَقْطُوعَةِ خَطَاءً بِكُلِّ الدِّيَةِ اَوْ بَعْضِهَا غَيْرُ مُدْرَكٍ بِالْعَقْلِ اِذْ لَا مُمَاثَلَةَ بَيْنَ الْاٰدَمِيِّ الْمَالِكِ الْمُتَبَذِّلِ وَبَيْنَ الْمَالِ الْمَمْلُوْكِ الْمُتَبَذِّلِ وَاِنَّمَا شَرَعَهَا اللّٰهُ تَعَالٰى لِئَلَّا تَهْدُرَ النَّفْسُ الْمُحْتَرَمَةُ مَجَانًا اِذِ الْقِصَاصُ اِنَّمَا شُرِعَ اِذَا كَانَ عَمَدًا لِتَحْصُلَ الْمُسَاوَاةُ -

---

অনুবাদ॥ ***আর জীবন এবং অঙ্গের ক্ষতিপূরণ মাল দ্বারা আদায় করা,*** এটা قضاء بمثل غير معقول এর উদাহরণ। কেননা ভুলক্রমে হত্যাকৃত জানের ক্ষতিপূরণ এবং ভুলক্রমে কর্তিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতিপূরণ সম্পূর্ণ দিয়ত দ্বারা আদায় করা, অথবা কিছু অংশ দ্বারা আদায় করা যুক্তিযুক্ত নয়।

কারণ মানুষ যে অর্থের মালিক ও উহা ব্যয়কারী এবং মানুষের মালিকানাধীন যে অর্থ আছে ও যা সে ব্যয়করে তার মাঝে কোন সাদৃশ্যতা নেই। আল্লাহ তা'আলা দিয়তকে ধর্তব্য করেছেন যাতে একটি মর্যাদাপূর্ণ প্রাণ মূল্যহীনভাবে বিনষ্ট না হয়। কেননা কিসাস এমন ক্ষেত্রে বৈধ হয়েছে যেখানে ইচ্ছাকৃত হত্যা সংঘটিত হয়; যেন উভয়ের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ قَوْلُهُ وَضَمَانُ النَّفْسِ وَالْاَطْرَافِ الخ : কতল ২ প্রকার। ১. قتل عمد ২. قتل خطاء

قتل خطاء আবার ২ প্রকার। ১. خطاء فِىْ ظَنِّ الْفَاعِلِ ২. خطاء فِىْ نفس الفعل

قتل عمد তথা ইচ্ছাপূর্বক হত্যা : কাউকে ধারালো অস্ত্র দ্বারা ইচ্ছা পূর্বক হত্যা করা। এক্ষেত্রে হত্যাকারীর উপর কিসাস ওয়াজিব হয়। তবে হত্যাকারী এবং নিহতের অভিভাবকদের মাঝে নির্দিষ্ট পরিমাণ মালের উপর সন্ধি হয়ে গেলে তখন কিসাস ওয়াজিব থাকে না। قتل خطاء فى ظَنِّ الْفَاعِلِ তথা হত্যাকারীর ধারণা ভুলবশত হত্যা ঘটা। যেমন কোনো ব্যক্তিকে দূর থেকে শিকার মনে করে তার প্রতি তীর ছুড়লো। এতে লোকটির মৃত্যু ঘটলো।

قتل خطاء فى نَفْسِ الْفِعْلِ : কাজের মধ্যে ভ্রান্তি ঘটা যেমন কেউ শিকারের প্রতি তীর নিক্ষেপ করলো কিন্তু হঠাৎ কোনো ব্যক্তির শরীরে বিদ্ধ হয়ে তার মৃত্যু ঘটলো; قتل خطاء এর মধ্যে হত্যাকারীর উপর দিয়ত ওয়াজিব হয়। দিয়ত বলে যা কোনো প্রাণের বিনিময় হয়। আর অঙ্গহানীর বিনিময় স্বরূপ যে মাল ওয়াজিব হয় তাকে ارش বলা হয়।

দিয়তের পরিমাণ : ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে দিয়ত হলো ১০০ উট। তা এভাবে যে, ২০টি বিনতে মাখাজ, ২০টি বিনতে লাবুন, ২০টি ইবনে মাখাজ, ২০টি হিক্কা এবং ২০টি জাযআ। অথবা এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা কিংবা ১০ হাজর রৌপ্য দিরহাম।

যেসব কাজে পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হয় : এমন কতিপয় বস্তু রয়েছে যেগুলোর মধ্যে থেকে কোনো একটিকে ভুলবশত নষ্ট করলে পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হয়। যথা ১. নফস , ২. নাক, ৩. উভয় কান, ৪. উভয় চোখ , ৫. উভয় হাত, ৬. উভয় পা, ৭. পুরুষের লজ্জাস্থান, ৮. জিহ্বা, ৯. উভয় ঠোঁট, ১০, উভয় অণ্ডকোষ, ১১. উভয় ভ্রু, মহিলাদের উভয় স্তন, ১২. উভয় চোখের সম্পূর্ণ পাতা, ১৩. উভয় হাতের সমস্ত আঙ্গুল।

যে যে কাজে আংশিক দিয়ত ওয়াজিব হয় : এমন কিছু অঙ্গ রয়েছে যেগুলোকে ভুলবশত নষ্ট করলে পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হয় না। বরং দিয়তের ১ অংশ ওয়াজিব হয়। যেমন– ১ হাত অথবা ১ পা বিনষ্ট করলে অর্ধ দিয়ত ওয়াজিব হয়। আর হাতের বা পায়ের এক আঙ্গুল নষ্ট করলে দিয়তের একদশমাংশ ওয়াজিব হয়। ১ চোখের উপরের বা নিচের পাতা নষ্ট করলে দিয়তের একচতুর্থাংশ ওয়াজিব হয়। *(পরের পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)*

وَادَاءُ الْقِيْمَةِ فِيْمَا اِذَا تَزَوَّجَ عَلٰى عَبْدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهٖ هذا نَظِيْرٌ لِلْقَضَاءِ الَّذِىْ فِىْ مَعْنَى الْاَدَاءِ وَ لِهٰذَا عَبَّرَ عَنْهُ بِلَفْظِ الْاَدَاءِ اى اِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً عَلٰى عَبْدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهٖ فَحِيْنَئِذٍ اِنِ اشْتَرٰى عَبْدًا وَسَطًا وَسَلَّمَهُ اِلَيْهَا فَلَا خَفَاءَ اَنَّهٗ اَدَاءٌ وَاِنْ اَدّٰى اِلَيْهَا قِيْمَةَ عَبْدٍ وَسَطٍ فَهٰذَا قَضَاءٌ لٰكِنَّهٗ فِىْ مَعْنَى الْاَدَاءِ لِاَنَّ الْعَبْدَ مَعْلُوْمُ الذَّاتِ مَجْهُوْلُ الصِّفَةِ فَلَا بُدَّ فِىْ قَطْعِ الْمُنَازَعَةِ بَيْنَهُمَا مِنْ اَنْ يُّسَلِّمَهَا عَبْدًا وَسَطًا وَالْوَسَطُ لَا يَتَحَقَّقُ اِلَّا بِالتَّقْوِيْمِ لِيَكُوْنَ قَلِيْلُ الْقِيْمَةِ اَدْنٰى وَكَثِيْرُ الْقِيْمَةِ اَعْلٰى وَاَوْسَطُهَا بَيْنَ وَبَيْنَ فَكَانَ الْمَرْجِعُ اِلَى التَّقْوِيْمِ فَلِهٰذَا كَانَتِ الْقِيْمَةُ فِىْ مَعْنَى الْاَدَاءِ حَتّٰى تُجْبَرَ عَلَى الْقَبُوْلِ كَمَا لَوْ اَتَاهَا بِالْمُسَمّٰى تَفْرِيْعٌ عَلٰى كَوْنِهَا فِىْ مَعْنَى الْاَدَاءِ اى تُجْبَرُ الْمَرْاَةُ عَلٰى قَبُوْلِ الْقِيْمَةِ كَمَا لَوْ اَتَاهَا بِالْعَبْدِ الْمُسَمّٰى تُجْبَرُ عَلٰى قَبُوْلِ الْعَبْدِ فَكَذَا تُجْبَرُ عَلٰى قَبُوْلِ الْقِيْمَةِ ـ

অনুবাদ ॥ *আর সে ক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধ করা, যখন কেউ কোন অনির্দিষ্ট ক্রীতদাসকে মহর নির্ধারণ করে বিবাহ করে।* এটা ঐ কাযার উদাহরণ যা আদার অর্থে ব্যবহৃত। এ কারণেই উহাকে আদা শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে অনির্দিষ্ট ক্রীতদাস মহর হওয়ার শর্তে বিবাহ করে, তবে সে ক্ষেত্রে লোকটি যদি একটি মধ্যম শ্রেণীর ক্রীতদাস ক্রয় করে এবং সে তাকে সোপর্দ করে; তবে উহা আদা হওয়ার ব্যাপারে কোন অস্পষ্টতা নেই। আর সে যদি তাকে একটি মধ্যম শ্রেণীর ক্রীতদাসের মূল্য সোপর্দ করে, তবে এটা আদার অর্থে قضاء হবে। কেননা ক্রীতদাস শব্দটি সত্তাগতভাবে জ্ঞাত, গুণগতভাবে অজ্ঞাত। সুতরাং উভয়ের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসনকল্পে মধ্যম শ্রেণীর ক্রীতদাস অর্পণ করা

(পূর্বের বাকী অংশ) মোটকথা কারো জীবন কিংবা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভুলবশত বিনষ্ট করলে দিয়ত তথা মাল দ্বারা ক্ষতিপূরণ দেয়া ওয়াজিব হওয়াটা قضاء بمثل غير معقول এর উদাহরণ। কেননা ভুলবশত যে প্রাণ নষ্ট করা হয় তার জরিমানা হলো পূর্ণ দিয়ত। আর কোন অঙ্গ ভুলবশত কর্তন করা হলে তার ক্ষতিপূরণ হলো পূর্ণ দিয়ত কিংবা দিয়তের নির্দিষ্ট এক অংশ এটা যুক্তিবিরোধী। কেননা এমন ব্যক্তি যে মালিক এবং যে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে সক্ষম তার এবং দিয়ত স্বরূপ প্রদত্ত মালিকানাধীন মালের মধ্যে মধ্যে কোনো প্রকার সামঞ্জস্যতা থাকে না। তবে আল্লাহ তা'আলা কেবল এ কারণেই দিয়ত প্রবর্তন করেছেন যাতে সম্মানিত একটি জীবন কিংবা অঙ্গ অহেতু নষ্ট না হয়ে যায়। কেননা কিসাস সেক্ষেত্রে ওয়াজিব যখন ইচ্ছাপূর্বক হত্যা পাওয়া যায়। কারণ সে ক্ষেত্রে হত্যাকারীর হত্যাক্রিয়া এবং নিহতের অভিভাবকদের হত্যার ক্রিয়ার মধ্যে সামঞ্জস্যতা রয়েছে। সুতরাং قتل خطاء এর মধ্যে কিসাস বৈধ নয় তবে দিয়তও যদি বৈধ না হতো তাহলে একটি মর্যাদাবান জীবন অহেতুক বিনষ্ট হয়ে যেত; অথচ ইসলাম এর অনুমতি দেয় না।

মোটকথা নিহতের জীবন কিংবা কর্তিত অঙ্গ এবং মালের মধ্যে যেহেতু দৃশ্যত কোনো সামঞ্জস্যতা নেই এ কারণেই এটা খিলাফে আকল ও অযৌক্তিক বিষয়।

জরুরী। আর মধ্যম শ্রেণীর হওয়া মূল্য নির্ধারণ ছাড়া সাব্যস্ত হবে না। যাতে কম মূল্যেরটি নিম্ন শ্রেণীর, অধিক মূল্যেরটি উত্তম শ্রেণীর এবং মধ্যবর্তী মূল্যেরটি মধ্যম শ্রেণীর বিবেচিত হবে। সুতরাং এ সকল শ্রেণী বিভাগের মাধ্যম হলো মূল্য নির্ধারণ। এ কারণে মূল্য পরিশোধ আদা অর্থে গণ্য হবে।

ফলে স্ত্রীকে তা গ্রহণের বাধ্য করা হবে, যেমনটি তাকে নির্দিষ্ট ক্রীতদাস প্রদানের ক্ষেত্রে বাধ্য করা হয়। এটা মূল্য পরিশোধ আদায় অর্থে হওয়ার ওপর শাখা মাসআলা। অর্থাৎ মূল্য পরিশোধ করার ক্ষেত্রে স্ত্রীকে তা গ্রহণে তদ্রূপই বাধ্য করা হবে, যেমন হুবহু নির্দিষ্ট ক্রীতদাসকে অর্পণ করার ক্ষেত্রে তাকে গ্রহণ করার জন্যে বাধ্য করা হয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ وَادَاءُ الْقِيْمَةِ فِيْمَا اِذَا الخ : মানার গ্রন্থকার (র) বলেন– কেউ যদি অনির্দিষ্ট গোলামকে বিবাহের সময় নিজ বিবির মোহর নির্ধারণ করে পরে তাকে গোলামের মূল্য অর্পণ করে। তাহলে এটা قضاء مشابه بالاداء এর উদাহরণ হবে। কারণ গোলামের মূল্য পরিশোধ করা আদায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ কারণে মুসান্নিফ (র) এ প্রকারকে اداء শব্দের দ্বারা প্রকাশ করে اداء القيمة বলেছেন। সারকথা এই যে, যখন কোনো ব্যক্তি বিবাহকালে অনির্দিষ্ট কোনো গোলামকে মহর নির্ধারণ করে। এ সময় যদি মধ্যম পর্যায়ের গোলাম খরিদ করে স্ত্রীকে দেয়। তাহলে নিঃসন্দেহে এটা আদায় বিবেচিত হবে। কারণ সে মহরস্বরূপ যা সাব্যস্ত করেছিলো হুবহু তাই অর্পণ করলো। আর এটাকেই আদা বলা হয়।

আর যদি মধ্যমস্তরের গোলামের মূল্য পরিশোধ করে তাহলে তা কাযা হবে। কারণ মূল্য ওয়াজিব বস্তুর হুবহু বস্তু নয়। বরং এটা তার মিসল বা অনুরূপ হবে। আর ওয়াজিবের মিসল অর্পণ করাকে কাযা বলা হয়। তবে এ কাযাটা আদায়ের অর্থে বিবেচিত হবে। কেননা সত্তাগতভাবে গোলাম নির্দিষ্ট। আর গুণগত দিক দিয়ে অনির্দিষ্ট। কেননা এটা জানা আছে যে, মহর হল গোলাম। তবে তা কোন ধরনের গোলাম তা জানা নেই। অতএব কোন ধরনের গোলাম হবে এ ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য বিবি উচ্চ স্তরের গোলাম দাবি করবে। আর স্বামী নিম্নস্তরের গোলাম অর্পণ করার চেষ্টা করবে। আর এ উত্তম ও নিম্নমান নির্ধারণের বিষয়টি শেষ পর্যন্ত মূল্য নির্ধারণের উপর নির্ভরশীল হয়। তাছাড়া তা অনুমান করা সম্ভব হয় না।

সুতরাং মূল্যই যখন সবকিছুর ক্ষেত্রে নির্ধারক গণ্য হচ্ছে। এ কারণেই মূল্য অর্পণ করা কেমন যেন হুবহু বস্তু অর্পণ করা-ই শামিল। একারণেই মূল্য পরিশোধ করা আদায়ের অর্থে গণ্য হবে।

قوله حَتّٰى تُجْبَرَ عَلَى الْقَبُوْلِ الخ : মানার গ্রন্থকার বলেন– স্বামী যদি গোলামের স্থলে স্ত্রীকে তার মূল্য অর্পণ করে। আর স্ত্রী তা নিতে অস্বীকার করে তাহলে কাজী স্ত্রীকে মূল্য গ্রহণের ব্যাপারে বাধ্য করবেন। যেভাবে স্বামী বিবাহের সময় উল্লেখিত গোলাম অর্পণ করলে স্ত্রীকে গোলাম গ্রহণের ব্যাপারে বাধ্য করা হয়ে থাকে। মোটকথা স্ত্রীকে গোলামের মূল্য গ্রহণ করতে বাধ্য করাটা এ বিষয়ের আলামত যে, মূল্য প্রদান করা আদা বিবেচিত। কারণ আদার ক্ষেত্রে যার নিকট আদায় করা হয় (مودى له) তাকে বাধ্য করা হয়। কিন্তু কাযার ক্ষেত্রে এরূপ বাধ্য করা যায় না।

ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ رح تَفْرِيعَيْنِ لِأَبِي حَنِيْفَةَ رح عَلَى قَوْلِهِ وَهُوَ السَّابِقُ فَقَالَ وَعَلَى هٰذَا قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ رح فِي الْقَطْعِ ثُمَّ الْقَتْلُ عَمْدًا قَبْلَ الْبُرْءِ لِلْوَلِيِّ فِعْلُهُمَا اي لِأَجَلِ أَنَّ الْمِثْلَ الْكَامِلَ سَابِقٌ عَلَى الْمِثْلِ الْقَاصِرِ قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ رح فِي صُوْرَةِ قَطْعِ رَجُلٍ يَدَ رَجُلٍ عَمْدًا ثُمَّ قَتْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَبْرَأَ يَنْبَغِي لِلْوَلِيِّ أَنْ يَفْعَلَ مِثْلَ مَافَعَلَ الْقَاتِلُ فَيَقْطَعُهُ أَوَّلًا ثُمَّ يَقْتُلُهُ لِيَكُوْنَ جَزَاءُ الْفِعْلِ بِالْفِعْلِ إِذِ الْفِعْلُ مُتَعَدِّدٌ مِنَ الْقَاتِلِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُوْنَ كَذٰلِكَ مِنَ الْوَلِيِّ رِعَايَةً لِلْمِثْلِ الْكَامِلِ وَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَى الْقَتْلِ جَازَ لَهُ أَيْضًا لِأَنَّهُ عَفَا عَنْ بَعْضِ مُوْجَبِهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا عَفَا عَنْ كُلِّهِ

অনুবাদ ॥ অতঃপর মুসান্নিফ (র) وهوالسابق উক্তির প্রেক্ষিতে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দুটি শাখা মাসআলা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ***এর ওপর ভিত্তি করে ইমাম আবু হানীফা (র) বলেছেন, ইচ্ছাকৃতভাবে কর্তনের পর ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের জন্যে উভয় কার্যই জায়েয আছে।*** অর্থাৎ যেহেতু مثل كامل টা مثل قاصر এর ওপর অগ্রগণ্য, সেহেতু এ ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন যে, একজন লোক ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য এক লোকের হাত কর্তন করেছে, অতঃপর হদ কার্যকর করার পূর্বেই সে তাকে হত্যা করেছে; তবে এমন ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের জন্যে সমীচীন হবে সে অনুরূপ কাজ করবে যা হত্যাকারী করেছে। সুতরাং প্রথমতঃ সে তার হাত কর্তন করবে, অতঃপর তাকে হত্যা করবে। যাতে কৃতকর্মের প্রতিফল অনুরূপ কর্ম দ্বারাই হয়। কেননা অভিভাবকের/কর্তার কাজ অনেক অনেক। সুতরাং অভিভাবকের সমীচীন হবে مثل كامل তথা পূর্ণাঙ্গ সাদৃশ্যের বিবেচনায় অনুরূপ হওয়া। আর যদি হত্যার ওপরে সীমিত রাখা হয়, তবে এটাও শুদ্ধ হবে। কেননা সে অংশ বিশেষকে ক্ষমা করে দিয়েছে বিবেচিত হবে; যেমন সে সম্পূর্ণ ক্ষমা করার অধিকার রাখে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ تَفْرِيعَيْنِ الخ : মুসান্নিফ (র) পূর্বে উল্লেখ করেছেন যে, وهوالسابق অর্থাৎ مثل صورى তথা মিসলে কামিল مثل معنوى তথা মিসলে কাসির এর উপর অগ্রগামী। এ নীতির উপর ভিত্তি করে ইমাম আবু হানীফা (র) এর ২ টি শাখা মাসআলা উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম মাসআলা : ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন– কেউ যদি ইচ্ছাপূর্বক কারো হাত কেটে ফেলে। এরপর ক্ষত সুস্থ হওয়ার পূর্বেই হাত কর্তিত ব্যক্তিকে উক্ত ব্যক্তি হত্যা করে। তাহলে নিহতের অভিভাবকদের কর্তব্য এই যে, হত্যাকারী নিহতের সাথে যেরূপ আচরণ করেছে তারাও তার সাথে অনুরূপ আচরণ করবে। অর্থাৎ আগে তার হাত কাটবে, এরপর তাকে হত্যা করবে। যাতে কৃতকর্মের হুবহু সাজা বা বিনিময় ঘটে। আর হত্যাকারীর পক্ষ থেকে যেহেতু কর্ম একাধিক অর্থাৎ কর্তন করা এবং হত্যা করা। এ কারণে مثل صورى (মিসলে কামিল) এর প্রতি লক্ষ্য রেখে নিহতের অভিভাবকদেরও এমন করা উচিত। কিন্তু তারা যদি শুধু হত্যার উপর ক্ষান্ত করে অর্থাৎ তার হাত কর্তন না করে তাহলে তা জায়েয হবে। এর কারণ এই যে, নিহতের অভিভাবকরা হত্যাকারীর কর্মের কিছু অংশ অর্থাৎ হাত কর্তনকে ক্ষমা করে দিলো। তারা যদি পূর্ণাঙ্গ কর্ম অর্থাৎ হাত কর্তন এবং হত্যা উভয়কেই মাফ করতো তথাপি তা জায়েয হতো। সুতরাং পূর্ণাঙ্গ যেহেতু জায়েয, কাজেই আংশিকও জায়েয হবে।

وَعِنْدَهُمَا لَا يَقْتَصُّ الوليُّ إلاّ بالقَتْلِ لِأَنَّ مُوجَبَ القطع دَخَلَ فِى مُوجَبِ القَتْلِ إذا افْضَى اليه ولَمْ يَبْرأْ بَيْنَهُمَا وهٰذه المَسْالَةُ عَلى ثَمانِيَةِ اوْجُهٍ وَالمذكُورُ فِى المَتْنِ واحدٌ مِنْها وذٰلك لِأنّه لا يَخلُو اِمّا اَن يَكُوْنَ القَطْعُ وَالقتلُ عَمَديْن اوْ خَطائيْن او الاوّلُ عمدًا والثّانى خطأً او بالعَكْسِ فهى اربعةٌ وعلى كلّ تقديرٍ مِنها اِمّا ان يَتخَلّلَ بينَهُما بُرءٌ اَوْ لا فاِنْ كانَ الثّانى بَعْدَ البُرْءِ فَهُمَا جنايَتانِ اِتّفاقًا لايَتداخَلانِ سواءٌ كانَا عمديْن اَوْ خَطائيْن او كان احدُهما عمدًا والاخرُ خطأً - وانْ كان قبلَ البُرْءِ فانْ كانَ احدُهما عمدًا والاخرُ خطأً لا يتداخَلانِ اِتّفاقًا وانْ كانَا خطائيْن يتداخلانِ اِتّفاقا وان كانَا عمديْن فهو المسئلةُ الخِلافِيّةُ المذكورةُ فى المَتْنِ يتداخلانِ عندَهُما لا عندَهٗ وهٰذا كُلُّه اِذا صَدَرا عن شخصٍ واحدٍ فانْ صَدَرَ عن شخصين فَالكلامُ فيه طويلٌ يُعْرَفُ فى موضعِه -

অনুবাদ ॥ আর ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে, নিহত ব্যক্তির অভিভাবক হত্যা ছাড়া কিসাস গ্রহণ করবে না। কেননা কর্তনের পরিণতি হত্যার পরিণতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। যেহেতু কর্তন হত্যা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে এবং উভয়ের মধ্যখানে সুস্থতা লাভ করে নি। এ মাসআলাটি মূলতঃ আট প্রকার হতে পারে। মতনে মাত্র একটি উল্লেখ করা হয়েছে। এ মাসআলাটির আটটি সূরত হওয়ার কারণ হলো- কর্তন ও হত্যা নিম্নলিখিত অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। উভয়টি হয়তো ইচ্ছাকৃত হবে, অথবা এর বিপরীত তথা প্রথমটি অনিচ্ছামূলক কিন্তু দ্বিতীয়টি ইচ্ছামূলক হবে। এরূপে চার অবস্থা হলো এর প্রত্যেকটির আবার ভাগ রয়েছে। হয়তো উভয়ের মধ্যখানে সুস্থতা লাভ করবে অথবা না। দ্বিতীয়টি যদি সংজ্ঞা প্রাপ্তির পরে হয়,তবে সর্বসম্মত মতানুসারে এটা দুটি অপরাধ গণ্য হবে। একটি অন্যটির মধ্যে প্রবিষ্ট হবে না। চাই উভয়টি ইচ্ছামূলক হোক অথবা অনিচ্ছামূলক হোক অথবা একটি ইচ্ছামূলক ও অপরটি অনিচ্ছামূলক হোক।

আর যদি তা সুস্থতা প্রাপ্তির পূর্বে হয় উভয়টির একটি ইচ্ছাকৃত ও অন্যটি অনিচ্ছাকৃত হয়, তবে এ ক্ষেত্রেও সর্বসম্মত মতানুসারে একটি অপরটির অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর যদি উভয়টি অনিচ্ছাকৃত হয়, তবে তাতেও সর্বসম্মত মতে একটি অপরটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। উভয়টিই ইচ্ছাকৃত হলে তা বিরোধপূর্ণ মতনে মাসআলা উল্লিখিত হয়েছে। এক্ষেত্রে সাহেবাইনের মতে, একটি অপরটির অন্তর্ভুক্ত হবে, আর ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর উল্লিখিত সকল অবস্থায়ই যদি উক্ত ঘটনা একই ব্যক্তি কর্তৃক সংঘটিত হয়, তবে তা দীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষ; যথাস্থানেই তাজানা যাবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ সাহেবাইন (র) বলেন- উল্লেখিত ক্ষেত্রে হত্যাকারীকে কেবল হত্যা করতে হবে। তার হাত কর্তন করা যাবে না। এর দলিল এই যে, হাতের ক্ষত যখন সুস্থ হওয়ার পূর্বেই হত্যা পর্যন্ত উপনীত হয়েছে অর্থাৎ হাত কর্তনের পরে হত্যাও করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে হত্যার দ্বারা যা সাব্যস্ত হয়েছিলো অর্থাৎ হাতের কিসাস।

অতএব হত্যা দ্বারা যা ওয়াজিব হয়েছে। অর্থাৎ তার জানের কিসাস এর মধ্যে দাখিল হয়ে যাবে। আর হত্যা করা এবং হাত কর্তন করা উভয়টিকে একই অপরাধ সাব্যস্ত করা হবে। যেমন- এক ব্যক্তি কাউকে ১০ বার বেত্রাঘাত দ্বারা মেরে ফেললো। এ ক্ষেত্রেও হত্যাকারীকে কতল করা হয়। বেত্রাঘাত করার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। কারণ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ "তরবারী ছাড়া হত্যা বৈধ নয়"। মোটকথা কর্তন দ্বারা যা সাব্যস্ত হয়েছিলো তা যখন হত্যার সাব্যস্ত বিষয়ের মধ্যে শামিল রয়েছে। কাজেই হত্যাকারীকে কেবল হত্যা করতে হবে। তার হাত কর্তন করা যাবে না।

قوله وَهٰذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلٰى ثَمَانِيَةِ أَوْجُهٍ الخ : নূরুল আনওয়ার গ্রন্থকার বলেন- এ মাসআলাটির মোট ৮টি সূরত বা অবস্থা হতে পারে। তন্মধ্য হতে মতনে কেবল ১টি উল্লেখ করা হয়েছে। ১. কর্তন এবং হত্যা উভয়টি ইচ্ছাপূর্বক। ২. উভয়টি ভুলবশত। ৩. কর্তন ইচ্ছা পূর্বক এবং হত্যা ভুলবশত। ৪. কর্তন ভুলবশত এবং হত্যা ইচ্ছা পূর্বক। এই ৪টির প্রত্যেকটি ২-২ প্রকার হতে পারে। কেননা কর্তন এবং হত্যার মাঝে সুস্থতা লাভ হবে কিংবা না। অতএব ৪কে ২ দ্বারা গুণ করায় মোট ৮টি অবস্থা হলো।

উপরোক্ত এই ৮ প্রকারের বিধান : যদি সুস্থতা লাভ হওয়ার পরে দ্বিতীয় অপরাধ অর্থাৎ হত্যা পাওয়া যায় তাহলে এক্ষেত্রে কর্তন এবং হত্যা মোট ২টি অপরাধ সাব্যস্ত হবে। এ ব্যাপারে সকলেই একমত। এক অপরাধ অপর অপরাধের মধ্যে শামিল হবে না। চাই উভয়টি ইচ্ছাপূর্বক হোক বা ভুলবশত হোক। কিংবা একটি ইচ্ছাবশত এবং অপরটি ভুলবশত হোক। সুতরাং উভয় অপরাধকে ভিন্ন ভিন্ন অপরাধ গণ্য করা হবে। এবং সে অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন সাজা প্রয়োগ করা হবে।

★ উভয়টি যদি ইচ্ছাপূর্বক হয়। তাহলে অভিভাবকদের জন্য এটা জায়েয আছে যে, তারা প্রথমে হত্যাকারীর হাত কর্তন করবে। এরপর তাকে হত্যা করবে।

★ উভয়টি যদি ভুলবশত হয় তাহলে হত্যাকারীর উপর দেড় দিয়ত ওয়াজিব হবে। পূর্ণ দিয়ত হত্যার কারণে, এবং অর্ধ দিয়ত হাত কর্তনের কারণে।

★ যদি ইচ্ছাবশত হাত কর্তন করে। আর ভুলবশত হত্যা করে তাহলে হাতের ক্ষেত্রে কিসাস ওয়াজিব হবে। আর হত্যার কারণে দিয়ত ওয়াজিব হবে। এর বিপরীতে যদি কর্তন ভুলবশত হয়, আর হত্যা ইচ্ছাপূর্বক হয় তাহলে অর্ধ দিয়ত ওয়াজিব হবে। আর হত্যার কারণে কিসাস ওয়াজিব হবে।

★ যদি সুস্থতা লাভের পূর্বে দ্বিতীয় অপরাধ তথা হত্যা প্রমাণিত হয়। তাহলে এক্ষেত্রে ১টি ইচ্ছাবশত এবং অপরটি ভুলবশত হলে সর্বসম্মতিক্রমে ১ অপরাধ অপর অপরাধের মধ্যে শামিল হবে না। কেননা ইচ্ছাপূর্বক এবং ভুলবশত এ পার্থক্যের কারণে উভয় অপরাধ সম্পূর্ণ ভিন্ন। আর ভিন্ন ২ বস্তু একটি অপরটির মধ্যে শামিল হয় না। সুতরাং এখানেও তা হবে না। এ কারণে ভুলের ক্ষেত্রে দিয়ত ওয়াজিব হবে। আর ইচ্ছাপূর্বকের ক্ষেত্রে কিসাস ওয়াজিব হবে।

★ উভয়টি যদি ভুলবশত হয় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে ১ অপরাধ আরেক অপরাধের মধ্যে শামিল হবে। আর উভয়ের সমষ্টি ১ অপরাধ গণ্য হবে। অতএব ১ দিয়ত ওয়াজিব হবে।

★ উভয়টি যদি ইচ্ছাবশত হয় তাহলে মতনে উল্লেখিত মাসআলার ন্যায় তার মধ্যে ইখতেলাফ রয়েছে। এক্ষেত্রে সাহেবাইন (র) এর মতে এক অপরাধ অপর অপরাধের মধ্যে দাখিল হবে। আর আবু হানীফা (র) এর মতে দাখিল হবে না। পূর্বে এর দলিল উল্লেখিত হয়েছে।

قوله وهذا كله اذا صار الخ : ব্যাখ্যাকার (র) বলেন- এ সকল বিশ্লেষণ সে ক্ষেত্রে যখন হাত কর্তন ও হত্যা উভয়টি একই ব্যক্তি থেকে প্রকাশিত হবে। যদি ভিন্ন ২ ব্যক্তি থেকে এ ২ কাজ সংঘটিত হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এই মাসআলাটি অনেক দীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষ। সুতরাং তা স্বজায়গায় আলোচিত হবে।

وَلَا يُضْمَنُ الْمِثْلِىُّ بِالْقِيْمَةِ اِذَا انْقَطَعَ الْمِثْلُ اِلَّا يَوْمَ الْخُصُوْمَةِ تفريعٌ ثانٍ لِاَبِىْ حَنِيْفَةَ رح عَلٰى قوله وَهُوَ السَّابِقُ يَعْنِىْ اِذَا غَصَبَ شَخْصٌ مِنْ اٰخَرَ مِثْلِيًّا ثُمَّ انْقَطَعَ الْمِثْلُ وَ انْصَرَمَ عَنْ اَيْدِى النَّاسِ فَلَا جُرْمَ تَجِبُ قِيْمَتُهُ فَقَالَ اَبُو حَنِيْفَةَ رح لَا يُضْمَنُ هٰذَا الْمِثْلِىُّ بِالْقِيْمَةِ اِلَّا بِقِيْمَةِ يَوْمِ الْخُصُوْمَةِ لِاَنَّهُ مَالَمْ تَقَعِ الْخُصُوْمَةُ يَحْتَمِلُ اَنْ يَقْدِرَ عَلٰى الْمِثْلِ الصُّوْرِىِّ وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلٰى الْمِثْلِىِّ الْمَعْنَوِىِّ فَاِذَا وَقَعَتِ الْخُصُوْمَةُ فَحِيْنَئِذٍ لَابُدَّ اَنْ يَاْخُذَ الْمَالِكُ الضَّمَانَ فَيُقَدَّرُ الضَّمَانُ بِقِيْمَةِ يَوْمِ الْخُصُوْمَةِ -

অনুবাদ ॥ *যদি* مثلى *তথা সাদৃশ্য বস্তু বিলুপ্ত হয় তবে ক্ষতিপূরণ বিচারের দিনের মূল্য ব্যতীত (অন্য কোন দিনের মূল্য দ্বারা) প্রদত্ত হবে না।* এটা গ্রন্থকারের উক্তি وهو السابق এর ওপরে ইমাম আবু হানীফা থেকে বর্ণিত দ্বিতীয় শাখা মাসআলা। অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির সাদৃশ্য বস্তু ছিনতাই করে, অতঃপর সাদৃশ্য বস্তু যদি বিলুপ্ত হয় এবং জনসাধারণের হাতে তা দুষ্প্রাপ্য হয়, তবে তার মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব। ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, এ সাদৃশ্য বস্তুর ক্ষতিপূরণ কেবল বিচারের দিনের মূল্য দ্বারা প্রদান করতে হবে। কেননা যতদিন পর্যন্ত বিচার সংঘটিত না হয়, ততদিন পর্যন্ত এ সম্ভাবনা থাকে যে, সে مثل صورى তথা আকারগত সাদৃশ্য আদায়ে সক্ষম হবে। আর তা مثل معقول বা সঙ্গত সাদৃশ্য থেকে অগ্রগামী। আর যখন বিচার সংঘটিত হলো তখন মালিকের ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা অবশ্যই প্রয়োজন হলো। সুতরাং বিচারের দিনের মূল্যই ক্ষতিপূরণরূপে নির্ধারিত হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قَوْلُهُ وَلَا يُضْمَنُ الْمِثْلِىُّ بِالْقِيْمَةِ الخ : এই ইবারতে মাতিন (র) وهوالسابق (মিসলে সূরী ও মিসলে মা'নবীর উপর অগ্রগামী হয়) উক্তির উপর ২টি শাখা মাসআলা উল্লেখ করেছেন।

১. কোনো ব্যক্তি যদি অপর কোনো ব্যক্তির মিসলী বস্তু ছিনতাই করে। এরপর বাজারে তার মিসল তথা অনুরূপ বস্তু দুষ্প্রাপ্য হয়। এমনকি তা সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন হয়ে যায় তাহলে ছিনতাইকারীর উপরে নিশ্চিতরূপে উক্ত বস্তুর মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হয়। তবে এক্ষেত্রে কোন দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে يوم خصومت তথা কাজীর দরবারে যেদিন এই ব্যাপারে মামলা দায়ের হয়েছে সেদিনের মূল্য নির্ধারণ করা হবে এবং কাজী তার সিদ্ধান্ত দিলে উক্ত দিনের মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে ছিনতাইয়ের দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে। অর্থাৎ ছিনতাইকরার দিন যে মূল্য ছিলো। কাজী তা পরিশোধের সিদ্ধান্ত দিলে তা পরিশোধ করা ছিনতাইকারীর উপর ওয়াজিব হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে يوم القطاع তথা যেদিন থেকে তা বাজারে অনুপস্থিত সে দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে।

দলিল : আবু হানীফা (র) এর দলিল এই যে, কাজীর দরবারে মামলা পেশ না হওয়া পর্যন্ত এ সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে যে, ছিনতাইকারী উক্ত বস্তুর মিসল আদায় করতে সক্ষম। কারণ যে বস্তু বাজার থেকে উঠে যায় কখনো কখনো তা পাওয়াও যায়। সুতরাং এ সম্ভাবনা যেহেতু রয়েছে এবং মিসলে সূরী মা'নবীর উপর অগ্রগামী হয়। কাজেই মামলা দায়ের করার পূর্বে ছিনতাইকারীর উপর মূল্য ওয়াজিব হবে না। কিন্তু যখন মামলা দায়ের করা হলো তখন মালিক ছিনতাইকারী থেকে অবশ্যম্ভাবিরূপে তার ক্ষতিপূরণ নিবে। আর মামলা দায়েরের পূর্বে যেহেতু মিসলে সূরীর উপর সক্ষমতার সম্ভাবনা ছিলো। মামলা দায়েরের পূর্বে মিসলে মা'নবী তথা মূল্য পরিশোধের প্রশ্নই উঠতো না। কিন্তু মামলা দায়েরের দিন যখন এসে গেলো এবং ছিনতাইকারীর উপর ক্ষতিপূরণ আদায় করা জরুরি হয়ে গেলো। আর তখনও বাজারে তা অনুপস্থিত প্রমাণিত হলো। সুতরাং আজ তথা মামলা দায়েরের দিনের মূল্যের প্রতি রুজু করা হবে। সুতরাং সেদিন ব্যবসায়ীদের কাছে উক্ত বস্তুর যে বাজার দর হবে ছিনতাইকারীর উপরে উক্ত মূল্যই ওয়াজিব হবে

وعِنْدَ اَبِىْ يُوسُفَ رح تُعْتَبَرُ قِيمَةُ يَوْمِ الْغَصَبِ لِاَنَّهُ لَمَّا اَنْقَطَعَ الْمِثْلُ اِلْتَحَقَ بِمَا لاَ مِثْلَ لَهُ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ وَفِيْهَا تَجِبُ قِيْمَةُ يَوْمِ الْغَصَبِ بِالْاِتِّفَاقِ قُلْنَا الْاَصْلُ ثَمَّهُ كَانَ رَدُّ الْاَصْلِ وَاِذَا عَجِزَ عَنْهُ بِالْاِسْتِهْلَاكِ تَجِبُ قِيمَةُ ذٰلِكَ الْيَوْمِ و هٰهُنَا الاصلُ اَيْضًا رَدُّ الْعَيْنِ وَاِذَا عَجِزَ عَنْهَا يَجِبُ رَدُّ الْمِثْلِ فَاِذَا عَجِزَ عَنِ الْمِثْلِ وَظَهَرَ عِنْدَ الْقَاضِى تَجِبُ عَلَيْهِ قِيْمَةُ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رح تَجِبُ عَلَيْهِ قِيْمَةُ يَوْمِ الْاِنْقِطَاعِ لِاَنَّ الْعَجْزَ عَنِ الْاَصْلِ اِنَّمَا يَتَحَقَّقُ فِىْ هٰذَا الْيَوْمِ قُلْنَا نَعَمْ وَلٰكِنْ يَظْهَرُ ذٰلِكَ الْعَجْزُ وَقْتَ الْخُصُومَةِ -

---

অনুবাদ ॥ আর ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ছিনতাইয়ের দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে। কেননা যখন সাদৃশ্য বিলুপ্ত হয়ে গেছে তখন তা ঐ বস্তুর তুল্য হয়ে গেছে যা সাদৃশ্যহীন মূল্য বিশিষ্ট। আর সর্বসম্মত মতানুসারে এতে ছিনতাই করার দিনের মূল্য ওয়াজিব হয়। আমরা এর উত্তরে বলবো যে, মূলবস্তু ফেরত দেয়াই এখানে মৌলিক বিধান। সে যখন তা ধ্বংস করে দেয়ার কারণে ফেরত দিতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই এ দিনের মূল্য পরিশোধ করাই তার ওপর ওয়াজিব হবে। এ ক্ষেত্রে মূল বস্তুটি ফেরত দেয়াই মৌলিক বিধান। সে যদি তা ফেরত দিতে অপারগ হয় এবং তা বিচারকের কাছে প্রকাশিত হয়, তবে সেই দিনের মূল্য দেয়া তার ওপর ওয়াজিব হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে, উক্ত বস্তু নিঃশেষ হওয়ার দিনের মূল্য প্রদান করা ওয়াজিব হবে। কেননা প্রকৃত বস্তু ফেরত দেয়া থেকে অক্ষম হওয়া সে দিনই সাব্যস্ত হয়েছে। আমরা এর উত্তরে বলবো যে, হ্যাঁ তবে অপারগতা বিচারের দিনেই প্রকাশিত হয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ **ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর দলিল :** বাজার থেকে ছিনতাইকৃত দ্রব্যের মিসল যেদিন থেকে নিঃশেষ হয়েছে তখন থেকেই ছিনতাইকৃত বস্তু ذوات القيم দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ ذوات القيم এর যেভাবে কোন মিসল থাকে না। তদরূপ এরও কোনো মিসল নেই। কাজেই ذوات القيم এর মতো সর্বসম্মতিক্রমে ছিনতাই এর দিনের মূল্য ওয়াজিব হবে। আমাদের পক্ষ থেকে এর উত্তর এই যে, মিসলী বস্তুকে ذوات القيم এর উপর কিয়াস করা এবং সে ধরনের দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত করা বৈধ নয়। কারণ ذوات القيم এর মধ্যে আসল হলো মূল বস্তুকে মালিকের নিকট অর্পণ করা; কিন্তু যখন তা বিনষ্ট করার কারণে ফেরত দিতে অক্ষম হয়ে গেছে। কাজেই ছিনতাইয়ের দিনের মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে। এ মাসআলায় ছিনতাইকৃত দ্রব্য যেহেতু ذوات الامثال এর অন্তর্ভুক্ত নয়; কাজেই তার মিসল ফেরত দেয়া ওয়াজিব হবে না।

قوله ذَوَاتُ الْاَمْثَالِ : এ ক্ষেত্রে ক্রমধারাএই যে, ছিনতাইকারী হুবহু বস্তু ফেরত দিবে। এ ব্যাপারে অক্ষম হলে তার মিসল ফেরত দেয়া ওয়াজিব। কিন্তু বাজারে তার মিসল বিদ্যমান না থাকার কারণে ফেরত দিতে অসমর্থ হলে এবং কাজীর কাছে তা সুস্পষ্ট হলে মামলার দিনে তার যা মূল্য হবে সে পরিমাণ মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) এর দলিল : ذوات الامثال এর মধ্যে ছিনতাইকারীর উপর মূল্য দ্বারা ক্ষতিপূরণ দেয়া ঐসময় ওয়াজিব হবে যখন ছিনতাইকারী মিসল আদায় করতে অসমর্থ হবে। আর তার এ অসমর্থ হওয়াটা তার মিসল নিঃশেষ হওয়ার দিন সাব্যস্ত হবে। অতএব অসমর্থ হওয়াটা যেহেতু নিঃশেষ হওয়ার দিন সাব্যস্ত হচ্ছে। কাজেই সেদিনের মূল্য ধর্তব্য ও ওয়াজিব হবে।

উত্তর : ইমাম মুহাম্মদ (র) এর উক্তি সঠিক যে, নিঃশেষ হওয়ার দিন তার অক্ষমতা সাব্যস্ত হচ্ছে। তবে মামলার দিন তা সুস্পষ্ট হচ্ছে। কাজেই যেদিন অক্ষমতা স্পষ্ট হচ্ছে সেদিনের মূল্য ধর্তব্য করা ওয়াজিব হবে।

ثُمَّ اِنَّهٗ لَمَّا نَشَاَتْ مِنْ هٰذَا كُلِّه مُقَدِّمَةٌ وهى اَنَّ الضَّمَانَ لا يجبُ لا عِنْدَ وُجُودِ الْمُمَاثَلَةِ سَوَاءٌ كانت كاملةً او قاصرةً صُورَةً او معنًى فَرَّعَ عليها المصنِّفُ رح ثَلٰثَ مَسائِلَ على طِبْقِ مَذهبِه مُخَالِفًا لِلشَّافعىِّ رح و ان لَم تكُنْ تِلك المُقَدِّمَةُ مذكورةً فِى المَتنِ -فقال وقُلْنا جَمِيْعُ المَنَافِعِ لا تُضْمَنُ بِالْاِتْلَافِ وهو عطفٌ على قوله قال ابو حنيفة رح اَىْ وَمِنْ اَجْلِ انَّ مَا لا يُعْقَلُ لَهُ مِثْلٌ لا يُضْمَنُ شرعًا قُلنا جميعًا يعنى ابا حنيفةَ رح وابا يُوْسفَ ومحمدًا رح بِخِلَافِ الشَّافعىِّ رح لا يُضْمَن مَنَافِعُ ما غَصَبَه رجلٌ بِالْاِتْلافِ وكذا بالْاِمْسَاكِ وصُوْرَتُها رَجُلٌ غَصَبَ فَرَسًا لِاَحَدٍ وَرَكِبَهُ عِدَّةَ مَرَاحِلَ او حَبَسَهٗ فِى بَيْتِه ولَمْ يَرْكَبْ لَمْ يُرْسِلْ فقال عُلَماؤُنا جميعًا انه لا تُضْمَنُ هٰذه المَنَافِعُ بِشَىْءٍ امَّا بِالْمَنَافِعِ فظاهِرٌ لِاَنَّهٗ لَوْضَمِنَ بالمَنَافِعِ لَكانَ بِانْ يَرْكَبَ المَالِكُ دابَّةَ الغَاصِبِ قدرَ ما رَكِبَ الغاصِبُ او يَحْبِسَه قدرَ مَا حبسه الغاصبُ -

وذٰلك باطلٌ لِلتَّفَاوُتِ بَيْنَ راكِبٍ وراكِبٍ وبَيْنَ سَيْرٍ وسَيْرٍ وحَبْسٍ وحَبْسٍ واَمَّا بِالْاَعْيَانِ وَالْمَالِ فَلِاَنَّ الْمَنَافِعَ عَرَضٌ لا يَبْقَى زَمانَيْنِ وغيرُ مُتَقَوَّمٍ بِخِلَافِ الْمَالِ فلاتماثُلَ بَيْنَهُمَا وانَّما ضَمَّنَّاها بِالْمَالِ فى الْاِجَارَةِ لِاَنَّ لِلرِّضَا تاثيرًا فِى اِيْجَابِ الْاُصُوْلِ وَالْفُصُوْلِ جميعًا ولَا تاثِيْرَ لِعُدْوَانٍ فيه والشافعىُّ رح يَقُوْلُ بِضَمانِها بِالمال بِقَدْرِ العُرْفِ فِى كِرائها اِلٰى ذٰلك المَنْزِلِ قِياسًا على الْاِجارةِ وَالْوَجْهُ مَا قُلْنَا

অনুবাদ ॥ অতঃপর যখন উল্লিখিত এসব বিষয় থেকে একটি ভূমিকা বা মূলনীতি সাব্যস্ত হলো যে, সাদৃশ্যতার অস্তিত্ব ব্যতিত ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না, চাই তা صورى হোক অথবা معنوى । তাই গ্রন্থকার (র) এর ওপর ভিত্তি করে ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতের বিপরীতে তিনটি শাখা মাসআলা বর্ণনা করেছেন। যদিও উক্ত মূলনীতি মতন তথা মূল ভাষ্যে উল্লিখিত হয়নি।

মুসান্নিফ (র) বলেন- ***আমরা সকলেই এ কথা বলি যে, বিনষ্টকরণের কারণে মুনাফার ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না।*** এ অংশটুকু গ্রন্থকারের অন্য উক্তি قال ابو حنيفة (رحـ) এর ওপরে আত্ফ হয়েছে। অর্থাৎ যেহেতু যে সকল বস্তুর সাদৃশ্যতা বিবেকসম্মত নয়, শরীআতের মতে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না; সেহেতু আমরা সকলেই অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা (র), ইমাম আবু ইউসূফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র), ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতের বিপরীত বলেছি যে, কোন ব্যক্তি ছিনতাইকৃত বস্তু বিনষ্টকরণের কারণে, কিংবা ছিনতাইকৃত বস্তু আবদ্ধ রাখার কারণে তার মুনাফার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। মাসআলার বিবরণ এই যে, (যেমন) কেউ কারো ঘোড়া আত্মসাৎ করে তাতে কয়েক মনযিল পথ আরোহণ করলো, অথবা সে তাকে স্বীয় গৃহে আবদ্ধ করে রাখলো তবে তার ওপরে আরোহণ করলো না, তাকে ছেড়েও দিল না, (এ ব্যাপারে) আমাদের সকল মনীষী বলেন- এ মুনাফার কোন বস্তু দ্বারাই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। মুনাফার ক্ষতিপূরণ মুনাফার দ্বারা না দেয়ার কারণ সুস্পষ্ট। কেননা যদি মুনাফার ক্ষতিপূরণে দায়বদ্ধ হয়, তবে অবশ্যই তা এমন হবে যে, মালিক ছিনতাইকারীর ঘোড়ায় তত পরিমাণ পথ আরোহণ করবে। অথবা তত পরিমাণ ঘোড়াকে আটকে রাখবে, যত পরিমাণ ছিনতাইকারী মালিকের ঘোড়াটিকে আটকে রেখেছিল।

আর এমন বাতিল বা অগ্রহণযোগ্য, কেননা আরোহীতে আরোহীতে, ভ্রমণ-ভ্রমণে এবং আবদ্ধতায়-আবদ্ধতায় পার্থক্য রয়েছে। আর দৃশ্যমান বস্তু বা মাল দ্বারা ক্ষতিপূরণ দেয়া যাবে না। কারণ মুনাফা হলো ক্ষণস্থায়ী। এটা মূল্যযোগ্য নয়। কিন্তু মাল এর বিপরীত। সুতরাং উভয়ের মধ্যে কোন সাদৃশ্য হতে পারে না। অবশ্য ইজারার ক্ষেত্রে মাল দ্বারা মুনাফার ক্ষতিপূরণ প্রদানের অভিমত আমরা ব্যক্ত করেছি ভিন্ন কারণে। কেননা মৌলিক বস্তু অতিরিক্ত বস্তু উভয়ের মধ্যে সম্মতির বিরাট প্রভাব রয়েছে। এক্ষেত্রে সীমালংঘনের কোন প্রভাব নেই। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, ইজারার ওপর কিয়াস করে এ ক্ষেত্রে মুনাফার ক্ষতিপূরণ মাল দ্বারা এ পরিমান দেয়া হবে, যা ওরফে সচরাচর পরিমাণ পথের ভাড়া হয়ে থাকে। এর মূল কারণ এটাই যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এ ক্ষেত্রে তোমার জন্যে অবশ্যই প্রয়োজন মুনাফা এবং অতিরিক্তের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে জানা।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ قوله ثُمَّ اِنَّهُ لَمَّا نَشَاتْ مِنَ الخ : মোল্লা জিয়ন (র) বলেন– পূর্বের বিশ্লেষণ দ্বারা একটি মূলনীতি বোঝা গেছে। তা এই যে, কোনো বস্তুর ক্ষতিপূরণ ঐ সময়ই ওয়াজিব হয় যখন তার কোনো مثل তথা সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকে। চাই তা কামিল হোক বা কাসির। রূপগত হোক কিংবা মূল্যের দিক দিয়ে। যদি কোনো প্রকার مثل বিদ্যমান না থাকে তখন তার ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না।

মুসান্নিফ (র) নিজ মাযহাব মোতাবেক ইমাম শাফেয়ী (র) এর খেলাফ এ মূলনীতির উপর ৩ টি মাসআলা আলোচনা করছেন। মূল্যনীতিগুলো যদিও মতনে সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই।

প্রথম মাসআলা : হানাফী আলিমগণের মতে منافع তথা উপকারীতা বিনষ্ট করার ক্ষেত্রে তার ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না। এভাবে বিনষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রেও তার ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়।

উদাহরণস্বরূপ এক ব্যক্তি কারো ঘোড়া ছিনতাই করে কয়েক মনযিল পর্যন্ত তার উপর আরোহণ করলো, কিংবা ছিনতাইকারী ঘোড়াকে তার নিজ গৃহে আবদ্ধ রাখলো; তার উপর সওয়ার হলো না এবং ছেড়েও দিলো না। এক্ষেত্রে হানাফী আলিমগণ বলেন কোনো বস্তু দ্বারা এ উপকারীতার ক্ষতিপূরণ দেয়া যাবে না। উপকারীতার ক্ষতিপূরণ উপকারিতা দ্বারা পরিশোধ না করার ব্যাপারটি সুস্পষ্ট। কারণ উপকারীতা দ্বারা ক্ষতিপূরণ দেয়া ঐক্ষেত্রে হবে যখন মালিক ছিনতাইকারীর ঘোড়ার উপর অতটুকু দূরত্ব পরিমাণ আরোহণ করাবে যে পরিমাণ ছিনতাইকারী ছিনতাইকৃত ঘোড়ার উপর আরোহণ করেছিলো।

অথবা মালিক ছিনতাইকারীর ঘোড়াকে ঐ সময় পর্যন্ত আবদ্ধ রাখবে যতোক্ষণ পর্যন্ত ছিনতাইকারী মালিকের ঘোড়াকে আবদ্ধ রেখেছিলো। আর এমনটা বাতিল। কারণ মালিকের ঘোড়ার দ্বারা ছিনতাইকারী যে উপকার লাভ করেছিলো বা তার যে উপকারীতা আবদ্ধ রেখেছিলো তার মাঝে এবং উপকারীতার মাঝে অথবা মালিক যে উপকারীতা আটকে রেখেছে এর মধ্যে কোনো مُمَاثلت (সামঞ্জস্যতা) নেই।

কারণ ২ ঘোড়ায় আরোহণের মধ্যে অনেক ব্যবধান থাকতে পারে। যেমন এক সওয়ার আরোহণের সকল নিয়মনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত। আর অপরটি সম্পূর্ণ এর বিপরীত। সে আরোহণের কোনো নীতি সম্পর্কে আদৌ অবগত নয়। কাজেই প্রথম ঘোড়ায় আরোহণের দ্বারা লোকটির কোনো কষ্ট অনুভব হবে না। আর দ্বিতীয়টির উপর আরোহণ দ্বারা নিজেও মরবে এবং পশুকেও কষ্ট দিবে।

এভাবে ২টি বাহনের চলার মধ্যেও বহু ব্যবধান হয়ে থাকে। কারণ একটি পশু এমনও হতে পারে যার দ্বারা সওয়ারীর কোনো ক্লেশ অনুভব হয় না। আর অপরটি দ্বারা কষ্টক্লেশ অনুভব হতে পারে। এভাবে রাস্তার তারতম্যেও সওয়ারীর মধ্যে তারতম্য হয়ে থাকে। এভাবে আবদ্ধ রাখার মধ্যেও তারতম্য হতে পারে। যেমন এক কয়েদখানায় ঘাস, পানি, বাতাস ইত্যাদির সকল সুযোগ সুবিধা থাকে। কিন্তু অপরটিতে এমন সুবিধা নাও থাকতে পারে।

মোটকথা উভয় সওয়ার, চাল-চলন, কয়েদখানা ইত্যাদির মধ্যে পারস্পরিক তারতম্য থাকে। কাজেই ছিনতাইকারীর লাভকৃত উপকারীতা এবং মালিকের লাভকৃত উপকারীতার মধ্যে কিভাবে সামঞ্জস্যতা হতে পারে?

সুতরাং এ দুইয়ের মধ্যে যেহেতু সামঞ্জস্যতা নেই। কাজেই ছিনতাইকারী যে উপকারীতা বিনষ্ট করেছে তার উপর উক্ত উপকারীতার ক্ষতিপূরণ দেয়া ওয়াজিব হবে না।

কারণ ক্ষতিপূরণ সেই ক্ষেত্রেই ওয়াজিব হয় যার কোনো মিসল বিদ্যমান থাকে। চাই তা كامل হোক বা قاصر এবং বাহ্যিক (সূরী) হোক বা পরোক্ষ (মা'নবী) হোক। আর হুবহু বস্তু কিংবা মাল দ্বারা মালিকের ক্ষতিপূরণ দেয়াও সম্ভব নয়। কেননা ছিনতাইকারী কেবল উপকারীতা বিনষ্ট করেছে। আর উপকারীতা কোনো বস্তু নয়। বরং عرض যা অন্যের উপর নির্ভরশীল তা কখনো দু সময়ে অবশিষ্ট থাকে না। আর যা অবশিষ্ট থাকে না তা সঞ্চিত করা সম্ভব নয়। কাজেই যে বস্তু غير مُحْرَز হয় (তথা সঞ্চিত রাখা যায় না) তা মূল্যহীন ধর্তব্য হয়।

অতএব ফলাফল এই হলো যে, উপকারীতা মূল্যহীন বিষয়। আর মাল এবং হুবহু বস্তু হলো متقوم তথা মূল্যবান। আর মূল্যবান ও মূল্যহীনের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্যতা থাকে না। এ কারণে উপকারীতা এবং মালের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্যতা হবে না। কাজেই ছিনতাইকারী যখন উপকারীতা বিনষ্ট করলো তখন ছিনতাইকারীর উপর মাল এবং হুবহু বস্তু দ্বারা ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। কারণ ক্ষতিপূরণ ঐসময়ই ওয়াজিব হয় যখন তার কোনো মিসল বিদ্যমান থাকে। চাই তা কামিল হোক বা কাছির এবং সূরী হোক বা মা'নবী।

قوله وإنما ضمناها بالمال في الإجارة الخ : এর দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে।

প্রশ্ন : منافع বা উপকারীতা নিঃসন্দেহে আরজের অন্তর্গত যা غير متقوم বা মূল্যহীন এবং বিদ্যমানশীল নয়। তবে শরীআতে তার জন্য বিদ্যমানশীল বস্তুর বিধান দিয়েছে। যেমন منافع বা উপকারীতার উপর আকদে ইজারা সূচিত হয়। অর্থাৎ ইজারার কারণে উপকারীতা মালের দ্বারা ক্ষতিপূরণীয় হয়ে থাকে। যার কারণে কোনো ব্যক্তি যদি কারো একটি ঘোড়া ১০ কি. মি. পর্যন্ত আরোহণের জন্য ২০ টাকায় ভাড়া নেয়। তাহলে ভাড়া গ্রহিতা যখন ১০ কি. মি. এর বাহন তথা তার উপকারীতা গ্রহণ করবে তখন তার উপর এর পরিবর্তে ২০ টাকা দেয়া ওয়াজিব হবে। সুতরাং ইজারার মধ্যে যেরূপ উপকারীতা মালের সাথে ক্ষতিপূরণীয়; এভাবে ছিনতাইয়ের মধ্যেও ছিনতাইকারীর উপর উপকার গ্রহণের ক্ষতিপূরণ মাল দ্বারা পরিশোধ করা ওয়াজিব হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিলো।

উত্তর : ইজারার মধ্যে খেলাফে কিয়াস পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে منافعকে মূল্যবান সাব্যস্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ পারস্পরিক সন্তুষ্টির দ্বারা আছল এবং فضل (উপকার) উভয়ই ওয়াজিব হয়ে থাকে। যেমন কেউ ১ হাজার টাকার মূল্যের গোলাম ১০ হাজার টাকায় বিক্রি করলো। তাহলে ক্রেতার উপর আছল তথা ১ হাজারই ওয়াজিব হবে। আর فضل তথা ৯ হাজারও ওয়াজিব হবে। এভাবে পারস্পরিক সম্মতি দ্বারা যা মাল নয় এমন বস্তুর মোকাবেলায়ও মাল ওয়াজিব হয়ে থাকে। যেমন ইচ্ছাপূর্বক হত্যার ব্যাপারে সন্ধির ক্ষেত্রে হত্যাকারীর উপর মাল ওয়াজিব হয়ে থাকে। অথচ এটা কিসাস যা মাল নয় তার মোকাবেলায় হচ্ছে। যদি ১ হাজার টাকা মূল্যের গোলামকে কেউ অপহরণ করে তাহলে অপহরণকারীর উপর কেবল আসল মূল্য ১ হাজার টাকা ওয়াজিব হবে। فضل অর্থাৎ ৯ হাজার টাকা ওয়াজিব হবে না। কারণ অপহরণের মধ্যে পারস্পরিক সম্মতি থাকে না। বরং সেখানে জুলুম ও সন্ত্রাস বিদ্যমান থাকে। আর এক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ বা জরিমানা ওয়াজিব হয় তবে উপকারের ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না।

সারকথা এই যে, ইজারার মধ্যে যেহেতু পারস্পরিক সম্মতিক্রমে منافع খেলাফে কিয়াস মূল্যবান বিবেচিত। আর খেলাফে কিয়াস বস্তুর উপর অন্য কিছুকে কিয়াস করা যায় না। একারণে ইজারার উপর ছিনতাইয়ের বিষয়টিকে কিয়াস করা যাবে না। এটাকে মোল্লা জুয়ুন (র) নিজ ভঙ্গিতে এভাবে বলেছেন যে, সম্মতিকে اصل وفضل ওয়াজিব করার মধ্যে বড়ই ভূমিকা রয়েছে। তবে عدوان তথা জুলুম ও সন্ত্রাসের ব্যাপারে এর কোনো ভূমিকা নেই।

ইমাম শাফেয়ী (র) ইজারার উপর এ মাসআলাকে কিয়াস করে বলেন– ছিনতাইকারীর উপর মাল দ্বারা منافع এর ক্ষতিপূরণ এ পরিমাণই ওয়াজিব হবে যে পরিমাণ সমাজে প্রচলিত। অর্থাৎ নির্দিষ্ট মঞ্জিল পর্যন্ত সওয়ারীর যা ভাড়া থাকে তাই ওয়াজিব হবে। কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে ইজারাও ছিনতাইয়ের মধ্যে পার্থক্যের বর্ণনা উল্লেখিত হয়েছে। উক্ত পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে উভয় মাসআলায় ব্যবধান হয়ে থাকে।

وَلابُدَّ لَكَ حِيْنَئِذٍ مِن الفَرْقِ بَيْنَ المَنَافِعِ والزَّوائِدِ فَالمَنَافِعُ كَرُكُوْبِ الدَّابَّةِ والحَمْلِ عليْهَا والزَّوائِدُ كَالنَّسْلِ للدَّابّةِ واللَّبَنِ لها والثَّمرَةِ للشَّجَرَةِ ونَحْوِها فَالمَغْصوبُ بِنَفْسِه يُضْمَنُ بالهَلاكِ والاِسْتهلاكِ جميعًا والزَّوائِدُ تُضْمَنُ بِالاِسْتِهلاكِ دُوْنَ الهَلاكِ والمَنَافِعُ لاَ تُضْمَنُ بِالْاِسْتِهلاكِ وَالهَلاكِ فعَبَّرَ المُصَنِّفُ عَنِ الْاِسْتهلاكِ بِالْاِتْلافِ ولَمْ يذكر الْهَلاكَ وهُوَ الحَبْسُ وهو غَيْرُ مَضمونٍ قِيَاسًا علَى الزَّوائِدِ فَانَّ الزَّوائِدَ لمَا لم تُضْمَنْ بِالْهَلاكِ فالمَنافِعُ اَوْلَى اَن لاَ تُضْمَنَ بِهِ هٰذا الفرقُ مِمَّا يَتَخَبَّطُ فيْه كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ -

অনুবাদ ॥ সুতরাং মুনাফা হলো যেমন- জন্তুর ওপর আরোহণ করা এবং তদ্দারা বোঝা বহন করানো। আর زوائد বা অতিরিক্ত হলো যেমন- জন্তুর বাচ্চার প্রজনন, জন্তুর দুগ্ধ, গাছের ফল ইত্যাদি। সুতরাং ছিনতাইকৃত বস্তুর ক্ষতিপূরণ প্রদত্ত হবে তা ধ্বংস হওয়া এবং ধ্বংস করা উভয় অবস্থায়। আর زوائد এর ক্ষতিপূরণ ধ্বংস করার ক্ষেত্রে প্রদত্ত হবে, ধ্বংস হওয়ার ক্ষেত্রে নয়। ধ্বংস করা এবং ধ্বংস হওয়ার ক্ষেত্রে মুনাফার ক্ষতিপূরণ প্রদত্ত হবে না। সুতরাং গ্রন্থকার (র) استهلاك দ্বারা এই اتلاف বা ধ্বংসকরণকেই উদ্দেশ্য করেছেন। তিনি ধ্বংস হওয়া সম্পর্কে (কিছুই) বলেন নি; যা হলো আবদ্ধ রাখা। অতিরিক্তের ওপর কিয়াস করে তা ক্ষতিপূরণের অযোগ্য সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা زوائد যখন ধ্বংস হওয়ার কারণে ক্ষতিপূরণযোগ্য হবে না, তখন ধ্বংস হওয়ার কারণে ক্ষতিপূরণ প্রদান না করা অধিক অগ্রগণ্য। মুনাফা এবং زوائد এর মধ্যকার এ পার্থক্যে নির্ণয়ে অনেকেই ভুল করে থাকে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ নুরুল আনওয়ার গ্রন্থকার বলেন- منافع এবং زوائد এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা জরুরি। আপনারা এটা এভাবে বুঝতে পারেন যে, একটি বিষয় হলো আছল বা মূল। আর একটি হলো অতিরিক্ত। আর একটি হলো منافع বা উপকারীতা। যেমন মহিষ হলো আসল বস্তু। আর তার বাচ্চা ও দুধ অতিরিক্ত বস্তু। পশুর উপর সওয়ার হওয়া, তার উপর বোঝা চাপানো ইত্যাদি হলো উপকারীতা গ্রহণ। গাছের ফলও অতিরিক্ত বিষয় গণ্য হয়। এগুলোর মধ্যে সর্বাধিক শক্তি হলো আছল বা মূলের। তারপর অতিরিক্ত বিষয়ের, সর্বশেষ হলো উপকার গ্রহণের। এই তিনোটির বিধানও ভিন্ন ভিন্ন। যেমন مغصوب بنفسه তথা যে মূল বিষয়কে ছিনতাই করা হয় তা বিনষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রেও ক্ষতিপূরণীয় হয়ে থাকে এবং বিনষ্ট করার ক্ষেত্রেও। আর অতিরিক্ত বস্তু বিনষ্ট করার দ্বারাও ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়। তবে নিজে নিজে বিনষ্ট হলে তার ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না। যেমন এক ব্যক্তি কারো গাভী ছিনতাই করলো গাভী ছিনতাইয়ের পর সে বাচ্চা প্রসব করলো। এখন ছিনতাইকারী যদি গাভীর বাচ্চা নষ্ট করে ফেলে তাহলে তার উপর তার জরিমানা ওয়াজিব হবে। আর যদি বাচ্চা নিজে নিজে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ছিনতাইকারীর উপর এর কোনো জরিমানা ওয়াজিব হবে না। আর কোন বস্তুর উপকার বিনষ্ট করার দ্বারা তা ক্ষতিপূরণীয় হয় না এবং বিনষ্ট হওয়ার দ্বারাও তা ক্ষতিপূরণীয় হয় না। যেমন ছিনতাইকারী কোনো বাহনের পশু ছিনতাই করে তার উপর কাউকে আরোহণ করালো বা তাকে এমনিই নিজের কাছে আটকে রাখলো। উভয় ক্ষেত্রে ছিনতাইকারীর উপর এর কোনো ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না।

ব্যাখ্যাকার বলেন- মুসান্নিফ (র) এই استهلاك তথা নষ্ট করাকে নিজের ভাষায় اتلاف বা زوائد দ্বারা প্রকাশ করেছেন। আর বিনষ্ট হওয়াকে অর্থাৎ আটকে রাখাকে যার মধ্যে ক্ষতিপূরণ নেই। অতিরিক্তের উপর কিয়াস করে তা উল্লেখ করেননি। কারণ অতিরিক্ত বস্তু যা উপকারীতার তুলনায় শক্তিশালী তা বিনষ্ট হওয়ার দ্বারা যেহেতু ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না। কাজেই উপকারীতার ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হওয়াই স্বাভাবিক। ব্যাখ্যাকার বলেন- منافع ও زوائد তথা উপকারীতাও অতিরিক্তের মাঝে এমন পার্থক্য রয়েছে যে ব্যাপারে অনেক মানুষ ভুল করে থাকে। কাজেই তা উত্তমরূপে বোধগম্য করা বাঞ্ছনীয়।

وَالْقِصَاصُ لَا يُضْمَنُ بِقَتْلِ الْقَاتِلِ تَفْرِيعٌ ثَانٍ لَنَا عَلَى أَنَّ مَا لَا مِثْلَ لَهُ لَا يُضْمَنُ اصْلًا يَعْنِى اَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ قِصَاصٌ لِغَيْرِهِ فَقَتَلَ الْقَاتِلَ اَجْنَبِىٌّ غَيْرَ وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ فَلَا يَضْمَنُ هٰذَا الْاَجْنَبِىُّ لِاَجْلِ وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ شَيْئًا مِنَ الدِّيَةِ وَالْقِصَاصُ عِنْدَنَا وَاِنْ كَانَ يَضْمَنُ لِاَجْلِ وَرَثَةِ هٰذَا الْقَاتِلِ اَلْبَتَّةَ وَذٰلِكَ لِاَنَّ الْقِصَاصَ مَعْنًى غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ فِى نَفْسِهِ لَا يُعْقَلُ لَهُ مِثْلٌ حَتّٰى تَقُوْلَ اِنَّ الْاَجْنَبِىَّ ضَيَّعَ قِصَاصَهُ فَتَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَمَا قَالَ الشَّافِعِىُّ رح

অনুবাদ ॥ *আর হত্যাকারীকে হত্যা করার কারণে কিসাসের ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না।* এটা আমাদের দ্বিতীয় শাখা মাসআলা, এই কথার ওপর যে, যে বস্তুর কোন সাদৃশ্যতা নেই তার কোন ক্ষতিপূরণ নেই। অর্থাৎ, যার ওপরে কিসাস ওয়াজিব হয়েছে, তাকে হত্যাকৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ ব্যতীত অন্য কোন লোক হত্যা করলে হত্যাকৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদেরকে আমাদের মতে কোন দিয়ত এবং প্রতিহত্যার ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে না। যদিও সে এ হত্যাকারীর ওয়ারিশদেরকে এটা ক্ষতিপূরণ প্রদানের অবশ্যই দায়বদ্ধ হবে।

কেননা কিসাস এমন বস্তু যা নিজেই মূল্যযোগ্য নয়, এর এমন কোন যুক্তিসঙ্গত সাদৃশ্য নেই, যাতে আপনি বলতে পারেন, তৃতীয় এ ব্যক্তিটি হত্যাকৃতের কিসাসকে ধ্বংস করেছে। সুতরাং, তার ওপরে রক্তপণ ওয়াজিব হবে। যেমন ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله وَالْقِصَاصُ لَا يُضْمَنُ بِقَتْلِ الخ : **দ্বিতীয় মাসআলা :** পূর্বে উল্লেখিত মূলনীতি অর্থাৎ যে জিনিসের مماثل তথা অনুরূপ বস্তু না থাকে তার ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না। এই ইবারতে এ বিষয়ের উপর দ্বিতীয় মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে।

মাসআলার সার : উদাহরণ স্বরূপ শাহিদ নামক ব্যক্তি আরিফকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করলো। এর দরুন শাহিদের উপর কিসাস ওয়াজিব হলো। কিন্তু নিহত আরিফের ওয়ারিশগণ ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি হত্যাকারী শাহিদকে হত্যা করে ফেললো। তাহলে এই তৃতীয় ব্যক্তির উপর প্রথম নিহত অর্থাৎ আরিফের ওয়ারিশেরদের জন্য দিয়ত বা কিসাস কোনো প্রকারের কোনো ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। অবশ্য এই তৃতীয় ব্যক্তির উপর প্রথম নিহত অর্থাৎ আরিফের হত্যাকারী (শাহিদ) যে দ্বিতীয় নিহত তার ওয়ারিশদের জন্য ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

দলিল : কিসাস অর্থাৎ হত্যাকারীর জীবন প্রকৃতপক্ষে মূল্যহীন বিষয়। এর এমন কোনো যুক্তিযুক্ত مثل নেই যে কারণে তুমি বলবে যে, তৃতীয় ব্যক্তি প্রথম নিহত অর্থাৎ আরিফের কিসাসকে বিনষ্ট করেছে। কাজেই এর উপর প্রথম নিহতের ওয়ারিশদের উপর দিয়ত ওয়াজিব হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেমন ইমাম শাফেয়ী (র) বলে থাকেন।

ইমাম শাফেয়ী (র) এর উক্তির সারমর্ম এই যে, উল্লেখিত তৃতীয় ব্যক্তি যে নিহত শাহিদকে হত্যা করেছে তার উপর প্রথম নিহত আরিফের ওয়ারিশদের জন্য দিয়ত ওয়াজিব হবে। কেননা হত্যাকারী শাহিদের উপর ওয়াজিব কিসাস প্রথম নিহত আরিফের ওয়ারিশদের জন্য মূল্যবান মালিকানাধীন বস্তু যেভাবে ভুলবশত হত্যার ক্ষেত্রে জীবনের ক্ষতিপূরণ মাল দ্বারা আদায় করা হয়। সুতরাং ভুলবশত হত্যার মধ্যে হত্যাকারীর জীবন যেরূপ মূল্যবান তদ্রূপ ইচ্ছাপূর্বক হত্যার মধ্যেও হত্যাকারীর জীবন মূল্যবান হবে। আর ইচ্ছাপূর্বক হত্যার মধ্যে হত্যাকারীর জীবন প্রথম নিহত আরিফের ওয়ারিশদের মালিকানা স্বত্ব। তৃতীয় ব্যক্তিটি উক্ত মালিকানা স্বত্বকে বিনষ্ট করেছে। কাজেই তার উপর প্রথম নিহত আরিফের ওয়ারিশদের জন্য তার ক্ষতিপূরণ তথা দিয়ত ওয়াজিব হবে।

وَانَّمَا يُتَقَوَّمُ فِى حَقِّ الدِّيَةِ فِيمَا لا يُمْكِنُ الْمُمَاثَلَةُ فِيْهِ لِئَلَّا يَلْزَمَ إِهْدَارُ الدَّمِ بِالْكُلِّيَّةِ ضَرُورَةً وَهٰهُنَا الْاَجْنَبِىُّ مَا ضَيَّعَ لِاَوْلِيَاءِ الْمَقْتُوْلِ شَيْئًا بَلْ قَتَلَ عَدُوَّهُمْ فَكَانَّهُ اَعَانَهُمْ نَعَمْ يَضْمَنُ ذٰلِكَ لِاَجْلِ اَوْلِيَاءِ هٰذَا الْقَاتِلِ اِمَّا قِصَاصًا وَاِمَّا دِيَةً عَلٰى حَسْبِ مَا تَحَقَّقَ وَمِلْكُ النِّكَاحِ لا يُضْمَنُ بِالشَّهَادَةِ بِالطَّلَاقِ بَعْدَ الدُّخُوْلِ تَفْرِيْعٌ ثَالِثٌ لَنَا عَلٰى اَنَّ مَا لا مِثْلَ لَهُ لَايُضْمَنُ يَعْنِى اِذَا شَهِدَ الرَّجُلَانِ بِاَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ بَعْدَ الدُّخُوْلِ فَحَكَمَ الْقَاضِى عَلَيْهِ بِاَدَاءِ الْمَهْرِ وَالتَّفْرِيْقِ ثُمَّ رَجَعَ الشَّاهِدَانِ فَعِنْدَنَا لَا يَضْمَنَانِ لِلزَّوْجِ شَيْئًا لِاَنَّ الْمَهْرَ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ بِسَبَبِ الدُّخُوْلِ سَوَاءٌ كَانَ طَلَّقَهَا اَوْ لَا فَمَا اَتْلَفَا عَلَيْهِ شَيْئًا اِلَّا حَلَّ اِسْتِمْتَاعِهِ بِالْمَرْأَةِ وَهُوَ الَّذِى يُعَبَّرُ عَنْهُ بِمِلْكِ النِّكَاحِ وَلَيْسَ لَهُ مِثْلٌ لا مُمَاثَلَةَ الْبُضْعِ بِبُضْعٍ اُخَرَ فَاِنَّ ذٰلِكَ فِى الشَّرْعِ حَرَامٌ وَلَا مُمَاثَلَةَ بِالْمَالِ لِاَنَّ تَقَوُّمَهُ بِالْمَالِ لا يَظْهَرُ اِلَّا عِنْدَ النِّكَاحِ ضَرُورَةً لِشَرْفِهِ وَلَايَظْهَرُ عِنْدَ التَّفْرِيْقِ اَصْلًا وَلِهٰذَا صَحَّتْ اِزَالَتُهُ بِالطَّلَاقِ بِلَا بَدَلٍ وَلَا شُهُوْدٍ وَلَا وَلِيٍّ وَلَا اِذْنٍ

অনুবাদ॥ অবশ্য রক্তপণ তখনই মূল্যযোগ্য হবে যখন তাতে مثل অসম্ভব। যাতে কারো খুন বৃথা না যায়। প্রকৃতপক্ষে এ ক্ষেত্রে অপর ব্যক্তিটি হত্যাকৃতের ওয়ারিশদের কোন ক্ষতি করে নি। বরং তাদের শত্রুকেই হত্যা করেছে। কেমন যেন সে তাদেরকে (আরো) সাহায্য করেছে। অবশ্য এ অপর ব্যক্তি দ্বিতীয় হত্যাকৃতের ওয়ারিশদেরকে ক্ষতিপূরণ দিবে। চাই তা কিসাস হোক বা রক্তপণ হোক, যাই শরীআতে সাব্যস্ত হয়। *আর সহবাসের পর তালাকের সাক্ষ্য দ্বারা* ملك نكاح *এর কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।* এটা আমাদের এ মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে উদ্ভূত তৃতীয় শাখা মাসআলা যে, যে বস্তুর কোন সাদৃশ্য নেই তার কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। অর্থাৎ, যদি দুজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, সহবাসের পর সে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে। অতঃপর কাযী তাকে (স্বামী) মহর আদায়ের এবং বিচ্ছেদ করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর তারা দুজন তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমাদের মতে তারা স্বামীকে কোন কিছু ক্ষতিপূরণ দেবে না।

কেননা তার ওপরে সহবাসের কারণে মহর ওয়াজিব হয়েছে। চাই স্বামী তাকে তালাক দিক বা না দিক। সুতরাং স্ত্রী উপভোগ বৈধ হওয়ার ক্ষতিপূরণ ব্যতীত সাক্ষীদ্বয় তার কোন ক্ষতি করে নি। আর তা হলো তাই যাকে ملك نكاح বলে আখ্যায়িত করা হয়। আর এর কোন مثل নেই। আর এক যৌনাঙ্গের অপর যৌনাঙ্গ কোন مثل হয় না। কেননা, শরীআতে এটা অবৈধ। আর মালের দ্বারাও مثل হতে পারে না। কেননা এর মর্যাদা রক্ষার প্রয়োজনে বিবাহ ব্যতিত অন্য ক্ষেত্রে মাল দ্বারা মূল্যযোগ্য হওয়া সাব্যস্ত হয় না। আর বিচ্ছেদের সময়ও তা মোটেই সাব্যস্ত হয় না। এ কারণে কোন প্রকার বিনিময়, সাক্ষ্য, অভিভাবক বা অনুমতি ছাড়া তালাকের মাধ্যমে (ملك نكاح) দূরীভূত করা বৈধ।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ قوله وَاِنَّمَا يَتَقَوَّمُ فِى حَقِّ الدِّيَةِ الخ : এই বারত দ্বারা এর উত্তর দেয়া হয়েছে উত্তরের সার এই যে, ভুলবশত হত্যা যার মধ্যে مماثلت তথা সামঞ্জস্যতা সম্ভব নয়। তার মধ্যে জীবনকে দিয়তের ব্যাপারে খেলাফে কিয়াস এ কারণেই মূল্যবান সাব্যস্ত হয়েছে যাতে বাহ্যিকভাবে সামষ্টিকরূপে একটি মর্যাদাবান জীবন বিনষ্ট করা এবং বাতিল করা সাব্যস্ত না হয়। সুতরাং ভুলবশত হত্যার ক্ষেত্রে জীবনকে খেলাফে কিয়াস প্রয়োজনের খাতিরে মূল্যবান গণ্য করা হয়েছে। কাজেই এর উপর অন্য কোনো বস্তুকে কিয়াস করা যাবে না। সুতরাং কিসাস معنى متقوم হবে না। ফলে তৃতীয় ব্যক্তি হত্যাকারী শাহিদকে হত্যা করে প্রথম নিহত আরিফের ওয়ারিশদের কিছুই বিনষ্ট করেনি। বরং তাদের শত্রুকে হত্যা করে এক দিক দিয়ে তাদের সাহায্যই করেছে। আর সাহায্যকারীর উপর কোনো ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হতে পারে না। অতএব প্রথম নিহত আরিফের ওয়ারিশদের জন্য তৃতীয় ব্যক্তির উপর কোনো ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। হ্যা, তার উপর দ্বিতীয় নিহতের ওয়ারিশদের জন্য ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। সে যদি হত্যাকারীকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করে তাহলে তার উপর কিসাস ওয়াজিব হবে। আর ভুলবশত হত্যা করলে দিয়ত ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ وَ مِلْكُ النِّكَاحِ لَا يُضْمَنُ بِالشَّهَادَةِ الخ : **তৃতীয় মাসআলা :** পূর্বে এ নীতি বর্ণিত হয়েছিলো যে, যদি কোনো বস্তুর মিসলে কামিল বা কাছির কিংবা মিসলে সূরী কিংবা মিসলে মা'নবী কোনোটি না থাকে তাহলে তার ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না। এই ইবারতে এই নীতির উপর তৃতীয় মাসআলা বর্ণিত হয়েছে।

মাসআলার সার : যদি ২ জন ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, হামেদ সহবাসের পরে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে এই সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচারক স্বামী- স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে এবং স্বামীর উপর মহর আদায়ের নির্দেশ দেন। এরপরে সাক্ষীদ্বয় নিজ নিজ সাক্ষ্য থেকে রুজু করে তাহলে হানাফীদের মতে এই ২ সাক্ষী স্বামীর জন্য কোনো জিনিসের জামিন হবে না এবং তাদের উপর কোনো ক্ষতিপূরণ বর্তাবে না। কারণ সহবাসের দরুন স্বামীর উপর মহর ওয়াজিব হয়েই থাকে। চাই সে তালাক দিক বা না দিক। কাজেই সাক্ষীদ্বয় স্বামীর কোনো বস্তু বিনষ্ট করেনি। অবশ্য স্ত্রীর সাথে তার যে সম্পর্ক ছিলো অর্থাৎ বিবাহের মাধ্যমে তার যে মালিকানা স্বত্ব লাভ হয়েছিলো। কেবল তা বিনষ্ট করেছে। কিন্তু এটা এমন বস্তু যার কোনো মিসল হতে পারে না। কেননা ملك نكاح অর্থাৎ লজ্জাস্থানের সামঞ্জস্যত না উক্ত বিশেষ অঙ্গের সাথে হয়। আর না বিশেষ অঙ্গের সামঞ্জস্যতা মাল দ্বারা بضع বা বিশেষ অঙ্গের অপর বিশেষ অঙ্গের সামঞ্জস্যতা থাকে। কারণ, শরীআতে এ ধরনের বিনিময় নিষিদ্ধ। অর্থাৎ শরিআতে এটা জায়েয নয় যে, সাক্ষীরা যদি স্বামীর মালিকানাধীন বিশেষ অঙ্গের দ্বারা উপকৃত হওয়াকে বিনষ্ট করে তাহলে সে এর পরিবর্তে অন্য অঙ্গকে তার উপকার লাভের জন্যে প্রদান করবে।

এভাবে মালের সাথেও উক্ত অঙ্গের কোনো সামঞ্জস্যতা নেই কারণ ملك بضع মালের সাথে متقوم (মূল্যবান) হতে পারে না। আর বিবাহের সময় মহরের দ্বারা মাল ওয়াজিব হওয়া এটা বিশেষ অঙ্গের মূল্য স্বরূপ নয়। বরং ক্ষেত্র তথা বিশেষ অঙ্গের মর্যাদা জাহির করার জন্য বাহ্যিকভাবে মালকে মহর স্বরূপ ওয়াজিব করা হয়েছে। কেননা স্বামী যদি কোনো বিনিময় বিহীন বিশেষ অঙ্গের মালিক হতো তাহলে মানুষের অন্তরে উক্ত অঙ্গের কোনো মর্যাদা থাকতো না এবং বিচ্ছিন্নতার সময় বিশেষ অঙ্গ যেহেতু কারো মালিকানায় দাখিল হয় না বরং স্বামীর মালিকানা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এ মালিকানা মুক্ত হওয়া এক দিক দিয়ে একটি মর্যাদাকর বিষয়। এই কারণে বিচ্ছিন্নতার সময় কখনো তা মূল্যবান হয় না। এই কারণেই তালাকের দরুন বিশেষ অঙ্গের মালিকানা দূরীভূত করার জন্য কোনো বিনিময়ের প্রয়োজন হয় না। এবং সাক্ষী, ওলী ও স্ত্রীর অনুমতিরও প্রয়োজন হয় না।

وَانَّمَا تَصِيْرُ مُتَقَوِّمَةً فِى الْخُلْعِ بِالنَّصِّ عَلٰى خِلَافِ الْقِيَاسِ - وَانَّمَا قَيَّدَ بِالطَّلَاقِ بَعْدَ الدُّخُوْلِ لِاَنَّهُ اِذَا شَهِدَ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُوْلِ ثُمَّ رَجَعَ يَضْمَنَانِ نِصْفَ الْمَهْرِ لِلزَّوْجِ لِاَنَّ قَبْلَ الدُّخُوْلِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَهْرُ اِلَّا عِنْدَ الطَّلَاقِ لِاَنَّهَا تَحْتَمِلُ اَنْ تَرْتَدَّ اَوْ طَاوَعَتْ اِبْنَ الزَّوْجِ فَحِيْنَئِذٍ يَبْطُلُ الْمَهْرُ اَصْلًا وَاِنَّمَا اَكَّدَ نِصْفَ الْمَهْرِ بِالْمَهْرِ بِالطَّلَاقِ فَكَانَ الشَّاهِدَيْنِ اَخَذَ نِصْفَ الْمَهْرِ مِنْ يَدِ الزَّوْجِ وَاَعْطَاهَا فَيَضْمَنَانِ مَا اَعْطَاهَا -

অনুবাদ ॥ অবশ্য খোলার ক্ষেত্রে নসের সাহায্যে কিয়াসের বিপরীতে তা মূল্যযোগ্য বিবেচিত হয়। এখানে সহবাসের পর তালাক প্রদানের কথাটি শর্তযুক্ত হয়েছে এজন্যে যে, সাক্ষীদ্বয় যদি সহবাসের পূর্বে তালাকের সাক্ষ্য দিত, অতঃপর প্রত্যাহার করত, তবে তারা স্বামীকে অর্ধেক মহর ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য থাকত। কেননা সহবাসের পূর্বে তার ওপর মহর ওয়াজিব হয় না। কেবলমাত্র তালাকের মাধ্যমেই ওয়াজিব হয়। কারণ এ ক্ষেত্রে এ সম্ভাবনা থাকে যে, স্ত্রী ধর্মত্যাগী অথবা, স্বামীর সন্তানের অনুগত হবে। আর তখন পূর্ণ মহরই বাতিল হয়ে যাবে। এখানে তালাকের দ্বারা অর্ধেক মহরের ব্যাপারে জোর দেয়া হয়েছে। সুতরাং সাক্ষীদ্বয় কেমন যেন স্বামীর থেকে অর্ধেক মহর নিয়ে স্ত্রীকে প্রদান করেছে। এ কারণে তারা দুজন স্বামীর থেকে নিয়ে স্ত্রীকে যা প্রদান করেছে তার ক্ষতিপূরণ দিবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله وَاِنَّمَا تَصِيْرُ مُتَقَوِّمًا فِى الْخُلْعِ الخ : এর দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে।

প্রশ্ন : خلع এর মধ্যে বিশেষ অঙ্গের উপকারীতা বিচ্ছিন্নতার সময় মূল্যবান সাব্যস্ত হয়। অর্থাৎ স্ত্রী খোলা'র মধ্যে বিশেষ অঙ্গের উপকারীতার বিনিময় দিয়ে স্বামীর কবল থেকে বের হয়ে আসে। এর দ্বারা বোঝা গেলো যে, বিশেষ অঙ্গের উপকারীতা বিচ্ছিন্নতার সময় মাল দ্বারা মূল্যায়ন হয়ে থাকে। অথচ আপনারা বলেন যে, বিশেষ অঙ্গের উপকারীতা বিচ্ছিন্নতার সময় মোটেই মাল দ্বারা মূল্যায়ন হয় না?

উত্তর : খোলা'র মধ্যে উপকারীতা (منافع بضع) মূল্যবান হওয়া খিলাফে কিয়াস নস দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ যদি তোমরা এ ব্যাপারে আশংকা করো যে, তারা ২জন আল্লাহর বিধান অক্ষুণ্ন রাখতে পারবে না। তাহলে স্ত্রীর জন্য বিনিময় দিয়ে মুক্ত হয়ে আসার ক্ষেত্রে কারো উপর কোনো গুণাহ হবে না"। মোটকথা খোলা'র মধ্যে منافع بضع মাল দ্বারা মূল্যায়ন হওয়া খেলাফে কিয়াস নস দ্বারা প্রমাণিত। কাজেই এর উপর অন্যকিছুকে কিয়াস করা যাবে না। আর এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করাও গ্রহণযোগ্য হবে না।

قوله وَاِنَّمَا قَيَّدَ الطَّلَاقَ بِالدُّخُوْلِ الخ : নূরুল আনওয়ার গ্রন্থকার বলেন– মাতিন (র) সহবাসের পরে তালাকের কয়েদ বা শর্ত এ কারণে আরোপ করেছেন যে, সহবাসের পূর্বে যদি ২ জন সাক্ষী তালাকের সাক্ষ্য দেয়। এরপর তারা সাক্ষ্য থেকে রুজু করে। সেক্ষেত্রে উভয় সাক্ষী অর্ধমহর ক্ষতিপূরণ দিবে। কেননা সহবাসের পূর্বে স্বামীর উপর তালাকের সময় কেবল মোহর ওয়াজিব হয়। কারণ এ সম্ভাবনা থাকে যে, নাউযুবিল্লাহ! স্ত্রীর মুরতাদ হয়ে যেতে পারে। অথবা স্বামীর পুত্রের সাথে (অন্য স্ত্রীর গর্ভের) আকৃষ্ট হয়ে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারে। অথচ এ ২ ক্ষেত্রে স্ত্রী ناشزة তথা অবাধ্য হওয়ার কারণে সম্পূর্ণরূপে মহর থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। সুতরাং সহবাসের পূর্বে তালাকের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়ার দ্বারা তালাক পতিত হয়ে যাবে এবং অর্ধ মহর ওয়াজিব হবে।

সারকথা এই যে, যে মহর রহিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিলো তা সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্য দ্বারা ওয়াজিব হচ্ছে। কাজেই এটা কেমন যেন সাক্ষীদ্বয় অর্ধমোহর স্বামীর থেকে ছিনতাই করে উক্ত স্ত্রীকে প্রদান করলো। আর ছিনতাইকারী যেহেতু ছিনতাইকৃত বস্তুর জামিন হয়। এ কারণে তারা অর্ধমহরের ক্ষতিপূরণ আদায় করবে।

ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ رح عَنْ بَيَانِ اَنْوَاعِ الْاَدَاءِ وَالْقَضَاءِ شَرَعَ فِىْ بَيَانِ حُسْنِ الْمَامُوْرِ بِهِ فَقَالَ وَلَا بُدَّ لِلْمَامُوْرِ بِهِ مِنْ صِفَةِ الْحُسْنِ ضَرُوْرَةَ اَنَّ الْاٰمِرَ حَكِيْمٌ يَعْنِىْ لَابُدَّ اَنْ يَكُوْنَ الْمَامُوْرُ بِهِ حَسَنًا عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى قَبْلَ الْاَمْرِ ولٰكِنْ يُعْرَفُ ذٰلِكَ بِالْاَمْرِ ضَرُوْرَةَ اَنَّ الْاٰمِرَ حَكِيْمٌ وَالْحَكِيْمُ لَا يَاْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَهٰذَا عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ الْحَاكِمُ بِالْحُسْنِ وَالْقُبْحِ وَهُوَ الْعَقْلُ لَا دَخْلَ فِيْهِ لِلشَّرْعِ وَعِنْدَ الْاَشْعَرِىِّ الْحَاكِمُ بِهِمَا هُوَ الشَّرْعُ لَا دَخْلَ فِيْهِ لِلْعَقْلِ -

---

حَسَنٌ لِعَيْنِهِ وَلِغَيْرِهِ - এর বর্ণনা

অনুবাদ ॥ মুসান্নিফ (র) اداء ও قضاء এর প্রকারভেদের বর্ণনা থেকে অবসর হওয়ার পর তিনি مامور به এর حسن হওয়া সম্পর্কে আলোচনা শুরু করছেন। এ মর্মে তিনি বলেন, مامور به *(আদিষ্ট বিষয়) -এর জন্যে আবশ্যকীয়ভাবে কল্যাণের বৈশিষ্ট্য থাকা জরুরী। কারণ আদেশদাতা অবশ্যই প্রজ্ঞাময়।* অর্থাৎ আদেশের পূর্বে আদিষ্ট বিষয়টি আল্লাহর কাছে ভাল বা কল্যাণকর হওয়া জরুরী। তবে তা امر এর মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা যাবে। কারণ আদেশদাতা অবশ্যই প্রজ্ঞাময়। আর প্রজ্ঞাময় কখনো অমঙ্গল কাজের আদেশ দেন না। এটা হচ্ছে আমাদের আহনাফের অভিমত ; আর মু'তাযিলাদের মতে, আদেশদাতা ভাল মন্দ উভয় বিষয়ে আদেশ দিতে পারেন। এটা عقلى ব্যাপারে, এখানে শরিআতের কোন দখল নেই।

আর আল্লামা আবুল হাসান আল আশয়ারীর মতে, আদেশদাতা ভাল-মন্দ উভয়ের আদেশ দিতে পারেন তবে এটা শরিআতের বিষয়। এর মধ্যে বিবেকের কোন দখল নেই।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ عَنْ بَيَانِ اَنْوَاعِ الخ : মুসান্নিফ (র) বলেন- مامور به **তথা নির্দেশিত বস্তুর জন্য** صفت حسن তথা উত্তম বিশেষণ পাওয়া যাওয়া আবশ্যক। যেমন منهى عنه তথা নিষিদ্ধ **বস্তুর জন্য** قبيح **তথা** খারাপের বিশেষণ পাওয়া যাওয়া জরুরি। **এর কারণ এই যে,** নির্দেশদাতা এবং নিষেধকারী **(আল্লাহ) হলেন হাকীম তথা বিজ্ঞ। আর হাকীম** ভালো কাজেই নির্দেশ দিয়ে থাকেন এবং অন্যায় করতে নিষেধ করে থাকেন। কাজেই তিনি যখন কোনো বিষয়ের নির্দেশ দিবেন নিঃসন্দেহে তা উত্তম হবে এবং যা নিষেধ করবে নিঃসন্দেহে তা মন্দ হবে।

মোটকথা নির্দেশিত কাজ ভালো হওয়া এবং নিষিদ্ধ কাজ খারাপ হওয়া জরুরি।

তবে প্রশ্ন এই যে, ভালো মন্দ হওয়াটা যুক্তিযুক্ত বিষয় নাকি শরয়ী বিষয়? এ ব্যাপারে এতোটুকু বলা জরুরি যে, ভালো-মন্দের কয়েক অর্থ হতে পারে। যথা-

১. পূর্ণতার গুণ পাওয়া যাওয়া। যেমন ইলম ভালো বিষয় অর্থাৎ এটা একটা পূর্ণতার গুণ, আর অন্যায়ের অর্থ হলো ত্রুটিপূর্ণ হওয়া। যেমন অজ্ঞতা একটা খারাপ কাজ। অর্থাৎ অপূর্ণাঙ্গতার বিষয়।

২. কাজ ভালো হওয়ার অর্থ হলো পার্থিব উদ্দেশ্যের অনুকূলে হওয়া। আর কাজ খারাপ হওয়ার অর্থ হলো পার্থিব উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হওয়া।

৩. কাজ ভালো হওয়ার অর্থ হলো কর্তা প্রশংসা ও সওয়াবের অধিকারী হওয়া। আর খারাপ হওয়া অর্থ হলো কর্তা তিরস্কৃত ও সাজাযোগ্য হওয়া।

প্রথম ২ অর্থ অনুযায়ী ভালো-মন্দ হওয়াটা সর্বসম্মতিক্রমে عقلى তথা যুক্তিযুক্ত বিষয়। আর তৃতীয় অর্থের বিচারে মতানৈক্য রয়েছে। শায়খ আবুল হাসান আশ'আরী এর মতে উভয়টি শরয়ী বিষয়। অর্থাৎ আশ'আরীগণের মতে শরীআত প্রবর্তনের পূর্বে সকল কাজ যেমন ইমান, কুফর, নামায, ব্যাভিচার ইত্যাদি সব সমপর্যায়ের ছিলো। এসকল কাজ আঞ্জামদানকারী সওয়াবের অধিকারী ছিলো না এবং সাজাযোগ্যও ছিলো না। কিন্তু শরীআত প্রবর্তনের পরে শরীআত প্রবর্তক কোনো কোনো কাজের উপর সওয়াব নির্ধারণ করেছেন এবং তা করার নির্দেশ দিয়েছেন। কোনো কোনো কাজের ব্যাপারে কর্তাকে সাজাযোগ্য বলেছেন এবং তা করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং যে সকল কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন সেসব কাজ ভালো এবং যা করতে নিষেধ করেছেন তা খারাপ বিবেচিত হবে। আর আমাদের অর্থাৎ মাতুরিদিয়া এবং মো'তেজিলাদেরদের মতে ভালো মন্দ উভয়টি عقلى বিষয়। শরীআতের উপর মওকুফ নয়। কারণ শরীআত প্রবর্তনের পূর্বে বাস্তবে কিছু কিছু কাজ ভালো ছিলো। সেসবের কর্তা সওয়াবের অধিকারী হবে। আর কিছু কিছু কাজ খারাপ ছিলো উক্ত কাজে জড়িত ব্যক্তি সাজাযোগ্য হবে। সুতরাং যে সকল কাজ বাস্তবে ভালো ছিলো শরীআত প্রবর্তক সেগুলো করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর যেসব কাজ খারাপ ছিলো তা করতে নিষেধ করেছেন।

মোটকথা শরীআত প্রবর্তকের নির্দেশ দ্বারা কোনো কাজের মধ্যে উত্তমতা সৃষ্টি হয় না। এবং নিষেধ করার দ্বারা কোনো কাজের কদার্যতাও সূচিত হয় না। যেমন ডাক্তার ওষুধের মধ্যে কোনো উপকার সৃষ্টি করে না এবং কোনো অপকারও সৃষ্টি করে না। বরং বাস্তবে যে উপকার বা অপকার থাকে তা প্রকাশ করে মাত্র।

তবে জ্ঞান– বিবেক বাস্তব পক্ষে কখনো ভালো-মন্দ উদঘাটন করতে সক্ষম হয়। যেমন সততা ভালো হওয়া এবং মিথ্যা খারাপ হওয়া। আবার কখনো তা বোধগম্য করতে পারে না। যেমন রমযানের শেষ ১০ দিনের রোযা ভালো হওয়া এবং প্রথম শাওয়ালের রোযা খারাপ হওয়া। এমন বিষয় যা জ্ঞান বিবেক দ্বারা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। কিন্তু শরীআত উক্ত বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছে।

হানাফী ও মো'তাজিলাদের মধ্যে এ বিষয়ে ঐক্যমত রয়েছে যে, ভালো মন্দ عقلى ও বাস্তব সম্মত বিষয়; শরীআতের উপর মওকুফ নয়। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে–

প্রথম পার্থক্য : আমাদের তথা মুতুরীদিয়াদের মতে ভালো মন্দ কোনো বিধানকে জরুরি করে না। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার উপর ভালো কাজের আদেশ করা ওয়াজিব নয় এবং খারাপ কাজের ব্যাপারে নিষেধ করাও ওয়াজিব নয়। আর মো'তাজিলাদের মতে ভালো মন্দের নির্দেশনা ওয়াজিব। অর্থাৎ যে সকল কাজ ভালো সেসকল কাজের আদেশ করা আল্লাহর উপর ওয়াজিব। আর যে সকল কাজ খারাপ সে সকল কাজ থেকে নিষেধ করাও ওয়াজিব। অতএব যদি শরীআত প্রবর্তক না হতো। আর বিভিন্ন কাজ এবং তার কর্তা থাকতো তাহলে বিবেকের মাধ্যমে বিধান সাব্যস্ত হতো। যে সকল কাজ মুবাহ হওয়ার যোগ্যতা রাখতো তা মুবাহ হতো। আর যেসব কাজ হারাম হওয়ার যোগ্যতা রাখতো নিঃসন্দেহে তা হারাম হতো।

দ্বিতীয় পার্থক্য : মো'তাজিলাদের মতে ভালো মন্দ নিরূপণকারী হলো– বিবেক অর্থাৎ বিবেক যে কাজকে ভালো সাব্যস্ত করে বাস্তবে তা ভালো। এবং বিবেকে যে কাজকে খারাপ সাব্যস্ত করে বাস্তবে তা খারাপ। আর আমাদের মতে ভালো-মন্দ নিরূপণকারী হলো শরিআত। শরিআত যাকে ভালো সাব্যস্ত করবে বাস্তবে তাকে ভালো গ্রহণ করতে হবে। আর যে কাজকে খারাপ সাব্যস্ত করবে বাস্তবেও তাকে খারাপ জানতে হবে।

মাতুরীদিয়া ও আশাইরাদের মধ্যে পার্থক্য : আশাইরাদের মতে শরীআত প্রবর্তনের পরে ভালো-মন্দ সাব্যস্ত হয়েছে। এর পূর্বে ভালো-মন্দ সাব্যস্ত ছিলো না। আর মাতুরীদিয়াদের মতে শরীআত প্রবর্তনের পূর্বেও ভালো-মন্দ সাব্যস্ত ছিলো। তবে শরীআত তাকে স্পষ্ট করে দিয়েছে মাত্র।

ثُمَّ شَرَعَ فِى تَقْسِيْمِ الْحَسَنِ اِلَى عَيْنِهِ وَاِلَى غَيْرِه وتقسيم كُلِّ مِّنْهُمَا اِلَى اَقْسَامِهِمَا فقال وهُوَ اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ لِعَيْنِهٖ اى الْحَسَنُ اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ لِذَاتِ الْمَامُوْرِ بِهٖ بِاَنْ يَّكُوْنَ حُسْنُهٗ فِىْ ذَاتِ مَا وُضِعَ لَهٗ ذٰلِكَ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ وهٰذا ثَلٰثَةُ اَنْوَاعٍ عَلٰى مَا قَال وَهُوَ اِمَّا اَنْ لَّا يَقْبَلَ السُّقُوْطَ اَوْ يَقْبَلَهٗ اى لَا يَقْبَلُ ذٰلِكَ الْحَسَنُ السُّقُوْطَ مِنَ الْمَامُورِ بِهٖ بَلْ يَكُوْنُ دَائِمًا حَسَنًا مَامُورًا بِه عَلَى الْمُكَلَّفِ وَ وَاجِبًا عَلَيْهِ او يَقْبَلُ السُّقُوْطَ فِى حِيْنٍ مِّنَ الْاَحْيَانِ لِعُذْرٍ مِّنَ الْاَعْذَارِ اَوْ يَكُوْنَ مُلْحِقًا بِهٰذَا الْقِسْمِ لٰكِنَّهٗ مُشَابِهٌ لِمَا حَسُنَ الْمَعْنٰى فِى غَيْرِهٖ اى يَكُوْنُ المَامُوْرُ بِه مُلْحِقًا بِالْحَسَنِ لِعَيْنِهٖ لٰكِنَّه مُشَابِهٌ لِلْحَسَنِ لِغَيْرِه فَهُوَ ذُوْ جِهَتَيْنِ وانّما جَعَلَهٗ مِنْ اقسامِ الْحَسَنِ لِعَيْنِهٖ اِعْتِبَارًا لِلْاَصْلِ كَمَا سَتَقِفُ عَلَيْهِ فِيْمَا بعدُ ولٰكِنْ فِى التَّقْسِيْمِ مُسَامَحَة والْوَاجِبُ ان يَّقُوْلَ وهُوَ اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ بِعَيْنِه بِالذَّاتِ اَوْ بِالْوَاسِطَةِ وَالاَوَّلُ اِمَّا اَنْ لَّا يَقْبَلَ السُّقُوْطَ او يَقْبَلَه وقَدْ وَقَعَ التَّسَامُحُ مِنْهُ فِىْ هٰذا التَّقْسِيْمِ كَثِيْرًا كَالتَّصْدِيْقِ والصَّلٰوةِ والزَّكٰوةِ نَشْرٌ عَلٰى تَرْتِيْبِ اللَّفِّ فَالْاَوَّلُ مِثَالٌ لِمَا لَا يَقْبَلُ السُّقُوْطَ فَاِنَّ التَّصْدِيْقَ لَازِمٌ عَلَى الْمَرْءِ ولا يَسْقُطُ عَنْهُ مَادَامَ عَاقِلًا بَالِغًا ولِهٰذا لَا يَزُوْلُ حَالَ الْاِكْرَاهِ فَاِنْ اُكْرِهَ عَلٰى اِجْرَاءِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ يَجُوْزُ لَهُ التَّلَفُّظُ بِاللِّسَانِ بِشَرْطِ اَنْ يَّبْقَى التَّصْدِيْقُ عَلٰى حَالِهٖ فَالْاِقْرَارُ يَقْبَلُ السُّقُوْطَ وَالتَّصْدِيْقُ لَا يَقْبَلُهٗ قَطُّ وحُسْنُ التَّصْدِيْقِ ثَابِتٌ لِعَيْنِهٖ لِاَنَّ الْعَقْلَ يَحْكُمُ بِاَنَّ شُكْرَ الْمُنْعِمِ الْخَالِقِ وَاجِبٌ -

অনুবাদ ॥ حسن এর বিভক্তি : অতপর গ্রন্থকার حسن কে عينه এবং غيره এ দু ভাগে ভাগ করেছেন এবং প্রত্যেকটিকে তাদের প্রকারসহ বর্ণনা শুরু করেছেন। তিনি বলেন, حسن ***হয়ত*** لعينه ***হবে অর্থাৎ*** حسن ***টি হয়ত*** مامور به-***এর সত্তার মধ্যে থাকবে*** এভাবে যে, তা যে উদ্দেশ্যে সৃচিত হয়েছে কোন প্রকার মাধ্যম ছাড়াই তার সত্তার মধ্যে কল্যাণ থাকবে। গ্রন্থকারের বর্ণনা মতে সেটা তিন প্রকার। ***আর তা হয়ত*** سقوط ***বা বাদ পড়াকে কবুল করবে না, অথবা কবুল করবে।*** অর্থাৎ مامور به থেকে উক্ত حسن রহিত হওয়াকে গ্রহণ করবেনা। বরং সর্বদাই مامور به মুকাল্লাফ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির ওপর حسن হিসেবে থাকবে এবং তার ওপর ওয়াজিব থাকবে। অথবা কোন ওজরের কারণে কখনো কখনো বাদ পড়াকে কবুল করবে, ***কিংবা এর সাথে সংযুক্ত থাকবে, তবে অর্থগতভাবে*** حسن لغيره ***এর সাথে সাদৃশ্য রাখবে।*** অর্থাৎ مامور به টি حسن لعينه এর সাথে সংযুক্ত থাকবে, কিন্তু حسن لغيره এর সাথে এটা সাদৃশ্য রাখবে। কাজেই এটা হবে দ্বি-মুখী বিষয়।

মুসান্নিফ (র) এটাকে اصل এর দিক বিবেচনা করে حسن لعينه এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যেমনটা পরবর্তিতে জানতে পারবে। তবে এ বিভক্তিতে কিছুটা বেখেয়ালী ঘটেছে। এভাবে বলা উচিৎ ছিল যে, حسن হয়ত সত্তাগতভাবে حسن لعينه হবে অথবা কোন মাধ্যম দ্বারা হবে। প্রথমটি হয়ত سقوط কবুল করবেনা অথবা কবুল করবে। এ বিভক্তির বিষয়ে মুসান্নিফের থেকে বেশ শৈথিল্য প্রকাশ পেয়েছে। ***যেমন-*** تصديق ***(বিশ্বাস স্থাপন)***, صلوة ও زكوة। ধারাবাহিক অনুসারে উপস্থাপিত। প্রথমটি যা سقوط কবুল করেনা তার উদাহরণ। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর تصديق আবশ্যকীয় বিষয় যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাপ্ত বয়স্ক, বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত এটা রহিত হয় না। তাই বলপ্রয়োগের اكراه অবস্থাও এটা দূর

হতে পারে না। যদি কোন ব্যক্তিকে কুফরী বাক্য উচ্চারণে বাধ্য করা হয়, তার জন্যে তা জবানে উচ্চারণ করা এ শর্তে বৈধ যে, তার অন্তরে تصديق বিদ্যমান থাকবে। সুতরাং اقرار (মৌখিক স্বীকৃতি) রহিত হওয়াকে কবুল করলেও تصديق (আন্তরিক বিশ্বাস) কখনো রহিত হওয়াকে কবুল করেনা। আর تصديق এর حسن সত্তাগতভাবে বিদ্যমান। কেননা বিবেক এ হুকুম দেয় যে, অনুগ্রহকারী সৃষ্টিকর্তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আবশ্যক।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ قوله ثُمَّ شَرَعَ فِىْ تَقْسِيْمِ الخ : নুরুল আনওয়ার গ্রন্থকার বলেন- مامور به ভালো সাব্যস্ত করার পরে মুসান্নিফ (র) حسن তথা ভালোর ২টি প্রকার উল্লেখ করেছেন। ১. حسن لعينه (নিজের থেকেই ভালো।) ২. حسن لغيره (অন্যের কারণে ভালো।) এ ২টির প্রত্যেকটি আবার ৩ প্রকার।

মুসান্নিফ (র) বলেন- حسن ২ প্রকার। ১. حسن لعينه ২. حسن لغيره

حسن لعينه : এই যে, অন্য কোনো মাধ্যম ছাড়াই বস্তুর মধ্যে উত্তমতা পাওয়া যাবে।

حسن لغيره : এই যে, উত্তমতা مامور به হওয়া ছাড়া অন্য কোনো কারণে সূচিত হবে।

এরপর মুসান্নিফ (র) বলেন حسن لعينه ৩ প্রকার। ১. নির্দেশিত কাজ থেকে উত্তমতা রহিত হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। বরং সর্বদার জন্যে তা উত্তম এবং মুকাল্লাফ ব্যক্তির উপর সবসময় তা ওয়াজিব। ২. ওযরের কারণে কোনো কোনো সময় রহিত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। ৩. مامور به টা حسن لعينه এর সাথে সংশ্লিষ্ট এবং حسن لغيره এর সামঞ্জস্যপূর্ণ। সারকথা এই যে, তৃতীয় প্রকারটি দ্বিমুখী অর্থাৎ এক দিক দিয়ে হাসান লি আইনিহী এবং অপর দিক দিয়ে হাসান লি গায়রিহী! এখানে প্রশ্ন এই যে, এই তৃতীয় প্রকারকে হাসান লি আইনিহী এর প্রকারসমূহের মধ্যে গণ্য করা হলো কেন? হাসান লি গায়রিহীর প্রকারসমূহের মধ্যে শামিল করা হলো না কেন? এর উত্তর এই যে, হাসান حسن لعينه হলো আসল। অতএব আছলের ধর্তব্য করে এটাকে حسن لغيره এর প্রকারসমূহের মধ্যে গণ্য করেছেন।

মোল্লা জুয়ুন (র) বলেন- এই বিভক্তির মধ্যে মাতিন (র) এর বিচ্যুতি হয়েছে। কারণ একই বিভক্তির প্রকারসমূহের মধ্যে পরস্পর ভিন্নতা থাকে। কিন্তু এখানে তৃতীয় প্রকারটি প্রথম ২ প্রকারের ভিন্ন ও বিপরীত নয়। কারণ তৃতীয় প্রকারটি রহিত হওয়া সম্ভব কিংবা রহিত হওয়া সম্ভব নয়। যদি রহিত হওয়া সম্ভব হয় তাহলে তা প্রথম প্রকারে শামিল। অন্যথায় দ্বিতীয় প্রকারে শামিল। সুতরাং তৃতীয় প্রকারের মধ্যে কোনো ভিন্নতা নেই। মুসান্নিফ (র) এর জন্য এরূপ বর্ণনা করা জরুরি ছিলো যে, حسن لعينه ২ প্রকার। ১. بالذات وبلا واسطه ২. حَسَنٌ لِعَيْنِهٖ بِالْوَاسِطَه এর প্রথম প্রকারটি আবার ২ প্রকার। ১. রহিত হওয়া সম্ভব, ২. রহিত হওয়া সম্ভব নয়। এভাবে বিভক্ত করলে কোনো ত্রুটি থাকতো না। এজন্যে ব্যাখ্যাকার বলেন- এই বিভক্তির ক্ষেত্রে মুসান্নিফ (র) অনেক বিচ্যুতির শিকার হয়েছেন। সে সবের কিছু এই এবং কিছু সামনে আসছে।

قوله كَالتَّصْدِيْقِ وَالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ الخ : এই ইবারতে ক্রমধারা মোতাবেক উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম যে মামুরবিহীর উত্তমতা রহিত হওয়া সম্ভব তা উল্লেখ করেছেন। মুসান্নিফ (র) এর উক্তির মধ্যে কিছু কথা উহ্য রয়েছে। তা এই যে كَعَدَمِ سُقُوْطِ حُسْنِ تَصْدِيْقِ অর্থাৎ حسن لعينه প্রথম প্রকার এর উদাহরণ তাসদীকের উত্তমতা রহিত না হওয়া। কারণ রাসূলুল্লাহ (স) যে সকল বিষয় নিয়ে এসেছেন সেসব সত্যায়ন করা প্রত্যেক বিবেকবান বালিগ মানুষের উপর ফরয। যতোক্ষণ সে বিবেক সম্পন্ন থাকবে। এ ওয়াজিবের জিম্মাদারি থেকে কখনো সে দায়িত্বমুক্ত হবে না। সুতরাং এটা যেহেতু রহিত হওয়ার যোগ্য নয়। এ কারণে اكراه অর্থাৎ হত্যা কিংবা অঙ্গহানীর ভীতি প্রদর্শন সত্ত্বে তাসদীক দূরীভূত হয় না। এমনকি কোনো মুসলমানকে কুফরী কথা বলতে বাধ্য করা হলে তার জন্য মুখে উক্ত কথা উচ্চারণ করা জায়েয হবে। তবে শর্ত হলো অন্তরে প্রগাঢ় আস্থা ও বিশ্বাস বহাল থাকতে হবে।

মোটকথা اقرار বা স্বীকারোক্তি রহিত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে কিন্তু تصديق কোনোক্রমে রহিত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে না। আর তাসদীকের উত্তমতা মূল কাজের পরিপ্রেক্ষে প্রমাণিত। কারণ বিবেক এই নির্দেশ করে যে, অনুগ্রহশীল স্রষ্টার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা এই যে, মনে প্রাণে তার একত্ববাদ স্বীকার করবে এবং মেনে নেবে। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, তাসদীকের মধ্যে উত্তমতা বিদ্যমান। আর তাসদীক যেহেতু রহিতযোগ্য নয়। একারণে তার উত্তমতাও রহিতযোগ্য হবে না।

وَالثَّانِيْ مِثَالٌ لِمَا يَقْبَلُ السُّقُوْطَ فَإِنَّ الصَّلٰوةَ تَسْقُطُ فِيْ حَالِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ كَالْاِقْرَارِ بِالْاِكْرَاهِ وَحُسْنُ الصَّلٰوةِ فِيْ نَفْسِهَا لِاَنَّهَا مِنْ اَوَّلِهَا اِلٰى اٰخِرِهَا تَعْظِيْمٌ لِلرَّبِّ بِالْاَقْوَالِ وَالْاَفْعَالِ وَثَنَاءٌ عَلَيْهِ وَخُشُوْعٌ لَهُ وَقِيَامٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَجَلْسَةٌ بِحُضُوْرِهِ وَاِنْ كَانَتِ الْكَمِّيَّاتُ وَتَعْدَادُ الرَّكْعَاتِ وَالْاَوْقَاتِ وَالشَّرَائِطِ لَا يَسْتَقِلُّ بِمَعْرِفَتِهِ الْعَقْلُ وَمُحْتَاجًا اِلَى الشَّرِيْعَةِ وَقَدْ نَبَّهْتُ اَنَا لِاَسْرَارِهَا فِي الْمَثْنَوِيِّ الْمَعْنَوِيِّ -

---

অনুবাদ ॥ আর দ্বিতীয়টি এমন বিষয়ের উপমা যা سقوط কবুল করে। যেমন নামায نفاس ও حيض অবস্থায় স্থগিত হয়ে যায়। যেমনিভাবে বলপ্রয়োগের অবস্থায় اقرار স্থগিত হয়ে যায়। আর নামাযের حسن (সৌন্দর্য) সরাসরি তার মধ্যেই বিদ্যমান। কেননা এর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিপালকের প্রতি কথা ও কাজের দ্বারা সম্মান প্রদর্শন, তার প্রশংসা, তার প্রতি বিনয় প্রদর্শন, তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এবং তাঁর দরবারে বসে থাকা প্রভৃতি রয়েছে। যদিও নামাযের সংখ্যা, রাকাআত সংখ্যা, সময় এবং শর্তসমূহ বিবেকের দ্বারা স্বাধীনভাবে বুঝা যায় না বরং শরীআতের প্রয়োজন হয়। আমি এর রহস্যাবলীর ব্যাপারে مثنوى معنوى গ্রন্থে আলোকপাত করেছি।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله وَالثَّانِيْ مِثَالٌ لِمَا يَقْبَلُ الخ : ব্যাখ্যাকার বলেন- দ্বিতীয় বিষয় অর্থাৎ নামায এমন নির্দেশিত বিষয়ের উদাহরণ যা রহিতযোগ্য। কারণ মহিলাদের উপর হায়েয ও নিফাসকালে নামায ফরয থাকে না। এক দিন এবং এক রাত বেহুশ অবস্থায় থাকলেও তার উপর নামায ফরয হওয়া রহিত হয়ে যায়। এসব নামায পরবর্তীতে কাযা করা ওয়াজিব হয় না। যেভাবে اكراه তথা বাধ্যকরার ক্ষেত্রে اقرار রহিত হয়ে যায়।

আর নামাযের উত্তমতা মূল বিষয়ের মধ্যে নিহীত। অর্থাৎ নামায প্রকৃতপক্ষেই হাসান। প্রকৃতপক্ষে হাসান হওয়ার কারণ এই যে, নামায শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উত্তম কথা যেমন তাকবীর, কোরআন তেলাওয়াত এবং তাসবীহ ইত্যাদি এবং উত্তম কাজ যথা রুকু-সাজদার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মর্যাদা সম্বলিত। উপরন্তু নামাযের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুনগান রয়েছে। আল্লাহর সামনে নামাযের মাধ্যমে বান্দা অনুনয় বিনয় প্রকাশ করে। এইসকল বস্তু আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব বোঝায়। আর আল্লহর বড়ত্ব প্রকাশ নিঃসন্দেহে হাসান তথা উত্তম কাজ। অতএব প্রমাণিত হলো যে, নামায প্রকৃতপক্ষে হাসান। এর মধ্যে অন্যের কারণে حسن সৃষ্টি হয়নি। আর নামায যেহেতু রহিতযোগ্য এ কারণে তার উত্তমতাও রহিতযোগ্য হবে।

قوله وَاِنْ كَانَتِ الْكَمِّيَّاتُ وَتَعْدَادُ الرَّكْعَاتِ الخ : ব্যাখ্যাকার বলেন- নামাযের পরিমাণ, রাকআতসমূহের সংখ্যা, সময় নির্ধারণ এবং শর্তাবলি নির্দিষ্টকরণ এসব এমন বিষয় যা বিবেকের দ্বারা বোধগম্য করা সম্ভব নয়। বরং শরীআতের প্রতি মুখাপেক্ষী। ব্যাখ্যাকার এর তত্ত্ব-রহস্য স্বীয় মসনবী এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন। কারো মতে নামায حسن لذاته নয়। বরং কাবার মাধ্যমে এর মধ্যে উত্তমতা এসেছে। কাজেই এটা তৃতীয় প্রকারের অন্তর্গত হবে। অর্থাৎ حسن لعينه এর অন্তর্গত হবে তবে حسن لغيره এর সাথে সামঞ্জস্যশীল এর উত্তর এই যে, নামাযের উত্তমতার ক্ষেত্রে কা'বার কোনো দখল নেই। কারণ যখন বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ ফিরানো ফরয ছিলো তখনো নামায হাসান ছিলো এবং কিবলার ব্যাপারে সন্দিহান হবার সময় কা'বার মূলদিক ভ্রষ্ট হওয়াকালেও নামায হাসান থাকে। কাজেই প্রমাণিত হলো যে, নামায হাসান হওয়ার ক্ষেত্রে কা'বার কোনো প্রভাব নেই।

وَالثَّالِثُ مِثَالٌ لِمَا يَكُونُ مُلْحِقًا لِعَيْنِه ومُشَابِهًا لِغَيْرِه فإنَّ الزَّكوٰةَ فِي الظَّاهِرِ اِضَاعَةُ الْمَالِ وانَّمَا حَسُنَتْ لِدَفْعِ حَاجَةِ الْفَقِيْرِ الَّذِيْ هُوَ مَحْبُوبُ اللّٰهِ تَعَالٰى وحاجَتُه لَيْسَتْ بِاخْتِيَارِه بَلْ بِمَحْضِ خَلْقِ اللّٰهِ تعالٰى كذٰلك وكَذا الصَّوْمُ فِيْ نَفْسِه تَجْوِيْعٌ وإتْلافٌ لِنَفْسٍ وإنَّمَا حَسُنَ لِقَهْرِ النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ الَّتِيْ هِيَ عَدُوُّ اللّٰهِ تَعَالٰى وهٰذه العَداوَةُ بِخَلْقِ اللّٰهِ تعَالٰى لَا اِخْتِيَارَ لِلنَّفْسِ فِيْهَا وكَذا الحَجُّ فِيْ نَفْسِه سَعْيٌ وقَطْعُ مَسافَةٍ و رُؤيَةُ اَمْكِنَةٍ مُتَعَدِّدَةٍ وانَّما حَسُنَ لِشَرْفِ الْمَكَانِ الَّذِيْ شَرَّفَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى سَائِرِ الْأَمْكِنَةِ وتِلْكَ الشَّرَافَةُ لَيْسَتْ بِاخْتِيَارِ الْأَمْكِنَةِ بَلْ بِخَلْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى كَذالِك فَصَارَ كَاَنَّ هٰذِه الْوَسَائِطُ لَمْ تَكُنْ حَائِلَةً فِيْمَا بَيْنَ فَكَانَتْ حَسَنَةً لِعَيْنِهَا اَوْ لِغَيْرِه عطفٌ علٰى قوله لِعَيْنِه اي الْحَسَنُ اِمَّا اَنْ يَكُونَ لِغَيْرِ الْمَامُوْرِ بِه بِاَنْ يَكُونَ مَنْشَاُ حُسْنِه هُوَ ذٰلِكَ الْغَيْرُ وَالْمامُوْرُ بِه لَا دَخْلَ لَهٗ فيه وهُو ثَلٰثَةُ اَنْوَاعٍ اَيضًا علٰى ما بيَّنَه بِقَوْله وَهُوَ اِمَّا اَنْ لَا يَتَادّٰى بِنَفْسِ الْمَامُوْرِ بِه اَوْ يَتَادّٰى اَوْ يَكُوْنَ حَسَنًا لِحُسْنٍ فِيْ شَرْطِه بَعْدَ مَا كَانَ حَسَنًا لِمَعْنًى فِيْ نَفْسِه اَوْ مُلْحِقًا بِه

অনুবাদ ॥ আর তৃতীয়টি (زكوة) এমন বিষয়ের উদাহরণ যা حسن لعينه এর সাথে যুক্ত এবং حسن لغيره এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা زكوة হলো বাহ্যিকদৃষ্টে সম্পদ বিনষ্ট করান। তবে এটা ভাল বলে গণ্য হয়েছে দরিদ্রদের অভাব দূর করার কারণে যা আল্লাহর পছন্দনীয় বিষয়। আর দরিদ্রদের অভাব বস্তুত তাদের ইচ্ছা মাফিক হয়না, বরং তা আল্লাহর সৃষ্টির দ্বারাই হয়। অনুরূপভাবে صوم হলো নিজেকে ক্ষুধার্ত রাখা ও নফসকে কষ্ট দেয়া। এটা حسن হয়েছে নফসে আম্মারা নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে যে আল্লাহর শত্রু। অবশ্যই এ শত্রুতা আল্লাহরই সৃষ্ট, নফসের কোন এখতিয়ার নেই। অনুরূপভাবে حج সত্তাগতভাবে দৌড়ানো, দূরত্ব অতিক্রম করা, বিভিন্নস্থান দর্শন করা। এটা حسن হয়েছে স্থানের মর্যাদার জন্যে যাকে আল্লাহ সকল স্থানের ওপর মর্যাদা দিয়েছেন। এ সম্মান স্থানগুলোর ইচ্ছায় হয়নি, বরং আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট। সুতরাং এসকল মাধ্যম এমন যে, এগুলোর মাঝে কোন প্রতিবন্ধক নেই। ফলে حسن لعينه হিসেবে গণ্য হয়েছে।

অথবা مامور به টি حسن لغيره হবে, এটা গ্রন্থকারের উক্তি لعينه এর ওপর মা'তূফ। অর্থাৎ حسن হয়তো مامور به ছাড়া অন্য কোন কারণে হবে। তা এভাবে যে, حسن এর উৎস উক্ত ভিন্ন বিষয় তার মধ্যে مامور به এর কোন দখলও নেই। ماموربه তিন প্রকার। যেমন গ্রন্থকার তার ভাষায় বর্ণনা করেছেন যে, ***হয়তো ভিন্ন বিষয়টি مامور به এর মাধ্যমে আদায় হবে না, অথবা আদায় হবে, কিংবা مامور به এর শর্তের মধ্যে حسن থাকার কারণে হবে, যা সরাসরি مامور به এর মধ্যে অথবা তার সাথে সংযুক্ত বিষয়ের মধ্যে পরোক্ষভাবে حسن থাকার দ্বারা হয়।***

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله والثالث مثال لما يكون الخ : তৃতীয় উদাহরণ অর্থাৎ যাকাত এমন মামুর বিহী যা حسن لعينه এর সাথে সংশ্লিষ্ট এবং حسن لغيره এর সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ যাকাত দ্বারা দৃশ্যত মাল বিনষ্ট করা হয়। আর মাল বিনষ্ট করা শরীআতে হারাম এবং যুক্তিগতভাবে নিষিদ্ধ। আর যে জিনিস শরীআতে হারাম এবং যুক্তি বা বিবেকের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ প্রকৃতপক্ষে তা মন্দ হয়ে থাকে। কাজেই যাকাত মন্দ হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যাকাতের মধ্যে এ কারণে উত্তমতা এসেছে যে, এর দ্বারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা গরীবদের প্রয়োজন পূর্ণ করা হয়। তাদের অভাব দূর করা হয়। আর আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের অভাব দূর করা যেহেতু উত্তম ও পছন্দনীয় কাজ। এ কারণে যাকাতের মধ্যে উত্তমতা এসেছে। একথা লক্ষণীয় যে, অভাবীদের অভাব তাদের এখতিয়ারগত নয়। বরং আল্লাহই তাদের এমন বানিয়েছেন।

সারকথা এই যে, যাকাতের মধ্যে অভাবীদের অভাব দূর করার কারণে উত্তমতা এসেছে। আর এ অভাব বান্দার এখতিয়ারাধীন বিষয় নয়। এভাবে রোযা প্রকৃতপক্ষে নিজেকে ক্ষুধার্ত রাখা এবং কষ্ট দেয়ার নাম। অথচ আল্লাহর সমূহ নেয়ামত থেকে নফসকে বিরত রাখা বিবেকের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। কিন্তু এর মাধ্যমে আল্লাহর দুশমন নফসে আম্মারা দুর্বল হয়। এ কারণে এর মধ্যে উত্তমতা এসেছে। কিন্তু এ শত্রুতাও আল্লাহর সৃজিত। অন্যথায় নফসের এ শত্রুতার কোনো এখতিয়ার নেই। এভাবে হজ প্রকৃতপক্ষে দোড়াদৌড়ি, দীর্ঘ পথ অতিক্রম এবং বিভিন্ন জায়গা দর্শনের নাম। এটা ব্যবসায়িক সফরের ন্যায়। এই কারণে এর মধ্যে কোনো উত্তমতা নেই। তবে হজ্জের মধ্যে কা'বা শরীফের মর্যাদার কারণেই উত্তমতা সূচিত হয়েছে। যাকে আল্লাহ সকল স্থানের উপর মর্যাদা দান করেছেন। এ মর্যাদাও কোনো জায়গার এখতিয়ারের বিষয় নয়। বরং আল্লাহরই সৃজিত। সুতরাং কা'বার মাধ্যমেই এর মধ্যে উত্তমতা এসেছে। আর এটা তার এখতিয়ারাধীন নয়।

قوله فصار كان هذه الوسائط الخ : নূরুল আনওয়ার গ্রন্থকার এর ফলাফল স্বরূপ বলেন যে, উল্লেখিত তিনোটি মাধ্যম যেহেতু এখতিয়ারী নয়। এসবের ব্যাপারে বান্দার কোনো ভূমিকা নেই। একারণে তা হওয়া না হওয়া সমপর্যায়ের। আর সমপর্যায়ের হওয়ার কারণে কেমন যেন এ সকল মাধ্যম বিদ্যমান নেই। আর মাধ্যম যেহেতু বিদ্যমান নেই কাজেই যাকাত, রোযা এবং হজ্জ মাধ্যমবিহীন হাসান হল। কাজেই তিনোটি حسن لعينه এর সাথে সংশ্লিষ্ট হলো। তবে এসকল মাধ্যমের মধ্যে উত্তমতা সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে কিছুনা কিছু দখল রয়েছে। এ কারণে حسن لغيره এর সামঞ্জস্যশীল হলো। মোটকথা প্রমাণিত হলো যে, যাকাত, রোযা ও হজ্জ তিনোটি حسن لعينه এর সাথে সংশ্লিষ্ট এবং حسن لغير এর সামঞ্জস্যপূর্ণ।

قوله أولغيره عطف الخ : পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, حسن لغيره এমন বিষয়কে বলে যে মামূরবিহীটি অন্যের কারণে হাসান তথা উত্তম বিবেচিত হয়। অন্যের কারণে হওয়ার অর্থ এই যে, উক্ত কাজ প্রকৃতপক্ষে হাসান কিন্তু তার উত্তম হওয়ার কারণে মামূরবিহীর মধ্যে উত্তমতা এসেছে। উত্তম হওয়ার ক্ষেত্রে মামূরবিহীর কোনো ভূমিকা নেই।

মোটকথা حسن لغيره ৩ প্রকার–

১. ভিন্ন কাজটি মামূরবিহী আদায় হওয়ার দ্বারা আদায় হয় না। বরং মামূরবিহী আদায় হওয়ার জন্য ভিন্ন কাজের প্রয়োজন পড়ে। আর উক্ত ভিন্ন কাজটি আদায় করার জন্যও ভিন্ন আমল করতে হয়।

২. মামূরবিহী আদায় হওয়ার দ্বারা ভিন্ন কাজটিও আদায় হয়ে যায়। অর্থাৎ মামূরবিহী এবং উক্ত ভিন্ন কাজ উভয়ই এক আমল দ্বারা আদায় হয়ে যায়। প্রত্যেকটির জন্য ভিন্ন ভিন্ন আমলের প্রয়োজন হয় না।

৩. মামূরবিহী এমন উত্তমতার দরুন হাসান বা উত্তম যা তার শর্তের মধ্যে রয়েছে। আর পূর্বে তা حسن لعينه ছিলো। কিংবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলো।

فِيْ هٰذَا التَّقْسِيْمِ وَاَمْثِلَتِهٖ مُسَامَحَاتٌ لِاَنَّ ضَمِيْرَ هُوَ راجِعٌ اِلَى الْغَيْرِ وَضَمِيْرَ يَكُوْنُ راجِعٌ اِلَى الْمَامُوْرِ بِهٖ وَفِيْهِ اِنْتِشَارٌ وَالْمَعْنٰى اِنَّ ذٰلِكَ الْغَيْرَ الَّذِىْ حَسُنَ الْمَامُوْرُ بِهٖ لِاَجْلِهٖ اِمَّا اَنْ لَا يَتَادّٰى بِنَفْسِ فِعْلِ الْمَامُوْرِ بِهٖ بَلْ لَا بُدَّ اَنْ يُّوْجَدَ الْمَامُوْرُ بِهٖ بِفِعْلٍ اٰخَرَ فَهُوَ كَامِلٌ فِىْ كَوْنِهٖ حَسَنًا لِلْغَيْرِ اَوْ يَتَادّٰى بِنَفْسِ فِعْلِ الْمَامُوْرِ بِهٖ لَا يَحْتَاجُ اِلٰى فِعْلٍ اٰخَرَ فَهُوَ قَرِيْبٌ مِّنَ الْحَسَنِ لِعَيْنِهٖ - اَوْ يَكُوْنُ ذٰلِكَ الْمَامُوْرُ بِهٖ حَسَنًا لِحُسْنٍ فِىْ شَرْطِهٖ وَهُوَ الْقُدْرَةُ يَعْنِىْ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ تَعَالٰى لِاَحَدٍ بِاَمْرٍ مِّنَ الْمَامُوْرِ لَا بِحَسْبِ طَاقَتِهٖ وَقُدْرَتِهٖ فَهٰذَا اَيْضًا حَسَنٌ -

---

অনুবাদ॥ এ বিভক্তি ও উদাহরণসমূহের মধ্যেও বেখেয়ালী ঘটেছে। কারণ هو যমীরটি غير এর দিকে ফিরেছে, আবার يكون এর যমীর مامور به এর দিকে ফিরেছে। ফলে এর মধ্যে انتشار ضمائر হয়েছে। অর্থ এই যে, ঐ غير যার কারণে مامور به টি حسن হয়েছে, সেটি হয়ত স্বয়ং مامور به এর فعل দ্বারা আদায় হবে না। বরং مامور به পাওয়া যাওয়ার জন্যে অন্যের فعل প্রয়োজন হবে। তখন সেটা حسن لغيره হওয়ার দিক থেকে পরিপূর্ণ। অথবা স্বয়ং مامور به এর فعل দ্বারা আদায় হবে, অন্যের فعل এর প্রয়োজন হবে না। এটা حسن لعينه এর কাছাকাছি। অথবা مامور به টি তার শর্তের মধ্যে حسن থাকার কারণে حسن হবে। এটা হলো قدرة বা সামর্থ্য। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কাউকে কোন مامور به এর امر দ্বারা এমন দায়িত্ব দেননা যা তার শক্তি বহির্ভূত। আর এটাও حسن।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ قوله فِىْ هٰذَا التَّقْسِيْمِ وَاَمْثِلَتِهٖ الخ : ব্যাখ্যাকার বলেন– এ বিভক্তি এবং তার উদাহরণসমূহের মধ্যে কয়েকটির বিচ্যুতি ঘটেছে। প্রথম এই যে, هو যমীরের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো غير এবং يكون যমীরের মারজা হলো মামূর বিহী। এটা انتشار ضمائر এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এক বাক্যে কয়েকটি যমীরের কয়েকটি মারজা' সাব্যস্ত করা হবে। অথচ এক বাক্যে যদি একাধিক যমীর হয় তাহলে সবগুলোর একই মারজা' হওয়া উচিত। মোটকথা মতনের ভাষ্যে এটা হলো প্রথম বিচ্যুতি।

قوله وَالْمَعْنٰى اَنَّ ذٰلِكَ الْغَيْرَ الخ : এর মধ্যে ওয়াও কারণ জ্ঞাপক (تعليلية)। ব্যাখ্যাকার هو যমীরের মারজা' غير শব্দ হওয়ার ইল্লত বা কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন– এর কারণ এই যে, ভিন্ন যে কাজের দরুন মামূর বিহী হাসান হয় হয়তো হুবহু সে কাজটি মামূর বিহী দ্বারা আদায় হবে না। বরং এটা জরুরি যে, মামূর বিহী অন্য কাজ দ্বারা বিদ্যমান হবে। এক্ষেত্রে মামূর বিহীটা হাসান লি গায়রিহী হওয়ার ব্যাপারে কামিল হবে। কারণ এক্ষেত্রে তার এবং উক্ত ভিন্ন কাজের মধ্যে ব্যবধান রয়েছে। আর মামূর বিহীর জন্য ভিন্ন আমলের প্রয়োজন পড়ে। আর ভিন্ন সে আমলে জন্য ভিন্ন আমল করার প্রয়োজন হয়। অথবা মামূর বিহীর আদায়ের দ্বারা তা আদায় হয়ে যাবে। অন্য কোনো কাজের মুখাপেক্ষী হবে না। এক্ষেত্রে তা উত্তম হওয়া হাসান লি আইনিহীর নিকটবর্তী হবে। কেননা এক্ষেত্রে তার এবং ভিন্ন কাজের মাঝে কোনো ব্যবধান নেই। অর্থাৎ উভয়ের জন্য এক কাজই যথেষ্ট হয়ে যায়।

অথবা মামুর বিহী এই কারণে হাসান যে, তার শর্তের মধ্যে উত্তমতা রয়েছে। আর তা হলো সক্ষমতা। এর উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তাআলা বান্দাকে কোনো কাজের মুকাল্লাফ ও দায়িত্বশীল বানান না যতোক্ষণ না তার মধ্যে উক্ত কাজ আঞ্জাম দেয়ার সক্ষমতা থাকে। সুতরাং এটাও হাসানের একটি প্রকার হলো।

وَهٰذَا الْقِسْمُ لَيْسَ بِقِسْمٍ فِى الْوَاقِعِ وَلٰكِنَّهٗ شَرْطٌ لِلْاَقْسَامِ الْخَمْسَةِ الْمُقَدَّمَةِ لِعَيْنِهٖ وَلِغَيْرِهٖ وَلِهٰذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الْجُمْهُوْرُ بِعُنْوَانِ التَّقْسِيْمِ وَاِنَّمَا ذَكَرَهٗ فَخْرُ الْاِسْلَامِ مُسَامَحَةً وَسَمَّاهُ ضَرْبًا سَادِسًا جَامِعًا لِكُلٍّ مِنَ الْخَمْسَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَاِذَا كَانَ جَامِعًا فَيَنْبَغِىْ اَنْ يَقُوْلَ بَعْدَ مَاكَانَ حَسَنًا لِمَعْنًى فِىْ نَفْسِهٖ اَوْ مُلْحَقًا بِهٖ اَوْ لِغَيْرِهٖ حَتّٰى اَنْ يَكُوْنَ الْمَعْنٰى اَ الْمَامُوْرُ بِهٖ بَعْدَ مَا كَانَ حَسَنًا لِمَعْنًى فِىْ نَفْسِهٖ كَالتَّصْدِيْقِ وَالصَّلٰوةِ اَوْ مُلْحَقًا بِهٖ كَالزَّكٰوةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ اَوْ لِغَيْرِهٖ كَالْوُضُوْءِ وَالْجِهَادِ صَارَ حَسَنًا لِمَعْنًى اٰخَرَ وَهُوَ كَوْنُهٗ مَشْرُوْطًا بِالْقُدْرَةِ فَلِهٰذِهِ الْقُدْرَةِ صَارَتِ الْاَوَامِرُ الشَّرْعِ كُلُّهَا حَسَنَةً لِلْغَيْرِ وَلٰكِنَّ الْحُسْنَ لِمَعْنًى فِىْ نَفْسِهٖ وَ الْمُلْحَقِ بِهٖ صَارَ جَامِعًا لِكَوْنِهٖ لِعَيْنِهٖ وَلِغَيْرِهٖ - وَلِهٰذَا قَيَّدَهٗ بِهِمَا بِخِلَافِ مَا كَانَ لِغَيْرِهٖ فَاِنَّهُ اجْتَمَعَ فِيْهِ الْحَسَنُ لِغَيْرِهٖ مِنْ جِهَتَيْنِ لِاَجْلِ الْغَيْرِ الْمُعَيَّنِ وَلِاَجْلِ الْقُدْرَةِ فَلَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهٖ لِغَيْرِهٖ وَلَعَلَّهٗ لِهٰذَا لَمْ يُقَيِّدْهُ بِهٖ ثُمَّ بَعْدَ هٰذِهِ الْمُسَامَحَاتِ الثَّلٰثَةِ قَدْ تَسَامَعَ فِىْ اَمْثِلَتِهٖ حَيْثُ قَالَ كَالْوُضُوْءِ وَالْجِهَادِ وَالْقُدْرَةُ الَّتِىْ يَتَمَكَّنُ بِهَا الْعَبْدُ مِنْ اَدَاءِ مَا لَزِمَهٗ

অনুবাদ ॥ তবে বাস্তবিকভাবে এটা কোন প্রকার নয়। বরং حسن لعينه ও حسن لغيره এর পূর্বোক্ত পাঁচ প্রকারের জন্যে এটা শর্ত বিশেষ। তাই অধিকাংশ উসূলবিদ حسن لعينه ও حسن لغيره এর শিরোনামে এটা উল্লেখ করেন নি।

কেবলমাত্র ইমাম ফখরুল ইসলাম বযদবী (র) এটা বেখেয়ালীভাবে উল্লেখ করেছেন। এবং এটাকে ষষ্ঠ প্রকার নাম দিয়েছেন যা পূর্বের পাঁচ প্রকারকে শামিল করে। যেহেতু এটা সবগুলোকে অন্তর্ভুক্তকারী। কাজেই এভাবে বলা উচিৎ ছিল بَعْدَ مَا كَانَ حَسَنًا لِمَعْنًى فِىْ نَفْسِهٖ اَوْ مُلْحَقًا بِهٖ اَوْ لِغَيْرِهٖ তখন অর্থ এই হতো যে, مامور به প্রকৃত অর্থে حسن যেমন تصديق ও صلوة অথবা حسن -এর সাথে সংশ্লিষ্ট যেমন زكوة، صوم ও حج কিংবা حسن لغيره যেমন جهاد، وضوء অন্য কোন কারণে حسن হয়েছে। আর তা হচ্ছে مامور به টি قدرة বা সামর্থের সাথে শর্তযুক্ত হওয়া। এ قدرة এর কারণেই শরিআতের সকল নির্দেশ حسن لغيره হয়েছে। তবে প্রকৃত অর্থে حسن لعينه ও ملحق به এ দুটি حسن لعينه ও حسن لغيره এ দুটিকে শামিল করে। এজন্যে গ্রন্থকার এ দুটির সাথে এ শর্ত (শর্তের মধ্যে حسن থাকা) যুক্ত করেছেন। তবে حسن لغيره এর বিপরীত। কেননা তা দুদিক থেকে حسن لغيره হয় (যথা) غير টি নির্দিষ্ট হওয়ার কারণে এবং قدرة এর কারণে। সুতরাং এটা حسن لغيره হওয়া থেকে বের হয়না। সম্ভবত এ কারণেই গ্রন্থকার حسن لغيره এর সাথে শর্তের মধ্যে حسن থাকার শর্তারোপ করেন নি। অতপর এ তিনটি تسامح এর পরে মুসান্নিফ (র) উদাহরণের ক্ষেত্রেও বেখেয়ালী প্রদর্শন করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন- وضوء، جهاد ও قدرة *বা সামর্থ্য যার মাধ্যমে বান্দা তার আবশ্যকীয় বিষয় সম্পাদনে সক্ষম হয়।*

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله وهذا القسم ليس بقسم فى الواقع الخ : এ পর্যন্ত মোট ৬ প্রকার উল্লেখিত হয়েছে। ১. হাসান লি আইনিহী যা রহিতযোগ্য নয়। ২. হাসান লি আইনিহী যা রহিতযোগ্য। ৩. যা হাসান লি আইনিহীর সাথে সংশ্লিষ্ট এবং হাসান লি গাইরিহী এর সামঞ্জস্যপূর্ণ। ৪. হাসান লি গাইরিহী যা মামূরবিহী আদায় হওয়ার দ্বারা আদায় হয় না। ৫. হাসান লি গাইরিহী যা মামূরবিহী আদায় হওয়ার দ্বারা আদায় হয়ে যায়। ৬. এমন মামূরবিহী যা নিজ শর্তের উত্তমতার দরুন উত্তম বিবেচিত।

নূরুল আনওয়ার গ্রন্থকার বলেন- এই ষষ্ঠ প্রকার প্রকৃতপক্ষে কোনো প্রকার নয়। তবে হাসান লি আইনিহী ও হাসান লি গাইরিহী এর পূর্বোক্ত পাঁচো প্রকারের জন্য শর্ত। ষষ্ঠ প্রকার যেহেতু ভিন্ন কোনো প্রকার নয়। এ কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ উসূলবিদগণ এটাকে বিভক্তির শিরোনামের সাথে উল্লেখ করেননি। অর্থাৎ এটাকে হাসান লি গায়রিহীর প্রকার বানিয়ে উল্লেখ করেননি। অবশ্য আল্লামা ফখরুল ইসলাম (র) এটাকে ভুলবশত ষষ্ঠ প্রকার দ্বারা নামকরণ করেছেন। কিন্তু এখন এ প্রশ্ন হয় যে, এ প্রকার যেহেতু পূর্বের পাঁচো প্রকারকে শামিল করে কাজেই মতনে بعد ما كَانَ حَسَنًا لِمَعْنًى فِىْ نَفْسِهِ اَوْ مُلْحَقًا بِهِ এর পরে اولغيره বলা উচিত ছিলো। অর্থাৎ এরপরে যে উক্ত মামূরবিহী হাসান লি আইনিহী হোক কিংবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট হোক বা হাসান লি গাইরিহী হোক এমন বলা উচিত ছিলো। তাহলে পূর্ণ ইবারতের উদ্দেশ্য এই হতো যে, মামূরবিহী হাসান লি আইনিহী হওয়ার পরে যেমন তাসদীক এবং নামায অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার পরে যেমন যাকাত, রোযা ও হজ্জ অথবা হাসান লি গায়রিহী হওয়ার পরে যেমন উযু ও জিহাদ ভিন্ন কারণে উত্তম হয়েছে। আর উক্ত দ্বিতীয় কারণটি হলো মায়ুরবিহীর সক্ষমতা শর্তের সাথে শর্তারোপ হওয়া। সুতরাং যখন সক্ষমতার উত্তমতার কারণে পূর্বের সকল প্রকারের ভিতরে উত্তমতা এসেছে। কাজেই এ দিক দিয়ে শরীআতের সকল বিধান হাসান লি গায়রিহী সাব্যস্ত হবে। কারণ সকল বিধানের জন্য সক্ষমতা শর্ত।

এর উত্তর এই যে, যে মামূরবিহীটা হাসান লি আইনিহী এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট উভয়ের মধ্যে حسن لذاته (মূলগত উত্তমতা)ও থাকে। আর ভিন্ন বস্তু অর্থাৎ শর্তের সক্ষমতার কারণেও উত্তম হয়। অতএব এ উভয়টি لعينه হাসান হলো। لغيره ও হাসান হলো। এ কারণে মাতিন (র) স্বীয় উক্তি حسنا لحسن فى شرطه কে হাসান লি ওআইনিহী এবং হাসান লি ওআইনিহীর সংশ্লিষ্টের সাথে গ্রথিত করেছেন। যাতে উভয়টি হাসান লি আইনিহীর সাথে সাথে হাসান লি গায়রিহীও হয়। বাকী হাসান লি গায়রিহী যেহেতু প্রথম থেকে মামূরবিহীর ভিন্ন বস্তু দ্বারা হাসান হয়েছে। আর সক্ষমতার শর্তের কারণে তা হাসান লি গায়রিহী হওয়া থেকে খারিজ হয়নি। বরং ২ কারণে হাসান লি গায়রিহী হয়েছে। এক কারণতো অনির্দিষ্ট, আর দ্বিতীয় কারণ হলো সক্ষমতা। একারণে اويكون حَسَنًا لِحُسْنٍ فِى شَرْطِه এর পরে লি গায়রিহী উল্লেখ করার কোনো জরুরত নেই। এটাকে ব্যাখ্যাকার এভাবে বলেছেন যে,

যেহেতু সক্ষমতার শর্তের কারণেই হাসান লি গায়রিহীটা লি গায়রিহী থাকে। এ কারণে মাতিন (র) ষষ্ঠ প্রকার অর্থাৎ حَسَنًا لِحُسْنٍ فِى شَرْطِه কে হাসান লি গায়রিহীর কয়েদ দ্বারা বিশেষিত করেননি।

قوله ثُمَّ بَعْدَ هٰذِهِ الْمُسَامَحَاتِ الخ : ব্যাখ্যাকার (র) বলেন- যেভাবে হাসান লি গায়রিহীর বিভক্তির মাঝে মাতিন (র) এর ৩টি বিচ্যুতি ঘটেছে। ১. انتشار ضمائر- এর ক্ষেত্রে ২. اويكون حَسَنًا لِحُسْنٍ فِى شرطه কে ভিন্ন ষষ্ঠ প্রকার গণ্য করার কারণে। ৩. بعد ماكان حَسَنًا لِمَعْنًى فِى نَفْسِه اوملحقابه এর পরে اولغيره উল্লেখ করার কারণে। এভাবে উদাহরণের মধ্যেও বিচ্যুতি ঘটেছে। যেমন সামনে আসছে।

فَالْوُضُوْءُ مِثَالٌ لِلْمَامُوْرِ بِهِ الَّذِي لَا يَتَادَّى الغَيْرُ بِاَدَائِهِ فَاِنَّهُ فِي نَفْسِهِ تَبْرِيْدٌ وَ تَنْظِيْفٌ لِلْاَعْضَاءِ وَاِضَاعَةٌ لِلْمَاءِ وَاِنَّمَا حَسُنَ لِاَجْلِ اَدَاءِ الصَّلٰوةِ وَالصَّلٰوةُ مِمَّا لَا يَتَادَّى بِنَفْسِ فِعْلِ الْوُضُوْءِ بَلْ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ فِعْلٍ اٰخَرَ قَصْدًا تُوْجَدُ بِهِ الصَّلٰوةُ وَاِذَا نَوٰى فِي هٰذَا الْوُضُوْءِ كَانَ مَنْوِيًّا وَقُرْبَةً مَقْصُوْدَةً يُثَابُ عَلَيْهَا وَالْجِهَادُ مِثَالٌ لِلْمَامُوْرِ بِهِ الَّذِي يَتَادَّى الغَيْرُ بِاَدَائِهِ فَاِنَّهُ فِي نَفْسِهِ تَعْذِيْبُ عِبَادِ اللّٰهِ وَتَخْرِيْبُ بِلَادِ اللّٰهِ وَاِنَّمَا حَسُنَ لِاَجْلِ اِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللّٰهِ وَالْاِعْلَاءُ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ فِعْلِ الْجِهَادِ لَا بِفِعْلٍ اٰخَرَ بَعْدَهُ -

অনুবাদ ॥ وضوء এমন مامور به এর উদাহরণ যা আদায়ের দ্বারা غير আদায় হয় না। কারণ وضوء হলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করা, পরিচ্ছন্ন করাও পানি বিনষ্ট করা (খরচ করা)। এটা حسن হয়েছে নামায আদায়ের কারণে। আর নামায এমন مامور به যা وضوء সম্পাদনের মাধ্যমে আদায় হয় না; বরং এর জন্যে উদ্দেশ্যগতভাবে আরও একটি فعل এর প্রয়োজন পড়ে যার মাধ্যমে নামায পাওয়া যায়। যখন এ উযূর মধ্যে নিয়ত করবে তখন তা নিয়্যতকৃত ও উদ্দেশ্যগতভাবে নৈকট্য লাভের উপায় হবে, যার বিনিময়ে সাওয়াব লাভ করবে। আর جهاد হলো এমন مامور به এর উদাহরণ যা আদায়ের মাধ্যমে غير আদায় হয়ে যায়। তা হলো আল্লাহর বান্দাদেরকে কষ্ট দেয়া ও আল্লাহর যমীনকে ক্ষতিগ্রস্ত করা। এটা حسن হয়েছে কেবলমাত্র আল্লাহর বাণী সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে। جهاد এর মাধ্যমেই আল্লাহর বাণী সমুন্নত করার বিষয়টি অর্জিত হয়। এর পরে অন্য কোন কাজ দ্বারা তা অর্জিত হয় না।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ মোটকথা হাসান লি গায়রিহীর প্রথম উদাহরণ হলো উযু। কারণ উযু এমন একটি বিষয় যা নিজে কোনো হাসান তথা উত্তম কাজ নয়। বরং নামায আদায়ের মাধ্যমে এর মধ্যে উত্তমতা এসেছে। কারণ উযু হলো প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন অঙ্গ ঠাণ্ডা করা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা ও পানি বিনষ্ট করার নাম। আর অঙ্গ ঠাণ্ডা করা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা এবং পানি বিনষ্ট করার মধ্যে শরয়ী ও আকলীভাবে কোনো উত্তমতা নেই। বরং পানি বিনষ্টের দিক দিয়ে এক ধরনের অন্যায় রয়েছে। কিন্তু যখন নামাযের উদ্দেশ্যে উযু করা হয়েছে তখন একটি ইবাদতে মাকসূদা পরিগণিত হয়েছে যার দরুন সওয়াব লাভ হয়ে থাকে। আর যে কাজে সওয়াব হয় তাকে হাসান তথা উত্তম বলা হয়। এ কারণে উযু নামাযের কারণে হাসান হয়েছে। আর অন্যের কারণে হাসান হওয়ার দরুন তাকে হাসান লি গায়রিহী বলা হয়। উযু করার দ্বারা যেহেতু নামায আদায় হয়ে যায় না। বরং এর জন্য ভিন্ন আমলের প্রয়োজন পড়ে। এ কারণেই উযু হাসান লি গায়রিহীর প্রথম প্রকার لَايَتَادّٰى بِنَفْسِ الْمَامُوْرِبِهِ এর উদাহরণ হবে।

এ ব্যাপারে কোনো ব্যক্তি প্রশ্ন করে বলেন– উযুকে হাসান লি গায়রিহীর উদাহরণ স্বরূপ পেশ করা মুনাসিব নয়। কেননা উযু যদি নামাযের উদ্দেশ্য ছাড়া করা হয়। তথাপি তার দ্বারা পবিত্রতা লাভ হয়। আর পবিত্রতা একটি উত্তম কাজ। যে কারণে শরীআতে সবসময় উযু অবস্থায় থাকাকে মুস্তাহাব সাব্যস্ত করেছে। আর শরীআতে যা মুস্তাহাব তা হাসান হয়ে থাকে। কাজেই উযু স্বয়ং হাসান কাজ। এ কারণে উযুর পরিবর্তে এর উদাহরণে জুমআর নামাযের জন্য سعى কে পেশ করলে তা ভালো হতো। কারণ দ্রুত পদক্ষেপ কোনো ভালো কাজ নয়। একমাত্র জুমআর নামাযের কারণে এর মধ্যে উত্তমতা এসেছে। আর এর দ্বারা যেহেতু জুমআর নামায আদায় হয়ে যায় না বরং ভিন্ন আমলের প্রয়োজন পড়ে এজন্য হাসান লি গায়রিহীর প্রথম প্রকার لَايَتَادّٰى بِنَفْسِ الْمَامُوْرِبِهِ এর উদাহরণ হয়ে যেতো।

قوله وَالْجِهَادُ مِثَالٌ لِلْمَامُوْرِبِهِ الخ : মোল্লা জুয়ুন (র) বলেন– হাসান লি গায়রিহীর ৩ প্রকারের মধ্যে থেকে জিহাদ এমন মামূরবিহীর উদাহরণ যা আদায় করার দ্বারা উক্ত ভিন্ন বিষয়ও আদায় হয়ে যায়। যার দরুন মামূর

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

وَكَذٰلِكَ اِقَامَةُ الْحُدُوْدِ فِىْ نَفْسِهَا تَعْذِيْبٌ وَاِنَّمَا حَسُنَ لِزَجْرِ النَّاسِ مِنَ الْمَعَاصِىْ وَالزَّجْرُ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ اِقَامَةِ الْحُدُوْدِ لَا بِفِعْلٍ اٰخَرَ بَعْدَهُ وَكَذٰلِكَ صَلٰوةُ الْجَنَازَةِ فِىْ نَفْسِهَا بِدْعَةٌ مُشَابِهَةٌ لِعِبَادَةِ الْاَصْنَامِ وَاِنَّمَا حَسُنَتْ لِاَجْلِ قَضَاءِ حَقِّ الْمُسْلِمِ وَهُوَ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ لَا بِفِعْلٍ بَعْدَهَا فَهٰذِهِ الْوَسَائِطُ وَهِىَ كُفْرُ الْكَافِرِ وَاِسْلَامُ الْمَيِّتِ وَهَتْكُ حُرْمَةِ الْمَنَاهِىْ كُلُّهَا بِفِعْلِ الْعِبَادِ وَاخْتِيَارِهِمْ فَلِهٰذَا اُعْتُبِرَتِ الْوَسَائِطُ هٰهُنَا وَجُعِلَتْ دَاخِلَةً فِى الْحَسَنِ لِغَيْرِهِ بِخِلَافِ وَسَائِطِ الزَّكٰوةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ اَعْنِىْ فَقْرَ الْفَقِيْرِ وَعَدَاوَةَ النَّفْسِ وَشَرَفَ الْمَكَانِ فَاِنَّهَا بِمَحْضِ خَلْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَلَا اِخْتِيَارَ فِيْهَا لِلْعَبْدِ اَصْلًا وَلِهٰذَا جُعِلَتْ مِنَ الْمُلْحَقِ بِالْحَسَنِ لِعَيْنِهِ فَتَاَمَّلْ وَالْقُدْرَةُ مِثَالٌ لِلشَّرْطِ الَّذِىْ حَسُنَ الْمَامُوْرُ بِهٖ لِاَجْلِهٖ لَا لِلْمَامُوْرِ بِهٖ وَاِنْ قَدَّرْتَ الْمُضَافَ وَقُلْتَ مَشْرُوْطُ الْقُدْرَةِ كَانَ مِثَالًا لِلْمَامُوْرِ بِهِ الْمَشْرُوْطِ بِهَا

অনুবাদ ॥ এভাবে হদ্দ বা শরয়ী দণ্ড বিধান কায়েম করা حسن হয়েছে মানুষকে অপরাধ হতে নিবৃত্ত করার জন্যে। দণ্ডবিধান কার্যকর করার মাধ্যমেই নিবৃত্ত করণ সম্ভব হয়। এর পরবর্তী কোন কাজের মাধ্যমে নয়। একইভাবে صلوة الجنازة মূলতঃ বিদআত কাজ যা মূর্তিপূজার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে এর দ্বারা মুসলিমের হক আদায়ের কারণে তা حسن হয়েছে, যা মানে جنازة নামাযের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়, এর পরে অন্য কোন কাজের মাধ্যমে হয় না। সুতরাং এ সকল মাধ্যম তথা কাফিরের কুফরী, মৃত মুসলিম ব্যক্তি হওয়া, নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের মর্যাদাহানি সবই বান্দার কাজ ও ইচ্ছার মাধ্যমে হয়ে থাকে। ফলে এখানে মাধ্যমগুলো ধর্তব্য হয়েছে। এবং এগুলোকে حسن لغيره এর মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। তবে زكوة، صوم ও حج এর মাধ্যমগুলো ভিন্নতর। অর্থাৎ দরিদ্রের দারিদ্র্য, আত্মার শত্রুতা, স্থানের মর্যাদা সবকিছুই আল্লাহর সৃজনানুসারে হয়েছে। এসবের মধ্যে বান্দার আদৌ কোন এখতিয়ার নেই। এজন্যেই এগুলোকে حسن لعينه এর সাথে সংশ্লিষ্ট গণ্য করা হয়েছে। অতএব চিন্তা কর। আর قدرة হলো এ শর্তের উদাহরণ যে শর্তের কারণে مامور به টি حسن হয়। এটা مامور به এর উদাহরণ নয়। যদি তুমি مضاف কে উহ্য রাখ এবং বল مشروط القدرة، قدرة এর সাথে শর্তযুক্ত বিষয়। তা হলে مامور به এর উদাহরণ হবে যার সাথে قدرة শর্তযুক্ত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ ১. **শরয়ী দণ্ড কায়েম করা :** যেমন ব্যাভিচারিকে রজম তথা পাথর মেরে নিঃশেষ করা। ইচ্ছাপূর্বক হত্যার ক্ষেত্রে কিসাস স্বরূপ হত্যা করা। মদ্যপায়ীকে দুররা মারা ইত্যাদির দ্বারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর বান্দাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়। আল্লাহর বান্দাদের কষ্ট দেয়ার মধ্যে কোনো উত্তমতা থাকতে পারে না। তবে এর দ্বারা

(পূর্বের বাকী অংশ)

বিহীর মধ্যে উত্তমতা এসেছে। সারকথা জিহাদ হলো হাসান লি গায়রিহীর দ্বিতীয় উদাহরণ। জিহাদ হাসান লি গায়রিহী এ কারণে যে, প্রকৃতপক্ষে জিহাদ হলো আল্লাহর বান্দাদেরকে শাস্তি দেয়া এবং বিভিন্ন জনপদকে ধ্বংস করার নাম। অর্থাৎ লুটপাট হত্যাযজ্ঞ ও মারধরের নাম হলো জিহাদ। সুতরাং এর মধ্যে কোনো উত্তমতা না থাকাই সুস্পষ্ট। কিন্তু এর দ্বারা যেহেতু জমিনের বুকে আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করা উদ্দেশ্য হয় যা একটি উত্তম কাজ বটে। এ কারণেই জিহাদ উত্তম বা হাসান বিবেচিত হবে। আর যে বস্তু অন্যের মাধ্যমে হাসান হয় তা হাসান লি গায়রিহী হয়। আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করা যেহেতু স্বয়ং জিহাদ দ্বারা হাসিল হয়ে যায়। এ কারণে এটা হাসান লি গায়রিহীর দ্বিতীয় প্রকার يتادى بنفس المامور به এর উদাহরণ হবে। ব্যাখ্যাকার এর আরো ২টি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন–

যেহেতু মানুষদেরকে বিভিন্ন পাপাচারে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখা উদ্দেশ্য হয় যা একটি উত্তম কাজ। এ কারণেই এর মধ্যে উত্তমতা সূচিত হয়েছে। আর যার মধ্যে অন্যের কারণে উত্তমতা সূচিত হয় তা হাসান লি গায়রিহী হয়। কাজেই শরয়ী দণ্ড কায়েম করা হাসান লি গায়রিহী হবে। আর মানুষদেরকে পাপাচার থেকে বিরত রাখা যেহেতু দণ্ড কায়েম দ্বারা অর্জিত হয়। এর জন্য ভিন্ন কোনো কাজের প্রয়োজন পড়ে না। এ কারণে দণ্ড কায়েম করা হাসান লি গায়রিহীর দ্বিতীয় প্রকার তথা يَتَأَدّٰى بِنَفْسِ الْمَأْمُوْرِ بِهٖ এর উদাহরণ হবে।

২. **জানাযার নামায** : জানাযার নামায এমন একটি কাজ যা মূর্তি পূজার সাথে সামঞ্জস্য রাখে। কারণ নামাযীদের সামনে নিষ্প্রাণ মুর্দারকে রাখা মূর্তির সামনে মাথা রেখে পূজা করার ন্যায়। তবে যেহেতু জানাযার নামাযের মাধ্যমে মুসলমানের হক আদায় করা হয়। যেমন তিরমিযীর আদাব অনুচ্ছেদের ১০৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে যে, এক মুসলমানের অপর মুসলমানের উপর ৬টি হক রয়েছে। ১. অসুস্থ হলে তার খোঁজ খবর নেয়া, ২. মৃত্যু ব্যক্তির জানাযা পড়া, এবং কবরস্তান পর্যন্ত গমন করা, ৩. আহ্বানকারীর উত্তরে সাড়া দেয়া, ৪. সাক্ষাৎকালে সালাম দেয়া, ৫. হাঁচির জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা, ৬. সাক্ষাতে ও অসাক্ষাতে কল্যাণ কামনা করা। এ কারণে মুসলমানের হক আদায়ের দরুন জানাযা নামাযও একটি উত্তম কাজ হলো। আর অন্যের কারণে যা উত্তম হয় তাকে হাসান লি গায়রিহি বলে। কাজেই জানাযার নামায হাসান লি গায়রিহী হবে। আর এর দ্বারা মুসলমান মুর্দারের হক আদায় করা যেহেতু স্বয়ং জানাযার নামায দ্বারাই হাসিল হয়ে যায়। এর জন্য ভিন্ন কোনো আমলের প্রয়োজন পড়ে না। কাজেই এটা হাসান লি গায়রিহীর দ্বিতীয় প্রকার يَتَأَدّٰى بِنَفْسِ الْمَأْمُوْرِ بِهٖ এর উদাহরণ হলো।

قوله فَهٰذِهِ الْوَسَائِطُ الخ : ব্যাখ্যাকার জিহাদ, দণ্ড কায়েম করা এবং জানাযার নামায হাসান লি গায়রিহী হওয়া সাব্যস্ত করার জন্য বলেন যে, উল্লেখিত মাধ্যমসমূহ অর্থাৎ আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ (সমুন্নত) করা, মুসলমান মুর্দারের হক আদায় করা এবং পাপাচার থেকে মানুষকে বিরত রাখা বান্দার কাজ এবং তার এখতিয়ারাধীন। এই কারণেই এই সকল মাধ্যম ধর্তব্য করা হয়েছে। ফলে জিহাদ, দণ্ড, কায়েম করা এবং জানাযার নামায হাসান লি গায়রিহী সাব্যস্ত হবে। এর বিপরীতে যাকাত, রোযা ও হজ্জের মাধ্যমসমূহ অর্থাৎ অভাবীদের অভাব দূর করা, নফসে আম্মারাকে দমন করা এবং খানায়ে কা'বার মর্যাদা প্রদান করা এসব আল্লাহর সৃষ্টি করার দরুন হয়েছে। এসকলের মধ্যে বান্দার কাজ ও এখতিয়ারের কোনো দখল নেই। এই কারণেই এসবের ধর্তব্য না করে যাকাত, রোযা ও হজ্জকে হাসান লি আইনিহীর সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে।

প্রশ্ন : ব্যাখ্যাকার এর বাহ্যিক ইবারতের উপর একটি প্রশ্ন আরোপিত হয় যে, তিনি জিহাদ উত্তম হওয়ার মাধ্যম, কাফেরের কুফরী এবং দণ্ড কায়েম করা হাসান হওয়ার মাধ্যম পাপাচার থেকে বিরত রাখাকে এবং জানাযার নামায হাসান হওয়ার মাধ্যম মুর্দারের হক আদায় করাকে সাব্যস্ত করেছেন। অথচ এগুলোর কোনোটি উত্তমতার মাধ্যম নয়। যেমন অধম উল্লেখ করলো। তথাপি এগুলোকে উত্তম বলার কারণ কি?

উত্তর : এই সকল মাধ্যমের শুরুতে একটি শব্দ উহ্য রয়েছে। পূর্ণ ইবারত এমন হবে اِعْدَامُ كُفْرِ الْكَافِرِ وَ قَضَاءُ حَقِّ إِسْلَامِ الْمَيِّتِ، وَالزَّجْرُعَنْ هَتْكِ حُرْمَةِ الْمَنَاهِى অর্থাৎ জিহাদ উত্তম হওয়ার মাধ্যম হলো কাফেরের কুফরীকে নিশ্চিহ্ন করা। নামায উত্তম হওয়ার কারণ হলো মুসলমান মুর্দারের হক আদায় করা। আর হক কায়েম উত্তম হওয়ার মাধ্যম হলো নিষিদ্ধকাজসমূহ থেকে বিরত রাখা। কাজেই এখন কোনো প্রশ্ন আরোপিত হবে না।

قوله وَالْقُدْرَةُ مِثَالٌ لِلشَّرْطِ الخ : এখান থেকে মাতিন (র) মামূর বিহী হাসান লি গায়রিহীর তৃতীয় প্রকার اويكون حَسَنًا لِحُسْنٍ فِىْ شَرْطِه এর উদাহরণ দিচ্ছেন। তবে উদাহরণটি ممثل له এর মুতাবিক নয়। কারণ সক্ষমতা মামূরবিহীর উদাহরণ নয়। বরং যে শর্তের কারণে মামূর বিহী হাসান হয়েছে তার উদাহরণ। অথচ উদাহরণ হওয়া উচিত ছিলো মামূর বিহী হাসান লি গায়রিহীর। যেমন উযু এবং জিহাদ হাসান লি গায়রিহীর উদাহরণ। যদি এ উত্তর দেয়া হয় যে, মতনে قدرة শব্দের পূর্বে মুযাফ উহ্য রয়েছে। মূল ইবারত হলো ومشروط القدرة অর্থাৎ তৃতীয় প্রকারের উদাহরণ হলো সক্ষমতার শর্তআরোপিত হওয়া। আর সক্ষমতার শর্তারোপিত হওয়া এমন মামূর বিহী যার জন্য কুদরত শর্ত। এক্ষেত্রে উদাহরণটি নিঃসন্দেহে ঐ মামূর বিহীর হবে যা এ কারণে হাসান হয়েছে যে, তার শর্ত তথা কুদরতের মধ্যে উত্তমতা রয়েছে। তখন উদাহরণটি ممثل له এর মুতাবেক হবে।

وَاِنْ جَعَلْتَ ضَمِيْرَ او يَكُوْنَ حَسَنًا رَاجِعٌ اِلَى الْغَيْرِ كَمَا كَانَ ضَمِيْرُ لَا يَتَادّٰى اَوْ يَتَادّٰى رَاجِعًا اِلَيْهِ كَمَا قِيْلَ لَمْ يَنْتَشِرِ الْكَلَامُ وَتَكُوْنُ الْقُدْرَةُ مِثَالًا لِّلْغَيْرِ بِلَا تَكَلُّفٍ لٰكِنْ يَكُوْنُ الشَّرْطُ حِيْنَئِذٍ بِمَعْنَى الْمَشْرُوْطِ وَيَكُوْنُ الْمَعْنٰى اَوْ يَكُوْنَ الْغَيْرُ كَالْقُدْرَةِ حَسَنَةً لِحُسْنٍ فِىْ مَشْرُوْطِهَا فَانْقَلَبَ الْمَقْصُوْدُ وَانْعَكَسَ الْمُدَّعٰى - وَبِالْجُمْلَةِ لَا يَخْلُوْ هٰذَا الْمَقَامُ عَنْ تَمَحُّلٍ

অনুবাদ॥ আর যদি او يكون حسنا এর ضمير কে غير এর প্রতি ফিরাও, যেমনিভাবে لا يتادى ও يتادى এর ضمير তার দিকে ফিরেছে। যেমনটা বলা হয়ে থাকে। তাহলে বাক্যটি منتشر (বিক্ষিপ্ত) হয় না। তখন কোন تكلف ছাড়াই قدرة টি غير এর উদাহরণ হবে। তবে তখন شرط টি مشروط অর্থে হবে এবং অর্থ এরূপ হবে যে, اَوْ يَكُوْنُ الْغَيْرُ كَالْقُدْرَةِ حَسَنَةً لَحُسْنٍ فِىْ مَشْرُوْطِهَا অর্থাৎ غير টি قدرة এর ন্যায় حسن হবে তার مشروط এর মধ্যে حسن থাকার কারণে। তখন উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং দাবী পাল্টে যায়। মোটকথা এ স্থানটি ত্রুটিমুক্ত নয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ আর আপনি যদি বলে اَوْيَكُوْن حَسَنًا لِحُسْنٍ فِىْ شَرْطِه মধ্যে ليكون এর যমীর মামুর বিহীর প্রতি ফিরেনি বরং غير এর দিকে ফিরেছে। যেমন لايتادى ও يتادى এর জমির غير এর দিকে ফিরেছে। তখন এর উপকার এই হবে যে, মুসান্নিফ (র) এর ভাষ্য বিক্ষিপ্ত তথা انتشار ضمائر মুক্ত হবে।

দ্বিতীয় ফায়েদা এই যে, মুযাফ উহ্য মানা ছাড়াই এটা غير এর উদাহরণ হবে এবং উদাহরণ ممثل له এর মুতাবেক হয়ে যাবে। তবে তখন মতনের ইবারত فى شرطه এর মধ্যে شرط টি مشروط এর অর্থে হবে। কেননা যদি শর্তকে مشروط অর্থে না নেয়া হয় তখন অর্থ হবে "হয়তো ভিন্ন সে বিষয়টি এমন উত্তমতা দ্বারা উত্তম হবে যা তার শর্তের মধ্যে রয়েছে"। আর শর্তও মামূর বিহী হয়ে থাকে। সুতরাং উদ্দেশ্য এই হলো যে, ভিন্ন বিষয়টি এ কারণে হাসান হয়েছে যা তার ভিন্ন বস্তুর মধ্যে রয়েছে। আর এ উদ্দেশ্য একেবারেই অযৌক্তিক। এ কারণে শর্তকে مشروط অর্থে নেয়া হয়েছে। কাজেই এখন এ উদ্দেশ্য হলো যে, হয়তো ভিন্ন বিষয়টি যেমন কুদরত এমন কারণে হাসান হয়েছে যে, উত্তমতা তার মাশরূতের মধ্যেই রয়েছে। আর তা হলো মামূর বিহী।

সুতরাং উদ্দেশ্য এই হলো যে, ভিন্ন বিষয় তথা কুদরতের মধ্যে উত্তমতা এসেছে তার মামূর বিহীর কারণে। এক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্য পরিবর্তন হয়ে গেলো এবং দাবি পাল্টে গেলো। কেননা উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, মাশরূত তথা মামূর বিহী এ কারণে হাসান হয়েছে যে, তার শর্তের মধ্যে উত্তমতা রয়েছে। এক্ষেত্রে এটা অনিবার্য হয় যে, শর্ত তথা ভিন্ন বিষয়টি যেমন কুদরত হাসান হয়েছে এ কারণে যে, তার মাশরূত তথা মামূর বিহীর মধ্যে উত্তমতা রয়েছে। মোটকথা এ বিষয়টি অনেক জটিল অর্থাৎ ইবারতকে স্বঅবস্থায় বহাল রাখলে ممثل له - مثال এর মোতাবেক হয় না। আর মাশরূত উহ্য মানলে তা মূলের পরিপন্থী এবং অনুচিত বিবেচিত হয়। আবার يكون এর যমীরের মারজা' যদি غير কে সাব্যস্ত করা হয় এবং শর্তকে মাশরূতের অর্থে নেয়া হয়। তাতেও উদ্দেশ্যের খেলাপ সাব্যস্ত হয়।

ثُمَّ وَصَفَ الْقُدْرَةَ بِقَوْلِهِ يَتَمَكَّنُ بِهَا الْعَبْدُ مِنْ اداءِ مَا لَزِمَهُ لِلْإِيْمَاءِ إِلَى اَنَّ هٰذِهِ الْقُدْرَةَ لَيْسَتْ قُدْرَةً حقِيْقَةً يَكُوْنُ مَعَهَا الْفِعْلُ وتَكُوْنُ عِلَّةً لَهُ بِلَا تَخَلُّفٍ - فَإِنَّ ذٰلِكَ لَيْسَ مَدَارَ التَّكْلِيْفِ لِاَنَّه لا يَكُوْنُ سابِقًا علَى الْفِعْلِ حَتّٰى يُكَلَّفَ بِسَبَبِهِ الْفاعِلُ بَلِ الْمُرادُ بِها هٰهُنا هِيَ الْقُدْرَةُ الَّتِىْ بِمَعْنَى سَلَامَةِ الْاَسْبَابِ وَالْآلاتِ وصِحَّةِ الْجَوارِحِ فَإِنَّها تَتَقَدَّمُ عَلَى الْفِعْلِ وصِحَّةُ التَّكْلِيْفِ اِنَّما يَعْتَمِدُ عَلى هٰذه الْاِسْتِطاعَةِ فَقُدْرَةُ التَّوَضِّى حِيْنَ وِجْدانِ الْماءِ وإِلَّا فَالتَّيَمُّمُ وقُدْرَةُ تَوجُّهِ الْقِبْلَةِ حِيْنَ عدَمِ الْخَوْفِ و وُجُودِ الْعِلْمِ وإِلَّا فَجِهَةُ الْقُدرةِ او التَّحرِّىْ وقُدرة الْقِيامِ حِيْنَ الصِّحَّةِ وإِلَّا فالْقُعُوْدُ او الْإِيْماءُ وقدرةُ الزَّكوةِ حِيْنَ مِلْكِ النِّصابِ وإِلَّا فَهُوَ مَعْفُوٌّ وقدرةُ الصَّوم حِيْنَ الصِّحَّةِ وَالْاِقامَةِ وَإِلَّا فَالْقَضاءُ خَلْفُه وقُدْرَةُ الْحَجِّ حِيْنَ وِجْدانِ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ وصِحَّةِ الْاَعْضاءِ وأَمْنِ الطَّرِيْقِ وإِلَّا فَهُوَ تَطَوُّعٌ وعلَى هٰذا الْقِيَاسِ -

অনুবাদ ॥ ... গ্রন্থকার তার ভাষায় قدرة এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন যে, يتمكن بها العبد من الاداء ما لزمه (এর মাধ্যমে বান্দা তার কর্তব্য পালনে সক্ষম হয়')। এ দিকে ইঙ্গিত করার জন্যে যে, এ قدرة প্রকৃত قدرت বা ক্ষমতা নয়, যার সাথে فعل থাকে। বরং এটা فعل এর জন্যে علة হয়ে থাকে কোন অস্বাভাবিকতা ছাড়াই। কারণ তা (قدرة) تكليف (দায়িত্ব প্রদান) এর ভিত্তি নয়। কেননা তা فعل এর আগে আসেনা, যাতে এর কারণে فاعل কে مكلف বানানো যেতে পারে। বরং এখানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন قدرة যার অর্থ হলো উপায়-উপকরণ নিরাপদ থাকা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ থাকা। কেননা এগুলো فعل এর আগে আসে। আর مكلف বানানো বা দায়িত্ব আরোপ শুদ্ধ হওয়া এ ধরনের সক্ষমতার ওপর নির্ভর করে। তাই وضوء এর قدرة হলো পানি বিদ্যমান থাকা অবস্থায়, অন্যথায় تيمم করতে হবে, কিবলার দিকে মুখ করার قدرة আশংকাহীন ও জানা থাকা অবস্থায়। অন্যথায় যেদিকে সক্ষম সেদিকে অথবা ধারণার ওপর ভিত্তি করে দাঁড়ানোর قدرة সুস্থতার অবস্থায়, অন্যথায় বসে বসে, অথবা ইশারার করে (নামায পড়বে)। زكوة এর قدرة হলো নিসাবের মালিক হওয়া অবস্থায়, অন্যথায় যাকাত মাফ। صوم এর قدرة হলো সুস্থ ও মুকীম অবস্থায়, অন্যথায় পরবর্তী তার কাযা করতে হবে। حج এর قدرة পাথেয় ও ভ্রমণে সক্ষম হওয়া শারীরিক সুস্থতা ও পথ নিরাপদ থাকা অবস্থায়, অন্যথায় সেটা নফল বলে গণ্য হবে। এভাবে কিয়াস করতে হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله ثُمَّ وَصَفَ الْقُدْرَةَ لِقَوْلِهِ الخ : ব্যাখ্যাকারের ইবারত বোঝার পূর্বে কয়েকটি জিনিস বোধগম্য করা জরুরি ; যথা)–

قدرت حقيقية বা ১. কুদরত ২ ধরনের হয়ে থাকে। ১. (বাস্তবিক কুদরত বা সক্ষমতা), ২. আসবাব ও উপকরণ ঠিক থাকা এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুস্থ থাকা।

কুদরতে হাকীকিয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলার তাওফীক প্রদান।

২. কুদরতে হাকীকিয়া কাযার সাথে হয়ে থাকে এবং তা কাযার জন্য ইল্লত হয়। এটা আসবাব ঠিক থাকা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুস্থ থাকার উপর অগ্রগামী হয়ে থাকে।

৩. মানুষকে মুকাল্লাফ তথা শরীআতের বিধান আরোপিত হওয়ার ভিত্তি কুদরতে হাকীকিয়ার উপরে নয় বরং দ্বিতীয়টার উপরে হয়ে থাকে। কারণ এটা যদি কুদরতে হাকীকিয়ার উপর নির্ভরশীল হয় তাহলে যে কাফের ব্যক্তি কুফরির উপর মারা যায় সে ঈমানের মুকাল্লাফ হতো না। কারণ তার মধ্যে কুদরতে হাকীকিয়া অনুপস্থিত। কেননা তা ফে'ল বা কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়। আর ঈমানের ফে'ল যেহেতু পাওয়া যায়নি। সুতরাং কুদরতে হাকীকিয়াও পাওয়া যায়নি। অথচ কাফের ব্যক্তি ঈমানের কুকাল্লাফ।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, যে কুদরত মুকাল্লাফ হওয়ার ব্যাপারে ক্রিয়াশীল থাকে তা ফে'লের উপর অগ্রগামী হয়। আর এটা স্বীকৃত যে, কুদরতে হাকীকিয়া ফে'লের উপর অগ্রগামী হয় না। বরং তা ফে'লের সাথে হয়ে থাকে। অবশ্য দ্বিতীয়ার্থে তা কুদরত অর্থাৎ আসবাব ঠিক থাকাটা ফে'লের উপর অগ্রগামী হয়। কাজেই যে অর্থে কুদরত তা তার উপরই মোকাল্লাফ হওয়ার ভিত্তি হবে।

ব্যাখ্যাকারের ইবারতের সার : মাতিন (র) কুদরত কে স্বীয় ভাষ্য يَتَمَكَّنُ بِهَا الْعَبْدُ مِنْ أَدَاءِ مَا لَزِمَهُ (যার দ্বারা বান্দা তার উপর অবধারিত কাজ আঞ্জাম দানে সক্ষম হয়) এর সাথে সংশ্লিষ্ট করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, মামূর বিহীর সাথে যে কুদরত শর্ত হয়েছে এবং যার দরুন মামুর বিহীর মধ্যে উত্তমতা এসেছে সে কুদরত হাকীকী কুদরত নয়। কারণ তা কাজের সাথে ঘটে থাকে এবং তা কাজের জন্য ইল্লত হয়। তার উপর মুকাল্লাফ হওয়ার ভিত্তি হয় না। অথচ এখানে এমন কুদরত উদ্দেশ্য যা মুকাল্লাফ হওয়ার জন্য ভিত্তি হয়ে থাকে।

অতএব এখানে কুদরত দ্বারা ঐ কুদরত উদ্দেশ্য যার অর্থ হলো আসবাব ও উপকরণ ঠিক থাকা এবং অঙ্গসমূহ সুস্থ থাকা। কারণ এ প্রকার কুদরতই কাজের উপর অগ্রগামী হয়। এবং এর উপরই মুকাল্লাফ হওয়ার ভিত্তি। কারণ মানুষ সে সময়ই উযুর উপর সক্ষম গণ্য হয় যখন পানি বিদ্যমান থাকে এবং রোগ ইত্যাদি উযুর কোনো প্রতিবন্ধক না থাকে। যদি পানি বিদ্যমান না থাকে অথবা পানি বিদ্যমান থাকে কিন্তু রোগ ইত্যাদি উযুর কোনো প্রতিবন্ধক ওযর থাকে এক্ষেত্রে উযুর কুদরত না থাকার কারণে তাকে তায়াম্মুম করার নির্দেশ দেয়া হবে। এভাবে কেবলামুখী হওয়ার ব্যাপারে ঐ সময় সক্ষম গণ্য হবে। যখন কেবলামুখী হওয়াতে কোনোরূপ ভয়-ভীতি না থাকবে এবং কেবলা জানা থাকবে। পক্ষান্তরে যদি কেবলামুখী হওয়াতে কোনো আশংকা থাকে তাহলে যেদিকে মুখ করতে সক্ষম সেদিকই তার কেবলা বিবেচিত হবে। এভাবে যদি কেবলার দিক সঠিক জানা না থাকে তাহলে চিন্তাভাবনার মাধ্যমে যেদিকটি কেবলা নিরূপিত হবে সেটাই তার কেবলা হবে।

এভাবে দাঁড়ানোর কুদরত এই যে, মানুষ সুস্থ হবে। যদি সুস্থ না হয় তাহলে বসে নামায পড়া ফরয হবে। তাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে ইশারার মাধ্যমে নামায পড়বে। যাকাতের কুদরত এই যে, কুকাল্লাফ ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হবে। অন্যথায় তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। রোযার কুদরত এই যে, মুকাল্লাফ ব্যক্তি সুস্থ ও মুকীম হবে। অনথ্যায় সে রোযা কাযা করবে। হজের কুদরত এই যে, সফরের পাথেয় এবং সওয়ারী ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকবে এবং তার শরীর সুস্থ থাকবে রাস্তা নিরাপদ হবে। এর কোনো একটি বিদ্যমান না থাকলে সে ক্ষেত্রে তার জন্য হজ করা ফরয হবে না বরং নফল বিবেচিত হবে। এভাবে অন্যান্য বস্তুকে অনুমান করা উচিত। অর্থাৎ সকল বিধানের মুকাল্লাফ হওয়ার ভিত্তি হলো কুদরত তথা আসবাব ঠিক থাকা যা কাজের উপর অগ্রগামী হয়ে থাকে তার ওপর। কুদরতে হাকীকিয়ার উপর মুকাল্লাফ হওয়া নির্ভরশীল নয়।

ثُمَّ قَسَّمَ هٰذِهِ الْقُدْرَةَ اِلَى الْمُطْلَقِ وَالْكَامِلِ فَقَالَ وَهِيَ نَوْعَانِ مُطْلَقٌ اَىِ الْقُدْرَةُ الَّتِي يَتَمَكَّنُ بِهَا الْعَبْدُ وَهِيَ بِمَعْنَى سَلَامَةِ الْاٰلَاتِ وَالْاَسْبَابِ نَوْعَانِ اَحَدُهُمَا مُطْلَقٌ اى غَيْرِ مُقَيَّدٍ بِصِفَةِ الْيُسْرِ وَالسُّهُوْلَةِ كَمَا فِي الْقِسْمِ الْاٰتِيْ وَهُوَ اَدْنٰى مَا يَتَمَكَّنُ بِهِ الْمَامُوْرُ مِنْ اداءِ مَا لزمه وهو شَرْطٌ فِي اداءِ كُلِّ اَمْرٍ اى الْمُطْلَقُ اَدْنٰى مَا يَتَمَكَّنُ بِهِ الْعَبْدُ وهٰذا الْقَدْرُ مِنَ التمكّن شَرْطٌ فِيْ اداءِ كُلِّ اَمْرٍ اى وَالْبَاقِي زَائِدٌ و هُو قَدْرُ مَا يَسَعُ فِيْهِ اَرْبَعُ رَكْعَاتٍ مِّنَ الظُّهْرِ فَاِنِ اكْتَفٰى بِهٰذَا الْقَدْرِ سُمِّيَ مُمْكِنَةً - وَهُوَ الَّذِى سَمَّاه الْمُصَنِّفُ رح مُطْلَقًا وكَانَ يَنْبَغِي اَنْ يَقُولَ مُطْلَقٌ و مُقَيَّدٌ اَوْ كَامِلٌ وقَاصِرٌ وبِازْدِيَادِ لَفظِ اَدْنٰى اِفْتَرَقَ بَيْنَ الْمُقَسَّمِ وَالْقِسْمِ لِاَنَّ الْمُقَسَّمَ هُو ما يَتَمَكَّنُ بِها الْعَبْدُ وَالْقِسْمُ هُو اَدْنٰى ما يَتَمَكَّنُ بِها الْعَبْدُ فلا يَرِدُ مَا يُتَوَهَّمُ اَنَّهُ يَلْزَمُ اِنْقِسَامُ الشَّيْءِ اِلٰى نَفْسِهِ وَاِلٰى غَيْرِهِ -وَاِنَّمَا قَيَّدَ باداءِ كُلِّ امرٍ لِاَنَّ القضاءَ لا يُشْتَرَطُ فيه هٰذه الْقُدْرَةُ مُطلقًا بَلْ اِذَا كَانَ المطلوبُ الفعلَ واَمَّا اِذا كانَ المَطلوبُ السُّؤالُ وَالْاِثْمُ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذٰلِكَ

مطلق এর আলোচনা

অনুবাদ॥ অতঃপর মুসান্নিফ (র) এ قدرت কে মুতলাক (সাধারণ) এবং كامل (পূর্ণাঙ্গ) এ দুভাগে বিভক্ত করেছেন। এ মর্মে তিনি বলেন, *এটা দুপ্রকার; مطلق বা সাধারণ।* অর্থাৎ এমন সামর্থ্য, যার দ্বারা বান্দা তার দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়। তার অর্থ হলো- উপায় ও উপকরণসমূহ সঠিক থাকা। এটা আবার দুপ্রকার। ১. মুতলাক তথা সাধারণ অর্থাৎ যা সহজসাধ্য হওয়ার শর্ত দ্বারা শর্তযুক্ত নয়। যেমন- সামনের প্রকারসমূহের মধ্যে রয়েছে। ***আর মুতলাক হলো সে ন্যূনতম সামর্থ্য যার দ্বারা আদিষ্ট ব্যক্তি তার দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়। এ সামর্থ্য প্রত্যেকটি আদেশ পালনের ক্ষেত্রেই শর্ত।*** অর্থাৎ, মুতলাক قدرت (সামর্থ্য) হলো সে নূন্যতম সামর্থ্য, যার মাধ্যমে বান্দা তার দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়। এ পরিমাণ সামর্থ্য প্রত্যেক আদেশ পালনের ক্ষেত্রে থাকা শর্ত। আর অবশিষ্টটুকু অতিরিক্ত ধর্তব্য হবে।

ন্যূনতম সামর্থ্য হলো (উদাহরণ) এ পরিমাণ সময় যার মধ্যে যোহরের চার রাক'আত নামায আদায় করতে পারে। সুতরাং, যদি এ পরিমাণের উপরেই যথেষ্ট করা হয়, তবে একে ممكنة বলা নামকরণ করা হয়। এটাকেই গ্রন্থকার (র) মুতলাক নামে নামকরণ করেছেন। আর সমীচীন ছিল যে, مطلق এবং مقيد অথবা كامل ও قاصر শব্দ বৃদ্ধিকরণের দ্বারা مقسم (বিভাজ্য বস্তু) ও قسم এর মধ্যে পার্থক্য হয়ে যেতো। কারণ مقسم হলো সে সামর্থ্য, যার দ্বারা বান্দা সক্ষমতা লাভ করতে পারে। আর قسم হলো সে ন্যূনতম সামর্থ্য, যার দ্বারা বান্দা সক্ষমতা লাভ করতে পারে। সুতরাং কেউ কেউ যে ধারণা করে যে, এতে انقسام الشي الى نفسه তথা বস্তুকে স্বয়ং বস্তুর প্রতি ও অন্য বস্তুর প্রতি বিভক্তকরণ আবশ্যক হয়ে পড়ে, এ ক্ষেত্রে তা আরোপিত হবে না।

মুসান্নিফ (র) সকল বস্তু আদায় করা (اداء كل امر) দ্বারা এ জন্য শর্তারোপ করেছেন যে, কাযার মধ্যে এ সামর্থ্য থাকা মোটেই শর্ত নয়। বরং তা শুধু তখনই শর্ত, যখন কাজটি উদ্দেশ্য হয়। আর যদি প্রশ্ন ও গুনাহ উদ্দেশ্য হয়, তবে সে ক্ষেত্রে এ সামর্থ্য শর্ত নয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله ثُمَّ قَسَّمَ هٰذِهِ الْقُدْرَةَ إِلَى الخ : যে কুদরতের উপর মুকাল্লাফ হওয়ার ভিত্তি এবং যার অর্থ হলো উপকরণ ও আসবাব ঠিক থাকা। এটা ২ প্রকার। ১. قدرت مطلقة ২. قدرت كاملة

قدرت مطلقة বলতে এমন নিম্ন ক্ষমতা বোঝায় যার দ্বারা মুকাল্লাফ ব্যক্তি তার দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়। এ ধরনের কুদরত সকল নির্দেশ পালন ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত। অর্থাৎ যতোক্ষণ এতোটুকু ক্ষমতা না থাকবে ততোক্ষণ মুকাল্লাফ ব্যক্তির উপর কোনো নির্দেশ পালন করা ওয়াজিব হবে না। মোটকথা আদায় ওয়াজিব হওয়ার জন্য এতটুক ক্ষমতা থাকা শর্ত। আর এর অবশিষ্ট অংশ হলো অতিরিক্ত বিষয়।

قوله وَهٰذَا الْقَدْرُ مِنَ التَّمَكُّنِ شَرْطٌ الخ : মুসান্নিফ (র) নিম্নস্তরের কুদরতের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেন– নিম্নস্তরের কুদরত এতোটুকু হওয়া বাঞ্ছনীয় যে, উদাহরণস্বরূপ যোহরের ওয়াক্ত এতোটুকু বাকী থাকা যার মধ্যে যোহরের ৪ রাকআত নামায পড়ার অবকাশ থাকে। অর্থাৎ যোহরের নামায ওয়াজিব হওয়ার জন্য কমপক্ষে এতোটুকু সময় পাওয়া যাওয়া শর্ত। এর অতিরিক্ত ওয়াক্তের শর্ত হওয়ার ব্যাপারে কোনো দখল নেই। ব্যাখ্যাকার (র) বলেন– নিম্নস্তরের এ কুদরতের নাম হলো قدرت ممكنة মুসান্নিফ (র) এটাকে قدرت مطلقة দ্বারা নামকরণ করেছেন।

ব্যাখ্যাকার বলেন– মাতিনের উল্লিখিত কুদরতের ২ প্রকার মুতলাক এবং কামিল এর মধ্যে সঠিক অর্থে কোন ভিন্নতা নেই। কাজেই তাঁর জন্য মুনাসিব ছিলো মুতলাক ও মুকাইয়্যাদ বলা। কিংবা কামিল ও কাসির বলা।

قوله وَبِازْدِيَادِ لَفْظِ أَدْنَى الخ : দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

প্রশ্ন : مقسم (বিভাজ্য) এমন কুদরত যার দ্বারা মুকাল্লাফ ব্যক্তি ফরয আদায় করতে সক্ষম হয়। তার এক প্রকার হলো মুতলাক। এর দ্বারাও এমন কুদরত উদ্দেশ্য যার দ্বারা মুকাল্লাফ ব্যক্তি ফরয আদায় করতে সক্ষম হয়। কেমন যেন مقسم ও قسم তথা বিভাজ্য এবং তার প্রকারের মধ্যে اتحاد রয়েছে। আর এরই নাম হলো اِنْقِسَامُ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ وَإِلَى غَيْرِهِ অর্থাৎ কুদরত তার সত্তা এবং ভিন্ন বস্তুর দিকে বিভক্ত হয়। অথচ বস্তু তার সত্তা ও তার ভিন্নের দিকে বিভক্ত হওয়া বৈধ নয়।

উত্তর : ব্যাখ্যাকার (র) বলেন– এখানে مقسم ও قسم তথা বিভক্তি ও প্রকারের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। তা এভাবে যে, مقسم হলো মূল কুদরত। আর তার একটি প্রকার হলো মুতলাক। যা নিম্নস্তরের কুদরত। এর দ্বারা বান্দা ফরয আদায় করতে সক্ষম হয়। কাজেই সংজ্ঞায় ادنى শব্দ বৃদ্ধি করে مقسم ও قسم এর মধ্যে ভিন্নতা সৃষ্টি করতে হবে। ফলে বস্তু তার সত্তা ও ভিন্ন বস্তুর দিকে বিভক্ত হওয়া সাব্যস্ত হবে না।

ব্যাখ্যাকার (র) বলেন– মাতিন (র) وَهُوَ شَرْطٌ فِيْ أَدَاءِ كُلِّ أَمْرٍ বলে কুদরতকে প্রত্যেক বিষয় ওয়াজিব হওয়ার জন্য এ কারণে শর্ত স্থির করেছেন যে, কাযার জন্য কোনোক্রমেই এ ধরনের কুদরত শর্ত নয়। বরং মুকাল্লাফ ব্যক্তি থেকে যদি কোনো কাজ কাম্য থাকে অর্থাৎ ছুটে যাওয়া নামাযের কাযা করা উদ্দেশ্য হয় তাহলে কাযার জন্যও قدرت ممكنة শর্ত। কারণ ক্ষমতা ছাড়া কাজ তলব করা জায়েয নয়। কিন্তু মুকাল্লাফ ব্যক্তি থেকে যদি কোনো কাজ কাম্য না হয়। অর্থাৎ ছুটে যাওয়া নামাযের কাযা কাম্য না হয় বরং এটা কাম্য হয় যে, যে ব্যক্তির ছুটে যাওয়া নামাযের কাযা রয়েছে নিজ কোনো ওয়ারিশকে ওছিয়ত করবে যে, আমার মৃত্যুর পরে আমার এত ওয়াক্ত ছুটে যাওয়া নামাযের ফিদিয়া দিবে। ওছিয়ত না করলে সে গুণাহগার হবে। এমন ক্ষেত্রে قدرت ممكنة শর্ত নয়।

فَانَّ مَنْ عَلَيْهِ اَلْفُ صَلٰوةٍ يُقَالُ لَهُ فِى النَّفْسِ الْاَخِيْرَةِ اِنَّ هٰذِهِ الصَّلٰوةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكَ وَثَمْرَتُهُ تَظْهَرُ فِىْ حَقِّ وُجُوْبِ الْاِيْصَاءِ بِالْفِدْيَةِ وَالْاِثْمِ وَالشَّرْطُ تَوَهُّمُهُ لَا حَقِيْقَتُهُ اى الشَّرْطُ فِيْمَا بَيْنَ هٰذِهِ الْقُدْرَةِ الْمُمْكِنَةِ الْاَدْنٰى كَوْنُهُ مُتَوَهَّمُ الْوُجُوْدِ لَا مُتَحَقِّقُ الْوُجُوْدِ اي لَا يَلْزَمُ ان يَّكُوْنَ الْوَقْتُ الَّذِى يَسَعُ اربعُ ركعاتٍ مَوْجُوْدًا متحققًا فِى الْحَالِ بَلْ يَكْفِى وَهْمُهُ فَاِنْ تَحَقَّقَ هٰذَا الموهومُ فِى الْخَارِجِ بانْ يَّمْتَدَّ الوقتُ مِن جانبِ اللّٰهِ يُؤَدِّيهِ فِيهِ والَّا تَظْهَرُ ثمرتُه فِى الْقَضَاءِ

অনুবাদ ॥ কেননা, যার উপরে এক হাজার ওয়াক্ত নামায ওয়াজিব রয়েছে, তাকে তার জীবনের শেষ মুহূর্তে বলা হবে যে, তোমার উপরে এ নামাযসমূহ ওয়াজিব। এর ফলাফল প্রকাশিত হবে ফিদিয়া প্রদানের অসিয়ত ওয়াজিব হওয়া এবং গুনাহ অত্যাবশ্যক হওয়ার ক্ষেত্রে। *আর এর শর্তটা হলো- এর কাল্পনিক সামর্থ্য, হাকীকত শর্ত নয়।* অর্থাৎ, এ সর্বনিম্ন কুদরতে মুমাক্কিনাহ এর মধ্যে শর্ত হলো- এর অস্তিত্ব ধারণামূলক হওয়া। বাস্তব অস্তিত্ব উদ্দেশ্য নয়। অর্থাৎ এ কথা আবশ্যক নয় যে, যে সময়ের মধ্যে চার রাক'আত নামায আদায় করা সম্ভব, সে ওয়াক্তটি বাস্তবে অস্তিত্বশীল থাকা শর্ত নয়। বরং এর অস্তিত্বের কল্পনাই যথেষ্ট। সুতরাং, উক্ত ধারণাটি যদি বাস্তবেও এরূপ সাব্যস্ত হয় যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সময় দীর্ঘায়িত হয়। তাহলে সে একে সময়ের মধ্যে তা আদায় করবে। অন্যথায় কাযার মধ্যে এর ফল প্রকাশিত হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله فَانَّ مَنْ الخ : কারণ যার উপরে ১ হাজার নামায কাযা রয়েছে তাকে শেষ সময়ে একথা বলা হয় যে, তোমার উপর এ পরিমাণ নামায ফরয রয়েছে। অথচ সে তখন ঐ সকল নামায কাযা পড়তে সক্ষম নয়। সুতরাং বোঝা গেলো যে, যখন শেষ সময়ে ফিদিয়া দেয়ার অছিয়ত করা কিংবা অছিয়ত না করার ক্ষেত্রে গোণাহগার সাব্যস্ত হওয়া কাম্য। তখন কাযার জন্য قدرت ممكنة শর্ত নয়। এর ফলাফল এই দাঁড়াবে যে, উক্ত ব্যক্তির উপর ফিদিয়ার ওছিয়ত করা ওয়াজিব হবে। অন্যথায় সে গোণাহগার হবে এবং কেয়ামতের দিবসে পাকড়াও হবে।

قوله وَالشَّرْطُ تَوَهُّمُهُ لا حَقِيْقَتُهُ الخ : মুসান্নিফ (র) বলেন- قدرت ممكنة যা আদায় ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত তা توهم الوجود তথা অস্তিত্ব সম্ভাব্য হওয়া শর্ত। বাস্তবে বিদ্যমান হওয়া শর্ত নয়। অর্থাৎ যে সময়ে যোহরের ৪ রাকআত পড়ার অবকাশ থাকে তা বাস্তবে বিদ্যমান থাকা শর্ত নয়। বরং তার ধারণা থাকাই যথেষ্ট। তা এভাবে যে, যদি কেউ ১ মিনিট সময় পায় তাহলে তার উপর যোহর আদায় করা ওয়াজিব হবে। অথচ বাস্তবে ১ মিনিটে ৪ রাকআতের অবকাশ রাখে না। তবে কাল্পনিকভাবে তা সম্ভব। যেমন আল্লাহ তা'আলা যদি এক মিনিটকে এ পরিমাণ প্রলম্বিত করে দেন যার মধ্যে যোহরের ৪ রাকআত পড়তে পারে। তাহলে যোহর আদায় করবে। আর প্রলম্বিত না করলে সে তার কাযা করবে।

حَتّٰى اذا بَلَغَ الصَّبِىُّ او اسلَمَ الْكَافِرُ او طَهُرَتِ الْحَائِضُ فِى اٰخِرِ الْوَقْتِ لَزِمَتْهُ الصَّلٰوةُ لِتَوهُّمِ الْاِمْتِدَادِ فِى اٰخِرِ الْوَقْتِ بِوَقْفِ الشَّمْسِ والْمُرَادُ بِاٰخِرِ الْوَقْتِ الَّذِى لَا يَسَعُ فِيْهِ اِلَّا مِقْدَارُ التَّحْرِيْمَةِ فَاِذَا حَدَثَتْ هٰذِهِ الْمُوْجِبَاتُ فِىْ هٰذَا الْوَقْتِ اَلْزَمَتْهُ الصَّلٰوةُ لِاِحْتِمَالِ اِمْتِدَادِهِ بِوَقْفِ الشَّمْسِ فَاِنِ امْتَدَّ فِى الْوَاقِعِ يُؤَدِّيْهِ فِيْهِ والَّا يَقْضِيْهَا وهٰذَا الْوَقْفُ امرٌ مُمْكِنٌ خَارِقٌ لِّلْعَادَةِ كَمَا كَانَ لِسُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السلام حيثُ عُرِضَتْ عَلَيْهِ بِالْعَشِىِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَكَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ فَضَرَبَ سُوقَهَا وأَعْنَاقَهَا فَرَدَّ اللّٰهُ الشَّمْسَ حَتّٰى صَلَّى الْعَصْرَ وسَخَّرَ لَهُ الرِّيحَ مَكَانَ الْخَيْلِ وهٰذَا بِنَصِّ الْقُرْاٰنِ

অনুবাদ ॥ ***ফলে যদি কোন বালক শেষ সময়ে বালেগ হয়, অথবা কোন কাফির মুসলমান হয়, অথবা কোন ঋতুবতি মহিলা ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হয়; তাহলে তাদের ওপর নামায ওয়াজিব হবে তবে এসব শেষ সময়ে সূর্য স্থির হওয়ার মাধ্যমে, সময় দীর্ঘায়িত হওয়ার সম্ভাবনার কারণে।***

শেষ সময় দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে সময়ে তাকবীরে তাহরীমা পরিমাণ সময় বাকী থাকে। সুতরাং, এসব সবাব যদি সে সময়ে সংঘটিত হয়, তবে সূর্য স্থির হওয়ার মাধ্যমে দীর্ঘায়িত হওয়ার সম্ভাবনার কারণে নামায ওয়াজিব হবে।

সুতরাং যদি বাস্তবে সময় দীর্ঘায়িত হয়, তবে উক্ত সময়ে আদায় করবে, অন্যথায় কাযা পড়বে। আর এমন স্থির হওয়া সম্ভবপর এবং অলৌকিক ব্যাপার। যেমন- হযরত সুলায়মান (আ)-এর ক্ষেত্রে ঘটেছিল। তিনি সন্ধ্যায় যখন তার কাছে উত্তম ও দ্রুতগামী ঘোড়াসমূহ পেশ করা হয়েছিল, অতঃপর সূর্য অস্তমিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তখন তিনি তাদের পা এবং ঘাড় কাটতে শুরু করেন; অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সূর্যকে ফিরিয়ে দেন। তখন তিনি আছরের নামায আদায় করে নেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা ঘোড়ার স্থলে বাতাসকে তার বশীভূত করে দেন। এ ঘটনাটি কুরআনের نص দ্বারা প্রমাণিত।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله حَتّٰى اِذَا بَلَغَ الصَّبِىُّ او الخ : মুসান্নিফ (র) পূর্বে উল্লেখ করেছিলেন যে আদায় ওয়াজিব হওয়ার জন্য বাস্তবে قدرت مُمَكِّنَةٌ থাকা শর্ত নয়। বরং তার সম্ভাবনা বা ধারণাই যথেষ্ট। এ সূত্রের উপর বলেন যে, কোনো ওয়াক্তের শেষাংশে যদি কোনো নাবালেগ বালেগ হয়ে যায়, কিংবা কাফের ব্যক্তি মুসলমান হয়ে যায়, অথবা ঋতুবতী মহিলা ঋতু থেকে পাক হয় তাহলে এ সকল ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে উক্ত ব্যক্তির উপর নামায জরুরি হয়ে যাবে। যদি কারামত স্বরূপ ওয়াক্ত প্রলম্বিত হয় তাহলে নামায আদায় করবে। অন্যথায় তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে।

দলিল : এই যে, শেষ সময়ে সূর্য থেমে যাওয়ার বা ওয়াক্ত প্রলম্বিত হওয়ার وهم থাকে যদিও বাস্তবে এতোটুকু সময় বিদ্যমান না থাকে যার মধ্যে ৪ রাকআত নামায পড়া সম্ভব। ইমাম সাহেব (র) এর মতে যেহেতু تَوَهُّم قُدْرَت বা সক্ষমতার কল্পনাই আদায় ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত, বাস্তবে তা বিদ্যমান থাকা শর্ত নয়। এই কারণে আখেরী ওয়াক্তে নামায ফরয হয়ে যাবে।

ব্যাখ্যাকার বলেন– আখেরী ওয়াক্ত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– কেবল তাকবীরে তাহরীমা বলার জন্য যথেষ্ট হওয়া, অর্থাৎ বাচ্চা বালেগ হওয়া, কাফের মুসলমান হওয়া এবং ঋতুবতী পবিত্র হওয়া। যদি এতো সংকীর্ণ সময়ে পাওয়া যায় যে, উক্ত সময়ে কেবল তাকবীরে তাহরীমা বলা সম্ভব। তথাপি তাদের উপর উক্ত ওয়াক্তের নামায ফরয হয়ে যাবে। কেননা যদিও এ সময়টুকু বাস্তবে পূর্ণ নামায আদায় করার অবকাশ রাখে না। তবে এ সম্ভাবনা অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তা'আলা সূর্যকে তার জন্য স্থির রেখে ওয়াক্তকে প্রলম্বিত করে দিবেন। কাজেই এই সম্ভাবনা হেতু আল্লাহ তা'আলা যদি বাস্তবে তার জন্য ওয়াক্তকে প্রলম্বিত করে দেন তাহলে সে সে সময়ই নামায আদায় করবে। অন্যথায় সে তা কাযা পড়বে। মোল্লা জুয়ুন (র) এই সম্ভাবনার সম্ভবতা সাব্যস্ত করার জন্য বলেন– সূর্যের পরিক্রমা পরিহার করে তার থেমে যাওয়া এক সম্ভাব্য বিষয় এবং তা স্বাভাবিক রীতির পরিপন্থী।

قوله وهٰذا الأمر ممكن خارق للعادة الخ : অতীতকালে এ ধরনের ঘটনা পেশ এসেছে। ব্যাখ্যাকার কোরআন শরীফের বরাত দিয়ে হযরত সোলায়মান (আ) এর ঘটনা উল্লেখ করেছেন। কোরআন মজীদে উক্ত ঘটনা এভাবে উল্লেখিত হয়েছে وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ، رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ

আমি দাউদ কে দান করেছি সুলায়মান। সে অতিশয় আল্লাহর প্রতি রুজুশীল বান্দা ছিলো। তার সম্মুখে সন্ধায় অতিমূল্যবান ঘোড়াসমূহ পেশ করা হলে সে বললো আমি মালের মহব্বতে আবদ্ধ হয়েছি; আমার প্রভুর স্মরণ বাদ দিয়ে, যার দরুন সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে। তোমরা ঘোড়াগুলোকে আমার সামনে হাজির করো। এরপর সে ঘোড়াসমূহের গর্দান ও পা কাটতে শুরু করলো।

★ এ আয়াতের তাফসীরে কোনো কোনো আলিম বলেন– সুলায়মান (আ) ঘোড়া পরিদর্শন কার্যে নিয়োজিত হওয়ার ফলে নামাযের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়েন। এরপর খেয়াল হলে তিনি বললেন- দেখো! মালের মতহব্বত আমাকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল বানিয়ে দিয়েছে। যার দরুন আমি সূর্য অস্ত হওয়া পর্যন্ত আমার দায়িত্ব আদায় করতে পারিনি। সুলায়মান (আ) উক্ত ইবাদত ছুটে যাওয়ার ব্যাপারে পেরেশান হয়ে গেলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, ঐ সকল ঘোড়াকে হাজির করো যার দরুন আমি আজ আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন হয়ে গিয়েছি। ঘোড়াসমূহ হাজির করা হলে আল্লাহর প্রেমে মত্ত হয়ে তরবারি নিয়ে ঘোড়াসমূহের গর্দান ও পা কাটতে শুরু করলেন। যাতে এ উদাসীন হওয়ার পেছনে যা কারণ হয়েছিলো তা সামনে থেকে সরে যায় এবং এর কাফফারা হয়ে যায়। এরপর আল্লাহ তা'আলা সুলায়মান (আ) এর দোয়ার বদৌলতে পুনরায় সূর্য উঁচু করে দিলেন। ফলে আছরের ছুটে যাওয়া নামায তার ওয়াক্তের মধ্যে পড়ে নিলেন। আর আল্লাহ তা'আলা ঘোড়ার স্থলে তার জন্য বায়ু অনুগত করে দিলেন।

লক্ষ্য করুন! আল্লাহ তা'আলা সূর্যকে পিছিয়ে এনে এ পরিমাণ উঁচু করে দিলেন যে, সুলায়মান (আ) আছরের নামায আদায় করলেন। অতএব এ ঘটনা দ্বারা ওয়াক্ত প্রলম্বিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রমাণিত হয়।

এখানে এ প্রশ্ন করা যে, সুলায়মান (আ) এর ঘটনা দ্বারা সূর্য ফিরে আসা সাব্যস্ত হয়। অথচ আমাদের কথা হলো সূর্য পরিক্রমা থেকে স্থির থাকা। কাজেই এ বিষয়ের সাথে সুলায়মান (আ) এর ঘটনার কোনো সামঞ্জস্যতা নেই।

এর উত্তর এই যে, সূর্য ফিরে আসা যেহেতু আল্লাহর কুদরতের অধীনে। কাজেই স্থির থাকাও তার অধীনের বাইরে নয়।

وَقدْ كَانَ لِيُوشَعَ عليه السَّلام حَتّى فَتَحَ القُدُسَ قَبْلَ دُخُولِ لَيْلَةِ السَّبْتِ وقد كانَ لِنَبِيِّنَا عليه السَّلام حِينَ فاتَتْ صَلوةُ الْعَصْرِ مِنْ عَلِيٍّ (رضـ) كما ذُكِرَ فِي كتابِ السِّيَرِ وهٰذا بِخِلافِ الحَجِّ فإنّه لَمْ يُعْتَبَرْ فيه توهُّمُ الزّادِ و الرّاحِلةِ مَعَ أنّ اكثرَ النّاسِ يَحُجُّونَ بِلا زادٍ و رَاحِلةٍ لِانّ فِي اِعْتِبارِ ذٰلِك حَرَجًا عظيمًا ولَوِ اُعْتُبِرَ ذٰلِكَ لا تَظْهَرُ ثَمرتُه فِي وُجوبِ القضاءِ

অনুবাদ ॥ এমন ঘটনা হযরত ইউশা (আ)-এর ক্ষেত্রেও ঘটেছিল। শনিবার রাত্রি আসার পূর্বেই কুদস জয় করেন। অনুরূপভাবে আমাদের নবী করীম (স)-এর ক্ষেত্রেও এমনি একটি ঘটনা ঘটেছিল, যখন হযরত আলী (রা) থেকে আসর নামায কাযা হয়ে গিয়েছিল। যেমন সীরাত গ্রন্থসমূহে উল্লেখ রয়েছে। তবে এটা হজ্জের বিপরীত। কেননা, এক্ষেত্রে পাথেয় এবং বাহনের ধারণা ধর্তব্য হয় না। যদিও অনেক লোক পাথেয় এবং বাহন ব্যতীত হজ্জ আদায় করে থাকে। কেননা, এতে অনেক অসুবিধা রয়েছে। যদি এটা বিবেচনা করা হয়, তবে এর ফলাফল কাযা ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে প্রকাশিত হবে না।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ ★ এ ধরনের ঘটনা হযরত ইউশা' ইবনে নূনের ব্যাপারেও ঘটেছিলো। উক্ত ঘটনার সার এই যে, একদা ইউশা ইবনে নূন (আ) শুক্রবারে অবাধ্য কিবতীদের সঙ্গে মোকাবেলা করছিলেন। পূর্ণ দিবস যুদ্ধ চলা সত্ত্বে কুদুস পর্বত বিজয় হয়নি। এ অবস্থায় সূর্য অস্তমিত হওয়ার উপক্রম হয়ে গেলো। তখন তিনি সূর্যকে লক্ষ্য করে বললেন– তুমি অস্তমিত হতে নির্দেশ প্রাপ্ত। আর আমি সূর্যাস্তের পূর্বে যুদ্ধের ব্যাপারে নির্দেশ প্রাপ্ত। কারণ শনিবার দিন এবং উক্ত রাতে মূসা (আ) এর শরীঅতে যুদ্ধ হারাম ছিলো। তাই তিনি দোয়া করলেন اللّهم احبس الشمس علينا হে আল্লাহ আমাদের জন্য সূর্যকে স্থির রাখুন। ইউশা (আ) এর দোয়ার ফলে সূর্যের পরিক্রমা বন্ধ রাখা হয় এবং সূর্য স্বস্থানে থেমে থাকে। এক পর্যায়ে কুদুস পাহাড় জয় করেন।

এই ঘটনাটি বুখারী শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে এভাবে বর্ণিত হয়েছে। মোটকথা এ ঘটনা দ্বারাও সূর্য স্বস্থানে স্থির থাকার এবং সময় প্রলম্বিত হওয়ার প্রমাণ বোঝায়।

★ এভাবে রাসূলুল্লাহ (স) এর ক্ষেত্রেও এমন একটি ঘটনা পেশ এসেছিলো। কাজী আয়ায (র) শিফা গ্রন্থে লিখেন– একবার রাসূলুল্লাহ (স) এর উপর অহী অবতীর্ণ হচ্ছিলো। রাসূলুল্লাহ (স) এর মস্তক মোবারক হযরত আলী (রা) এর কোলে ছিলো। আলী (রা) তখন পর্যন্ত আছরের নামায পড়েননি। এমতাবস্থায় সূর্য অস্ত হয়ে গেলো। অহী শেষ হবার পরে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন- আলী! তুমি কি নামায পড়েছ? তিনি উত্তর দিলেন– না। রাসূলুল্লাহ (স) তখন বললেন– اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ كَانَ فِي طَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُوْلِكَ فَارْدُدْ عَلَيْهِ الشَّمْسَ "হে আল্লাহ! আলী তোমার এবং তোমার রাসূলের কাজে লিপ্ত ছিলো। অতএব তার জন্যে সূর্য ফিরিয়ে দাও"। হযরত আসমা বিনতে উমাইস বলেন– আমি দেখলাম সূর্য অস্তমিত হয়ে গিয়েছে। এরপর সূর্য উদয় হলো। এমন কি তার রৌদ্র পাহাড়ে এবং জমিনের উঁচু অংশে পরিলক্ষিত হলো। এ ঘটনাটি ঘটেছিলো খায়বার যুদ্ধে। এর দ্বারাও সূর্য ফিরে আসার কারণে ওয়াক্ত প্রলম্বিত হওয়া সাব্যস্ত হয়। কাজেই বোঝা গেলো যে, সময় প্রলম্বিত হওয়া সম্ভাব্য বিষয়।

قَوْلُه وهٰذا بِخِلافِ الحَجِّ الخ : এর দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে।

প্রশ্ন : হজ্জের জন্য বাহন ও সম্বল থাকা قُدرتِ مُمْكِنَة আর আদায় ওয়াজিব হওয়ার জন্য قدرتِ مُمكِنة এর সম্ভাবনা শর্ত। সুতরাং সম্বল ও বাহনের সম্ভাবনার ভিত্তিতে হজ্জ ফরয হওয়া চাই। যেমন– কুদরতের সম্ভাবনার কারণে নামায ওয়াজিব হয়ে যায়। অথচ সম্বল ও বাহন বিহীন বহু মানুষ হজ্জ করে থাকে। আর ওয়াক্তের শেষ অংশে ওয়াক্ত প্রলম্বিত হওয়ার ক্ষেত্রে নামায আদায় করা খুবই দুর্লভ ব্যাপার। কিন্তু তা সত্ত্বে ওয়াক্তের শেষাংশে কোনো ব্যক্তি নামাযের যোগ্য হলে কেবল কুদরতের সম্ভাবনার ভিত্তিতে নামায ওয়াজিব হয়ে যায়। সুতরাং সম্বল ও বাহনের সম্ভাবার কারণে আরো উত্তমরূপে হজ্জ ফরয হওয়া উচিত অথচ তা হয় না কেন?

لِاَنَّ الْحَجَّ لَا يُقْضٰى وَاِنَّمَا تَظْهَرُ فِى حَقِّ الْاِثْمِ وَالْاِيْصَاءِ وَذٰلِكَ غَيْرُ مَعْقُوْلٍ - وَكَامِلٌ وَهُوَ الْقُدْرَةُ الْمُيَسِّرَةُ لِلْاَدَاءِ عَطْفٌ عَلٰى قَوْلِهِ مُطْلَقٌ وَهٰذَا هُوَ الْقِسْمُ الثَّانِى وَيُسَمّٰى هٰذَا مُيَسِّرَةً لِاَنَّهُ جَعَلَ الْاَدَاءَ يَسِيْرًا سَهْلًا عَلَى الْمُكَلَّفِ لَا بِمَعْنٰى اَنَّهُ قَدْ كَانَ قَبْلَ ذٰلِكَ عَسِيْرًا ثُمَّ يَسَّرَهُ اللّٰهُ بَعْدَ ذٰلِكَ بَلْ بِمَعْنٰى اَنَّهُ اَوْجَبَ مِنَ الْاِبْتِدَاءِ بِطَرِيْقِ الْيُسْرِ وَالسُّهُوْلَةِ كَمَا يُقَالُ ضَيِّقْ فَمَ الرَّكِيَّةِ اَىْ اِجْعَلْهُ ضَيِّقًا مِنَ الْاِبْتِدَاءِ لَا اَنَّهُ كَانَ وَاسِعًا ثُمَّ يُضَيِّقُهُ وَهٰذِهِ الْقُدْرَةُ شَرْطٌ فِى اَكْثَرِ الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَةِ دُوْنَ الْبَدَنِيَّةِ - وَدَوَامُ هٰذَا الْقُدْرَةِ شَرْطٌ لِدَوَامِ الْوَاجِبِ اَىْ مَا دَامَتْ هٰذِهِ الْقُدْرَةُ بَاقِيَةً يَبْقَى الْوَاجِبُ وَاِذَا انْتَفَى الْقُدْرَةُ اِنْتَفَى الْوَاجِبُ لِاَنَّ الْوَاجِبَ كَانَ ثَابِتًا بِالْيُسْرِ فَاِنْ بَقِىَ بِدُوْنِ الْقُدْرَةِ يَتَبَدَّلُ الْيُسْرُ اِلَى الْعُسْرِ الصِّرْفِ -

---

অনুবাদ॥ কেননা, হজ্জের কাযা হয় না। বরং গুনাহগার হওয়া এবং অসিয়ত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে এর ফল প্রকাশিত হবে। আর তা যুক্তিযুক্ত নয়। ২. *আর* قدرت كامل *(পূর্ণাঙ্গ সামর্থ্য) হলো আদার জন্যে* قدرت ميسره *বা (সহজসাধ্য সামর্থ্য)।* এটা গ্রন্থকারের অন্য উক্তি مطلق এর উপরে আতফ হয়েছে। এটা কুদরতের দ্বিতীয় প্রকার। এটাকে সহজসাধ্য সামর্থ্য বলে নামকরণ করা হয়েছে। কেননা, এটা মুকাল্লাফের জন্যে আদাকে সহজসাধ্য করে দেয়। এটা এ অর্থে নয় যে, তা পূর্বে কঠিন ছিল, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা একে সহজ করে দিয়েছেন। বরং এ অর্থে যে, আল্লাহ তা'আলা সহজ ও সরল পন্থায় শুরু থেকে ওয়াজিব করে দিয়েছেন।

যেমন বলা হয়– কূপের মুখ সংকীর্ণ রাখ, অর্থাৎ প্রথম থেকেই কূপেরমুখ সংকীর্ণ রাখ। এ অর্থ নয় যে, কূপের মুখ আগে প্রশস্ত ছিল, তারপর তাকে সংকীর্ণ করা হয়েছে। অধিকাংশ আর্থিক ইবাদতে قدرت ميسره শর্ত, দৈহিক ইবাদতে নয়। *ওয়াজিব স্থায়ী হওয়ার জন্যে এ সামর্থ্য স্থায়ী হওয়া শর্ত।* অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত এ সামর্থ্য বিদ্যমান থাকবে ওয়াজিবও ততদিন বিদ্যমান থাকবে। আর যখন এ সামর্থ্য রহিত হয়ে যাবে, তখন ওয়াজিবও রহিত হয়ে যাবে। কেননা ওয়াজিব সহজসাধ্য হিসেবে সাব্যস্ত। অতএব সামর্থ্য ছাড়া যদি তা বহাল থাকে, তবে সহজ কঠিনে পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ উত্তর : হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে সম্বল ও বাহনের সম্ভাবনা ধর্তব্য হওয়ার মধ্যে অনেক ক্ষতি রয়েছে। কারণ যদি এ ধরনের কথা মেনে নেয়া হয়। তাহলে তার ফলাফল কাযা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে জাহির হবে না। কারণ হজ্জের কাযা হয় না। বরং যখন হজ্জ করবে তখনই আদায় গণ্য হবে। অবশ্য গুণাহগার হওয়া এবং অছিয়ত করার ক্ষেত্রে এর ফলাফল প্রকাশ পাবে। তা এভাবে যে, যদি এ ধরনের توهم এর দ্বারা হজ্জ ফরয হয় তাহলে প্রত্যেক বিবেক সম্পন্ন বালিগ ব্যক্তির উপরে হজ্জ ফরয হবে। এখন এই توهم যদি বাস্তবে সম্বল ও বাহন দ্বারা পরিবর্তিত না হয়, আর এ অবস্থায় মৃত্যুর ডাক এসে পড়ে তাহলে উক্ত ব্যক্তি হয়তো তার কোনো ওয়ারিশকে তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করার অছিয়ত করবে। যদি অছিয়ত না করে তাহলে লোকটি গোণাহগার হবে। আর

অছিয়ত করলেও তা পালন করা অধিকাংশের ক্ষেত্রেই দুরূহ ব্যাপার হবে। ফলে এর দ্বারা تكليف ما لا يطاق সাব্যস্ত হবে। অথচ আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا আল্লাহ সাধ্যের বাইরে কারো উপর কোনো বিধান চাপিয়ে দেন না।

قوله وكامل وهو القدرة الميسرة الخ : এই ইবারতে কুদরতের দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ কুদরতে কামেলার বর্ণনা করা হয়েছে। এর অপর নাম হলো قدرت مُيَسِّرَة এ নাম এ কারণে রাখা হয়েছে যে, এর দ্বারা মোকাল্লাফ ব্যক্তির উপর মামূরবিহী আদায় করা সহজ করে দেয়। مُيَسِّرَة এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, এর পূর্বে মামূরবিহী দুঃসাধ্য ছিলো। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাকে সহজ করে দিয়েছেন। বরং উদ্দেশ্য এই যে, শুরু থেকেই আল্লাহ তা'আলা সহজভাবে ওয়াজিব করেছেন। যেমন কোনো ব্যক্তি বললো ضَيِّقْ فَمَ الْبِئْرِ "কূপের মুখ সংকীর্ণ রেখ" এর অর্থ এই নয় যে, আগে কূপের মুখ প্রশস্ত ছিলো। এরপর তাকে সংকীর্ণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বরং এর অর্থ হলো শুরু থেকেই কূপের মুখ সংকীর্ণ রাখো।

মোল্লা জিয়ন (র) বলেন– অধিকাংশ عِبَادَاتِ مَالِيَه এর জন্য قدرت مُيَسِّرَة শর্ত। যেমন যাকাত ও উশর। عبادت بدنية এর জন্য এটা কখনো শর্ত নয় এবং কোনো কোনো ইবাদতে مالية এর ক্ষেত্রেও শর্ত নয়। যেমন সাদকায়ে ফিতির। কারণ তা قدرت مُمَكِّنَة দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে যায়। আর সাদকায়ে ফিতির ওয়াজিব হওয়ার জন্য قدرت مُيَسِّرَة শর্ত নয়। বাকী অধিকাংশ ইবাদাতে مالية এর জন্য قدرت مُيَسِّرَة শর্ত হওয়ার কারণ কি?

এর উত্তর এই যে, মাল যেহেতু মানুষের প্রিয় বস্তু। এ কারণে মাল ব্যয় করা তথা عبادت مالية আদায় করা অত্যন্ত কষ্টকর বিষয়। সুতরাং ইবাদতে مالية আদায় করা যেহেতু মানুষের উপর কষ্টকর এজন্য। এ কষ্ট নিবারণার্থে قدرت مُيَسِّرَة কে শর্ত স্থির করা হয়েছে।

قوله ودوام هذه القدرة الخ : মানার গ্রন্থকার বলেন– قدرت مُيَسِّرَة এর সদা স্থিতি ওয়াজিবের স্থিতির জন্য শর্ত। অর্থাৎ যতোক্ষণ পর্যন্ত قدرت ميسرة বহাল থাকবে ততোক্ষণ পর্যন্ত ওয়াজিবও বাকী থাকবে। আর যখন قدرت ميسّرة থাকবে না তখন ওয়াজিবও থাকবে না। কারণ ওয়াজিব يُسر (সহজতা) গুণের সাথে সাব্যস্ত হয়। সুতরাং যদি قدرت ميسّرة ছাড়া ওয়াজিব বহাল থাকে তাহলে সহজতা কাঠিন্য (عُسر) দ্বারা পরিবর্তন হয়ে যায়। অর্থাৎ যে ইবাদত এবং মামুরবিহী সহজভাবে আদায় করা ওয়াজিব হয়েছিলো। তা কাঠিন্যতার সাথে আদায় করতে হবে। অথচ এটা শরীআতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। অতএব সাব্যস্ত হলো যে, قدرت ميسّرة এর স্থিতি ওয়াজিবের স্থিতির জন্য শর্ত।

حَتّٰى تَبْطُلَ الزَّكٰوةُ وَالْعُشْرُ وَالْخِرَاجُ بِهَلَاكِ الْمَالِ تفريعٌ على قوله و دَوامُ هٰذه الْقُدْرَة يَعْنِى اَنَّ الزَّكٰوة كَانَتْ وَاجِبَةً بِالْقُدْرَةِ الْمُيَسِّرة لِاَنَّ التَّمَكُّنَ فِيهِ يَثْبُتُ بِمِلْكِ اَصْلِ الْمَالِ فَاِذَا اشْتُرِطَ النِّصَابُ الْحَوْلِيُّ عُلِمَ اَنَّ فِيهِ قدرةٌ مُيَسِّرةٌ فاذا هَلَكَ النِّصَابُ بَعْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ سَقطتِ الزَّكٰوةُ اِذْ لَوْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ اِلَّا غُرْمًا وعِنْد الشَّافِعِيِّ رح لَا تَسْقُطُ لِتقرُّرِ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ بِالتَّمَكُّنِ

অনুবাদ॥ ***ফলে যাকাত, উশর এবং কর, মাল বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে রহিত হয়ে যায়।*** এখান থেকে গ্রন্থকারের বক্তব্য ودوامُ هٰذه الْقُدْرَة -এর আলোকে অনেকগুলো শাখা মাসআলা আরম্ভ হয়েছে। অর্থাৎ, যাকাত قدرت مُيَسِّرَة এর কারণে ওয়াজিব ছিল। কেননা, তার মধ্যে সামর্থ্য সাব্যস্ত হয়েছে মূল মাল তথা নিসাব পরিমাণ মালের মালিকানা দ্বারা। সুতরাং, যখন বর্ষপূর্তির শর্ত করা হলো, তখন জানা গেল যে, অবশ্যই তাতে قدرت مُيَسِّرَة রয়েছে।

অতঃপর বর্ষপূর্তির পর যদি নিসাব ধ্বংস হয়ে যায়, তবে যাকাত রহিত হয়ে যাবে। কেননা, এমতাবস্থায় যদি আদিষ্ট ব্যক্তির উপর যাকাত বহাল থাকে, তবে তা নিছক জরিমানা হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, আদিষ্ট ব্যক্তির উপরে قُدرتِ مُمَكِّنَة এর وجوب বহাল থাকার কারণে যাকাত মাফ হবে না।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ قوله حَتّٰى تَبْطُلَ الزَّكٰوةُ الخ : মুসান্নিফ (র) পূর্বে উল্লেখ করেছেন যে, ওয়াজিব বহাল থাকার জন্য قدرت ميسَّرة বহাল থাকা শর্ত। এই সূত্রের উপর ভিত্তি করে বলেন যে, নিসাব পরিমাণ মাল বিনষ্ট হওয়ার দ্বারা যাকাত এবং ফসল বিনষ্ট হওয়ার দ্বারা ওশর ও খেরাজ (ট্যাক্স) বাতিল হয়ে যায়।

এর ব্যাখ্যা এই যে, قدرت ميسرة এর কারণে যাকাত ওয়াজিব হয়। কেননা যাকাতের ওপর মূল ক্ষমতা (قدرت ممكنة) এমন মালে নিসাবের মালিক হওয়া দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে মাল মৌলিক প্রয়োজনাদি এবং ঋণ থেকে অতিরিক্ত হয়। কিন্তু এর সাথে যখন حولان حول তথা বছর পূর্ণ হওয়ার শর্তারোপ করা হলো যা প্রকৃত মাল বৃদ্ধির স্থলাভিষিক্ত। তখন বোঝা গেলো যে, যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য قدرت ميسرة শর্ত। অন্যথায় বছর অতিক্রান্ত হওয়াকে শর্ত স্থির করা হতো না। সুতরাং যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য এ حولان حول শর্ত হওয়ার কারণে বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর যদি পূর্ণ নিসাব নষ্ট হয়ে যায়। তাহলে হানাফীগণের মতে তার যাকাত রহিত হয়ে যাবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে যাকাত রহিত হবে না। তবে বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে যদি মালে নিসাব নষ্ট হয়ে যায়। তাহলে কারো মতে যাকাত ওয়াজিব হবে না।

দলিল : বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরে মালে নিসাব নষ্ট হলে যাকাত রহিত হওয়ার ব্যাপারে হানাফীগণের দলিল এই যে, মালে নিসাব বিনষ্ট হওয়া সত্ত্বে যদি মুকাল্লাফ ব্যক্তির উপর যাকাত বহাল থাকে তাহলে এটা তার উপর এক পর্যায়ে জরিমানা সাব্যস্ত হবে। এবং সক্ষমতা ছাড়া যাকাত ওয়াজিব করা বিবেচিত হবে। অথচ قدرت ميسرة ছাড়া যাকাত ওয়াজিব হয় না। কাজেই বোঝা গেলো যে, বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর মালে নিসাব বিনষ্ট হওয়ার কারণে মুকাল্লাফ ব্যক্তির জিম্মা থেকে যাকাত রহিত হয়ে যায়।

এখন কথা হলো দুনিয়া ও আখিরাত উভয় ক্ষেত্রে যাকাত রহিত হবে, না কি শুধু পার্থিব ক্ষেত্রে? এ প্রসঙ্গে মিশকাতুল আনওয়ার গ্রন্থকারের অভিমত এই যে, উভয় ক্ষেত্রেই যাকাত রহিত হয়ে যাবে। তবে "তাকরীব" গ্রন্থকার বলেন– কেবল পার্থিব বিধানে রহিত হবে। পারলৌকিক ক্ষেত্রে সে গুণাহগার হবে।

بِخِلَافِ مَا إِذَا اسْتَهْلَكَهُ إِذْ تَبْقَى عَلَيْهِ زَجْرًا لَهُ عَلَى التَّعَدِّيْ وَهٰذَا إِذَا هَلَكَ كُلَّ النِّصَابِ إِذْ لَوْ هَلَكَ بَعْضُ النِّصَابِ تَبْقَى بِقِسْطِهِ لِأَنَّ شَرْطَ النِّصَابِ فِى الْإِبْتِدَاءِ لَمْ يَكُنْ إِلَّا لِلْغِنَاءِ لَا لِلْيُسْرِ - إِذْ أَدَاءُ دِرْهَمٍ مِنْ أَرْبَعِيْنَ كَأَدَاءِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ مِنْ مِائَتَيْنِ فَإِذَا وُجِدَ الْغِنَاءُ ثُمَّ هَلَكَ الْبَعْضُ فَالْيُسْرُ فِى الْبَاقِىْ بَاقٍ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ

অনুবাদ॥ আদিষ্ট ব্যক্তি যদি স্বয়ং নিসাবকে ধ্বংস করে ফেলে তাহলে তা এর বিপরীত। কেননা, তার উপরে যাকাতের হুকুম থেকে যাবে, এটা সীমালঙ্ঘন হেতু তার শাস্তি স্বরূপ। এ মত পার্থক্য তখনই কার্যকর হবে, যখন সম্পূর্ণ নিসাব ধ্বংস হয়ে যাবে। কেননা, নিসাবের কিছু অংশ যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তবে এর বাকি অংশের উপরে যাকাত থেকে যাবে। কেননা, প্রথম দিকে নিসাবের শর্ত ছিল কেবল ধনাঢ্যতার কারণে, সহজতার জন্যে নয়।

কারণ চল্লিশ দিরহাম থেকে এক দিরহাম আদায় করা, দুইশত দিরহাম থেকে পাঁচ দিরহাম আদায় করার মতই। সুতরাং যখন ধনাঢ্যতা পাওয়া গেল; তারপর নিসাবের কিছু অংশ নষ্ট হয়ে গেল, তখন অবশিষ্টাংশের মধ্যে এর অংশ অনুপাতে সহজসাধ্যতা অবশিষ্ট থেকে গেল।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ ইমাম শাফেয়ী (র) এর দলিল : পূর্ণ নিসাব বিনষ্ট হওয়া সত্ত্বে লোকটি قدرت ميسرة এর কারণে যেহেতু যাকাত আদায়ে সক্ষম। এ কারণ তার উপর ওয়াজিব বহাল থাকবে। তবে যদি কেউ বছর অতিক্রান্ত করার পরে পূর্ণ নিসাব বিনষ্ট করে দেয়। তাহলে আমাদের মতেও তার উপর যাকাত বহাল থাকবে। কারণ সে পূর্ণ নিসাব বিনষ্ট করে যাকাতের হকদার তথা গরিব মিসকীনের অধিকার নষ্ট করলো। এই কারণে প্রতিফল ও সাজাস্বরূপ তার উপর যাকাত বহাল থাকবে।

নুরুল আনওয়ার গ্রন্থকার বলেন– হানাফী এবং শাফেয়ীগণের মধ্যে এই ইখতেলাফ পূর্ণ মালে নিসাব বিনষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে। যদি নিসাবের কিছু অংশ বাকী থাকে তাহলে উক্ত অংশের যাকাত আমাদের মতেও বহাল থাকবে। আর বিনষ্ট পরিমাণ মালের যাকাত রহিত হয়ে যাবে।

দলিল : এর দলিল এই যে, শুরুতে নিসাবের শর্ত কেবল ধনাঢ্যতার কারণে ছিলো। অর্থাৎ মুকাল্লাফ ব্যক্তিকে ধনী বা মালদার বানানোর জন্যে শুরুতে নিসাবের শর্ত লাগানো হয়েছিলো। কারণ যাকাতের উদ্দেশ্য হলো গরীবকে ধনী করা। আর সে-ই ধনী বানাতে পারে যে নিজে ধনী থাকে। সুতরাং মুকাল্লাফ ব্যক্তির ধনী হওয়া আবশ্যক। আর ধনী হওয়ার ক্ষেত্রে যেহেতু মানুষের অবস্থা বিভিন্নরূপ। এ কারণে শরীআত প্রবর্তক নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়াকে এর মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন। অর্থাৎ এ পরিমাণের মালিক হলে সে ধনী বিবেচিত হবে। অন্যথায় সে গরীব বিবেচিত হবে।

মোটকথা বছরের শুরুতে নিসাবের শর্তারোপ করা কেবল ধন্যাঢ্যতার কারণে ছিলো; সহজতার জন্যে নয়। অর্থাৎ নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়া যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য قدرت ممكنة এর পর্যায়ে, قدرت ميسرة এর পর্যায়ে নয়। ৪০ দিরহামের থেকে ১ দিরহাম প্রদান করা সহজতার ক্ষেত্রে এমন যেমন ২শ দিরহাম থেকে ৫ দিরহাম আদায় করা সহজ। কাজেই প্রমাণিত হলো যে, নিসাবের শর্তারোপ করা সহজতার কারণে নয়। বরং ধন্যাঢ্যতা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য। কাজেই যখন ধনাঢ্যতা তথা নিসাবের মালিক হওয়া পাওয়া গেলো আর বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরে নিসাবের এক অংশ বিনষ্ট হয়ে গেলো। সেক্ষেত্রে বাকী অংশের সহজতা যেহেতু উক্ত অংশ পরিমাণ বিদ্যমান থাকে। এ কারণে বাকী অংশে যাকাত ওয়াজিব থাকবে।

উদাহরণ : যেমন ২শ দিরহামের মধ্য থেকে বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরে ১শ দিরহাম বিনষ্ট হয়ে গেলো। তাহলে বাকী ১শ দিরহাম থেকে আড়াই দিরহাম যাকাত ওয়াজিব হবে। কারণ ২শ দিরহাম থেকে ৫ দিরহাম আদায় করা যেমন সহজ তদ্রূপ ১শ দিরহাম থেকে আড়াই দিরহাম আদায় করাও তেমন সহজ।

وَكذا العُشْرُ كانَ واجبا بِالقُدْرَةِ المُيَسِّرَةِ لِاَنَّ المُمَكِّنَةَ فِيهِ كانَ بِنَفْسِ الزِّرَاعَةِ فَاِذا شَرَطَ قِيامَ تِسْعَةِ الاَعْشارِ عِنْدَه كانَ دَلِيلاً عَلَى اَنَّه يَجِبُ بِطَرِيقِ اليُسْرِ فَاِذا هَلَكَ الخارِجُ كُلُّه او بَعْضُه بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنَ التَّصَدُّقِ يَبْطُلُ العُشْرُ بِحِصَّتِه لِاَنَّه اسمٌ اِضافِيٌّ يَقْتَضِي وُجُودَ الحِصَصِ الباقِيَةِ - وكذا الخَراجُ كانَ واجِبا بِالقُدْرَةِ المُيَسِّرَةِ لِاَنَّه يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّمَكُّنُ مِنَ الزِّرَاعَةِ بِنُزُولِ المَطَرِ و وُجُودِ الاٰلاتِ الحَرْثِ وغَيرِ ذٰلِكَ -

---

অনুবাদ ॥ অনুরূপভাবে قدرت ميسرة এর কারণে উশর ওয়াজিব ছিল। কেননা, এর মধ্যকার قدرت ميسرة নিছক কৃষি দ্বারাই সাব্যস্ত ছিল। সুতরাং, ভূমির মালিকের কাছে যখন দশ ভাগের নয় ভাগ বর্তমান থাকার শর্ত করা হলো- তখন এটা প্রমাণিত হলো যে, নিশ্চয়ই উশর সহজতার লক্ষ্যে ওয়াজিব হয়েছে।

অতএব, উৎপাদিত ফসলের সম্পূর্ণ অংশ অথবা কিয়দাংশ যদি সাদকা করার ক্ষমতা লাভের পর বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে এর অংশ অনুসারে অর্থাৎ, যে পরিমাণ শস্য বিনষ্ট হয়েছে সে অনুপাতের উশর বাতিল হয়ে যাবে। কারণ, উশর হলো একটি আপেক্ষিক নাম, যা অবশিষ্ট অংশের অস্তিত্ব কামনা করে।

অনুরূপভাবে قدرت ميسرة এর কারণে কর ওয়াজিব হয়ে থাকে; কেননা, তার মধ্যে শর্ত হলো- বৃষ্টিবর্ষণ, কৃষি উপকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষিকার্য করার ক্ষমতা অর্জন করা।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله وكذا العُشْرُ كانَ الخ : ব্যাখ্যাকার বলেন- উশরও قدرت ميسرة এর কারণে ওয়াজিব ছিলো। কারণ উশরের মধ্যে ফসলের দ্বারা قدرت ممكنة হাসিল ছিলো। কিন্তু ভূমির মালিকের নিকট যখন নয় অংশ বাকী থাকার শর্তারোপ করা হলো তখন এটা এ বিষয়ের দলিল বোঝায় যে, উশর সহজতার ভিত্তিতে ওয়াজিব হয়। সুতরাং যদি উশর আদায় করতে সক্ষমতার পরে পূর্ণ ফসল নষ্ট হয়ে যায় বা কিছু অংশ নষ্ট হয়ে যায় তাহলে নষ্টের পরিমাণে উশর বাতিল হয়ে যাবে। অর্থাৎ পূর্ণ ফসল নষ্ট হয়ে গেলে উশর সম্পূর্ণরূপে বাতিল হয়ে যাবে। আর কিছু বিনষ্ট হলে সে পরিমাণে উশর বাতিল হবে। কারণ উশর হলো আপেক্ষিক বা তুলনামূলক নাম। যা ৯ অংশ বিদ্যমান থাকার দাবি করে। কাজেই নষ্ট হওয়ার পরে যা বাকী থাকবে তারই দশমাংশ ওয়াজিব হবে।

قوله وكذا الخَراجُ الخ : এভাবে কর বা ট্যাক্সও قدرت ميسرة এর কারণে ওয়াজিব ছিলো। কারণ ট্যাক্স ওয়াজিব হওয়ার জন্য ফসল করতে সমর্থ হওয়া শর্ত। তা এভাবে যে, বৃষ্টি, অনুকূল বায়ু এবং চাষের সরঞ্জাম বিদ্যমান থাকবে। সুতরাং যদি জমি অনুর্বর হয়, অথবা অনুর্বর নয় তবে বৃষ্টিপাত হয়নি, অথবা চাষের সরঞ্জাম যোগাড় হয়নি তাহলে এ সকল ক্ষেত্রে খেরাজ বা ট্যাক্স ওয়াজিব হবে না। কারণ ট্যাক্স ওয়াজিব হওয়া ভূমি থেকে উৎপন্ন ফসলের সাথে সংশ্লিষ্ট; মূল ভূমির সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। কাজেই ট্যাক্স ওয়াজিব হওয়ার জন্য জলবায়ু অনুকূলে হওয়া এবং কৃষি সরঞ্জামাদি থাকা ও ভূমি উর্বর হওয়ার শর্তারোপ করা সহজতার লক্ষ্যে শর্ত হয়েছে। এর দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, ট্যাক্স ওয়াজিব হওয়ার জন্যও قدرت ميسرة শর্ত।

فَاِذَا عَطَّلَ الْاَرْضَ وَ لَمْ يَزْرَعْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْخِرَاجُ لِلتَّمَكُّنِ التَّقْدِيْرِيِّ وَ هٰذَا مِمَّا يُعْرَفُ وَ لَا يُفْتٰى بِهٖ لِتَجَاسُرِ الظَّلَمَةِ بِخِلَافِ الْعُشْرِ فَاِنَّهٗ يُشْتَرَطُ فِيْهِ الْخَارِجُ التَّحْقِيْقِيُّ دُوْنَ التَّقْدِيْرِيِّ وَ لٰكِنْ اِذَا لَمْ يُعَطِّلْ وَ زَرَعَ الْاَرْضَ وَ اصْطَلَمَتِ الزَّرْعَ اٰفَةٌ يَسْقُطُ عَنْهُ الْخِرَاجُ لِاَنَّهٗ وَاجِبٌ بِالْقُدْرَةِ الْمُيَسَّرَةِ -

---

অনুবাদ ॥ সুতরাং, সে ব্যক্তি যদি জমিন চাষাবাদ না করে জমিনকে অনাবাদী রাখে, তবে পরোক্ষ ক্ষমতার কারণে তার উপরে ট্যাক্স কর আদায় করা ওয়াজিব হবে। এটা সর্বজনবিদিত বস্তুর অন্তর্গত। আর জালিমদের দুঃসাহস বেড়ে যাওয়ার আশংকায় এর উপর ফতোয়া প্রদান করা যাবে না। কিন্তু উশর এর বিপরীত। কেননা, ফসল বাস্তবে বিদ্যমান থাকা এর মধ্যে শর্ত; বাস্তবের ধারণা যথেষ্ট নয়। তবে চাষী যদি জমি অনাবাদী না রাখে বরং জমিনকে চাষাবাদ করে, কিন্তু কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল বিনাশ করে ফেলে, তবে কর মওকুফ হয়ে যাবে। কেননা, তা قدرت ميسرة এর কারণে ওয়াজিব হয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله فَاِذَا عَطَّلَ اَرْضَ الخ : এর দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দেয়া উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন : ট্যাক্স যদি قدرت ميسرة এর কারণে ওয়াজিব হয় তাহলে যে ব্যক্তি খেরাজি জমিকে কোনো চাষাবাদ না করে বেকার ছেড়ে দেবে তাহলে তার উপর ট্যাক্স ওয়াজিব না হওয়া উচিত। কারণ তার উপর ট্যাক্স ওয়াজিব করার মধ্যে কোনো يسر তথা সহজতা নেই। অথচ শরীআতে তার উপর ট্যাক্স ওয়াজিব করে থাকে।

উত্তর : এখানে পরোক্ষভাবে قدرت ميسرة বিদ্যমান রয়েছে, অর্থাৎ উর্বর ভূমি, চাষ উপযোগী হয়েছে এবং কৃষি সরঞ্জামাদিও রয়েছে। এতো কিছু সত্বে চাষাবাদ না করা এবং ভূমিকে বেকার ছেড়ে দেয়া তা বিনষ্টের নামান্তর। এটা এক পর্যায়ের অনাচার ও জুলুমে শামিল। আর জুলুমের ক্ষেত্রে ওয়াজিব রহিত হয় না। সুতরাং এ ব্যক্তির জিম্মা থেকে ট্যাক্স রহিত হবে না।

এটি মনে রাখতে হবে যে, জানার জন্য এ মাসআলা অবগত হওয়া কিংবা বর্ণনা করাতে কোনো দোষ নেই। তবে এর উপর ফতওয়া দেয়া যাবে না। অন্যথায় জালিম শাসকবর্গ প্রকৃত অক্ষমতা সত্ত্বেও সক্ষম হওয়ার কথা বলে ট্যাক্স চাপিয়ে বসবে। যা সরাসরি জুলুম। কাজেই এ ব্যাপারে ফতওয়া দেয়া যাবে না। তব উশরের ব্যাপারটি এ থেকে ভিন্ন। কার উশর ওয়াজিব হওয়ার জন্য বাস্তবে ফসল হওয়া শর্ত। ফসল উপযোগী হওয়া ধর্তব্য নয়। কাজেই যখন প্রকৃতপক্ষে ফসল উৎপন্ন হবে তখন উশর ওয়াজিব হবে। অন্যথায় উশর ওয়াজিব হবে না। তবে ভূমি মালিক যদি ভূমিকে বেকার না ছাড়ে বরং তাতে চাষাবাদ করে। আর তা কোনো প্রাকৃতিক কারণে নষ্ট হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে ভূমি মালিক থেকে ট্যাক্স রহিত হয়ে যাবে। কেননা قدرت ميسرة এর কারণে ট্যাক্স ওয়াজিব হয়েছিলো। এখন যদি দৈব কারণে ফসল বিনষ্ট হওয়া স্বত্বে ট্যাক্স ওয়াজিব করা হয় তাহলে এটা ভূমি মালিকের উপর জরিমানা সাব্যস্ত হবে এবং সহজতা কাঠিন্য দ্বারা পরিবর্তন হয়ে যাবে। আর শরীআতে এর কোনো অবকাশ নেই।

بِخِلَافِ الْأُوْلَى حَتَّى لَا يَسْقُطَ الْحَجُّ وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ بِهَلَاكِ الْمَالِ بَيَانٌ لِلْمُمَكِّنَةِ بِطَرِيْقِ الْمُقَابَلَةِ يَعْنِي أَنَّ بَقَاءَ الْقُدْرَةِ الْمُمَكِّنَةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِبَقَاءِ الْوَاجِبِ لِأَنَّهُ شَرْطٌ مَحْضٌ وَلَا يُشْتَرَطُ بَقَاؤُهُ كَالشُّهُوْدِ فِي بَابِ النِّكَاحِ فَإِذَا زَالَتِ الْقُدْرَةُ الْمُمَكِّنَةُ بَقِيَ الْوَاجِبُ وَلِهٰذَا يَبْقَى الْحَجُّ وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ بِهَلَاكِ الْمَالِ لِأَنَّ الْحَجَّ يَثْبُتُ بِالْقُدْرَةِ الْمُمَكِّنَةِ لِأَنَّ الزَّادَ الْقَلِيْلَ وَالرَّاحِلَةَ الْوَاحِدَةَ أَدْنَى مَا يَتَمَكَّنُ بِهَا الْمَرْءُ مِنْ أَدَاءِ الْحَجِّ وَأَمَّا الْيُسْرُ فَإِنَّمَا يَقَعُ بِخَدَمٍ وَمَرَاكِبَ كَثِيْرَةٍ وَأَعْوَانٍ مُخْتَلِفَةٍ وَمَالٍ كَثِيْرٍ فَإِذَا فَاتَتِ الْقُدْرَةُ يَبْقَى الْحَجُّ عَلَى حَالِهِ يَظْهَرُ ذٰلِكَ فِي حَقِّ الْإِثْمِ وَالْإِيْصَاءِ -

অনুবাদ ॥ *এটা প্রথম প্রকারের বিপরীত। এ জন্যে হজ্জ এবং সাদকায়ে ফিতর মাল ধ্বংস হওয়ার কারণে রহিত হয় না।* مقابلة তথা তুলনামূলক হিসেবে قدرت ممكنة এর আলোচনা। অর্থাৎ, ওয়াজিব বহাল থাকার জন্য قدرتِ مُمَكِّنَة বহাল থাকা শর্ত নয়। কেননা, এটা নিছক শর্ত মাত্র। এটা বহাল থাকা শর্ত নয়। যেমন- বিবাহের সাক্ষীদের বহাল থাকা শর্ত নয়।

قدرت ممكنة যখন রহিত হয়ে যায়, তখন ওয়াজিব বহাল থেকে যায়। এ কারণে হজ্জ এবং সাদকায়ে ফিতর মাল ধ্বংস হওয়া সত্ত্বে বহাল থেকে যায় (রহিত হয় না)। কেননা, হজ্জ সাব্যস্ত হয় قدرت ممكنة দ্বারা। কারণ, স্বল্প পরিমাণ পাথেয় এবং একটি যানবাহন সর্বনিম্ন এমন সামর্থ্য, যা দ্বারা মানুষ হজ্জ আদায় করতে সক্ষম হতে পারে।

قدرت ميسرة হলো বহু সেবক, প্রচুর বাহন, নানাবিধ সাহায্য-সহযোগিতা এবং অনেক সম্পদ পাওয়া যাওয়ার মাধ্যমে লাভ হবে। قدرت ممكنة ফউত হয়ে গেলেও হজ্জ স্ব-অবস্থায় বহাল থাকবে। এটা প্রকাশিত হবে গুনাহগার হওয়া এবং অসিয়ত করা ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله بِخِلَافِ الْأُوْلَى حَتَّى لَا يَسْقُطَ الخ : পূর্বের ইবারতে قدرت ميسرة এর বিবরণ ছিলো। এই ইবারতে তার মোকাবেল বা বিপরীতের পর্যায়ে قدرت ممكنة এর বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে।

এর সার এই যে, ওয়াজিব বহাল থাকার জন্য قدرت ممكنة বহাল থাকা শর্ত। قدرت ممكنة বহাল থাকা শর্ত নয়।

অর্থাৎ قدرت مُمَكِّنَة দ্বারা যে জিনিস ওয়াজিব হয়েছিলো তা বহাল থাকা উক্ত قدرت বহাল থাকার উপর মওকুফ নয়। বরং ممكنة এর অনুপস্থিতিতেও ওয়াজিব বহাল থাকে।

দলিল : قدرت ممكنة - احداث فعل ও ايجاد فعل তথা কোনো কাজ সৃষ্টি করার ব্যাপারে সক্ষম হওয়ার জন্য কেবল একটি শর্ত মাত্র। এর মধ্যে ইল্লতের অর্থ কখনো নেই। আর যে বস্তু কোনো কাজ বিদ্যমান হওয়ার শর্ত হয় তার দ্বারা এটি অপরিহার্য হয় না যে, উক্ত বস্তু সে কাজ বহাল থাকার জন্য শর্ত হবে।

উদাহরণ : যেমন বিবাহ বন্ধনের জন্য সাক্ষী থাকা শর্ত। বিবাহ বহাল থাকার জন্য সাক্ষীদের বহাল থাকা শর্ত নয়। বরং সাক্ষীদের মৃত্যুর পরও বিবাহ বহাল থাকে।

মোটকথা قدرت ممكنة যেহেতু احداث فعل তথা কোনো কাজ অস্তিত্বে আনার জন্য শর্ত। এর মধ্যে ইল্লতের অর্থ একেবারে নেই। কাজেই কাজ বহাল থাকার জন্য قدرت ممكنة থাকা শর্ত হবে না। এর বিপরীতে قدرت ميسرة এটা নিছক শর্ত নয় বরং এর মধ্যে ইল্লতের অর্থও রয়েছে। তা এভাবে যে, قدرت ميسرة এর কারণে যখন কোনো জিনিস ওয়াজিব হবে তখন তা সহজতার বিশেষণের সাথে ওয়াজিব হবে। আর সহজতা যেহেতু قدرت ميسرة ছাড়া কল্পনা করা সম্ভব নয়। এ কারণেই قدرت ميسرة এর মাধ্যমে যে বস্তু ওয়াজিব হয় তা বহাল থাকার জন্যও قدرت ميسرة বহাল থাকা শর্ত। কারণ মা'লূল যেভাবে তার অস্তিত্বের ব্যাপারে ইল্লতের মুখাপেক্ষী তদ্রূপ তার স্থায়িত্বের জন্যে ইল্লতের মুখাপেক্ষী হয়। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, মা'লূলের স্থায়িত্বের জন্য ইল্লতের স্থায়িত্ব শর্ত। আর ওয়াজিব বহাল থাকার জন্য যেহেতু قدرت ممكنة এর স্থায়িত্ব শর্ত নয়। এ কারণে এর অনুপস্থিতিতে ওয়াজিব স্ব অবস্থায় বহাল থাকে।

এ কারণে নেসাবের মালিক হওয়ার পরে যদি ঈদের দিন মালে নিসাব নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সাদকায়ে ফিতির স্ব অবস্থায় ওয়াজিব থাকবে। যদি সম্বল ও বাহনের উপর সক্ষমতার পরে উক্ত মাল বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে হজ্জ ওয়াজিব হওয়া বহাল থাকে। কারণ হজ্জ قدرت ممكنة দ্বারা সাব্যস্ত হয়। তা এভাবে যে, হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার বাণী وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا এর কারণে প্রকৃত সক্ষমতা শর্ত। আর কা'বাগৃহ থেকে দূরে অবস্থানকারীদের জন্য সম্বল ও বাহনের দ্বারা প্রকৃত সক্ষমতা হাছিল হয়। কেননা সামান্য পরিমাণ সম্বল এবং একটি সওয়ারি হলো নিম্নতম ক্ষমতা বা কুদরত। এর দ্বারা মানুষ হজ্জ করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ এটা তার জন্য قدرت ممكنة আর অনেক চাকর বাকর ও অধিক সওয়ারী, সাহায্যকর্মী ও অর্থকড়ি হওয়া এটা হলো قدرت ميسرة - কাজেই قدرت ممكنة ছুটে গেলেও হজ্জ তার জিম্মা থেকে রহিত হবে না।

এ ওয়াজিব বহাল থাকার ফলাফল এভাবে প্রকাশ পাবে যে, লোকটি হয়তো তার কোনো ওয়ারিশকে বদলি হজ্জ করার জন্য ওছিয়ত করবে। অন্যথায় সে গোণাহগার হবে। সুতরাং قدرت ممكنة না থাকার পরে শেষ সময়ে বদলি হজ্জের ওছিয়ত করা ওয়াজিব হওয়া, আর তা না করলে গুণাহগার হওয়া এ বিষয়ের দলিল যে, قدرت ممكنة না থাকা সত্ত্বে হজ্জ ওয়াজিব হওয়া বহাল থাকে।

وَكَذَا صَدَقَةُ الْفِطْرِ تَثْبُتُ بِالْقُدْرَةِ الْمُمَكِّنَةِ الَا تَرٰى اَنَّهُ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيْهَا حَوْلَانُ الْحَوْلِ وَالنَّمَاءُ بَلْ لَوْ هَلَكَ النِّصَابُ فِىْ يَوْمِ الْعِيْدِ تجبُ عليه الصَّدَقَةُ فاذا فَاتَ هٰذَا النِّصَابُ يَبْقٰى عليه الْوَاجِبُ بِحَالِهِ وعِنْدَ الشَّافِعِىِّ رح كُلُّ مَنْ يَمْلِكُ قُوْتًا فَاضِلاً عَنْ يَوْمِهِ تَجِبُ عليه الصَّدَقَةُ ولا يُشْتَرَطُ مِلْكُ نِصَابٍ قُلْنَا يَلْزَمُ فِىْ هٰذَا قَلْبُ الْمَوْضُوْعِ بِاَنْ يُعْطِىَ الْيَوْمَ الصَّدَقَةَ ثُمَّ يَسْاَلُ مِنْهُ غَدًا عَيْنَ تِلْكَ الصَّدَقَةِ -

অনুবাদ ॥ অনুরূপভাবে قدرت ممكنة দ্বারা সাদকায়ে ফিতর সাব্যস্ত হয়। তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, এর মধ্যে বর্ষপূর্তি এবং বর্ধনশীলতা শর্ত করা হয়নি।

এমনকি যদি ঈদের দিনে নিসাব বিনষ্ট হয়ে যায়, তথাপি সাদকা প্রদান করা তার ওপরে ওয়াজিব হয়। আর এ নিসাব ছুটে গেলে ওয়াজবি স্ব-অবস্থায় তার ওপরে বহাল থাকবে। ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, যে সকল লোক একদিনের অধিক খাদ্য দ্রব্যের মালিক তার/তাদের ওপর সাদকায়ে ফিতির ওয়াজিব হবে। তাঁর মতে, নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া শর্ত নয়।

আমরা এর উত্তরে বলবো, যে, এতে قلب موضوع অনিবার্য হয়ে পড়ে। তা এভাবে যে, যে ব্যক্তি আজ অন্যকে সাদকা প্র[illegible] করবে, আগামীকাল সে তার কাছেই সেই হুবহু উক্ত সাদকাই প্রার্থনা করবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله وكذا صَدَقَةُ الْفِطْرِ الخ : এভাবে সাদকায়ে ফিতির قدرت ممكنة দ্বারা ওয়াজিব হয়। কারণ সাদকায়ে ফিতির ওয়াজিব হওয়ার জন্য নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়া যথেষ্ট। এর জন্য বছর অতিক্রান্ত হওয়া এবং মাল বর্ধনশীল হওয়া শর্ত নয়। সুতরাং এটা এ বিষয়ের আলামত যে, সাদকায়ে ফিতির ওয়াজিব হওয়ার জন্য قُدْرَتِ مُمَكِّنَة শর্ত নয়। বরং قدرت ميسرة যথেষ্ট। এর স্থায়িত্ব যেহেতু ওয়াজিবের স্থায়িত্বের জন্য শর্ত নয়। এ কারণে ঈদের দিন সুবেহ সাদিকের পরে যদি নেসাব নষ্ট হয়ে যায়। তাহলেও সাদকায়ে ফিতির রহিত হবে না। বরং তা স্ব অবস্থায় বহাল থাকবে। কাজেই যদি কেউ তা আদায় করা ছাড়া মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে গোণাহগার হবে।

সাদকায়ে ফিতির ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র) এর মত এই যে, কোনো ব্যক্তি যদি এক দিনের অধিক খোরাকের মালিক হয় তাহলে তার উপরেও সাদকায়ে ফিতির ওয়াজিব। উদাহরণ স্বরূপ কোনো এক ব্যক্তি ঈদের দিন জরুরী খরচার অতিরিক্ত অর্ধ সা' গম কিংবা এক সা' যবের মালিক থাকে তাহলে তার উপরেও সাদকায়ে ফিতির আদায় করা ওয়াজিব হবে। তার মতে নিসাবের মালিক হওয়া জরুরি নয়।

উত্তর : হানাফীদের পক্ষ থেকে উত্তর এই যে, এক্ষেত্রে সাদকার মূল রহস্য পরিবর্তন হওয়া জরুরি হয়। কারণ ঈদের দিন যদি সেদিনের অতিরিক্ত অর্ধ সা' গম ফকিরকে দিয়ে দেয়। তাহলে ঈদের পূর্বের দিন এই লোকটি নিজে ভিক্ষার মুখাপেক্ষী হয় এবং হুবহু উক্ত ফকিরের কাছেই তার প্রদত্ত সাদকায়ে ফিতির চাবে যা সে গতকাল তাকে দিয়েছিলো। অর্থাৎ কাল সে ফকিরকে দান করলো। আর আজই তার ফকিরের নিকট ভিক্ষা চাইতে হলো। অথচ এটা জায়েয নয়। কেননা ফকিরের প্রয়োজন পূর্ণ করার তুলনায় অন্যের কাছে না চেয়ে নিজ প্রয়োজনাদি পূর্ণ করা উত্তম।

ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ رح عَنْ بَيَانِ حُسْنِ الْمَامُوْرِ بِهِ شَرَعَ فِيْ بَيَانِ جَوَازِهِ مُنَاسَبَةً وَاطِّرَادًا فَقَالَ وَهَلْ تَثْبُتُ صِفَةُ الْجَوَازِ لِلْمَامُوْرِ بِهِ إِذَا اَتَى بِهِ قَالَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِيْنَ لَا يَعْنِيْ اِخْتَلَفُوْا فِيْ أَنَّهُ إِذَا أَدَّى الْمَامُوْرَبِهِ مَعَ رِعَايَةِ الشَّرَائِطِ وَالْأَرْكَانِ فَهَلْ يَجُوْزُ لَنَا أَنْ نَحْكُمَ بِمُجَرَّدِ إِتْيَانِهِ بِالْجَوَازِ أَنْ نَتَوَقَّفَ فِيْهِ حَتَّى يَظْهَرَ دَلِيْلٌ خَارِجِيٌّ يَدُلُّ عَلَى طَهَارَةِ الْمَاءِ وَسَائِرِ الشَّرَائِطِ فَقَالَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِيْنَ لَا نَحْكُمُ بِهِ حَتَّى نَعْلَمَ مِنْ خَارِجٍ أَنَّهُ مُسْتَجْمِعٌ لِلشَّرَائِطِ وَالْأَرْكَانِ اَلَا تَرٰى أَنَّهُ مَنْ أَفْسَدَ حَجَّهُ بِالْجِمَاعِ قَبْلَ الْوُقُوْفِ فَهُوَ مَامُوْرٌ بِالْأَدَاءِ شَرْعًا بِالْمُضِيِّ عَلٰى أَفْعَالِهِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ الْمُؤَدّٰى إِذَا أَدَّاهُ فَيَقْضِيْ مِنْ قَابِلٍ -

অনুবাদ॥ মুসান্নিফ (র) مامور به টা حسن হওয়ার বর্ণনা থেকে অবসর হওয়ার পর, এখন তিনি প্রসঙ্গক্রমে ও সামগ্রিক আলোচনার স্বার্থে মামূর বিহী জায়েয হওয়ার বর্ণনা শুরু করেছেন। তিনি বলেন, ***যদি কেউ মামূরবিহী আদায় করে, তাহলে কি তার বৈধতার বিশেষণ সাব্যস্ত হবে? কতিপয় কালামশাস্ত্রবিদ না সূচক উত্তর দিয়েছেন।*** অর্থাৎ, উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে মতানৈক্য করেছেন যে, যদি মামূরবিহীকে তার শর্ত এবং রুকনসহ আদায় করা হয়– তবে কি আমাদের জন্যে জায়েয হবে যে, আমরা শুধুমাত্র মামূরবিহী (আদিষ্ট বস্তু) জায়েয হওয়ার হুকুম প্রদান করবো? অথবা আমরা এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করবো? স্বতন্ত্র প্রমাণ প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত, যা পানি পবিত্র হওয়ার এবং অপরাপর শর্তাবলির উপস্থিতির প্রতি ইংগিত করে। এ ব্যাপারে কতিপয় কালামশাস্ত্রবিদ বলেন, আমরা সে হুকুম প্রদান করবো না যতক্ষণ না স্বতন্ত্র প্রমাণের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, নিশ্চয়ই সে যাবতীয় শর্তাবলির ও যাবতীয় রোকনের পূরণকারী। তুমি কি দেখ নি- যে ব্যক্তি যৌনমিলনে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে আরাফার ময়দানে অবস্থানের পূর্বে তার হজ্জকে বিনষ্ট করে দেয়, সে শরীআত মোতাবেক অবশিষ্ট কার্যাদি সম্পন্ন করার মাধ্যমে হজ্জের অনুষ্ঠানাদি আদায়ে আদিষ্ট। অথচ তার আদায়কৃত হজ্জ জায়েয হয় না। সুতরাং আগামী বছর তার কাযা করতে হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ قوله ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ عَنْ بَيَانِ الخ : ব্যাখ্যাকার (র) বলেন– حسن مامور به এর বর্ণনা থেকে অবসর গ্রহণের পরে মুসান্নিফ (র) এখানে মামূরবিহী জায়িয হওয়ার বর্ণনা করছেন।

এর সার এই যে, মামূরবিহী আদায় করার পরে মামূরবিহীর জন্য বৈধতা প্রমাণিত কি না? এখানে বৈধতা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুকাল্লাফ ব্যক্তি থেকে কাযা রহিত হওয়া। অর্থাৎ মুকাল্লাফ ব্যক্তি যদি তার নির্দেশিত কাজকে আদায় করে তাহলে তার জিম্মা থেকে এর কাযা রহিত হবে কি না?

এ ব্যাপারে কিছু সংখ্যক দার্শণিক তথা মুতাকাল্লিমিন ও মু'তাযিলাদের অভিমত এই যে, শুধু মামূরবিহী আদায় করার দ্বারা বৈধতার বিধান লাগানো যাবে না। বরং অতোক্ষণ পর্যন্ত বিরত থাকতে হবে যতোক্ষণ না জানা যাবে যে, মামূরবিহীর মধ্যে সকল শর্ত ও রোকন বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং যখন মামূরবিহীর মধ্যে সকল রোকন ও শর্ত বিদ্যমান থাকা জানা যাবে তখন মামূরবিহীর জন্য বৈধতার বিধান সাব্যস্ত হবে। অর্থাৎ তখন মুকাল্লাফ ব্যক্তি থেকে উক্ত মামূরবিহী কাজা রহিত হয়ে যাবে।

দলিল : যদি কোনো ব্যক্তি আরাফায় অবস্থানের পূর্বে স্ত্রী সহবাস করে নিজ হজ্জ বিনষ্ট করে তাহলে সে এ বিষয়ে নির্দেশ প্রাপ্ত যে, এ সময়ও সে হজ্জের কার্যাদি আদায় করবে। অথচ তার এ হজ্জের সকল কাজ আদায় করা সত্ত্বে তার হজ্জ শুদ্ধ হবে না। অর্থাৎ তার জিম্মা থেকে কাযা রহিত হয় না। বরং আগামী বছর হজ্জ কাযা করা ওয়াজিব হয়। এ মাসআলা দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, শুধু মামূরবিহী আদায় করার দ্বারা তা শুদ্ধ হওয়া সাব্যস্ত হয় না। বরং তার জন্যে সকল শর্ত ও রোকন বিদ্যমান থাকার উপর ভিন্ন দলিল পাওয়া যাওয়া আবশ্যক।

وَالصَّحِيْحُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ اَنَّهُ تَثْبُتُ بِهِ صِفَةُ الْجَوَازِ لِلْمَامُوْرِ بِهِ وَانْتِفَاءُ الْكَرَاهَةِ اى الْمَذْهَبُ الصَّحِيْحُ عِنْدَنَا اَنَّهُ تَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ اِيْجَادِ الْفِعْلِ صِفَةُ الْجَوَازِ لِلْمَامُوْرِ بِهِ وهُو حُصُوْلُ الْاِمْتِثَالِ عَلى مَا كُلِّفَ بِهِ وَاِلَّا يَلْزَمُ تَكْلِيْفُ مَا لا يُطَاقُ ثُمَّ اذا ظَهَرَ الْفَسَادُ بِدَلِيْلٍ مُسْتَقِلٍّ بَعْدَه يُعِيْدُهُ و امّا الْحَجُّ فَقَدْ اَدَّاهُ بِهٰذَا الْاِحْرَامِ وفَرَغَ عَنْهُ و الْاَمْرُ بِحَجٍّ صَحِيْحٍ فِى الْعَامِ الْقَابِلِ بِاَمْرٍ مُبْتَدأٍ وعِنْدَ اَبِىْ بَكْرِنِ الرَّازِى لا يَثْبُتُ بِمُطْلَقِ الْاَمْرِ اِنْتِفَاءُ الْكَرَاهَةِ لِاَنَّ عَصْرَ يَوْمِه مَامُوْرٌ بِالْاَداءِ مَعَ اَنَّهُ مَكْرُوْهٌ شَرْعًا وَالطَّوَافُ مُحْدِثًا مامورٌ بِه مَعَ اَنَّهَ مَكروهٌ شرعًا - قُلْنَا ذٰلك الْكَرَاهَةُ لَيْسَ فِى نَفْسِ الْمَامُوْرِ بِه بَلْ لِمَعْنًى خارِجٍ وهُو التَّشْبِيْهُ بِعَبَدَةِ الشَّمْسِ وكَوْنُ الطَّائِفِ مُحْدِثًا ومِثْلُ هٰذا غَيْرُ مُضِرٍّ -

---

অনুবাদ॥ ***আর ফিকহবিদগণের বিশুদ্ধ মত এই যে, এর দ্বারা আদিষ্ট বস্তুর জন্যে বৈধতার বিশেষণ সাব্যস্ত হবে এবং মাকরূহ হওয়ার সম্ভাবনা রহিত হয়ে যাবে।*** অর্থাৎ, আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য মত এই যে, কেবল কাজটি করার মাধ্যমে আদিষ্ট বস্তুর জন্যে বৈধতার গুণ সাব্যস্ত হবে।

আর তা হলো- বান্দার উপরে যা ওয়াজিব হয়েছে, তা যথাযথভাবে পালন করা। অন্যথায় বান্দার সাধ্যের বাইরের কাজ চাপিয়ে দেয়া অত্যাবশ্যক হবে। অতঃপর যদি কার্য সম্পাদনের পর স্বতন্ত্র প্রমাণের মাধ্যমে তা ফাসাদ তথা বিনষ্ট হওয়া প্রকাশিত হয়; তবে তা পুনরায় আদায় করতে হবে। আর সে হজ্জ এ ইহরামের মাধ্যমেই আদায় করেছে এবং এ থেকে সে অব্যাহতি লাভ করেছে। পরবর্তী বছর বিশুদ্ধ হজ্জের আদেশ অন্য একটি নতুন امر বা নির্দেশ দ্বারা হবে।

ইমাম আবু বকর রাযী (র)-এর মতে, امر مطلق দ্বারা মাকরূহ না হওয়া সাব্যস্ত হবে না। কেননা, অদ্যকার আছর নামায আদায়ের ব্যাপারে আদিষ্ট। অথচ শরীআতে তা আদায় করা মাকরূহ। আর উযু বিহীন অবস্থায়ও কাবা শরীফ তাওয়াফ করা হলো আদিষ্ট। যদিও শরীঅতের দৃষ্টিতে তা আদায় করা মাকরূহ।

আমরা এর উত্তরে বলি যে, এ মাকরূহ হওয়া মূল মামূর বিহীর মধ্যে নয়। বরং স্বতন্ত্র বা তৎবহির্গত কারণের প্রেক্ষিতে। আর তা হলো সূর্যপূজারীদের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি হওয়া। আর তওয়াফকারী উযুবিহীন হওয়া এবং অনুরূপ অন্যান্য কাজ কোন ক্ষতিকর নয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ قوله والصَّحِيْحُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ الخ : উল্লেখিত মাসআলায় হানাফীদের অভিমত এই যে, মামূরবিহী আদায় করার দ্বারা মামূরবিহী শুদ্ধ হওয়া সাব্যস্ত হবে। এবং তা মাকরূহ হওয়া দূরীভূত হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে শুদ্ধ হওয়া দ্বারা কাযা রহিত হওয়া উদ্দেশ্য নয়। বরং নির্দেশ পালন করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ মামূরবিহী কাজটি বিদ্যমান থাকা এবং আদায় করার পরে এমন বলে দেয়া যে, মুকাল্লাফ ব্যক্তির পক্ষ থেকে নির্দেশ পালন হয়ে গেছে এবং মাকরূহ হওয়াও দূরীভূত হয়েছে। কারণ মামূরবিহী আদায় করার পরেও যদি নির্দেশ পালন সাব্যস্ত না হয় তাহলে এর দ্বারা تكليف ما لا يُطاق তথা সাধ্যের বাইরে কাজ চাপানো বিবেচিত হয়। এরপর নির্দেশিত কাজ

আদায় করার পরে যখন ভিন্ন দলিল দ্বারা তা ফাসিদ হওয়া সুস্পষ্ট হবে তখন মুকাল্লাফ ব্যক্তিকে তা দোহরানোর নির্দেশ দেয়া হবে।

নূরুল আনওয়ারের জনৈক টীকা লেখক বলেন– শুদ্ধ হওয়ার অর্থ যদি নির্দেশ পালন করা হয়ে থাকে তাহলে এ ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই। বরং সবার মতে মামূরবিহী আদায় করার পরে আদেশ পালন হয়ে যায়। দ্বিমত কেবল ঐ শুদ্ধতা বা বৈধতার ক্ষেত্রে যার অর্থ হলো কাযা রহিত হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ মামূরবিহী আদায় করার পরে তা জায়িয হবে না। এবং তার কাযাও রহিত হবে না। এটা কিছু সংখ্যক মুতাকাল্লিমীনের অভিমত। বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী কাযা রহিত হয়ে যাবে।

তবে এ দলিলের উত্তর যে, মুহরিম ব্যক্তি আরাফায় অবস্থানের পূর্বে স্ত্রী সহবাসের মাধ্যমে নিজ হজ্জ বিনষ্ট করে এবং শরিআত তাকে উক্ত এহরামেই হজ্জের অবশিষ্ট রোকন পালন করার নির্দেশ দেয়। অথচ হজ্জের রোকনসমূহ আদায় করার পরেও মামূরবিহী তথা পালনকৃত হজ্জ জায়িয হয় না। বরং তা কাযা করা জরুরি হয়। সুতরাং বোঝা গেলো যে, মামুরবিহী আদায় করা সত্ত্বে তার জন্য তা জায়িয হওয়া সাব্যস্ত হয় না।

উত্তর : এর উত্তর এই যে, লোকটি যখন পূর্বের এহরামেই হজ্জ আদায় করলো তখন লোকটি দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে গেলো। এখন আগামী বছর বিশুদ্ধ হজ্জ করার নির্দেশ একটি ভিন্ন আদেশের মাধ্যমে করা হয়েছে। কেমন যেন এই বিশুদ্ধ হজ্জ গত বছরের হজ্জের কাযা নয় বরং ভিন্ন আদেশ দ্বারা তা ফরয হয়েছে।

হযরত আবু বকর রাজী (র) বলেন– امر مطلق দ্বারা كراهت তথা মাকরূহ হওয়া দূরীভূত হয় না। অর্থাৎ শরীআত যদি স্বাভাবিকভাবে কোনো কাজের আদেশ করে তাহলে এর দ্বারা এটা অপরিহার্য হয় না যে, মামূরবিহী আদায় করার পরে মামূরবিহী থেকে তার কারাহাত দূরিভূত হয়েছে। বরং আমরা দেখি যে, কারাহাত বহাল থাকে।

উদাহরণ : যেমন সূর্যাস্তের সময় কাউকে সেদিনের আছর নামায আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু সূর্যাস্তের সময় আদায় করলে শরীআতের দৃষ্টিতে তা মাকরূহ হয়। সুতরাং বোঝা গেলো যে, امر مطلق দ্বারা মাকরূহ না হওয়া সাব্যস্ত হয় না।

এভাবে উযুবিহীন অবস্থায় তওয়াফ করার নির্দেশ আছে। অথচ শরীআতে তা মাকরূহ। হানাফীদের উত্তর এই যে, উল্লেখিত উভয় উদাহরণে মূল নির্দেশিত বিষয়ে কোনো কারাহাত নেই। বরং বর্হিগত কারণে তার মধ্যে কারাহাত সূচিত হয়েছে। কারণটি হলো সূর্যাস্তের সময় আছরের নামায আদায়করা সূর্য পূজকদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে যায়। কারণ সূর্য পূজকেরা এ সময়ে সূর্যপূজা করে থাকে। এই কারণে আছরের নামাযকে মাকরূহ বলা হয়। অন্যথায় মূল নামাযের মধ্যে কোনো কারাহাত নেই।

দ্বিতীয় উদাহরণে তওয়াফকারীর উযুবিহীন হওয়ার কারণে তার মধ্যে কারাহাত সৃষ্টি হয়েছে। কারণ বিনা উযুতে যিকির করা, মসজিদে প্রবেশ করা, আল্লাহর ঘর তওয়াফ করা ইত্যাদি অপছন্দনীয় কাজ। এসবের দরুন কারাহাত সৃষ্টি হয়েছে। নতুবা মূল কাজের মধ্যে কোনো কারাহাত নেই।

মূলকাজের মধ্যে কারাহাত নেই কেন? এর কারণ আদেশ দ্বারা যেভাবে কোনো কাজ তলব করা হয় তদ্রূপ অনুমতি দ্বারাও তলব করা যায়। তবে এ ব্যাপারে আদেশ দ্বারা তলব করাই বেশি অর্থজ্ঞাপক। আর অনুমতি তথা কোনো কাজ অনুমোদন দ্বারা তা মাকরূহ হওয়া দূরীভূত হয়ে যায়। সুতরাং আমর যা কাজ তলবের ব্যাপারে অধিক অর্থবহ। এর দ্বারা যদি কোনো কাজ তলব করা হয় তাহলেও আরো উত্তমরূপে তা মাকরূহ হওয়া দূরীভূত হয়ে যাবে।

وَاذا عَدِمَتْ صِفَةُ الْوُجُوْبِ لِلْمَامُوْرِ بِه لا تَبْقَى صِفَةُ الْجَوَازِ عِنْدَنا خِلافًا لِلشَّافِعِيِّ رح هٰذا بَحْثٌ اٰخَرُ متعلّقٌ بِما مَرَّ مِنْ اَنَّ مُوْجَبَ الْاَمْرِ هُوَ الوجوبُ يعني اَنّه اِذا نُسِخَ الْوُجوبُ الثّابِتُ بِالْاَمْرِ فهَل تَبْقٰى صِفَةُ الْجَوازِ الّذِيْ فِي ضِمْنِه اَمْ لا فَقَال الشّافِعِيُّ رح تَبْقٰى صِفَةُ الْجَوازِ اِسْتِدلالاً بِصَوْمِ عَاشُوْراءَ فَاِنّه قدكانَ فَرْضًا ثُمَّ نُسِخَتْ فَرْضِيَّتُهُ وبَقِيَ اِسْتِحبابُه اَلْاٰنَ - وعِنْدَنا لا تَبْقٰى صفةُ الْجَوازِ الثّابِتِ فِيْ ضِمْنِ الوُجُوْبِ كما اَنَّ قَطْعَ الْاَعْضاءِ الْخَاطِيَةِ كانَ واجبًا علٰى بَنِيْ اسرائيلَ وقد نُسِخَ مِنّا فَرْضِيَّتُهُ وجَوازُه وهٰكذا الْقِياسُ و اَمّا صومُ عَاشوراءَ فَاِنّما يَثْبُتُ جَوازُه اَلْاٰنَ بِنَصٍّ اٰخَرَ لا بِذٰلِكَ النَّصِّ الْمُوْجِبِ لِلْاَدَاءِ وقِيلَ وفائِدةُ الْخِلافِ بَيْنَنَا وبَيْنَه تَظْهَرُ فِي قَوْلِه عليه السّلام مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَاٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنها فَلْيُكَفِّرْ يَمِيْنَهُ ثُمَّ لِيَأْتِ بِالّذِيْ هُوَ خَيْرٌ فَاِنّه يَدُلُّ علٰى وُجُوْبِ تَقْدِيْمِ الْكَفّارَةِ عَلَى الْحِنْثِ وقَدْ نُسِخَ وجوبُ تَقْدِيْمِها بالْاِجْماعِ ولٰكِنْ يَبْقٰى جَوازُهُ عِنْدَه ولَمْ يَبْقَ عِنْدَنا اَصْلاً -

অনুবাদ ॥ ***আর যদি মামূর বিহীর জন্য ওয়াজিব হওয়ার সিফাত না থাকে তবে আমাদের মতে তার বৈধতার সিফাত বহাল থাকবে না।*** ইমাম শাফেয়ী (র)-এর বিপরীত মতামত ব্যক্ত করেছেন। এটা অন্য একটি আলোচনা যা পূর্বের এ বক্তব্যের সাথে সংশ্লিষ্ট যে, আমরের موجب (চাহিদা) হলো وجوب অর্থাৎ যখন আমরের দ্বারা সাব্যস্তকৃত وجوب রহিত হবে, তখন তার جواز বা বৈধতার সিফাত অবশিষ্ট থাকবে কিনা যা আমরের মধ্যে নিহিত? ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, বৈধতার গুণ (صنت اباحت) অবশিষ্ট থাকবে। প্রমাণ হিসেবে তিনি আশুরার রোযাকে পেশ করেন। কেননা এ রোযা প্রথমতঃ ফরয ছিল। অতঃপর এর ফরযিয়্যাতকে রহিত করা হয়েছে কিন্তু এখনো মুস্তাহাব রূপে বহাল রয়েছে। আর আমাদের আহনাফের মতে বৈধতার গুণ অবশিষ্ট থাকবে না, যা وجوب এর অধীনে সাব্যস্ত আছে। যেমন বনী ইসরাইলের উপর পাপী অঙ্গকে কেটে ফেলা ওয়াজিব ছিল। অতঃপর এর ফরযিয়্যাতকে আমাদের থেকে রহিত করা হয়েছে এবং তা জায়েয হওয়াকে রহিত করা হয়েছে। অন্যান্য আহকামের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। আর বর্তমানে আশুরার রোযার বৈধতা অন্য প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে; ঐ প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি যার দ্বারা আদা ওয়াজিব হয়েছিলো। কেউ কেউ বলেন, আমাদের মাঝে এবং ইমাম শাফেয়ী (র) এর মাঝে এ মতানৈক্যের ফলাফল প্রকাশ পাবে রাসূল (স)-এর এ বাণীতে 'যে ব্যক্তি কোন বস্তুর উপরে শপথ করবে, অতঃপর সে অন্যটি তা থেকে উত্তম' পাবে তার উচিত হবে ঐ শপথের কাফফারা প্রদান করা, অতঃপর উক্ত উত্তম কাজটি করা'। কেননা, এ হাদীস শপথ ভঙ্গের পূর্বে কাফফারা আদায় ওয়াজিব হওয়া বুঝায়। অথচ শপথ ভঙ্গের পূর্বে কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব হওয়া ইজমা দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, তার বৈধতা বহাল রয়েছে। আর আমাদের মতে তা আদৌ অবশিষ্ট নেই।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله واذا عدمت صفة الوجوب الخ : **আমর দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হওয়া :** এর সার এই যে, আমর দ্বারা যে ওয়াজিব সাব্যস্ত হয় তা যদি মানসূখ হয়ে যায় তাহলে ওয়াজিবের অধীনে যে বৈধতা সাব্যস্ত হয়েছিলো তা বহাল থাকবে কি না? এ ব্যাপারে আলিমগণের দ্বিমত রয়েছে।

হানাফীগণের অভিমত এই যে, ওয়াজিবের সাথে সাথে বৈধতাও মানসূখ হয়ে যায়। আর ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে বৈধতা বহাল থাকে। বৈধতা তথা جواز শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। ১. যে বস্তু বিবেকের কাছে নিষিদ্ধ নয়

তাকে জায়েয বলা হয়। ২. যেখানে শরীআতে কোনো কাজ করা না করা সমপর্যায়ের হয় তাকে মুবাহ্ বলা হয়। ৩. যে বিষয়ে শরীআতের দলিল পরস্পর সাংঘর্ষিক যেমন গাধার উচ্ছিষ্টের ব্যাপারে সেখানেও বৈধতা বা জায়েয প্রযোজ্য হতে পারে। ৪. শরীআতের দৃষ্টিতে যা নিষিদ্ধ নয় অর্থাৎ যে ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স) এরশাদ করেছেন যে, এতে কোনো দোষ নেই সেটাও জায়েয। এ অর্থের দিক দিয়ে ওয়াজিবের অধীনে জায়েয হওয়া পাওয়া যায়।

মোটকথা যে বস্তু পরিহার করার ভেতরে ক্ষতি থাকে তা ওয়াজিব। আর যা করার মধ্যে অসুবিধা থাকে তা নাজায়িয। আর যা করায় কোনো ক্ষতি থাকে না তা জায়িয।

জায়িয হওয়ার এ অর্থের ব্যাপারে শাফেয়ীগণ বলেন ওয়াজিব রহিত হওয়ার পরে তার মধ্যে جواز (জায়িয হওয়া) বহাল থাকে। আর হানাফীগণ বলেন– ওয়াজিব মানসূখ হওয়ার পরে جواز বহাল থাকে না বরং তা রহিত হয়ে যায়।

শাফেয়ীগণের দলিল : আশুরার রোযা প্রথম যুগে এ উম্মতের উপর ফরয ছিলো। কিন্তু রমযানের রোযা ফরয হওয়ার দ্বারা আশুরার রোযা ফরয হওয়া মানসূখ হয়ে গেছে। তবে অধ্যাবধি তা জায়েযই নয় বরং মুস্তাহাবরূপে বহাল রয়েছে। এর দ্বারা বোঝা গেল যে, ফরযিয়্যত বা উযূর মানসূখ হওয়ার পরে তা জায়িযরূপে বহাল থাকে।

হানাফীগণের দলিল : বণী ইসরাঈলের যুগে পাপী ব্যক্তির অঙ্গ কেটে ফেলা ওয়াজিব ছিলো। কিন্তু উম্মতে মুহাম্মদীয়ার উপর তার فرضيت মানসূখ হওয়ার সাথে সাথে جواز ও মানসূখ হয়ে গেছে। অর্থাৎ বর্তমান এমন করা ফরযও নয় বরং নাজায়িয। এভাবে নাপাক কাপড় কেটে ফেলা ফরয ছিলো কিন্তু আমাদের উপর তা ফরয হওয়া এবং জায়িয হওয়া উভয়ই মানসূখ হয়ে গেছে।

ইমাম শাফেয়ী (র) এর দলিলের উত্তর : যে সময় আশুরার রোযার فرضيت মানসূখ হয়েছিলো তখন তার جواز ও মানসূখ হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু পরে তা জায়িয হওয়া ভিন্ন দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। ভিন্ন দলিল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কিয়াস। অর্থাৎ যেভাবে রমযান এবং নিষিদ্ধ দিনসমূহে নফল রোযা জায়েয তদ্রূপ আশুরার দিন নফল রোযা রাখাও জায়েয। অথবা ভিন্ন দলিল দ্বারা উদ্দেশ্য উক্ত হাদীস যার মাধ্যমে আশুরার দিন রোযা রাখা সাব্যস্ত হয়। যেমন তিরমিযী শরীফের প্রথম খণ্ডে ১৫৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ رض اَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ صِيَامُ يَومِ عَاشُوْرَاءَ اِنِّىْ اَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهُ

রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন– আমি আশা রাখি আশুরার রোযা রোযাদারের ১ বছরের পূর্বের গোণাসমূহের জন্য কাফফারা হয়ে যাবে। এই হাদীস দ্বারা বোঝা গেলো যে, উক্ত রোযা শুধু জায়েযই নয় বরং উত্তম।

নুরুল আনওয়ার গ্রন্থকার বলেন– হানাফী ও শাফেয়ীগণের মধ্যকার মত পার্থক্যের ফল এই হাদীসের দ্বারা সুস্পষ্ট হয় যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন– কেউ কোনো জিনিসের ব্যাপারে কছম খাওয়ার পর সে যদি তার বিপরীত কোনো কাজ কল্যাণকর মনে করে। তাহলে তার জন্য কছমের কাফফারা দিয়ে উক্ত কাজ করাই উত্তম। এই হাদীস এ বিষয়ের প্রমাণ বহন করে যে, কারো যদি কছম ভাঙ্গা উদ্দেশ্য হয় তাহলে সে আগেই কাফফারা দিবে। তারপর কছম ভঙ্গ করবে। অর্থাৎ আগে কাফফারা দেয়া ওয়াজিব। কেননা فليكفر শব্দটি আমরের সীগা যা ওয়াজিব বোঝায়। আর ثم ليات শব্দটি কছমের বিপরীত কাজ করা অর্থাৎ কছম ভঙ্গ করা পরে হওয়া বোঝায়।

অতএব প্রমাণিত হলো যে, কছম ভাঙ্গার পূর্বে কাফফারা দেয়া ওয়াজিব। কিন্তু কাফফারা আগে দেয়ার বিষয়টি ইজমা দ্বারা মানসূখ হয়ে গিয়েছে। অবশ্য শাফেয়ীগণের মতে যদিও আগে কাফফারা দেয়া ওয়াজিব হওয়া মানসূখ হয়ে গেছে কিন্তু তা জায়িয হিসেবে বহাল রয়েছে। আর হানাফীগণের মতে ওয়াজিব হওয়া মানসূখ হওয়ার সাথে সাথে জায়িয হওয়াও মানসূখ হয়ে গেছে। সুতরাং কেউ যদি কছম ভাঙ্গার পূর্বে কাফফারা আদায় করে। এরপরে কছম ভঙ্গ করে তাহলে শাফেয়ীগণের মতে তার কাফফারা আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু হানাফীগণের মতে কাফফারা আদায় হবে না; বরং দ্বিতীয়বার কাফফারা দেয়া ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে প্রথম কাফফারাটি নফল সাদকা বিবেচিত হবে। যাদেরকে পূর্বে কাফফারা দিয়েছিলো তাদের থেকে কাফফারা ফেরত নেয়া মুনাসিব নয়।

উল্লেখ্য যে, হানাফী ও শাফেয়ীগণের মধ্যকার পার্থক্যটি মাল দ্বারা কাফফারা আদায়ের ক্ষেত্রে। কারণ রোযার মাধ্যমে কাফফারার ক্ষেত্রে কছম ভঙ্গের পূর্বে সকলের মতে তা যথেষ্ট নয়।

ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ رح عَنْ مَبَاحِثِ حُسْنِ الْمَامُوْرِ بِهِ وَمُلْحِقَاتِهِ شَرَعَ فِيْ بَيَانِ تَقْسِيْمِهِ اِلَى الْمُطْلَقِ وَالْمُؤَقَّتِ فَقَالَ وَالْاَمْرُ نَوْعَانِ مُطْلَقٌ مِنَ الْوَقْتِ اَيْ اَحَدُهُمَا اَمْرٌ مُطْلَقٌ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِوَقْتٍ يَفُوْتُ بِفَوْتِهِ كَالزَّكٰوةِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ فَاِنَّهُمَا بَعْدَ وُجُوْدِ السَّبَبِ اَيْ مِلْكِ الْمَالِ وَالرَّاْسِ وَالشَّرْطِ اَيْ حَوْلَانُ الْحَوْلِ وَيَوْمُ الْفِطْرِ لَا يَتَقَيَّدَانِ بِوَقْتٍ يَفُوْتَانِ بِفَوْتِهِ بَلْ كُلَّمَا اَدّٰى يَكُوْنُ اَدَاءً لَا قَضَاءً وَاِنْ كَانَ الْمُسْتَحَبُّ التَّعْجِيْلَ -وَهُوَ عَلَى التَّرَاخِيْ خِلَافًا لِلْكَرْخِيْ رح اَيْ هٰذَا الْاَمْرُ الْمُطْلَقُ مَحْمُوْلٌ عِنْدَنَا عَلَى التَّرَاخِيْ يَعْنِيْ لَا يَجِبُ الْفَوْرُ فِيْ اَدَائِهِ بَلْ يَسَعُ تَاخِيْرَهِ

مُوَقَّت ও مُطْلَق প্রসঙ্গ

অনুবাদ ॥ মুসান্নিফ (র) حسن مامور به এবং তার সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোচনা থেকে অবসর গ্রহণ করে এখন তিনি এর প্রকারভেদ তথা مطلق এবং موقت এর আলোচনা আরম্ভ করেছেন। তিনি বলেন, امر দু প্রকার। ১. مُطْلَقٌ عَنِ الْوَقْتِ *তথা সময় থেকে নিঃশর্ত।* অর্থাৎ, দু প্রকারের প্রথমটি হলো امر مطلق যা কোন সময়ের সাথে শর্তযুক্ত নয় যে, সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে তা ফউত হয়ে যায়। *যেমন- যাকাত ও সাদকায়ে ফিতর।* কেননা উভয়টি سبب তথা নিসাব পরিমাণ মালের মালিক ও راس (ব্যক্তি) পাওয়া যাওয়ার পর এবং শর্ত অর্থাৎ, বর্ষপূর্তি ও ঈদুল ফিতরের দিন পাওয়া যাওয়ার পর এমন নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সীমাবদ্ধ নয়, যা অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে এদুটি হাতছাড়া হয়ে যায়। বরং যখনই مكلف ব্যক্তি তা আদায় করবে, তখন তা আদা হবে কাযা হবে না; যদিও দ্রুত আদায় করা মুস্তাহাব। امر مطلق বিলম্বের অবকাশ রাখে; কিন্তু ইমাম কারখী (র) ভিন্নমত ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ, আমাদের মতে امر مطلق বিলম্বের ওপর প্রযোজ্য। অর্থাৎ তা তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা অত্যাবশ্যক নয়, বিলম্ব করার সুযোগ আছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ عَنْ الخ : মুসান্নিফ (র) حسن مامور به এবং তার সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির আলোচনা শেষ করার পরে মামূরবিহীর প্রকারভেদ উল্লেখ করছেন। মতনে امر দ্বারা উদ্দেশ্য মামূরবিহী। কারণ এখানে মামূরবিহীর প্রকারভেদ উল্লেখ করা হয়েছে। আমরের প্রকারভেদ উল্লেখ করা হয়নি। তিনি বলেন- মামূরবিহী ২ প্রকার। ১. مطلق عن الوقت (সময় সংশ্লিষ্ট নয়)। ২. مقيد بالوقت (সময় সংশ্লিষ্ট)।

مطلق عن الوقت দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, মামূরবিহী এমন কোনো সময় সংশ্লিষ্ট নয় যা পেরিয়ে গেলে মামূরবিহী ছুটে যায়। যেমন যাকাত এবং সাদকায়ে ফিতির। কেননা যাকাত ওয়াজিব হওয়ার সবাব (নিসাবের মালিক) এবং শর্ত (বছর অতিক্রান্ত হওয়া) এর পরে এবং সাদকায়ে ফিতির ওয়াজিব হওয়ার সবাব (راس) এবং শর্ত يوم الفطر এরপরে উভয়টি এমন কোনো সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় যা পেরিয়ে গেলে উভয়টি ফউত হয়ে যাওয়া জরুরি হয়। বরং ওয়াজিব হয়ে যাওয়ার পরে যে কোনো সময় যাকাত এবং সাদকায়ে ফিতির আদায় করবে তা আদায় গণ্য হবে। কাযা গণ্য হবে না। যদিও দ্রুত আদায় করা মুস্তাহাব।

قوله وَهُوَ عَلَى التَّرَاخِيْ الخ : এই ইবারতে মুসান্নিফ (র) এ মতবিরোধ উল্লেখ করেছেন যে, امر مطلق তথা যে আমর সময় সংশ্লিষ্ট নয় তা তাৎক্ষণিক আদায় করা ওয়াজিব নাকি বিলম্বের অবকাশসহ আমল করা ওয়াজিব?

এ ব্যাপারে তিনি বলেন- হানাফীগণের মতে যা সময় সংশ্লিষ্ট নয় তা তাৎক্ষণিক আদায় করা ওয়াজিব নয়। বরং তাতে বিলম্বের অবকাশ আছে।

وَعِنْدَ الْكَرْخِيِّ لا بُدَّ فِيْهِ مِنَ الْفَوْرِ اِحْتِيَاطًا لاَمْرِ الْعِبَادَةِ بِمَعْنَى اَنَّهُ يَأْثَمُ بِالتَّاخِيْرِ لاَ بِمَعْنَى اَنَّهُ يَصِيْرُ قَاضِيًا - وَعِنْدَنا لاَ يَأْثَمُ اِلاَّ فِي اٰخِرِ الْعُمْرِ او حِيْنَ اِدراكِ عَلامَاتِ الْمَوْتِ ولَمْ يُؤَدِّ فِيْه و دَلِيْلُنا هُوَ مَا اشارَ اِلَيْهِ بِقَوْلِه لِئَلاَّ يَعُوْدَ عَلٰى مَوْضُوْعِه بِالنَّقْضِ يَعْنِي مَوضوعُ الْاَمْرِ الْمُطلقِ كانَ هُوَ التَّيْسِيْرُ والتَّسْهِيْلَ فَلَوْ كَانَ مَحْمُوْلاً عَلٰى الْفَوْرِ لَعَادَ عَلٰى مَوْضُوْعِه بِالنَّقْضِ وَيَكُوْنُ مُنَاقِضًا لِّلْمَوْضُوْعِ -

অনুবাদ॥ আর ইমাম কারখী (র)-এর মতে, ইবাদত সংক্রান্ত কাজে সতর্কতার স্বার্থে তার মধ্যে দ্রুত করা অত্যাবশ্যক, এ অর্থে যে, বিলম্ব করার মাধ্যমে সে নিশ্চয়ই গুনাহগার হবে; এ অর্থে নয় যে, বিলম্বের কারণে সে কাযা আদায়কারী হবে।

আমাদের জুমহুরের মতে, বিলম্বের কারণে সে গুনাহগার হবে না। কিন্তু (যদি এমন হয় যে,) শেষ জীবনে অথবা মৃত্যুর লক্ষণ পাওয়া পর্যন্ত সে আদায় করেনি তবে গুনাহগার হবে। এ ব্যাপারে আমাদের দলিল এ কথা যার প্রতি মুসান্নিফ (র) তার এ বক্তব্যে ইঙ্গিত করেছেন *যাতে* امر مطلق *উহার প্রণীত অর্থের প্রতি ত্রুটিসহ প্রত্যাবর্তন না করে।* অর্থাৎ, امر مطلق এর উদ্দেশ্য হলো সহজ-সরল করণ। সুতরাং তা যদি তাৎক্ষণিক আদায় করার প্রয়োজন হয়, তবে তা ত্রুটিসহ তার মূল বিষয়ের প্রতি প্রত্যাবর্তিত হবে এবং মূল বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ ইমাম কারখী (র) ও শাফেয়ীগণের মতে মুতলাক মামূরবিহীকে তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে বিলম্ব করলে সে গুণাহগার হবে। তবে লক্ষণীয় যে, গুণাহগার হওয়া সত্ত্বে সে কাযাকারী বিবেচিত হবে না। আর আমাদের মতে সে গুণাহগার হবে না। তবে যদি এতো বিলম্ব হয়ে যায় যে, লোকটি জীবনের শেষ মুহূর্তে পৌছে যায় এবং মৃত্যুর লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে যায়। আর এর মধ্যে সে তা আদায় করতে না পারে তাহলে অবশ্যই সে গুণাহগার হবে।

ইমাম শাফেয়ী ও কারখী (র) এর দলিল :

১. ইবাদতের ব্যাপারে সাবধানতার দাবী এই যে, খামাখা বিলম্ব না করে দ্রুত আদায় করা হোক।

২. দ্বিতীয় দলিল এই যে, মণিব যদি তার গোলামকে বলে 'আমাকে পানি পান করাও' এখন সে যদি বিলম্ব করে তাহলে বিবেকবানদের দৃষ্টিতে গোলাম অন্যায়কারী বিবেচিত হবে। সুতরাং বোঝা যায় যে, আমরে মুতলাক তাৎক্ষণিকভাবে মামূরবিহী আদায় করাকে ওয়াজিব করে।

হানাফীদের পক্ষ থেকে উত্তর : আমাদের কথা উক্ত আমরের ব্যাপারে যা قرينه তথা আলামত মুক্ত হয়। অর্থাৎ তাৎক্ষণিক নাকি বিলম্বের অবকাশ আছে তা বোঝা না যায়। অথচ উল্লেখিত উদাহরণে স্বভাবত তাৎক্ষণিক ওয়াজিব হওয়ার আলামত রয়েছে। কারণ কেউ তৃষ্ণার্ত হলে তৃষ্ণা নিবারণার্থেই সে পানি কামনা করে। অতএব এটা তাৎক্ষণিক পানি পান করানো বোঝায়। এর মধ্যে বিলম্বের অবকাশ থাকে না।

৩. **তৃতীয় দলিল :** বিলম্ব করা প্রকৃতপক্ষে ফউত করার নামান্তর। কারণ কেউ বলতে পারে না যে, পরে সে তা আদায় করতে সক্ষম হবে কি না? আর تفويت তথা স্বেচ্ছায় ফউত করা হলো হারাম। কাজেই বিলম্ব করা হারাম হবে। আর বিলম্ব করা যেহেতু হারাম কাজেই তাৎক্ষণিক আদায় করা ওয়াজিব হবে।

উত্তর : বিলম্ব করাকে تفويت তথা স্বেচ্ছায় ফউতকরণ আমরা মানি না। কারণ মুতলাক মামূরবিহীকে মুকাল্লাফ ব্যক্তি ওয়াক্তের এমন অংশে আদায় করার ক্ষমতা রাখে যে অংশ সে পাবে। বাকী আকস্মিক মৃত্যু আসা দুর্লভ ব্যাপার। কাজেই এর উপরে বিধান আরোপিত হতে পারে না। (অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

وَمُقَيَّدًا بِهِ اى الثَّانى اَمْرٌ مُقَيَّدٌ بِالْوَقْتِ وَهُوَ اَرْبَعَةُ اَنْوَاعٍ لِاَنَّهُ اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ الْوَقْتُ ظَرْفًا لِلْمُؤَدّٰى وَشَرْطًا لِلْاَدَاءِ وَسَبَبًا لِلْوُجُوْبِ فَهُوَ النَّوْعُ الاَوَّلُ وَالْمُرَادُ بِالظَّرْفِ اَنْ لَا يَكُوْنَ مِعْيَارًا لَهُ بَلْ يَفْضُلُ عَنْهُ وَالْمُرَادُ بِالشَّرْطِ اَنْ لَا يَصِحَّ الْمَامُوْرُ بِهِ قَبْلَ وُجُوْدِهِ وَيَفُوْتَ بِفَوْتِهِ وَالْمُرَادُ بِالسَّبَبِ اَنَّ لِهٰذَا الْوَقْتِ تَاثِيْرًا فِىْ وُجُوْبِ الْمَامُوْرِ بِهِ وَاِنْ كَانَ الْمُؤَثِّرُ الْحَقِيْقِيُّ فِىْ كُلِّ شَيْءٍ هُوَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَلٰكِنْ يُضَافُ الْوُجُوْبُ فِى الظَّاهِرِ اِلَى الْوَقْتِ لِاَنَّ فِىْ كُلِّ لَمْحَةٍ وُصُوْلُ نِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ تَعَالٰى اِلٰى جَانِبِ الْعَبْدِ وَهُوَ يَقْتَضِى الشُّكْرَ فِىْ كُلِّ سَاعَةٍ وَاِنَّمَا خُصَّ هٰذِهِ الاَوْقَاتُ الْمُعَيَّنَةُ بِالْعِبَادَاتِ لِعَظْمَتِهَا وَتَجَدُّدِ النِّعَمِ فِيْهَا وَلِئَلَّا يُفْضِىَ اِلَى الْحَرَجِ فِىْ تَحْصِيْلِ الْمَعَاشِ اِنِ اسْتَغْرَقَ الْوَقْتَ الْعِبَادَةَ ـ

অনুবাদ ॥ ২. مقيد به অর্থাৎ, দ্বিতীয় প্রকার হলো এমন امر যা সময়ের قيد যুক্ত। ادا। চার প্রকার। কেননা, *ওয়াক্ত (সময়) হয়তো আদায়কৃত বিষয়ের জন্যে ظرف (আধার), আদায়ের জন্য শর্ত এবং ওয়াজিব হওয়ার জন্যে সবাব তথা কারণ হবে।* এটা হলো প্রথম প্রকার। ظرف বা আধার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তা আদায়কৃত বিষয়ের জন্যে معيار (মানদণ্ড) হবে না; বরং আদায়কৃত বিষয় থেকে অতিরিক্ত থেকে যায়। আর শর্ত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- ওয়াক্ত আসার পূর্বে আদিষ্ট বস্তু বিশুদ্ধ না হওয়া এবং ওয়াক্ত চলে যাওয়ার দ্বারা আদিষ্ট বস্তুও চলে যাওয়া।

আর সবাব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– আদিষ্ট বস্তু ওয়াজিব হওয়ার মধ্যে ওয়াক্তের প্রভাব থাকা। যদিও প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে প্রকৃত প্রতিক্রিয়াকারী হলেন মহান আল্লাহ তা'আলা। কিন্তু বাহ্যতঃ ওয়াক্তের দিকে ওয়াজিব সম্বন্ধযুক্ত হয়ে থাকে। কেননা, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি প্রতিটি মুহূর্তে নিয়ামত পৌছে থাকে। আর তা প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর শুকরিয়া কামনা করে। এ নির্দিষ্ট কতিপয় সময়কে ইবাদতের সাথে নির্ধারণ করা হয়েছে এগুলোর মহত্ত্বের কারণে। ঐসব সময়ে আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামতের বারংবার আগমন ঘটে থাকে। আর যাতে বান্দা সমস্ত সময় ইবাদতে কাটিয়ে দেয়ার দরুন জীবিকা উপার্জনে অসুবিধার সম্মুখীন না হয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله ومقيد به الخ : মুসান্নিফ (র) পূর্বে আমরের ২ প্রকার বর্ণনা করেছিলেন। ১. مطلق عن الوقت ২. مقيد بالوقت প্রথম প্রকারের বর্ণনার পরে এখন দ্বিতীয় প্রকারের বর্ণনা করছেন।

মুসান্নিফ (র) বলেন– দ্বিতীয় প্রকার আমর অর্থাৎ যে মামূরবিহী কোনো সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট যদি সময় পেরিয়ে যায় তাহলে আদায় করাও ফউত হয়ে যাবে। এটা ৪ প্রকার।

(পূর্বের বাকী অংশ) **হানাফীগণের দলিল :** মুসান্নিফ (র) হানাফীগণের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে দলিল পেশ করেছেন যে, আমরে মুতলাকের উদ্দেশ্য হলো বান্দাদের জন্য তা সহজ করে দেয়া। কাজেই ইমাম শাফেয়ী ও কারখী'র মত অনুযায়ী আমরে মুতলাককে যদি তাৎক্ষণিকের উপর প্রয়োগ করা হয় তাহলে তাতে উদ্দেশ্যের খেলাপ সাব্যস্ত হয়। অর্থাৎ বান্দাদের জন্য সহজ করার স্থলে কঠিন করা সাব্যস্ত হয়।

১. উক্ত সময় যে সময়ের সাথে মামূরবিহী সংশ্লিষ্ট তা উক্ত কাজের জন্য জরফ হবে এবং কাজ আদায়ের জন্য শর্ত হবে। আর মূল কাজ ওয়াজিব হওয়ার জন্য সবাব হবে।

ব্যাখ্যাকার যরফ, শর্ত ও সবাবের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন। আগে এ কথা বুঝে নেয়া উচিত যে, যার মধ্যে মামূরবিহী কাজটি পতিত হয় তার মধ্যেই কাজ আঞ্জাম দেয়াটা হলো معيار-এর কোনো অংশ যেন মামূরবিহী কাজ থেকে খালি না হয়। অর্থাৎ معيار বৃদ্ধির দ্বারা কাজেরও বৃদ্ধি ঘটবে। এবং معيار কম হওয়ার দ্বারা কাজও কম হয়ে যাবে। এখন লক্ষ করুন!

ظرف : যরফ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সময়টা আদায়কৃত কাজের জন্য معيار না হওয়া। বরং কাজ আদায়ের পরেও ওয়াক্ত বাকী থাকা। অর্থাৎ উক্ত সময়ে ওয়াজিব দায়িত্ব পালনের পরে অন্য কিছু আদায়ের অবকাশ থাকে।

شرط : শর্ত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সময়ের অস্তিত্বের পূর্বে মামূরবিহী বৈধ না হওয়া এবং সময় পেরিয়ে যাওয়ার দ্বারা মামূরবিহী কাজ ছুটে যাওয়া।

سبب : সবাব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মামূরবিহী কাজের ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে সময়টা প্রভাবশীল হওয়া।

এখানে লক্ষণীয় যে, সকল কাজের মধ্যে مؤثر حقيقى তথা প্রকৃত প্রভাব বিস্তারকারী হলেন আল্লাহ তা'আলা। কিন্তু বাহ্যিকভাবে সময়ের প্রতিও نفس وجوب সম্বন্ধিত হয়।

ইবাদত ওয়াজিব হওয়া সময়ের প্রতি এ কারণে সম্বন্ধিত হয় যে, সর্বমুহূর্তে বান্দার উপর রহমতের বারিপাত হচ্ছে। সুতরাং এটা এ বিষয়ের দাবি করে যে, ইবাদতের মাধ্যমে সর্বমুহূর্তে বান্দা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুক। তবে বিশেষ ৫ ওয়াক্তের সাথে ইবাদতকে তার মর্যাদার দরুন খাছ করা হয়েছে। কারণ বিশেষ এ ৫ সময়ে বান্দার উপর নিত্যনতুন নেয়ামত অবতীর্ণ হতে থাকে। যেমন–

★ ফজরে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া মৃত্যুর পরে জীবিত হওয়ার ন্যায়। আর জীবন লাভ করাটা এমন নেয়ামত যার দরুন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অপরিহার্য। এজন্যে এ নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ফজরের নামায ফরয করা হয়েছে।

★ ফযরের নামাযের পরে মানুষ জীবিকার অন্বেষণে নিয়োজিত হয়। অর্ধদিন পর্যন্ত এতে নিয়োজিত থাকার পরে যখন সে পানাহার সামগ্রী লাভ করে তখন তার উপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কল্পে যোহরের নামায ফরয করা হয়েছে।

★ যোহরের নামাযের পরে যেহেতু অধিকাংশ মানুষের অভ্যাস হলো কিছুক্ষণ ঘুমানো ও বিশ্রাম গ্রহণ করা। এ কারণে এ সময়ে আল্লাহর স্মরণ থেকে যে উদাসীনতা পাওয়া যায় তার ক্ষতিপূরণের জন্য আসরের নামায ফরয করা হয়েছে।

★ এরপর সূর্যাস্তের দ্বারা যখন দিনের নেয়ামতরাজি পরিপূর্ণ হয়ে গেলো। তখন এর কৃতজ্ঞতা আদায়ার্থে মাগরিবের নামায ফরয করা হয়েছে।

★ এরপর যখন মানুষ নিদ্রামগ্ন হওয়ার ইচ্ছা করে। তখন শুভ সমাপ্তির পর্যায়ে ইশার নামায ফরয করা হয়েছে। কারণ ইশার নামাযের পরে নিদ্রামগ্ন হওয়া ঈমান ও আনুগত্যের উপর মৃত্যুবরণ করা তুল্য।

ইবাদতের জন্য সময় নির্ধারিত হওয়ার দলিল : যদি সম্পূর্ণ ওয়াক্তকে ইবাদতের মধ্যে ব্যয় করে দেয়া হয় তাহলে জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রে প্রচুর বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। অথচ শরীআতে বিঘ্ন সৃষ্টি করাকে পছন্দ করে না। অতএব এ অসুবিধা দূরীকরণার্থে নির্দিষ্ট কিছু সময়ে ইবাদত ফরয করা হয়েছে। সম্পূর্ণ সময়ে ইবাদতে নিয়োজিত করা ফরয করা হয়নি।

كَوَقْتِ الصَّلٰوةِ فَاِنَّ الْوَقْتَ فِيْهَا يَفْضُلُ عَنِ الْاَدَاءِ اِذَا اَدّٰى عَلٰى حَسْبِ السُّنَّةِ مِنْ غَيْرِ اِفْرَاطٍ فَيَكُوْنُ ظَرْفًا وَلَا يَصِحُّ الْاَدَاءُ قَبْلَ دُخُوْلِ الْوَقْتِ وَيَفُوْتُ بِفَوْتِهٖ فَيَكُوْنُ شَرْطًا وَيَخْتَلِفُ الْاَدَاءُ بِاخْتِلَافِ صِفَةِ الْوَقْتِ صِحَّةً وَكَرَاهَةً فَيَكُوْنُ سَبَبًا لِلْوُجُوْبِ - وَتَقْدِيْمُ الْمَشْرُوْطِ عَلَى الشَّرْطِ جَائِزٌ اِذَا كَانَ الشَّرْطُ شَرْطًا لِلْوُجُوْبِ كَمَا فِىْ حَوْلَانِ الْحَوْلِ لِلزَّكٰوةِ وَاَمَّا اِذَا كَانَ الشَّرْطُ شَرْطًا لِلْجَوَازِ لَا يَصِحُّ التَّقْدِيْمُ عَلَيْهِ كَسَائِرِ شَرَائِطِ الصَّلٰوةِ وَتَقْدِيْمُ الْمُسَبَّبِ عَلَى السَّبَبِ لَا يَجُوْزُ اَصْلًا وَهٰهُنَا لَمَّا اجْتَمَعَتِ الشَّرْطِيَّةُ وَالسَّبَبِيَّةُ فَلَا جَرَمَ اَنْ لَا يَجُوْزَ التَّقْدِيْمُ عَلَى الْوَقْتِ ثُمَّ هٰهُنَا شَيْئَانِ نَفْسُ الْوُجُوْبِ وَ وُجُوْبُ الْاَدَاءِ فَنَفْسُ الْوُجُوْبِ سَبَبُهُ الْحَقِيْقِىْ هُوَ الْاِيْجَابُ الْقَدِيْمُ وَسَبَبُهُ الظَّاهِرِىْ وَهُوَ الْوَقْتُ اُقِيْمَ مَقَامَهُ

অনুবাদ ॥ যেমন নামাযের সময়। কেননা সময়টা আদায় থেকে উদ্বৃত্ত থাকে, যখন সে সীমাতিক্রম ব্যতীত হাদীস মোতাবেক আদায় করে। এজন্যে সময় ظرف তথা আধার হবে এবং সময় আসার পূর্বে নামায আদায় করা বিশুদ্ধ হবে না। আবার সময় চলে যাওয়ার মাধ্যমে আদায়ের সুযোগ ছুটে যাবে। সুতরাং, সময় হলো আদায়ের জন্যে শর্ত। সময়ের সিফাতের বিভিন্নতার কারণে বিশুদ্ধ হওয়া এবং মাকরূহ হওয়ার প্রশ্নে আদায় বিভিন্ন হবে। নামায আদায় হওয়ার জন্যে سبب হবে। আর যখন শর্ত কোন وجوب এর জন্যে শর্ত হয়। তখন শর্তযুক্ত বিষয়কে শর্তের ওপরে অগ্রবর্তী করা বৈধ। যেমন- যাকাত ওয়াজিব হওয়া বর্ষপূর্তির সাথে শর্তযুক্ত। যদি শর্তটি জায়েয হওয়ার জন্যে শর্তযুক্ত বিষয়ের ওপর অগ্রবর্তী হয়, তবে অগ্রবর্তী করা শুদ্ধ নয়। যেমন, নামাযের সমস্ত শর্তাবলি। আর سبب অগ্রবর্তী করা জায়েয নয়।

এখানে যখন শর্ত হওয়া ও সবাব তথা কারণ হওয়া একত্রিত হয়েছে, তাই সময়ের পূর্বে অগ্রবর্তী করা জায়েয না হওয়ায় কোন সমস্যা নেই। এখানে দুটি বস্তু আছে; যেমন- نفس وجوب হওয়া এবং وجوب اداء বা আদায় ওয়াজিব হওয়া। নিছক ওয়াজিবের সবাব হলো প্রকৃত সবাব। এটা হলো আদি ওয়াজিবকরণ। এর অন্য সবাব হলো- বাহ্যিক সবাব। তা হলো এমন সময় যা প্রকৃত সবাবের স্থলাভিষিক্ত।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله كَوَقْتِ الصَّلٰوةِ فَاِنَّ الخ : মুসান্নিফ (র) বলেন- প্রথম প্রকারের উদাহরণ হলো নামাযের ওয়াক্ত। কেননা ওয়াক্ত নামাযের জন্য যরফ। এটা এভাবে যে, যদি সুন্নত মোতাবেক নামায পড়া হয় তাহলে নামায আদায়ের পরে সময়ের কিছু অংশ অবশ্যই অতিরিক্ত থাকবে। আর নামায আদায়ের পরে ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকা ওয়াক্ত যরফ হওয়ার আলামত। ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগে নামায আদায় করা যেহেতু সহীহ নয় এবং ওয়াক্ত ফউত হওয়ার দ্বারা আদায়ও ফউত হয়ে যায়। এ জন্য নামায আদায়ের ব্যাপারে ওয়াক্ত শর্ত হলো। কারণ পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, শর্ত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বিদ্যমান হওয়ার পূর্বে মামূরবিহী শুদ্ধ না হওয়া এবং তা ছুটে যাওয়ার দ্বারা মামূরবিহীও ছুটে যাওয়া। আর যেহেতু সময়ের তারতম্যে আদায়ের ক্ষেত্রে তারতম্য ঘটে। এ কারণে নামায ওয়াজিব হওয়ার জন্য ওয়াক্ত হলো সবাব। অর্থাৎ ওয়াক্ত কামিল হলে আদায় কামিল বিবেচিত হবে। আর ওয়াক্ত নাকিস হলে

নাকিসরূপে আদায় ওয়াজিব হবে। সুতরাং কেমন যেন আদায় ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে ওয়াক্ত প্রভাবশীল। আর যা আদায় ওয়াজিব হওয়ার মধ্যে প্রভাবশীল হয় তা সবাব হয়ে থাকে। সুতরাং ওয়াক্ত নামায ওয়াজিব হওয়ার জন্য সবাব হবে।

মোটকথা নামাযের ওয়াক্ত যেহেতু নামাযের জন্য যরফও এবং وجوب اداء জন্য শর্তও। সুতরাং নামাযের ওয়াক্ত مقيد بالوقت মামূরবিহী এর প্রথম প্রকারের উদাহরণ হলো।

وَتَقْدِيمُ الْمَشْرُوطِ جَائِزٌ عَلَى الشَّرْطِ الخ এটা একটা উহ্য প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন : আপনি উল্লেখ করেছেন যে, নামায আদায়ের জন্য ওয়াক্ত হলো শর্ত। আর শর্তের উপর মাশরূতকে অগ্রগামী করা জায়েয। যেমন- বছর অতিক্রান্ত হওয়া যাকাত আদায় ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত। আর যাকাতকে বছর অতিক্রান্ত হওয়ার উপর অগ্রগামী করা জায়েয। সুতরাং এভাবে নামায আদায় করাও তার শর্ত অর্থাৎ ওয়াক্তের আগে করা জায়েয হওয়া উচিত ছিলো। অথচ ওয়াক্তের আগে নামায আদায় করা জায়েয নয় কেন?

উত্তর : শর্ত ২ প্রকার। ১. شرط وجوب ২. شرط اداء

شرط وجوب তথা ওয়াজিব হওয়ার শর্ত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওয়াজিব হওয়াটা শর্তের উপর মওকূফ হওয়া। অর্থাৎ শর্তের পরে ওয়াজিব সাব্যস্ত হবে। যদিও শর্ত ছাড়াই জায়েয হওয়া সাব্যস্ত হয়ে যায়।

شرط جواز তথা জায়েয হওয়ার শর্ত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জায়েয হওয়াটা শর্তের উপর মওকূফ থাকা। অর্থাৎ শর্ত ছাড়া জায়েয হওয়া সাব্যস্ত হবে না। অতএব شرط وجوب এর উপর মাশরূতকে মুকাদ্দাম করা জায়েয। কিন্তু شرط جواز এর উপর মুকাদ্দাম করা জায়েয নয়। আর বছর অতিক্রান্ত হওয়া যাকাত আদায় ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত। এ কারণে বছর অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই যাকাত দেয়া জায়েয। আর ওয়াক্ত নামায ওয়াজিব হওয়ার জন্য شرط جواز এ কারণে ওয়াক্তের আগে নামায আদায় করা জায়েয নয়। এভাবে নামাযের অন্যান্য শর্ত যেমন কাপড়, শরীর ও জায়গা পাক হওয়া নামাযের জন্য شرط اداء এ কারণে এ সকল জিনিসের উপর নামায মুকাদ্দাম করা জায়েয নয়।

মোটকথা شرط جواز এর উপর মাশরূতকে মুকাদ্দাম করা জায়েয নয় এবং সবাবের উপর মুসাববাবকে মুকাদ্দাম করাও জায়েয নয়। আর এখানে নামাযের ওয়াক্তের ক্ষেত্রে যেহেতু শর্ত ও সবাব হওয়া উভয়টিই বিদ্যমান এ কারণে সময়ের আগে নামায পড়া জায়েয নয়।

قوله ثُمَّ هٰهُنَا شَيْئَانِ الخ : মোল্লা জিয়ূন (র) বলেন, নামাযের ব্যাপারে ২টি বস্তু রয়েছে। ১. نفس وجوب বা মূল নামায ওয়াজিব হওয়া, وجوب اداء বা নামাযের আদায় ওয়াজিব হওয়া। প্রথমটির ২টি সবাব রয়েছে। ১. سبب حقيقى (প্রকৃত সবাব), ২. سبب ظاهرى (বাহ্যিক সবাব)। نفس وجوب এর হাকীকী সবাব হলো ايجاب قديم তথা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াজিব করা। যেমন তালবীহ গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। আর এ বাহ্যিক সবাব হলো ওয়াক্ত যা হাকীকী সবাবের স্থলাভিষিক্ত। এভাবে আদায় ওয়াজিব হওয়ার জন্য ২টি সবাব রয়েছে। ১. সবাবে হাকীকী, ২. সবাবে জাহিরী। হাকীকী সবাব ফে'ল তলব করার সাথে সংশ্লিষ্ট। আর জাহিরী সবাব হলো যা হাকীকী সবাবের স্থলাভিষিক্ত।

وَوُجُوبُ الْاَدَاءِ سَبَبُهُ الْحَقِيْقِيُّ تَعَلُّقُ الطَّلَبِ بِالْفِعْلِ وَسَبَبُهُ الظَّاهِرِيُّ وَ هُوَ الْاَمْرُ اُقِيْمَ مَقَامَهُ ثُمَّ الظَّرْفِيَّةُ وَالسَّبَبِيَّةُ لَاتَجْتَمِعَانِ بِحَسْبِ الظَّاهِرِ لِاَنَّهُ اِنْ اَدّٰى فِي الْوَقْتِ لَا يَكُوْنُ سَبَبًا لِاَنَّ السَّبَبَ يَجِبُ اَنْ يَقَدَّمَ عَلَى الْمُسَبَّبِ وَاِنْ لَمْ يُؤَدِّ فِي الْوَقْتِ لَا يَكُوْنُ ظَرْفًا اِذِ الظَّرْفُ مَا يُؤَدّٰى فِيْهَالَا بَعْدَهُ فَلِهٰذَا قَالُوا اِنَّ الظَّرْفَ هُوَ جَمِيْعُ الْوَقْتِ وَالشَّرْطُ هُوَ مُطْلَقُ الْوَقْتِ وَالسَّبَبُ هُوَ الْجُزْءُ الْاَوَّلُ الْمُتَّصِلُ بِالْاَدَاءِ قَبْلَ الشُّرُوْعِ فِي الْاَدَاءِ وَالْكُلُّ فِي الْقَضَاءِ -

অনুবাদ॥ আর وجوب اداء এর حقيقى সবাব হলো- কার্যের সাথে طلب সংশ্লিষ্ট হওয়া। এর বাহ্যিক সবাব হলো এমন امر যা হাকীকী সবাবের স্থলাভিষিক্ত।

অতঃপর যরফ এবং সবব বাহ্যতঃ একত্রিত হয় না। কেননা, কাজ যদি সময়ের মধ্যে আদায় করা হয়, তবে সময় সবাব হবে না। কেননা, সবাব মুসাব্বাবের পূর্বে হওয়া অত্যাবশ্যক। আর যদি সময়ের মধ্যে কার্য আদায় করা না হয়, তবে সময় যরফ হবে না। কেননা, যরফ হলো- যার মধ্যে কার্য সম্পাদন করা হয়। তার পরে কার্য সম্পাদন করলে তা যরফ হবে না। সুতরাং, এ কারণেই উসূলবিদগণ বলেন, যরফ হলো পূর্ণ সময়। আর শর্ত হলো সাধারণ সময়। আদায় করার মধ্যে সবাব হলো- ওয়াক্তের প্রথম অংশ যা আরম্ভ করার পূর্বে আদায় করার সাথে যুক্ত। আর কাযার মধ্যে পুরো সময়টিই সবাব।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ নূরুল আনওয়ারের জনৈক টীকা লেখক বলেন– মূল ওয়াজিবের হাকীকী সবাব ايجاد قديم কে সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। কারণ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলার উক্ত সম্বোধন যা বান্দার কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট। এটাই কাজের সাথে তলব সংশ্লিষ্ট হওয়ার অর্থ। আর তলব কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া আদায় ওয়াজিব হওয়ার জন্য সবাব, মূল ওয়াজিবের সবাব নয়। সুতরাং মূল ওয়াজিবের হাকীকী সবাব হয়তো ঐ সকল নেয়ামত যা আল্লাহ স্বীয় বান্দাদেরকে দান করেছেন। যেমন কাজী বায়যাবী يَا اَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের জন্য যে সকল নেয়ামত দান করেছেন। তার শুকরিয়া আদায় করার জন্য ইবাদত ফরয করেছেন। সুতরাং বোঝা গেলো যে, আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত নেয়ামতসমূহ মূল নামায ওয়াজিব হওয়ার হাকীকী সবাব। অথবা এর হাকীকী সবাব হলো আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং। যেমন নূরুল আনওয়ারের ব্যাখ্যাকার উল্লেখ করেছেন।

قوله ثُمَّ الظَّرْفِيَّةُ وَالسَّبَبِيَّةُ الخ : নূরুল আনওয়ার গ্রন্থকার বলেন– বাহ্যত সবাব এবং যরফ একত্র হতে পারে না। কারণ নামায যদি ওয়াক্তের মধ্যে আদায় করা হয় তাহলে নামাযের জন্য ওয়াক্ত সবাব হতে পারে না। কারণ সবাব মুসাব্বাবের উপর মুকাদ্দাম হওয়া আবশ্যক। আর নামায যদি ওয়াক্তের মধ্যে আদায় করা না হয় তাহলে ওয়াক্ত নামাযের জন্য যরফ হবে না। কারণ যরফ বলা হয় ঐ বস্তুকে যার মধ্যে নামায আদায় করা হয়; যার পরে নামায আদায় করা হয় তা নয়। মোটকথা বাহ্যিকভাবে সবাব এবং যরফ উভয়টি একত্রিত হওয়া অসম্ভব। অথচ মুসান্নিফ (র) ওয়াক্তকে নামাযের জন্য সবাব সাব্যস্ত করেছেন এবং যরফও সাব্যস্ত করেছেন।

উত্তর : উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরে উসূলবিদগণ বলেন– যরফ হলো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পূর্ণ ওয়াক্ত। আর শর্ত হলো মুতলাক ওয়াক্ত। আর আদায়ের মধ্যে ওয়াক্তের ঐ প্রথম অংশটা সবাব যা শুরু করার আগে আদায়ের সাথে মিলিত হয়। আর কাযার মধ্যে পূর্ণ ওয়াক্তটাই সবাব হয়। সুতরাং নামাযের জন্য পূর্ণ ওয়াক্ত যেহেতু যরফ। আর আদায়ের সাথে মিলিত অংশটা হলো সবাব। সুতরাং এক্ষেত্রে সবাব এবং যরফ উভয়টি একত্র হওয়া সম্ভব। আর কাযার জন্য সম্পূর্ণ ওয়াক্তকে সবাব সাব্যস্ত করায় কোনো অসুবিধা নেই। কেননা ওয়াক্তের মধ্যে যেহেতু নামায আদায় করা হলো না। সুতরাং কাযা নামাযের জন্য ওয়াক্ত যরফ থাকলো না। আর জরফ না থাকার দরুন তা সবাব হওয়াও অসম্ভব হবে না।

وَهُوَ اَرْبَعَةُ اَنْوَاعٍ وَقَدْ فَصَّلَهُ الْمُصَنِّفُ رح بِقَوْلِه وَهُوَ اِمَّا اَنْ يُّضَافَ اِلَى الْجُزْءِ الْاَوَّلِ اَوْ اِلَى مَا يَلِيْ اِبْتِدَاءَ الشُّرُوْعِ اَوْ اِلَى الْجُزْءِ النَّاقِصِ عِنْدَ ضِيْقِ الْوَقْتِ اَوْ اِلَى جُمْلَةِ الْوَقْتِ يَعْنِيْ اَنَّ الْاَصْلَ اَنَّ كُلَّ مُسَبَّبٍ مُتَّصِلٌ بِسَبَبِه فَاِنْ اُدِّيَتِ الصَّلٰوةُ فِيْ اَوَّلِ الْوَقْتِ يَكُوْنُ الْجُزْءُ السَّابِقُ عَلَى التَّحْرِيْمَةِ وَهُوَ الْجُزْءُ الَّذِيْ لَا يَتَجَزَّا سَبَبًا لِوُجُوْبِ الصَّلٰوةِ فَاِنْ لَمْ يُؤَدِّ فِيْ اَوَّلِ الْوَقْتِ تَنْتَقِلُ السَّبَبِيَّةُ اِلَى الْاَجْزَاءِ الَّتِيْ بَعْدَهُ فَيُضَافُ الْوُجُوْبُ اِلَى كُلِّ مَا يَلِيْ اِبْتِدَاءَ الشُّرُوْعِ مِنَ الْاَجْزَاءِ الصَّحِيْحَةِ فَاِنْ لَمْ يُؤَدِّ فِي الْاَجْزَاءِ الصَّحِيْحَةِ حَتّٰى ضَاقَ الْوَقْتُ فَحِيْنَئِذٍ يُضَافُ الْوُجُوْبُ اِلَى الْجُزْءِ النَّاقِصِ عِنْدَ ضِيْقِ الْوَقْتِ وَهٰذَا لَا يُتَصَوَّرُ اِلَّا فِي الْعَصْرِ فَاِنَّ فِيْ غَيْرِه مِنَ الصَّلٰوةِ كُلُّ الْاَجْزَاءِ صَحِيْحَةٌ وَهٰذَا الْجُزْءُ النَّاقِصُ مِقْدَارُ مَا يَسَعُ التَّحْرِيْمَةَ عِنْدَنَا وَمِقْدَارُ مَا يُؤَدِّيْ فِيْهِ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زُفَرَ رح فَلَا تَنْتَقِلُ السَّبَبِيَّةُ عِنْدَه اِلَى مَا بَعْدَه لِاَنَّهُ خِلَافُ الْاَمْرِ وَالشَّرْعِ فَاِنْ كَانَ هٰذَا الْجُزْءُ الْاَخِيْرُ كَامِلًا كَمَا فِيْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَجَبَتْ كَامِلَةً فَاِنِ اعْتَرَضَ الْفَسَادُ بِالطُّلُوْعِ بَطَلَتِ الصَّلٰوةُ وَيُحْكَمُ بِالْاِسْتِيْنَافِ وَاِنْ كَانَ هٰذَا الْجُزْءُ نَاقِصًا كَمَا فِيْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ وَجَبَتْ نَاقِصَةً فَاِنِ اعْتَرَضَ الْفَسَادُ بِالْغُرُوْبِ لَمْ تَفْسُدِ الصَّلٰوةُ لِاَنَّهُ اَدَّاهَا كَمَا وَجَبَتْ

অনুবাদ॥ আর এটা চার প্রকার গ্রন্থকার (র) তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা তাঁর এ বক্তব্যের মাধ্যমে পেশ করেছেন। ***আর*** وجوب ***হয়তো প্রথম অংশের দিকে সম্বন্ধ হবে, অথবা ঐ বস্তুর দিকে সম্বন্ধ হবে যা সূচনার প্রথম দিকের সাথে যুক্ত রয়েছে, অথবা ওয়াক্ত সংকীর্ণ হওয়া অবস্থায় অপূর্ণাঙ্গ অংশের দিকে সম্বন্ধ হবে, অথবা সম্পূর্ণ ওয়াক্তের দিকে সম্বন্ধ হবে।*** অর্থাৎ এ ব্যাপারে মূলনীতি এই যে, প্রত্যেকটি মুসাব্বাব তার সবরের সাথে যুক্ত হয়। সুতরাং, নামায যদি প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা হয়, আর তা হলো جُزْء لَايَتَجَزَّى তথা যে অবিভাজ্য অংশটি তাহরীমার পূর্বে তা নামায ওয়াজিব হওয়ার সবাবরূপে গণ্য হবে।

সুতরাং, নামায যদি প্রথম সময়ে আদায় করা না হয়, তবে সবাব (ক্রমান্বয়ে) তৎপরবর্তী অংশসমূহের দিকে স্থানান্তরিত হবে। অতএব وجوب সম্বন্ধযুক্ত হবে প্রত্যেক ঐ অংশের সাথে যা বিশুদ্ধ অংশসমূহের সূচনার সাথে সংযুক্ত। আর যদি বিশুদ্ধ সময়ের মধ্যে আদায় না করে, এমনকি সময় সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, তখন ওয়াজিব হওয়াকে সংকীর্ণতার প্রেক্ষিতে অসম্পূর্ণ অংশের সাথে সম্বন্ধ করা হবে।

এ অসম্পূর্ণ অংশটি আছর নামায ছাড়া অন্য নামাযে কল্পনা করা যায় না। কেননা, আছর ছাড়া অন্যান্য নামাযের ওয়াক্তের সকল অংশই বিশুদ্ধ। আর আমাদের মতে, এ অসম্পূর্ণ অংশ হলো তাকবীরে তাহরীমা বলা পরিমাণ সময়। আর ইমাম যুফার (র) এর মতে, এ পরিমাণ সময় যার মধ্যে চার রাক'য়াত নামায আদায় করা যায়। সুতরাং, তার মতে, এ পরবর্তী অংশসমূহের প্রতি سببية স্থানান্তরিত হবে না। কেননা, এটা আমর ও শরীআতের বিপরীত।

সুতরাং, যদি এ শেষাংশ কামিল তথা পরিপূর্ণ হয়, যেমন ফজরের নামাযে; তাহলে নামায কামিলরূপে ওয়াজিব হবে। সুতরাং, যদি সূর্যোদয়ের কারণে ফাসাদ দেখা দেয়, তবে নামায বাতিল হবে এবং নতুনভাবে

নামায আদায় করার নির্দেশ করা হবে। আর যদি উক্ত অংশ ناقص বা অসম্পূর্ণ হয়, যেমন আছরের নামাযে, তাহলে নামায অসম্পূর্ণরূপে ওয়াজিব হবে। সুতরাং, যদি সূর্যাস্তের দ্বারা فساد প্রকাশিত হয়, তবে নামায বিনষ্ট হবে না। কেননা, মুসল্লী নামায তেমনভাবে আদায় করেছে যেমনভাবে তা ওয়াজিব হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ قوله وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ الخ : নূরুল আনওয়ার গ্রন্থকার বলেন- امر موقت তথা সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আমরও ৪ প্রকার। কারণ ১. হয়তো ওয়াক্তের প্রথম অংশের প্রতি وجوب সম্বন্ধিত হবে। ২. অথবা উক্ত সময়ের প্রতি সম্বন্ধিত হবে যা শুরু করার আগের অংশের সাথে মিলিত। যেমন আজকের যোহরের ওয়াক্ত সাড়ে ১২টা থেকে শুরু হয়। কিন্তু এক ব্যক্তি ২ টার সময় নামায শুরু করলো। সুতরাং ২টা বাজার সাথে যে সময়টা মিলিত অর্থাৎ ১টা ৫৯ মিনিট ৫৯ সেকেন্ড উক্ত সময়ের প্রতি وجوب صلاة সম্বন্ধিত হবে। ৩. অথবা সময় সংকীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে নাকেস অংশের প্রতি সম্বন্ধিত হবে। ৪. অথবা পূর্ণ সময়ের প্রতি সম্বন্ধিত হবে।

এর ব্যাপারে কায়দা এই যে, প্রত্যেক মুসাববাব নিজ সবাবের সাথে মিলিত হয়।

এর এখন প্রশ্ন জাগে যে, এখানে মুসাববাব হলো স্বয়ং নামায ওয়াজিব হওয়া, নামায আদায় করা নয়। আর এখানে উক্ত جزء বা অংশের সাথে সবাব রয়েছে তাকে আদায়ের সাথে মিলিত হওয়া ধর্তব্য করা হয়েছে। মূল ওয়াজিব হওয়ার সাথে নয়। অথচ اِتِّصَالُ مُسَبَّبٍ بِالسَّبَبِ গ্রহণযোগ্য। আর اتصال اداء بالسبب গ্রহণযোগ্য নয়।

উত্তর : نفس وجوب টা مفضى الى الاداء হয়ে থাকে। সুতরাং কেমন যেন وجوب এর মাধ্যমে আদায়ও মুসাববাব হলো। আদায় যেহেতু মুসাববাব হলো। সুতরাং সবাবের সাথে আদায় মিলিত হওয়ার ধর্তব্য হয়েছে।

মোটকথা প্রত্যেক মুসাববাব তার সবাবের সাথে মিলিত হয়। নামায যদি ওয়াক্তের শুরুতে আদায় করা হয় তাহলে যে جزء لايتجزى তাহরীমার উপর মুকাদ্দাম হয় তা وجوب صلوة এর জন্য সবাব হবে।

এর দলিল এই যে, ওয়াক্তের প্রথম অংশতো বিদ্যমান রয়েছে। এর মধ্যে বাকী সকল অংশ উপস্থিত নেই। আর যা উপস্থিত নেই তা উপস্থিতের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে না। কাজেই পরবর্তী অংশসমূহ প্রথম অংশের সাথে সাংঘর্ষিক হবে না। অর পরবর্তী অংশসমূহ যখন প্রথম অংশের সাথে সাংঘর্ষিক হলো না। কাজেই ওয়াক্তের প্রথম অংশকে নামায ওয়াজিব হবার সবাব সাব্যস্ত করা বৈধ। আর যদি শুরু ওয়াক্তে নামায আদায় না করা হয় তাহলে সবাব হওয়াটা ঐ সকল অংশের প্রতি স্থানান্তরিত হবে যা প্রথম অংশের পরে রয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে নামায ওয়াজিব হওয়া সময়ের সঠিক অংশসমূহের মধ্যে থেকে উক্ত অংশের প্রতি সম্বন্ধিত হবে যে অংশ নামায শুরু করার প্রথম অংশের সাথে মিলিত। যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঠিক ২ টার সময় যোহরের নামায শুরু করার ক্ষেত্রে ১টা ৫৯ মিনিট ৫৯ সেকেন্ডে যে সময় রয়েছে উক্ত সময়টা এ যোহরের নামায ওয়াজিব হওয়ার সবাব এবং এই যোহরের নামায ওয়াজিব হওয়াটা উক্ত সময়ের প্রতি সম্বন্ধিত। তবে এখানে ২টি প্রশ্ন আরোপিত হয়।

১. **প্রথম প্রশ্ন :** নূরুল আনওয়ারের ব্যাখ্যাকার যে تنتقل السببية বলেছেন তা সঠিক নয়। কারণ সবাব হওয়াটা সিফাত হওয়ার কারণে عرض, যা পরনির্ভরশীল। আর عرض কখনো স্থানান্তর কবুল করে না।

উত্তর : এখানে সবাব স্থানান্তরিত হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, তা প্রথমত এক স্থানে সাব্যস্ত ছিলো আর এখন তা ভিন্ন স্থানে সাব্যস্ত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ প্রথম ওয়াক্তের প্রথম অংশে سببيت সাব্যস্ত ছিলো। আর এখন উক্ত অংশে সাব্যস্ত হচ্ছে যা নামায শুরু করার প্রথম অংশের সাথে মিলিত। প্রকৃতপক্ষে এটা কোনো স্থানান্তর নয়। তবে স্থানান্তরের সাথে সামঞ্জস্যশীল হওয়ায় এটাকে স্থানান্তর দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : প্রথম অংশে নামায আদায় না করার ক্ষেত্রে পরবর্তী অংশের দিকে سببيت স্থানান্তরিত হওয়ার কারণে এক ওয়াজিবের জন্য বিভিন্ন সবাব হওয়া সাব্যস্ত হচ্ছে। কারণ নামায শুরু করার প্রথমভাগে মানুষ বিভিন্নরূপ থাকে। যেমন- অনেকে প্রথম ওয়াক্তে যোহরের নামায পড়ে না, বরং পরে পড়ে। উদাহরণ স্বরূপ কেউ পৌনে ২টার সময় আদায় করে, কেউ ২ টার সময়, কেউ আড়াইটার সময়। কাজেই প্রত্যেকের যোহরের নামাযের সবাব ভিন্ন ভিন্ন হলো। প্রথম ব্যক্তির ক্ষেত্রে পৌনে ২ টার ১ সেকেন্ড পূর্বের সময় হলো সবাব, দ্বিতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে সবাব

হলো ২ টা বাজার ১ সেকেন্ড পূর্বের সময় এবং তৃতীয় ব্যক্তির জন্য বেলা আড়াইটার ১ সেকেন্ড পূর্বের সময়। অথচ ১ ওয়াজিবের জন্য ১টিই সবাব হয়ে থাকে বিভিন্ন সবাব হয় না।

উত্তর : হাকীকী সবাব হলো আল্লাহ তা'আলা। আর ওয়াক্ত হলো معرف তথা সবাবের পরিচায়ক। সুতরাং একই বস্তুর জন্য বিভিন্ন পরিচায়ক হওয়া সাব্যস্ত হবে। এতে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ একই বস্তুর বিভিন্ন معرف বা পরিচায়ক হতে পারে। যদি ওয়াক্তের সঠিক অংশে নামায আদায় করা না হয় ফলে সময় সংকীর্ণ হয়ে যায় তখন وجوب نماز নাকিস অংশের প্রতি সম্বন্ধিত হবে। আর নাকিস অংশ নামায ওয়াজিব হবার সবাব হবে। এ কারণে নামাযও নাকিসভাবে ওয়াজিব হবে। কারণ ওয়াজিব হওয়াটা সবাব মোতাবেক হয়ে থাকে। সবাব কামিল হলে ওয়াজিবও কামিল হয়। আর সবাব নাকিস হলে ওয়াজিব ও নাকিস হয়।

তবে এ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য যে, ওয়াক্তের মধ্যে নাকিস অংশ কেবল আছরের নামাযের ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। অন্যান্য নামাযের মধ্যে পাওয়া যায় না। কারণ আছর ছাড়া সকল নামাযের সম্পূর্ণ অংশ সহীহ তথা কামেল। এর কোনো নাকিস অংশ নেই। আর আমাদের মতে নাকিস অংশ কেবল এতোটুকু যার মধ্যে তাকবীরে তাহরীমা বলার অবকাশ থাকে। ইমাম যুফার (র) এর মতে এতোটুকু সময় যার মধ্যে ৪ রাকআত নামায আদায় করা যায়। তাঁর মতে যে সময় ৪ রাকআত নামায আদায় করা যায় তার পরবর্তী সময়ের দিকে সবাব স্থানান্তরিত হবে না। কারণ তার পরের অংশের প্রতি সবাব স্থানান্তরিত হওয়া আমর ও শরীয়তের পরিপন্থী। কেননা এ পরিমাণ সময় বাকী না থাকলে ওয়াক্তকে সবাব সাব্যস্ত করে নামায ওয়াজিব সাব্যস্ত করলে تَكْلِيْفُ مَالَا يُطَاقُ তথা দুঃসাধ্য কাজের নির্দেশ দেয়া সাব্যস্ত হয়। আর শরীঅতে তা অবৈধ। কারণ আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا জুমহুরের দলিল কুদরতে মুতলাকার অধীনে বিস্তারিত উল্লেখিত হয়েছে।

মোটকথা সময় সংকীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে সময়ের শেষাংশ নামায ওয়াজিব হওয়ার সবাব হবে। এখন উক্ত অংশ যদি কামিল তথা পূর্ণাঙ্গ হয় যেমন ফজর নামাযের মধ্যে তাহলে ওয়াজিবও কামেল হবে। কারণ সবাব মোতাবেক ওয়াজিব হয়ে থাকে। আর ফজরের ওয়াক্ত যেহেতু পূর্ণটাই কামিল এ কারণে সবাবও কামিল হবে। আর সবাব যেহেতু কামিল হলো। সুতরাং ফযরের নামাযও কামিলরূপে ওয়াজিব হবে। অতএব নামায আদায়কালে সূর্যোদয় হলে ফজরের নামায বাতিল হয়ে যাবে এবং নতুনভাবে নামায পড়ার নির্দেশ দেয়া হবে। কারণ যেভাবে নামায ওয়াজিব হয়েছিলো সেভাবে আদায় পাওয়া যায়নি।

টীকাকার লেখেন– নামায বাতিল হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, তার ফরয বাতিল হয়ে যাবে। অর্থাৎ ফরয আদায় হবেনা। অবশ্য যা পড়েছে তা নফল হয়ে যাবে। আর কারো মতে মূল নামাযই বাতিল হয়ে যাবে। অর্থাৎ ফরযও হবে না এবং নফলও হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন– সূর্য উদয়ের কারণে ফজরের নামায বাতিল হয় না। এ ব্যাপারে তার দলিল হলো আবু হুরায়রা (রা) এর বর্ণিত হাদীস مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ الْعَصْرَ (বুখারী, মুসলিম) অর্থাৎ যে ব্যক্তি সূর্য উদয়ের আগে ফজরের ১ রাকআত নামায পেলো সে ফজর পেয়ে গেলো। যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের ১ রাকআত পেলো সে আছর পেয়ে গেলো।

এই হাদীস দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, যেভাবে আছরের নামায আদায়কালে সূর্য অস্তমিত হওয়ার দ্বারা নামায বাতিল হয় না। তদ্রূপ ফজরের নামায আদায়কালে সূর্যোদয় ঘটলে নামায বাতিল হয় না।

আহনাফের উত্তর : এর উত্তর এই যে, এই হাদীস এবং যে হাদীসের মধ্যে বিশেষ ৩ ওয়াক্তে (সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও দ্বিপ্রহর) নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে উভয়ের মধ্যে تعارض তথা দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। আর নিয়ম আছে যে, ২টি হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে কিয়াস দ্বারা তা নিরসন করতে হবে। সুতরাং কিয়াসের দাবি এই যে, সূর্যাস্তের দ্বারা আছরের নামায বাতিল না হোক। আর সূর্যোদয়ের দ্বারা ফজরের নামায বাতিল হোক। *(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)*

وَكَانَ قَوْلُهُ إِلَى مَا يَلِيْ اِبْتِدَاءَ الشُّرُوْعِ شَامِلاً لِلْجُزْءِ الْاَوَّلِ وَلِلْجُزْءِ النَّاقِصِ لِاَنَّ الْجُزْءَ الاول والْجُزْءَ النَّاقِصَ إِنَّمَا يَصِيْرُ سَبَبًا لِوُجُوْبِ الصَّلٰوةِ إِذَا شُرِعَ فِيْهِ واما اذا لَمْ يُشْرَعْ فِيْهِ لَمْ يَصِرْ سَبَبًا فَيَنْبَغِيْ اَنْ يَقْتَصِرَ عَلَيْهِ إِلَّا اَنَّ الْجُزْءَ الاوَّلَ لِاهْتِمَامِ شَانِهِ عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ وَصَرَّحَ بِهِ حَتّٰى ذَهَبَ كُلُّ الْاَئِمَّةِ سِوٰى اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح اِلَى الْاِسْتِحْبَابِ الْاَدَاءِ فِيْهِ وَكَذَا الْجُزْءُ النَّاقِصُ لِاَجْلِ خِلَافِيَّةِ زُفَرَ رح فِيْهِ صَرَّحَ بِذِكْرِهِ وَهٰذَا كُلُّهُ اذا اُدِّيَ الصَّلٰوةُ فِى الْوَقْتِ وَامَّا اذا فَاتَتِ الصَّلٰوةُ عَنِ الْوَقْتِ فَحِيْنَئِذٍ يُضَافُ الْوُجُوْبُ اِلٰى جُمْلَةِ الْوَقْتِ لِاَنَّهُ قَدْ زَالَ الْمَانِعُ عَنْ جَعْلِ كُلِّ الْوَقْتِ سَبَبًا وَهُوَ كَوْنُهُ ظَرْفًا لِلصَّلٰوةِ لِاَنَّه لَمْ يَبْقَ الْوَقْتُ فَلَمَّا كَانَ كُلُّ الْوَقْتِ سَبَبًا لِلْقَضَاءِ وَهُوَ كَامِلٌ فَحِيْنَئِذٍ تَجِبُ الصَّلٰوةُ كَامِلَةً فَلَا يَتَادّٰى إِلَّا فِى الْوَقْتِ الْكَامِلِ -

---

অনুবাদ ॥ গ্রন্থকারের উক্তি الى ما يلى ابتداء الشروع এটা প্রথম এবং অসম্পূর্ণ উভয় অংশকে অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা প্রথম এবং অসম্পূর্ণ অংশ শুধু তখনই নামায ওয়াজিব হওয়ার সবাব হবে, যখন সেসব সময়ে নামায শুরু করা হবে। আর যদি নামায শুরু না করা হয়, তবে এসব সবব হবে না। সুতরাং, এ উক্তির ওপরে [illegible]ন্ত করা উচিত হবে। তবে জুমহুর আলিমদের মতে, প্রথম অংশের গুরুত্ব সর্বাধিক হওয়ার কারণে তাকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি ইমাম আবু হানীফা (র) ব্যতীত অন্যান্য সকল ইমাম প্রথম ওয়াক্তে নামায আদায় করা মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে মত ব্যক্ত করেছেন। এ সকল কথা ঐক্ষেত্রে, যখন নামায ওয়াক্তের মধ্যে আদায় করা হবে। আর যদি ওয়াক্ত থেকে ছুটে যায়, তবে ওয়াজিবকে সম্পূর্ণ সময়ের প্রতি সম্বন্ধ করা হবে। কেননা, যে কারণে সম্পূর্ণ ওয়াক্তকে সবাব নির্ধারণ করা প্রতিবন্ধক ছিল, তা দূরীভূত হয়ে গেছে। অর্থাৎ নামাযের জন্যে ওয়াক্ত ظرف হওয়া। কেননা, ওয়াক্ত বাকি না থাকা-ই বাধা তথা প্রতিবন্ধকতা অপসারিত হওয়ার কারণ। সুতরাং, কাযার জন্যে সম্পূর্ণ ওয়াক্ত হলো সবাব। আর তা যেহেতু كامل তাই নামায পরিপূর্ণ হিসেবে ওয়াজিব হবে। সুতরাং, পরিপূর্ণ ওয়াক্তেই আদায় করতে হবে।

(পূর্বের বাকী অংশ) এর কারণ এই যে, ফজরের পূর্ণ ওয়াক্ত হলো কামিল। অতএব কামিল সবাবের কারণে ফজরের নামাযও কামিল ওয়াজিব হবে। সুতরাং কামিলরূপে তা আদায় করার দ্বারা আদায় বিবেচিত হবে। অথচ সূর্যোদয়ের কারণে নামায কামিলরূপে আদায় হয়নি। বরং তা নাকিস হয়ে গেছে। এ কারণে এ নামায গ্রহণযোগ্য হবে না বরং তা দোহরানো ওয়াজিব হবে।

পক্ষান্তরে আছরের পূর্ণ ওয়াক্ত কামিল নয় বরং তার শেষ অংশ হলো নাকিস। অতএব শেষাংশে আছর শুরু করার দ্বারা নাকিস সবাবের কারণে ওয়াজিবও নাকিস হবে। অতএব নামাযও নাকিসরূপে আদায় হয়ে যাবে। সুতরাং যেমন ওয়াজিব হয়েছিলো তেমনি আদায় হয়ে গেলো। এ কারণে তা শরীআতে গ্রহণযোগ্য হবে।

মোটকথা ফজরের নামাযে কিয়াসের দাবি হলো সূর্য উদয়ের দ্বারা নামায বাতিল হোক। আর আছরের ক্ষেত্রে কিয়াসের দাবি হলো সূর্যাস্তের দ্বারা নামায বাতিল না হোক। অতএব এ কিয়াসের উপর আমল করে আমরা হানাফীগণ বলে থাকি যে, সূর্যাস্তের কারণে আছরের নামায বাতিল হবে না। কিন্তু সূর্যোদয়ের কারণে ফজরের নামায বাতিল হয়ে যাবে। এটাকেই নুরুল আনওয়ার গ্রন্থকার এভাবে বলেছেন যে, ওয়াক্তের শেষ অংশ যদি নাকিস হয় যেমন আছরের ক্ষেত্রে তাহলে নামায নাকিস হবে। এখন যদি নামায আদায়কালে সূর্যাস্ত হয় তাহলে নামায নষ্ট হবে না। কেননা যেভাবে ওয়াজিব হয়েছিলো সেভাবেই আদায় করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قَوْلُه وَكَانَ قَوْلُه اِلَى مَا يَلِى الخ : ব্যাখ্যাকার বলেন– এই ইবারতে একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রশ্ন : ওয়াক্তের প্রথম প্রকারকে ৪ ভাগে বিভক্ত করা ঠিক নয়। কারণ মাতিন (র) এর উক্তি مايلى ابتداء الشروع প্রথম অংশ এবং নাকিস অংশ উভয়কে শামিল করে। কারণ প্রথম অংশেও নামায ওয়াজিব হওয়ার সবাব ঐ সময় হবে যখন প্রথম অংশে নামায শুরু করা হয়। আর নাকিস অংশ ঐ সময়ই সবাব হবে যখন নাকিস অংশে শুরু করা হয়। অতএব যদি প্রথম অংশ বা নাকিস অংশে নামায শুরু না করা হয় তাহলে প্রথম অংশ সবাব হবে না এবং নাকিস অংশও সবাব হবে না।

মোটকথা প্রথম অংশে এবং নাকিস অংশে যখন নামায ওয়াজিব হওয়ার সবাব ঐ সময়ই হচ্ছে যে সময়ে নামায শুরু করা হচ্ছে তখন প্রথম অংশ এবং নাকিস অংশও مَايَلِى اِبْتِدَاءَ الشُّرُوْعِ এর অধীনে দাখিল হবে। কারণ যখন প্রথম অংশে শুরু করা হবে তখন প্রথম অংশটি নামায শুরু করার সাথে মিলিত হবে। আর যখন নাকিস অংশে শুরু করা হবে তখন নাকিস অংশ নামাযের শুরু অংশে মিলিত হবে। সারকথা মুসান্নিফ (র) এর مَايَلِى اِبْتِدَاءَ الشُّرُوْعِ বাক্য প্রথম অংশ এবং নাকিস অংশ উভয়কে শামিল করে। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনার কোনো প্রয়োজন ছিলো না। বরং এভাবে বলা উচিত ছিলো وَهُوَ اِمَّا اَنْ يُّضَافَ اِلَى مَايَلِى اِبْتِدَاءَ الشُّرُوْعِ اَوْ اِلَى جُمْلَةِ الْوَقْتِ অর্থাৎ ওয়াক্তের প্রথম প্রকারটি ২ প্রকার। ১. ওয়াজিব হওয়াটা ওয়াক্তের ঐ অংশের প্রতি সম্বন্ধিত হবে যা নামায শুরুর প্রথম অংশের সাথে মিলিত। ২. ওয়াজিব হওয়াটা পূর্ণ ওয়াক্তের প্রতি সম্বন্ধিত হবে। প্রথম প্রকারের মধ্যে প্রথমের তিনো প্রকার শামিল হয়ে যাবে।

এর উত্তর এই যে, জুমহুরের মতে ওয়াক্তের প্রথম অংশটা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে ইমাম আবু হানীফা (র) ছাড়া বাকী সকল ইমাম প্রথম ওয়াক্তে নামায আদায় করাকে মুস্তাহাব বলেছেন। এই গুরুত্বের কারণেই এটাকে স্পষ্টভাবে ভিন্ন করে উল্লেখ করেছেন। এভাবে নাকিস অংশের ব্যাপারে ইমাম যুফার (র) এর দ্বিমত রয়েছে। এ দ্বিমতকে স্পষ্ট করার জন্য নাকিস অংশকে ভিন্ন করে উল্লেখ করেছেন।

قوله وَهٰذَا كُلُّهٗ اِذَا اُدِّىَ الخ : নূরুল আনওয়ার গ্রন্থকার বলেন– এ সকল আলোচনা ঐ ওয়াক্ত সম্পর্কে যখন নামায ওয়াক্তের মধ্যে আদায় করা হয়। কিন্তু যদি ওয়াক্তের মধ্যে নামায আদায় করা সম্ভব না হয় ফলে নামায ছুটে যায় তাহলে এক্ষেত্রে নামায ওয়াজিব হওয়াটা পূর্ণ ওয়াক্তের প্রতি সম্বন্ধিত হবে এবং পূর্ণ ওয়াক্তটা কাযা ওয়াজিব হওয়ার সবাব হবে। কেননা পূর্ণ ওয়াক্তকে সবাব সাব্যস্ত করার ব্যাপারে এ বিষয়টি প্রতিবন্ধক ছিলো যে, ওয়াক্ত নামাযের জন্য যরফ এবং সবাব। আর যরফ ও সবাব উভয়টি একত্র হতে পারে না। কাজেই যখন ওয়াক্ত অতিক্রান্ত হয়ে গেলো কিন্তু নামায আদায় করতে পারলো না। তখন নামাযের জন্য এ ওয়াক্ত যরফ থাকবে না। কাজেই পূর্ণ ওয়াক্তকে সবাব সাব্যস্ত করায় যে প্রতিবন্ধকতা ছিলো তা দূরীভূত হয়ে গেলো। অতএব এখন পূর্ণ ওয়াক্তকে নামায ওয়াজিব হওয়ার সবাব সাব্যস্ত করায় কোনো ক্ষতি নেই। আর পূর্ণ ওয়াক্ত যেহেতু কামিল। এই কারণে নামাযও কামিলরূপে ওয়াজিব হবে। সুতরাং কামিলরূপে ওয়াজিব হওয়ার কারণে কামিল ওয়াক্তে আদায় করতে হবে। সামনের ইবারতে মুসান্নিফ (র) এদিকে ইঙ্গিত করেছেন।

وَالَيْه اَشَارَ بِقَوْلِهِ فَلِهٰذَا لاَ يَتَادّٰى عَصْرُ اَمْسِهِ فِى الوقت الناقص بخلاف عصر يَوْمِهِ يَعْنِى فَلِاَجْلِ اَنَّ سَبَبَ وُجُوْبِ عَصْرِ الْيَوْمِ هُوَ الْوَقْتُ النَّاقِصُ اذا لَمْ يُؤَدِّهِ فِى الْاَجْزَاءِ الصَّحِيْحَةِ وسَبَبُ وُجُوْبِ عَصْرِ الْاَمْسِ هُوَ كُلُّ الوَقْتِ الْفَائِتِ الكَامِلِ قُلْنَا لاَ يَتَادّٰى عَصْرُ الْاَمْسِ فِى الْوَقْتِ النَّاقِص لاَنَّه لَمَّا فَاتَتِ الصَّلٰوةُ عَنِ الوَقْتِ كَانَ كُلّ الوَقْتِ سَبَبًا وهُوَ كَاملٌ بِاعْتِبَارِ اَكْثَرِ اَجْزَائِهِ وانْ كَانَ يَشْتَمِلُ عَلَى الْوَقْتِ النَّاقِصِ فَلاَ يَصِحُّ قَضَاؤُهُ اِلاَّ فِى الْوَقْتِ الْكَامِلِ و يَتَادّٰى عَصْرُ يَوْمِهِ فِى الْوَقْتِ النَّاقِصِ لِاَنَّه لَمَّا لَمْ يُؤَدِّهِ فِى الْوَقْتِ الاوّل وَاتّصَلَ شُرُوْعُه فِى الْجُزْءِ النَّاقِصِ كَانَ هُوَ سَبَبًا لِوُجُوْبِه فَيُؤَدّٰى نَاقِصًا كَمَا وَجَبَ -

অনুবাদ॥ সম্মানিত গ্রন্থকার (র) তাঁর নিম্নোক্ত বক্তব্য দ্বারা একথার প্রতিই ইংগিত করেছেন যে, ***"সুতরাং, গতকালের আছরের নামায অসম্পূর্ণ সময়ে আদায় করা যাবে না। এটা আজকের আছরের নামাযের বিপরীত"।*** অর্থাৎ, যেহেতু আজকের আছরের নামায ওয়াজিব হওয়ার সবাব হল অসম্পূর্ণ সময়। কারণ এটা সঠিক সময়ে আদায় করা হয়নি। আর গতকালের আছরের নামায ওয়াজিব হওয়ার সবাব ছিলো ছুটে যাওয়া পূর্ণ সময়টা। এজন্যে আমরা হানাফীগণ বলেছি যে, গতকালের আছরের নামায অসম্পূর্ণ সময়ে আদায় করা যাবে না। কারণ নামায যখন ওয়াক্ত থেকে ছুটে গেছে, তখন সম্পূর্ণ ওয়াক্তটাই সবাব ছিল। আর অধিকাংশের বিচারে এটা পরিপূর্ণ, যদিও অসম্পূর্ণ সময়কেও অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং, সম্পূর্ণ সময় ছাড়া এর কাযা বিশুদ্ধ হবে না। আর গত দিনের আছরের নামায অসম্পূর্ণ সময়েও আদায় করা যাবে। কারণ তা যখন প্রথম সময়ে আদায় করেনি এবং অসম্পূর্ণ সময়ের সাথে তার সূচনা সংযুক্ত হয়েছে, কাজেই সেটাই তার জন্যে ওয়াজিব হওয়ার সবাব হয়েছে। অতএব অসম্পূর্ণভাবেই আদায় করতে হবে, যেমনভাবে তা ওয়াজিব হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ قوله واليه اَشَارَ بِقوله فَلِهٰذَا لاَيَتَادّٰى الخ : মানর গ্রন্থকার (র) বলেন– আজকের আছরের নামায যদি সঠিক অংশে আদায় করা না হয় তাহলে আজকের আছরের নামায ওয়াজিব হওয়ার সবাব যেহেতু নাকিস ওয়াক্ত। আর গতকালের ছুটে যাওয়া আছরের নামায ওয়াজিব হওয়ার সবাব হলো পূর্ণ ওয়াক্ত। পূর্ণ ওয়াক্ত তার অধিকাংশের দিক দিয়ে কামিল। এই কারণে আমরা বলি যে, গতকালের আছরের নামায নাকিস ওয়াক্তে আদায় করার দ্বারা আদায় হবে না। কারণ যখন আছরের নামায কাযা হয়ে গেলো তখন পূর্ণ ওয়াক্তটাই গতকালের আছরের নামাযের কাযার সবাব হবে। আর পূর্ণ ওয়াক্ত যদিও নাকিস অংশকেও শামিল করে তবে বেশি অংশের দিকে লক্ষ করে তা কামিল বিবেচিত। অতএব গতকালের কাযার সবাব কামিল হবে। এ কারণে কামিল ওয়াক্তেই গতকালের আছরের নামাযের কাযা পড়তে হবে। নাকিস ওয়াক্তে কাযা পড়লে তা সহীহ হবে না। কিন্তু আজকের আছরের নামায নাকিস ওয়াক্তেও আদায় হতে পারে। কারণ কামিল ওয়াক্তে যেহেতু আদায় করতে পারেনি। এ কারণে তা কামিল ওয়াজিব হয়নি বরং নাকিসরূপে ওয়াজিব হয়েছে। সুতরাং নাকিস ওয়াক্তে আদায় করলে তা ওয়াজিবের মুতাবিক হয়ে যাবে।

وَلَا يُقَالُ اِنَّ مَنْ شَرَعَ فِى صَلٰوةِ الْعَصْرِ فِى اَوَّلِ الْوَقْتِ ثُمَّ مَدَّهَا بِالتَّعْدِيْلِ وَالتَّطْوِيْلِ اِلٰى اَنْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَاِنَّ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ قَدْ تَمَّتْ نَاقِصَةً وَكَانَ شُرُوْعُهَا فِى الْوَقْتِ الْكَامِلِ لِاَنَّا نَقُوْلُ اِنَّمَا يَلْزَمُ هٰذَا ضُرُوْرَةَ اِبْتِنَائِهٖ عَلَى الْعَزِيْمَةِ فَاِنَّ الْعَزِيْمَةَ فِىْ كُلِّ صَلٰوةٍ اَنْ تُؤَدّٰى فِىْ تَمَامِ الْوَقْتِ فَالْاِحْتِرَازُ عَنِ الْكَرَاهَةِ مَعَ الْاِقْبَالِ عَلَى الْعَزِيْمَةِ مِمَّا لَا يَجْتَمِعُ قَطُّ فَجُعِلَ هٰذَا الْقَدْرُ مِنَ الْكَرَاهَةِ عَفْوًا -

অনুবাদ॥ এমন বলা যাবে না যে, যে ব্যক্তি আছরের নামায প্রথম সময়ে আরম্ভ করেছে, অতঃপর সে তাকে ধীরস্থিরভাবে এমন দীর্ঘায়িত করে আদায় করেছে যে, সূর্যাস্ত হয়ে গেছে, তাহলে তার এ নামায অসম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হয়েছে, অথচ তার সূচনা সম্পূর্ণ সময়ের মধ্যে ছিল। আমরা এর উত্তরে বলবো, আযীমতের ওপর আমল করার জন্যে উক্ত অবস্থা অনিবার্য হয়েছে। কেননা, প্রত্যেক নামাযে আযীমত হলো- নামাযকে পূর্ণ ওয়াক্তের মধ্যে আদায় করা। সুতরাং, এ স্থলে আযীমতের ওপর আমল করার সাথে সাথে كراهة থেকে মুক্ত থাকা কখনো একসাথে হতে পারে না। কাজেই এ পরিমাণ كراهة কে ক্ষমাযোগ্য গণ্য করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ قوله وَلَا يُقَالُ اِنَّ الشُّرُوْعَ الخ : এ ইবারতে ব্যাখ্যাকার একটি প্রশ্ন এবং তার উত্তর উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্ন : আপনার এ উক্তি যে, যে নামায কামিল ওয়াজিব হয় তা নাকিসভাবে আদায় হয় না তা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা কোনো ব্যক্তি যদি আছরের প্রথম ওয়াক্তে নামায শুরু করে। এর পর তা'দীলে আরকান এবং কেরাতকে প্রলম্বিত করার মাধ্যমে নামায এ পরিমাণ দীর্ঘায়িত করে যে, সালাম ফেরানোর পূর্বে সূর্যাস্ত হয়ে যায়। তাহলে এ নামায নাকিসরূপে পূর্ণ হবে। অথচ তা কামিল ওয়াক্তে শুরু করা হয়েছিলো। অর্থাৎ কামিল ওয়াক্তের কারণে কামিল রূপে ওয়াজিব হয়েছিলো। কিন্তু নাকিসরূপে আদায় করা হলো।

উত্তর : احكام مشروعة (শরয়ী বিধান) ২ প্রকার। ১. عزيمت ২. رخصت

عزيمت বলে যা মূল এবং তার মধ্যে পারপার্শ্বিকতা এর কোনো প্রভাব থাকে না।

رخصت বলে যা عوارض তথা পারিপার্শ্বিকতার কারণে প্রবর্তিত হয়। যেমন- সফরে রমযানের রোযা না রাখা হলো রুখসত। অর্থাৎ সফরের কারণে রোযা না রাখার অবকাশ রয়েছে। আর রোযা রাখা হলো আযীমত। অর্থাৎ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ আয়াতের কারণে এটাই আসল। এভাবে পূর্ণ ওয়াক্তে নামায আদায় করা হলো আযীমত। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যেহেতু সর্বদা নেয়ামত অবতীর্ণ হচ্ছে। এ কারণেই তার শুকরিয়ার দাবি এই যে, সম্পূর্ণ ওয়াক্তে নামায তথা তার ইবাদত করা হোক। কিন্তু ওয়াক্তের এক অংশে নামায আদায় করে বাকী ওয়াক্তকে নিজ প্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় করার অনুমতি ও রুখসত দেয়া হয়েছে। অন্যথায় জীবন নির্বাহে অসুবিধা সৃষ্টি হতো। এ আরজের কারণেই ওয়াক্তের এক অংশে নামায আদায় করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

মোটকথা এ প্রশ্নের ভিত্তি হলো আযীমতের উপর অর্থাৎ এ লোকটি যেহেতু আযীমতের উপর আমল করেছে এ কারণে এ প্রশ্নের উদ্রেক হয়েছে। এ মাসআলায় মাকরূহ থেকে রক্ষা পাওয়া এবং আযীমতের উপর আমল করা উভয়টি একত্রিত হতে পারে না। এ কারণে আযীমতের উপর আমল করার জন্য এ পরিমাণ মাকরূহকে বরণ করে নিতে হবে। এটা বরণকরা যখন জরুরি সে হিসেবে এ পরিমাণ মাকরূহকে শরীআতে মাফ করে দেয়া হয়েছে। আর উল্লেখিত ক্ষেত্রে আছরের নামায কামিল ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বে মাকরূহ সহকারে অর্থাৎ নাকিসভাবে আদায় করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। সুতরাং কোনো প্রশ্ন উঠবে না।

وَمِنْ حُكْمِهٖ اِشْتِرَاطُ نِيَّةِ التَّعْيِيْنِ اى مِنْ حُكْمِ هٰذَا الْقِسْمِ الَّذِىْ هُوَ ظَرْفٌ اِشْتِرَاطُ نِيَّةِ التَّعْيِيْنِ بِاَنْ يَّقُوْلَ نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ ظُهْرَ الْيَوْمِ وَلَا يَصِحُّ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ لِاَنَّهٗ لَمَّا كَانَ الْوَقْتُ ظَرْفًا صَالِحًا لِلْوَقْتِىِّ وَغَيْرِهٖ مِنَ النَّوَافِلِ وَالْقَضَاءِ يَجِبُ اَنْ يُّعَيِّنَ النِّيَّةَ - وَلَا يَسْقُطُ بِضِيْقِ الْوَقْتِ اى اِذَا ضَاقَ الْوَقْتُ عَنِ التَّوْسِعَةِ بِسَبَبِ تَقْصِيْرِهٖ اِلَى اٰخِرِ الْوَقْتِ او بِسَبَبِ نَوْمِهٖ اَوْ نِسْيَانِهٖ لَا يَسْقُطُ التَّعْيِيْنُ عَنْ ذِمَّتِهٖ لِاَنَّهٗ اِنَّمَا جَاءَ الضِّيْقُ بِسَبَبِ الْعَارِضِ فِى الْاَصْلِ كَانَ سَعَةً -

অনুবাদ॥ ***এ প্রকারের হুকুম হলো নিয়্যত নির্দিষ্টকরণের শর্তারোপ করা।*** অর্থাৎ, যার মধ্যে সময়টা ظرف হয় তার হুকুম হলো– নিয়্যত নির্দিষ্টকরণ শর্ত। তা এভাবে যে, আমি আজকের যোহরের নামায আদায় করার নিয়্যত করলাম। আর সাধারণণ নিয়্যতের দ্বারা যোহরের নামায বিশুদ্ধ হবে না। কেননা, ওয়াক্ত যেহেতু ওয়াক্তিয়া নামাযের জন্যে এবং অন্যান্য নফল ও কাযা নামাযের উপযুগী কাজেই নিয়্যত নির্দিষ্ট করা ওয়াজিব। ***আর ওয়াক্তের সংকীর্ণতার দরুন নিয়্যত নির্দিষ্টকরণ রহিত হবে না।*** অর্থাৎ, মুসল্লী কর্তৃক অবহেলা করে নামাযকে শেষ দিকে নিয়ে যাওয়ার কারণে অথবা মুসল্লির ঘুমের কারণে অথবা বিস্মৃতির কারণে ওয়াক্ত যদি ব্যাপকতা থেকে সংকীর্ণ হয়, তবে তার যিম্মা থেকে নির্দিষ্টকরণ রহিত হবে না। কেননা, সংকীর্ণতা এসেছে অস্থায়ী সববের দ্বারা। মূল নামাযের মধ্যে প্রশস্ততা রয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ قوله وَمِنْ حُكْمِهٖ الخ : মুসান্নিফ (র) বলেন– আমরে মুতলাকের যে প্রকারে ওয়াক্ত যরফ, শর্ত ও সবাব তিনোটি হয় তার বিধান এই যে, ওয়াক্তের ফরয নির্দিষ্ট করার জন্য নিয়ত করা শর্ত। যেমন এরূপ বলবে আমি আজকের যোহরের নামাযের নিয়ত করছি"। এর জন্য মুতলাক নিয়ত যথেষ্ট নয়। যেমন– বললো আমি নামাযের নিয়ত করছি। কারণ ওয়াক্ত যেহেতু যরফ-এর মধ্যে ওয়াক্তিয়া নামায এবং ভিন্ন নামায যেমন– নফল, কাযা ইত্যাদি আদায় করার অবকাশ রয়েছে। এ কারণে নির্দিষ্টভাবে নিয়ত করা জরুরি। যদি বলে যে, আমি যোহরের নামাযের নিয়ত করছি তথাপি যথেষ্ট হবে না। কারণ যোহরের নামায আজকেরও হতে পারে এবং পূর্বের কাযাও হতে পারে। অতএব ঐসময়ই আদায় নির্দিষ্ট হবে যখন ওয়াক্তের ফরয উল্লেখ করবে এবং এমন বলবে– আমি আজকের যোহরের নিয়ত করছি।

মানার গ্রন্থকার বলেন– যদি সময় এমন সংকীর্ণ হয়ে যায় যে, উক্ত সময়ে ফরয ছাড়া অন্য কোনো নামাযের অবকাশ থাকে না তথাপি নির্দিষ্ট নিয়ত করা রহিত হবে না। বরং ওয়াক্তের ফরযকে নির্দিষ্ট করা জরুরি হবে। কারণ ওয়াক্ত মূলত প্রশস্ত ছিলো। কিন্তু বিশেষ কারণ যথা অলসতা, নিদ্রা, ভুলে যাওয়া ইত্যাদির কারণে সংকীর্ণ হয়ে গেছে। আর আছলের মোকাবিলায় আরজ গ্রহণযোগ্য হয় না। অতএব সময় সংকীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রেও আছল নির্দিষ্ট করার নিয়ত করা শর্ত থাকবে।

প্রশ্ন : কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, সময় সংকীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করার নিয়ত করা রহিত হওয়া উচিত এবং ব্যক্তির বাহ্যিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করে তার স্বাভাবিক নিয়তকে ওয়াক্তের ফরযের প্রতি রুজু করা উচিত। কারণ মুসল্লির বাহ্যিক অবস্থার দাবি এই যে, সংকীর্ণ সময়ে সে ওয়াক্তিয়া নামায আদায় করবে; নফল, কাযা ইত্যাদি নয়।

উত্তর : কোনা বস্তুকে তার পূর্বের অবস্থার উপর বহাল রাখার জন্য বাহ্যিক অবস্থা দলিল হতে পারে। কিন্তু তা সাব্যস্ত কোনো বস্তুকে দূরীভূত করার জন্য দলিল হতে পারে না। সুতরাং ওয়াক্তের ফরয যেহেতু আসর ওয়াক্তের প্রশস্ততার কারণে মুকাল্লাফ ব্যক্তির জিম্মায় সাব্যস্ত হয়েছিলো। অতএব তার বাহ্যিক অবস্থার কারণে তা রহিত হতে পারে না। এ কারণেই ওয়াক্ত সংকীর্ণ হওয়া সত্ত্বে নির্দিষ্ট করণের নিয়ত করা রহিত হবে না।

وَلَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِيْنِ اِلَّا بِالْاَدَاءِ اى اِنْ عَيَّنَ اَحَدُ اَوَّلَ الْوَقْتِ اَوْ اَوْسَطَهُ اَوْ اٰخِرَهُ لَا يَتَعَيَّنُ بِتَعْيِيْنِهِ اللِّسَانِىِّ اَوِ الْقَصْدِىِّ اِلَّا اِذَا اَدّٰى فَفِىْ اَىِّ وَقْتٍ اَدّٰى يَكُوْنُ ذٰلِكَ الْوَقْتُ مُتَعَيِّنًا وَاِنْ لَمْ يُؤَدِّ فِيْمَا عَيَّنَه بَلْ فِىْ جُزْءٍ اٰخَرَ لَا يُسَمّٰى قَضَاءً - كَالْحَانِثِ فِى الْيَمِيْنِ فَاِنَّهُ يَتَخَيَّرُ فِىْ كَفَّارَتِهَا بَيْنَ ثَلٰثَةِ اَشْيَاءٍ : اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ اَوْ كِسْوَتُهُنَّ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ، فَاِنْ عَيَّنَ وَاحِدًا مِنْهَا بِاللِّسَانِ اَوْ بِالْقَلْبِ لَا يَتَعَيَّنُ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى مَالَمْ يُؤَدِّهِ فَاِذَا اَدّٰى صَارَ مُتَعَيِّنًا وَاِنْ اَدّٰى غَيْرَ مَا عَيَّنَهُ اَوَّلًا يَكُوْنُ مُؤَدِّيًا -

অনুবাদ ॥ ***'আর আদায় করা ব্যতীত নির্দিষ্টকরণ দ্বারা তা নির্দিষ্ট হবে না'।*** অর্থাৎ, যদি কোন ব্যক্তি ওয়াক্তের প্রথমাংশকে অথবা মধ্যাংশকে অথবা শেষাংশকে নির্দিষ্ট করে, তবে তার এ মৌখিক অথবা ইচ্ছাকৃত নির্দিষ্টকরণের দ্বারা তা নির্দিষ্ট হবে না। যতক্ষণ না সে নামায আদায় করবে। সুতরাং যে সময়ে সে আদায় করবে, তখন তা নির্দিষ্ট হয়ে যাবে।

যদি তার নির্ধারিত সময়ে আদায় না করে, বরং অন্য সময়ে আদায় করে, তবে তাকে কাযা বলা যাবে না। ***যেমন- শপথ ভঙ্গকারী।*** কেননা, তাকে কাফফারার ব্যাপারে তিনটি বিষয়ের একটি যথা- দশজন মিসকীনকে খাদ্যদান, অথবা তাদেরকে বস্ত্রদান অথবা দাসমুক্ত করার এখতিয়ার রয়েছে। সুতরাং, এগুলো থেকে সে যে কোন একটিকে নির্দিষ্ট করবে সে তা আদায় না করা পর্যন্ত আল্লাহর কাছে তা নির্দিষ্ট হবে না। যদি সে আদায় করে, তবে তা নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি সে প্রথমতঃ যা নির্দিষ্ট করেছে তাছাড়া অন্য কোনটি, আদায় করে তবে সে আদায়কারী গণ্য হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله وَلَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِيْنِ الخ : মানার গ্রন্থকার বলেন– মুকাল্লাফ ব্যক্তি যদি ওয়াক্তের কোনো অংশকে মুখে বা অন্তরের নামাযের জন্য নির্দিষ্ট করে নেয় তাহলে তা নির্দিষ্ট হবে না। বরং যে অংশে নামায আদায় করবে সে অংশই নির্দিষ্ট হবে। অর্থাৎ কেবল মামূরবিহী কাজ আদায় করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। সুতরাং নিজের নির্দিষ্টকৃত ওয়াক্তের অংশে যদি নামায আদায় না করে অন্য অংশে আদায় করে তাহলে এ নামায কাযা বিবেচিত হবে না। বরং আদা গণ্য হবে। কেননা যে বস্তু প্রশস্ত সময়ে ওয়াজিব হয় তাকে সময়ের যে অংশেই আদায় করা হোক তাকে আদায়ই বলা হবে।

শাফেয়ীগণ বলে থাকেন যে, সময়ের প্রথম অংশ আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট। আর যা প্রথম অংশ ছাড়া অন্য অংশে পড়া হয় তা কাযা হবে, আদায় হবে না। কোনো কোনো হানাফী আলিম বলেন যে, ওয়াক্তের শেষ অংশ আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট। আর প্রথম অংশে আদায় করলে নামায নফল হবে। তবে তার দ্বারা ফরয রহিত হয়ে যাবে। এসব ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন কথা। কেননা নির্দেশদাতা ওয়াক্তের মধ্যে প্রশস্তা রেখেছেন। অতএব ওয়াক্তের অংশের মধ্য থেকে প্রত্যেক অংশ হুকুম পালনের ওয়াক্ত বিবেচিত। এখন যদি প্রথম বা শেষ অংশ নির্দিষ্ট করে তাহলে ওয়াক্তকে সংকীর্ণ করা ও নির্দেশের খেলাপ করা সাব্যস্ত হবে। আদায় করা ছাড়া ওয়াক্তের কোনো অংশ নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না।

এর উদাহরণ এই যে, কোনো ব্যক্তি যদি তার কছমের বিপরীত আমল করে তার কছম ভঙ্গ করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার কাফফারায় তিনটি বস্তুর এখতিয়ার দিয়েছেন। ১. ১০জন মিসকীনকে আহার করানো, ২. তাদেরকে কাপড় পরিধান করানো, ৩. একটি গোলাম আযাদ করা। এই তিনটির কোনটিতে সক্ষম না হলে সে ৩টি রোযা রাখবে। উপরোক্ত ৩টি বিষয় এবং ৩ রোযার মধ্যে কোনো এখতিয়ার নেই। বরং রোযার মাধ্যমে কাফফারা আদায়

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

أَوْ يَكُونَ مِعْيَارًا لَهُ وَسَبَبًا لِوُجُوبِهِ كَشَهْرِ رَمَضَانَ عطف على قوله اما ان يكون ظَرْفًا وهُوَ النَّوْعُ الثَّانِى مِنَ الاَنْوَاعِ الاَرْبَعَةِ لِلْمُؤَقَّتِ ولَا فَرْقَ بَيْنَهُ وبَيْنَ الْقِسْمِ الاوّلِ اِلاّ بِكَوْنِ الاوّلِ ظَرفًا وهٰذا معيارًا والمِعْيَارُ هُوَ الّذى اسْتَوْعَبَ المُؤَقّت ولا يَفضُلُ عَنْه فيَطُوْلُ بِطُوْلِهِ ويَقصُرُ بقَصْرِه فاِنّ الصَّومَ يطُول بطُول النّهار ويَقصُر بقَصْرِه فيَكونُ مِعْيَارًا وهُوَ سببٌ لِوُجوبِه ايضًا وقَدْ اُخْتُلِفَ فِيْهِ فقِيْلَ الشَّهْرُ كلُّه سببٌ لِلصّوم وقِيْل الاَيّامُ فَقَطْ دُون اللّيَالِىْ ثم قِيل الجُزْءُ الْاَوّلُ مِن الشَّهرِ سببٌ لِوُجُوبِ صَوْمِ تمامِ الشَّهرِ وقِيْل اوّلُ كلّ يومٍ سببٌ لِصَوْمِه عَلٰحدةً وقد ذَكَرْنا كُلَّه فِى التّفسِيْرِ الاَحْمَدِىّ ولَمْ يَذْكُرْ هٰهُنا كَوْنَهٗ شرطًا لِلاداءِ مَعَ انّه شرطًا لِلاداءِ ايضًا اِكْتِفاءً بِالْقَرائِنِ -

---

অনুবাদ॥ ***অথবা ওয়াক্ত*** امر موقت ***এর জন্যে*** معيار ***হবে এবং তা ওয়াজিব হওয়ার জন্যে সবাব হবে। যেমন- রমযান মাস।*** এটা গ্রন্থকারের উক্তি। إِمَّا اَنْ يَكُوْنَ الْوَقْتُ ظَرْفًا এর ওপর عطف হয়েছে। এটা হলো امر موقت এর চার প্রকারের মধ্য থেকে দ্বিতীয় প্রকার। এর মাঝে এবং প্রথম প্রকারের মাঝে কেবল এতটুকু পার্থক্য যে, প্রথমটিতে সময় ظرف আর এর মধ্যে সময় হলো معيار বা মানদণ্ড। আর معيار টা মুয়াক্কাতকে বেষ্টন করে নেয়, তা থেকে পৃথক হয় না। কাজেই معيار এর বৃদ্ধির কারণে موقت বৃদ্ধি পায় এবং معيار হ্রাসের কারণে موقت ও হ্রাস পায়। এ কারণে দিন দীর্ঘ হওয়ার দ্বারা

(পূর্বের বাকী অংশ)

করার অনুমতি ঐসময়ই লাভ হবে যখন উপরোক্ত ৩টির কোনোটির উপর সক্ষম না হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন فَكَفَّارَتُهٗ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْكِسْوَتُهُمْ اَوْتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ

অর্থাৎ কছমের কাফফারা হলো ১০ জন মিসকীনকে আহার দান করা মধ্যম পর্যায়ের যা তোমরা নিজেরা আহার করে থাকো। কিংবা ১০ জন অভাবীকে বস্ত্র দান করা অথবা ১টি গোলাম আযাদ করা। আর যে এর কোনোটিতে সক্ষম না হবে সে ৩টি রোযা রাখবে"।

মোটকথা যে ৩টি বিষয়ের মধ্যে শরীআতে কছমের কাফফারা দেয়ার এখতিয়ার দিয়েছে কছম ভঙ্গকারী যদি এগুলোর কোনো ১টিকে মুখে বা অন্তরে নির্দিষ্ট করে নেয় তাহলে তা আল্লাহ তা'আলার নিকট ঐ সময় পর্যন্ত নির্দিষ্ট হবে না যতোক্ষণ সে তা আদায় করবে। হ্যা, যদি সে আদায় করে তখন তা নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। যদি সে যা নির্দিষ্ট করেছিলো তা ছাড়া অন্য একটি আদায় করে যেমন মুখে বা অন্তরে ১০জন মিসকীনকে আহার দান করাকে নির্দিষ্ট করেছিলো। কিন্তু পরবর্তীতে এর স্থলে ১টি গোলাম আযাদ করলো। তাহলে আযাদ করা-ই তার জন্য আদা হবে, কাযা হবে না। এভাবে যদি নির্দিষ্টকৃত ওয়াক্তের কোনো অংশ ছাড়া ভিন্ন ওয়াক্তে নামায পড়ে তাহলেও তা আদায় বিবেচিত হবে। কাযা বিবেচিত হবে না।

রোযা দীর্ঘ হয় এবং দিন ছোট হওয়ার কারণে রোযাও ছোট হয়। সুতরাং. এটা রোযার জন্যে معيار আর তা রোযা ওয়াজিব হওয়ার জন্যে সবাবও বটে। রোযা ওয়াজিব হওয়ার سبب এর ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, রোযা ওয়াজিব হওয়ার জন্যে সম্পূর্ণ মাসটিই হলো সবাব।

আবার কেউ কেউ বলেন, শুধু দিনগুলো সবাব, রাতসমূহ নয়। আবার কেউ কেউ বলেন যে, মাসের প্রথমাংশ সম্পূর্ণ মাসের রোযা ওয়াজিব হওয়ার জন্যে সবাব। কেউ কেউ বলেন, প্রত্যেক দিনের প্রথমাংশ এ দিনের রোযার জন্যে স্বতন্ত্র সবাব। (ব্যাখ্যাকার বলেন) আমি এ সকল কিছু তাফসীরে আহমদীতে উল্লেখ করেছি। সময় আদায়ের জন্য শর্ত হওয়া সত্ত্বে আলামতের ওপর যথেষ্ট করে এখানে সময় আদায়ের জন্যে শর্ত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়নি।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ قوله أَوْ يَكُوْنَ مِعْيَارًا الخ : পূর্বে বর্ণিত হয়েছিলো যে, امر مقيد بالوقت তথা সময় সংশ্লিষ্ট আমর ৪ প্রকার। তন্মধ্য থেকে প্রথম প্রকার (ওয়াক্তটা আদায়কৃত কাজের জন্য যরফ, আদায় করার জন্য শর্ত এবং ওয়াজিব হওয়ার জন্য সবাব) এর বর্ণনা চলে গেছে। দ্বিতীয় প্রকার হলো ওয়াক্তটা فعل مامور به এর জন্য معيار এবং তা ওয়াজিব হওয়ার জন্য সবাব হবে। যেমন- রমযান মাস। ব্যাখ্যাকার বলেন- এই ইবারতটি পূর্বের ইবারত اما ان يكون ظرفا এর উপর মা'তূফ এবং امرمقيد بالوقت এর দ্বিতীয় প্রকার।

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে পার্থক্য : প্রথম প্রকারে ওয়াক্তটা যরফ। আর দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে - معيار. معيار ঐটাকে বলে যা ওয়াক্ত সংশ্লিষ্ট মামূরবিহী কাজকে বেষ্টন করে নেয় এবং মামূরবিহী কাজ আদায় করে নেয়ার পরে معيار এর কোনো অংশ অবশিষ্ট থাকে না। বরং معيار (সময়) বৃদ্ধির সাথে সাথে মামূরবিহী কাজও বৃদ্ধি পায়। এভাবে معيار সংকুচিত হওয়ার কারণে মামূরবিহী কাজও সংকুচিত হয়: যেমন রোযা। গ্রীষ্মকালে দিন প্রলম্বিত হওয়ার দ্বারা রোযাও প্রলম্বিত হয় এবং শীতকালে দিন ছোট হওয়ার কারণে রোযাও ছোট হয়ে যায়। সুতরাং ওয়াক্ত হলো রোযার জন্য معيار আর এই সময়টাই রোযা ওয়াজিব হওয়ার জন্য সবাব। কারণ রোযা রমযান মাসের প্রতি মুযাফ হয়। যেমন বলা হয় صوم رمضان আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ তোমাদের মধ্য থেকে যে রমযান মাস পায় সে যেন রমযানের রোযা রাখে। মোটকথা রোযা রমযান মাসের দিকে মুযাফ হয়। আর ইযাফতটা সবাব হওয়ার দলিল। অতএব রমযান মাস তথা রমযানের সময়টা রোযা ওয়াজিব হওয়ার জন্য সবাব। তবে اسباب وجوب এর মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

১. কারো মতে রমযানের পূর্ণ মাস রোযার জন্য সবাব। এর দলিল পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, রোযা রমযানের প্রতি মুযাফ হয়। আর ইযাফত হলো সবাব হওয়ার দলিল অর্থাৎ মুযাফ ইলায়হে মুযাফের জন্য সবাব হয়। তবে এ উক্তি অনুযায়ী মুসাববাব সবাবের উপরে মুকাদ্দাম হওয়া জরুরি হয়। তা এভাবে যে, রমযানের প্রথম দিনের রোযা রমযানের উপর মুকাদ্দাম হবে। কারণ সবাব মুসাববাবের উপর মুকাদ্দাম হওয়াই স্বাভাবিক।

এর উত্তর এই যে, সবাব হলো রমযানের পূর্ণ মাস। আর পূর্ণ মাসের মধ্যে প্রথম দিনও শামিল রয়েছে। সুতরাং মাসের উপর মুকাদ্দাম হওয়া জরুরি হবে না। কাজেই সবাবের উপর মুসাববাব মুকাদ্দাম হওয়াও জরুরি হয় না। অতএব পূর্ণ মাসকে রোযার সবাব সাব্যস্ত করায় কোনো ক্ষতি নেই।

২. কারো মতে রোযার সবাব হলো শুধু দিন। রমযানের রাত রোযা ওয়াজিব হওয়ার সবাব নয়। এর দলিল এই যে, কোনো বস্তুর সবাব উক্ত বস্তু আদায় করার জন্য محل বা ক্ষেত্র হয়। আর রোযা আদায় করার ক্ষেত্র হলো দিন; রাত নয়। সুতরাং দিনই রোযা ওয়াজিব হওয়ার জন্য সবাব হবে। এ ব্যাপারে রাতের কোনো দখল নেই।

দ্বিতীয় দলিল : রাত রোযার পরিপন্থী। কারণ রোযা বলা হয় সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও সহবাস থেকে বিরত থাকাকে। আর রাতে এসব কাজ জায়েয। কাজেই রাত রোযার বিপরীত হলো। আর কোনো বস্তু তার বিপরীত বস্তুর সবাব বা কারণ হতে পারে না। কাজেই রাত রোযার জন্য কিভাবে সবাব হতে পারে?

প্রথম দলিলের উপর এ প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, কোনো বস্তুর সবাবের জন্য এটা আবশ্যক নয় যে, তা উক্ত বস্তু আদায় করার জন্য ক্ষেত্রও হবে। যেমন এক ব্যক্তি নামাযের শেষ ওয়াক্তে মুসলমান হলো। এই সময়টা উক্ত নামায ওয়াজিব হওয়ার জন্য সবাব তবে উক্ত সময়ে নামায আদায় করা সম্ভব নয়। কারণ সে সময় দ্বারা উদ্দেশ্য তাহরীমা পরিমাণ সময় থাকা। আর এতো স্বল্প সময়ে নামায আদায় না হওয়াই সুস্পষ্ট।

এর উত্তর এই যে, এতো সংকীর্ণ সময়ে নামায আদায় করা সম্ভব। তা এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা অস্বাভাবিকভাবে সংকীর্ণ সময়কে প্রলম্বিত করতে পারেন যেমন قدرت مطلقه এর অধীনে বিস্তারিত আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে।

৩. কোনো কোনো আলিম বলেন– মাসের প্রথম অংশ পূর্ণ মাসের রোযা ওয়াজিব হওয়ার জন্য সবাব। এর দলিল এই যে, যদি কোনো ব্যক্তি রমযানের প্রথম রাতে রোযার যোগ্য থাকে। এরপর সুবহে সাদিকের পূর্বে সে পাগল হয়ে যায়। আর রমযান অতিক্রান্ত হওয়ার পরে সুস্থ হয়ে যায়। তাহলে এ ব্যক্তির উপর সকল রোযা কাযা করা জরুরি। অতএব কাযা জরুরি হওয়া এ বিষয়ের দলিল বহন করে যে, তার উপর রমযানের রোযা ওয়াজিব ছিলো। আর এটা তখনই সম্ভব যখন রমযানের প্রথম অংশ রোযা ওয়াজিব হওয়ার সবাব হবে। মোটকথা রমযানের প্রথম অংশ রোযা ওয়াজিব হওয়ার সবাব হওয়া সুপ্রমাণিত।

৪. কোনো কোনো আলিম বলেন– প্রত্যেক দিনের প্রথম অংশ সেদিনের রোযা ওয়াজিব হওয়ার জন্য ভিন্ন সবাব। কারণ প্রত্যেকটি রোযা ভিন্ন ইবাদত। এ কারণে এক রোযা নষ্ট হওয়ার দ্বারা অন্য রোযা নষ্ট হয় না। সুতরাং প্রত্যেক রোযা যেহেতু ভিন্ন ইবাদত। কাজেই প্রত্যেক রোযার সবাবও ভিন্ন হবে। কারণ ভিন্ন ভিন্ন মুসাববাবের জন্য সবাবও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। অতএব প্রমাণিত হলো যে, প্রত্যেক দিনের প্রথম অংশ সেদিনের রোযার সবাব।

৫. কারো কারো মতে প্রত্যেক রাতের শেষ অংশ পরবর্তী দিনের সবাব। এর কারণ এই যে সবাব মুসাববাদের উপর মুকাদ্দাম হওয়া জরুরি। আর এটা এক্ষেত্রেই সম্ভব। চতুর্থ উক্তি মতে সম্ভব নয়।

সারকথা এই যে, চতুর্থ ও পঞ্চম উক্তির সার হলো প্রত্যেক রোযা ভিন্ন সবাব। পার্থক্য এতোটুকু যে চতুর্থ উক্তি মতে প্রত্যেক দিনের প্রথম অংশ সেদিনের রোযার সবাব। আর পঞ্চম উক্তি মতে রাতের শেষাংশ পরবর্তী দিনের সবাব। মাতিন (র) বলেন– এসব বিশ্লেষণ তাফসীরে আহমদীতে উল্লেখিত হয়েছে।

وَلَمْ يَذْكُرْ هٰهُنَا كَوْنَهُ شَرْطًا الخ : এটা একটা প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন : সময় যেভাবে মামূরবিহী কাজের জন্য معيار এবং তা ওয়াজিব হওয়ার জন্য সবাব হয়। তদ্রূপ আদার জন্যও শর্ত হয়ে থাকে। কিন্তু মাতিন (র) এর শর্ত হওয়াকে উল্লেখ করেননি। এর কারণকি?

উত্তর : قرينه তথা আলামতের উপর নির্ভর করে এটাকে উল্লেখ করেননি। কারণ যে জিনিস সময়ের সাথে নির্ধারিত হয় সময়টা তা আদায় করার জন্য অবশ্যই শর্ত হয়ে থাকে। এটা সকলেরই জানা কথা। এ কারণে তিনি তা উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করেননি। পক্ষান্তরে সবাব এবং معيار এমন নয়।কারণ সময় কখনো কখনো সবাব হয় না। যেমন নির্দিষ্ট দিনের মান্নতের রোযার ক্ষেত্রে মান্নত রোযা ওয়াজিব হওয়ার সবাব ওয়াক্ত নয়। ওয়াক্ত কখনো কখনো معيار হয় না। নামাযের ওয়াক্ত নামাযের জন্য معيار নয়। সুতরাং ওয়াক্ত সবাব এবং معيار হওয়া যেহেতু জরুরি নয় এই জন্যেই এ দুটোকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

ثُمَّ فَرَّعَ عَلٰى كَوْنِهٖ مِعْيَارًا فَقَالَ فَيَصِيْرُ غَيْرُهٗ مَنْفِيًّا اى لَمَّا كَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ مِعْيَارًا لِلصَّوْمِ يَصِيْرُ غَيْرُ الْفَرْضِ مَنْفِيًّا فِىْ رَمَضَانَ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِذَا انْسَلَخَ شَعْبَانُ فَلَا صَوْمَ اِلَّا عَنْ رَمَضَانَ وَلَا تُشْتَرَطُ نِيَّةُ التَّعْيِيْنِ بِاَنْ يَقُوْلَ بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ بِفَرْضِ رَمَضَانَ لِاَنَّ هٰذَا التَّعْيِيْنَ اِنَّمَا شُرِعَ فِى الصَّلٰوةِ لِكَوْنِ وَقْتِهَا ظَرْفًا صَالِحًا لِغَيْرِهَا اَيْضًا وَهُوَ مُنْتَفٍ هٰهُنَا وَقَالَ الشَّافِعِىُّ رح لَابُدَّ مِنْ تَعْيِيْنِ النِّيَّةِ قِيَاسًا عَلَى الصَّلٰوةِ وَقَالَ زُفَرُ رح لَا حَاجَةَ اِلٰى اَصْلِ النِّيَّةِ اَيْضًا لِاَنَّهٗ مُتَعَيِّنٌ بِتَعْيِيْنِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَخَيْرُ الْاُمُوْرِ اَوْسَطُهَا وَهُوَ فِيْمَا قُلْنَا

অনুবাদ ॥ অতঃপর মুসান্নিফ (র) ওয়াক্ত معيار হওয়ার ব্যাপারে শাখা মাসআলা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ***"সুতরাং موقت ছাড়া অন্যসব منفى তথা নেতিবাচকতা পরিত্যক্ত হয়ে যাবে"।*** অর্থাৎ, যেহেতু রমযান মাস রোযার জন্যে معيار বা মানদণ্ড। তাই ফরয রোযা ব্যতীত অন্যসব পরিত্যক্ত হয়ে যাবে। যেমন– রাসূল (স) বলেছেন, যদি শাবান মাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে রমযানের রোযা ছাড়া কোন রোযা নেই। ***আর এখানে নির্দিষ্টকরণের নিয়্যত শর্ত নয়"।*** (অর্থাৎ) এভাবে বলা যে, আমি আগামীকল্য রমযানের ফরয রোযা রাখার নিয়্যত করলাম। কেননা, এ ধরনের নির্দিষ্টকরণ নামাযের মধ্যে বিধান করা হয়েছে এর ওয়াক্ত অন্যান্য নামাযের জন্যে যরফ এবং উপযুগী হওয়ার কারণে। আর এখানে তা অনুপস্থিত।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, নামাযের ওপর কিয়াস করে রোযারও নিয়্যত নির্দিষ্ট করা জরূরী। ইমাম যুফার (র) বলেন, মূল নিয়্যতেরও কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, রমযানের রোযা আল্লাহর নির্দিষ্টকরণের দ্বারা নির্দিষ্ট রয়েছে। আর "কাজের মধ্যমপন্থাই উত্তম"। আর মধ্যমপন্থা হলো "আমরা যা তার মধ্যে উল্লেখ করেছি"।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله ثُمَّ فَرَّعَ عَلٰى كَوْنِهٖ مِعْيَارًا الخ : ওয়াক্ত যেহেতু রোযার জন্য معيار এ কারণে মুসান্নিফ (র) এ ব্যাপারে শাখা মাসআলা বয়ান করছেন। তিনি বলেন– রমযান মাসে রমযান ছাড়া ভিন্ন রোযা জায়েয নয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (স) এরশাদ করেছেন– যখন শা'বান মাস শেষ হয়ে যায় তখন রমযান ছাড়া অন্য কোনো রোযা রাখা যায় না। এ কারণে কোনো ব্যক্তি যদি রমযান মাসে নফল কিংবা অন্য কোনো রোযার নিয়ত করে তাহলে রমযানের রোযাই আদায় হয়। উক্ত নফল কিংবা ওয়াজিব রোযা আদায় হয় না। কেননা সে মূল রোযার নিয়ত করেছে। সাথে সাথে রোযার বিশেষণ অর্থাৎ নফল বা ভিন্ন ওয়াজিবেরও নিয়ত করেছে। আর ওয়াক্ত তথা রমযান কেবল মূল রোযার যোগ্যতা রাখে। অন্য কোনো বিশেষণ অর্থাৎ নফল কিংবা ভিন্ন ওয়াজিবের যোগ্যতা রাখে না। একারণেই উক্ত বিশেষণ বাতিল হয়ে মূল রোযা অবশিষ্ট থাকবে। আর মূল রোযার নিয়তের দ্বারা যেহেতু রমযানের রোযা আদায় হয়ে যায় এই কারণেই নফল বা ভিন্ন কোনো ওয়াজিবের নিয়ত দ্বারাও রমযানের রোযা আদায় হয়ে যাবে।

قوله وَلَا تُشْتَرَطُ التَّعْيِيْنُ الخ : মানার গ্রন্থকার বলেন– রমযান মাস যেহেতু রোযার জন্য معيار এ কারণে রমযানে রোযা রাখার জন্য নির্দিষ্ট করার নিয়ত করা শর্ত নয়। অর্থাৎ অন্তরে বা মুখে এমন বলা জরুরি নয় যে, আমি আগামীকাল রমযানের রোযা রাখবো। বরং কেবল রোযা রাখবো এতোটুকু বলাই যথেষ্ট।

এর দলিল এই যে, নামাযের মধ্যে নির্দিষ্ট করণের নিয়ত করা এজন্য জরুরি সাব্যস্ত হয়েছে যে, নামাযের ওয়াক্ত যরফ হওয়ার কারণে ওয়াক্তিয়া এবং ওয়াক্তিয়া ছাড়াও ভিন্ন নামাযেরও যোগ্যতা রাখে। একারণেই ওয়াক্তিয়াকে নির্দিষ্ট করার জন্য নির্দিষ্টকরণের নিয়ত করা শর্ত সাব্যস্ত হয়েছে। আর রমযান মাস معيار হওয়ার কারণে যেহেতু তাতে রমযান ছাড়া ভিন্ন কোনো রোযা বৈধ নয়। এই কারণেই নির্দিষ্ট করণের নিয়ত করা শর্ত সাব্যস্ত হয়নি।

وقال الشافعي او الخ : হযরত ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন– নামাযের উপর কিয়াস করে রমযানের রোযার মধ্যেও নির্দিষ্ট করণের নিয়ত করা শর্ত।

দলিল এই যে, যদি রমযানের রোযা মূল রোযা অথবা নফল রোযা কিংবা ভিন্ন কোনো ওয়াজিব রোযার নিয়ত দ্বারা আদায় হয়ে যায়। যেমন হানাফীগণ বলে থাকেন। তাহলে বান্দার জন্য ইবাদতের বিশেষণে বাধ্য হওয়া জরুরি সাব্যস্ত হয়। তা এভাবে যে, বান্দা কোনো قربت তথা কোনো রোযার জন্য নিজেকে পানাহার ও সহবাস থেকে বিরত রাখবে। কিন্তু সে ফরয ইবাদত অর্থাৎ রমযানের রোযার জন্য বিরত রাখা সাব্যস্ত হবে। চাই সে তা ইচ্ছা করুক বা না করুক। আর এটাই বাধ্য করার নামান্তর। অথচ বান্দা ইবাদত ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাধ্য নয়। বরং ইচ্ছাধীন। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, রমযানের রোযা রমযান মাসে তখনই আদায় হবে যখন বান্দা রমযানের রোযা নির্দিষ্ট করার নিয়ত করবে। মুতলাক রোযা কিংবা নফল রোযা অথবা ভিন্ন কোনো ওয়াজিব রোযার নিয়ত দ্বারা রমযানের রোযা আদায় হবে না।

আমাদের পক্ষ থেকে এর উত্তর : রমযান মাস রমযানের রোযার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকেই নির্ধারিত। কারণ রমযান মাসে রমযানের রোযা ছাড়া অন্য কোনো রোযা রাখা বৈধ নয়। অতএব কোনো ব্যক্তি যখন স্বাভাবিক রোযার নিয়ত করবে। তার দ্বারা রমযানের রোযা সহীহ হবে এবং রোযাকে অন্য কোনো বিশেষণের সাথে বিশেষিত করা ছাড়াই নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। যেমন কোনো ঘরে যদি কেবল খালেদ নামক ব্যক্তি থাকে। আর আপনি তাকে হে মানুষ বলে ডাক দেন তাহলে উক্ত ডাক দ্বারা খালেদ ব্যক্তিই নির্দিষ্টরূপে বোঝাবে। সে এমন বলতে পারবে না যে, আপনি আমাকে ডাকেননি। এভাবেই রমযান মাসে রমযানের রোযা আল্লাহর পক্ষ থেকেই নির্ধারিত। কাজেই নিয়ত দ্বারা তাকে নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই। বরং স্বাভাবিক রোযার নিয়ত দ্বারাই রমযানের রোযা বোঝাবে।

ইমাম যুফার (র) বলেন– রমযানের রোযার জন্য মূল রোযার নিয়তও জরুরি নয়। এমনকি যদি কেউ কোন নিয়তই না করে এবং রমযানের রোযা রাখে তথাপি রমযানের রোযা আদায় হয়ে যাবে। এর দলিল এই যে, রমযানের রোযা আল্লাহ তা'আলার নির্ধারণ দ্বারা নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। কাজেই রমযানের দিনে সুস্থ মুকিম ব্যক্তির পক্ষ থেকে যেকোনো ধরনের امساك তথা পানাহার ও সহবাস থেকে বিরত থাকা পাওয়া যাবে, তার দ্বারা ফরয রোযা আদায় হয়ে যাবে। মোটকথা একথা প্রমাণিত হলো যে, রমযানের রোযা আদায় করার জন্য নিয়তের কোনো প্রয়োজনই নেই।

হানাফীদের পক্ষ থেকে উত্তর : এর উত্তর এই যে, স্বাভাবিক امساك তথা পানাহার ও সহবাস থেকে বিরত থাকার দ্বারা রমযানের রোযা আদায় হবে না। বরং যে امساك দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য ও ইবাদত বোঝাবে তার দ্বারাই রমযানের রোযা নির্দিষ্ট হবে। আর নৈকট্য ও ইবাদতের নিয়ত ছাড়া কোনো ইবাদত বিশুদ্ধ হয় না। এ কারণেই امساك কে নৈকট্য ও ইবাদত বানানোর জন্য নিয়ত করা জরুরি। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, রমযানের রোযার জন্য মৌলিক নিয়ত জরুরি। নিয়ত ছাড়া রমযানের রোযা আদায় হবে না।

আহনাফের দলিল : রাসূলুল্লাহ (স) এরশাদ করেছেন– মধ্যম পন্থায় উত্তম। আর মধ্যম হওয়া আহনাফের উক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়। কারণ তারা একথা বলেন না যে, মূল নিয়ত নিষ্প্রয়োজন। আর এমনও বলেন না যে, নিয়ত নির্দিষ্ট করা জরুরি। যেমন ইমাম শাফেয়ী (র) বলে থাকেন। বরং তারা এ কথা বলেন যে, নিয়ত নির্দিষ্ট করণ তো জরুরি নয়। তবে মৌলিক নিয়ত পাওয়া যাওয়া জরুরি।

فَيُصَابُ بِمُطْلَقِ الْاِسْمِ وَمَعَ الْخَطَاءِ فِي الْوَصْفِ تفريعٌ عَلٰى مَاسَبَقَ اى فَيُصَابُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِمُطْلَقِ اِسْمِ الصَّوْمِ بِاَنْ يَقُولَ نَوَيْتُ الصَّوْمَ وَمَعَ الْخَطَاءِ فِى الْوَصْفِ اَيْضًا بِاَنْ يَنْوِىَ النَّفْلَ اَوْوَاجِبًا اُخَرَ فَلَا يَكُوْنُ اِلَّا عَنْ رَمَضَانَ وَالْمُرَاد بِهٰذَا الْخَطاءِ ضِدُّ الصَّوابِ لَا ضِدَّ الْعَمَدِ فَاِنَّ الْعَامِدِ وَالْمُخْطِى سَوَاءٌ فِى هٰذَا الْحُكْمِ -

অনুবাদ ॥ ***সুতরাং, রোযার وصف এর মধ্যে ভুল হওয়া সত্ত্বেও রমযানের রোযা শুধু রোযার নাম উল্লেখের দ্বারাই বিশুদ্ধ হবে"।*** পূর্বের ওপর ভিত্তি করে একটি শাখা মাসআলা। অর্থাৎ, রমযানের রোযা শুধু রোযার নাম উল্লেখের দ্বারাই বিশুদ্ধ হবে। এভাবে বলবে যে, আমি রোযার নিয়্যত করেছি; তদ্রূপ রোযার وصف এর বর্ণনায় ভুল হলেও রোযা বিশুদ্ধ হবে। যেমন নফল রোযার নিয়্যত করবে অথবা অন্য কোন ওয়াজিব রোযার নিয়্যত করলে রমযানের রোযা এ ক্ষেত্রে আদায় হবেই। এ خطاء বা ভুল দ্বারা সঠিকের বিপরীত অর্থ উদ্দেশ্য, ইচ্ছার বিপরীত অর্থ উদ্দেশ্য নয়। কেননা, এ ব্যাপারে স্বেচ্ছাকারী এবং ভুলকারী সমপর্যায়ের।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله تُصَابُ بِمُطْلَقِ الْاِسْمِ الخ : মতনের এই ইবারতে মাতিন (র) তার পূর্বের ভাষ্য فَيَصِيْرُ غَيْرُهُ مَنْفِيًّا এর উপর শাখা মাসআলা বর্ণনা করেছেন। এর সার এই যে, রমযানে যখন রমযান ছাড়া ভিন্ন রোযা জায়েয নয় তাহলে রমযানের রোযা কেবল মুতলাক রোযার নিয়ত দ্বারাও দুরস্ত হয়ে যাবে। যেমন কেউ অন্তরে বা মুখে বললো আমি রোযার নিয়ত করলাম। এভাবে বিশেষণের মধ্যে ভুল করা সত্ত্বেও রোযা দুরস্ত হয়ে যাবে। যেমন- কেউ রমযানে নফল রোযার নিয়ত করলো বা অন্য কোনো ওয়াজিবের নিয়ত করলো তথাপি রমযানের রোযা আদায় হয়ে যাবে। কেননা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, রমযান মাস বিশেষ কোনো বিশেষণ যথা নফল অথবা ভিন্ন কোনো ওয়াজিবের যোগ্যতা রাখে না। কাজেই রমযানে বা এ ধরনের বিশেষণ বাতিল হয়ে যাবে। আর বিশেষণ বাতিল হওয়ার দ্বারা বিশেষ্য তথা মূল রোযা বাতিল হওয়া জরুরি হয় না। অতএব রোযার বিশেষণ বাতিল হওয়ার সত্বে মূল রোযা বহাল থাকবে। অর মূল রোযার দ্বারা রমযানের রোযা যেহেতু আদায় হয়ে যায়। এ কারণে নফল বা ভিন্ন কোনো ওয়াজিবের নিয়তে রোযা রাখলে তা দ্বারা রমযানের রোযা আদায় হয়ে যাবে।

قوله وَالْمُرَادُ بِهٰذَا الْخَطَاءِ الخ : নুরুল আনওয়ার গ্রন্থকার বলেন- মতনে উল্লেখিত ভুল দ্বারা صواب (সঠিক) এর বিপরীত উদ্দেশ্য عمد (ইচ্ছা) এর বিপরীত উদ্দেশ্য নয়। কেননা রমযানে নফল বা ভিন্ন কোনো ওয়াজিব রোযার ইচ্ছাপূর্বক নিয়তকারী এবং ভুলবশত নিয়তকারী উভয়ে সমপর্যায়ের। রমযানে صواب এই যে, রমযানের নিয়ত করবে। কিন্তু সে যখন নফল বা ভিন্ন কোনো ওয়াজিবের নিয়ত করলো তখন তা ভুল সাব্যস্ত হবে। চাই সে ইচ্ছাপূর্বক নিয়ত করুক বা ভুলবশত। উভয় ক্ষেত্রে রমযানের রোযা আদায় হয়ে যাবে। নফল বা ভিন্ন কোনো রোযা আদায় হবে না।

اِلاَّ فِي الْمُسَافِرِ يَنْوِي وَاجِبًا اٰخَرَ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رح اِسْتِثْنَاءٌ مِّنْ مُقَدَّرٍ اَيْ يُصَابُ رَمَضَانُ مَعَ الْخَطَاءِ فِي الْوَصْفِ فِيْ حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ اِلاَّ فِي الْمُسَافِرِ حَالَ كَوْنِهٖ يَنْوِيْ فِيْ رَمَضَانَ وَاجِبًا اٰخَرَ مِنَ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ فَاِنَّهٗ يَقَعُ عَمَّا نَوٰى لَا عَنْ رَمَضَانَ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رح لِاَنَّ وُجُوْبَ الْاَدَاءِ لَمَّا سَقَطَ فِيْ حَقِّهٖ يَتَخَيَّرُ بَعْدَ ذٰلِكَ بَيْنَ الْاَكْلِ وَ بَيْنَ وَاجِبٍ اٰخَرَ وَعِنْدَهُمَا لَا يَصِحُّ لِاَنَّ شُهُوْدَ الشَّهْرِ مَوْجُوْدٌ فِيْ حَقِّهٖ كَالْمُقِيْمِ وَاِنَّمَا رُخِّصَ لَهٗ بِالْاِفْطَارِ لِلْيُسْرِ فَاِذَا لَمْ يَتَرَخَّصْ عَادَ حُكْمُهٗ اِلَى الْاَصْلِ فَلَا يَقَعُ عَمَّا نَوٰى بَلْ عَنْ رَمَضَانَ ـ

অনুবাদ ॥ ***"কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, মুসাফিরের জন্যে (ব্যতিক্রম), সে অন্য ওয়াজিবেরও নিয়্যত করতে পারবে"।*** এটি একটি উহ্য বাক্য হতে استثناء। অর্থাৎ, বিশেষণের মধ্যে ভুল হওয়া সত্ত্বেও সকলের ক্ষেত্রে রমযানের রোযা বিশুদ্ধ হবে। কিন্তু মুসাফিরের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ হবে না। যখন সে রমযানের মধ্যে অন্য ওয়াজিবের কাযা এবং কাফফারার নিয়্যত করে। এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, মুসাফির যে রোযার নিয়্যত করবে তাই আদায় হবে। রমযানের রোযা আদায় হবে না। কেননা, وجوب اداء যখন তার যিম্মা হতে ছুটে গেছে তখন তার এখতিয়ার রয়েছে, পানাহার করার বা অন্য ওয়াজিব আদায়ের। আর সাহেবাইনের মতে, এমতাবস্থায় অন্য ওয়াজিব রোযা শুদ্ধ হবে না। কেননা, মুসাফিরের ক্ষেত্রে মুকীমের মত (রমযান) মাস প্রত্যক্ষ করা বিদ্যমান রয়েছে।

এবং মুসাফিরকে শুধু কষ্ট লাঘবের জন্যে রোযা ভঙ্গের অবকাশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং, যখন সে অবকাশ গ্রহণ করলো না, তখন তার হুকুম মূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। অতএব, মুসাফিরের রোযা তার নিয়্যত মোতাবেক আদায় হবে না; বরং রমযানের রোযা-ই আদায় হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله اِلاَّ فِي الْمُسَافِرِ يَنْوِي الخ : নূরুল আনওয়ার গ্রন্থকার বলেন– لا فى المسافر الخ হলো ইসতেসনা। এর মুসতাসনা মিনহু উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ خطاء فى الوصف (বিশেষণের মধ্যে ভুল করা) স্বত্বে প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে রমযানের রোযা দুরস্ত হবে। তবে মুসাফির যদি রমযানে ভিন্ন কোনো ওয়াজিব যথা কাযা বা কাফফারার নিয়ত করে তাহলে আবু হানীফা (র) এর মতে যা নিয়ত করবে তাই আদায় হবে। রমযানের রোযা আদায় হবে না।

দলিল : মুসাফিরের ক্ষেত্রে যেহেতু وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْعَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ আয়াতের কারণে রোযা আদায় ওয়াজিব হওয়া রহিত হয়ে গেছে। কাজেই তার ব্যাপারে রমযান, শাবান একই পর্যায়ের। শাবান মাসে যেমন প্রত্যেক মানুষের এখতিয়ার আছে যে, সে রোযা না রাখতে পারে বা অন্য কোনো ওয়াজিব রোযা রাখতে পারে তদ্রূপ মুসাফির ব্যক্তিরও এখতিয়ার থাকবে যে, সে রমযান মাসে ইচ্ছা করলে রমযানের রোযা রাখতে পারে কিংবা ভিন্ন কোনো রোযাও রাখতে পারে। কাজেই এ অনুমতির দ্বারা ভিন্ন ওয়াজিবের নিয়ত করলে ভিন্ন ওয়াজিবই আদায় হবে।

সাহেবাইন (র) বলেন– মুসাফির ব্যক্তি যদি রমযান মাসে ভিন্ন কোনো ওয়াজিবের নিয়ত করে তাহেল তার পক্ষ থেকেও বর্তমান রমযানের রোযা-ই আদায় হবে। (অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

وَهٰذَا الْمُسَافِرُ مُتَلَبِّسٌ بِخِلَافِ الْمَرِيْضِ فَانَّه اِنْ نَوٰى نَفْلًا اَوْ وَاجِبًا اٰخَرَ لَمْ يَقَعْ عَمَّا نَوٰى لِاَنَّ رُخْصَتَه مُتَعَلِّقَةٌ بِحَقِيْقَةِ الْعِجْزِ لَا الْعِجْزُ التَّقْدِيْرِى فَاذَا صَامَ وَ تَحَمَّلَ الْمِحْنَةَ عَلٰى نَفْسِه عُلِمَ انَّه لَمْ يَكُنْ عَاجِزًا فَيَقَعُ عَنْ رَمَضَانَ وَهٰذَا هُوَ الْمُخْتَارُ وَقِيْلَ رُخْصَتُه اَيْضًا مُتَعَلِّقَةٌ بِالْعِجْزِ التَّقْدِيْرِى وَهُوَ خَوْفُ زِيَادَةِ الْمَرَضِ فَهُوَ كَالْمُسَافِرِ وَقِيْلَ فِى التَّطْبِيْقِ بَيْنَهُمَا اِنَّ الْمَرِيْضَ الَّذِى يَضُرُّبِهِ الصَّوْمُ كَمَرَضِ حُمَّى الْبَرْدِ وَوَجْعِ الْعَيْنِ فَرُخْصَتُه مُتَعَلِّقَةٌ بِخَوْفِ اِزْدِيَادِ الْمَرَضِ وَالْعِجْزِ التَّقْدِيْرِى وَالْمَرِيْضُ الَّذِىْ لَايَضُرُّبِهِ الصَّوْمُ كَمَرَضِ اِمْتِلَاءِ الْبَطْنِ فَرُخْصَتُه مُتَعَلِّقَةٌ بِحَقِيْقَةِ الْعِجْزِ فَاذَا صَامَ هٰذَا الْمَرِيْضُ ظَهَرَ اَنَّه لَمْ يَكُنْ لَهُ عِجْزٌ حَقِيْقِىٌّ فَلَا يَقَعُ عَمَّا نَوٰى بَلْ عَنْ رَمَضَانَ -

---

অনুবাদ ॥ আর এ মুসাফির "রুগ্ন ব্যক্তির বিপরীত"। কেননা, রুগ্ন ব্যক্তি যদি কোন নফল অথবা অন্যকোন ওয়াজিবের নিয়্যত করে, তবে সে যা নিয়্যত করবে তা আদায় হবে না। কেননা, তার অক্ষমতা প্রকৃত অক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত, কল্পিত অক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত নয়।

সুতরাং, সে যখন রোযা রেখেছে এবং নিজে কষ্ট সহ্য করেছে, তখন বুঝা গেল যে, সে প্রকৃতপক্ষে অক্ষম ছিল না। কাজেই তার রোযা রমযানের রোযা হিসেবেই গণ্য হবে। আর এটাই গ্রহণযোগ্য মত। কেউ কেউ বলেন, তার এ অবকাশও عجزتقديرى বা কল্পিত অক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত। তা হলো রোগ বৃদ্ধির আশংকা। সুতরাং, সে মুসাফিরের মতই। উভয় মতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানকল্পে কেউ কেউ বলেন, রুগ্ন ব্যক্তি যাকে রোযা কষ্ট দেয়, যেমন সর্দি-জ্বর এবং চোখ ব্যথার রোগ। তার অবকাশ রোগ বৃদ্ধির আশংকার সাথে এবং কল্পিত অক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত। আর (এমন) রুগ্ন ব্যক্তি যাকে রোযা ক্ষতি করে না, সে হলো পেটের অসুখের মত। সুতরাং, তার অবকাশ প্রকৃত অক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত। অতএব এ রুগ্ন ব্যক্তি যখন রোযা রাখে, তখন বুঝা গেল যে, তার মধ্যে প্রকৃত অক্ষমতা ছিল না। সুতরাং, নিয়্যত মোতাবেক (তার এ রোযা) আদায় হবে না।

(পূর্বের বাকী অংশ) **দলিল :** فمن شهد منكم الشهر فليصمه আয়াতের কারণে রমযানের রোযা ওয়াজিব হওয়ার সবাব হলো মাস আগমন করা। আর রমযান মাস আগমন যেভাবে মুকীম ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিদ্যমান তদ্রূপ মুসাফিরের ক্ষেত্রেও বিদ্যমান। অতএব মুকীমের উপর যেভাবে রমযানের রোযা ওয়াজিব। তদ্রূপ মুসাফিরের উপরও ওয়াজিব। কিন্তু মুসাফিরের ব্যাপারে সহজতার লক্ষ্যে রোযা না রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এমন নয় যে, রমযানের রোযা ছাড়া অন্য কোনো রোযা তার জন্য বৈধ করা হয়েছে। মোটকথা কেবল তার সহজতার লক্ষ্যে এবং সফরের কষ্ট নিবারনার্থে তাকে রোযা না রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু সে যখন শরীআত প্রদত্ত অনুমতি বা রুখসত দ্বারা উপকার গ্রহণ করলো না বরং রোযা রাখার কষ্ট সংবরণ করলো। কাজেই তার বিধান মূলের প্রতি ধাবিত হবে। অর্থাৎ রমযান মাস আগমনের দ্বারা মুকীম ও মুসাফির উভয়ের বিধান একই রকম হবে। মুকীম যেভাবে রমযানে যে কোনো রোযা রাখলে রমযানের রোযা আদায় হয় তদ্রূপ মুসাফিরও যে রোযার নিয়তই করুক না কেন সর্বাবস্থায় রমযানের রোযা-ই আদায় হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ قوله وهذا المسافر متلبس الخ : মানার গ্রন্থকার বলেন– মুসাফিরের বিধান রুগীর বিধানের বিপরীত। অর্থাৎ রোগী যদি রমযানে নফল রোযা কিংবা ভিন্ন কোনো ওয়াজিব রোযার নিয়ত করে তাহলে নফল অথবা ভিন্ন ওয়াজিব রোযা আদায় হবে না। বরং চলতি রমযানের রোযা-ই আদায় হবে। কেননা রুগ্নব্যক্তির জন্য রোযা না রাখার অনুমতি এবং রুখসত প্রকৃত অক্ষমতার সাথে সংশ্লিষ্ট। সম্ভাব্য কল্পিত অক্ষমতার সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। অতএব রুগ্ন ব্যক্তি যদি রোযা রাখে এবং নিজের উপর কষ্ট বরদাশত করে নেয় তাহলে এটা এর পরিচায়ক হবে যে, সে অক্ষম নয়। কারণ অক্ষম হলে রোযা রাখতে সক্ষম হতো না। বস্তুত রোযা রাখা তার অক্ষম না হওয়ার দলিল। সুতরাং সে যখন অক্ষম নয়। কাজেই তার উপর চলতি রমযানের রোযা-ই ওয়াজিব হবে। রোযা না রাখার অনুমতি থাকবে না। আর যখন চলতি রমযানের রোযা রাখা ওয়াজিব হলো ও রোযা না রাখা অনুমতি থাকলো না। কাজেই সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় নফল বা ভিন্ন কোনো ওয়াজিবের নিয়ত সত্ত্বে রমযানের রোযাই আদায় হবে। মুসান্নিফ (র) এর মতে এ মতটিই অধিক পছন্দনীয়।

কোনো কোনো আলিম বলেন– রুগ্ন ব্যক্তির রোখসত সম্ভাবনা এবং অপারগ মেনে নেয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট। আর অপারগ মেনে নেয়া রোগ বৃদ্ধির আশংকা অর্থাৎ যদি রোযা রাখার দ্বারা রোগ বৃদ্ধির আশংকা থাকে তাহলে তার জন্য রোযা না রাখার অনুমতি আছে। আর রুগ্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে কেবল রোগ বৃদ্ধির আংশকা দ্বারা যেহেতু রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে। কাজেই সে মুসাফিরের ন্যায় হলো। অর্থাৎ মুসাফিরের ন্যায় রুগ্ন ব্যক্তিও নফল কিংবা ভিন্ন কোনো ওয়াজিব রোযার নিয়ত করলে নিয়ত মোতাবেকই রোযা আদায় হয়ে যাবে। রমযানের রোযা আদায় হবে না।

কোনো কোনো আলিম উপরোক্ত ২ উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছেন। তারা বলেন রোগী ২ ধরনের হতে পারে।

১. যার জন্য রোযা ক্ষতিকর। যেমন সর্দি জ্বরের রোগী ও চোখ ব্যাথার রোগী। এ রোগীর জন্য রুখসত হলো রোগ বৃদ্ধির আশংকা এবং সম্ভাবনা। রোগ মেনে নেয়ার সাথে এটা সংশ্লিষ্ট। যেমন দ্বিতীয় উক্তির প্রবক্তাগণ বলেছেন।

২. এমন রোগী যার জন্য রোযা রাখা ক্ষতিকর নয়। বরং এক দিক দিয়ে তা উপকারীও বটে। যেমন– বদ হজমের রোগী। এর জন্য রুখসত প্রকৃত অক্ষমতার সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন প্রথম উক্তির প্রবক্তাগণ বলেছেন। সুতরাং এ রোগী যদি রোযা রাখে তাহলে এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, তার মধ্যে প্রকৃত অক্ষমতা নেই। অন্যথায় সে রোযা রাখতে পারতো না। সুতরাং এর জন্য রোযা না রাখার অনুমতি থাকবে না। সুস্থ মানুষের ন্যায় তার রোযা নিয়ত মোতাবেক আদায় হবে না। বরং সর্বাবস্থায় রমযানের রোযা-ই আদায় হবে।

وَفِى النَّفْلِ عَنْه رِوَايَتَانِ مُتَعَلِّق بِقَوْله يَنْوِى وَاجِبًا اٰخَرَ اى فِى صَوْمِ النَّفْلِ لِلْمُسَافِرِ عَنْ اَبِى حَنِيْفَةَ رِوَايَتَانِ فِى رِوَايَةِ الْحَسَنِ يَقَعُ عَمَّا نَوٰى وَفِى رِوَايَةِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ رَمَضَانَ وَهٰذَا الْاِخْتِلَافُ مَبْنِىٌّ عَلٰى دَلِيْلَيْنِ لِاَبِى حَنِيْفَةَ رح نَقْلًا عنه - فَالدَّلِيْلُ الْاَوَّلُ اَنَّه لَمَّا رَخَّصَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى بِالْفِطْرِ كَانَ رَمَضَانُ فِى حَقِّه كَشَعْبَانَ وَفِى شَعْبَانَ يَصِحُّ النَّفْلُ فَكَذَا هٰهُنَا . وَالدَّلِيْلُ الثَّانِى اَنَّه لَمَّا رُخِّصَ لَهٗ بِالْفِطْرِ لِيَصْرِفَهٗ اِلٰى مَنَافِعِ بَدَنِه بِالْاِسْتِرَاحَةِ فَلَاَنْ يَصْرِفَه اِلٰى مَنَافِعِ دِيْنِه وَهِىَ قَضَاءُ مَا وَجَبَ عَلَيْه مِنَ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ اَوْلٰى لِاَنَّه اِنْ مَاتَ فِى هٰذَا الرَّمَضَانِ لَمْ يُعَاقَبْ لِاَجْلِ رَمَضَانَ وَيُعَاقَبُ بِسَبَبِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ وَالنَّفْلُ لَيْسَ اَهَمَّ لَهٗ لَا فِى مَصَالِحِ دِيْنِهٖ وَلَا فِى مَصَالِحِ دُنْيَاهُ -

---

অনুবাদ ॥ ***নফল রোযার ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা থেকে দুটি উদ্ধৃতি বর্ণিত আছে।*** এটা গ্রন্থকারের উক্তি ينوى واجبا اخر এর সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ, মুসাফিরের নফল রোযা রাখার ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে দুটি উদ্ধৃতি বর্ণিত আছে। হযরত হাসানের উদ্ধৃতিতে আছে যে, তার নিয়্যত মোতাবেক রোযা আদায় হবে। আর হযরত ইবনে সামাআর উদ্ধৃতি মোতাবেক রমযানের রোযাই আদায় হবে। এ মতানৈক্য ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণিত দুটি দলিলের ওপর ভিত্তি করে।

প্রথম দলিল : "আল্লাহ যখন মুসাফিরকে পানাহার করার অবকাশ প্রদান করেছেন, তখন রমযান মাস তার ক্ষেত্রে শাবান মাসের ন্যায়। আর শাবান মাসে নফল রোযা রাখা বিশুদ্ধ। সুতরাং, এখানে অর্থাৎ রমযান মাসেও নফল রোযা বিশুদ্ধ হবে।

দ্বিতীয় দলিল ঃ মুসাফিরকে যখন পানাহার করার অবকাশ প্রদান করা হয়েছে, যাতে এ রুখসতকে সে শারীরিক উপকারে ব্যয় করতে পারে। অতএব সে দ্বীনী কল্যাণে ব্যয় করতে পারে। তথা তার ওপরে যে কাযা ওয়াজিব রয়েছে তা পরিশোধ করা উত্তমভাবে শুদ্ধ হবে। কেননা, সে যদি এ রমযান মাসে মৃত্যুবরণ করে, তবে রমযানের রোযা না রাখার কারণে তাকে শাস্তি দেয়া হবে না। বরং কাযা এবং কাফফারার রোযা না রাখার কারণে তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে। আর তার জন্যে নফল রোযা গুরুত্বপূর্ণ নয়, দ্বীনী স্বার্থেও নয় এবং দুনিয়াবী স্বার্থেও নয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله وفى النَّفْلِ عَنْه رِوَايَتَانِ الخ : পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, মুসাফির ব্যক্তি যদি রমযানে ভিন্ন কোনো ওয়াজিব কাযা বা কাফফারার নিয়ত করে তাহলে নিয়ত মোতাবেক রোযা আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু নফল রোযার নিয়ত করলে এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে ২ ধরনের বর্ণনা রয়েছে। হাসান ইবনে যিয়াদের বর্ণনা এই যে, মুসাফিরের নিয়ত মোতাবেক নফল রোযা আদায় হয়ে যাবে। আর ইবনে সামা'আর বর্ণনা মতে নিয়ত মোতাবেক নফল রোযা আদায় হবে না। বরং চলতি রমযানের রোযা-ই আদায় হবে।

ব্যাখ্যাকার বলেন– বর্ণনার এ পার্থক্য ইমাম আবু হানীফা (র) এর ২টি দলিলের উপর ভিত্তি করে হয়েছে। প্রথম দলিল দ্বারা হাসান ইবনে জিয়াদের বর্ণনার সহায়তা লাভ হয়। তা এই যে, আল্লাহ তা'আলা যেহেতু মুসাফিরকে রমযানে রোযা না রাখার রুখসত দান করেছেন। অতএব রোযা আদায়ের ব্যাপারে মুসাফিরের জন্য রমযান ও শাবান

সমপর্যায়েয়র। আর শা'বান মাসে নফল রোযা রাখা তার জন্য বৈধ। অতএব রমযান মাসে মুসাফিরের নফল রোযাও বৈধ হবে।

এ দলিলের উপর একটি প্রশ্ন এই যে, মুসাফিরের ক্ষেত্রে রমযান মাস যেহেতু শা'বান মাসের ন্যায়। কাজেই মুসাফিরের ব্যাপারে রমযানের রোযা ওয়াজিব হওয়ার সবাব অর্থাৎ রমযান মাস আগমন না পাওয়া যাওয়ার কারণে তার উপর রোযা ওয়াজিব হওয়া সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং আদায় ওয়াজিব হওয়াও সাব্যস্ত হবে না। কারণ আদায় ওয়াজিব হওয়া نفس وجوب তথা মূল ওয়াজিব হওয়ার فرع বা শাখা। আর মুসাফিরের জিম্মায় আদায় ওয়াজিব হওয়া সাব্যস্ত নয়। সুতরাং মুসাফির যদি রমযানের রোযা আদায় করে তাহলে তার রোযা আদায় না হওয়া উচিত। কারণ ওয়াজিব হওয়ার সবাব ছাড়া কোনো ইবাদত আদায় হয় না। অথচ মুসাফির যদি রমযানের রোযা আদায় করে তাহলে তা সহীহ হয়ে যায়।

এর উত্তর এই যে, বাস্তব পক্ষে মুসাফিরের ব্যাপারে রমযান শা'বানের মত নয়। কেননা মুসাফিরের ক্ষেত্রে রোযা ওয়াজিব হওয়ার সবাব হলো রমযান। কিন্তু শাবান রোযা ওয়াজিব হওয়ার সবাব নয়। বরং রমযানে রোযা রাখা না রাখার এখতিয়ারের বিষয়ে শা'বানের মতো সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর সফরের কারণে রোযা রাখা না রাখার এখতিয়ার দ্বারা এটা জরুরি হয় না যে, মুসাফিরের ক্ষেত্রে রমযান রোযা ওয়াজিব হওয়ার সবাব হবে না। বরং এ এখতিয়ার সত্বে রমযান মুসাফিরের ক্ষেত্রে রোযা ওয়াজিব হওয়ার সবাব হবে। কাজেই মুসাফির যদি রমযানের রোযা রাখে তাহলে তার রোযা আদায় হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় দলিল : যার দ্বারা ইবনে সামাআ'র বর্ণনার সহায়তা লাভ হয়। তা এই যে, আল্লাহ তা'আলা মুসাফিরকে রমযান মাসের রোযা না রাখার অনুমতি এ কারণে দিয়েছেন যে, সে যেন তার শরীরকে আরাম দিতে পারে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা মুসাফিরকে রোযা না রাখার অনুমতি দিয়ে শারীরিক উপকার লাভের অনুমতি দিয়েছেন। অতএব কাযা বা কাফফারা রোযার দ্বারা ধর্মীয় উপকার লাভের অনুমতি আরো উত্তমরূপে হাসিল থাকা উচিত। কেননা মুসাফির যদি চলতি রমযানে মারা যায় তাহলে উক্ত রমযানের রোযা না রাখার কারণে তার উপর কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। কিন্তু তার উপর যে রোযা কাযা বা কাফফারা রয়ে গিয়েছে তার দরুন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সুতরাং বোঝা গেলো যে, মুসাফিরের ক্ষেত্রে চলতি রমযানের তুলনায় কাযা ও কাফফারার রোযা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং মুসাফির চলতি রমযানে যদি কাযা বা কাফফারার রোযা রাখে তাহলে তা আদায় হয়ে যাবে। আর মুসাফিরের ক্ষেত্রে নফল রোযা যেহেতু মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। না তার পার্থিব মঙ্গলের দিক দিয়ে, না ধর্মীয় মঙ্গলের দিক দিয়ে। এ কারণে সে যদি রমযানে নফল রোযার নিয়ত করে তাহলে নফল রোযা আদায় হবে না বরং রমযানের রোযা আদায় হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় এ দলিলের উপর এ প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, নফল রোযা যদিও রমযানের রোযা থেকে গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু রোযা না রাখার চাইতে অবশ্যই তা গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং তার জন্য রোযা না রাখার অনুমতি যেহেতু রয়েছে। সুতরাং নফল রোযা রাখার অনুমিত অবশ্যই থাকা উচিত ছিলো।

উত্তর : মুসাফিরকে রমযানের রোযা না রাখার অনুমতি উপকার লাভের উদ্দেশ্যে দেয়া হয়েছিলো। আর এ উপকার আযীমতের উপর আমল করা অর্থাৎ রোযা রাখার দ্বারা হাসিল হয় না। সুতরাং মুসাফির যদি রোযা না রাখে তার জন্য শারীরিক উপকারীরতা লাভ হবে। আর এ শারীরিক উপকারীতা রমযানের রোযার দ্বারা লাভ হয় না। মুসাফির যদি ভিন্ন ওয়াজিব রোযার কাযা করে তাহলে ১ ওয়াজিব থেকে তার দায়িত্ব মুক্ত হবে এবং আল্লাহর দরবারে পাকড়াও থেকে বেচে যাবে। এ উপকারীতাটা এরূপ যা রমযানের রোযা দ্বারা হাসিল হয় না। বাকী নফল রোযা দ্বারা মুসাফিরের শারীরিক উপকারীতা লাভ হয় না। কোনো দায়িত্ব থেকেও মুক্ত হয় না। অতএব নফল রোযা রমযানের রোযার তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ হবে না। বরং রমযানের রোযাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ হবে। এ কারণে নফল রোযার নিয়ত করলেও রমযানের রোযা-ই আদায় হবে।

او يَكُونَ مِعْيَارًا لَهُ لَا سَبَبًا كَقَضَاءِ رَمَضَانَ عَطْفٌ عَلَى السَّابِقِ وَهُوَ النَّوْعُ الثَّالِثُ مِنَ الْاَنْوَاعِ الْاَرْبَعَةِ لِلْمُؤَقَّتِ فَاِنَّ وَقْتَ الْقَضَاءِ مِعْيَارٌ بِلَا شُبْهَةٍ وَسَبَبُ وُجُوبِهِ هُوَ شُهُودُ الشَّهْرِ السَّابِقِ لَا هٰذِهِ الْاَيَّامُ فَاِنَّ سَبَبَ الْقَضَاءِ هُوَ سَبَبُ الْاَدَاءِ وَلَمْ يُعْلَمْ حَالُ شَرْطِيَّتِهِ وَالظَّاهِرُ الْعَدَمُ فَاِنَّهُ اِذَا لَمْ يُعْلَمْ تَعْيِينُ الْوَقْتِ فَاَيُّ وَقْتٍ يَكُونُ شَرْطُهُ وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَالنَّذْرُ الْمُطْلَقُ فَاِنَّ وَقْتَهُ مِعْيَارٌ لَهُ وَلَيْسَ سَبَبٌ لِوُجُوبِهِ وَاِنَّمَا السَّبَبُ هُوَ النَّذْرُ -وَاَمَّا النَّذْرُ الْمُعَيَّنُ فَقِيلَ اِنَّهُ شَرِيكٌ لِلنَّذْرِ الْمُطْلَقِ فِي هٰذَا الْمَعْنٰى وَاِنَّمَا يُخَالِفُهُ فِي بَعْضِ اَحْكَامِهِ وَهُوَ اِشْتِرَاطُ نِيَّةِ التَّعْيِينِ وَعَدَمُ اِحْتِمَالِ الْفَوَاتِ وَلِذَا قَيَّدَهُ بِهِ

অনুবাদ॥ "অথবা ওয়াক্ত তার জন্যে معيار হবে, সবাব হবে না"। যেমন– রমযানের রোযার কাযা। এটা পূর্বোক্ত বক্তব্যের ওপর মা'তূফ। এটা موقت এর চার প্রকারের তৃতীয় প্রকার। কেননা কাযার সময়টা নিঃসন্দেহে معيار। আর তা ওয়াজিব হওয়ার সবাব; তা হলো পূর্ববর্তী মাস প্রত্যক্ষকরণ, এ দিনগুলো সবাব নয়। কেননা, কাযার জন্যে যা সবাব, তা আদায়ের জন্যেও সবাব। ওয়াক্ত শর্ত হওয়ার ব্যাপারটি জ্ঞাত নয়। আর বাহ্যত সময় শর্ত না হওয়াই স্বীকৃত। কেননা, সময় নির্ধারণ যখন পরিজ্ঞাত নয়, কাজেই কোন সময়কে শর্তরূপে গণ্য করা হবে? নূরুল আনওয়ারের কোন কোন কপিতে والنذر المطلق রয়েছে। কেননা, সময় তার জন্যে معيار তা ওয়াজিব হওয়ার জন্যে সবাব নয়। বরং মান্নতই হলো এর সবাব।

আর নির্দিষ্ট মান্নতের ব্যাপারে কেউ কেউ বলেন, তা এ অর্থে সাধারণ মান্নতের সাথে শরীক। কিন্তু কতিপয় হুকুমে তার সাথে পার্থক্য রয়েছে। তা হলো নির্দিষ্টকরণের নিয়্যত শর্ত হওয়া এবং ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা না থাকা। এ কারণে এর দ্বারা এটাকে শর্তযুক্ত করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ قوله اويَكُوْنَ مِعيارًا لَهُ لَاسَبَبًا الخ : মানার গ্রন্থকার বলেন– امر مقيد بالوقت তথা সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আমরের তৃতীয় প্রকার এই যে, ওয়াক্ত فعل مامور به এর জন্য معيار ও ওয়াজিব হওয়ার সবাব হবে না। যেমন রমযানের কাযা রোযা। ব্যাখ্যাকার বলেন– এ ইবারতটি পূর্বে উল্লেখিত اما ان يكون الوقتُ ظرفًا لِلْمُؤَدّٰى এর উপর মা'তূফ। এটা امرموقت বা সময় সংশ্লিষ্ট আমরের তৃতীয় প্রকার। কেননা যেসময় রমযানের রোযা কাযা করা হবে নিসন্দেহে উক্ত সময় ঐ সকল রোযার জন্য معيار হবে। কারণ যেদিন কাযা রোযা রাখবে সেদিনের কিছু অংশ রোযা থেকে অতিরিক্ত থাকবে না। আর এ সময় অর্থাৎ যে দিনের রমযানের রোযার কাযা করে তা রমযানের রোযার কাযা ওয়াজিব হওয়ার সবাব নয়। কেননা আমাদের মতে আদার জন্য যা সবাব কাযার জন্য তা-ই সবাব হয়ে থাকে। এখানে আদার সবাব হলো রমযান মাস আগমন। অতএব এ রমযানের রোযার কাযার জন্য সবাব হলো এ রমযানের আগমন। সুতরাং গত রমযানের কাযা রোযা ওয়াজিব হওয়ার সবাব গত রমযানের আগমন। অতএব যে সকল দিনে রোযা কাযা করা হচ্ছে সে সকল দিন কাযা ওয়াজিবের জন্য সবাব হবে না।

নূরুল আনওয়ার গ্রন্থকার বলেন– এটা অবগত হওয়া সম্ভব হয়নি যে, যে সময় রমযানের রোযা কাযা করা হবে সে সময়টা তার জন্য শর্ত কি না? তবে সম্ভাবনা এটাই যে, উক্ত ওয়াক্তের সময় রমযানের রোযার কাযার জন্য শর্ত নয়। কেননা কাযার জন্য যেহেতু কোনো সময় নির্ধারিত নেই। অতএব কোন সময়টি এই জন্য শর্ত হবে?

নুরুল আনওয়ার গ্রন্থকার বলেন– মানারের কোনো কোনো কপিতে امر مقيد بالوقت এর তৃতীয় প্রকারের উদাহরণ نذر مطلق উল্লেখ রয়েছে। নজরে মুতলাক বলা হয় এমন মান্নতকে– যেমন কোনো ব্যক্তি বললো– আমি এক দিনের রোযার মান্নত করলাম। সে কোনো দিন নির্দিষ্ট করলো না। এটার তৃতীয় প্রকারের উদাহরণ এই জন্য যে, এ ব্যক্তি যেদিন মান্নতের রোযা রাখবে সেদিনটি মান্নতের উক্ত রোযার জন্য معيار হবে। অর্থাৎ সে দিনের কোনো অংশ মান্নতের রোযার থেকে অতিরিক্ত থাকবে না। আর সেদিনটি রোযা ওয়াজিব হওয়ার সবাবও নয়। কারণ মান্নতের রোযা ওয়াজিব হওয়ার সবাব হলো মান্নত করা। যেমন– আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন وليوفوا نذورهم তারা যেন তাদের মান্নত পূর্ণ করে।

قوله وَامَّا النَّذْرُ الْمُعَيَّنُ الخ : এটা একটা প্রশ্নে উত্তর।

প্রশ্ন : امرمقيّد بالوقت এর তৃতীয় প্রকারের উদাহরণে মান্নতকে মুতলাক শব্দের সাথে বিশেষিত করাটা ঠিক হয়নি। কারণ যেভাবে نذر مطلق তৃতীয় প্রকারের উদাহরণ হতে পারে। তদ্রূপ নির্দিষ্ট দিনের রোযার মান্নতও তৃতীয় প্রকারের উদাহরণ হতে পারে। কেননা এর জন্যও সময়টা معيار হয়ে থাকে এবং নির্দিষ্ট দিনের মান্নতের রোযা ওয়াজিব হওয়ার সবাব হয় না। সুতরাং মানারের কোনো কোনো কপিতে মুতলাকের সাথে বিশেষিত না করে النذر বলা উচিত ছিলো। যাতে মুতলাক মান্নত এবং নির্দিষ্ট দিনের মান্নত উভয়টি শামিল হতো।

উত্তর : নির্দিষ্ট দিনের মান্নত যদিও ওয়াক্তের معيار হওয়া এবং সবাব না হওয়ার ক্ষেত্রে মুতলাক মান্নতের সাথে শরীক রয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু বিধানের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট দিনের মান্নত এবং মুতলাক মান্নতের মধ্যে বৈপরিত্ব রয়েছে। যেমন–

১. মুতলাক মান্নতের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করণের নিয়ত করা শর্ত। অর্থাৎ এমন উদ্দেশ্য করা যে, আমি মান্নতের রোযা রাখবো। আর নির্দিষ্ট দিনের মান্নতের ক্ষেত্রে এমন নিয়ত করা শর্ত নয়। বরং উক্ত নির্দিষ্ট দিনে যদি সাধারণ রোযার কিংবা নফল রোযার নিয়ত করে তাহলে নির্দিষ্ট দিনের মান্নতের রোযা-ই আদায় হবে।

এর কারণ এই যে, নির্দিষ্ট দিনের মান্নতের রোযায় সময় যেহেতু সুনির্দিষ্ট থাকে। এ কারণে নির্দিষ্ট করণের নিয়ত করা জরুরি নয়। আর মুতলাক মান্নতের মধ্যে সময় নির্দিষ্ট থাকে না বিধায় নির্দিষ্টরূপে নিয়ত করা জরুরি।

২. মুতলাক মান্নতের ক্ষেত্রে রোযা ছুটে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। বরং যখনই রোযা রাখবে মান্নতের রোযা-ই আদায় হবে। আর নির্দিষ্ট দিনের মান্নতের ক্ষেত্রে যদি নির্দিষ্ট সময় ছাড়া অন্য সময় রোযা রাখে তাহলে উক্ত রোযা আদায় হবে না বরং কাযা হবে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট দিনের রোযা কেমন যেন ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বাকী রমযানের কাযা রোযার মধ্যে নির্দিষ্ট করণের নিয়ত করাও শর্ত এবং তা ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা রাখে না। কাজেই উভয় বিধানে মুতলাক মান্নত রমযানের কাযার সামঞ্জস্য রাখে। নির্দিষ্ট দিনের মান্নতের সামঞ্জস্য রাখে না। এ কারণে মুসান্নিফ (র) মান্নতকে মুতলাকের সাথে বিশেষিত করেছেন।

তৃতীয় প্রকারের উদাহরণে কোনো কোনো কপিতে النذر المطلق উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু النذر উল্লেখ করা হয়নি। সারকথা এই যে, মানারের কোনো কোনো কপিতে তৃতীয় প্রকারের উদাহরণে قضاء رمضان উল্লেখিত হয়েছে। আর রমযানের কাযা রোযার সাথে উল্লেখিত দুটি বিধানে যেহেতু মুতলাক মান্নতের সাথে সামঞ্জস্যতা রয়েছে। নির্দিষ্ট মান্নতের সামঞ্জস্যতা নেই। এ কারণে অন্যান্য কপিতে তৃতীয় প্রকারের উদাহরণে النذر المطلق উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু النذر উল্লেখিত হয়নি।

والظَّاهِرُ اَنَّ النَّذْرَ الْمُعَيَّنَ شَرِيْكٌ لِرَمَضَانَ فِىْ كَوْنِ الْاَيَّامِ مِعْيَارًا لَهٗ وَسَبَبًا لِلْوُجُوْبِ بَعْدَمَا اَوْجَبَ عَلٰى نَفْسِهٖ فِىْ هٰذِهِ الْاَيَّامِ وَاِنْ قَالُوْا بِاَنَّ النَّذْرَ سَبَبٌ لِلْوُجُوْبِ وَالْحَاصِلُ اَنَّ النَّذْرَ الْمُعَيَّنَ شَرِيْكٌ لِرَمَضَانَ فِىْ بَعْضِ الْاَحْكَامِ وَلِقَضَاءِ رَمَضَانَ فِىْ بَعْضٍ اُخَرَ فَالْحِقْ بِاَيِّهِمَا شِئْتَ وَصَاحِبُ الْمُنْتَخَبِ الْحُسَامِىْ جَعَلَ النَّذْرَ الْمُعَيَّنَ مِنْ جِنْسِ صَوْمِ رَمَضَانَ وَلَمْ يَذْكُرْ قَضَاءَ رَمَضَانَ وَالنَّذْرُ الْمُطْلَقُ مِنْ اَقْسَامِ الْاَمْرِ الْمُقَيَّدِ بَلْ هُوَ مُطْلَقٌ مِنْ قَبِيْلِ الزَّكٰوةِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَمَنْ اَدْخَلَهُمَا فِى الْمُقَيَّدِ نَظَرَ اِلٰى اَنَّهُمَا مُقَيَّدَانِ بِالْاَيَّامِ دُوْنَ اللَّيَالِىْ وَهٰذَا تَمَحُّلٌ وَتُشْتَرَطُ فِيْهِ نِيَّةُ التَّعْيِيْنِ وَلَا يَحْتَمِلُ الْفَوَاتَ بِخِلَافِ الْاَوَّلَيْنِ اَىْ يُشْتَرَطُ فِىْ هٰذَا الْقِسْمِ الثَّالِثِ مِنَ الْمُوَقَّتِ نِيَّةُ التَّعْيِيْنِ بِاَنْ يَقُوْلَ نَوَيْتُ لِلْقَضَاءِ وَالنَّذْرِ وَلَا يَتَاَدّٰى بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ وَلَا بِنِيَّةِ النَّفْلِ اَوْ وَاجِبٍ اُخَرَ -

অনুবাদ ॥ এ কথা সুস্পষ্ট যে, নির্দিষ্ট মান্নতের, দিনগুলো তজ্জন্য معيار এবং ওয়াজিবের সবাব হওয়ার ব্যাপারে রমযানের রোযার সদৃশ। কারণ সে এ দিন এটা আদায় করা তার জন্যে ওয়াজিব করে নিয়েছে। যদিও উসূলবিদগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, মান্নত করাই ওয়াজিব হবার সবাব।

সারকথা এই যে, নির্দিষ্ট মান্নত কতিপয় হুকুমের ক্ষেত্রে রমযানের রোযার সদৃশ এবং কতিপয় আহকামের ক্ষেত্রে রমযানের কাযা রোযার সদৃশ। অতএব কর্তব্য হলো- এটাকে এ দুটির মধ্য হতে যে কোন একটির সাথে সংযুক্ত করা। মুন্তাখাব প্রণেতা আল্লামা হুসসামী (র) নির্দিষ্ট মান্নতকে রমযানের রোযার শ্রেণীভুক্ত করেছেন। রমযানের কাযা রোযা এবং সাধারণ (অনির্দিষ্ট) মান্নতকে امر مقيد এর প্রকারের অন্তর্ভুক্ত করেন নি। বরং তা যাকাত এবং সাদকায়ে ফিতরের শ্রেণীভুক্ত হয়ে কোন নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সীমিত নয়। যে উসূলবিদ এগুলোকে مقيد এর প্রকারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তিনি এ দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন যে, এ দুটো দিনের সাথে সম্পর্কযুক্ত, রাতের সাথে নয়। বস্তুত এটা ব্যর্থ প্রয়াস।

"এ তৃতীয় প্রকারে নির্দিষ্টকরণের নিয়্যত শর্ত করা হয়েছে। এটা ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা রাখে না। প্রথম দু প্রকার এর বিপরীত"। অর্থাৎ, موقت এর এ তৃতীয় প্রকারে নির্দিষ্টকরণের নিয়্যত শর্ত। যেমন- এরূপ বলবে– আমি কাযা এবং মান্নত রোযার নিয়্যত করলাম। আর তা নির্দিষ্ট নিয়্যত দ্বারা আদায় হবে না, নফলের নিয়্যত দ্বারা বা অন্য ওয়াজিবের নিয়্যত দ্বারাও আদায় হবে না।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله والظَّاهِرُ اَنَّ النَّذْرَ الْمُعَيَّنَ الخ : দ্বারাও একটি প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে।

প্রশ্ন : তৃতীয় প্রকারের উদাহরণে যেহেতু কেবল نذر مطلق এর রোযা উল্লেখ করা সম্ভব نذر معين এর রাযা এ প্রকারের উদাহরণ হতে পারে না। কাজেই সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট মামূরবিহীর ৫ প্রকার হয়ে গেলো। ১. নামাযের ওয়াক্ত, ২. রমযান মাস, ৩. রমযানের রোযা কাযা করা এবং মুতলাক মান্নতের ওয়াক্ত, ৪. হজ্জের সময়, ৫. নির্দিষ্ট দিনের মান্নতের সময়। অথচ পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট মামূরবিহী মোট ৪ প্রকার।

উত্তর : নির্দিষ্ট দিনের মান্নতের রোযা কোনো কোনো বিধানে রমযানের রোযার সাথে শরীক যেমন রমযানের দিন রমযানের রোযার জন্য معيار হওয়া। এভাবে নির্দিষ্ট মান্নতের দিনে সুনির্দিষ্ট দিন মান্নতের রোযার জন্য معيار যেভাবে রমযানের দিনসমূহ রমযানের রোযার জন্য ওয়াজিব হওয়ার সবাব তদ্রূপ মান্নতের রোযার দিনও নির্দিষ্ট মান্নতের রোযা ওয়াজিব হওয়ার সবাব। সে নিজেই এ দিনে নিজের উপর রোযা ওয়াজিব করেছে। যদিও উসূলবিদগণ বলে থাকেন যে, মান্নতের দিনের রোযা ওয়াজিব হওয়ার সবাব হলো মান্নত করা। যে সব দিনে রোযা রাখা হয় সে সকল দিন নয়। মোটকথা এ উত্তরকে সঠিক মানার পরে নির্দিষ্ট মান্নতের রোযা যখন রমযানের রোযার সাথে শরীক হলো। কাজেই নির্দিষ্ট মান্নতের রোযা দ্বিতীয় প্রকারে শামিল হবে। সুতরাং সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট মামূরবিহী ৫ প্রকার না হয়ে ৪ প্রকারই হলো।

قوله وَالْحَاصِلُ اَنَّ النَّذْرَ الْمُعَيَّنَ الخ : ব্যাখ্যাকার বলেন– সারকথা এই যে, নির্দিষ্ট দিনের মান্নতের রোযা কোনো কোনো বিধানের ক্ষেত্রে রমযারে রোযার সাথে শরীক। আর কোনো কোনো বিধানে রমযানের কাযা রোযার সাথে শরীক। রমযানের সাথে শরীক এ কারণে যে, সময় যেভাবে রমযানের রোযা ওয়াজিব হওয়ার সবাব তদ্রূপ উক্ত দিন অর্থাৎ যেদিনে রোযা রাখার মান্নত করা হয়েছে তা নির্দিষ্ট মান্নতের রোযা ওয়াজিব হওয়ার সবাব। যদিও এটা মান্নতকারীর নিজের উপর রোযা ওয়াজিব করার পরের কথা। আর রমযানের কাযা রোযার সাথে এ কারণে শরীক যে, যে সকল দিনে রোযা কাযা করা হয় তা কাযা ওয়াজিব হওয়ার জন্য সবাব নয়। এভাবে যেদিনে মান্নতের রোযা রাখবে বাস্তবে তা রোযা ওয়াজিবের সবাব নয়। বরং মান্নত করাটাই নির্দিষ্ট মান্নতের রোযা ওয়াজিব হওয়ার সবাব।

মোটকথা নির্দিষ্ট মান্নত যেহেতু কোনো কোনো বিধানে রমযানের সাথে এবং কোনো কোনো বিধানে রমযানের কাযা রোযার সাথে শরীক। কাজেই নির্দিষ্ট মান্নতকে এর কোনো একটির সাথে মিলালেই যথেষ্ট। অতএব مامور به مقيد بالوقت ৫ প্রকার না হয়ে ৪ প্রকারই হবে।

قوله وَصَاحِبُ مُنْتَخَبِ الْحُسَّامِيِّ الخ : ব্যাখ্যাকার মোল্লা জুয়ূন (র) মানার গ্রন্থকারের উপর প্রশ্ন আরোপ করে বলেন– মুনতাখাবুল হুসসামী গ্রন্থকার নির্দিষ্ট মান্নতকে রমযানের রোযার সমজাতীয় সাব্যস্ত করেছেন কিন্তু রমযানের কাযা এবং মুতলাক মান্নতের রোযাকে مامور به مقيد بالوقت এর প্রকারসমূহের মধ্যে শামিল করেননি। যেমনটি মাতিন (র) করেছেন। বরং তিনি উভয়কে مامور به مطلق عن الوقت এর মধ্যে গণ্য করেছেন। যেমন– যাকাত এবং সাদকায়ে ফিতির مامور به مطلق عن الوقت এর অন্তর্গত। হুসসামী গ্রন্থকার একথা বলেছেন যে, যে সকল মনীষী এ দুটোকে مامور به مقيد بالوقت এর মধ্যে গণ্য করেছেন। তারা এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন যে, এ উভয়টি দিনের সাথে সংশ্লিষ্ট, রাতের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। অর্থাৎ রমযানের কাযা রোযা এবং মুতলাক মান্নতের রোযা দিনের বেলায় আদায় করা হয়। অতএব দিনের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার কারণে مامور به مقيد بالوقت এর মধ্যে গণ্য করেছেন। অথচ প্রকৃতপক্ষে এটা একটা হীলা বা কৌশল অবলম্বন কেননা রোযা তো দিনের বেলায়ই বৈধ হয়েছে রাতে নয়। কাজেই রাতে রোযা রাখা জায়েয না হওয়া এ কারণে নয় যে, তা দিনের সাথে সংশ্লিষ্ট। বরং এ কারণে যে, রোযা রাতে জায়েয নয়। বরং দিনের বেলা জায়েয। মোটকথা দিনের সাথে সংশ্লিষ্ট করা যেহেতু একটি হীলা। এ কারণে হুসসামী গ্রন্থকারের বর্ণিত কথা যে, রমযানের কাযা রোযা এবং মুতলাক মান্নতের রোযা مامور به مطلق عن الوقت এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া অধিক সমীচীন।

قوله وتُشْتَرَطُ فِيْهِ نِيَّةُ التَّعْيِيْنِ الخ : **হুকুম বা বিধান :**

মানার গ্রন্থকার বলেন مامور به مقيد بالوقت এর এই তৃতীয় প্রকারে নিয়ত নির্দিষ্ট করণ শর্ত। অর্থাৎ অন্তরে বা মুখে এমন বলা শর্ত যে, আমি রমযানের কাযা রোযা বা মুতলাক মান্নতের রোযার নিয়ত করছি। যদি মুতলাক রোযার নিয়ত করে বা নফল রোযার নিয়ত করে অথবা ভিন্ন কোনো ওয়াজিবের যথা কাফফারা ইত্যাদি রোযার নিয়ত করে তাহলে এর দ্বারা রমযানের কাযা রোযা এবং মুতলাক মান্নতের রোযা আদায় হবে না।

كذا يُشْتَرَطُ فِيه التَّبْيِيْتُ اى النِّيَّةُ مِنَ اللَّيْلِ لاَنّ ما سوى رَمَضانَ كُلُّه مَحَلٌّ لِلنَّفْلِ فيَقعُ جَمِيعُ الْاِمْسَاكَاتِ عَلى النَّفْلِ مَالَمْ يُعَيِّن مِنَ اللَّيْلِ الصَّوْمَ العَارِضيَّ وهُو القَضاءُ والكَفَّارَةُ والنَّذرُ المُطلَقُ بخِلافِ النَّذرِ المُعيَّنِ فَاِنَّه يَتَأدّى بِمُطلَقِ النِّيةِ ونِيّةِ النَّفلِ ولٰكن لا يَتأدّى بنِيّةِ واجبٍ اٰخرَ - ولاَ يُشْتَرطُ فيْه التَّبْيِيْتُ لِانّه مُعيّنٌ فِي نَفْسِه كرَمضانَ لا يَقعُ الْاِمْسَاكُ المُطلَقُ اِلاّ عليْه مَا لَمْ يَصْرِفْهُ الى واجبٍ اٰخرَ وايضًا لايحتَمِلُ هٰذا القِسْمُ الثّالثُ الفواتَ بَل كُلَّمَا صامَ لَهُ يَكُونُ مُؤدّيًا لان كُلَّ العُمْرِ محلٌّ لَه عِندنا وعِنْدَ الشّافعيّ رح اِن لَم يَقْضِ رَمَضانَ حَتّى جاءَ رمضانُ اٰخرُ تجِبُ عليْه الفِدْيَةُ مَعَ القضاءِ جَبْرًا لَهٗ علٰى التكاسُلِ والتّهاوُنِ بِخِلافِ القِسْمَيْنِ الاوّليْنِ وهُما الصلٰوةُ والصّومُ فاِنّهُما يَحْتَمِلان الفَواتَ اذا لَمْ يُؤدّهما فِي الوَقتِ المَعْهُودِ فيَكونُ قضاءً او يَكُونَ مُشْكِلاً يُشبِهُ المِعْيَارَ والظَّرفَ كالحَجّ عَطفٌ على ما سَبقَ وهُوَ النّوعُ الرّابعُ مِن اَنْواعِ المُوقّتِ يَعنِي او يَكونَ وَقتُ المُوَقّتِ مُشْكِلاً اى مُشْتَبِهَ الحَالِ يُشْبِهُ المِعْيارَ مِن وجْهٍ وَالظَّرفَ مِنْ وَجْهٍ

অনুবাদ॥ *"তদ্রূপ এ প্রকারে تبييت শর্ত।"* অর্থাৎ, রাতে নিয়্যত করা শর্ত। কেননা, রমযান ছাড়া অন্য সকল সময় হলো নফল রোযার সময়। সুতরাং, তার সকল রোযাই নফল রোযারূপে গণ্য হবে, যতক্ষণ না সে রাতে অন্য রোযার নিয়্যত নির্দিষ্ট করে। আর তা হলো– কাযা, কাফফারা এবং অনির্দিষ্ট মান্নতের রোযা। নির্দিষ্ট মান্নতের রোযা এর বিপরীত। কেননা, এটি অনির্দিষ্ট এবং নফল রোযার নিয়্যতের মাধ্যমে আদায় হয়ে যায়। অন্য ওয়াজিবের নিয়্যতে আদায় হয় না। আর তাতে রাত শর্ত করা হয়নি। কেননা, তা রমযানের রোযার ন্যায় স্বয়ং নির্দিষ্ট। এটি সাধারণ রোযা হিসেবে প্রযোজ্য হবে না যতক্ষণ না তাকে অন্য কোন ওয়াজিব রোযার দিকে ফেরানো হবে। তাছাড়া এ তৃতীয় প্রকার ছুটে যাওয়ার অবকাশ রাখে না। বরং যখনই এ রোযা রাখবে আদায়কারী হবে। কেননা, আমাদের মতে সমস্ত জীবন এর জন্য আদায়ের ক্ষেত্র।

আর ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, যদি সে রমযানের রোযা আদায় না করে, এমনকি অন্য রমযানের রোযা এসে যায়- তবে কাযার সাথে সাথে তার ওপর ফিদিয়া দেয়া ওয়াজিব হবে। যাতে তার জন্যে তার অবহেলা ও অলসতার প্রতিকার হয়ে যায়।

প্রথমোক্ত দুপ্রকার এর বিপরীত। সে দু প্রকার হলো- নামায ও রোযা। কারণ উভয়টি ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যদি এ দুটি যথাসময়ে আদায় না করে– তবে তা কাযা হবে। ***অথবা সময়টা مشكل তথা সন্দেহযুক্ত হবে। যা معيار ও ظرف এর সদৃশ। যেমন– হজ্জ"*** এ বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের ওপর আতফ হয়েছে। এটি মুয়াক্কাতের প্রকারসমূহের চতুর্থ প্রকার। অর্থাৎ, হয়তো মুয়াক্কাতের সময় مشكل অর্থাৎ সন্দেহজনক অবস্থাযুক্ত হবে। এটি একদিকে বিবেচনায় معيار সদৃশ এবং অপরদিক দিয়ে ظرف।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله وكذا يشترط فيه التبييت : এভাবে এই তৃতীয় প্রকারে রাতে অর্থাৎ সুবহে সাদিক শুরু হওয়ার পূর্বে নিয়ত করা শর্ত। তার কারণ এই যে, রমযান ছাড়া বাকী ১১ মাস হলো নফল রোযার ক্ষেত্র। এই ১১ মাসে যে যখনই রোযা রাখবে তা নফল রোযা হবে। তবে রাতে নফল ছাড়া কাযা, কাফফারা কিংবা মুতলাক মান্নতের নিয়ত করলে তা-ই আদায় হবে। অর্থাৎ যদি রাতে এ ধরনের কোনো নিয়ত না করে তাহলে নফল রোযা বিবেচিত হবে। সুতরাং বোঝা গেলো যে, কাযা ইত্যাদি রোযার জন্য রাতে নিয়ত করা জরুরি। পক্ষান্তরে নির্দিষ্ট দিনের মান্নতের রোযা এর বিপরীত। কারণ তা মুতলাক নিয়ত দ্বারাও আদায় হয়ে যায় এবং নফলের নিয়ত দ্বারাও আদায় হয়ে যায়। যেমন রমযানের রোযা সাধারণ রোযার নিয়ত কিংবা নফল রোযার নিয়ত দ্বারা আদায় হয়ে যায়। কিন্তু নির্দিষ্ট মান্নতের রোযা এবং অন্য কোনো ওয়াজিব রোযার নিয়ত দ্বারা আদায় হয় না। যদিও রমযানের রোযা ভিন্ন ওয়াজিবের নিয়ত সত্ত্বে আদায় হয়ে যায়।

পার্থক্যের কারণ : উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের কারণ এই যে, নির্দিষ্ট মান্নতের রোযা বান্দার নিজের ওয়াজিবকৃত আর রমযানের রোযা আল্লাহর ওয়াজিবকৃত। আল্লাহর ওয়াজিবকৃত রোযা যেহেতু অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণে ভিন্ন ওয়াজিবের নিয়ত করলেও তা আদায় হয়ে যাবে। আর বান্দার ওয়াজিবকৃত রোযা এ পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ নয় বিধায় ভিন্ন ওয়াজিবের নিয়ত দ্বারা তা আদায় হবে না। এর জন্য রাতে নিয়ত করাও শর্ত নয়। কারণ রমযানের রোযার ন্যায় এটা আগে থেকে নির্দিষ্ট। এ কারণে সেদিন সাধারণ কোনো রোযার নিয়ত দ্বারাও নির্দিষ্ট মান্নতের রোযা আদায় হয়ে যাবে। অতএব নির্দিষ্ট মান্নতের ক্ষেত্রে ভিন্ন ওয়াজিবের নিয়ত ছাড়া যে নিয়তই করুক তার দ্বারা নির্দিষ্ট মান্নতের রোযা আদায় হয়ে যাবে।

এ তৃতীয় প্রকারের দ্বিতীয় বিধান এই যে, রমযানের কাযা রোযা এবং সাধারণ মান্নতের রোযা ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। বরং যখনই কাযা রোযা রাখবে তখনই তা কাযা আদায়কারীগণ্য হবে। বিলম্বের দ্বারা কাযা রোযার কাযা গণ্য হবে না। এভাবে সাধারণ মান্নতের রোযা যখনই রাখবে তা আদায় গণ্য হবে কাযা গণ্য হবে না।

দলিল : আমাদের মতে রমযানের কাযা রোযা এবং সাধারণ মান্নতের রোযার সময় হলো পূর্ণ জীবন। অতএব মৃত্যুর পূর্বে যখনই কাযা রোযা বা মান্নতের রোযা রাখবে তা জায়েয হয়ে যাবে। মতনে উল্লেখিত عدم احتمال فوت এর দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য। অন্যথায় মৃত্যুর দ্বারা উভয়টিই ছুটে যায়।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন– যদি কোনো ব্যক্তি রমযানের রোযার কাযা না করে এমনকি দ্বিতীয় রমযান এসে যায় তাহলে তার উপর কাযা রোযার সাথে সাথে ফিদিয়া দেয়াও ওয়াজিব হবে। ফিদিয়াটা তার অলসতার কারণে। কেমন যেন ইমাম শাফেয়ী (র)এর নিকটে কাযা রোযা ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা রাখে। কারণ তার মতে এর সময় হলো পরবর্তী রমযানের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত। অতএব এর মধ্যে কেউ কাযা না রাখলে পরবর্তীতে তার জন্য রোযা কাযার সাথে সাথে ফিদিয়াও ওয়াজিব হয়।

গ্রন্থকার বলেন– প্রথম দুই প্রকার (১. ওয়াক্তটা যরফ, সবাব ও শর্ত হওয়া এবং ২. ওয়াক্ত معيار ও সবাব হওয়া) দ্বিতীয় বিধানে তৃতীয় প্রকারের বিপরীত। কারণ প্রথম প্রকার যেমন নামায, আর দ্বিতীয় প্রকার যেমন রমযানের রোযা উভয়টি ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা রাখে। অতএব উভয়কে যদি শরীআতে নির্ধারিত সময়ে আদায় না করা হয় বরং পরে আদায় করা হয় তাহলে উভয়টি কাযা বিবেচিত হবে।

قوله اويكون مشكلا يشبه الخ : ব্যাখ্যাকার (র) বলেন– এ ইবারতটি পূর্বের ইবারত اما ان يكون الوقت ظرفا الخ এর উপর মা'তূফ। এটা مامور به مقيد بالوقت এর চতুর্থ প্রকার। এর সার এই যে, সময়ের সাথে নির্দিষ্ট মামূরবিহী এর মধ্যে কখনো এমন সন্দেহজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে যায় যে, এক দিক দিয়ে তা معيار এর সামঞ্জস্য রাখে। অপর দিক দিয়ে যরফের সামঞ্জস্য রাখে।

وَ نَظِيْرُهُ وَقْتُ الحَجِّ فَاِنَّهُ مُشْكِلٌ بِهٰذَا المَعْنٰى وذٰلكَ مِنْ وَجْهَيْنِ الأَوَّلُ أَنَّ وَقْتَ الحَجِّ شَوَّالٌ وذُو القَعْدَة وعَشَرَةُ ذِى الحِجَّةِ والحَجُّ لاَ يُؤَدّٰى اِلاَّ فِىْ بَعْضِ عَشَرَةِ ذِى الحِجَّةِ فَيَكُوْنُ الوقتُ فاضِلاً فَمِنْ هٰذا الوَجْهِ يكونُ ظَرْفًا ومِنْ حَيْثُ اَنَّهُ لاَ يُؤَدّٰى فِىْ هٰذا الوَقْتِ اِلاَّ حَجٌّ واحدٌ يكونُ مِعْيارًا بِخِلاَفِ الصَّلٰوةِ فَاِنَّه فِىْ وقتٍ واحدٍ يُؤَدّٰى صلٰوةٌ مُخْتَلِفَةٌ والثَّانى اَنَّ الحَجَّ لا يُفْرَضُ فِى العُمُرِ اِلاَّ مرَّةً واحِدةً فاِنْ اَدْرَكَ العامَ الثَّانِىَ والثَّالثَ يكونُ الوَقْتُ مُوسَّعًا يُؤَدِّيْهِ فِى اىِّ وقتٍ شاءَ وانْ لَمْ يُدْرِكِ الْعَامَ الثَّانِىَ يكونُ الوقتُ مُضَيَّقًا لابُدَّ لهُ اَنْ يُؤَدِّىَ فِى الْعَامِ الاَوَّلِ لٰكِنَّ اَبَا يُوسُفَ رح اِعْتَبَرَ جَانِبَ التَّضْيِيْقِ ومحمّد رح اِعْتَبَرَ جانِبَ التوسُّعِ عَلٰى مَا قَال المُصَنِّفُ رح –

অনুবাদ ॥ এর উদাহরণ হলো- হজ্জের সময়। কেননা, হজ্জের সময় এ অর্থে مشكل বিষয়। আর এটা দুকারণে। ১. হজ্জের সময় হচ্ছে- শাওয়াল, যীকা'দা এবং যিলহিজ্জার দশ দিন। কিন্তু হজ্জ যিলহিজ্জার দশ দিনের কেবল কিছু অংশে আদায় হয়। কাজেই সময় উদ্বৃত্ত থেকে যায়। সুতরাং, এ দিক দিয়ে সময় ظرف। অপরদিকে এ সময়ের মধ্যে কেবল একটি হজ্জই আদায় করা যায়। এ হিসেবে এটি معيار। কিন্তু নামায এর বিপরীত। কেননা, একই সময়ে বিভিন্ন নামায আদায় করা যায়।

২. দ্বিতীয় কারণ এই যে, হজ্জ জীবনে কেবল একবার ফরয হয়। সুতরাং, মুকাল্লাফ ব্যক্তি যদি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বছর প্রাপ্ত হয়, তবে সময় প্রশস্তরূপে গণ্য হবে। সে যে সময়ই ইচ্ছা করে হজ্জ আদায় করতে পারবে। আর যদি সে দ্বিতীয় বছর না পায়, তবে সময় সংকীর্ণ গণ্য হবে। (তখন) তার জন্যে প্রথম বছরে (হজ্জ) আদায় করা অত্যাবশ্যক হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র) এ সংকীর্ণতার দিকটি বিবেচনা করেছেন। আর ইমাম মুহাম্মদ (র) বিবেচনা করেছেন প্রশস্ততার দিকটি। যেমন- গ্রন্থকার (র) উল্লেখ করেছেন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ এর উদাহরণ হলো হজ্জের সময়। কেননা হজ্জের সময়টা সন্দেহজনক অবস্থা। একদিক দিয়ে তা معيار এর সাথে মিল রাখে। অপর দিক দিয়ে যরফের সাথে মিল রাখে। এ সন্দেহজনক অবস্থাটা ২ভাবে হয়ে থাকে। প্রথম এই যে, হজ্জের সময় হলো শাওয়াল, যীকাদা ও যিলহিজ্জার ১০ দিন। এ কারণেই শাওয়ালের পূর্বে হজ্জের ইহরাম বাধা মাকরূহ তাহরীমি। মোটকথা উল্লেখিত ২ মাস ১০ দিন হলো হজ্জের সময়। তবে একথাও সুস্পষ্ট যে, হজ্জের রোকনসমূহ আদায়ে এ পূর্ণ সময় ব্যয় হয় না। বরং যিলহিজ্জার প্রথম দশকের কিছুদিন সময় ব্যয়িত হয়। বাকী সকল সময় অতিরিক্ত থাকে। আর ফে'লে মামূরবিহী আদায় করার পরে সময় অতিরিক্ত থাকা সময়টা যরফ হওয়ার পরিচায়ক। সুতরাং এদিক দিয়ে হজ্জের সময়টা হজ্জের জন্য যরফ হবে। তবে এ পূর্ণ সময়ে যেহেতু একটি হজ্জই আদায় করা সম্ভব এর অধিক আদায়ের অনুমতি নেই। এ দিক দিয়ে হজ্জের সময়টা معيار হওয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু নামাযের সময় এর বিপরীত। কেননা একই ওয়াক্তে অনেক নামায আদায় করা সম্ভব। সুতরাং নামাযের সময়টা নিঃসন্দেহে নামাযের জন্য যরফ হবে।

কিন্তু এ ব্যক্তি যদি হজ্জ ফরয হওয়ার বছর হজ্জের সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে মারা যায়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছর আদায় করার সুযোগ না পায়। তাহলে বলা হবে যে, সময়ের সংকীর্ণতার দরুন তার উপর প্রথম বছরই হজ্জ আদায় করা জরুরী ছিলো। আর এ বছরই ফরয হজ্জ আদায়ের ব্যাপারে নির্দিষ্ট ছিলো। উক্ত বছর যেহেতু কেবল একই হজ্জ আদায় করা সম্ভব। সুতরাং এটা সময় معيار হওয়ার পরিচায়ক। এ কারণে হজ্জের সময়টা হজ্জের জন্য معيار হবে।

মোটকথা হজ্জের সময়টা যেহেতু ظرف ও معيار হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। এ কারণে এটা مشتبه الحال হবে।

ব্যাখ্যাকার বলেন– মাতিন (র) এর উক্তিমতে ইমাম আবু ইউসূফ (র) সময়ের সংকীর্ণতার ধর্তব্য করেন। আর ইমাম মুহাম্মদ (র) সময়ের প্রশস্ততা ধর্তব্য করেন।

وَيَتَعَيَّنُ اَشْهُرُ الحَجِّ مِنَ العَامِ الاَوَّلِ عِندَ ابِى يُوسُفَ رح خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ رح اَىْ لَابُدَّ عِندَ ابِى يُوسُفَ رح اَنْ يُؤَدِّىَ الحَجَّ فِى العَامِ الاولِ اِحْتِيَاطًا اِحْتِرَازًا عَنِ الفَوَاتِ فَاِنَّ الحَيٰوةَ الَى العَامِ الثَّانِى مَوْهُوْمٌ والوقتُ مديدٌ وعندَ محمّدٍ رح يَتَرَخَّصُ لَه ان يُؤَخِّر الى العامِ الاٰخرِ بِشَرْطِ انْ لَا يفوتَ مِنه وثَمَرَةُ الاِخْتِلَافِ لَا تَظْهَرُ اِلَّا فِى الاِثْمِ فَاِذَا لَمْ يُؤَدِّ فِى العَامِ الاوَّلِ يَصِيْرُ فاسِقًا مردودَ الشَّهَادَةِ عندَ ابى يوسفَ رح ثمّ اذا اَدَّاهُ فِى العَامِ الثَّانِى يَرْتَفِعُ عَنْه الاِثْمُ و تُقْبَلُ شهادتُه وهٰكذا فِى كُلِّ عامٍ - وعندَ محمّدٍ رح لَا يَاْثَمُ اِلَّا عِندَ المَوْتِ او اِدْرَاكِ عَلَامَاتِهٖ وَلا يَكُوْنُ مَرْدُوْدَ الشَّهَادَةِ ولٰكِنْ كُلَّمَا ادّٰى يَكُوْنُ اداءً عِندَ الفَرِيْقَيْنِ لَا قَضاءً

অনুবাদ॥ ***"ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, হজ্জের মাসসমূহ প্রথম বছর থেকে নির্ধারিত হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র) এতে মতবিরোধ করেছেন"।*** অর্থাৎ, ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, ছুটে যাওয়ার আশংকায় সতর্কতা হিসেবে প্রথম বছরে হজ্জ আদায় করতে হবে। কেননা, জীবন দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করা অনিশ্চিত। আর এ সময়ও অনেক দীর্ঘ।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে, মুকাল্লাফকে এ শর্তে দ্বিতীয় বছর পর্যন্ত বিলম্ব করার অবকাশ দেয়া যাবে যে, এটা তার থেকে (কোনক্রমেই) দূরীভূত হতে পারে না। এ মতানৈক্যের ফলাফল কেবল পাপের ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং, মুকাল্লাফ যদি প্রথম বছর হজ্ব আদায় না করে, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, সে ফাসিক হয়ে যাবে। তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। এরপর সে যদি তা দ্বিতীয় বছরে আদায় করে, তবে তার থেকে পাপ মোচন হয়ে যাবে এবং তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। এমনিভাবে প্রতি বছরে এ অবস্থা চলতে থাকবে।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে, মৃত্যুর সময় এবং মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া ব্যতীত তার কোন পাপ হবে না, তার সাক্ষ্য পরিত্যক্ত হবে না। কিন্তু উভয়ের মতে, যখন সে হজ্জ আদায় করবে, তখন তা (তার পক্ষ থেকে) আদায় বিবেচিত হবে, কাযা হবে না।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ وَيَتَعَيَّنُ اَشْهُرُ الحَجِّ الخ : পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, হজ্জ আদায়ের বিষয়ে ইমাম আবু ইউসুফ (র) সময়ের সংকীর্ণতা ধর্তব্য করেন। আর মুহাম্মদ (র) সময়ের প্রশস্ততা ধর্তব্য করেন। এ কারণে গ্রন্থকার (র) বলেন– আবু ইউসূফ (র) এর মতে প্রথম বছরের হজ্জের মাসে হজ্জ আদায় করার জন্য নির্দিষ্ট অর্থাৎ সাবধানতাবশত প্রথম বছরই হজ্জ আদায় করা জরুরি। যাতে হজ্জ ফউত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে। কারণ আগামী বছর জীবিত থাকা সন্দেহজনক বিষয়। এ কারণে আগামী সাল পর্যন্ত বিলম্ব না করাই উত্তম।

লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ইমাম আবু ইউসূফ (র) এর মাযহাবের ভিত্তি হলো সাবধানতার উপর। এর দ্বারা এ উদ্দেশ্য নয় যে, তার মতে আমর দ্বারা তাৎক্ষণিকভাবে ওয়াজিব হওয়া সাব্যস্ত হয়। যেমন– ইমাম কারখী (র) বলেন থাকেন। বরং উদ্দেশ্য এই যে, তার মতে যদিও তাৎক্ষণিক ওয়াজিব হয় না। তবে সাবধানতাবশত তাৎক্ষণিক আদায় করাই জরুরি।

আবু ইউসূফ (র) এর দলিল আমর : দ্বারা তাৎক্ষণিক ওয়াজিব সাব্যস্ত না হওয়ার দলিল এই যে, তার মতে যদি তাৎক্ষণিক ওয়াজিব সাব্যস্ত হতো তাহলে বিলম্ব করার দ্বারা গোণাহগার হতো। দ্বিতীয় বছর আদায় করা সত্ত্বে সে গুণাহমুক্ত হতো না। অথচ এমনটি নয় বরং দ্বিতীয় বছর আদায় করলে গুণাহ মুক্ত হয়ে যাবে। যেমন সামনে আসছে।

মোটকথা একথা প্রমাণিত হলো যে, ইমাম আবু ইউসূফ (র) এর এ অভিমতটি সাবধানতার উপর ভিত্তি করে। ইমাম মুহাম্মদ (র) যেহেতু সময়ের প্রশস্ততা ধর্তব্য করেন। এ কারণে তার মতে প্রথম বছরের হজ্জের মাস হজ্জ আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট নয়। বরং আগামী বছরসমূহ পর্যন্ত হজ্জ বিলম্বিত করার অনুমতি আছে। তবে শর্ত হলো হজ্জ ফউত না হওয়া। অর্থাৎ মৃত্যুর আগে আগে যখন ইচ্ছা হজ্জ আদায় করবে। বিলম্বের দরুন সে গোনাহগার হবে না।

মুহাম্মদ (র) এর দলিল : নবী করীম (স) ১০ম হিজরী সনে ফরয হজ্জ আদায় করেছেন। অথচ এর আগেই হজ্জ ফরয হয়েছিলো। সুতরাং বোঝা গেলো যে, হজ্জের ক্ষেত্রে বিলম্ব করা জায়েয।

ইমাম আবু ইউসূফ (র) এর পক্ষ থেকে এ দলিলের উত্তর এই যে, হজ্জ বিলম্বিত করা ফউত হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকায় হারাম হয়েছে। আর ফউত হওয়ার আশংকা ঐ সময় থাকবে যখন মানুষের মৃত্যুর সময় জানা না থাকে। অথচ রাসূলুল্লাহ (স) নিশ্চিতভাবে জানতেন যে, যতোক্ষণ পর্যন্ত তিনি উম্মতের সামনে হজ্জের বিধান বাস্তবে না দেখাবেন ততোক্ষণ পর্যন্ত তার ওফাত হবে না।

মোটকথা কেমন যেন রাসূলুল্লাহ (স) এর ক্ষেত্রে হজ্জ ফউত হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো না। কাজেই তার জন্য বিলম্ব করা জায়েয ছিলো। পক্ষান্তরে উম্মতের ব্যাপারে এটা সম্পূর্ণ অজানা বিষয়। এ কারণে উম্মতের ব্যাপারে হজ্জ বিলম্বিত করা জায়েয হবে না।

قوله وَثَمَرَةُ الْاِخْتِلَافِ تَظْهَرُ الخ : ব্যাখ্যাকার (র) বলেন– উভয়ের মতবিরোধের ফল এ মাসআলায় সুস্পষ্ট হবে যে, যদি কোনো ব্যক্তি হজ্জ ফরয হওয়ার বছরে হজ্জ আদায় না করে। তাহলে আবু ইউসূফ (র) এর মতে সে গুণাহগার হবে। ফাসেক এবং সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত বিবেচিত হবে। এরপর যখন সে দ্বিতীয় বছর হজ্জ আদায় করবে তখন তার গুণাহ মাফ হয়ে যাবে এবং সাক্ষ্যযোগ্য গণ্য হবে। এভাবে প্রত্যেক বছরই চলতে থাকবে। ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে এ বিলম্বের কারণে সে গুণাহগার হবে না। তবে হঠাৎ মৃত্যু ঘটলে বা মৃত্যুর লক্ষণ ফুটে উঠলে হজ্জ আদায় না করার কারণে অবশ্যই সে গুণাহগার হবে। তবে সাক্ষ্যপ্রত্যাখ্যাত হবে না।

ব্যাখ্যাকার বলেন– হজ্জ বিলম্বের কারণে গুণাহগার না হওয়ার ক্ষেত্রে সাহেবাইন (র) এর মধ্যকার মতবিরোধ স্বস্থানে রয়েছে। কিন্তু মুকাল্লাফ ব্যক্তি হজ্জ প্রথম বছর আদায় করুক কিংবা আগামী বছরসমূহে আদায় করুক উভয়ের মতে এর দ্বারা ফরয হজ্জই আদায় হবে। কাযা হজ্জ বিবেচিত হবে না। কারণ সকলেই একমত যে, হজ্জের সময় হলো পূর্ণ জীবন। কাজেই যখনই আদায় করুক তা হজ্জের সময়ের মধ্যে আদায় হবে। এ কারণে উভয়ের মতে আদায় হজ্জই বিবেচিত হবে।

উপরোক্ত মতবিরোধের ফলস্বরূপ ইমাম আবু ইউসূফ (র) এর উক্তির উপর একটি প্রশ্ন এই যে, তিনি বলেন– প্রথম বছর হজ্জ আদায় করা জরুরি সাব্যস্ত করাটা সাবধানতার উপর ভিত্তি করে। আর সাবধানতা হলো ظنى দলিল। অতএব প্রথম বছর থেকে হজ্জকে বিলম্ব করা সগীরা গুণাহ হবে, কবীরা গুণাহ নয়। কেননা قطعى দলিল দ্বারা কবীরা গুণাহ সাব্যস্ত হয়। আর একবার সগীরা গুণাহে লিপ্ত হলে তা ফিসক গণ্য হয় না। যতোক্ষণ না সগীরা গুণাহের উপর অটল থাকে। সুতরাং প্রথম বছর থেকে দ্বিতীয় বছর বিলম্বের কারণে লোকটি ফাসিক ও সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হওয়া উচিত হবে না। হ্যা, যদি কয়েক বছর বিলম্ব করে তখন তা কবীরা গুণাহ এবং ফাসেক ও সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে।

وَ يَتَأَدّٰى بِاطْلَاقِ النِّيَّةِ لا بِنِيَّةِ النَّفْلِ هٰذا مِنْ حُكْمِ كَوْنِه مُشْكِلًا اى اِنْ اَدّٰى الحَجَّ بِمُطْلَقِ النِّيةِ بانْ يَقولَ نَوَيْتُ الحَجَّ يَقَعُ عَنِ الْفَرْضِ بِخِلافِ مَا اذا قَالَ نَوَيْتُ حَجَّ النَّفلِ فِانّه يَقَعُ عَنِ النَّفلِ و قَالَ الشافعيُّ رح يقعُ هٰهُنا عَنِ الفَرْضِ ايضًا لِانّهُ سَفِيْهٌ يجِبُ ان يُّحْجَرَ عليْه وَلا يُقْبَلُ تَصَرُّفُه قلنا هٰذا يُبْطِلُ الْاِختيارَ الّذِىْ شَرْطٌ فِى الْعِبادَاتِ والحَاصِلُ اَنَّ الحجَّ لمَّا كانَ يُشْبِهُ المِعْيَارَ والظَّرْفَ اَخَذَ شِبْهًا مِنْ كُلٍّ مِّنْهما فمِنْ حَيْثُ كَوْنِه معْيارًا اَخَذَ شِبْهًا مِنَ الصَّوْمِ فيَتَأَدّٰى بِمُطْلَقِ النّيةِ كَالصَّوْمِ ومِنْ حيثُ كونِه ظَرفًا اَخَذَ شِبْهًا مِّنَ الصَّلٰوةِ فلاَ يَتَادّٰى بِنِيَّةِ النَّفلِ كَالصَّلٰوةِ هٰكذا يَنْبَغِىْ اَنْ يُّفْهَمَ -

---

অনুবাদ॥ ***আর ফরয হজ্জ সাধারণ নিয়্যত দ্বারা আদায় হয়ে যায়। নফলের নিয়্যতের দ্বারা আদায় হয় না।*** এটা মুশকিল তথা জটিল ওয়াক্তের একটি হুকুম। অর্থাৎ, মুকাল্লাফ যদি সাধারণ নিয়্যত দ্বারা হজ্জ আদায় করে এবং নিয়্যতের সময়ে এভাবে বলে যে, আমি হজ্জের নিয়্যত করলাম, তবে এতে ফরয হিসেবে তার হজ্জ গণ্য হবে। এর বিপরীত যদি সে এরূপ বলে, আমি নফল হজ্জের নিয়্যত করলাম। তাহলে, তা নফল হবে। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, এক্ষেত্রে ফরয হিসেবে বিবেচিত হবে। কেননা, মুকাল্লাফ নির্বোধ, কাজেই অবশ্যই তাকে অপারগ ধরতে হবে এবং তার ক্ষমতা প্রয়োগকে কার্যকর করা যাবেনা।

এর উত্তরে আমরা বলব- এটা ঐ এখতিয়ার বাতিল করে দেয়, যা ইবাদতের মধ্যে শর্ত করা হয়েছে। সারকথা এই যে, হজ্জ যখন معيار এবং ظرف এর সাদৃশ্যশীল হলো, তখন উভয়ের প্রত্যেকের সাথে সাদৃশ্য বজায় রাখল। সুতরাং, معيار এর বিবেচনায় রোযার সাথে কিছুটা সাদৃশ্য রেখেছে। সুতরাং, ফরয হজ্জ রোযার মত সাধারণ নিয়্যত দ্বারা আদায় হয়ে যাবে। আর ظرف এর দিকের বিবেচনায় নামাযের সাথে কিছুটা সাদৃশ্য রাখে। সুতরাং, নফল হজ্জের নিয়্যতে নামাযের মত তা আদায় হবে না, এভাবে বুঝা উচিত।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ قوله وَيَتَادّٰى بِاطْلَاقِ النِّيَّةِ الخ : মুসান্নিফ (র) সময়টা মুশকিল তথা مشتبه الحال হওয়ার বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন- ফরয হজ্জ স্বাভাবিক হজ্জের নিয়ত দ্বারা আদায় হয়ে যাবে। যেমন বললো- "আমি হজ্জের নিয়ত করলাম" এর দ্বারা ফরয হজ্জ আদায় হয়ে যাবে তবে নফল হজ্জের নিয়ত দ্বারা ফরয হজ্জ আদায় হবে না, বরং নফল হজ্জই আদায় হবে। কারণ লোকটির বাহ্যিক অবস্থা এ বিষয়ের প্রমাণ বহন করে যে, সে এ পরিমাণ সফরের কষ্ট সংবরণ করে ফরয হজ্জই আদায় করবে। নফল আদায় করার উদ্দেশ্য নিবে না। কারণ জ্ঞানী ব্যক্তি আগে ফরয হজ্জই আদায় করে থাকে। এরপরই নফলের প্রতি ধাবিত হয়।

নফলের নিয়ত দ্বারা ফরয হজ্জ আদায় না হওয়ার কারণ : লোকটি যেহেতু স্পষ্টভাবে নফল হজ্জের নিয়ত করেছে। আর ফরয হজ্জ অস্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছিলো। এ কারণেই অস্পষ্টের উপর স্পষ্টটা প্রাধান্য পাবে। হজ্জের সময়টা যেভাবে ফরয হজ্জের যোগ্যতা রাখে তদ্রূপ নফল হজ্জেরও যোগ্যতা রাখে। এ কারণে নফল হজ্জের নিয়ত করলে নফল হজ্জই আদায় হবে, ফরয হজ্জ আদায় হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন– নফল হজ্জের নিয়ত করলেও ফরয হজ্জই আদায় হবে।

দলিল : যে ব্যক্তি ফরয আদায় না করে নফল আদায় করে সে চরম বোকা ও নির্বোধ। আর নির্বোধের কোনো কার্য শরীআতে কার্যকর বিবেচিত হয় না। বরং শরীআতে তাকে বাঁধা প্রদান করা হয়। অতএব উক্ত ব্যক্তির ভাষাগত تصرف তথা অধিকার প্রয়োগকে বন্ধ রাখা হবে এবং এটা বলা হবে যে, তার নফল হজ্জের নিয়ত ধর্তব্য নয়। কাজেই হজ্জ নফল হওয়ার বিশেষণ বাতিল হয়ে কেবল হজ্জের নিয়ত বাকী থেকে যাবে। আর পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, কেবল হজ্জের নিয়ত দ্বারা ফরয হজ্জ আদায় হয়। অতএব এখানেও নফল হজ্জের নিয়ত সত্ত্বেও ফরয হজ্জই আদায় হবে।

উত্তর : হানাফীদের পক্ষ হতে এর উত্তর এই যে, নফল হজ্জের নিয়তকারীর নিয়ত অর্থাৎ قولى تصرف (ভাষাগত অধিকার প্রয়োগ)কে বন্ধ রাখা হয়েছে। কাজেই তার এখতিয়ার বাতিল হয়ে গেলো। অথচ সকল ইবাদতের মধ্যে ইখতিয়ার থাকা শর্ত। সুতরাং এক্ষেত্রেও এখতিয়ার বাকী রাখার জন্য তার নফল হজ্জের নিয়ত গ্রহণযোগ্য হবে। অতএব নফল হজ্জের নিয়ত দ্বারা নফল হজ্জই আদায় হবে।

প্রশ্ন : এ উত্তরের উপর যদি প্রশ্ন করা হয় যে, রমযান মাসে নফল রোযার নিয়ত করার দ্বারা রমযানের রোযাই আদায় হয় অথচ এখানেও এখতিয়ার বাতিল হওয়া সাব্যস্ত হয়।

উত্তর : এর উত্তর এই যে, রমযান মাস যেহেতু নফল রোযার অবকাশ রাখে না। এ কারণে রমযান মাসে নফল রোযার নিয়ত করলে নফল বাতিল হয়ে মূল রোযা অবশিষ্ট থাকবে। আর মূল রোযার নিয়ত দ্বারা রমযানের রোযাই আদায় হয়। এ কারণে নফল রোযার নিয়ত করলেও রমযানের রোযা আদায় হবে। কিন্তু হজ্জের সময়টা এর বিপরীত। কেননা হজ্জের সময় নফল হজ্জেরও যোগ্যতা রাখে। এ কারণে নফল হজ্জের নিয়ত করলে নফল হজ্জই আদায় হবে। সাথে সাথে ফরয বিলম্বিত করা সাব্যস্ত হবে। আর ফরয থেকে মুখ ফেরানো তথা বিলম্বিত করার ক্ষেত্রে ফরয সাব্যস্ত হয় না। এ কারণে নফল হজ্জের নিয়ত দ্বারা ফরয হজ্জ সাব্যস্ত হবে না। বরং নফল হজ্জই সাব্যস্ত হবে।

قوله وَالْحَاصِلُ اَنَّ الْحَجَّ الخ : নূরুল আনওয়ার গ্রন্থকার বলেন– মতনের ইবারতের সারমর্ম এই যে, হজ্জের সময় যেহেতু معيار এবং যরফও। এ কারণে উভয়ের সামঞ্জস্যতা ধর্তব্য হবে। যরফ হওয়ার দিক দিয়ে হজ্জ নামাযের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। আর ফরয নামায যেহেতু নফলের নিয়ত দ্বারাও আদায় হয় না। এ কারণে নফল হজ্জের নিয়ত দ্বারা ফরয হজ্জ আদায় হবে না। আর হজ্জের সময় যেহেতু معيار এদিক দিয়ে হজ্জ রোযার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। রমযানের রোযা যেহেতু সাধারণ রোযার নিয়ত দ্বারা আদায় হয়ে যায়। এ কারণে ফরয হজ্জও সাধারণ হজ্জের নিয়ত দ্বারা আদায় হয়ে যাবে।

ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ رح عَنْ مَبَاحِثِ الْمُطْلَقِ وَالْمُؤَقَّتِ شَرَعَ فِي بَيَانِ كَوْنِ الْكُفَّارِ مَامُورِيْنَ بِالْأَمْرِ اَوْ لَا فَقَالَ وَالْكُفَّارُ مُخَاطَبُوْنَ بِالْأَمْرِ بِالْإِيْمَانِ وَ بِالْمَشْرُوْعِ مِنَ الْعُقُوْبَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ لِاَنَّ الْاَمْرَ بِالْإِيْمَانِ فِي الْوَاقِعِ لَا يَكُوْنُ اِلَّا لِلْكُفَّارِ وَاَمَّا لِلْمُؤْمِنِيْنَ كَمَا فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا فَاِنَّمَا يُرَادُ بِهِ الْاِثْبَاتُ عَلَى الْاِيْمَانِ وَ الْاِسْتِقَامَةُ عَلَيْهِ اَوْ مُوَاطَاةُ الْقَلْبِ بِاللِّسَانِ اَوْ نَحْوِ ذٰلِكَ وَكَذَا هُمْ اَلْيَقُّ بِالْعُقُوْبَاتِ لِاَنَّ الْعُقُوْبَاتِ وَهِيَ الْحُدُوْدُ وَالْقِصَاصُ اِذَا كَانَتْ تَجْرِيْ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ لِاَجْلِ اِنْتِظَامِ الْعَالَمِ وَمَصْلِحَةِ الْبَقَاءِ وَالزَّجْرِ عَنِ الْمَعَاصِيْ فَالْكُفَّارُ اَوْلٰى بِهَا سِيَّمَا عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رح لِاَنَّ الْحُدُوْدَ وَالْكَفَّارَاتِ عِنْدَهُ زَاجِرَةٌ لِلنَّاسِ عَنِ الْاِرْتِكَابِ لَا سَاتِرَةٌ وَمُزِيْلَةٌ لِلْمَعْصِيَةِ وَاَمَّا الْمُعَامَلَاتُ فَهِيَ دَائِرَةٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَيَنْبَغِيْ اَنْ نَتَعَامَلَ مَعَهُمْ حَسْبَ مَا تَعَامَلْنَا بَيْنَنَا فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْاِجَارَةِ وَغَيْرِهَا سِوَى الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيْرِ فَاِنَّهُمَا مُبَاحَانِ لَهُمَا لَا لَنَا وَاِلَيْهِ اَشَارَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ بِقَوْلِهِ اَلْخَمْرُ لَهُمْ كَالْخَلِّ لَنَا وَالْخِنْزِيْرُ لَهُمْ كَالشَّاةِ لَنَا وَاِنَّمَا بَذَلُوا الْجِزْيَةَ لِيَكُوْنَ دِمَاءُهُمْ كَدِمَائِنَا وَاَمْوَالُهُمْ كَاَمْوَالِنَا -

---

অনুবাদ ॥ মুসান্নিফ (র) مطلق এবং موقت এর আলোচনা শেষ করে তিনি কাফিরগণ امر র দ্বারা আদিষ্ট হওয়া, না হওয়ার আলোচনা আরম্ভ করেছেন। তিনি বলেন, ***কাফিররা ঈমান গ্রহণ করার, দণ্ডবিধি সম্পর্কিত বিষয়ে এবং লেন-দেন সম্পর্কিত বিষয় দ্বারা সম্বোধিত হবে।*** কেননা, বাস্তবপক্ষে কেবল কাফিরদেরকেই ঈমান গ্রহণ করার হুকুম করা হয়েছে।

বাকী ঈমানদারদেরকে ঈমান গ্রহণের যে হুকুম দেয়া হয়েছে, যেমন- আল্লাহর বাণী- "হে ঈমানদারগণ! তোমরা ঈমান আনয়ন কর", এটি দ্বারা ঈমানের ওপর দৃঢ় থাকা, প্রতিষ্ঠিত থাকা অথবা অন্তরকে মুখে বলার সাথে সামঞ্জস্যশীল করা অথবা তদ্রূপ অন্যকোন অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়। এভাবে কাফিররা দণ্ডবিধি প্রয়োগের অধিক উপযুক্ত পাত্র। কেননা, দণ্ডবিধি যেমন- হদ্দ, কিসাস (ইত্যাদি) যদি সামাজিক শৃঙ্খলা, শান্তি রক্ষা এবং পাপ থেকে মানুষকে বিরত রাখার কারণে মুসলমানদের ওপর আরোপিত হয়, তাহলে কাফিররা তার জন্যে সর্বাপেক্ষা যোগ্য। বিশেষতঃ ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে। কেননা, তাঁর মতে দণ্ড হলো মানুষকে অপরাধ প্রবণতা থেকে বিরত রাখার বস্তু। এটা পাপ দূরীভূতকারী নয় এবং আবৃতকারী নয়। এভাবে লেন-দেন আমাদের মাঝে এবং কাফিরদের মাঝে বিদ্যমান। সুতরাং, উচিত এই যে, আমরা কাফিরদের সাথে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে, ইজারা ইত্যাদির ক্ষেত্রে এমন ব্যবহার করবো, যেরূপ আমরা পরস্পরের সাথে করে থাকি। কিন্তু মদ এবং শূকরের হুকুম আলাদা। কেননা, তাদের মতে উভয়টি জায়েয, আমাদের মতে

জায়েয নয়। এর প্রতি রাসূল (স) তাঁর এ উক্তি দ্বারা ইংগিত করেছেন 'কাফিরদের মদ আমাদের শরবতের মতো এবং তাদের শূকর আমাদের বকরীর মতো'। তারা জিযিয়া প্রদান করে এজন্যে যে, যাতে তাদের রক্ত লাভ আমাদের রক্তের মতো এবং তাদের সম্পদ আমাদের সম্পদের মতো নিরাপদ হয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ عَنْ مَبَاحِثِ الْمُطْلَقِ الخ : موقت ও امر مطلق এর আলোচনা শেষ করে মুসান্নিফ (র) বর্ণনা করতে চাচ্ছেন যে, কাফেরগণ আমরের দ্বারা সম্বোধিত হয় কিনা? অর্থাৎ শরীআত প্রবর্তকের আদেশসমূহ দ্বারা যেসকল বিষয় সাব্যস্ত হয় কাফের অমুসলিমগণ তার মুকাল্লাফ কিনা?

মুসান্নিফ (র) এ ব্যাপারে বলেন– কাফেরগণ ঈমান আনয়ন, হদ, কিসাস এবং পার্থিব লেন-দেন সম্পর্কিত বিষয়ে আদেশ পালনের মুকাল্লাফ। কেননা ঈমান আনার নির্দেশ বস্তুত কাফেরদেরকেই দেয়া হয়। তবে এ প্রশ্ন যে, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا آمِنُوْا হে ঈমানদারগণ! ঈমান আনো। এতে মুমিনদেরকে সম্বোধন করা হলো কেন? কারণ এর দ্বারা تحصيل حاصل সাব্যস্ত হয় যা অবান্তর। এর কয়েকটি উত্তর রয়েছে।

১. আয়াতে امنوا আমরের সীগাটি যেভাবে কাজের অস্তিত্ব ও সূচনা বোঝায় তদ্রূপ স্থায়ীত্বও কামনা করে। এখানে স্থায়ীত্ব উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বলছেন– হে ঈমানদারগণ! তোমরা ঈমানের উপর অবিচল থাকো।

২. এর দ্বারা মুমিন, মুনাফিকদেরকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যারা মুখে ঈমানের দাবী করো তোমরা অন্তর দ্বারাও ঈমান আনো।

৩. এর দ্বারা আহলে কিতাবদেরকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ হে পূর্বের নবী ও কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনায়নকারীগণ! তোমরা কোরআন ও কোরআনের ধারক মুহাম্মদ (স) এর উপর ঈমান আনো। এক্ষেত্রেও আমরের সীগাটি احداث الفعل বোঝায়।

বাকী শরয়ী দণ্ডের বিষয় এক্ষেত্রে কাফেররাই অধিকযোগ্য। কেননা মুসলমানদের উপর হদ্দ ও কিসাস এইজন্য কায়েম করা হয়ে থাকে যাতে জগতে শৃংখলা ও স্থীতি বিদ্যমান থাকে। অতএব মুসলমানদের উপর যখন হদ ও কিসাস কায়েমের উদ্দেশ্য দুনিয়ায় শান্তি শৃংখলা ও স্থীতি বজায় রাখা। কাজেই কাফেররা এর বেশিযোগ্য। বিশেষত ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে। কারণ তার মতে মানুষকে পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার থেকে বিরত রাখার জন্যই শরয়ী দণ্ড, কাফফারা ইত্যাদি প্রবর্তিত হয়েছে। পাপাচার থেকে বিরত রাখা এবং তা দূর করার উদ্দেশ্যে নয়।

মোটকথা মানুষকে পাপাচার থেকে বিরত রাখার জন্য যেহেতু মুসলমাদের উপর শরয়ী দণ্ড জারী করা যায়। অতএব কাফেরদের উপর আরো উত্তমরূপে জারী করা যাবে। বাকী মুয়ামালা তথা লেন-দেন, বেচা-কেনা, বিবাহ–শাদী, ইজারা ইত্যাদি মুসলমান এবং কাফেরদের মাঝে সমভাবে চলে থাকে। কাজেই আমরা কাফেরদের সাথে এমনই আচরণ করবো যেমন আমরা পরস্পরের মাঝে করে থাকি। তাদের এবং আমাদের মধ্যে প্রত্যেক জিনিসের লেন-দেন একই ধরনের হবে। তবে মদ পান ও শূকর লেন-দেন ছাড়া। কারণ এ দুটো কাফেরদের জন্য বৈধ। আমাদের জন্য বৈধ নয়। যেমন হাদীসে এরশাদ হয়েছে اَلْخَمْرُ لَهُمْ كَالْخَلِّ لَنَا وَالْخِنْزِيْرُ لَهُمْ كَالشَّاةِ لَنَا وَاِنَّمَا يَبْذُلُو الْجِزْيَةَ لِيَكُوْنَ دِمَائُهُمْ كَدِمَائِنَا وَاَمْوَالُهُمْ كَاَمْوَالِنَا কাফেরদের জন্য শরাব এভাবে মুবাহ যেমন আমাদের নিকট সিরকা মুবাহ। তাদের জন্য শূকর এমনই জায়েয যেরূপ আমাদের জন্য ছাগল জায়েয। কাফেররা এ কারণে জিযিয়া প্রদান করে থাকে যাতে আমাদের জানের ন্যায় তাদের জানও নিরাপদ থাকে। তাদের মাল আমাদের মালের ন্যায় নিরাপদ থাকে। মোটকথা কাফেরগণ ঈমান, সাজা, লেন-দেন ইত্যাদির মুকাল্লাফ যেভাবে মুসলমানরা মুকাল্লাফ।

وَبِالشَّرَائِعِ فِي حُكْمِ الْمُؤَاخَذَةِ فِي الآخِرَةِ بِلا خِلافٍ يَعْنِي اَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُوْنَ بِالشَّرَائِعِ وهِيَ الصِّيَامُ والصَّلوٰةُ والزَّكٰوةُ والحَجُّ فِي حَقِّ الْمُؤَاخَذَةِ فِي الْاٰخِرَةِ بِاتِّفَاقٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الشَّافِعِيِّ رح فَهُمْ يُعَذَّبُوْنَ بِتَرْكِ اِعْتِقَادِ الفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ كَمَا يُعَذَّبُوْنَ بِتَرْكِ اِعْتِقَادِ اَصْلِ الْاِيْمَانِ لِقولِه تَعالى مَاسَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ اى لم نكُ مِن الْمُعْتَقِدِيْنَ لِلصَّلٰوةِ الْمَفروضَةِ والزكٰوةِ الْمَفْرُوضَةِ هٰكذا قالُوا وقد فَسَّرْتُه فِي التَّفْسِيْرِ الْاَحْمَدِيِّ بِاَطْنَبِ وجهٍ واَشْمَلِه وَاَمَّا فِيْ وُجُوْبِ الْاَداءِ فِيْ اَحْكَامِ الدُّنْيَا فَكَذا عِنْدَ الْبَعْضِ يعني اَنَّهُم مُخَاطَبُوْن بِاداءِ العِبَاداتِ فِي الدُّنْيا ايضًا عندَ البَعْضِ مِنْ مَشَائِخِ العِرَاقِ واكثرِ اصحابِ الشَّافِعِيِّ رح وهٰذِهٖ مُغَلَطَةٌ عَظِيْمَةٌ لِلْقَوْمِ لِاَنَّ الشَّافِعِيَّ رح لَمَّا لَمْ يَقُلْ بِصِحَّةِ اَدائِهِمَا مِنْهُمْ حَالَةَ الْكُفْرِ وَلا بِوُجُوبِ قَضَائِهَا بَعْدَ الاسلامِ فَمَا مَعْنى وُجُوبِ الاداءِ فِي الدُّنْيا۔ فَلِذَا اَوَّلُوْا كَلامَهُ بِاَنَّ مَعْنَى الْخِطَابِ فِي حَقِّهِمْ اٰمِنُوْا ثُمَّ صَلُّوا فَيُقَدَّرُ الْاِيْمَانُ مُقْتَضٰى تَبَعًا لِلْعِبَاداتِ وثَمَرَتُهُ اَنَّهُمْ يُؤَاخَذُوْنَ عِنْدَه فِي الْاٰخِرَةِ بِتَرْكِ فِعْلِ الصَّلٰوةِ كَمَا يُعَذَّبُوْنَ بِتَرْكِ اِعْتِقَادِهَا اِتِّفَاقًا فَلَوْ لَمْ يَكُوْنُوا مُخَاطَبِيْنَ بِاَداءِ الْعِبَاداتِ فِي الدُّنْيَا لَمَّا عُذِّبُوا فِي الْاٰخِرَةِ بِتَرْكِهَا هٰذا غَايَةُ مَاقِيْلَ فِي التَّلْوِيْحِ فِيْ تَحْقِيْقِ هٰذَا الْمَقَامِ -

---

অনুবাদ ॥ ***"আর শরয়ী বিধানাবলির ক্ষেত্রে সর্বসম্মত মতে পরকালে তাদের জবাবদিহি করতে হবে"।*** অর্থাৎ, কাফিররা শরয়ী বিধানাবলির ক্ষেত্রে সম্বোধিত তাহলো রোযা, নামায, যাকাত এবং হজ্জ। এটা আমাদের এবং ইমাম শাফেয়ী (র)-এর ঐক্যমতে এগুলোর ক্ষেত্রে পরকালে জবাবদিহিতার আওতায় পড়বে। সুতরাং, ফরয এবং ওয়াজিবসমূহের বিশ্বাস ত্যাগ করার দরুন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। যেমনিভাবে তাদেরকে মূল ঈমান ত্যাগ করার কারণে শাস্তি দেয়া হবে।

কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন, 'কোন বস্তু তোমাদেরকে দোযখে নিয়ে এসেছে? কাফিররা বলবে, আমরা নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না, আমরা দরিদ্রদেরকে অন্ন দান করতাম না।' অর্থাৎ, আমরা ফরয নামায এবং ফরয যাকাতের ব্যাপারে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। উসূলবিদগণ এমনই বলেছেন। এ ব্যাপারে আমি উত্তমভাবে এবং বিস্তারিতভাবে তাফসীরে আহমদীতে আলোচনা করেছি।

পার্থিব বিধানাবলিতে ইবাদত পালন ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কিছু সংখ্যক উলামার মতে অনুরূপভাবে তারা সম্বোধিত। অর্থাৎ, ইরাকী উলামার মধ্য থেকে কিছু সংখ্যকের মতে এবং অধিকাংশ শাফেয়ীদের মতে কাফিররা পার্থিব জীবনেও ইবাদত পালন করার ব্যাপারে অবশ্যই সম্বোধিত। বস্তুত এটি মানুষের বড় ধরনের বিভ্রান্তি। কেননা, ইমাম শাফেয়ী (র) যখন কোন কাফিরের জন্যে কাফির অবস্থায় ইবাদত পালন করা শুদ্ধ হওয়ার এবং ইসলাম গ্রহণের পর পূর্ববর্তী ইবাদতসমূহের কাযা ওয়াজিব নয় বলেন নি। সুতরাং তা পার্থিব জীবনে আদায় ওয়াজিব হবার অর্থ কি?

এ কারণে আলেমগণ ইমাম শাফেয়ী (র)-এর বক্তব্যকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, কাফিরদের ক্ষেত্রে সম্বোধনের অর্থ হলো- তোমরা প্রথমে ঈমান আনয়ন কর, অতঃপর নামায কায়েম কর। সুতরাং, ধরে নিতে

হবে যে, ইবাদতের সাথে তারা ঈমান গ্রহণের প্রতি সম্বোধিত। আর উক্ত وجوب এর সারকথা এই যে, ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, কাফিররা পরকালে (ইবাদত অনাদায়ের জন্যে) শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। যেমনিভাবে সর্বসম্মতভাবে নামাযের বিশ্বাস ত্যাগ করার কারণে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। অতএব কাফিররা যদি পার্থিব জীবনে ইবাদত আদায়ে সম্বোধিত না হতো, তাহলে ইবাদত বর্জনের কারণে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হত। এটি তালবীহ নামক কিতাবে এ বিষয়ের ব্যাখ্যায় যা বলা হয়েছে তার সার।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله وبالشرائع في حكم الخ : মানার গ্রন্থকার বলেন- কাফেরগণ পারলৌকিক জবাব দিহিতার দিক দিয়ে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদতেরও মুকাল্লাফ। এক্ষেত্রে হানাফী এবং শাফেয়ীদের মধ্যে পূর্ণ একমত রয়েছে। অর্থাৎ কাফেররা যেরূপ ঈমান না রাখার কারণে শাস্তিযোগ্য হবে তদ্রূপ ফরয ও ওয়াজিবের উপর ঈমান ও বিশ্বাস না রাখার কারণেও শাস্তিযোগ্য হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন- "বেহেশতীগণ কাফেরদেরকে বলবে তোমাদেরকে কিসে দোযখে প্রবিষ্ট করেছে? তারা উত্তর দিবে- আমরা যাকাত ও নামায ফরয হওয়ার উপর বিশ্বাস রাখতাম না"। এই আয়াত দ্বারা বোঝা গেলো যে, নামায ইত্যাদি ফরয হওয়ার উপর বিশ্বাস না রাখার কারণে কাফেরগণ এভাবেই সাজা পাবে যেভাবে ঈমান না আনার কারণে সাজা পাবে। মুসান্নিফ (র) বলেন- এ বিষয়ে আমি তাফসীরে আহমদীতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

قوله وأما في وجوب الأداء الخ : মানার গ্রন্থকার বলেন- এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে যে, কাফেরগণ পার্থিব বিধানের দিক দিয়ে ইবাদত আদায় ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সম্বোধিত কি না? অর্থাৎ পার্থিব বিধানে কাফেরদের উপর ইবাদত আদায় করা ওয়াজিব কি না?

এ ব্যাপারে মাশাইখে বুখারার অভিমত এই যে, কাফিরগণ ইবাদতসমূহ ওয়াজিব হওয়ার প্রতি বিশ্বাস রাখার ক্ষেত্রে সম্বোধিত ও মুকাল্লাফ। কিন্তু ইবাদত আদায়ের মুকাল্লাফ নয়। সুতরাং তাদের মতে ইবাদত ফরয হওয়ার বিশ্বাস না রাখার কারণে আযাব দেয়া হবে। ইবাদত তরক করার কারণে আযাব দেয়া হবে না। পক্ষান্তরে মাশাইখে ইরাক ও অধিকাংশ শাফেয়ীগণের মতে কাফিরগণ যেভাবে দুনিয়াতে ইবাদত ফরয হওয়া এ বিশ্বাসের মুকাল্লাফ তদ্রূপ ইবাদত আদায় করারও মুকাল্লাফ।

قوله وهذه مغلطة عظيمة الخ : নুরুল আনওয়ার গ্রন্থকার বলেন- এটা মানুষের বিরাট ভুল ধারণা। কেননা ইমাম শাফেয়ী (র) কুফরী অবস্থায় কাফেরদের পক্ষ থেকে ইবাদত আদায় করা বৈধ হওয়ার প্রবক্তা ছিলেন না। তিনি একথাও বলতেন না যে, মুসলমান হওয়ার পরে কুফরী অবস্থার ইবাদতসমূহ কাযা করা ওয়াজিব। সুতরাং কাফেরগণ দুনিয়াতে ইবাদত আদায় করার মুকাল্লাফ এর অর্থ কি? ইমাম শাফেয়ী (র) এর উক্তি মতে এটা একটা ভুল বিষয়। এই কারণে আলিমগণ ইমাম শাফেয়ী (র) এর এ উক্তি যে, কাফিরগণ দুনিয়াতে ইবাদত আদায় করার মুকাল্লাফ এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, কাফেরগণ আগে ঈমান আনবে, এরপর নামায ইত্যাদি আদায় করবে। যেমন কাযী বায়যাবী (র) কাফেরদেরকে সম্বোধিত বানানোর ক্ষেত্রে يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন يا أَيُّهَا النَّاسُ آمِنُوا ثُمَّ اعْبُدُوا অর্থাৎ হে কাফেরগণ! তোমরা ঈমান আনয়ন করো, অতপর ইবাদত কর"। সুতরাং সকল ইবাদতের জন্য ঈমান শর্ত। এ কারণে এখানেও ইবাদতকে তাবে' বানিয়ে আগে ঈমানকে উহ্য মানতে হবে। একথাটি এমন যে, জুনুবী ব্যক্তির উপর নামায ফরয। তবে এর শর্ত হলো পাক হওয়া। এভাবেই কাফেরদের উপরও ইবাদত ফরয তবে শর্ত হলো ঈমান আনয়ন করা।

ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে ইবাদত আদায় করা ওয়াজিব হওয়ার ফল এই হবে যে, যেভাবে তারা পরকালে ইবাদতের বিশ্বাস না করার দরুন শাস্তিযোগ্য হবে তদ্রূপ ইবাদত পরিহার করার দরুনও শাস্তিযোগ্য হবে।

নুরুল আনওয়ার গ্রন্থকার ইমাম শাফেয়ী (র) এর উক্তির উপর দলিল পেশ করতো বলেন- কাফেরগণ যদি দুনিয়াতে ইবাদত আদায়ের মুকাল্লাফ না হতো তাহলে পরকালে ইবাদত তরকের কারণে তাদেরকে আযাব দেয়া হতো না। অতএব বোঝা গেলো যে, তারা দুনিয়াতে ইবাদত আদায়ের মুকাল্লাফ। ব্যাখ্যাকার বলেন- এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আমি তালবীহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছি।

وَالصَّحِيْحُ أَنَّهُمْ لَا يُخَاطَبُوْنَ بِاَدَاءِ مَا يَحْتَمِلُ السُّقُوْطَ مِنَ الْعِبَادَاتِ اَىْ اَلْمَذْهَبُ الصَّحِيْحُ لَنَا اَنَّ الْكُفَّارَ لَا يُخَاطَبُوْنَ بِاَدَاءِ الْعِبَادَاتِ الَّتِىْ تَحْتَمِلُ السُّقُوْطَ مِثْلَ الصَّلٰوةِ وَالصَّوْمِ فَاِنَّهُمَا يَسْقُطَانِ عَنْ اَهْلِ الْاِسْلَامِ بِالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَنَحْوِهِمَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لِمُعَاذٍ (رضـ) حِيْنَ بَعَثَهُ اِلَى الْيَمَنِ لَتَاْتِىْ قَوْمًا مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ اِلٰى شَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ الْحَدِيْث فَاِنَّهُ تَصْرِيْحٌ بِاَنَّهُمْ لَا يُكَلَّفُوْنَ بِالْعِبَادَاتِ اِلَّا بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَاَمَّا الْاِيْمَانُ فَلَمَّا لَمْ يَحْتَمِلِ السُّقُوْطَ مِنْ اَحَدٍ لَا جُرْمَ كَانُوْا مُخَاطَبِيْنَ بِهِ ـ

অনুবাদ ॥ ***"বিশুদ্ধ মত এই যে, কাফিররা সব ইবাদত পালনের ব্যাপারে সম্বোধিত হবে না, যেগুলো ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা রাখে"।*** অর্থাৎ, আমাদের বিশুদ্ধ মত এই যে, কাফিররা সে সব ইবাদত আদায়ের ব্যাপারে সম্বোধিত হবে না, যেগুলো ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা রাখে। যেমন- নামায, রোযা। কেননা এ উভয়টি হায়েয, নেফাস এবং এ ধরনের কারণে ছুটে যায়। কারণ রাসূল (স) হযরত মুয়াযকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন যখন তাঁকে ইয়ামেনে প্রেরণ করেছিলেন 'হে মুয়ায! তুমি আহলে কিতাবের একটি সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ, সুতরাং তুমি তাদেরকে (প্রথমে) এ সাক্ষ্যদানের প্রতি আহ্বান করবে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই; আর আমি আল্লাহর রাসূল। তারা যদি তোমার আনুগত্য প্রকাশ করে, তবে তুমি তাদেরকে জানাবে যে, আল্লাহ প্রতি দিনে-রাতে তাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন।' সুতরাং, এখানে স্পষ্ট যে, নিশ্চয়ই কাফিররা ঈমান গ্রহণের পর ছাড়া ইবাদতের মুকাল্লাফ হয় না। আর ঈমান যখন কারো থেকে ছুটে যাওয়ার অবকাশ রাখে না, তখন অবশ্যই তারা এর দ্বারা সম্বোধিত হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله والصَّحِيْحُ اَنَّهُمْ لَا يُخَاطَبُوْنَ الخ : মুসান্নিফ (র) সঠিক উক্তি পেশ করে বলেন- আমাদের তথা مشائخ ماوراء النهر এর সঠিক মত এই যে, যে সকল ইবাদত কখনো কখনো মুসলমানদের থেকে রহিত হয়ে যায় যেমন নামায, রোযা ইত্যাদি। কাফেরগণ এ ধরনের ইবাদত আদায় করার মুকাল্লাফ নয়। কেননা নামায, রোযা, হায়েয-নিফাস এবং পাগলামি অবস্থায় রহিত হয়ে যায়। এর দলিল এই যে, ইমাম তিরমিযী (র) ইবনে আব্বাস (রা) এর একটি রেওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন- اِنَّ رسولَ اللّٰه صلّى اللّٰهُ عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اِنَّكَ تَاْتِىْ قَوْمًا اَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ اِلٰى شَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ لِذَالِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ لِذَالِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً اَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ لِذَالِكَ فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স) মু'আয (রা) কে ইয়ামানের গভর্ণর বানিয়ে প্রেরণকালে বলেছিলেন- মু'আয! তুমি আহলে কিতাবদের এক সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ। তাদেরকে প্রথমে আল্লাহর একত্ববাদ ও আমার রিসালাতের প্রতি ঈমান আনয়নের দা'ওয়াত দিবে। তারা যদি তা কবুল করে তাহলে তাদেরকে ৫ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার সংবাদ দিবে। তারা যদি

(পরের পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ رح عَنْ مَباحِثِ الْاَمْرِ شَرَعَ فِي مَباحِثِ النَّهْيِ فَقَالَ وَمِنْهُ النَّهْيُ وَهُوَ قَوْلُه اى الْقَائِلِ لِغَيْرِه عَلَى سَبِيلِ الْاِسْتِعْلاءِ لَا تَفْعَلْ يعنى انّ النَّهْيَ كَالْاَمْرِ فِي كَوْنِه مِنَ الْخَاصِّ لِاَنَّهُ لَفْظٌ وُضِعَ لِمَعْنًى مَعْلُومٍ وَهُوَ التَّحْرِيمُ وَبَاقِي الْقُيُوْدَاتِ كَمَا مَضَى فِي الْاَمْرِ غَيْرَ اَنَّهُ وُضِعَ قَوْلُه لَا تَفْعَلْ مَكَانَ قولِه اِفْعَلْ وهُوَ يَشْمُلُ الْمُخَاطَبَ والغَائِبَ والْمُتَكَلِّمَ والْمَعْرُوفَ والْمَجْهُولَ - وانّه يَقْتَضِي صِفَةَ الْقُبْحِ لِلْمَنْهِيِّ عَنْه ضَرُوْرَةَ حِكْمَةِ النَّاهِي وَالْحَكِيمُ اِنَّمَا يَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ كَمَا اَنَّ الْحُسْنَ فِي جَانِبِ الْاَمْرِ كَكَ ثُمَّ اَنَّ فِي النَّهْيِ تَقْسِيمًا بِحَسْبِ اقسامِ الْقُبْحِ وهُوَ اَنَّهُ اِمَّا قَبِيحٌ لِعَيْنِه او لِغَيْرِه - كُلٌّ مِنْهُمَا نَوْعَانِ فَصَارَ الْمَجْمُوعُ اَرْبَعَةً عَلَى مَا بَيَّنَه الْمُصَنِّفُ رح بِقَوْلِه

مَبْحَثُ النَّهْي - نهى এর আলোচনা

অনুবাদ ॥ মুসান্নিফ (র) امر এর আলোচনা থেকে অবসর হয়ে এখন তিনি نهى এর আলোচনা শুরু করেছেন। তিনি বলেন, *'নাহী خاص এর শ্রেণীভুক্ত। আর نهى হলো তাঁর কথা'* অর্থাৎ ***বক্তার কথা নিজকে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মনে করে অন্যকে লক্ষ্য করে لاتفعل (তুমি কারো না) বলা।*** অর্থাৎ خاص হওয়ার ব্যাপারে نهى আমরের মত। কেননা এটা একটি খাস শব্দ যা নির্দিষ্ট অর্থের জন্যে গঠিত হয়েছে। আর তা'হল হারাম করে দেয়া। আর অবশিষ্ট শর্তাবলী যা امر এর অনুরূপ পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে। শুধু তার উক্তি لا تفعل (তুমি করো না) এটাকে افعل (তুমি করো)-এর স্থলে রাখা হয়েছে। এটা মধ্যম পুরুষ, নাম পুরুষ, উত্তম পুরুষ, কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্যকে সবকেই অন্তর্ভুক্ত করে। نهى মূলত নিষিদ্ধ বস্তুর মধ্যে মন্দ হওয়ার বিশেষণ কামনা করে। (কেননা) নিষেধকারী বিজ্ঞ হওয়া জরুরী। আর বিজ্ঞজন অশ্লীল ও অপছন্দনীয় কাজ থেকেই নিষেধ করে থাকেন। এভাবে আমরের ক্ষেত্রে حسن তথা সৌন্দর্যের দিকটি, বিবেচিত হয়ে থাকে; قبح এর বিবেচনায় نهى এর একটি বিভক্তি রয়েছে।

(পূর্বের বাকী অংশ)

এটা মেনে নয় তাহলে তাদেরকে যাকাতের ব্যাপারে অবহিত করবে যে যাকাত ধনীদের থেকে গ্রহণ করে তাদের দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা হবে। তারা যদি একথাও মেনে নেয় তাহলে তুমি তাদের উৎকৃষ্ট মাল নেয়া থেকে বিরত থাকবে। অর্থাৎ যাকাত স্বরূপ মধ্যম পর্যায়ের মাল উসূল করবে। উৎকৃষ্ট মাল উসূল করে তাদের উপর যুলুম করবে না। মাযলুমের ফরিয়াদ থেকে বেচে থাকবে। কেননা মাযলুমের বদদোয়া এবং আল্লাহ তা'আলার মাঝে কোনো অন্তরায় থাকে না। বরং সরাসরি তা আল্লাহর কবুলের দরবারে পৌছে যায়"।

উল্লেখিত হাদীসটি এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, কাফেরগণ ঈমানের পরেই ইবাদতের মুকাল্লাফ হয়। ঈমানের পূর্বে ইবাদত আদায়ের মুকাল্লাফ হয় না। সুতরাং তাদেরকে ইবাদত আদায় পরিহার করার কারণে পরকালে শাস্তি দেয়া হবে না। বাকী ঈমান যেহেতু কোনো সময় রহিত হয় না। এ কারণে কাফেরগণ ঈমানের মুকাল্লাফ হবে। তারা ঈমান গ্রহণ না করলে পরকালে অবশ্যই শাস্তি প্রাপ্ত হবে।

তা হল منهى عنه হয়তো قبيح لعينه বা সত্তাগতভাবে মন্দ হবে। অথবা قبيح لغيره তথা আনুষঙ্গিক বিচারে মন্দ হবে। এ দুটির প্রত্যেকটি দুপ্রকার। গ্রন্থকার যা বর্ণনা করেছেন তার ওপর ভিত্তি করে এটা সর্বমোট চার প্রকার হলো।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ عَنْ مَبَاحِثِ الخ : আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহে আমরের দীর্ঘ আলোচনা শেষ হলো। আল্লাহর তাওফীকে এখান থেকে نهى এর আলোচনা শুরু হচ্ছে। মুসান্নিফ (র) বলেন– مسمى نهى তথা যে সকল সীগার উপর نهى প্রযোজ্য হয় তা খাস এর অন্তর্ভুক্ত। কোনো ব্যক্তির নিজেই নিজেকে বড়ো ভেবে অপরকে لاتفعل তথা কোনো কাজ না করার কামনা করাকে نهى বলে। ব্যাখ্যাকার বলেন- আমরের مسمى امر এর ন্যায় مسمى نهى ও কেননা نهى এমন শব্দ যা নির্দিষ্ট অর্থ তথা হারাম বোঝানোর জন্য গঠিত হয়েছে।

নূরুল আনওয়ার গ্রন্থকার বলেন– নাহীর সংজ্ঞায় উল্লেখিত শব্দসমূহ ব্যবহারের দ্বারা সেসকল উপকার রয়েছে যা আমরের অধীনে উল্লেখিত হয়েছে। কেবল পার্থক্য এতোটুকু যে, আমরের সংজ্ঞায় افعل রয়েছে। আর নাহীর সংজ্ঞায় তদস্থলে لاتفعل রয়েছে।

قوله وَهُوَ يَشْمَلُ الْمُخَاطَبَ الخ : এটা একটা প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন : نهى এর সংজ্ঞা সকল افراد কে বেষ্টনকারী নয়। কারণ উল্লেখিত সংজ্ঞায় لاتفعل উল্লেখের কারণে নাহী গায়েব ও মুতাকাল্লিম শামিল হয় না।

উত্তর : لاتفعل দ্বারা واحد مذكر حاضر এর সীগা উদ্দেশ্য নয়। বরং প্রত্যেক এমন সীগা উদ্দেশ্য যা বিরত থাকা কামনা করা বোঝায় এবং তা মুযারে থেকে নিষ্পন্ন হয়। চাই গায়েব হোক কিংবা মুতাকাল্লিম এবং মারূফ হোক বা মাজহুল। অতএব কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হবে না।

قوله وَاَنَّه يَقْتَضِىْ صِفَةَ الْقُبْحِ الخ : মুসান্নিফ (র) বলেন– نهى এ বিষয়ের দাবি করে যে, فعل منهى عنه তথা নিষিদ্ধ কাজ বাস্তবে মন্দ হোক। নাহীটা নিষিদ্ধ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া তা মন্দ হওয়ার পরিচায়ক। কেমন যেন শরীআত প্রবর্তক এ কারণে কোনো কাজ নিষেধ করে থাকেন যে, উক্ত কাজ ভালো নয় বরং মন্দ। কোনো কাজ থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি একথা বলছেন যে, এ কাজটি অন্যায়। এ কারণে তোমরা তা করো না। নিষেধ করার কারণেই কাজটি মন্দ হয়েছে তা নয়। বরং যে কাজ প্রকৃতপক্ষে মন্দ তিনি نهى দ্বারা তা স্পষ্ট করে দেন। যদি কেবল নিষেধ করার দ্বারা-ই মন্দ হওয়া সাব্যস্ত হতো তাহলে মুসান্নিফ (র) এমন বলতেন اِنَّمَا يَقْتَضِىْ صِفَةَ الْقُبْحِ, অর্থাৎ নাহী মন্দ বিশেষণ সাব্যস্ত করে। সুতরাং তিনি يثبت এর স্থলে يقتضى শব্দ উল্লেখ করতেন। মোটকথা নাহী নিষিদ্ধ কাজের জন্য وصف قبيح (মন্দ বিশেষণ) এ কারণে দাবী করে যে, নিষেধকারীর হেকমত এ বিষয়ের দাবী করে যে, তিনি হাকীম তথা সূক্ষ্মতত্ত্ব জ্ঞাত। আর হাকীম কখনো নির্লজ্জ ও অন্যায় কাজের নির্দেশ করেন না বরং নিষেধই করে থাকেন। এটা আমর দ্বারা মামূরবিহী কাজ ভালো বোঝানোর ন্যায় যেমন পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

ব্যাখ্যাকার বলেন قبيح মন্দ হওয়ার দিক দিয়ে নাহীর অপর এক বিভক্তি রয়েছে। তা এই যে, قبيح (তথা মন্দ) প্রথমত দুপ্রকার। ১. قبيح لعينه (সত্তাগতভাবে মন্দ), ২. قبيح لغيره (অন্যের কারণে মন্দ)। অতপর এর প্রত্যেকটি আবার ২ প্রকার। অতএব মোট ৪ প্রকার হলো।

وَهُوَ اى المَنْهِى عَنْه المَفْهُوْمُ مِنَ النَّهْيِ -اِمَّا اَنْ يَكُوْنَ قَبِيْحًا لِعَيْنِهِ اى تكُوْنُ ذاتُهُ قَبِيْحَةً بِقَطْعِ النَّظْرِ عَنِ الاَوْصَافِ اللّازِمَةِ والعَوارِضِ المُجاوِرَةِ وَذٰلِكَ نَوْعانِ وَضْعًا وشَرْعًا اى الاَوّلُ مِن حيثُ اَنّه وُضِعَ لِقبيحِ العَقْلِيّ بِقَطعِ النَظرِ عَنْ وُرُوْدِ الشَرعِ وَالثّانِيْ مِن حَيْثُ اَنَّ الشَرعَ وَرَدَ بِهٰذا واِلّا فَالعَقلُ يُجَوِّزُه اَوْ لِغَيْرِهِ عطفٌ علىٰ قوله لِعَيْنِه و ذٰلِك نوعانِ وَصْفا ومُجاوِرًا يَعنِي اِنّ النَوْعَ الاَوّل ما يكون القبيح وصفا لِلنَّهِي عَنْه اى لازِمًا غَيْرَ مُنفَكٍّ عَنه كَالوَصْفِ وَالنَّوعُ الثّانِيْ ما يَكُوْنُ القَبِيْحُ فِيْه مُجاوِرًا لِلمَنْهِي عنه فِيْ بَعضِ الاَحْيانِ ومُنفَكًّا عنه فِي بعضِ اُخَرَ

অনুবাদ ॥ ***"আর তা"*** অর্থাৎ নিষিদ্ধ বস্তু যা نهى থেকে বোধগম্য হয়েছে। ***"منهى عنه বা নিষিদ্ধ কাজটি হয়তো তা সত্তাগতভাবে মন্দ হবে"।*** অর্থাৎ তার মূল সত্তা আবশ্যক গুণাবলি ও আনুষঙ্গিক অবস্থার বিবেচনা ছাড়াই মন্দ হবে। ***আর তা হল দুপ্রকার, وضعى বা গঠনগত এবং شرعى বা শরীআতগত।*** অর্থাৎ প্রথমটি এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে, তা মন্দের জন্যেই গঠন করা হয়েছে। শরীআতের বিবেচনা ছাড়াই বিবেকের মাধ্যমে বোঝা যায়। আর দ্বিতীয়টি এ দিক দিয়ে যে, এ ব্যাপারে শরীআত তথা শরীআতের সিদ্ধান্ত বা সমর্থন এসেছে। তবে বিবেক তাকে জায়েয মনে করে। ***"অথবা قبيح لغيره তথা অন্য আনুষঙ্গিক কারণে মন্দ হবে"***, এ অংশটুকু গ্রন্থকারের অন্য উক্তি لعينه এর উপরে عطف হয়েছে। ***এটাও দুপ্রকার; قبيح وصفى (গুণবাচক) এবং قبيح جوارى (আনুষঙ্গিক)।*** অর্থাৎ প্রথম প্রকার হল যার মধ্যে মন্দটি নিষিদ্ধ বস্তুর গুণবাচক হয়। অর্থাৎ তা (নিষিদ্ধ বস্তুর সাথে) অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে। আর দ্বিতীয় প্রকারটি হল- যার মধ্যে মন্দটি কোন সময় নিষিদ্ধ বস্তুর আনুষঙ্গিক বস্তু হয় এবং কোন সময় নিষিদ্ধ বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله وَهُوَ اى المَنْهِى عَنْهُ الخ : ব্যাখ্যাকার বলেন- هو যমীর দ্বারা منهى عنه উদ্দেশ্য যা পূর্বে نهى দ্বারা বোঝা যায়। বস্তুত এটা ব্যাখ্যাকারের ভ্রান্তি। কেননা নিকটেই منهى عنه শব্দ স্পষ্টাকারে রয়েছে। কাজেই যা স্পষ্ট উল্লেখ নেই তাকে مرجع সাব্যস্ত করার কোনো প্রয়োজন নেই। মোটকথা منهى عنه (তথা নিষিদ্ধ কাজ) ২ প্রকার। ১. قبيح لعينه ২. قبيح لغيره

قبيح لعينه এমন মন্দ কাজকে বলে যার সত্তার মধ্যেই কদার্যতা বা মন্দ থাকে। তার কোনো আবশ্যিক বিশেষণের প্রতি লক্ষ্য রেখে নয়। এভাবে তার عوارض তথা পারিপার্শ্বিক বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেও নয়।

قبيح لغيره এমন মন্দ কাজকে বলে যার সত্তার মধ্যে কোনো قبح (কদার্যতা) থাকে না। বরং অন্যের কারণে তার মধ্যে কদার্যতা সৃষ্টি হয়। قبيح لعينه ২ প্রকার। ১. قبيح وضعى ২. قبيح شرعى

قبيح وضعى যা মন্দ হওয়াটা বিবেক দ্বারা বোঝা যায়। চাই সে ব্যাপারে শরীআত অবতীর্ণ হোক বা না।

২. قبيح شرعى যা মন্দ হওয়া কেবল শরীআত দ্বারাই বোঝা যায়। বিবেক দ্বারা তা অনুভব করা সম্ভব নয়। এমনকি শরীআত ছাড়া বিবেক তাকে অবৈধ ও সম্ভব জ্ঞান করে।

قبيح لغيره ও ২ প্রকার। ১. قبيح وصفى ২. قبيح جوارى

قبيح وصفى এমন বস্তুকে বলে যার মধ্যে বিশেষ কোনো গুণের কারণে কদার্যতা সৃষ্টি হয় এবং তা নিষিদ্ধ কাজের সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত হয়।

قبيح جوارى এমন বিষয়কে বলে- যার মধ্যে অন্যের সহবস্থানের কারণে কদার্যতা সৃষ্টি হয় তবে সে ভিন্ন বস্তুটা নিষিদ্ধ বিষয়ের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত থাকে না। বরং কখনো কখনো বিচ্ছিন্ন হয়।

كَالْكُفْرِ وَبَيْعِ الْحُرِّ وَصَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ وَالْبَيْعِ وَقْتَ النِّدَاءِ أَمْثِلَةٌ لِلْأَنْوَاعِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ فَالْكُفْرُ مِثَالٌ لِمَا قَبُحَ لِعَيْنِهِ وَضْعًا لِأَنَّهُ وُضِعَ لِمَعْنًى هُوَ قَبِيحٌ فِي أَصْلِ وَضْعِهِ وَالْعَقْلُ مِمَّا يُحَرِّمُهُ لَوْ لَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ الشَّرْعُ لِأَنَّ قُبْحَ كُفْرَانِ الْمُنْعِمِ مَرْكُوزٌ فِي الْعُقُولِ السَّلِيمَةِ -وَبَيْعُ الْحُرِّ مِثَالٌ لِمَا قَبُحَ لِعَيْنِهِ شَرْعًا لِأَنَّ الْبَيْعَ لَمْ يُوضَعْ فِي اللُّغَةِ لِمَعْنًى هُوَ قَبِيحٌ عَقْلًا وَإِنَّمَا الْقُبْحُ فِيهَا لِأَجْلِ أَنَّ الشَّرْعَ فَسَّرَ الْبَيْعَ بِمُبَادَلَةِ مَالٍ بِمَالٍ وَالْحُرُّ لَيْسَ بِمَالٍ عِنْدَهُ وَكَذَا صَلٰوةُ الْمُحْدِثِ قَبِيحٌ شَرْعًا لِأَنَّ الشَّارِعَ أَخْرَجَ الْمُحْدِثَ مِنْ أَنْ يَكُونَ أَهْلًا لِأَدَائِهَا

অনুবাদ॥ *যেমন- কুফরী করা, আযাদ ব্যক্তিকে বিক্রি করা, কুরবানীর দিন রোযা রাখা, আযানের সময় ক্রয়-বিক্রয় করা।* এগুলো ধারাবাহিকভাবে (উল্লিখিত) চার প্রকারের উদাহরণ। সুতরাং কুফর হলো قبيح لعينه وضعى এর উদাহরণ। কেননা এটাকে এমন অর্থের জন্যে গঠন করা হয়েছে, যা এর মৌলিক গঠনেই মন্দ। যদি এ ব্যাপারে শরীআতের হুকুম আরোপিত নাও হতো, (তবুও) বিবেক এটাকে হারাম সাব্যস্ত করতো। কেননা নেয়ামত বা অনুগ্রহদাতার অকৃতজ্ঞতা মন্দ হওয়া, সুস্থ বিবেকের কাছে স্বীকৃত।

আর আযাদ ব্যক্তিকে বিক্রি করা হলো قبيح لعينه شرعى এর উদাহরণ। কেননা বিক্রি শব্দটি এমন কোন অর্থের জন্যে প্রণীত হয়নি, যা বিবেকের দৃষ্টিতে মন্দ। এর মধ্যে মন্দ এ কারণে এসেছে যে, ইসলামী শরীআত বিক্রয়ের সংজ্ঞা এভাবে প্রদান করেছে যে, বিক্রি বলা হয় মালের বিনিময়ে মাল প্রদান করাকে। আর শরীআতের দৃষ্টিতে আযাদ ব্যক্তি মাল নয়। অনুরূপভাবে শরীআতের দৃষ্টিতে উযূ ভঙ্গকারীর নামায মন্দ। কেননা শরীআত প্রবর্তক তাকে নামায আদায়কারী থেকে বের করে দিয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ قوله كَالْكُفْرِ وَبَيْعِ الْحُرِّ الخ : মুসান্নিফ (র) قبيح এর উল্লেখিত ৪ প্রকারের ধারাবাহিক উদাহরণ দিচ্ছেন। তিনি বলেন- কুফর হলো قبيح لعينه وضعى এর উদাহরণ। কারণ কুফর শব্দটি এমন অর্থের জন্য গঠিত হয়েছে যে, অর্থটি মৌলিকভাবেই মন্দ বা কদার্য। এ ব্যাপারে যদি শরীআত অবতীর্ণ না হতো তাহলে বিবেকই তা হরাম ও কদার্য হওয়া বোঝাতো। কারণ প্রকৃত অনুগ্রহশীলের অকৃতজ্ঞতা এবং তার নেয়ামতসমূহের না শুকরি মন্দ হওয়া সুস্থ বিবেক দ্বারাই বোঝা যায়। কারণ বান্দার উপর আল্লাহর অবিরত নেয়ামতসমূহ নাযিল হওয়ার দাবি এই যে, বান্দা তার প্রকৃত প্রতিপালকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে এবং তার আনুগত্য করবে। মনে প্রাণে তার একত্ববাদের বিশ্বাস রাখবে। সুতরাং যখন অনুগ্রহশীলের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ওয়াজিব এবং উত্তম কাজ। সুতরাং তার বিপরীত করা অবশ্যই নিন্দনীয় ও খারাপ কাজ। আর এটা যেহেতু বিবেক দ্বারাই বোঝা যায়। এ কারণে এটা قبيح لعينه وضعى হবে।

স্বাধীন মানুষ ক্রয়-বিক্রয় قبيح لعينه شرعى এর উদাহরণ। কারণ بيع শব্দটি অভিধানে এমন অর্থের জন্য গঠিত নয় যা বিবেকের কাছে কদার্য। স্বাধীন মানুষ বেচা-কেনা মন্দ একারণে যে, ইসলামে বিক্রির সংজ্ঞা উল্লেখ করেছে যে, مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ অথচ শরীআতে স্বাধীন মানুষ কোনো মাল নয়। সুতরাং সে যখন মাল নয় কাজেই তার উপর বিক্রির সংজ্ঞা তথা "মালের বিনিময়ে মাল" প্রযোজ্য হয় না। এ কারণে সত্তাগতভাবেই এই বিক্রির মধ্যে কদার্যতা রয়েছে। আর বিবেক যেহেতু এটা বোধগম্য করতে অসমর্থ বরং তা কেবল শরীআত দ্বারাই জানা যায়। এ কারণেই এটা قبيح لعينه شرعى এর উদাহরণ হয়েছে।

এভাবে উযুবিহীন ব্যক্তির নামায শরীআতের দৃষ্টিতে قبيح বা মন্দ। কারণ নামায যদিও সত্তাগতভাবে উত্তম কাজ। তবে শরীআতে এমন ব্যক্তিকেই তার যোগ্য সাব্যস্ত করেছে যে পবিত্র। অতএব অপবিত্র অবস্থায় নামায আদায় করাটা শরীআতের দৃষ্টিতে قبيح হবে।

وَصَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ مِثَالٌ لِّمَا قَبُحَ لِغَيْرِهِ وَصْفًا فَإِنَّ الصَّوْمَ فِي نَفْسِهِ عِبَادَةٌ وَإِمْسَاكٌ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَإِنَّمَا يَحْرُمُ لِأَجْلِ أَنَّ يَوْمَ النَّحْرِ يَوْمُ ضِيَافَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَفِي الصَّوْمِ إِعْرَاضٌ عَنْهَا - وَهٰذَا الْمَعْنٰى لَازِمٌ بِمَنْزِلَةِ الْوَصْفِ لِهٰذَا الصَّوْمِ لِأَنَّ الْوَقْتَ دَاخِلٌ فِي تَعْرِيفِ الصَّوْمِ وَ وَصْفُ الْجُزْءِ وَصْفُ الْكُلِّ فَصَارَ فَاسِدًا وَلَمْ يَلْزَمْ بِالشُّرُوعِ بِخِلَافِ النَّذْرِ فَإِنَّهُ فِي نَفْسِهِ طَاعَةٌ وَلَا فَسَادَ فِي التَّسْمِيَةِ وَإِنَّمَا الْفَسَادُ فِي الْفِعْلِ فَيَجِبُ قَضَاؤُهُ

অনুবাদ॥ আর কুরবানীর দিনে রোযা রাখা এটা قبيح لغيره وصفى এর উদাহরণ। কেননা রোযা মূলতঃ একটি ইবাদত। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই (পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে) বিরত থাকা হয়। এটা হারাম করা হয়েছে এ কারণে যে, কুরবানীর দিন হল খোদায়ী মেহমানদারীর দিন। আর রোযা রাখার মধ্যে এ থেকে বিমুখ থাকা হয়।

রোযার এ অর্থটি وصف এর পর্যায়ে আবশ্যিক হয়েছে। কেননা রোযার সংজ্ঞার মধ্যে সময় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর جزء বা অংশের গুণ كل তথা গোটা বস্তুর গুণ হিসেবে ধর্তব্য হয়। কাজেই রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং আরম্ভ করার কারণে তা (আদায় করা) অত্যাবশ্যক হবে না। এটা মান্নতের বিপরীত। কেননা মান্নত হল প্রকৃত আনুগত্য পোষণ করা। আর রোযার নাম উচ্চারণের মধ্যে কোন দোষ নেই। দোষ হলো মূল কার্যের মধ্যেই। এ কারণে কাযা করা ওয়াজিব হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ قوله وَصَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ مِثَالٌ الخ : নুরুল আনওয়ার গ্রন্থকার বলেন- কোরবাণীর দিনসমূহের রোযা قبيح لغيره وصفى এর উদাহরণ। কারণ রোযা বলা হয় নিয়তের সাথে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিজেকে পানাহার ও সঙ্গম থেকে বিরত রাখাকে। আর এটা প্রকৃতপক্ষে একটা ইবাদত এবং উত্তম কাজ। কিন্তু কোরবাণীর দিনসমূহে রোযা রাখা এ কারণে হারাম যে, এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ মেহমানদারী বা আপ্যায়ন থেকে বিরত থাকা বোঝায়। যা অত্যন্ত অপছন্দনীয় ও মন্দ কাজ। সুতরাং কেমন যেন এর মধ্যে মূল কদার্যতা হলো আল্লাহর মেহমানদারীকে অবজ্ঞা করা। এ কারণে কোরবাণীর দিনসমূহের রোযার মধ্যেও কদার্যতা সৃষ্টি হয়েছে।

অতএব মূল রোযার মধ্যে যেহেতু কদার্যতা নেই এ কারণে এই সব দিনের রোযা قبيح لغيره হবে। আর রোযা থেকে বিরত থাকাটা যেহেতু একটা বিশেষণ বা وصف لازم অর্থাৎ আল্লাহর মেহমনাদারী থেকে বিমুখ থাকা রোযা থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। এ কারণেই এসকল রোযা قبيح لغيره وصفى হবে।

বাকী কোরবাণীর দিনসমূহের রোযার জন্য আল্লাহর মেহমানদারী থেকে বিরত থাকা وصف এর পর্যায়ে কেন? এর উত্তর এই যে, ওয়াক্ত তথা কোরবাণীর দিনসমূহ যা আল্লাহর মেহমানদারীর দিন। তা রোযা আদায় করার ক্ষেত্র। আর রোযার সংজ্ঞার মধ্যে ওয়াক্ত দাখিল রয়েছে। যেমন বলা হয়েছে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও সঙ্গম থেকে বিরত থাকাকে রোযা বলে। এর মধ্যে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় নিয়তের মধ্যে শামিল রয়েছে। এটা রোযার একটি অংশ। আর আল্লাহর মেহমানদারী থেকে দূরে থাকা এ অংশ (جزء) সময়ের একটি বিশেষণ ব

وصف আর যে اعراض (বিরত থাকা) جزء অর্থাৎ সময়ের বিশেষণ হয়ে থাকে তা كل অর্থাৎ কোরবাণী দিনের রোযারও বিশেষণ হবে।

মোটকথা যখন প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহর মেহমানদারী থেকে বিরত থাকাটা কোরবাণীর দিনের রোযার বিশেষণ। আর এটা কোরবাণীর দিনের রোযা থেকেও বিচ্ছিন্ন হয় না। অতএব কোরবাণীর দিনের রোযা قبيح لغيره وصفى হবে। এ কারণেই কোরবাণীর দিনের রোযা ফাসেদ গণ্য হবে। কেউ এ দিনে রোযা রাখলে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব হবে না। বরং তা ছেড়ে দেয়া এবং পরে কাযা করা ওয়াজিব হবে। যদি কেউ মধ্যবর্তী সময়ে রোযা ছেড়ে দেয় তাহলে তার কাযা ওয়াজিব হবে না।

কাযা ওয়াজিব না হওয়ার দলিল এই যে, শুরু করার দ্বারা পূর্ণ করা এ কারণে ওয়াজিব হয় যাতে শুরুকৃত বস্তু যে পরিমাণ আদায় করা হয়েছে সে পরিমাণের হেফাযত হতে পারে। কিন্তু কোরবাণীর দিন যেহেতু রোযা শুরু করার পরেও قبيح বা মন্দ হওয়ার কারণে আদায়কৃত পরিমাণের হেফাযত করা ওয়াজিব হয় না। এ কারণে আদায়কৃত পরিমাণের হেফাযত করার জন্য তা পূর্ণ করাও ওয়াজিব হবে না। আর পূর্ণ করা যেহেতু ওয়াজিব নয় কাজেই মধ্যবর্তী সময়ে ছেড়ে দেয়ার কারণে তার কাযা ও ওয়াজিব হবে না। কারণ ঐ জিনিসেরই কাযা করা ওয়াজিব হয় যা শুরু করার পরে পূর্ণ করা ওয়াজিব।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ النَّذْرِ : কোরবাণীর দিনসমূহে রোযা রাখার মান্নত করা এর বিপরীত। অর্থাৎ কেউ যদি এ সকল দিনে রোযা রাখার মান্নত করে এবং যিলহিজ্জার ৯ তারিখে বলে– আমি কাল রোযা রাখবো অথবা বললো– আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোরবাণীর দিন রোযা রাখার মান্নত করলাম। তাহলে এ মান্নত শুদ্ধ হবে। তবে সে কোরবাণীর দিন রোযা রাখবে না বরং পরে কাযা করবে। নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বে যদি কেউ রোযা রেখেই বসে তাহলে মান্নত পূর্ণ হয়ে যাবে। এর কাযা ওয়াজিব হবে না। কারণ রোযা যেভাবে সে নিজের উপর ওয়াজিব করেছিলো সেভাবেই সে আদায় করলো।

কোরবাণীর দিনসমূহে রোযার মান্নত করা জায়েয হওয়ার কারণ : আল্লাহর উদ্দেশ্যে রোযার মান্নত করা প্রকৃতপক্ষে একটি ইবাদত। আর কোরবাণীর দিনে রোযার মান্নত করছি এমন বলার মধ্যে কোনো قباحت নেই। কেননা গুণাহের কারণ হলো কেবল আল্লাহর মেহমানদারী থেকে বিরত থাকা। শুধু রোযা উল্লেখ করার দ্বারা বিরত থাকা সাব্যস্ত হয় না। কাজেই রোযার মান্নত করার মধ্যে কোনো দোষ নেই। তবে দোষ এবং পাপ এ কারণে যে, উক্ত দিনে সে রোযা রেখেছে। অতএব কোরবাণীর দিনে রোযা রাখা যেহেতু অন্যায় ও পাপ। এই কারণে সে উক্ত দিনে রোযা রাখবে না বরং পরে কাযা করবে। একথার উপরেই ফতওয়া। তবে যদি নিষেধ হওয়া সত্ত্বেও সে রোযা রাখে তবে মান্নত পূর্ণ হয়ে যাবে।

টীকা লেখকের ভাষ্যমতে এখানে একটি প্রশ্ন রয়েছে তা এই যে, রাসূলুল্লাহ (স) এরশাদ করেছেন لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللّٰهِ অর্থাৎ গুণাহের মান্নত করলে তা পূর্ণ করা যাবে না। কোরবাণীর দিন রোযার মান্নত করা অন্যায়। এ কারণে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব হবে না। আর ওয়াজিব না হওয়ার কারণে তার কাযাও ওয়াজিব না হওয়া উচিত। কারণ যা ওয়াজিব হয় তারই কাযা করতে হয়। যা আদায় করা ওয়াজিব নয় তা ছুটে গেলে কাযা করা ওয়াজিব নয়।

এর উত্তর এই যে, হাদীসে مَعْصِيَتْ দ্বারা مَعْصِيَتْ لِعَيْنِهَا উদ্দেশ্য। যেমন মদ পান করা। কেউ মদপানের মান্নত করলে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব নয়। এখানে কোরবাণীর দিনের রোযার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো অন্যায় নেই। বরং ভিন্ন কারণে তা মন্দ হয়েছে। অতএব উল্লেখিত হাদীস দ্বারা কোরবাণীর দিনের রোযার উপর কোনো প্রশ্ন আরোপিত হবে না।

بِخِلَافِ الصَّلٰوةِ فِى الْاَوْقَاتِ الْمَكْرُوْهَةِ فَاِنَّهَا وَاِنْ كَانَتْ مِنْ هٰذَا الْقِسْمِ اَيْضًا لٰكِنَّ الْوَقْتَ لَيْسَ دَاخِلًا فِىْ تَعْرِيْفِهَا وَلَا مِعْيَارًا لَّهَا فَلَمْ تَكُنْ فَاسِدَةً بَلْ مَكْرُوْهَةً تَلْزَمُ بِالشُّرُوْعِ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ بِالْاِفْسَادِ وَالْبَيْعُ وَقْتَ النِّدَاءِ مِثَالٌ لِمَا قَبُحَ لِغَيْرِهِ مُجَاوِرًا فَاِنَّ الْبَيْعَ فِىْ ذَاتِهِ اَمْرٌ مَشْرُوْعٌ مُفِيْدٌ لِلْمِلْكِ وَاِنَّمَا يَحْرُمُ وَقْتَ النِّدَاءِ لِاَنَّ فِيْهِ تَرْكُ السَّعْىِ اِلَى الْجُمُعَةِ الْوَاجِبِ بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ وَهٰذَا الْمَعْنٰى مِمَّا يُجَاوِرُ الْبَيْعَ فِىْ بَعْضِ الْاَحْيَانِ فِيْمَا اِذَا بَاعَ وَتَرَكَ السَّعْىَ وَيَنْفَكُّ عَنْهُ فِىْ بَعْضِ الْاَحْيَانِ فِيْمَا اِذَا سَعٰى اِلَى الْجُمُعَةِ وَبَاعَ فِى الطَّرِيْقِ بِاَنْ يَكُوْنَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِىْ رَاكِبَيْنِ فِىْ سَفِيْنَةٍ تَذْهَبُ اِلَى الْجَامِعِ - وَفِيْمَا اِذَا لَمْ يَبِعْ وَلَمْ يَسْعَ اِلَى الْجُمُعَةِ بَلِ اشْتَغَلَ بِلَهْوٍ اٰخَرَ فَهٰذَا الْبَيْعُ كَبَيْعِ الْغَاصِبِ يُفِيْدُ الْمِلْكَ بَعْدَ الْقَبْضِ

অনুবাদ ॥ এটা মাকরূহ সময়ে নামায আদায়ের বিপরীত। কেননা তা যদিও এ প্রকারের তবে সময়টা তার সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। আর তার জন্যে معيار নয়। সুতরাং নামায বিনষ্ট হবে না, বরং মাকরূহ হবে। অতএব নামায আরম্ভ করার কারণে তা আবশ্যক হবে এবং ভঙ্গ করলে কাযা ওয়াজিব হবে। আর আযানের সময় ক্রয়-বিক্রয় করা قبيح لغيره مجاورى তথা যে নাহী পার্শ্ববর্তী আনুষঙ্গিক কারণে মন্দ তার উদাহরণ। কেননা প্রকৃতপক্ষে ক্রয়-বিক্রয় মালিকানা সাব্যস্তকারী একটি বিধিসম্মত কাজ। আযানের সময়ে বেচা-কেনা হারাম। কেননা এর দ্বারা জুমুআর নামায আদায়ের চেষ্টা ত্যাগকরণ সাব্যস্ত হয়। যা আল্লাহর এ কথা দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়েছে– তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ছুটে এসো এবং বেচা-কেনা পরিত্যাগ কর'। আর উক্ত অর্থ অর্থাৎ জুমুআর নামাযের দিকে ধাবিত হওয়া পরিত্যক্ত হওয়া কোন কোন সময়ে بيع তথা ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার দরুন হয়ে থাকে। (যেমন) যখন ক্রয়-বিক্রয় করে এবং জুমুআর দিকে ধাবিত হওয়া পরিত্যাগ করে। আবার কখনো ধাবিত হওয়া বিচ্ছিন্ন হতে পারে। যখন জুমুয়ার দিকে ধাবিত হয় এবং রাস্তার মধ্যে বেচা-কেনা করে এভাবে যে, ক্রেতা এবং বিক্রেতা নৌকায় আরোহী থাকে যা জামে মসজিদের দিকে অগ্রসর হয়।

আর যখন ক্রয়-বিক্রয় করবে না এবং জুমুআর নামাযের দিকেও ছুটে যাবে না, বরং কোন অনর্থক কাজে ব্যস্ত থাকবে। তখন এই ক্রয়-বিক্রয় অপহরণকারীর ক্রয়-বিক্রয়ের মত হবে যা হস্তগত করার পর মালিকানার উপকারিতা প্রদান করে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله بخلاف الصلوة الخ : ব্যাখ্যাকার বলেন– নামাযের মাকরূহ ওয়াক্তসমূহে নামায পড়ার বিধানও কোরবাণীর দিনসমূহে রোযা রাখার বিপরীত। কারণ মাকরূহ ওয়াক্তসমূহে নামায পড়া মাকরূহ। কাজেই তখন নামায না পড়াই উচিত। তবে যদি কেউ নামায শুরু করে তা নষ্ট করে তাহলে তা কাযা করা ওয়াজিব। মোটকথা মাকরূহ ওয়াক্তসমূহে নামায পড়া যদিও কোরবাণীর দিনের রোযা রাখার ন্যায় قبيح لغيره নয় তবে নামাযের সংজ্ঞার মধ্যে ওয়াক্ত দাখিল নেই এবং তা নামাযের জন্য معيار ও নয় বরং যরফ। আর রোযার জন্য ওয়াক্ত হলো معيار এবং তা রোযার সংজ্ঞার মধ্যে দাখিল রয়েছে। এ কারণেই ওয়াক্ত ফাসেদ হওয়া নামায ফাসেদ হওয়ার মধ্যে ক্রিয়াশীল হবে। কিন্তু নামাযের মধ্যে ওয়াক্ত ফাসিদ হওয়া নামায ফাসিদ হওয়ায় ক্রিয়াশীল হবে না।

অর্থাৎ নামায ফাসিদ হবে না বরং মাকরূহ হবে। এ কারণে শুরু করলে তা ওয়াজিব হয়ে যাবে এবং ফাসিদ করলে তা কাযা করা ওয়াজিব হবে।

টীকা লেখক الصبح الصادق এর বরাতে লেখেন- নিষিদ্ধ সময়ে নামায পড়া নিষেধ হওয়ার ব্যাপারে যে বিধান আরোপিত হয়েছে উক্ত نهى হারাম বোঝানোর জন্য নয় বরং মাকরূহ বোঝানোর জন্য। এ কারণে এসকল সময়ে নামায পড়া এবং কোরবাণীর দিনে রোযা রাখা ফাসেদ ও হারাম হওয়ার ব্যাপারে সমপর্যায়ের।

قوله وَالْبَيْعُ وَقْتَ النِّدَاءِ : ব্যাখ্যাকার বলেন- জুমআর প্রথম আযানের পরে বেচা-কেনা করা قبيح لغيره جوارى এর উদাহরণ। কারণ প্রকৃতপক্ষে বেচা-কেনা বৈধ জিনিস। এবং তা মালিকানার ফায়দা দেয়। এর সত্তার মধ্যে কোনো দোষ নেই। তবে পারিপার্শ্বিক কারণে এর মধ্যে কদার্যতা ও দোষ সৃষ্টি হয়েছে। তাহলো আল্লাহ তা'আলার আদেশ অমান্য করা। কারণ তিনি এরশাদ করেছেন إِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ অতএব জুমআর জন্য গমন করা ওয়াজিব। এখন কেউ যদি আযানের পরে বেচা-কেনা করে তাহলে এর দ্বারা سعى বর্জন করা সাব্যস্ত হয় যা হারাম ও নাজায়িয। আর হারামের সবাবও যেহেতু হারাম হয়ে থাকে। এ কারণে শুক্রবারে জুমআর আযানের পরে বেচা-কেনা করাও হারাম হবে। তবে পারিপার্শ্বিক বিষয়টি অর্থাৎ নামাযের জন্য গমন জুমআর আযানের পরে প্রত্যেক বেচাকেনার ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। যেমন কোনো ব্যক্তি নৌকায় চড়ে জুমআর উদ্দেশ্যে গমনের পথে নৌকায় বসেই বেচা-কেনা করলো। তাহলে এতে আদেশ পালনে কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি হয় না। আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে। যেমন- দোকানে বসেই বেচা-কেনা করলো।

মোটকথা বোঝা গেলো যে, জুমআর আযানের পরে বেচা-কেনা করা ترك سعى الى الجمعة জরুরি করে না। বরং কখনো পাওয়া যায়, কখনো পাওয়া যায় না। আর এমন বিষয়টি قبيح لغيره جوارى এর ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, জুমআর আযানের পরে বেচা-কেনা قبيح لغيره جوارى এর উদাহরণ।

নূরুল আনওয়ার গ্রন্থকার বলেন- জুমআর আযানের পরে বেচা-কেনা ছিনতাইকারীর বেচা-কেনার ন্যায় অর্থাৎ ছিনতাইকারীর ছিনতাইকৃত বস্তু বিক্রি করার পর তা করায়ত্ত করা মালিকানা সাব্যস্ত করে। অর্থাৎ ক্রেতা পণ্যের মালিক হয়ে যায়। তদ্রূপ জুমআর আযানের পরে বেচা কেনা করলে এবং ক্রেতা পণ্য করায়ত্ত করলে সে তার মালিক হয়ে যাবে।

টীকা লেখক বলেন- এক্ষেত্রে ব্যাখ্যাকারের একাধিক ভ্রান্তি ঘটেছে। ১. প্রথম এই যে, জুমআর আযানের পরে বেচা-কেনা بيع فاسد নয়। বরং মাকরূহ তাহরিমী। আর মাকরূহ বেচা-কেনায় করায়ত্ত করার পূর্বে ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যায়। যার দরুন ক্রেতার উপর মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। হেদায়ার হাশিয়ায় এভাবেই উল্লেখিত হয়েছে। ব্যাখ্যাকার বলেন- জুমআর আযানের পরে বেচা-কেনাকে ফাসেদ সাব্যস্ত করা এবং করায়ত্ত করার পরে মালিকানার ফায়দা দানকারী সাব্যস্ত করা ভুল।

২. দ্বিতীয় বিচ্যুতি : ছিনতাইকারীর ছিনতাইকৃত দ্রব্য বিক্রি করা মালিকের অনুমতির উপর মওকূফ থাকে। এ বেচাকেনার দ্বারা ক্রেতার জন্য মালিকানা সাব্যস্ত হওয়াও মালিকের অনুমতির উপর মওকূফ। এমন নয় যে, করায়ত্ত করার পরে ক্রেতার জন্য এ বেচা-কেনা পূর্ণ মালিকানার ফায়দা দেয়। অর্থাৎ ছিনতাইকারীর বেচা-কেনায় ক্রেতার করায়ত্ত করা সত্ত্বে মালিকানা সাব্যস্ত হয় না। বরং মালিকের অনুমতির উপর মওকূফ থাকে। হেদায়া এবং দূররে মুখতার গ্রন্থে এমনই উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং ব্যাখ্যাকারের ছিনতাইকারীর বেচাকেনাকে ক্রেতার পণ্য করায়ত্ত করার পরে মালিকানার ফায়দা দেয়া সাব্যস্ত করা সম্পূর্ণ ভুল।

সারকথা এই যে, পণ্য করায়ত্ত করার পরে বেচাকেনাকে মালিকানার ফায়দা প্রদানকারী সাব্যস্ত করা بيع فاسد এর বিধানের অন্তর্গত। আর ব্যাখ্যাকার এটাকে মাকরূহ ও মওকূফ বেচা-কেনার জন্য সাব্যস্ত করেছেন। মাকরূহ, মওকূফ ও ফাসেদ বেচা-কেনার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। অথচ তিনি সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে বলেছেন।

وَمِثْلُه وَطْئُ الْحَائِضِ مَشْرُوْعٌ مِنْ حَيْثُ اَنَّهَا مَنْكُوْحَةٌ وَاِنَّمَا يَحْرُمُ لِاَجْلِ الَّذِىْ وَهُوَ مِمَّا يُمْكِنُ اَنْ يَنْفَكَّ عَنِ الْوَطْئِ بِاَنْ يُوْجَدَ الْوَطْئُ بِدُوْنِ الْاَذٰى وَالْاَذٰى بِدُوْنِ الْوَطْئِ وَكَذَا الصَّلٰوةُ فِى الْاَرْضِ الْمَغْصُوْبَةِ مَشْرُوْعَةٌ فِىْ ذَاتِهَا وَاِنَّمَا تَحْرُمُ لِاَجْلِ شُغْلِ مِلْكِ الْغَيْرِ وَهُوَ مِمَّا يَنْفَكُّ عَنِ الصَّلٰوةِ بِاَنْ تُوْجَدَ الصَّلٰوةُ بِدُوْنِ شُغْلِ مِلْكِ الْغَيْرِ بَلْ فِىْ مِلْكِ نَفْسِه وَيُوْجَدَ الشُّغْلُ بِدُوْنِ الصَّلٰوةِ بِاَنْ يَسْكُنَ فِيْهِ وَلَا يُصَلِّىْ

অনুবাদ ॥ হায়েযা নারীর সাথে সহবাস করাও ক্রয়-বিক্রয়ের অনুরূপ। কেননা সে নারী বিবাহিতা হওয়ার কারণে এ সহবাস বিধিসম্মত; তবে হায়েযের অপবিত্রতার কারণে তা হারাম। আর এটা এমন যা সহবাস থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে। এভাবে যে, সহবাস অপবিত্রতাবিহীন অবস্থায় পাওয়া যাবে এবং অপবিত্রতা পাওয়া যাবে সহবাসবিহীন অবস্থায়।

অনুরূপভাবে জবরদখলকৃত জায়গায় নামায আদায় করা (قبيح لغيره جوارى এর উদাহরণ)। এটা মৌলিকভাবেভাবেই বিধিসম্মত, অন্যের মালিকানাধীন ভূমিতে নামায আদায় করার কারণে তা এমন যা নামায থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে। এভাবে যে, অন্যে মালিকানাধীন ভূমিতে নামায আদায় না করে বরং নিজের ভূমিতে আদায় করবে। আবার شغل বা কাজ এভাবে পাওয়া যায় যে, সে তাতে বসবাস করবে কিন্তু নামায আদায় করবে না।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ وَمِثْلُه وَطْئُ الْحَائِضِ مَشْرُوْعٌ الخ : ব্যাখ্যাকার বলেন– জুমআর আযানের সময় এবং জুমআর আযানের পরে বেচা-কেনা مشروع (বৈধ) হওয়ার উদাহরণ ঋতুবতী মহিলার সাথে সঙ্গম করা। কেননা ঋতুবতী মহিলা তার বিবাহিতা স্ত্রী। অতএব তার জন্য সঙ্গম বৈধ। কিন্তু ক্ষেত্র যেহেতু নাপাক এ কারণে তা হারাম হয়েছে। এদিক দিয়ে এটা قبيح لغيره এর আলামত। আর ঋতুর দ্বারা অপবিত্র হওয়া সঙ্গম দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তা এভাবে যে, ঋতুকাল ছাড়া সঙ্গম করলে তা ঋতুর অপবিত্র ছাড়াই পাওয়া যায়। ঋতুকালে যদি সঙ্গম না করে তাহলে ঋতুর অপবিত্রতা সঙ্গমবিহীন পাওয়া গেলো। মোটকথা যখন ঋতুর অপবিত্রতা এবং সঙ্গমের মধ্যে কোনো অপরিহার্যতা নেই বরং একটি অপরটি থেকে পৃথক হতে পারে। কাজেই এটি قبيح لغيره مجاورا এর উদাহরণ হলো।

এভাবে জবর দখলকৃত ভূমিতে নামায পড়া প্রকৃতপক্ষে জায়েয; কিন্তু হারাম এ কারণে যে, সে অন্যের মালিকানাধীন বস্তুকে তার বিনা অনুমতিতে কাজে লাগিয়েছে। আর অন্যের মলিকানাধীন বস্তুকে কাজে লাগানো এবং নামায পড়া একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে। যেমন কেউ নিজের জমিতেই নামায আদায় করলো। তাহলে নামায অন্যের মালিকানাধীন বস্তুকে কাজে লাগানো ছাড়াই পাওয়া গেলো। কেউ যদি অন্যের জমিতে তার অনুমতি ছাড়াই অবস্থান করে এবং তাতে নামায না পড়ে। তাহলে অন্যের মালিকানাধীন বস্তুকে কাজে লাগানো নামায ছাড়াই পাওয়া গেলো। মোটকথা অন্যের মালিকানাধীন বস্তুকে কাজে লাগানো এবং নামাযের মধ্যে যেহেতু অপরিহার্যতা নেই বরং একটি অপরটি থেকে পৃথক হতে পারে। কাজেই এটা قبيح لغيره مجاورا এর উদাহরণ হলো।

وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ تَقْسِيْمِ النَّهْيِ اَرَادَ اَنْ يُبَيِّنَ اَنَّ اَىَّ نَهْيٍ يَقَعُ عَلَى الْقِسْمِ الْاَوَّلِ وَاَىَّ نَهْيٍ يَقَعُ عَلَى الْقِسْمِ الْاٰخَرِ فَقَالَ وَالنَّهْىُ عَنِ الْاَفْعَالِ الْحِسِّيَّةِ يَقَعُ عَلَى الْقِسْمِ الْاَوَّلِ وَالْمُرَادُ بِالْاَفْعَالِ الْحِسِّيَّةِ مَا تَكُوْنُ مَعَانِيْهَا الْمَعْلُوْمَةُ الْقَدِيْمَةُ قَبْلَ الشَّرْعِ بَاقِيَةً عَلَى حَالِهَا لَا تَتَغَيَّرُ بِالشَّرْعِ كَالْقَتْلِ وَالزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ بَقِيَتْ مَعَانِيْهَا وَمَاهِيَاتُهَا بَعْدَ نُزُوْلِ التَّحْرِيْمِ عَلَى حَالِهَا وَلَا يُرَادُ اَنَّ حُرْمَتَهَا حِسِّيَّةٌ مَعْلُوْمَةٌ بِالْحِسِّ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الشَّرْعِ - فَالنَّهْىُ عَنْ هٰذِهِ الْاَفْعَالِ عِنْدَ الْاِطْلَاقِ وَعَدَمِ الْمَوَانِعِ يَقَعُ عَلَى الْقَبِيْحِ لِعَيْنِهِ اِلَّا اِذَا قَامَ الدَّلِيْلُ عَلَى خِلَافِهِ كَالْوَطْيِ حَالَةَ الْحَيْضِ حَرَامٌ لِغَيْرِهِ مَعَ اَنَّهُ فِعْلٌ حِسِّيٌّ لِقِيَامِ الدَّلِيْلِ وَعَنِ الْاُمُوْرِ الشَّرْعِيَّةِ يَقَعُ عَلَى الَّذِىْ اتَّصَلَ بِهِ وَصْفًا عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ عَنِ الْاَفْعَالِ الْحِسِّيَّةِ اَىْ وَالنَّهْىُ عَنِ الْاُمُوْرِ الشَّرْعِيَّةِ يَقَعُ عَلَى الْقِسْمِ الَّذِىْ اتَّصَلَ بِهِ الْقُبْحُ وَصْفًا يَعْنِىْ يُحْمَلُ عَلَى اَنَّهُ قَبِيْحٌ لِغَيْرِهِ وَصْفًا

অনুবাদ ॥ মুসান্নিফ (র) نهى এর প্রকারভেদের আলোচনা থেকে অবসর হয়ে এখন তিনি কোন প্রকার প্রথম প্রকারভুক্ত এবং কোন প্রকার অন্য প্রকারভুক্ত তা বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন- *'افعال حسية থেকে নিষেধাজ্ঞা' প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।* আর افعال حسية দ্বারা উদ্দেশ্য হল– যার অর্থ শরীআতের হুকুম আরোপিত হবার পূর্বে পূর্ণ পরিজ্ঞাত ছিল। আর শরীআতের হুকুম আরোপিত হবার পরও পূর্বাবস্থার ওপর বহাল থাকে। শরীআতের দ্বারা তাতে কোন পরিবর্তন সূচিত হয় না। যেমন- হত্যা, ব্যভিচার, মদ্যপান এগুলোর অর্থ এবং এগুলোর হাকীকত নিষিদ্ধকরণের হুকুম প্রয়োগ হওয়ার পরও স্ব-অবস্থায় বহাল রয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, এগুলোর অবৈধতা অনুভূতি নির্ভর যা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুমিত হয়, শরীআতের ওপর এগুলোর অবৈধতা নির্ভরশীল নয়।

সুতরাং এ افعال حسّيّة সংক্রান্ত نهى সাধারণ ও প্রতিবন্ধকতা না থাকাবস্থায় قبيح لعينه তথা সত্তাগত মন্দের অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে যদি এর বিপরীতে কোন দলীল প্রতিষ্ঠিত হয় তবে তা قبيح لعينه এর প্রকারভুক্ত হবে না। যেমন হায়েয অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা নিষিদ্ধ, এটা فعل حسى হওয়া সত্ত্বে এর স্বপক্ষে দলিল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে তা قبيح لغيره গণ্য হবে। *"আর افعال شرعية থেকে নিষেধাজ্ঞা ঐ প্রকারভুক্ত যা গুণগত কারণে মন্দ"।* এটা عطف হয়েছে গ্রন্থকারের উক্তি عن الافعال الحسية এর উপরে। অর্থাৎ শরয়ী কার্যাবলী সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা ঐ প্রকারের সাথে জড়িত যার সাথে গুণগতভাবে মন্দ যুক্ত। অর্থাৎ قبيح لغيره وصفى আনুষঙ্গিক ও গুণগত কারণে মন্দ হওয়ার উপরে প্রয়োগ হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله ولما فرغ عن تقسيم النهى الخ : ব্যাখ্যাকার বলেন– মুসান্নিফ (র) نهى এর প্রকারভেদ বর্ণনার পরে বর্ণনা করতে চাচ্ছেন যে, কোন ধরনের نهى প্রথম প্রকারের অর্থাৎ قبيح لعينه এর উপর প্রযোজ্য হবে এবং কোনটি قبيح لغيره তথা দ্বিতীয় প্রকারের উপর প্রযোজ্য হবে।

মুসান্নিফ (র) বলেন– افعال حسية এর ব্যাপারে যে, পাওয়া যাবে তা قبح لعينه এর উপর প্রযোজ্য হবে।

নূরুল আনওয়ার এর মুসান্নিফ (র) বলেন افعال حسية দ্বারা এ উদ্দেশ্য নয় যে, এ সকল কাজ হারাম হওয়াটা حس তথা ইন্দ্রেয় গ্রাহ্য। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বোঝা যায় এবং শরীআতের উপর মওকূফ নয়। কেননা হারাম হওয়া আহকামের মধ্যেই পাওয়া যায়। আর আমাদের মতে বিধান সাব্যস্ত হয় শরীআত দ্বারা অন্য কোনো দলিল দ্বারা নয়। বরং افعال حسية দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ সকল কাজের হাকীকত ও উদ্দেশ্য শরীআত নাযিলের পূর্বেই পাওয়া যাওয়া এবং বর্তমান পর্যন্ত স্বঅবস্থায় বহাল থাকা। শরীআতের কারণে তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন সৃষ্টি হয়না। যেমন– হত্যা, ব্যভিচার ও মদ পান। এসকল কাজের সত্তা তাহরীম নাযিল হওয়ার পরেও স্ব অবস্থায় বহাল রয়েছে। যেমন– হত্যার যে অর্থ حرمت নাযিল হওয়ার পূর্বে ছিলো হারামের বিধান নাযিলের পরেও তেমন রয়েছে। শরীআত আসার দ্বারা এর মধ্যে কোনো প্রকার পরিবর্তন হয়নি।

এভাবে ব্যভিচারের অর্থ ব্যভিচার হারাম হওয়ার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পরে কোনারূপ পরিবর্তন হয়নি। কেননা এর অর্থ হলো অপাত্রে লজ্জাস্থান প্রয়োগ করা। কারো মতে এমন পাত্রে সঙ্গম করা যা বিবাহ বা দাসত্বের মালিকানা সূত্র মুক্ত এবং বিবাহ ও দাসত্বের সন্দেহমূলক মালিকানা থেকেও মুক্ত। দাসত্বের সন্দেহমূলক মালিকানা তথা মিলকে ইয়ামিনের সন্দেহ এভাবে যে, কোনো ব্যক্তি নিজ পুত্রের বাঁদীর সাথে সঙ্গম করলো। আর বিবাহের মালিকানার সন্দেহমূলক অবস্থা এই যে, এক ব্যক্তি কোনো মহিলাকে সাক্ষীর অনুপস্থিতিতে বিবাহ করে তার সাথে সঙ্গম করলো।

মোটকথা শরীআত প্রবর্তনের পূর্বে ব্যভিচারের যে অর্থ ছিলো শরীআত অবতীর্ণ হওয়ার পরেও একই অর্থ রয়েছে। এর মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসেনি। এভাবে মদ পানের যে অর্থ পূর্বে ছিলো পরেও একই অর্থ রয়েছে। এর মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসেনি।

সারকথা افعال حسية এর উপর যে নাহী আরোপিত হয় এবং তার উপর কোনো আলামত না থাকে, আর কোনো প্রতিবন্ধকও না থাকে তা قبح لعينه এর উপর প্রযোজ্য হবে। কারণ قبح لعينه হলো আসল। আর মুতলাক হওয়ার ক্ষেত্রে অর্থাৎ কোনো আলামত বা প্রতিবন্ধক না থাকলে আসল ধর্তব্য হয়। এ কারণেই মুতলাক ক্ষেত্রে افعال حسية এর উপর আরোপিত নাহী দ্বারা قبح لعينه প্রমাণিত হবে। তবে যদি এর বিপরীত অর্থাৎ قبح لغيره এর উপর কোন দলিল পাওয়া যায় তখন قبح لغيره এবং حرام لغيره- বোঝাবে। যেমন হায়েয অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা قبح لغيره ও حرام لغيره অথচ সহবাস করা فعل حسي তবে যেহেতু قبح لغيره হওয়ার ব্যাপারে দলিল তথা يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ বিদ্যমান রয়েছে। এ কারণেই তা قبح لغيره হচ্ছে।

قوله وعن الامور الشرعية يقع الخ : মুসান্নিফ (র) বলেন– শরয়ী বিষয়ে যে নাহী উল্লেখিত হয় তার দ্বারা قبح لغيره وصفي সাব্যস্ত হয়। অর্থাৎ নিষিদ্ধ কাজ যদি শরীআত বিষয়ক হয় তা হলে তা قبح لغيره وصفي হবে। এটাকে وصفي এ জন্য বলা হয় যে, এটাই অধিকাংশ ও প্রসিদ্ধ। নতুবা কখনো কখনো তা قبح لغيره ও مجاورا বোঝায়। যেমন– জবরদখলকৃত জমিতে নামায পড়ার ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে তাতে قبح لغيره مجاورا সাব্যস্ত হয়। অথচ নামায শরীআত বিষয়ক কাজ; فعل حسي নয়। মোটকথা নিষিদ্ধ কাজ যদি শরীআত বিষয়ক হয় তাহলে তা قبح لغيره وصفي হবে।

وَالْمُرَادُ بِالْأُمُورِ الشَّرْعِيَّةِ مَا تَغَيَّرَتْ مَعَانِيْهَا الْأَصْلِيَّةُ بَعْدَ وُرُوْدِ الشَّرْعِ بِهَا كَالصَّوْمِ وَالصَّلٰوةِ وَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ فَإِنَّ الصَّوْمَ هُوَ الْإِمْسَاكُ فِي الْأَصْلِ زِيْدَتْ عَلَيْهِ فِي الشَّرْعِ أَشْيَاءُ وَالصَّلٰوةُ هُوَ الدُّعَاءُ زِيْدَتْ عَلَيْهِ أَشْيَاءُ وَالْبَيْعُ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ فَقَطْ زِيْدَتْ عَلَيْهَا أَهْلِيَّةُ الْعَاقِدَيْنِ وَمَحَلِّيَّةُ الْمَعْقُوْدِ عَلَيْهِ وَغَيْرُ ذٰلِكَ وَالْإِجَارَةُ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَنَافِعِ زِيْدَتْ عَلَيْهِ مَعْلُوْمِيَّةُ الْمُسْتَاجِرِ وَالْأُجْرَةُ وَالْمُدَّةُ وَغَيْرُ ذٰلِكَ فَالنَّهْيُ عَنْ هٰذِهِ الْأَفْعَالِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يُحْمَلُ عَلَى الْقُبْحِ الْوَصْفِيِّ إِلَّا إِذَا دَلَّ الدَّلِيْلُ عَلٰى كَوْنِهِ قَبِيْحًا لِعَيْنِهِ كَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِيْنِ وَالْمَلَاقِيْحِ وَصَلٰوةِ الْمُحْدِثِ لِأَنَّ الْقُبْحَ يَثْبُتُ إِقْتِضَاءً فَلَا يَتَحَقَّقُ عَلٰى وَجْهٍ يَبْطُلُ بِهِ الْمُقْتَضٰى وَهُوَ النَّهْيُ دَلِيْلٌ عَلَى الدَّعْوَى الْأَخِيْرَةِ وَبَيَانُهُ يَقْتَضِيْ بَسْطًا وَهُوَ أَنَّ فِي النَّهْيِ عَنِ الْأَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ إِخْتِلَافًا

অনুবাদ ॥ শরয়ী কার্যাবলী দ্বারা উদ্দেশ্য হল শরীআতের বিধান আরোপিত হওয়ার পর যার মূল পথ পরিবর্তন হয়ে গেছে। যেমন- রোযা রাখা, নামায কায়েম করা, ক্রয়-বিক্রয় করা, ভাড়া দেওয়া। কেননা ধাতুগত অর্থে صوم হলো বিরত থাকা। আর শরীআতের বিধানভুক্ত হওয়ার পর এর মধ্যে কতিপয় বস্তু বৃদ্ধি করা হয়েছে। صلوة হলো- প্রার্থনা করা। (অতঃপর) এর মধ্যে কতিপয় বস্তু বৃদ্ধি করা হয়েছে।

بيع হলো শুধুমাত্র মালের বিনিময়ে মাল লেন-দেন করা। এর মধ্যে ক্রেতা-বিক্রেতা যোগ্য হওয়া, مبيع (পণ্য) বিক্রয়যোগ্য হওয়া ইত্যাদি (শর্ত) বৃদ্ধি করা হয়েছে। আর اجارة হলো- মুনাফাসহ মালের বিনিময়ে মাল আদান-প্রদান করা। (অতঃপর) এর মধ্যে ইজারা গ্রহণকারী মুনাফার পরিমাণ, ভাড়া ও সময় ইত্যাদি জ্ঞাত হওয়া (এ শর্ত) বৃদ্ধি করা হয়েছে।

সুতরাং, সাধারণতঃ উক্ত কার্যাবলী সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা قبيح لغيره وصفى তথা আনুষঙ্গিক গুণগত মন্দের প্রকারভুক্ত হবে। কিন্তু দলিল যদি এর বিপক্ষে قبيح لعينه হওয়ার স্বপক্ষে ইংগিত বহন করে (তবে তাই হবে)। যেমন- بيع مضامين এবং ملاقيح নিষিদ্ধ হওয়া এবং উযূ ভঙ্গকারীর নামায নিষিদ্ধ হওয়া। *কেননা মন্দ সাব্যস্ত হয় চাহিদা অনুযায়ী। এভাবে মন্দ সাব্যস্ত হবে না যার দ্বারা কাঙ্ক্ষিত বস্তু বাতিল হয়ে যায়। আর তা হল নিষেধাজ্ঞা।* এটা শেষোক্ত দাবীর দলিল। এর বিবরণ বিস্তারিত বর্ণনা সাপেক্ষ। এই যে, শরয়ী বিষয়ে নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে ইমামদের মতানৈক্য রয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ শরীআত বিষয়ক কাজ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উক্ত কাজের মূল অর্থ শরীআত অবতীর্ণ হওয়ার পরে পরিবর্তন হয়ে যাওয়া। যেমন নামায, রোযা বেচা-কেনা, ইজারা। কেননা রোযার আভিধানিক অর্থ হলো বিরত রাখা। কিন্তু শরীআতে এর ভিতর কয়েকটি জিনিস অতিরিক্ত করা হয়েছে। যেমন– ১. পানাহার ও সহবাস থেকে বিরত থাকা, ২. সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় হওয়া, ৩. নিয়ত করা।

এভাবে صلوة এর আভিধানিক অর্থ হলো দোয়া। কিন্তু শরীআতে এর উপর রুকু, সাজদা, কিয়াম, কেরআত, বসা ইত্যাদি কাজ বৃদ্ধি করেছে। এভাবে بيع এর অর্থ হলো এক মালকে অন্য মালের দ্বারা পরিবর্তন করা। শরীআতে এর মধ্যে কয়েকটি জিনিস বৃদ্ধি করেছে। যেমন– ১. ক্রেতা-বিক্রেতা বিবেকবান হওয়া, ২. পণ্য উপস্থিত থাকা, ৩. পণ্য বিক্রেতার মালিকানাধীন হওয়া, ৪. ক্রেতা-বিক্রেতা একে অন্যের কথা শ্রবণ করা ইত্যাদি।

ইজারার অর্থ হলো– পণ্যের উপকারীতা দ্বারা মালের বিনিময় করা। কিন্তু শরীআতে এর সাথে কয়েকটি জিনিস বৃদ্ধি করেছে ১. ইজারা গৃহীত বস্তু নির্দিষ্ট হওয়া, ২. পারিশ্রমিক বা ভাড়া নির্দিষ্ট হওয়া, ৩. মেয়াদ নির্দিষ্ট হওয়া, ৪. ভাড়ায় গৃহীত বস্তু দ্বারা উপকার গ্রহণ ভাড়াকারীর জন্য সম্ভাব্য হওয়া। যেমন– পলাতক গোলামকে ভাড়া নেয়া জায়েয নয়। কারণ তার দ্বারা উপকার গ্রহণ করা বাস্তবে সম্ভব নয়। এভাবে গোণাহ করার জন্য কোনো বস্তু ভাড়া গ্রহণ করা জায়েয নয়। কারণ তার দ্বারা শরীআতে উপকার লাভ করা সম্ভব নয়।

মোটকথা কাজের মূল অর্থ যদি শরীআত প্রবর্তনের পর পরিবর্তন হয়ে যায় তাহলে তাকে افعال شرعية বলে। আর তার উপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি হয় তাকে قبيح لغيره وصفا বলে। এ জন্য শর্ত হলো নিষেধাজ্ঞা মুতলাক তথা কোনো আলামত ও প্রতিবন্ধক মুক্ত হওয়া। হ্যা, যদি এ ব্যাপারে কোনো দলিল থাকে যে, শরয়ী কাজের উপর যে নিষেধাজ্ঞা জারী হয় তা কাজটি قبيح لعينه হওয়া বোঝায়। তাহলে সেক্ষেত্রে নিষিদ্ধ কাজটি শরীআত বিষয়ক হলেও তা قبيح لعينه হবে। যেমন بيع مضامين ও بيع ملاقيح দ্বারা নিষিদ্ধ قبيح لعينه বোঝায়। অপবিত্র ব্যক্তির নামাযের ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তা قبيح لعينه বোঝায়। অথচ তিনোটি কাজ শরীআত বিষয়ক। কেননা এগুলো قبيح لعينه হওয়ার ব্যাপারে দলিল বিদ্যমান রয়েছে।

দলিল এই যে, مضامين শব্দটি مضمونة এর বহুবচন। بيع مضمونة বলা হয় যেমন এক ব্যক্তি বললো আমার এ নর পশুর বীর্য দ্বারা যে বাচ্চা হবে আমি তাকে এ পরিমাণ মূল্যে ক্রয় করলাম। আর ملاقيح শব্দটি ملقوحة এর বহুবচন। بيع ملقوحة বলা হয় যেমন এক ব্যক্তি বললো আমার এ মাদি পশুর পেটে যে বাচ্চা আছে আমি তা বিক্রি করলাম। এ দুয়োটি বেচা-কেনা জাহিলী যুগে প্রচলিত ছিলো। রাসূলুল্লাহ (স) এ ধরনের বেচাকেনা নিষিদ্ধ করেছেন। যেমন– মুসলিম শরীফের দ্বিতীয় খন্ডে বর্ণিত রয়েছে।

অতএব এ উভয় বেচা-কেনা قبيح لعينه হওয়ার ব্যাপারে দলিল রয়েছে যে, বেচা-কেনার রোকন হলো مبيع বা পণ্য। আর এ উভয় বেচা-কেনায় পণ্য অনুপস্থিত। অতএব এ ধরনের বেচা-কেনা বাতিল গণ্য হবে। কেমন যেন এর সত্তার মধ্যেই কদার্যতা রয়েছে। আর যার সত্তার মধ্যে কদার্যতা থাকে তা قبيح لعينه বিবেচিত হয়। এ কারণে এ দুয়োটি বেচা-কেনা قبيح لعينه হবে।

অপবিত্র অবস্থায় নামায قبيح لعينه হওয়ার দলিল : বান্দা নামায আদায়ের যোগ্য হয় পবিত্র অবস্থায়, কাজেই অপবিত্র অবস্থায় নামায আদায় করা নিঃসন্দেহে قبيح لعينه হবে।

قوله لِاَنَّ الْقُبْحَ يَثْبُتُ اِقْتِضَاءً الخ : পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, افعال حسية বিষয়ে উল্লেখিত নিষেধাজ্ঞা قبيح لعينه দাবি করে। আর افعال شرعية বিষয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হলে তা قبيح لغيره দাবি করে।

এখান থেকে মুসান্নিফ (র) দ্বিতীয় দাবি তথা افعال شرعية এর উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা দ্বারা قبيح لغيره - প্রমাণিত করার ব্যাপারে দলিল পেশ করছেন। (এর বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী পৃ: দ্র:)

فَقَالَ الشَّافِعِيُّ رح اِنَّهُ يَقْتَضِى الْقُبْحَ لِعَيْنِه وهُوَ الكَامِلُ قِيَاسًا عَلَى الْاَوَّلِ عَلٰى مَا يَاتِىْ ونَحْنُ نقولُ اِنَّ النَّهْىَ يُرَادُ بِه عَدَمُ الفِعْلِ مُضَافًا اِلَى اِخْتِيَارِ الْعِبَادِ فَاِنْ كَفَّ عَنِ الْمَنْهِى عنه بِاخْتِيَارِه يُثَابُ عليه ولا يُعَاقَبُ عليه واِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّه اِخْتِيَارٌ سُمِّىَ ذٰلِكَ الكَفُّ نَفْيًا ونَسْخًا لَا نَهْيًا كَمَا اِذَا لَمْ يَكُنْ فِى الكُوْزِ مَاءٌ وُيقال لَهُ لا تَشْرَبْ فَهٰذَا نَفْىٌ واِنْ قِيْلَ لَهُ ذٰلِكَ بِوُجُوْدِ الْمَاءِ سُمِّىَ نَهْيًا فَالاَصْلُ فِى النَّهْىِ عَدَمُ الْفِعْلِ بِالْاِخْتِيَارِ وَالقُبْحُ اِنَّمَا يَثْبُتُ فِى النَّهْىِ اِقْتِضَاءً ضرورةَ حِكْمَةِ النَّاهِىْ فَيَنْبَغِىْ اَنْ لَا يَتَحَقَّقَ هٰذَا الْقُبْحُ عَلٰى وَجْهٍ يَبْطُلُ بِه المُقْتَضٰى اَعْنِى النَّهْىَ لِاَنَّه اِذَا اَخَذَ الْقُبْحُ قُبْحًا لِعَيْنِه صَارَ النَّهْىُ نَفْيًا وَيَبْطُلُ الْاِخْتِيَارُ اِذْ اِخْتِيَارُ كُلِّ شَئٍ مَا يُنَاسِبُه - فَاِخْتِيَارُ الْاَفْعَالِ الْحِسِّيَّةِ هُوَ الْقُدْرَةُ حِسًّا اى يَقْدِرُ الفاعِلُ اَنْ يَّفْعَلَ الزِّنَا بِاخْتِيَارِه ثُمَّ يَكُفُّ عَنْه نَظَرًا اِلٰى نَهْىِ اللّٰهِ تعالٰى فَيَكُوْنُ الْقُبْحُ ثَمَّه لِعَيْنِه وَاِخْتِيَارُ الْاَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ اَنْ يَكُوْنَ اِخْتِيَارُ الفِعْلِ فِيْهِ مِنْ جَانِبِ الشَّارِعِ ومَعَ ذٰلِكَ يَنْهَاهُ عَنْهُ فَيَكُوْنُ مَاذُوْنًا فِيْهِ وَمَمْنُوْعًا عَنْهُ جميعًا ولا يَجْتَمِعَانِ قَطُّ اِلَّا اَنْ يكون ذٰلك الفِعلُ مَشْروعًا بِاعْتِبَارِ اصلِه وذَاتِه وقَبِيحًا بِاعْتِبَارِ وَصْفِه - ولا يَكْفِى فِىْ هٰذِهِ الْاَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ الْاِخْتِيَارُ الْحِسِّىُّ كَمَا كَانَ فِى الْقِسْمِ الاَوَّلِ وَالشَّافِعِىُّ رح اِذَا قَالَ بِكَمَالِ الْقُبْحِ اَعْنِىْ لِعَيْنِه ذَهَبَ الْاِخْتِيَارُ الشَّرْعِىُّ وبَقِىَ الاِخْتِيَارُ الْحِسِّىُّ وهُوَ لَا يَنْفَعُنَا فَصَارَ النَّهْىُ نَفْيًا وَنَسْخًا وبَطَلَ الْمُقْتَضٰى لِرِعَايَةِ الْمُقْتَضٰى وهُوَ قَبِيحٌ جِدًّا هٰذَا مُرُّ غَايَةِ التَّحْقِيْقِ فِىْ هٰذَا الْمَقَامِ -

অনুবাদ॥ ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন– এটা সত্তাগত মন্দের কামনা করে। এটাই এর (মন্দের) পূর্ণরূপ। তিনি (গ্রন্থকার) প্রথমটির ওপর কিয়াস করে এরূপ বলেছেন। এর বিবরণ পরে আসছে। আর আমরা বলি যে, নিষেধাজ্ঞা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কার্য না হওয়া। এ হিসেবে যে, এটাকে সম্পর্কিত করা হয়েছে বান্দার ইচ্ছার সাথে। সুতরাং বান্দা যদি তার নিজ ইচ্ছায় নিষিদ্ধ বস্তু থেকে বিরত থাকে, তবে সে এর জন্যে প্রতিদান পাবে, অন্যথায় তাকে শাস্তি দেয়া হবে। আর যদি এতে ঐচ্ছিকতা না থাকে, তবে তার বিরত থাকাকে نفى ও نسخ নামকরণ করা হবে। এটাকে نهى বলা হবে না।

যেমন- যখন পাত্রের মধ্যে কোন পানি না থাকে, তখন যদি কাউকে বলা হয় 'তুমি পানি পান কর' তাহলে এটা নফী হবে। আর যদি পানি থাকা অবস্থায় তাকে এরূপ বলা হয়, তবে এটাকে نهى বলা হবে। সুতরাং نهى এর মধ্যে মূলনীতি হলো ইচ্ছার স্বাধীনতার সাথে কাজ না করা। نهى এর মধ্যে চাহিদা অনুযায়ী মন্দ সাব্যস্ত হয় নিষেধকারী বিজ্ঞ হওয়া সর্বজনবিদিত হওয়ার কারণে।

সুতরাং এই মন্দ এটা এমন না হওয়া উচিৎ, যার দ্বারা مقتضى তথা নাহী বাতিল হয়ে যায়। কেননা মন্দকে যদি قبيح لعينه ধরা হয় তবে نهى নফী হয়ে যাবে এবং ঐচ্ছিকতা বাতিল হয়ে যাবে। কেননা প্রত্যেক বস্তুর এখতিয়ার বা ঐচ্ছিকতা তাই হয়, যা তার জন্যে উপযুগী।

সুতরাং افعال حسية এর এখতিয়ার হলো ইন্দ্রিয়লব্ধ শক্তি। অর্থাৎ কর্তা স্বীয় ইচ্ছায় ব্যভিচার করার সামর্থ্য রাখে। অতঃপর মহান আল্লাহর নিষেধের প্রতি দৃষ্টি করে সে যিনা থেকে বিরত থাকে। সুতরাং

এক্ষেত্রে মন্দ قبح لعينه হবে। আর শরয়ী বিষয়ের এখতিয়ারের মধ্যে শরীআত প্রণেতার পক্ষ থেকে কাজের এখতিয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে। তা সত্ত্বে তিনি তা থেকে তাকে (مكلف কে) বারণ করেছেন। এক্ষেত্রে مكلف কে কার্যের অনুমতিও দেয়া হবে, আবার বিরতও রাখা হবে। আর এ অনুমতি ও বারণ একত্রে একত্রিত হয় না। তবে ঐ কাজটি যদি মৌলিকভাবে এবং সত্তাগত কারণে বিধিসম্মত হয়; আর গুণগত কারণে মন্দ হয়, তবে একত্রিত হতে পারে। আর এরূপ শরয়ী কাজে اختيار حسى যথেষ্ট হয় না। যেমনিভাবে প্রথম প্রকারের মধ্যে হয়ে থাকে।

ইমাম শাফেয়ী (র) যখন كمال قبح তথা পূর্ণ মন্দ হওয়ার অর্থাৎ قبح لعينه এর ব্যাপারে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তখন শরয়ী এখতিয়ার চলে গেছে এবং اختيار حسى অবশিষ্ট রয়ে গেছে। এটা আমাদেরকে কোন উপকার দেয় না। সুতরাং نهى নফী ও নসখে পরিণত হয়ে যায়। আর مقتضى এর কারণে مقتضى (চাহিদা বা দাবী) বাতিল হয়ে গেল। আর তা অতিশয় মন্দ। এ অধ্যায়ের এটাই চূড়ান্ত বিশ্লেষণ।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ মুসান্নিফ (র) এর ভাষা الخ وبيانه يقتضى بسطا এর সার : নিষিদ্ধ বস্তুর মধ্যে নিষেধাজ্ঞাটা কদার্যতা দাবি করে; অর্থাৎ কদার্যতা চাহিদাগতভাবে সাব্যস্ত হয়। অতএব نهى বা নিষেধাজ্ঞাটা مقتضى এবং দোষ বা কদার্যটা مقتضى হবে। আর নিয়ম রয়েছে যে, مقتضى (দাবি) এমনভাবে সাব্যস্ত করা হয় যার তুলনায় مقتضى বাতিল না হয়। শরীআত বিষয়ে আরোপিত নিষেধাজ্ঞাকে যদি قبح لغيره এর উপর প্রযোজ্য করা হয় যেমন পূর্বে বলা হয়েছে তাহলে قبح তথা مقتضى কে সাব্যস্ত করার জন্য مقتضى অর্থাৎ نهى দ্বারা বাতিল হওয়া জরুরি হয় না। আর যদি قبح لعينه এর উপর প্রয়োগ করা হয় যেমন ইমাম শাফেয়ী (র) বলে থাকেন। তাহলে কদার্যতা সাব্যস্ত করার দ্বারা নিষেধাজ্ঞা বাতিল হয়ে যায়। অথচ مقتضى কে এমনভাবে সাব্যস্ত করা যার দ্বারা مقتضى বাতিল হয়ে যায় তা অত্যন্ত দোষণীয়। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, নিষিদ্ধ কাজ যদি শরীআত বিষয়ক হয় তাহলে তা قبح لعينه হবে না বরং قبح لغيره হবে।

ব্যাখ্যাকার এর বর্ণনা মোতাবেক এর বিশ্লেষণ এইযে, শরীআত বিষয়ক কাজের উপর যে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয় সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন- এটা قبح لعينه দাবি করে। আর আহনাফের মতে قبح لغيره দাবি করে। এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র) এর ২টি দলিল রয়েছে। ১. নিষেধাজ্ঞা قبح দাবি করে। আর قبح এর فرد كامل (পূর্ণ একক) হলো قبح لعينه অতএব এর পূর্ণস্তর قبح لعينه উদ্দেশ্য হবে। ২. শরীআত বিষয়ক কাজে আরোপিত নিষেধাজ্ঞাকে افعال حسية এর উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার উপর কিয়াস করতে হবে। افعال حسية এর উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা قبح لعينه এর উপর প্রযোজ্য হয়। কাজেই শরীআত বিষয়ক কাজের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা قبح لعينه এর উপর প্রযোজ্য হবে।

কতিপয় জ্ঞাতব্য : প্রথম বিষয়

نفى ও نهى এর পার্থক্য : আহনাফের দলিলের পূর্বে نهى এবং نفى এর মধ্যে পার্থক্য বুঝে নেয়া উচিত। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে কাজ না হওয়া বান্দার এখতিয়ারাধীন হয়। অতএব নিষিদ্ধ কাজে যাতে জড়িত হওয়া বান্দার এখতিয়ারাধীন। সে যদি তাতে জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকে তাহলে সে সওয়াবের অধিকারী হবে। আর বিরত না থাকলে গুনাহগার ও সাজাযোগ্য হবে। নফী ও নসখের ক্ষেত্রে কাজ না হওয়ার ব্যাপারে বান্দার কোনো এখতিয়ার থাকে না। এ কারণে নেতিবাচক কাজ থেকে বিরত থাকলে বান্দা সওয়াবের অধিকারী হয় না। কারণ তার থেকে বিরত থাকা বস্তুত উক্ত কাজ না থাকার কারণে হয়ে থাকে। এতে বান্দার এখতিয়ারের কোনো দখল নেই। আর যার মধ্যে বান্দার এখতিয়ারের কোনো দখল নেই তার কারণে বান্দা সওয়াব ও সাজাযোগ্য হয় না। অতএব نفى তথা নেতিবাচক কাজ থেকে বিরত থাকার কারণে বান্দা সওয়াবের অধিকারী হবে না।

নিম্নের উদাহরণ থেকে উভয়ের পার্থক্য স্পষ্ট বোঝা যায়।

উদাহরণ : কোনো পাত্রে যদি পানি থাকে। আর কাউকে বলা হয় لَا تَشْرَبْ পান করো না। তাহলে এটা نَهْى বা নিষেধাজ্ঞা হবে। কারণ পানি পান করা না করা বান্দার ইচ্ছাধীন। পক্ষান্তরে যদি পাত্রে পানি না থাকে। আর বলা হয় لَا تَشْرَبْ পান করো না। তাহলে এটা نَفْى হবে। কারণ এক্ষেত্রে পান না করা বান্দার এখতিয়ার বর্হিভূত নয় বরং তা পানি না থাকার কারণে। এভাবে যদি অন্ধ ব্যক্তিকে বলা হয় لَا تُبْصِر তাহলে এটা নফী হবে। আর দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিকে যদি বলা হয় দেখো না। তাহলে এটা نَهْى হবে।

★ **দ্বিতীয় বিষয় :** نَهْى এর কারণে اِقْتِضَاءً (চাহিদাগতভাবে) দোষ প্রমাণিত হয়। কারণ নিষেধাজ্ঞাকারী সূক্ষ্মদর্শী। আর সূক্ষ্মদর্শী সত্তা অন্যায় থেকে নিষেধ করে থাকেন; ন্যায় থেকে নিষেধ করেন না।

★ **তৃতীয় বিষয় :** مُقْتَضِى এভাবে সাব্যস্ত করা হয় যে, যাতে مُقْتَضِى (যেরসহ) বাতিল না হয়।

দলিলের সার : উপরে উল্লেখিত ভূমিকার পর মুসান্নিফের আলোচিত দলিলের সার এই যে, শরীআত বিষয়ক কাজের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা দ্বারা যদি قبح لعينه সাব্যস্ত হয় যেমন ইমাম শাফেয়ী (র) এর মাযহাব। তাহলে উল্লেখিত নাহী নফী হয়ে যাবে। এবং মুকাল্লাফের এখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। কেননা প্রত্যেক জিনিসের এখতিয়ার তার মুনাসিব হয়ে থাকে। সুতরাং افعال حسية এর এখতিয়ার বাস্তব কুদরত লাভ হওয়া। যেমন– মুকাল্লাফ ব্যক্তি নিজ এখতিয়ার ও ক্ষমতা দ্বারা যিনা করতে সক্ষম। কিন্তু সে আল্লাহ তা'আলার নিষেধাজ্ঞার কারণে এ থেকে বিরত থাকে। অতএব এর মধ্যে قبح لعينه হবে।

আর افعال شرعية বিষয়ক এখতিয়ার এই যে, তার মধ্যে শরীআত প্রবর্তকের পক্ষ থেকে এখতিয়ার লাভ হয় কিন্তু তা সত্ত্বে শরীআত প্রবর্তক উক্ত কাজ থেকে নিষেধ করেন। অতএব এই শরয়ী কাজটি শরীআত প্রবর্তকের এখতিয়ার দেয়ার কারণে مأذون অনুমতি প্রদত্ত হবে এবং শরীআত প্রবর্তকের নিষেধাজ্ঞা দ্বারা তা নিষিদ্ধও হবে। আর এ কথাও স্বীকৃত যে, একই কাজের মধ্যে উভয়টি একটি হতে পারে না। অর্থাৎ এমন হতে পারে না যে, একই কাজ অনুমতি প্রদত্ত হবে এবং নিষিদ্ধ হবে। অবশ্য এ ব্যাপারে ২টি জমা হতে পারে যে, উক্ত কাজটি মৌলিকভাবে এবং সত্তার দিক দিয়ে বৈধ। আর অন্য কোনো বিশেষণের কারণে তা নিষিদ্ধ হবে।

একথাটি মনে রাখতে হবে যে, افعال شرعية এর মধ্যে اختيار حسى যথেষ্ট নয়। যেমন- افعال حسية এর মধ্যে حسى এখতিয়ার যথেষ্ট। অতএব ইমাম শাফেয়ী (র) যেহেতু শরীয়তগত নিষিদ্ধ كمال قبح এর প্রবক্তা, একারণে তার মতে শরয়ী এখতিয়ার শেষ হয়ে যাবে। কারণ যে বস্তুর সত্তার মধ্যে কদার্যতা থাকে শরীআত প্রবর্তকের পক্ষ থেকে তা করার কোনো এখতিয়ার থাকে না। তবে اختيار حسى বাকী থাকে। তবে তা শরীআত বিষয়ক কাজে কোনো উপকারী নয়। কেননা اختيار حسى শরীআত বিষয়ক কাজের মুনাসিব নয়। যেমন পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, প্রত্যেক বস্তুর এখতিয়ার তার অনুপাতেই হয়।

মোটকথা শরীআত বিষয়ক কাজ নিষিদ্ধ হওয়ার মধ্যে قبح لعينه মানার কারণে যখন মুকাল্লাফ ব্যক্তির এখতিয়ার দূরীভূত হয়ে যায় তখন উক্ত কাজটি বান্দার এখতিয়ারের বাইরে হওয়ার কারণে শরয়ীভাবে তা অসম্ভব হয়ে গেলো। আর অসম্ভব কাজের সাথে নিষেধাজ্ঞা সংশ্লিষ্ট হয় না বরং নফী সংশ্লিষ্ট হয়। অতএব ইমাম শাফেয়ী (র) এর মাযহাবের বুনিয়াদের উপর শরীআত বিষয়ক কাজের উপর نَهْى আরোপিত হলে তা নফী ও নসখ হয়ে যায়। আর এমনটি হলে (بالفتح) مُقْتَضَى এর মধ্যে مُقْتَضِى অর্থাৎ নাহী বাতিল হয়ে যাবে।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, مقتضى সাব্যস্ত করার জন্য مقتضى কে বাতিল করা অত্যন্ত খারাপ বিষয়। সুতরাং একথা বলা উত্তম যে, শরীআত বিষয়ক কাজের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা قبح لغيره বোঝায়। কেননা এ ক্ষেত্রে قبح ও সাব্যস্ত হবে। আর (بالكسر) مُقْتَضِى বাতিল হওয়াও জরুরি হবে না। এটাই আহনাফ বলে থাকে। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, আহনাফের অভিমত বিশুদ্ধ ও প্রাধান্যযোগ্য। ব্যাখ্যাকার বলেন– এ বিষয়ে এটাই হলো সর্বশেষ বিশ্লেষণ। এর অতিরিক্ত বিশ্লেষণ করা অধমের সাধ্যাতীত।

ثُمَّ فَرَّعَ عَلَى الْأَصْلِ الَّذِيْ مَهَّدَهُ فَقَالَ وَلِهٰذَا كَانَ الرِّبٰوا وَسَائِرُ الْبُيُوْعِ الْفَاسِدَةِ وَصَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ مَشْرُوْعًا بِأَصْلِهِ غَيْرُ مَشْرُوْعٍ بِوَصْفِهِ لِتَعَلُّقِ النَّهْيِ بِالْوَصْفِ لَا بِالْأَصْلِ اي لِأَجْلِ أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الْأَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ يَقْتَضِي الْقُبْحَ لِغَيْرِهِ وَصَارَ كَأَنَّ هٰذِهِ الْأُمُوْرُ الْمَذْكُوْرَةُ مَشْرُوْعَةٌ بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ دُوْنَ الْوَصْفِ فَإِنَّ الرِّبٰوا هُوَ مُعَاوَضَةُ مَالٍ بِمَالٍ فِيْهِ فَضْلٌ يَسْتَحِقُّ بِعَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ لِأَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَهٰذَا مَشْرُوْعٌ بِاعْتِبَارِ ذَاتِهِ الَّذِيْ هُوَ الْعِوَضَانِ وَإِنَّمَا الْفَسَادُ فِيْهِ لِأَجْلِ الْفَضْلِ الْمَشْرُوْطِ وَهٰكَذَا حَالُ سَائِرِ الْبُيُوْعِ الْفَاسِدَةِ كَالْبَيْعِ بِشَرْطٍ لَا يَقْتَضِيْهِ الْعَقْدُ وَفِيْهِ نَفْعٌ لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ أَوْ لِلْمَعْقُوْدِ عَلَيْهِ الَّذِيْ هُوَ أَهْلُ الْإِسْتِحْقَاقِ وَالْبَيْعِ بِالْخَمْرِ وَنَحْوِهِ كُلُّ ذٰلِكَ مَشْرُوْعٌ بِاعْتِبَارِ ذَاتِهِ وَإِنَّمَا الْفَاسِدُ بِاعْتِبَارِ الشَّرْطِ الزَّائِدِ فَيَكُوْنُ مُفِيْدًا لِلْمِلْكِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَكَذَا صَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ مَشْرُوْعٌ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ صَوْمًا وَغَيْرُ مَشْرُوْعٍ بِاعْتِبَارِ الْوَصْفِ الَّذِيْ هُوَ الْإِعْرَاضُ عَنِ الضِّيَافَةِ فَتَعَلَّقَ النَّهْيُ فِيْ كُلِّ ذٰلِكَ بِالْوَصْفِ لَا بِالْأَصْلِ -

অনুবাদ ॥ অতঃপর মুসান্নিফ (র) সেই মূলনীতির ওপর শাখামূলক মাসআলার বর্ণনা করছেন, যে ব্যাপারে তিনি ভূমিকা পেশ করেছেন। তিনি বলেন- *এ কারণে সুদ, যাবতীয় ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়, কুরবাণীর দিনে রোযা রাখা মূলতঃ শরীআতসম্মত ছিল। আর গুণগত কারণে নিষিদ্ধ ছিল। কেননা নিষেধাজ্ঞার সম্পর্ক গুণের সাথে, মূলের সাথে নয়"।*

অর্থাৎ এ কারণে যে, শরয়ী বিষয়ের নিষেধাজ্ঞা قبح لعينه وصفى এর চাহিদা রাখে। তাই উল্লিখিত কার্যসমূহ মৌলিকভাবে বিধিসম্মত ছিল, গুণগতভাবে নয়। কেননা সুদ হলো মালের বিনিময়ে মাল গ্রহণ করা, যার মধ্যে অতিরিক্ত সুবিধা থাকে। চুক্তির লেন-দেনের কোন এক পক্ষ তার অধিকারী হয়। মৌলিক দিক বিবেচনায় এটা বিধিসম্মত। এর মধ্যে (সুদের মধ্যে) দোষ সাব্যস্ত হয়েছে, অতিরিক্ত শর্তারোপের কারণে। এরূপ অবস্থা সকল ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের যেমন- এমন শর্তে কোন কিছু বিক্রি করা যা উক্ত চুক্তি কামনা করে না; আর তার মধ্যে ক্রেতা-বিক্রেতার কোন একজনের উপকার নিহিত। অথবা مبيع তথা বিক্রিত বস্তুর উপকার নিহিত থাকে যা হকদার হওয়ার যোগ্য। আর মদ ইত্যাদির বিনিময়ে বিক্রি করা, এ সব মূলগতভাবে বিধিসম্মত। অতিরিক্ত শর্তের কারণে দোষণীয় হয়েছে। সুতরাং এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ে হস্তগতকরণের পরে মালিকানা সাব্যস্ত হবে।

অনুরূপভাবে কুরবানীর দিনে রোযা রাখা এটা রোযা হওয়ার কারণে বৈধ। আর গুণগত কারণে তথা খোদায়ী মেহমানদারী থেকে বিরত থাকার কারণে তা অবৈধ। সুতরাং এ সকল ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার সম্পর্ক হবে গুণের সাথে, মূল বস্তুর সাথে নয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله ثم فرع على الاصل الخ : ব্যাখ্যাকার বলেন– মুসান্নিফ (র) পূর্বে যে দাবি করেছিলেন যে, শরীআত বিষয়ক কাজের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা قبح لغيره এর ফায়দা দেয়। মুসান্নিফ (র) এ সূত্রের উপর কয়েকটি শাখা মাসআলা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন–

১. সুদ, বায়ই ফাসেদ এবং নিষিদ্ধ দিনের রোযা মৌলিকভাবে জায়েয ... وصف তথা বিশ্লেষণের দিক দিয়ে না জায়েয। কারণ নিষেধাজ্ঞার সম্পর্ক وصف এর সাথে হয়ে থাকে; মূলের সাথে নয়।

এর বিশ্লেষণ এই যে, সুদি বেচা-কেনা বলা হয় এমন বেচা-কেনাকে যার উভয়পক্ষে মাল থাকে এবং উভয়পক্ষের মাল جنس وقدر তথা শ্রেণী ও পরিমাণের দিক দিয়ে এক হয়। এরপর কোনো একপক্ষ অতিরিক্তের শর্তারোপ করে। যেমন ১ জন বললো আমি তোমার নিকট এ শর্তের উপর ১০০ দিরহাম বিক্রি করছি যে, তুমি এর বিনিময়ে ১২৫ দিরহাম আমাকে দিবে। আর লোকটি তা মেনে নিলো। এটা হলো সুদী বেচা-কেনা। মৌলিকভাবে এ বেচা-কেনা বৈধ। কেননা বেচা-কেনার সত্তা হলো উভয় পক্ষের পণ্য। আর উভয় পণ্য হলো মাল। এদিক দিয়ে তা বেচা-কেনার দ্রব্য হতে পারে। আর ইজাব ও কবুল যা বেচা-কেনার রোকন তাও এখানে বিদ্যমান। অতএব মৌলিকভাবে এ বেচাকেনা বৈধ ও জায়েয। তবে জিনস ও কদর এক হওয়ার কারণে উভয়ের মধ্যে সমতা জরুরি। এ শর্তের কারণেই সমতা ফউত হয়ে যাচ্ছে। এ কারণে মাশরুত তথা অতিরিক্ত অংশ এ বেচা-কেনা থেকে রহিত হয়ে যাবে। অন্যথায় এ বেচা-কেনা ফাসিদ গণ্য হবে।

মোটকথা এটা প্রমাণিত হলো যে, সুদী বেচা-কেনা মৌলিকভাবে বৈধ এবং وصف-এর দিক দিয়ে অবৈধ ও ফাসিদ। আর যে জিনিস মৌলিকভাবে বৈধ এবং وصف এর বিচারে অবৈধ হয় তা قبيح لغيره হয়ে থাকে। সুতরাং সুদি বেচা-কেনাও قبيح لغيره হবে। সকল বায়ঈ ফাসেদের একই অবস্থা। উদাহরণ স্বরূপ এমন শর্তে বেচা-কেনা করলো যা বেচা-কেনা চুক্তির দাবির পরিপন্থী এবং তাতে কোনো একপক্ষের উপকার বা পণ্যের উপকার থাকে যখন তা উপকার গ্রহণের যোগ্য হবে। যেমন এক ব্যক্তি এ শর্তে তার গোলাম বিক্রি করলো যে, এক মাস সে বিক্রেতার খেদমত করবে এক্ষেত্রে বিক্রেতার উপকার রয়েছে। কেউ যদি এমন শর্তে কাপড় ক্রয় করে যে, বিক্রেতা তা সেলাই করে দিবে। এক্ষেত্রে ক্রেতার উপকার রয়েছে। কেউ যদি এ শর্তে তার গোলাম বিক্রি করে যে, ক্রেতার জীবদ্দশায় সে উক্ত গোলাম বিক্রি করতে পারবে না। তাহলে এতে পণ্য তথা গোলামের উপকার রয়েছে : কারণ কেউ বারবার বিক্রয়কে পছন্দ করে না। আর সে উপকার লাভের যোগ্যও। কারণ সে মানুষ। এ কারণে গোলামের জন্যে ক্রেতার উপর বিক্রি না করার অধিকার সাব্যস্ত হবে এবং সে তার অধিকার লাভের জন্য কোর্টের আশ্রয় নিতে পারবে।

যদি এমন শর্ত আরোপ করে যা বেচা-কেনা চুক্তির পরিপন্থী নয়। যেমন– শর্ত করলো যে, ক্রেতা বিক্রিত দ্রব্যের মালিক হবে তাহলে এতে বেচা-কেনা ফাসেদ হবে না। অথবা বিক্রিত দ্রব্যের উপকারের শর্তারোপ করলো কিন্তু উক্ত দ্রব্য অধিকার যোগ্য নয়। যেমন– কেউ এ শর্তে তার ঘোড়া বিক্রি করলো যে, ক্রেতা তাকে প্রতিদিন অমুক খাদ্য দিবে। এক্ষেত্রে বেচাকেনা ফাসেদ হবে না। কারণ এ শর্তে যদিও বিক্রিত দ্রব্য তথা ঘোড়ার উপকার হচ্ছে কিন্তু ঘোড়া অধিকার যোগ্য নয়।

মোটকথা ফাসেদ বেচা-কেনা সত্তাগতভাবে বৈধ ও অতিরিক্ত শর্তের কারণে অবৈধ। অতএব ফাসেদ বেচাকেনাও قبيح لغيره হবে। এভাবে মদের বিনিময়ে বেচা-কেনাও ফাসেদ। কারণ মদ مال متقوم নয়। মাল এ কারণে নয় যে, যে বস্তুর প্রতি মানুষের মন আকৃষ্ট হয় এবং প্রয়োজনের সময় মানুষ তা পুঞ্জিভূত করে কিংবা মানুষ যে বস্তু নিজ কল্যাণের জন্য উৎপন্ন করে এবং মানুষ তার প্রতি আকৃষ্ট থাকে তা হলো মাল। আর মদও এমন বস্তু তবে শরীআতের দৃষ্টিতে متقوم বা মূল্যবান নয়। কেননা শরীআতে তার দ্বারা উপকার লাভ করা অবৈধ। অতএব মদের বিনিময়ে ক্রয় বিক্রয় অবৈধ, শরীআত সম্মত নয়। এ কারণে কোনো বেচাকেনায় মদ মাল হওয়ার কারণে তাকে মূল্য স্থির করলে তা অর্পণ করা ক্রেতার জন্য ওয়াজিব নয়। এভাবে কোনো মুসলমানের জন্য তা করায়ত্ত করাও জায়েয নয়।

মোটকথা মদের বিনিময়ে ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্যের পক্ষ থেকে এ অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। আর মূল্য উদ্দেশ্যহীন থাকে। বরং পণ্যই উদ্দেশ্য হয়। এ কারণেই বেচাকেনা শুদ্ধ হওয়ার জন্য বিক্রিত বস্তু লাভে সক্ষম হওয়া শর্ত কিন্তু পণ্য করায়ত্ত করার উপর সক্ষম হওয়া শর্ত নয়। সুতরাং বেচা-কেনার মধ্যে মূল্য হলো اوصاف এর অন্তর্গত। আর অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে وصف এর মধ্যে। কাজেই বেচা-কেনা যখন সত্তাগততাবে বৈধ হলো এবং তা وصف এর মধ্যে অসুবিধা দেখা দিলো এ কারণে তা ফাসেদ বিবেচিত হয়। আর এর মধ্যে قبيح لغيره হয়ে থাকে। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, মদের বিনিময়ে বেচা-কেনা ফাসেদ এবং এর মধ্যে قبح لغيره রয়েছে। আর ফাসেদ

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ثُمَّ هٰهُنَا سُوَالٌ مُقَدَّر عَلٰى ابى حَنِيفَةَ رح وهُو انَّ بَيْعَ الحُرِّ وَالمَضَامِيْن والمَلَاقِيْحِ ونكاحَ المَحَارِمِ مِنَ الأَفْعَالِ الشَّرعِيَّةِ مع ان هٰهُنَا لَمْ يَقَعْ عَلٰى القُبْحِ لِغَيْرِه بل عَلٰى القُبْحِ لِعَيْنِه عِنْدَكُم فاجابَ عَنْهُ المُصَنِّفُ رح وقال وَالنَّهْىُ عَنْ بَيْعِ الحُرِّ وَالمَضَامِيْنِ والمَلَاقِيْحِ ونكاحِ المَحَارِمِ مَجَازٌ عَنِ النَّفى فَالحُرُّ عامٌّ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ حُرَّ الأَصْلِ او حُرَّ العَتَاقَةِ وَالمَضَامِيْن جَمْعُ مَضْمُوْنَةٍ وهو مَا فى أَصْلَابِ الاٰباءِ وَالمَلَاقِيحِ جمعُ مَلقُوحَةٍ وهو مَا فى أرْحَامِ الأُمَّهَاتِ وَالمَحَارِمُ عامٌّ مِن أنْ يَكُوْنَ حرمةَ القَرَابَةِ او حُرْمَةَ المُصَاهَرَة وبالجُمْلَة فالنَّهْىُ عَنْ هٰؤلاءِ مَحْمُولٌ على النَّفْى بطَرِيْقِ المَجَاز فكانَ نَسْخًا لِعَدَمِ مَحَلِّه اى فَكَانَ هٰذا النَّهْىُ كُلُّه نَسْخًا لِلمَشْرُوعِيَّةِ لِعَدَمِ مَحَلِّ النَّهْي إذْ مَحَلُّ البَيْعِ هُوَ المَالُ وهٰؤلاءِ لَيْسُوا بِمَالٍ ومَحَلُّ النَّكاحِ المُحَلَّلاتُ وهُنَّ مُحَرَّمَات بالنَّصِّ وفى إيرادِ لفظِ النَّسْخِ بعدَ النَّفى تَنْبِيْهٌ عَلٰى تَرادُفِهِمَا هٰهُنَا

অনুবাদ ॥ এখানে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর ওপরে আরোপিত একটি উহ্য প্রশ্ন রয়েছে। তা এই যে, আযাদ ব্যক্তিকে বিক্রি করা, مضامين ও ملاقيح (পিতৃপৃষ্ঠে অবস্থানকারীকে বিক্রি করা, মাতৃপৃষ্ঠে অবস্থানকারীকে বিক্রি করা) এবং মুহাররামাকে বিবাহ করা শরয়ী বিষয়ের অন্তর্গত; তা সত্ত্বেও এখানে এগুলোকে قبح لغيره এর অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। বরং আপনাদের মতানুসারে قبح لعينه এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইমাম সাহেব (র)-এর পক্ষ থেকে গ্রন্থকার (র) উত্তর প্রদান করছেন যে, ***"আযাদ ব্যক্তিকে বিক্রি করা, পিতৃপৃষ্ঠে অবস্থানকারীকে বিক্রি করা, بيع ملاقيح তথা মাতৃগর্ভে অবস্থানকারীকে বিক্রি করা, মুহররামাকে বিবাহ করা নফীর থেকে মাজায"।*** সুতরাং আযাদ শব্দটি জন্মগতভাবে আযাদ হওয়া, অথবা দাসত্ব থেকে আযাদ হওয়া উভয়কে শামিল করে। مضامين শব্দটি مضمونة এর বহুবচন। مضامين হলো পিতার পৃষ্ঠদেশে সন্তান অবস্থিত। আর ملاقيح শব্দটি ملقوحة এর বহুবচন। ملاقيح হলো- মাতৃউদরে অবস্থিত সন্তান। আর মাহরিম শব্দটি বংশগত মাহারিম অথবা বৈবাহিক সম্পর্কীয় মুহাররামা উভয়কে শামিল করে।

(পূর্বের বাকী অংশ)

বেচা-কেনা ক্রেতার করায়ত্তের পরে মালিকানার ফায়দা দেয়। অতএব এটা করায়ত্ত করার পরে মালিকানার ফায়দা দিবে। এভাবে কোরবাণীর দিনসমূহে রোযা রাখা। রোযা রাখা মৌলিকভাবে বৈধ বরং সওয়াবের কাজ। কিন্তু اعراض عن ضيافة الله তথা আল্লাহর মেহমানদারী থেকে বিরত থাকার কারণে তা অবৈধ। সুতরাং এটাও قبح لغيره হবে।

সারকথা এই যে, উল্লেখিত বস্তুসমূহের মধ্য থেকে প্রত্যেকটির মধ্যে نهى বা নিষেধাজ্ঞা وصف এর সাথে সংশ্লিষ্ট মূলের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। আর যার মধ্যে নিষেধাজ্ঞা وصف এর সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে এবং মূলের সাথে সংশ্লিষ্ট না থাকে তা قبح لغيره হয়ে থাকে। অতএব সুদি বেচা-কেনা ইত্যাদি সবই قبح لغيره হবে।

মোটকথা এ সব বিষয় থেকে নিষেধাজ্ঞা রূপকার্থে নফীর উপরে প্রযোজ্য। *"সুতরাং এ নাহীর ক্ষেত্রে না হওয়ার কারণে নসখ হয়েছে"* অর্থাৎ, স্থানটি নাহীর জন্যে উপযুক্ত না হওয়ার কারণে উপরোক্ত বিষয়সমূহের জন্যে এ নাহী নসখ গণ্য হয়েছে। কেননা بيع এর محل বা ক্ষেত্র হলো মাল। আর এগুলো মাল নয়। বিবাহের ক্ষেত্র হলো বৈধ স্ত্রীলোক মুহাররামা স্ত্রীলোকগণ কুরআনের দলিল দ্বারা হারামরূপে সাব্যস্ত হয়েছে। এখানে নফীর পরে نسخ শব্দের প্রয়োগে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, এখানে শব্দ দুটি সমার্থক।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله ثم ههنا سؤال مقدر الخ : ব্যাখ্যাকার বলেন– এখানে একটি প্রশ্ন উহ্য রয়েছে। উক্ত প্রশ্নটি করা হয়েছে ইমাম আবু হানীফা (র) এর উপর।

প্রশ্ন : স্বাধীন মানুষ ও ملاقيح – مضامين বায়ঈ (বেচা-কেনা) এভাবে মাহারিম তথা মা, নানী ইত্যাদির সাথে বিবাহ افعال شرعيه এর অন্তর্গত। অথচ তা সত্ত্বে আহনাফের মতে তার উপর আরোপিত নাহী قبح لغيره এর উপর প্রযোজ্য হয় না। বরং قبح لعينه এর উপর প্রযোজ্য হয়। অথচ আহনাফের মতে افعال شرعية এর উপর আরোপিত নাহী ملاقيح، مضامين এর উপর প্রযোজ্য হয়।

উত্তর : মুসান্নিফ (র) এর উত্তরে বলেন– স্বাধীন মানুষ এবং ملاقيح مضامين এর বেচাকেনা এভাবে মাহারিম মহিলাদের সহিত বিবাহের উপর যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে তা রূপকার্থে নফীর অর্থে অর্থাৎ নাহী দ্বারা রূপকভাবে নফী উদ্দেশ্য। আর উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক এই যে, উভয়ের মধ্যে বাহ্যিকভাবে মিল রয়েছে এবং অর্থগতভাবেও মিল রয়েছে। বাহ্যিকভাবে মিল একারণে যে, নাহী এবং নফী উভয়ের মধ্যে হরফে নফী বিদ্যমান থাকে। আর অর্থগত মিল এ কারণে যে, উভয়ের اعدام তথা কোনো বস্তু না হওয়া বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হয়। যদিও নাহী বান্দার এখতিয়ারে না হওয়ার দাবি করে। আর নফী মূল থেকেই এখতিয়ার ছাড়াই না হওয়ার দাবি করে। সুতরাং নাহী ও নফীর মধ্যে মিল রয়েছে। একারণেই নাহী দ্বারা রূপকার্থে নফী উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। অতএব তা قبح لغيره এর উপর প্রযোজ্য হবে। কারণ নফী দ্বারা ফে'লে মানফিতে قبح لعينه সাব্যস্ত হয়। অতএব আবু হানীফা (র) এর উপর কোনো প্রশ্ন আরোপিত হয় না।

ব্যাখ্যাকার এ উত্তরকে আরো স্পষ্ট করে বলেন– মতনে উল্লেখিত আযাদ শব্দটি আ'ম। চাই সৃষ্টিগতভাবে স্বাধীন হোক অথবা মণিবের স্বাধীন করার দ্বারা স্বাধীন হোক। مضامين শব্দটি مضمونة এর বহুবচন। পিতার পৃষ্ঠদেশ হতে নির্গত বীর্য। আর ملاقيح – ملقوحة এর বহুবচন। মাতৃউদরে অবস্থিত ভ্রূণ। মাহ্‌রিম শব্দটিও ব্যাপকার্থক। চাই আত্মীয়তার দরুন মাহ্‌রিম হোক। যেমন মা, কন্যা ইত্যাদি। অথবা দুধপান জনিত কারণে মাহ্‌রিম হোক। যেমন সহবাসকারীর পিতা এবং তার পুত্র সহবাসকৃতার জন্য হারাম হওয়া। এভাবে সহবাসকৃতার মা ও কন্যা সহবাসকারীর জন্য হারাম হওয়া। মোটকথা উল্লেখিত বিষয়ের উপর যে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে তা মাজাযস্বরূপ নফীর উপর প্রযোজ্য। অর্থাৎ انشاء এর সীগা (নাহী) اخبار এর সীগা (নফী) এর উপর প্রযোজ্য। অতএব এখানে নাহীটা মাজাযস্বরূপ মানসূখ হবে। অর্থাৎ উল্লেখিত বিষয়াদির উপর যে নাহী আরোপিত হয়েছে তা তার বৈধতার জন্য নাসিখ হবে। কেননা উল্লেখিত বিষয়ে নাহীর ক্ষেত্র অনুপস্থিত। কেননা বেচা-কেনার ক্ষেত্র হলো মাল। কিন্তু আযাদ ব্যক্তি এভাবে ملا قيح ও مضامين মাল নয়। এভাবে বিবাহের ক্ষেত্র হলো হালাল মহিলা। আর মাহারিম হলো ঐ সকল মহিলা যাদেরকে নস দ্বারা হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং উল্লেখিত বিষয়াদিতে যেহেতু বেচা-কেনা এবং বিবাহের ক্ষেত্র অনুপস্থিত। কাজেই তার সাথে নফী সংশ্লিষ্ট হতে পারে; নাহী সংশ্লিষ্ট হতে পারে না। এ কারণেই নাহীকে মাজায স্বরূপ নফীর উপর প্রয়োগ করতে হবে। আর নফীর দ্বারা যেহেতু قبح لعينه সাব্যস্ত হয়। এ কারণে এখানেও قبح لعينه সাব্যস্ত হবে। অতএব ইমাম সাহেব (র)এর উপর কোনো প্রশ্ন আরোপিত হবে না।

নূরুল আনওয়ার গ্রন্থকার বলেন– মতনের ভাষ্যে نفى শব্দের পরে نسخ শব্দ উল্লেখের দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এখানে নফী এবং নসখ উভয়ে সমর্থক।

وَيُمْكِنُ اَنْ يَكُوْنَ نَسْخًا اِصْطِلاحِيًا عِنْدَ مَنْ يَّقُوْلُ اِنَّ رَفْعَ الْاِبَاحَةِ الْاَصْلِيَّةِ وَرَفْعَ مَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ اَوْ فِى الشَّرَائِعِ السَّابِقَةِ يُسَمَّى نَسْخًا لِاَنَّ بَيْعَ الْحُرِّ كَانَ فِى شَرِيْعَةِ يوسفَ وَبَيْعَ الْمَضَامِيْنِ وَالْمَلَاقِيْحِ كَانَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ونكاحَ بعْضِ الْمَحَارِمِ كَانَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ و بَعْضِهَا فِى الْاَدْيَانِ السَّابِقَةِ - وَقَالَ الشَّافِعِىُّ رح فِى الْبَابَيْنِ يَنْصَرِفُ اِلَى الْقِسْمِ الْاَوَّلِ شروعٌ فى بَيَانِ مَذْهَبِ الشَّافِعِىِّ رح يَعْنِى اَنَّ عِنْده النَّهْىَ فِى كُلِّ مِّنَ الْاَفْعَالِ الْحِسِّيَّةِ وَالْاَفْعَالِ الشَّرعِيَّةِ يَنْصَرِفُ اِلَى الْقُبْحِ لِعَيْنِهِ فحُرْمَةُ الزِّنَا والخَمْرِ وحُرْمَةُ صَوْمِ النَّحْرِ عِنْده سواءٌ قَوْلاً بِكَمَالِ الْقُبْحِ حالٌ بِمَعْنَى الفاعِلِ اى حَالَ كَوْنِه قائِلاً بِكَمَالِ الْقُبْحِ وهُوَ الْقُبْحُ لِعَيْنِه اوْ مفعولٌ لَه اى لِاَجْلِ قَوْلِه بِكَمَالِ الْقُبْحِ كَمَا قُلْنَا فِى الْحُسْنِ فِى الْاَمْرِ لِاَنَّ مِنْ مَذْهَبِنَا اَنَّ الْاَمْرَ الْمُطْلَقَ الْخَالِى عَنِ الْقَرِيْنَةِ يَقَعُ عَلَى الْحُسْنِ لِعَيْنِه قولاً بِكَمَالِ الْحُسْنِ فلا يَكُوْنُ صَوْمُ يَوْمِ الْعِيْدِ سَبَبًا لِلثَّوَابِ عِنْدَه ولا الْبَيْعُ الْفَاسِدُ مُوْجِبًا لِلْمِلْكِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَاِنَّمَا شَبَّهَ الشَّافِعِىُّ رح النَّهْىَ بِالْاَمْرِ لِاَنَّ النَّهْىَ فِى اقْتِضَاءِ الْقُبْحِ حقيقة كَالْاَمْرِ فِى اقْتِضَاءِ الْحُسْنِ فينبغى ان يَكُوْنَا عَلَى السَّوَاءِ -

---

অনুবাদ ॥ এখানে নসখ দ্বারা পারিভাষিক অর্থ উদ্দেশ্য নেয়া সম্ভব। এটা তার মতানুসারে যারা- মৌলিক মুবাহ হওয়া দূরীভূত করা, অথবা জাহেলী যুগে যেসব প্রথা ছিল তা দূরীভূত করা, অথবা পরবর্তী শরীআতসমূহের বিধান উঠিয়ে নেয়াকে নসখ বলে নামকরণ করেন। কেননা হযরত ইউসুফ (আ)-এর শরীআতে আযাদকে বিক্রি করা বৈধ ছিল। পিতৃপৃষ্ঠে অবস্থানকারী সন্তানকে বিক্রি করা এবং মাতৃগর্ভে অবস্থানকারী সন্তানকে বিক্রি করা জাহেলী যুগে বৈধ ছিল। আর মুহাররামাদের কাউক বিবাহ করা জাহেলী যুগে এবং কাউকে পূর্ববর্তী ধর্মে বিবাহ করা বৈধ ছিল।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, উভয় ক্ষেত্রে নাহী প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হবে। এখান থেকে ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মাযহাবের আলোচনা শুরু হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর মতে افعال حسية ও افعال شرعية সকল ক্ষেত্রে নাহী قبيح لعينه তথা সত্তাগত মন্দের প্রকারভুক্ত হবে।

সুতরাং তাঁর মতে ব্যভিচার হারাম হওয়া, মদ্যপান হারাম হওয়া এবং কুরবানীর দিনে রোযা রাখা হারাম হওয়া সমান। ***"পরিপূর্ণ মন্দ হওয়ার প্রবক্তা হওয়ার কারণ তিনি এ কথা বলেছেন"।*** قولا শব্দটি এখানে ইসমে ফায়েল অর্থে حال হয়েছে। অর্থাৎ তিনি পরিপূর্ণ মন্দের অভিমত পোষণকারী হয়ে এরূপ বলেছেন। আর পরিপূর্ণ মন্দ বলতে যা বুঝানো হয়েছে তা হলো قبح لعينه তথা সত্তাগত মন্দ। অথবা قولا এ অংশটুকু مفعول له হয়েছে। অর্থাৎ পরিপূর্ণ মন্দ হওয়া বক্তব্যের কারণে। ***"যেমন, আমরা (হানাফীগণ) আমরের বর্ণনায় حسن এর ক্ষেত্রে বলেছি"।*** কেননা আমাদের মতে আলামতমুক্ত মুতলাক আমর حسن لعينه তথা সত্তাগত সৌন্দর্য বুঝায়। সুতরাং ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, ঈদের দিনে রোযা রাখা সওয়াবের কারণ হবে না এবং مبيع হস্তগতকরণের পরও ফাসিদ বিক্রির দ্বারা মালিকানা সাব্যস্ত হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র) نهى কে امر এর ন্যায় গণ্য করেন। ***কেননা امر যেমন حسن বা উত্তমতা কামনায় হাকীকত, نهى ও তদরূপ মন্দের কামনায় হাকীকত।*** সুতরাং উভয়টি সমান হওয়া উচিৎ।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ আর এমনও সম্ভাবনা আছে যে, নসখ দ্বারা পারিভাষিক নসখ উদ্দেশ্য হবে। তবে এটা তাদের মতে যারা নসখের সংজ্ঞা এই করে যে, নসখ হলো– মৌলিক মুবাহ হওয়া এবং জাহিলি যুগে প্রচলিত নিয়ম পদ্ধতি এবং পূর্বের শরিআতে প্রচলিত রীতিনীতিকে উঠিয়ে দেয়া। কেননা ইউসুফ (আ) এর শরীআতে স্বাধীন ব্যক্তির বেচা-কেনাও জায়েয ছিলো। কিন্তু ইসলামী শরীআতে তা মানসূখ হয়ে গেছে। এভাবে مضامين ও ملاقيح বেচা-কেনা জাহিলী যুগে জায়েয ছিলো। মাহারিম মহিলাদের সাথে বিবাহ করা জাহিলী যুগে জায়েয ছিলো। কিন্তু ইসলামী শরীআত সবগুলোকে মানসূখ করেছে। মোটকথা এক্ষেত্রে نفى এবং নসখ এর মধ্যে সমর্থবোধকতা থাকে না। বরং উদ্দেশ্য এই হবে যে, উল্লেখিত বিষয়াদির উপর আরোপিত নাহীকে যখন মাজায স্বরূপ নফীর উপর প্রয়োগ করা হয়েছে। কাজেই এ নাহী উল্লেখিত বিষয়াদির জন্য নসখ হবে। অর্থাৎ এগুলো আমাদের শরীআতের পূর্বে জায়েয ছিলো। আমাদের শরীআতে এগুলোকে মানসূখ করা হয়েছে।

قوله وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِى الْبَابَيْنِ الخ : গ্রন্থকার বলেন– ইমাম শাফেয়ী (র) এর মাযহাব এই যে, افعال حسية বা افعال شرعية এর উপর আরোপিত নাহী দ্বারা قبح لعينه সাব্যস্ত হবে। অতএব তার মতে যিনা এবং মদ পান হারাম হওয়া ও নিষিদ্ধ দিনসমূহে রোযা রাখা একই পর্যায়ভুক্ত। অথচ যিনা এবং মদ পান افعال حسية এর অর্ন্তগত এবং নিষিদ্ধ দিনে রোযা রাখা افعال شرعية এর অন্তর্গত। সুতরাং ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে উল্লেখিত কাজসমূহ মৌলিকভাবে বৈধ নয় এবং বিশেষণের দিক দিয়েও বৈধ নয় বরং সম্পূর্ণ বাতিল হবে।

এব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র) এর ২টি দলিল রয়েছে।

প্রথম দলিল : মুতলাক নাহী তথা যা قرينة থেকে খালি তা দ্বারা قبح كامل সাব্যস্ত হবে। আর তা قبح لعينه হয়ে থাকে। অতএব নাহী قبح لعينه এর উপর প্রযোজ্য হবে। চাই তা افعال حسية বিষয়ক হোক বা شرعية বিষয়ক হোক। এটা এমন যা আমরা হানাফীগণ আমরের বর্ণনায় حسن সম্পর্কে বলেছি। অর্থাৎ আমাদের মাযহাব এই যে, করীনামুক্ত (মুতলাক) আমর তার كمال حسن বোঝায়। আর এটা حسن لعينه হয়ে থাকে। কাজেই মুতলাক আমর حسن لعينه এর উপর প্রযোজ্য হবে। সুতরাং আমাদের মতে যেভাবে মুতলাক আমর كمال حسن এর প্রবক্তা হওয়ার কারণে حسن لعينه এর উপর প্রযোজ্য হয়। এভাবে ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে মুতলাক নাহী كمال قبح হওয়ার কারণে قبح لعينه এর উপর প্রযোজ্য হবে। কেমন যেমন– ইমাম শাফেয়ী (র) নিষিদ্ধ বিষয়ের কদর্যতাকে নিষিদ্ধ বিষয়ের উত্তমতার উপরে কিয়াস করেছেন। মোটকথা ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে افعال شرعية এর উপর আরোপিত নাহীও قبح لعينه এর উপর প্রযোজ্য হয়। অতএব তার মতে ঈদের দিনের রোযা যেহেতু قبيح لعينه এ কারণে রোযা সওয়াবের কারণ হবে না। এভাবে ফাসেদ বেচা-কেনাও তার মতে قبيح لعينه হওয়ার কারণে ক্রেতার করায়ত্ত করা স্বত্বে মালিকানার ফায়দা দিবে না।

ব্যাখ্যাকার নাহবী তারকীব বর্ণনা করত বলেন– قولا শব্দটি হাল হয়েছে। এটা ফায়েলের অর্থে। আর ফায়েল হলো ইমাম শাফেয়ী (র)। অর্থাৎ এমতাবস্থায় যে, ইমাম শাফেয়ী (র) كمال قبح এর প্রবক্তা। কিংবা মাফউলে লাহুর অর্থে হাল হয়েছে। অর্থাৎ এ কারণে যে, ইমাম শাফেয়ী (র) كمال قبح এর প্রবক্তা। অর্থাৎ পূর্ণ কদার্যতার কারণে ইমাম শাফেয়ী (র) নাহীকে قبح لعينه এর উপর প্রযোজ্য করেন। তিনি নাহীকে আমরের সাথে এ কারণে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন যে, নাহী কদার্যতা দাবি করার ক্ষেত্রে এমনভাবে হাকীকত যেমন আমর উত্তমতার দাবি করার ক্ষেত্রে হাকীকত। কাজেই আমর এবং নাহী উভয়টি এক রকম হওয়া মুনাসিব। অর্থাৎ মুতলাক, আমর যেভাবে حسن لعينه এর উপর প্রযোজ্য হয় তদ্রূপ মুতলাক, নাহীও قبح لعينه এর উপর প্রযোজ্য হবে।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে, নাহীর সীগা قبح বা কদার্যতা দাবি করার জন্য গঠিত হয়নি। অতএব এ বিষয়ে নাহীকে হাকীকত সাব্যস্ত করা কিভাবে ঠিক হতে পারে? এর উত্তর এই যে, কদার্যতা দাবি করার বিষয়ে হাকীকতের ন্যায়। অর্থাৎ যেভাবে হাকিকী অর্থ গঠিত শব্দের জন্য জরুরি, তা থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না। এভাবে কদার্যতার দাবিও নাহীর সীগা থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। বরং তা তার সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত।

وَلاَن الْمَنْهِىَّ عَنْه مَعْصِيَةٌ فلا يَكُوْنُ مشروعًا لِما بَيْنَهما مِنَ التَّضادِ عطفٌ علٰى قولِه قولاً بِكمالِ القُبحِ لاَ علٰى قوله لِاَنَّ النَّهْىَ فِى اقْتِضاءِ القُبْحِ حَقِيقةً كَما يُوهِمُه الظَّاهِرُ وهُو دَلِيلٌ ثانٍ لِلشَّافِعِىِّ رح بِاعْتِبار ترتُّبِ اَحْكامِه وآثارِه كَما اَنَّ الاوّلَ دليلٌ بِاعْتِبارِ تقدُّمِ مُقتَضاهُ وشَرطِه والفرقُ بينَ المَسْلَكَيْنِ بَيِّنٌ وقدْ عَرفْتَ جوابَهُما فِيما تَقدَّم فِى ضِمْنِ تَقْرِيْراتِنا -

অনুবাদ ॥ *"আর منهى منه যেহেতু গুনাহ, সুতরাং তা শরীআতসম্মত হতে পারে না। কেননা উভয়ের মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে"।* এ বাক্যটি গ্রন্থকারের উক্তি قولا بكمال القبح এর ওপর মা'তূফ। لان النهى فى اقتضاء القبح حقيقة তাঁর এ উক্তির ওপর নয়। যেমনটি বাহ্যদৃষ্টিতে মনে হয়। এটা নাহীর হুকুম ও প্রভাব ক্রিয়াশীল হওয়ার দিক দিয়ে ইমাম শাফেয়ী (র) এব দ্বিতীয় দলিল। যেমন- প্রথম দলিল ছিল নাহীর চাহিদা ও শর্তের অগ্রবর্তী হওয়ার প্রেক্ষিতে। উভয় মাযহাবের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। তুমি এ উভয় দলিলের উত্তর– আমাদের ইতঃপূর্বের আলোচনায় জেনেছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ ইমাম শাফেয়ী (র) এর দ্বিতীয় দলিল : নিষিদ্ধ কাজটি পাপ হয়ে থাকে। আর যে কাজ পাপ হয় তা বৈধ হতে পারে না। সুতরাং নিষিদ্ধ কাজ বৈধ হবে না। কারণ বৈধ এবং নিষিদ্ধ হওয়ার মধ্যে সাংঘর্ষিকতা রয়েছে। আর পরস্পর সাংঘর্ষিক দুটি বস্তু একত্রিত হতে পারে না। মোটকথা নিষিদ্ধ কাজ যেহেতু অবৈধ এবং হারাম। অতএব তার মধ্যে অবশ্যই قبح لعينه হবে। চাই তা افعال حسية হোক বা افعال شرعية হোক।

ব্যাখ্যাকার বলেন– ولان المنهى عنه ইবারত মাতিনের উক্তি قولا بكمال القبح এর উপর মাতূফ لِاَنَّ النَّهْىَ فِى اقْتِضاءِ القُبْحِ حَقِيقَةً এর উপর মাতূফ নয়। যেমন নিকটবর্তী হওয়ার কারণে ধারণা হয়।

সারকথা এই যে, ইমাম শাফেয়ী (র) এর প্রথম দলিল قولا بكمال القبح দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় দলিল وَلاَنَّ الْمَنْهِى عَنْهُ مَعْصِيَةٌ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। আর لان النهى فى اقتضاء القبح حقيقة الخ এর মধ্যে নাহীকে আমরের সাথে সামঞ্জস্য সাধন করে উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্যের কারণ বর্ণনা করা হয়েছে।

ব্যাখ্যাকার বলেন– ইমাম শাফেয়ী (র) এর দ্বিতীয় দলিল নাহীর বিধান এবং اثار বা ক্রিয়াশীলতা নিষিদ্ধ হওয়ার উপর প্রযোজ্য হওয়ার দিক দিয়ে। অর্থাৎ দ্বিতীয় দলিল এদিক দিয়ে যে, নিষিদ্ধ বিষয়ের বিধানও ক্রিয়া অর্থাৎ নিষিদ্ধ কাজের পাপ এবং অবৈধ হওয়া নাহীর উপর প্রযোজ্য হয়। আর বিধানও ক্রিয়া পরে আসে ; সুতরাং দ্বিতীয় দলিল নাহীর পরে আসার দিক দিয়ে।

ইমাম শাফেয়ী (র) এর প্রথম দলিল হলো নাহীর দাবি এবং শর্তের দিক দিয়ে। নাহীর দাবি এবং শর্ত হলো কদার্য বা মন্দ হওয়া। আর কোনো বস্তুর দাবি এবং শর্ত উক্ত বস্তুর উপর মুকাদ্দাম হয়। সুতরাং প্রথম দলিল এমন জিনিসের দিক দিয়ে যা নাহীর উপর মুকাদ্দম হয়।

নূরুল আনওয়ার গ্রন্থকার বলেন– আহনাফ ও শাফেয়ীগণের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। ইমাম শাফেয়ী (র) এর উভয় দলিলের উত্তর আমাদের পূর্বের আলোচনার অধীনে উল্লেখিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রথম দলিলের উত্তর এই যে, ইমাম শাফেয়ী (র) এর كمال قبح এর প্রবক্তা হওয়া অসম্ভব। কেননা كمال قبح অর্থাৎ قبح لعينه এর প্রবক্তা হওয়ার ক্ষেত্রে নাহী নফী হয়ে যাবে।

আর দ্বিতীয় দলিলের উত্তর এই যে, নিষিদ্ধ কাজ মৌলিকভাবে এবং বিশেষণের দিক দিয়ে পাপজনক হওয়া স্বীকৃত নয়। বরং তা বিশেষণের দিক দিয়ে পাপজনক হতে পারে। কিন্তু মৌলিকভাবে তা বৈধ। অতএব দিকের বিভিন্নতার কারণে উভয়ের মধ্যে কোনো সাংঘর্ষিকতা নেই। যেমন মণিব তার গোলামকে বললো– সফর করো না'। বরং আমার জামা সেলাই করে আনো। কিন্তু সে জামাও সেলাই করে আনলো এবং সফরও করলো। তাহলে গোলামটি অনুগতও হবে, অবাধ্যও হবে। এর মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই।

وَلِذَا قَالَ لَا تَثْبُتُ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ بِالزِّنَا هٰذَا شُرُوْعٌ فِيْ تَفْرِيْعَاتِ الشَّافِعِيِّ رح عَلٰى مُقَدِّمَةٍ مَطْوِيَّةٍ نَشَأَتْ مِن قَولِه فَلَا يَكُونُ مَشْرُوعًا اى وَلِاَنَّ الْمَنْهِيَّ عنه سواءٌ كان حِسِّيًّا اوشرعيًّا لا يَكُونُ مَشْرُوعًا بِنَفْسِه ولا سببًا لِمَشْرُوعٍ اٰخَرَ قال الشَّافِعِيُّ رح لا تَثْبُتُ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ بِالزِّنَا لاَنَّ الزِّنَا حَرَامٌ ومعصيَةٌ فلا يَكُونُ سَبَبًا لِنِعْمَةٍ فِي حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ لِاَنَّهَا تَلْحَقُ الْاَجْنَبِيَّةَ بِالْاُمَّهَاتِ وقدْ مَنَّ اللّٰهُ تعالٰى بها عَلَيْنَا حَيْثُ قَالَ وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا فَلَا تَثْبُتُ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ اِلَّا بِالنِّكَاحِ -وهى اربعُ حُرْمَاتٍ مُحَرَّمَةٌ اب الواطى وابنه على الموطوءة وحُرْمَةُ اُمِّ الْمَوْطُوءَةِ وبِنْتِهَا على الواطى فهٰذه الحُرُمَاتُ الاَرْبَعُ عِنده لا تَتَعَلَّقُ اِلَّا بِالوَطْىِ الْحَلَالِ وعندنا كما تَثْبُتُ بِالنِّكَاحِ تثبُتُ بالزِّنا ودواعِيه مِن القُبْلَةِ واللَّمْسِ والنَّظرِ الى الفَرْجِ الدَّاخِلِ بِشَهْوَةٍ وذٰلِك لِاَنَّ دَوَاعِيَ الزِّنَا مُفْضِيَةٌ الى الزِّنا وَالزِّنَا مُفْضٍ اِلَى الْوَلَدِ وَالْوَلَدُ هُوَ الْاَصْلُ فِيْ اِسْتِحْقَاقِ الْحُرُمَاتِ اى يُحَرِّمُ عَلٰى الْوَلَدِ اَوَّلًا اَبَ الْوَاطِي وَاِبْنَهٗ اِذَا كَانَتْ اُنْثٰى واُمَّ الْمَوْطُوءَةِ وَبِنْتَهَا اِذَا كُنَّ ذَكَرًا ثُمَّ تَتَعَدّٰى مِنَ الْوَلَدِ اِلٰى طَرَفَيْهِ فَتَحْرُمُ قَبِيْلَةُ الْمَرْاَةِ عَلَى الزَّوْجِ وَقَبِيْلَةُ الزَّوْجِ عَلٰى الْمَرْاَةِ لِاَنَّ الْوَلَدَ اَنْشَأَ جُزْئِيَّةً وَاِتِّحَادًا بَيْنَهُمَا وَلِهٰذَا يُضَافُ الْوَلَدُ الْوَاحِدُ اِلَى الشَّخْصَيْنِ جَمِيْعًا فَصَارَ كَاَنَّ الْمَوْطُوءَةَ جُزْءٌ مِّنَ الْوَاطِي وَالْوَاطِيْ جُزْءٌ مِّنْهَا فَتَكُوْنُ قَبِيْلَتُهٗ قَبِيْلَتَهَا وَقَبِيْلَتُهَا قَبِيْلَتَهٗ فَعَلٰى هٰذَا كَانَ يَنْبَغِيْ اَنْ لَّا يَجُوْزَ وَطْيُ الْمَوْطُوءَةِ مَرَّةً اُخْرٰى وَلٰكِنْ اِنَّمَا جَازَ ذٰلِكَ دَفْعًا لِلْحَرَجِ وَكَذَا تَتَعَدّٰى هٰذِهٖ مِنَ الزِّنَا اِلٰى اَسْبَابِهٖ فَالزِّنَا وَاَسْبَابُهٗ اِنَّمَا يُفِيْدُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ بِوَاسِطَةِ الْوَلَدِ لَا مِنْ حَيْثُ اَنَّهٗ زِنَا كَمَا اَنَّ التُّرَابَ اِنَّمَا يُطَهِّرُ الْاَحْدَاثَ لِاَجْلِ قِيَامِهٖ مَقَامَ الْمَاءِ لَا مِنْ حَيْثُ نَفْسِهٖ -

অনুবাদ ॥ *"ইমাম শাফেয়ী (র) এ কারণেই বলেন– যিনার দ্বারা حرمت مصاهرة সাব্যস্ত হবে না"।* এখান থেকে ইমাম শাফেয়ী (র)-এর ঐ সকল শাখা মাসআলার বর্ণনা শুরু হয়েছে, যা একটি জটিল ভূমিকার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। তা তাঁর বক্তব্য فلا يكون مشروعا থেকে সৃষ্ট। কেননা, নিষিদ্ধ বস্তু চাই তা حسى হোক, অথবা شرعى তা স্বয়ং বিধিসম্মত হয় না, আর তা অন্য কোন مشروع এর সবাবও হতে পারে না। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন- حرمت مصاهرة তথা বৈবাহিক কারণে সৃষ্ট হারাম হওয়া ব্যভিচারের দ্বারা সাব্যস্ত হবে না। কেননা ব্যভিচার একটি হারাম ও পাপের কাজ। সুতরাং তা নিয়ামত লাভের কারণ হতে পারে না। আর তা হলো বৈবাহিক কারণে সৃষ্ট অবৈধতা। কেননা এ হুরমত মায়েদের সাথে আত্মীয়কে যুক্ত করে দেয়। আল্লাহ্ পাক এ হুরমত দ্বারা আমাদের ওপর অনুগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তিনি এরশাদ করেছেন- তিনিই আল্লাহ যিনি মানুষকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি মানুষের জন্য রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা ও শ্বশুর-সম্পর্কীয় আত্মীয়তা সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং বিবাহ ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা

حرمة مصاهرة চার প্রকার। যেমন- (১) সঙ্গমকারীর পিতা ও (২) তার পুত্র সঙ্গমকৃতা মহিলার জন্যে হারাম হওয়া। (৩) সঙ্গমকৃতা মহিলার মাতা এবং (৪) তার কন্যা সঙ্গমকারীর ওপর হারাম হওয়া। ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে এ চারো প্রকার, হুরমত বৈধ পন্থায় কৃত সঙ্গমের দ্বারা সাব্যস্ত হবে। আমাদের হানাফীদের মতে বিবাহ দ্বারা যেমনিভাবে হুরমত সাব্যস্ত হয়, তদরূপ ব্যভিচার ও ব্যভিচারের পূর্বক্রিয়া যেমন উত্তেজনার সাথে চুম্বন করা, স্পর্শ করা, যৌনাঙ্গের প্রতি দৃষ্টি দেয়া ইত্যাদি দ্বারাও হুরমত সাব্যস্ত হবে।

دواعي وطى বা ব্যভিচারের পূর্বক্রিয়া দ্বারা হুরমত সাব্যস্ত হওয়ার কারণ এই যে, ব্যভিচারের পূর্বক্রিয়া ব্যভিচার পর্যন্ত পৌঁছায়। ব্যভিচার সন্তান পর্যন্ত পৌঁছায়। আর হুরমত সাব্যস্ত হওয়ার মূল কারণ হলো সন্তান। অর্থাৎ সঙ্গমকারীর পিতা এবং তার পুত্র প্রথমতঃ সন্তানের ওপরে হারাম হয়, যদি সে সন্তান কন্যা হয়। আর সঙ্গকৃতার মা এবং তার কন্যা (সন্তানের উপরে) হারাম হয় যদি সে সন্তান পুত্র হয়। তারপর সন্তান থেকে তা উভয় দিকে সম্প্রসারিত হয়। সুতরাং মহিলার মাতৃপক্ষ পুরুষের ওপর হারাম হবে এবং পুরুষের পিতৃপক্ষের মহিলার ওপর হারাম হবে।

কেননা এ সন্তানই তাদের উভয়ের মাঝে একে অপরের অংশ ও অভিন্নতা সৃষ্টি করেছে। এ কারণেই সন্তানকে পিতা-মাতা উভয়ের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করা হয়। সুতরাং কেমন যেন সমঙ্গকৃতা সঙ্গমকারীর অংশ এবং সঙ্গমকারী সঙ্গমকৃতার অংশে পরিণত হয়।

অতএব সঙ্গমকারীর বংশ সঙ্গমকৃতার বংশ রূপে এবং সঙ্গমকৃতার বংশ সঙ্গমকারীর বংশ রূপে গণ্য হবে। এর ওপরে ভিত্তি করে সঙ্গমকৃতার সাথে দ্বিতীয়বার সঙ্গম করা বৈধ না হওয়া উচিৎ। কিন্তু সমস্যা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে এটা বৈধ রাখা হয়েছে। অনুরূপভাবে এ حرمة مصاهرة ব্যভিচারে উদ্বুদ্ধকারী কার্যাবলীর প্রতি সম্প্রসারিত হয়। কাজেই ব্যভিচার এবং ব্যভিচারের পূর্ব ক্রিয়াদি সন্তানের মধ্যস্থতায় حرمت مصاهرة সাব্যস্ত করবে। এ কারণে নয় যে, তা ব্যভিচার। যেমন- মাটি পানির স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কারণে অপবিত্রতাকে পবিত্র করে, সত্ত্বাগত হিসেবে নয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ قوله وَلِذَا قَالَ لَاتَثْبُتُ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ الخ : ইমাম শাফেয়ী (র) এর উক্তি فَلَا يَكُونُ مَشْرُوْعًا দ্বারা একটা ভূমিকা বোঝা যায়। তা এই যে, নিষিদ্ধ কাজটি حسى হোক বা شرعى হোক। উক্ত কাজটি সত্তাগতভাবে বৈধ হবে না এবং অন্য কোনো বৈধ কাজের সবাবও হবে না। কারণ নিষিদ্ধ কাজ অন্যায় হয়ে থাকে। আর অন্যায় ও বৈধতার মধ্যে ব্যবধান থাকে। আর বিপরীতমুখী ২টি বস্তুর একটি অপরটির জন্য সবাব হতে পারে না। কাজেই নিষিদ্ধ কাজ বৈধ কাজের কোনো সবাব হতে পারে না। আর তা নিজেও বৈধ হয় না। সুতরাং ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন– নিষিদ্ধ কাজ বৈধও নয় এবং তা বৈধ কাজের সবাবও নয়।

এ ভূমিকার উপর ইমাম শাফেয়ী (র) এর পক্ষ থেকে কয়েকটি শাখা মাসআলা উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম মাসআলা : ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে যিনা, حرمت مصاهرة এর সবাব হয় না। অর্থাৎ যিনা দ্বারা হুরমতে মুসাহারা তথা বৈবাহিক সূত্রে হারাম হওয়ার ন্যায় হুরমত সাব্যস্ত হবে না। কারণ যিনা হলো হারাম এবং অন্যায় কাজ। আর হুরমতে মুসাহারা হলো একটি নেয়ামত এবং বৈধ বিষয়। কেননা যখন কোনো ব্যক্তি জামাতা হয় তখন স্ত্রীর মা অর্থাৎ তার শাশুড়ি আপন মা তুল্য হয়ে যায়। আর শাশুড়ির জন্য জামাতার সামনে পর্দা করা ওয়াজিব নয়। জামাতার জন্য শাশুড়িকে বিবাহ করা জায়েয নয়। এভাবেই স্বামীর পিতা স্ত্রীর পিতা হয়ে যায়। যার দরুন শ্বশুর থেকে তার পর্দা করা ওয়াজিব নয়। এবং শশুরের সাথে তার বিবাহ বৈধ নয়। অতএব বৈবাহিক সূত্র একটি বড়ো নেয়ামত। আল্লাহ তা'আলা এর দরুন করুণা প্রকাশ করেছেন। তিনি এরশাদ করেছেন– "আর ঐ সত্তা যিনি বীর্যের কণা দ্বারা মানব সৃষ্টি করেছেন। অতপর তাদেরকেও বংশ ও বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয় বানিয়েছেন"। মোটকথা আল্লাহ তা'আলার এর দ্বারা অনুগ্রহ প্রকাশ করা এ বিষয়ের দলিল যে এটা একটা নেয়ামত। কাজেই যিনা যা একটি নিষিদ্ধ

হারাম কাজ। তা উক্ত নেয়ামত লাভের কারণ হতে পারে না। বরং একমাত্র বিবাহ এবং বৈধ সহবাসের দ্বারাই তা সাব্যস্ত হতে পারে।

حرمة مصاهرة এর প্রকাভেদ : حرمة مصاهرة ৪ প্রকার। ১. সঙ্গমকারীর পিতা সঙ্গমকৃতার জন্য হারাম হওয়া, ২. সঙ্গমকারী পুত্র সঙ্গমকৃতার জন্যে হারাম হওয়া, ৩. সঙ্গমকারীর উপর সঙ্গমকৃতার মা হারাম হওয়া, ৪. সঙ্গমকারীর উপর সঙ্গমকৃতার কন্যা হরাম হওয়া।

ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে এ চারো প্রকার হুরমত কেবল বৈধ সহবাসের সাথে সংশ্লিষ্ট; যিনার সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। কিন্তু হানাফীদের মতে বিবাহের ন্যায় যিনার দ্বারা এবং যিনার প্রারম্ভিক কার্যকলাপের দ্বারাও হুরমতে মুসাহারা সাব্যস্ত হয়। যিনার প্রারম্ভিক কার্য যথা চুম্বন, উত্তেজনার সাথে স্পর্শ ও যৌনাঙ্গ দর্শন ইত্যাদি। টীকা লেখক বলেন– بشهوة শব্দটি স্পর্শ ও দেখার সাথে সংশ্লিষ্ট। চুম্বনের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। কারণ এক্ষেত্রে উত্তেজনাই মূল।

তানবীরুল আবসার গ্রন্থে উল্লেখিত আছে যে, কেউ যদি শাশুড়িকে চুম্বন করে তাহলে স্ত্রী তার উপর হারাম হয়ে যাবে। যতোক্ষণ না উত্তেজনা না থাকা স্পষ্ট হবে। এ মাসআলা দ্বারা বোঝা গেলো যে, চুম্বনের বিষয়ে উত্তেজনাই মূল। আর স্পর্শ ও দর্শনের ক্ষেত্রে উত্তেজনা মূল নয়। সুতরাং শাশুড়িকে স্পর্শ করা এবং যোনী অভ্যান্তরে দর্শনের দ্বারা স্ত্রী হারাম হবে না। যতোক্ষণ না উত্তেজনা বোঝা যায়। অর্থাৎ পুরুষের মধ্যে যখন উত্তেজনা পাওয়া যাওয়া প্রমাণিত হবে তখন স্ত্রী হারাম হবে। এর দ্বারা বোঝা গেলো যে, স্পর্শ ও দর্শনের মধ্যে উত্তেজনা পাওয়া যাওয়াই মূল নয়।

দূররে মুখতার গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে যে, স্পর্শ ও দর্শনের মধ্যে উত্তেজনা ধর্তব্য; অন্য কিছুতে ধর্তব্য নয়। উত্তেজনা বলতে উদ্দেশ্য হলো লিঙ্গে নড়াচড়া সৃষ্টি হওয়া। যদি পূর্বে এমন থেকে থাকে তাহলে স্পর্শ ও দর্শনের কারণে এর মধ্যে বৃদ্ধি ঘটবে। মহিলা ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদের উত্তেজনা এই যে, স্পর্শ ইত্যাদি দ্বারা তাদের অন্তরে কামস্পৃহা অনুভব হবে। যদি পূর্ব থেকেই অন্তরে এ ভাব বিরাজ করে তাহলে তা আরো বৃদ্ধি ঘটবে।

ব্যাখ্যাকার যোনীকে অভ্যান্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট বলেছেন। এই জন্যে যে, যোনীর উপরিভাগ দর্শন থেকে বিরত থাকা দুঃসাধ্য। কাজেই হুরমতে মুসাহারা সাব্যস্ত করার জন্য বহির্ভাগ দেখা ধর্তব্য হবে না। মোটকথা আমাদের মতে যিনা এবং যিনার প্রারম্ভিক কার্য্য দ্বারাও হুরমতে মুসাহারা সাব্যস্ত হয়।

দলিল : প্রারম্ভিক কার্যাদি মানুষকে যিনা পর্যন্ত উপনীত করে। আর যিনার দ্বারা সন্তান জন্ম লাভ করে। আর হুরমতে মুসাহারা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য বাচ্চাই মূল অর্থাৎ ভূমিষ্ট বাচ্চা যদি কন্যা হয় তাহলে প্রথমত তার উপর সহবাসকারীর পিতা ও কন্যা হরাম হবে। আর যদি পুত্র হয় তাহলে সহবাসকৃতার মা এবং তার কন্যা তার উপর হারাম হবে। অতঃপর এ হারাম হওয়া বাচ্চা থেকে তার পিতার মাতার দিকে ধাবিত হবে। সুতরাং মহিলা তথা বাচ্চার মায়ের উর্ধ্বতন বংশ এবং নিম্নগামী বংশ স্বামী তথা বাচ্চার পিতার উপর হারাম হয়ে যাবে। এবং স্বামী তথা বাচ্চার পিতার উর্ধ্বতন এবং নিম্নগামী আত্মীয়স্বজন মহিলা তথা বাচ্চার মায়ের উপর হারাম হয়ে যাবে।

হারাম সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে বাচ্চা মূল হওয়ার কারণ : বাচ্চা-ই সহবাসকারী এবং সহবাসকৃতার মধ্যে অংশীদারীত্ব ও ঐক্য সৃষ্টি করে। এ কারণে একটি বাচ্চা পূর্ণরূপে পিতার দিকেও সম্বন্ধিত হয় এবং মায়ের দিকেও সম্বন্ধিত হয়। যেমন বলা হয় যে, এ বাচ্চাটি অমুক পিতার বা অমুক মাতার। অর্থাৎ সে মায়েরও অংশ এবং পিতারও অংশ। এ অংশীদারিত্বের কারণে সহবাসকারীর গোত্র অর্থাৎ সহবাসকারীর উর্ধ্বতন ও নিম্নগামী বংশ সহবাসকৃতার উর্ধ্বগামী ও নিম্নগামী আত্মীয় হয়ে গেলে। এভাবে এর বিপরীতেও।

তবে এ ব্যাপারে প্রশ্ন যে, তাহলে তো সন্তান ভূমিষ্ট হবার পরে সহবাসকারী ও সহবাসকৃতার মাঝে হুরমত সাব্যস্ত হওয়া উচিত ছিলো। কারণ নিজ অংশ দ্বারা ফায়দা গ্রহণ করা হারাম। এর উত্তর এই যে, কিয়াসের দাবি এমনই ছিলো। তবে এতে অনেক অসুবিধা রয়েছে। কেননা প্রত্যেক সন্তানের পরে নতুন মহিলা যোগাড় হওয়া খুবই কষ্ট কর। সুতরাং মানুষের বংশ বহাল রাখার জন্য মানুষের প্রয়োজন সামনে রেখে এ অসুবিধাকে দূর করা হয়েছে ও অংশ হওয়া সত্ত্বে সহবাসকৃতা মহিলার সাথে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পরেও উপকার গ্রহণ তথা সহবাস বৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং যিনা এবং তার প্রাথমিক কার্যাদি সন্তানের মাধ্যমে হুরমতে মুসাহারার সবাব হলো। যিনার বা যিনার প্রারম্ভিক কার্যাদি

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

وَلا يُفِيْدُ الغَصْبُ المِلْكَ عطفٌ علٰى لا تَثْبُتُ وتفريعٌ ثانٍ لِلشّافعيِّ وذٰلك لِاَنَّ الغَصْبَ حرامٌ ومَعْصِيَةٌ فلا يَكُوْنُ سَبَبًا لِاَمرٍ مَشْرُوْعٍ هُوَ المِلْكُ اِذا هَلَكَ المَغْصُوْبُ وقُضِيَ علَيْه بِالضَّمان وعِنْدَنا يَمْلِكُ الغَاصِبُ المَغْصُوْبَ بَعْدَ الضَمانِ فَيَمْلِكُ اَكْسَابَه البَاقِيَةَ فِيْ يَدِه ويَنْفُذُ بَيْعُهُ المَاضِيْ لِاَنَّهٗ لَوْ لَمْ يَمْلِكِ الغَاصِبُ المَغْصُوْبَ بَلْ بَقِيَ فِيْ مِلْكِ المَالِكِ لَاجْتَمَعَ البَدَلَانِ فِيْ مِلْكِه وهُوَ الاَصْلُ مع الضَّمَانِ وذٰلِكَ لا يَجوزُ فَمَا مَلَك المَالِكُ الضَّمانَ يَجِبُ انْ يَمْلِكَ الغاصِبُ المَغْصُوْبَ فَالضَّمانُ عِنْدَهٗ بِمُقابَلَةِ اليَدِ الفَائِتَةِ عَنِ المِلْكِ وعِنْدَنا بِمُقابَلَةِ المِلْكِ الفَائِتِ اِلّا فِي المُدَبَّرِ فَاِنّه اِذا غَصَبَ رَجُلٌ مُدَبَّرَ احدٍ وهَلَكَ فِيْ يَدِه يَضْمَنُه ولَا يَمْلِكُهٗ جَبْرًا لِيَدِهِ الفَائِتَةِ

অনুবাদ ॥ *'আর অপহরণ মালিকানা সাব্যস্ত করে না"* । এ অংশটুকু গ্রন্থকারের উক্তি لَاتَثْبُتُ এর ওপরে মা'তূফ। এটা ইমাম শাফেয়ী (র)-এর দ্বিতীয় শাখা মাসআলা। এটা এ জন্যে যে, অপহরণ করা হারাম ও পাপের কাজ। কাজেই তা বিধিসম্মত বিষয়ের তথা মালিকানার কারণ হবে না। যখন অপহৃত বস্তু ধ্বংস হয় এবং তার ওপর ক্ষতিপূরণের রায় ঘোষিত হয়। আর আমাদের আহনাফের মতে-ক্ষতিপূরণ দানের পর অপহরণকারী অপহৃত বস্তুর মালিক হবে। সুতরাং সে উক্ত উপার্জিত অংশের মালিক হবে যা তার হাতে বিদ্যমান এবং অপহরণকারীর পূর্বের বিক্রয় কার্যকরী হবে। কেননা অপহরণকারী যদি অপহৃত বস্তুর মালিক না হয়, বরং তা প্রকৃত মালিকের মালিকানায় থেকে যায়, তবে এমতাবস্থায় মালিকের মালিকানায় দুটি বিনিময় একত্রিত হয়ে যায়, আর তা হল (১) মূলবস্তু (২) ক্ষতিপূরণ। আর এমনটা জায়েয নেই। কাজেই যখন মালিক ক্ষতিপূরণ লব্ধ অর্থের মালিক হয়েছে। তখন অপহৃত বস্তু অপহরণকারী মালিক হওয়া অনিবার্য। সুতরাং ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে ক্ষতিপূরণ লব্ধ মাল হল ঐ মালের মালিকানা হাত ছাড়া হওয়ার পরিবর্তে। আর আমাদের মতে- ছুটে যাওয়া মালিকানার বিনিময়ে সাব্যস্ত হবে। তবে মুদাব্বারের ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য হবে না। কেননা কোন ব্যক্তি যদি কারোর মুদাব্বার দাসকে অপহরণ করে। আর সে তার মালিকানায় ধ্বংস হয়ে যায়, তবে অপহরণকারী মুদাব্বারের ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে; কিন্তু সে তার মালিক হবে না। ক্ষতিপূরণটা মালিকের করায়ত্ব হাতছাড়া হওয়ার কারণে হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله وَلَايُفِيْدُ الغَصْبُ المِلْكَ الخ : ব্যাখ্যাকার বলেন– এই ইবারতটি পূর্বে উল্লেখিত মতন لَاتَثْبُتُ এর উপর মা'তূফ। এটা ইমাম শাফেয়ী (র) এর দ্বিতীয় শাখা মাসআলার সার। কেউ যদি কারো কোনো সামগ্রী ছিনতাই করে। আর তা ছিনতাইকারীর হাতে বিনষ্ট হয়ে যায়। ফলে তার উপর জরিমানা আদায়ের রায় দেয়া হয়। তাহলে ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে এ ছিনতাই মালিকানার ফায়দা দিবে না। অর্থাৎ ছিনতাইকারী জরিমানা আদায়ের পর ছিনতাইকৃত দ্রব্যের মালিক হবে না।

(পূর্বের বাকী অংশ)

মূল সবাব নয়। আর সন্তানের সত্তার মধ্যে কোনো হুরমত ও পাপ নেই। বরং যিনা কার্যের মধ্যে পাপ রয়েছে। সুতরাং যা নিষিদ্ধ তা বৈধ বিষয় তথা হুরমতে মুসাহারার সবাব নয়। আর যা হুরমতে মুসাহারার সবাব অর্থাৎ সন্তান তা منهي عنه নয়। অতএব আমাদের মতে যিনা এবং যিনার সবাবসমূহ দ্বারাও হুরমতে মুসাহারা সাব্যস্ত হবে। এর উদাহরণ এমন যেমন মাটি অপবিত্রকে পবিত্রকারী। তবে তা কেবল এ কারণে যে, মাটি পানির স্থলাভিষিক্ত। প্রকৃতভাবে মাটি পবিত্রকারী নয়। এভাবে যিনাও প্রকৃতভাবে হুরমতে মুসাহারার সবাব নয়। বরং সন্তানের মাধ্যমে সবাব হচ্ছে।

দলিল : ছিনতাই বা অপহরণ একটি হারাম কাজ যা পাপ এবং قبيح لعينه আর মালিক হওয়া একটি বৈধ বিষয় ও নেয়ামত। আর পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, হারাম কাজ এবং নিষিদ্ধ কাজ কোন বৈধ কাজের সবাব হতে পারে না। অতএব ছিনতাইকারীর জন্য ছিনতাইকার্য মালিকানা লাভের সবাব হবে না।

এ ব্যাপারে হানাফীদের মাযহাব এই যে, ছিনতাইকারী জরিমানা আদায়ের পর ছিনতাইকৃত দ্রব্যের মালিক হয়ে যায়। কাজেই ছিনতাইকৃত দ্রব্য যদি গোলাম হয় এবং সে এই সময়ে কোনো কিছু উপার্জন করে থাকে। তাহলে ছিনতাইকৃত গোলামের হাতে যা থাকবে ছিনতাইকারীই তার মালিক হবে। কারণ তা গোলামের তাবে' হয়ে থাকে। অতএব আসল তথা ছিনতাইকৃত গোলামে যখন নিতাইকারীর মালিকানা সাব্যস্ত হচ্ছে। অতএব তার উপার্জিত বস্তুও তার মালিকানাধীন হবে। এর মধ্যে রহস্য এই যে, জরিমানা আদায়ের পরে ছিনতাইকারীর জন্য মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া ছিনতাইয়ের সময়ের প্রতি সম্বন্ধিত হয়। সুতরাং ছিনতাই এর পরে অর্জিত সকল বস্তু ছিনতাইকারীর নিকট অর্পণ করা হবে। আমাদের মতে জরিমানা আদায়ের পরে ছিনতাইকারী যেহেতু ছিনতাইকৃত দ্রব্যের মালিক হয়ে যায়। এ কারণে ছিনতাইকারী যদি তা বিক্রি করে ফেলে এরপর মালিককে তার জরিমানা আদায় করে দেয় তাহলে জরিমানা আদায়ের পরে এ বিক্রি কার্যকর হবে। কারণ বিক্রি কার্যকর হওয়ার জন্য মিলকে নাকিসও যথেষ্ট।

মোটকথা ছিনতাই দ্বারা মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে হানাফীদের দলিল এই যে, জরিমানা আদায়ের পরে যদি ছিনতাইকারী ছিনতাইকৃত দ্রব্যের মালিক না হয় তাহলে আছল এবং জরিমানা উভয়ই মালিকের মালিকানায় একত্রিত হয়ে যায়। অথচ এটা অবৈধ। একারণে আমরা হানাফীগণ বলে থাকি যে, জরিমানা আদায়ের পরে ছিনতাইকারী ছিনতাইকৃত দ্রব্যের মালিক হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : এক্ষেত্রে ছিনতাই যা নিষিদ্ধ কাজ একটি বৈধ বিষয় তথা দ্রব্যের মালিক হওয়ার কারণ ঘটে। অথচ এটা বৈধ নয়।

উত্তর : ছিনতাইকারী ছিনতাইকৃত দ্রব্যের মালিকানার সবাব ছিনতাই করা নয়। বরং এর সবাব হলো জরিমানা ওয়াজিব হওয়া। আর জরিমানা ওয়াজিব হওয়া منهى عنه নয়। বরং مامور به সারকথা এই যে, যা منهى عنه নয় সেটাই ছিনতাইকারীর মালিক হওয়ার সবাব। আর যা নিষিদ্ধ তা এখানে সবাব নয়। সুতরাং কোনো প্রশ্ন আরোপিত হবে না। তবে বেশি থেকে বেশি এটা বলা যেতে পারে যে, ছিনতাইকারীর মালিক হওয়ার সবাব হলো জরিমানা ওয়াজিব হওয়া। আর জরিমানা ওয়াজিব হওয়ার সবাব হলো ছিনতাই করা। অতএব ছিনতাইকারীর মালিকানার সবাব ছিনতাই করাই সাব্যস্ত হলো। আর ছিনতাই করা যেহেতু منهى عنه কাজেই ছিনতাইকারীর মালিকানা তথা বৈধ কাজের সবাব منهى عنه হলো।

এর উত্তর এই যে, জরিমানা ওয়াজিব হওয়ার মাধ্যমে নিঃসন্দেহে ছিনতাই করা সবাব হচ্ছে। তবে এটা যেহেতু সরাসরি নয় বরং অন্যের মাধ্যমে এ কারণে তা ধর্তব্য নয়।

নূরুল আনওয়ার গ্রন্থকার (র) আহনাফ এবং শাফেয়ীগণের মধ্যকার মতবিরোধের সূত্র উল্লেখ করে বলেন– ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে মালিকের ছুটে যওয়া করায়ত্তের বিনিময়ে জরিমানা ওয়াজিব হয়। ছিনতাইকৃত দ্রব্যের বিনিময়ে জরিমানা ওয়াজিব হয় না। সুতরাং জরিমানা আদায় করার পরে ছিনতাইকারী ছিনতাইকৃত দ্রব্যের মালিক হবে না। আর আহনাফের মতে জরিমানা যেহেতু ছিনতাইকৃত দ্রব্যের বিনিময়ে ওয়াজিব হয়। এ কারণে জরিমানা আদায় করার কারণে সে উক্ত বস্তুর মালিক হয়ে যাবে। তবে মুদাববার গোলাম এর থেকে ব্যতিক্রম। অর্থাৎ কেউ যদি কারো মুদাববার গোলাম (যাকে মনিব তার মৃত্যুর পরে আযাদ হওয়ার ঘোষণা দেয়) অপহরণ করে। আর অপহরণকারীর নিকট থাকাকালে সে মারা যায়। এর পর অপহরণকারী তার জরিমানা আদায় করে তথাপি হানাফীগণের মতে সে উক্ত গোলামের মালিক হবে না। কারণ মুদাব্বার একজনের মালিকানা থেকে অপরের মালিকানায় স্থানান্তর কবুল করে না। এ কারণে জরিমানা আদায় করা স্বত্ত্বে অপহরণকারী মুদাব্বার গোলামের মালিক হবে না। সে যা জরিমানা আদায় করেছিলো তা মুদাব্বারের মনিবের করায়ত্ত ছুটে যাওয়ার বিনিময়ে সাব্যস্ত হবে।

وَلَا يَكُوْنُ سَفَرُ الْمَعْصِيَةِ سَبَبًا لِلرُّخْصَةِ تفريعُ ثَالِثٌ لِلشَّافِعِيِّ رح وذٰلك لِاَنَّ سَفَرُ الْمَعْصِيَةِ وهُوَ سَفَرُ الْاٰبِق وقَاطِعُ الطَّرِيْق وَالْبَاغِي مَعْصِيَةٌ وحَرامٌ فلا يَكُوْنُ سَبَبًا لِمَشْرُوْعٍ وهُوَ الرُّخْصَةُ فِي اِفْطَارِ الصَّوْمِ وقَصْرِ الصَّلٰوةِ وعِنْدَنَا تعُمُّ الرُّخْصَةُ لِلْمُطِيْعِ والعَاصِي جميعًا لِاَنَّ السَّفَرَ لَيْسَ قَبِيْحًا فِي نفسِه بَلِ الْقَبِيْحُ هو الْمَعْصِيَةُ مُجَاوِرٌ لَه مُنْفَكٌّ عَنه فيَصْلَحُ سَبَبًا لِلرُّخْصَةِ ولا يَمْلِكُ الْكافِرُ مَالَ الْمُسْلِمِ بِالْاِسْتِيْلَاءِ تفريعُ رابعُ لِلشَّافِعِيِّ رح وذٰلِكَ لِاَنَّ اِسْتِيْلَاءَ الكافِرِ عَلٰى مَالِ الْمُسْلِمِ واِحْرَازَه بِدارِ الحَرْبِ امرٌ حرامٌ ومَحْظُورٌ فلا يَصْلُحُ اَنْ يَكُوْنَ سببًا لِمِلْكِه وعِنْدَنا يكونُ ذٰلكَ سَبَبًا لِمِلْكِهِ لِاَنَّ الْحِفْظَ اِنَّمَا يَكُوْنُ بِالْمِلْكِ اَوْ بِالْيَدِ فَاِذَا اَخَذُوْهُ وَاَدْخَلُوْهُ فِيْ دَارِهِمْ فَاتَ مِنَّا الْيَدُ وَالْمِلْكُ فَكَانَ اِسْتِيْلَاؤُهُمْ عَلٰى مَحَلٍّ غيرِ معصومٍ بقاءً وانْ كَانَ مَعْصُوْمًا اِبْتِدَاءً فيَمْلِكُوْنَه وقد ثَبَتَ ذٰلِكَ مِنْ اِشَارَةِ قَوْلِهِ تَعَالٰى لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ لِاَنَّهُمْ كَانُوْا مَيَاسِيْرَ بِمَكَّةَ وَاِنَّمَا سُمُّوا فُقَرَاءَ لِاِسْتِيْلَاءِ الْكُفَّارِ عَلٰى مَالِهِمْ -

অনুবাদ ॥ *"পাপকার্যের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ রুখসতের কারণ হবে না।* এটা ইমাম শাফেয়ী (র)-এর তৃতীয় শাখা মাসয়ালা। এটা এজন্যে যে, পাপজনিত ভ্রমণ তথা মণিব থেকে পলাতক ক্রীতদাসের ভ্রমণ, ডাকাতের ভ্রমণ এবং রাষ্ট্রদ্রোহীর ভ্রমণ গুনাহের কাজ ও হারাম। সুতরাং হারাম কাজ একটি বিধিসম্মত বিষয়ের কারণ হতে পারে না। আর তা হলো- রোযা ভঙ্গের অনুমতি এবং নামায কসর করার অনুমতি। আমাদের মতে- রুখসাত অনুগত, পাপী সবাইকে শামিল করবে। কেননা ভ্রমণ করা প্রকৃতপক্ষে মন্দ নয়। বরং মন্দ হলো পাপ করা, যা তৎসঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও বিচ্ছিন্ন হতে পারে। সুতরাং এ ভ্রমণ রুখসতের সবাব হওয়ার উপযোগী।

আর কাফির মুসলমানের সম্পদ তার হস্তগতকরণের দ্বারা মালিক হবে না। এটা ইমাম শাফেয়ী (র)-এর চতুর্থ শাখা মাসয়ালা। এটা এজন্যে যে, মুসলমানের সম্পদের উপরে কাফিরদের আধিপত্য এবং দারুল হরবে তা পুঞ্জিভূত করা হারাম ও নিষিদ্ধ কাজ। কাজেইমালিকানার সবব হবে না।

আর আমাদের মতে এটা তার মালিকানার সবাব হবে। কেননা মালের সংরক্ষণ মালিকানা ও করায়ত্ত দ্বারা হয়ে থাকে। সুতরাং তারা যখন এটাকে হস্তগত করেছে এবং তা তাদের রাষ্ট্রে নিয়ে গেছে, তখন আমাদের থেকে মালিকানা হাতছাড়া হয়ে গেছে। সুতরাং তাদের আধিপত্য এমন ক্ষেত্রে ছিল, যা স্থায়িত্বের দিক থেকে অসংরক্ষিত, যদিও ক্ষেত্রটি প্রথমেই সংরক্ষিত থেকে থাকে। কাজেই তারা সম্পদের মালিক হবে। আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীর ইংগিত দ্বারা- সাব্যস্ত হয়েছে 'সাদকা দারিদ্র মুহাজিরদের জন্যে নির্ধারিত, যারা তাদের ঘর-বাড়ি ও ধন-সম্পদ থেকে বিতাড়িত হয়েছে'। কেননা তারা মক্কায় সম্পদশালী ছিলেন। তাঁদের সম্পদের ওপর কাফিরদের আধিপত্যের কারণে তাদেরকে দরিদ্র নামকরণ করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله ولايكون سفر المعصية الخ : **ইমাম শাফেয়ী (র) এর তৃতীয় মাসআলা :** পাপের উদ্দেশ্যে সফর করলে তা রমযান মাসের রোযা না রাখার এবং নামায কছর করার রুখসৃতের সবাব হবে না। কেননা গোণাহর উদ্দেশ্যে সফর যেমন মণিবের থেকে পলাতক গোলামের সফর, ডাকাত এবং মুসলমান শাসকের সাথে বিদ্রোহকারীদের সফর এ সকল কাজ হারাম এবং পাপ। আর রমযানের রোযা না রাখার অনুমতি এবং নামায কছর করার অনুমতি হলো বৈধ কাজ। হারাম কাজ কখনো বৈধ কাজের কারণ হতে পারে না। অতএব এ সকল ব্যক্তিদের জন্য রোযা না রাখার এবং নামায কছর করার অনুমতি থাকবে না।

হানাফীদের মতে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত এই রুখসত অনুগত ও অবাধ্য উভয়কে শামিল করে। অর্থাৎ হারাম উদ্দেশ্যে সফরকারী বা পলাতক গোলাম, মুসলিম শাসকের বিদ্রোহী ব্যক্তির সফর সর্বক্ষেত্রে রুখসতের সবাব হবে।

দলিল : প্রকৃতপক্ষে সফর বা ভ্রমণ কোনো খারাপ কাজ নয়। এখানে খারাপ হলো তাদের পলায়ন করা, ডাকাতি করা ও বিদ্রোহ পোষণ করা। আর সফরের জন্য এ ধরনের নাফরমানি অপরিহার্য নয়। বরং কখনো সফরের ক্ষেত্রে এসব সংশ্লিষ্ট হয় কখনো বা হয় না। যেমন কোনো গোলাম তার মণিবের অনুমতি নিয়ে ভ্রমণ করলো। তাহলে এক্ষেত্রে ভ্রমণ পাওয়া গেলো কিন্তু অবাধ্যতা বা গোণাহ পাওয়া গেলো না। মোটকথা মূল ভ্রমণের মধ্যে কোনো পাপ নেই। এ কারণেই আমরা মূল সফরকেই রোযা না রাখার এবং নামায কছর করার সবাব সাব্যস্ত করেছি। আর ভ্রমণ একটি বৈধ কাজ। অতএব তা দ্বারা রুখসৃত সাব্যস্ত হওয়ায় কোনো ক্ষতি নেই।

قوله ولايملك الكافر مال المسلم الخ এটা ইমাম শাফেয়ী (র) এর চতুর্থ শাখা মাসআলা। মাসআলার বিবরণ : কোনো কাফের যদি মুসলমানের মাল আত্মসাৎ করে তাহলে সে তার মালিক হবে না।

দলিল : কাফেরের জন্যে মুসলমানের মাল আত্মসাৎ করে তাকে দারুল হরবে সংরক্ষিত করা নিষিদ্ধ ও হারাম কাজ। আর মালিক হওয়া হলো একটি বৈধ কাজ ও নেয়ামত। পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, হারাম ও অবৈধ কাজ দ্বারা বৈধ বিষয়ের মালিক হওয়া যায় না। আহনাফের মতে তার এ আত্মসাৎ করা মালিক হওয়ার জন্য সবাব হবে। অর্থাৎ সে উক্ত মালের মালিক হয়ে যাবে।

দলিল : মালের হেফাযত ও সংরক্ষণ মালিকানার মাধ্যমে কিংবা করায়ত্ত করার দ্বারা লাভ হয়। টীকা লেখকের ভাষ্য মতে দারুল ইসলাম হওয়ার কারণে অথবা করায়ত্তের কারণে মালিকানা লাভ হয়। কিন্তু কাফের যখন মুসলমানের মাল দারুল ইসলাম থেকে দারুল হরবে নিয়ে গেলো এর দ্বারা মুসলমানের করায়ত্ত দূরীভূত হয়ে গেলো এবং তার মালিকানাও চলে গেলো। হাশিয়া লেখকের ভাষ্য মতে মুসলমানের করায়ত্ত থাকলো না এবং দারুল ইসলামেও থাকলো না। অতএব এ মাল অরক্ষিত হয়ে গেলো। আর কাফেরের আত্মসাৎ এক অরক্ষিত মালের উপর ঘটলো। আর অরক্ষিত মালের উপর কাফের কর্তৃক আত্মসাৎ প্রাপ্তি হারাম ও নিষিদ্ধ নয়। বরং মুসলমানের সংরক্ষিত মালের উপর আত্মসাৎ নিষিদ্ধ ও হারাম। সারকথা এই যে, মুসলমানের মাল প্রাথমিকভাবে অর্থাৎ কাফেরের আত্মসাতের পূর্বে যদিও সংরক্ষিত ছিলো। কিন্তু পরে কাফেরের আত্মসাৎ এমন মালের উপর ঘটলো যা অরক্ষিত। আর এটা যেহেতু নিষিদ্ধ নয় বরং মুবাহ। এ কারণে সে উক্ত মালের মালিক হয়ে যাবে। এর সবাব নিষিদ্ধ মালের মালিক হওয়া নয় বরং অরক্ষিত মালের মালিক হওয়া।

ব্যাখ্যাকার বলেন– মুসলমানের মাল কাফের কর্তৃক আত্মসাৎ করার দ্বারা তার মালিক হওয়া اشارة النص দ্বারা প্রমাণিত। কারণ যে সকল মুহাজির মক্কা মুকাররমায় ধনী ছিলেন। তারা নিজেদের মাল মক্কায় রেখে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। ফলে মদীনায় তাদেরকে ফকির তথা অভাবী বলা হয়। এ কারণে মক্কার কাফেররা তাদের মাল আত্মসাৎ করতে সমর্থ হয় এবং এর দ্বারা তার মালিকও হয়ে যায়। সুতরাং কাফেররা যদি উক্ত মালের মালিক না হতো বরং মুসলমানগণই তার মালিক থেকে যেতো তাহলে শুধু হিজরতের দ্বারা তাদেরকে فقير বা অভাবী বলা হতো না। অতএব এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, মক্কার কাফেরগণ মুসলমানদের মালের মালিক হয়ে গিয়েছিলো।

ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ عَنْ بَيَانِ الْخَاصِ بِأَحْكَامِهِ وَاَقْسَامِهِ شَرَعَ فِىْ بَيَانِ الْعَامِّ فَقَالَ وَامَّا الْعَامُّ فَمَا يَتَنَاوَلُ اَفْرَادًا مُتَّفِقَةَ الْحُدُوْدِ عَلٰى سَبِيْلِ الشُّمُوْلِ فَكَلِمَةُ مَا عِبَارَةٌ عَنْ لَفْظٍ مَوْضُوعٍ لِاَنَّ الْعُمُوْمَ لَا يَجْرِىْ فِى الْمَعَانِىْ وَالْعَامُّ مِنْ اَقْسَامِ وُجُوْهِ النَّظْمِ وَضْعًا كَالْخَاصِّ وَبِقَوْلِهِ يَتَنَاوَلُ اَفْرَادًا خَرَجَ الْخَاصُّ اَمَّا خَاصُّ الْعَيْنِ فَظَاهِرٌ وَاَمَّا خَاصُّ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ فَلِاَنَّهُ يَتَنَاوَلُ مَفْهُوْمًا كُلِّيًّا اَوْ فَرْدًا وَاحِدًا يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ عَلٰى كَثِيْرِيْنَ وَلَيْسَ هُوَ بِمَوْضُوْعٍ لِلْاَفْرَادِ بِنَفْسِهِ وَكَذَا خَرَجَ اَسْمَاءُ الْعَدَدِ لِاَنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْاَجْزَاءَ دُوْنَ الْاَفْرَادِ - وَكَذَا يَخْرُجُ بِهِ الْمُشْتَرَكُ لِاَنَّهُ يَتَنَاوَلُ مَعَانِىَ لَا اَفْرَادًا ثُمَّ قَوْلُهُ مُتَّفِقَةُ الْحُدُوْدِ عَلٰى سَبِيْلِ الشُّمُوْلِ لِبَيَانِ تَحْقِيقِ مَاهِيَةِ الْعَامِّ لَا لِلْاِحْتِرَازِ وَقِيْلَ مُتَّفِقَةُ الْحُدُوْدِ اِحْتِرَازٌ عَنِ الْمُشْتَرَكِ لِاَنَّهُ يَتَنَاوَلُ اَفْرَادًا مُخْتَلِفَةَ الْحُدُوْدِ وَعَلٰى سَبِيْلِ الشُّمُوْلِ احْتِرَازٌ عَنِ النَّكِرَةِ الْمَنْفِيَّةِ فَاِنَّهَا تَتَنَاوَلُ الْاَفْرَادَ عَلٰى سَبِيْلِ الْبَدَلِيَّةِ دُوْنَ الشُّمُوْلِ وَاِنَّمَا اكْتَفَى الْمُصَنِّفُ رح بِالتَّنَاوُلِ دُوْنَ الْاِسْتِغْرَاقِ اِتِّبَاعًا لِفَخْرِ الْاِسْلَامِ فَاِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ عِنْدَهُ فِى الْعَامِ الْاِسْتِغْرَاقِ لِجَمِيعِ الْاَفْرَادِ - فَالْجَمْعُ الْمُعَرَّفُ وَالْمُنَكَّرُ كُلُّهُ عَامٌّ وَعِنْدَ صَاحِبِ التَّوْضِيحِ يُشْتَرَطُ فِى الْعَامِّ الْاِسْتِغْرَاقَ فَيَكُوْنُ الْجَمْعُ الْمُنَكَّرُ وَاسِطَةً بَيْنَ الْعَامِّ وَالْخَاصِ -

---

مبحث العام (عام-এর আলোচনা)

অনুবাদ॥ মুসান্নিফ (র) خاص এর সংজ্ঞা, প্রকারভেদ ও হুকুমসমূহের বর্ণনা শেষ করে عام এর বর্ণনা আরম্ভ করেছেন। তিনি বলেন, (সংজ্ঞা:) عام ***এমন শব্দকে বলে যা অন্তর্ভুক্তকরণের দিক দিয়ে এমন কতগুলো আফরাদ বা একককে শামিল করে, যাদের সংজ্ঞা এক ও অভিন্ন।*** এখানে "ما" দ্বারা অর্থবোধক শব্দসমূহ উদ্দেশ্য। কেননা, عام হওয়া অর্থের মধ্যে কার্যকরী হয় না। عام গঠনের দিক দিয়ে خاص-এর ন্যায়, যা নজম এর প্রকারভুক্ত। গ্রন্থকারের উক্তি يَتَنَاوَلُ اَفْرَادًا সমস্ত একককে অন্তর্ভুক্ত করে' একথা দ্বারা খাস বেরিয়ে গেলো, বের হওয়াটা স্পষ্ট। আর خاص الجنس (জাতিবাচক খাস) ও خاص النوع (শ্রেণীবাচক খাস)ও বের হয়েগেছে। কেননা, আ'ম এমন مفهوم كلى কে অথবা এমন কোন একককে অন্তর্ভুক্ত করে, যা অধিক সংখ্যকের ওপর প্রযোজ্য হয়। তা স্বয়ং একাধিক এককের জন্যে গঠিত হয়নি। এমনিভাবে اسماء اعداد ও বের হয়ে গেছে। কেননা, তা افراد কে নয় বরং اجزاء কে শামিল করে। এমনিভাবে এটা দ্বারা মুশতারিক বা একাধিক অর্থবোধক শব্দও বের হয়ে গিয়েছে। কেননা, মুশতারিক অনেকগুলো অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে, কোন একককে নয়। গ্রন্থকারের ভাষা مُتَّفِقَةَ الْحُدُوْدِ عَلٰى سَبِيْلِ الشُّمُوْلِ একে আ'মের প্রকৃত অবস্থার গুরুত্ব বুঝানোর জন্যে আনা হয়েছে। পার্থক্য বর্ণনার উদ্দেশ্যে নয়।

কেউ কেউ বলেন, গ্রন্থকারের উক্তি مُتَّفِقَةَ الْحُدُوْدِ দ্বারা مشترك হতে পৃথক করেছেন। কেননা, مشترك বিভিন্ন হাকীকতবিশিষ্ট বহু একককে শামিল করে এবং وَعَلٰى سَبِيْلِ الشُّمُوْلِ দ্বারা نكرة منفية

হতে আ'মকে পৃথক করা হয়েছে। কেননা, نكرة منفية বদল তথা বিনিময়ের ভিত্তিতে কতকগুলো একককে অন্তর্ভুক্ত করে। شمول তথা একত্রিকরণের ভিত্তিতে নয়। মুসান্নিফ (র) استغراق শব্দ না বলে শুধুমাত্র يَتَنَاوَلُ শব্দ ব্যবহারকে যথেষ্ট মনে করেছেন, ইমাম ফখরুল ইসলাম বযদবীর অনুকরণ করে। কেননা, তিনি আ'মের মধ্যে সমস্ত একক শামিল করাকে শর্ত মনে করেন না। সুতরাং, তার দৃষ্টিতে جمع منكر ও جمع معرف সমষ্টি সবই আ'মের অন্তর্ভুক্ত। আর তাওযীহ গ্রন্থকারের মতে, আমের জন্যে إِسْتِغْرَاقِ لِجَمِيْعِ الْأَفْرَادِ তথা সমস্ত একককে শামিল করা শর্ত। সুতরাং, তার মতে جمع منكر খাস ও আ'মের মাধ্যম বিবেচিত।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ قوله ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ الخ : ব্যাখ্যাকার বলেন- মুসান্নিফ (র) খাসের সংজ্ঞা তার বিধান ও প্রকারভেদের আলোচনা শেষ করে এখন عام এর বর্ণনা শুরু করেছেন।

তিনি বলেন- عام এমন শব্দকে বলে যা একই সংজ্ঞা বিশিষ্ট বিভিন্ন افراد বা একককে শামিল করে। লক্ষ্যণীয় যে, সংজ্ঞায় افرادِ متفقة الحدود দ্বারা তার হাকীকত ও ماهيت এর মধ্যে এক ধরনের হওয়া উদ্দেশ্য নয়। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো مفهوم كُلِّي ও معنىً كُلِّي অর্থাৎ শব্দের অর্থ প্রযোজ্য হওয়ার ক্ষেত্রে সব এক ধরনের হওয়া। মুসান্নিফ (র) বলেন- মতনে উল্লেখিত ما দ্বারা অর্থবোধক শব্দ উদ্দেশ্য। কারণ অর্থের ক্ষেত্রে ব্যাপকতা প্রযোজ্য হয় না। অর্থাৎ ব্যাপকতা (عموم) অর্থের সাথে حقيقيভাবে বিশেষিত হয় না এবং مجازى ভাবেও নয়। কাজেই অর্থ عام; হবে না বরং শব্দ আ'ম হবে। আর আ'ম যেহেতু অর্থ নয় বরং শব্দ হয়ে থাকে। অতএব সংজ্ঞার মধ্যে ما দ্বারা শব্দ উদ্দেশ্য, অর্থ নয়। কোনো কোনো ব্যক্তি বলেন রূপকার্থে معانى ও عموم এর সাথে বিশেষিত হয়। কেউ বলেন- হাকীকী অর্থেই বিশেষিত হয়। যেমন শব্দ প্রকৃত অর্থে ব্যাপকতার সাথে বিশেষিত হয়। অতএব উভয় উক্তি মতে ما দ্বারা শব্দ উদ্দেশ্য নয়। বরং معانى উদ্দেশ্য হবে। অর্থাৎ عام এমন শব্দ বা এমন বস্তু। কারণ شئ বা বস্তু শব্দ ও অর্থ উভয়কেই শামিল করে। اقسام وجود এর মধ্যে ইযাফতটা বয়ানের জন্য।

সারকথা যেভাবে خاص গঠনের দিক দিয়ে শব্দের একটি প্রকার তদ্রূপ عامও গঠনের দিক দিয়ে শব্দের একটি প্রকার। ব্যাখ্যাকার فوائد قيود বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন- মাতিন (র) এর উক্তি تناول الافراد দ্বারা খাছ বের হয়ে গেলো। আর এরই একটি হলো مثنى বা দ্বিবচন শব্দ। কারণ এটা দুটি একককে শামিল করে। একাধিক একককে শামিল করে না।

নূরুল আনওয়ার গ্রন্থকার বলেন- خاص العين বের হয়ে যাওয়াতো স্পষ্ট। কারণ خاص العين হলো একক বস্তু ও একক ব্যক্তির নাম। আর خاص النوع ও خاص الجنس এ কারণে বের হলো যে, জিনসের ক্ষেত্রে কোনো কোনো ব্যক্তির অভিমত হলো জিনস مفهوم كُلِّي তথা ব্যাপকতা বোধক অর্থ বোঝানোর জন্য গঠিত। আর কারো মতে فرد منتشر বা বিক্ষিপ্ত এককসমূহ বোঝানোর জন্য গঠিত। অর্থাৎ এমন এক ফরদের জন্য গঠিত যা বিভিন্ন ফরদের উপর প্রযোজ্য হয়। ও একটা একটা করে বিভিন্ন একক বোঝায়। আর مفهوم كُلِّي - نوع এর জন্যে গঠিত।

সারকথা خاص الجنس এবং مفهوم كل এর জন্য গঠিত। অথবা فردٍ مُنْتَشِر এর জন্য গঠিত। উভয় ক্ষেত্রেই আফরাদের জন্য গঠিত নয়। অতএব এ দুটো عام হবে না। কারণ عام এর জন্য আফরাদ শামিল হওয়া জরুরি। ব্যাখ্যাকার বলেন- يَتَنَاوَلُ أَفْرَادًا দ্বারা اسماى اعداد যেমন ৩, ৪ ইত্যাদি বের হয়ে গেলো। কারণ সংখ্যা তার اجزاء বা অংশসমূহকে শামিল করে, افراد বা এককসমূহ শামিল করে না।

اجزاء এবং افراد **এর মধ্যে পার্থক্য :** افراد হলো كل এর খণ্ড বিশেষ। আর كل ঐ সকল খণ্ড বা অংশ দ্বারা গঠিত হয় কিন্তু كل তার جزء বা অংশসমূহের উপর প্রযোজ্য হয় না। যেমন زَيْدٌ - يَدٌ زَيْدٍ বলা যায় না। আর আফরাদ كلى এর উপর প্রযোজ্য হয়। كلى সেগুলোর দ্বারা মুরাককাব হয় না এবং তা নিজ আফরাদের উপরে প্রযোজ্য হয়। যেমন زَيْدٌ انسانٌ - বলা যেতে পারে।

মোটকথা সংখ্যা যখন তার অংশসমূহকে শামিল করে; আফরাদ শামিল করে না। আর اجزاء ও افراد এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কাজেই সংখ্যা আ'ম হবে না। কারণ তার জন্যে আফরাদ শামিল হওয়া জরুরি।

ব্যাখ্যাকার বলেন– يتناول افرادا দ্বারা এ সংজ্ঞা থেকে মুশতারিক শব্দও বের হয়ে গেলো। কারণ তা বিভিন্ন অর্থকে শামিল করে, আফরাদকে শামিল করে না।

মোল্লা জুয়ুন (র) বলেন– يتناول افرادا দ্বারা যেহেতু খাছ, আসমায়ে আ'দদ এবং মুশতারিক সব বের হয়ে গেলো। কাজেই মুসান্নিফ (র) এর উক্তি وَالَّذِيْ يَدُلُّ عَلٰى كَوْنِ حَدِيْثِ الْعُرَنِيِّيْنَ আ'ম এর হাকীকতের তাহকীক বর্ণনার জন্য হবে। আ'মের সংজ্ঞা থেকে কাউকে খারিজ করার জন্য হবে না। তবে কেউ কেউ বলেন– متفقة الحدود দ্বারা আ'মের সংজ্ঞা থেকে মুশতারিককে খারিজ করা হয়েছে। কেননা মুশতারিক ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা বিশিষ্ট আফরাদকে শামিল করে। আর আ'মের জন্য একই সংজ্ঞা বিশিষ্ট আফরাদেক শামিল করা জরুরি। আর على سبيل الشُّمُوْل দ্বারা সংজ্ঞা থেকে نكرة منفية কে খারিজ করা হয়েছে। কারণ এটা সকল আফরাদকে শামিল করে না। বরং ভিন্ন ভিন্নভাবে বা ভিন্ন সময়ে পর্যায়ক্রমে শামিল করে। যেমন– مَارَاَيْتُ رَجُلًا এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, আমি সকল একক পুরুষকে দেখিনি। বরং অর্থ হলো আমি কোনো কোনো পুরুষকে দেখিনি। এই লোকটিকেও নয় এবং ঐ লোকটিকেও নয়। অর্থাৎ একেকটি করে সকল পুরুষের একক থেকে না দেখা সাব্যস্ত করা হয়েছে। অতএব আ'মের জন্য যেহেতু সকল আফরাদকে একই সময় শামিল হওয়া জরুরি। এ কারণে على سبيل الشمول দ্বারা আ'মের সংজ্ঞার জন্য এটা উপকারী হলো। এর দ্বারা نكرة منفية আ'মের সংজ্ঞা থেকে খারিজ হয়ে গেলো।

কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, সামনে মুসান্নিফ (র) উল্লেখ করেছেন যে, نكرة منفيه আ'ম। তাহলে এখানে نكرة منفية কে আ'মের সংজ্ঞা থেকে খারিজ করা হলো?

এর উত্তর এই যে, এখানে আ'মের হাকীকত বর্ণনার জন্য সংজ্ঞা উল্লেখ করা হয়েছে। আর نكرة منفية আ'ম হওয়াটা মাজায। অতএব কোনো প্রশ্ন আরোপিত হবে না।

মোল্লা জুয়ুন (র) বলেন– মাতিন (র) এর জন্য عام এর সংজ্ঞায় تتناول শব্দের উপর যথেষ্ট করা এবং সকলকে বেষ্টনকারী শব্দ উল্লেখ না করা উচিত ছিলো। আল্লামা ফখরুল ইসলাম (র) এর অনুকরণের কারণে তিনি এমনটি করেছেন। (তার মতে আমের জন্য তার সকল আফরাদকে বেষ্টন করে নেয়া শর্ত নয়। বরং শামিল হওয়াই যথেষ্ট, চাই استغراق পাওয়া যাক বা না যাক। সুতরাং ফখরুল ইসলাম (র) এর মতে جمع معرف ও جمع منكر উভয়টি আ'ম হবে। কেননা উভয়টি আফরাদকে শামিল করে। তাওযীহ্ গ্রন্থকারের মতে আ'মের সংজ্ঞার মধ্যে যেহেতু আ'ম তার অর্থের সকল একককে বেষ্টন করে নেয়া শর্ত। এ কারণেই তা جمع معرف এর উপর প্রযোজ্য হবে। কারণ এর মধ্যে ইস্তেগরাক পাওয়া যায়। এভাবে যে جمع معرف এক থেকে উপরে সকল আফরাদের উপর প্রয়োগ করা হয়। কারণ ৩ ও ৩ এর উপরের সকল আফরাদের উপর এটা প্রযোজ্য হয়। কেবল ১ ও ২ এর উপর প্রযোজ্য হয় না। তবে বহুবচনের উপর লাম প্রবিষ্ট হলে তখন তার বহুবচন বাতিল হয়ে এক থেকে শেষ পর্যন্ত সকল আফরাদের উপর প্রযোজ্য হয়। অতএব এর মধ্যে ইসতেগরাক পাওয়া গেলো। এর ফলে তাওযীহ গ্রন্থকারের মতেও جمع معرف আ'মের সংজ্ঞার মধ্যে দাখিল থাকবে। বাকী منكر আ'মের সংজ্ঞায় দাখিল হবে না। কারণ তা আফরাদকে শামিল করে কিন্তু সকল আফরাদকে বেষ্টন করা বোঝায় না। তা এভাবে যে, جمع منكر দ্বারা ৩ এবং ৩ এর অধিক সংখ্যক বোঝায়। কিন্তু ১ এবং ২ বোঝায় না। সুতরাং সকল একককে বেষ্টনকারী হলো না। অতএব তাওযীহ গ্রন্থকারের মতে এটা আ'ম হবে না। এবং খাছও নয়। কারণ খাছ এক একককে শামিল করে। একাধিক একককে শামিল করে না। আর جمع منكر আফরাদকে শামিল করে। মোটকথা তাওযীহ গ্রন্থকারের মতে جمع منكر খাছও নয় আমও নয়। বরং উভয়ের মধ্যে মাধ্যমের ভূমিকা রাখে।

وَاَنَّهُ يُوْجِبُ الْحُكْمَ فِيْمَا يَتَنَاوَلُه قَطْعًا بيانٌ لِحُكْمِه بَعْدَ بَيَانِ مَعْنَاهُ فَقَوْلُه يُوْجِبُ الْحُكْمَ رَدٌّ عَلٰى مَنْ قَالَ اِنَّهُ مُجْمَلٌ لِاخْتِلَافِ اَعْدَادِ الْجَمْعِ فَلاَ يَكُوْنُ مُوْجِبًا اَصْلًا بَلْ يَجِبُ التَّوَقُّفُ حَتّٰى يَقُوْمَ الدَّلِيْلُ عَلٰى مُعَيَّنٍ - وَقَوْلُه فِيْمَا يَتَنَاوَلُهُ رَدٌّ عَلٰى مَنْ قَالَ لاَ يُوْجِبُ الْفَرْدُ اِلاَّ الْوَاحِدَ وَلاَ الْجَمْعُ اِلاَّ الثَّلٰثَ وَالْبَاقِىْ مَوْقُوْفٌ عَلٰى قِيَامِ الدَّلِيْلِ - وَقَوْلُه قَطْعًا رَدٌّ عَلٰى الشَّافِعِيِّ رح حَيْثُ ذَهَبَ اِلٰى اَنَّ الْعَامَّ ظَنِّيٌّ لِاَنَّهُ مَا مِنْ عَامٍّ اِلاَّ وَقَدْ خُصَّ مِنْهُ الْبَعْضُ فَيَحْتَمِلُ اَنْ يَكُوْنَ مَخْصُوْصًا مِنْهَا الْبَعْضُ وَاِنْ لَمْ نَقِفْ عَلَيْهِ فَيُوْجِبُ الْعَمَلَ لاَ الْعِلْمَ كَخَبَرِ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسِ وَنَقُوْلُ هٰذَا اِحْتِمَالٌ نَاشٍ بِلاَ دَلِيْلٍ وَهُوَ لاَ يُعْتَبَرُ وَاِذَا خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ كَانَ اِحْتِمَالاً نَاشِيًا عَنْ دَلِيْلٍ فَيَكُوْنُ مُعْتَبَرًا فَعِنْدَنَا الْعَامُّ قَطْعِيٌّ فَيَكُوْنُ مُسَاوِيًا لِلْخَاصِ

অনুবাদ ॥ عام এর হুকুম : عام ***তার অধীনে অন্তর্ভুক্ত সকল এককসমূহের মধ্যে হুকুমকে অকাট্যভাবে ওয়াজিব করে।*** আ'মের অর্থ বর্ণনা করার পর এখানে আ'মের হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। গ্রন্থকারের উক্তি يُوْجِبُ الْحُكْمَ দ্বারা তাদের মতকে খণ্ডন করা হয়েছে যারা বলে عام হল এক ধরনের مجمل – জمع এর সংখ্যা বিভিন্ন হওয়ার কারণে। সুতরাং মৌলিকভাবে عام কোন হুকুম আবশ্যককারী হতে পারে না, বরং সুস্পষ্ট বা নির্দিষ্ট দলিল- প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তাওয়াক্কুফ তথা অপেক্ষমান থাকা ওয়াজিব।

গ্রন্থকারের উক্তি فِيْمَا يَتَنَاوَلُه দ্বারা তাদের কথাকে খণ্ডন করা হয়েছে, যারা বলেন, مفرد শুধুমাত্র একককে, আর جمع শুধুমাত্র তিনকে আবশ্যক করে। আর অবশিষ্টগুলো দলিল পাওয়ার ওপর মওকুফ থাকবে। গ্রন্থকারের উক্তি قطعا দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতকে খণ্ডনকরা উদ্দেশ্য। তাঁর মতে, আ'ম হলো ظنى তথা সন্দেহযুক্ত। কেননা, প্রত্যেক عام হতে কিছু না কিছু খাস করা হয়ে থাকে। সুতরাং তার থেকে কিছু খাস তথা নির্দিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান। যদিও তা জানা না যায়, তাই عام শুধুমাত্র আমলকে আবশ্যক করবে। ইলমে একীনকে আবশ্যক করবে না। যেমন- খবরে ওয়াহেদ ও কিয়াস। আমরা বলি যে, এটা প্রমাণবিহীন একটা সম্ভাবনা মাত্র। তাই তা গ্রহণীয় নয়। আর যদি তা عام হতে কোন কিছু খাস তথা নির্দিষ্ট হয়, তাহলে এ সম্ভাবনা প্রমাণের ভিত্তিতে সাব্যস্ত হবে এবং তা গ্রহণীয় হবে। আমাদের (আহনাফের) নিকট عام হলো- قطعى তথা অকাট্য। সুতরাং তা খাসের সমকক্ষ।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله وَاَنَّهُ يُوْجِبُ الْحُكْمَ الخ : আ'মের সংজ্ঞা বর্ণনার পরে এই ইবারতে عام এর বিধান উল্লেখ করেছেন।

عام এর বিধান : عام শব্দ যে সকল আফরাদকে শামিল করে তার মধ্যে নিশ্চয়তা ও অকাট্যতা সাব্যস্ত করে। অর্থাৎ আ'মও খাছ এর ন্যায় একীনের ফায়দা দেয়। তার দ্বারা সাব্যস্ত বিষয়ের উপর একীনও প্রগাঢ় বিশ্বাস রাখা জরুরি এবং তদানুযায়ী আমল করা অপরিহার্য।

ব্যাখ্যাকার বলেন- মুসান্নিফ (র) يُوْجِبُ الْحُكْمَ দ্বারা ঐ সকল আলিমের উক্তি খণ্ডন করেছেন যারা বলেন যে, আ'ম মুজমাল। কারণ বহুবচনের সংখ্যা বিভিন্নরূপ হতে পারে। جمع قِلَّتْ এর ক্ষেত্রে ৩ থেকে ১০ পর্যন্ত

প্রত্যেকটি সংখ্যা উদ্দেশ্য হতে পারে। আর كثرت এর ক্ষেত্রে ৩ থেকে সীমাহীন সংখ্যা উদ্দেশ্য হতে পারে। আর কোনো সংখ্যার যেহেতু অপর সংখ্যার উপর প্রাধান্য নেই। এ কারণেই তা মুজমাল হবে। বিশেষ কোনো সংখ্যার موجب তথা জরুরি সাব্যস্তকারী হবে না। অর্থাৎ যতোক্ষণ পর্যন্ত নির্দিষ্ট সংখ্যা বোঝানোর জন্য কোনো দলিল না থাকবে ততোক্ষণ পর্যন্ত বিরত থাকা অপরিহার্য। তার উপর আস্থা রাখা জরুরি নয় এবং আমলও জরুরি নয়। এটা কতিপয় আশ'আরী এর অভিমত।

সমরকন্দের কোনো কোনো মনীষীর অভিমত এই যে, বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিরত থাকা জরুরি। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার যাই উদ্দেশ্য আ'ম হোক বা খাছ। অস্পষ্টভাবে তার উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। তবে আমল করা জরুরি।

আমাদের পক্ষ থেকে এর উত্তর এই যে, যখন প্রাধান্য দেয়ার মতো কোনো কারণ না থাকবে ততোক্ষণ উক্ত বহুবচন শব্দকে كل এর উপর প্রয়োগ করা হবে। এক্ষেত্রে একটিকে অপরটির উপর দলিলবিহীন প্রাধান্য দেয়া সাব্যস্ত হবে না এবং ইজমালও থাকবে না।

ব্যাখ্যাকার বলেন- মুসান্নিফ (র) এর ভাষা فيما يتناوله দ্বারা ঐ সকল মনীষীদের উক্তি প্রত্যাখ্যান করা উদ্দেশ্য যারা বলেন- আ'ম যদি একবচনের সীগা হয় তাহলে তা একটি একক প্রমাণিত করবে। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে একটি একক উদ্দেশ্য হবে। আর যদি বহুবচন শব্দ হয় তাহলে ৩টি একক বোঝাবে। এ ২টি ছাড়া সকল আ'ম শব্দ দলিল কায়েম হওয়ার উপর মওকূফ থাকবে। অর্থাৎ যে ব্যাপারে দলিল পাওয়া যাবে সেটাই উদ্দেশ্য হবে।

তাদের দলিল এই যে, কোনো শব্দকে অর্থ শূন্য করা বৈধ নয়। কারণ এটা সম্পূর্ণ অনর্থক। এখন আ'ম যদি একবচন শব্দ হয়। তাহলে তার দ্বারা সর্বনিম্ন সংখ্যা ১ উদ্দেশ্য হবে। আর আ'ম বহুবচন শব্দ হলে তার দ্বারা সর্বনিম্ন ৩ সংখ্যক উদ্দেশ্য হলে তা সুনিশ্চিত হবে। সর্বনিম্নের উপর তথা একবচনের ক্ষেত্রে একাধিক এবং বহুবচনের ক্ষেত্রে তিনের অধিক উদ্দেশ্য হলে তা নিশ্চিত বা قطعى হবে না বরং ظنى (সন্দেহজনক) হবে। কাজেই যা সন্দেহহীন তা উদ্দেশ্য হওয়াই উত্তম।

আমাদের পক্ষ থেকে উত্তর এই যে, এ ব্যাপারে যা বলা হলো তা অভিধানকে কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত করার নামান্তর। অথচ অভিধানকে কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত করা গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব এ উক্তিও গ্রহণযোগ্য নয়।

ব্যাখ্যাকার বলেন- মুসান্নিফ (র) এর উক্তি قطعا দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র) এর উক্তিকে খণ্ডন করা উদ্দেশ্য। কারণ তার মতে আ'ম হলো ظنى তথা সন্দেহজনক।

দলিল : এমন কোনো عام শব্দ নেই যা থেকে কিছু সংখ্যক একককে খাছ করা হয়নি। তবে যদি কোনো عام এর ব্যাপারে দলিল দ্বারা এটা প্রমাণিত থাকে যে, তা খাছ হওয়ার সম্ভাবনা রাখে না। যেমন- إن الله بكل شيء عليم এর কোনো فرد বা একক খাছ করা হয়নি।

মোটকথা এ প্রকারের عام ছাড়া এমন কোনো عام নেই যার থেকে কিছু সংখ্যক একককে খাছ করা না হয়েছে। আর প্রত্যেক عام مخصوص منه البعض এর সম্ভাবনা রাখে। যদিও আমরা সে ব্যাপারে অবগত নই। কাজেই এ ধরনের সম্ভাবনা থাকতে আ'ম একীনের ফায়দা দিবে না। বরং সন্দেহের ফায়দা দিবে। আর জন্নী দলিল আমলকে ওয়াজিব করে। তবে তার উপর অটল বিশ্বাস ও একীন ওয়াজিব নয়। যেমন খবরে ওয়াহিদ এবং কিয়াস সন্দেহের ফায়দা দেয়। তথাপি তার উপর আমল করা ওয়াজিব। এভাবে আ'মের ক্ষেত্রেও বুঝতে হবে।

উত্তর : হানাফীদের পক্ষ থেকে এর উত্তর এই যে, ইমাম শাফেয়ী (র) এর সৃজিত এ সম্ভাবনাটি দলিলবিহীন উক্তি। আর যা দলিল বিহীন হয় তা গ্রহণযোগ্য নয়। কাজেই এ সম্ভাবনাও ধর্তব্য হবে না। এর বিশ্লেষণ এই যে, আ'ম শব্দ গঠনগতভাবে ব্যাপকতা বোঝায়। এর প্রমাণ এই যে, সাহাবায়ে কেরাম বহুক্ষেত্রে আ'ম শব্দ দ্বারা ব্যাপকতার উপর দলিল পেশ করতেন। তারা কোনো করীনার মুখাপেক্ষী হতেন না। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, আ'ম শব্দ কোনো করীনা ছাড়াই ব্যাপকতা বোঝায়। আর করীনা বিহীন শব্দ দ্বারা কোনো অর্থ বোঝালে তা قطعى হয়। অতএব আ'ম শব্দ দ্বারা ব্যাপকতা বোঝানো قطعى বা অকাট্য হবে সন্দেহজনক নয়। (অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

حَتّٰى يَجُوْزَ نَسْخُ الْخَاصِ بِهٖ اى بِالْعَامِ لِاَنَّهٗ يُشْتَرَطُ فِى النَّاسِخِ اَنْ يَّكُوْنَ مُسَاوِيًا لِلْمَنْسُوْخِ اَوْ خَيْرًا مِنْهُ كَحَدِيْثِ الْعُرَنِيِّيْنَ نُسِخَ بِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِسْتَنْزِهُوْا عَنِ الْبَوْلِ وعُرَنِيُّوْنَ قَبِيْلَةٌ يُنْسَبُوْنَ اِلٰى عُرَيْنَةَ تَصْغِيْرُ عَرْنَةَ الَّتِىْ هِىَ وَادٍ بِعَرَفَاتِ وَحَدِيْثُهُمْ مَا رَوٰى اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رح اَنَّ قَوْمًا مِنْ عُرَيْنَةَ اَتَوا الْمَدِيْنَةَ فَلَمْ تُوَافِقْهُمْ فَاصْفَرَّتْ اَلْوَانُهُمْ وَانْتَفَخَتْ بُطُوْنُهُمْ فَاَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنْ يَخْرُجُوْا اِلٰى اِبِلِ الصَّدَقَةِ وَيَشْرَبُوْا مِنْ اَلْبَانِهَا وَاَبْوَالِهَا فَصَحُّوْا ثُمَّ ارْتَدُّوْا فَقَتَلُوا الرُّعَاةَ وَاسْتَاقُوا الْاِبِلَ فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اِثْرِهِمْ قَوْمًا فَاُخِذُوْا فَاَمَرَ بِقَطْعِ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلِهِمْ وَسَمْلِ اَعْيُنِهِمْ وَتَرْكِهِمْ فِىْ شِدَّةِ الْحَرِّ حَتّٰى مَاتُوْا - فَهٰذَا حَدِيْثٌ خَاصٌّ بِبَوْلِ الْاِبِلِ بَلْ عَلٰى طَهَارَتِهٖ وَحِلِّهٖ وَبِهٖ تَمَسَّكَ مُحَمَّدٌ رح فِىْ اَنَّ بَوْلَ مَا يُوْكَلُ لَحْمُهٗ طَاهِرٌ وَيَحِلُّ شُرْبُهٗ لِلتَّدَاوِىْ وَغَيْرِهٖ -وَعِنْدَهُمَا هُوَ مَنْسُوْخٌ بِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِسْتَنْزِهُوْا مِنَ الْبَوْلِ وَهُوَ عَامٌّ لِمَاكُوْلِ اللَّحْمِ وَغَيْرِهٖ فَقَدْ نُسِخَ الْخَاصُّ بِهٰذَا الْعَامِّ كَبَوْلِ مَا يُوْكَلُ لَحْمُهٗ وَغَيْرُهٗ كُلُّهٗ نَجِسٌ حَرَامٌ لَا يَحِلُّ شُرْبُهٗ وَاسْتِعْمَالُهٗ لِلتَّدَاوِىْ وَغَيْرِهٖ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح - وَيَحِلُّ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ رح فِى التَّدَاوِىْ لِلضَّرُوْرَةِ عَلٰى مَا عُرِفَ

অনুবাদ॥ *এমনকি আ'ম দ্বারা খাসকে রহিত করাও বৈধ।* কেননা, নসখের জন্যে নাসিখ মানসূখের সমকক্ষ বা তার থেকে উত্তম হওয়া শর্ত।

যেমন, عرينة এর (খাস) হাদীসটি মানসূখ হয়ে গেছে, রাসূল (স)-এর استنزهوا عن البول الخ (তোমরা পেশাব থেকে বেঁচে থাক। কেননা কবরের অধিকাংশ শাস্তি তার কারণেই হয়ে থাকে) দ্বারা। عرنيون হলো একটি গোত্রের নাম, তাদের عرنة এর প্রতি نسبة করা হয়, (عرينة শব্দটি) عرنة শব্দের تصغير যা আরাফাতের নিকটবর্তী একটি এলাকার নাম। তাদের হাদীস হলো যা হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেছেন। যে, উরায়না গোত্রের একটি দল মদীনায় আসল। কিন্তু (মদিনার আবহাওয়া) তাদের উপযোগী হয়নি। ফলে তাদের বর্ণ হরিদ্রা হয়ে গেল এবং তাদের পেট ফুলে গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) তাদের সাদকার উটের নিকট যাওয়ার এবং উটের দুধ ও প্রস্রাব পান করতে নির্দেশ দিলেন। তারা সুস্থ হয়ে মুরতাদ হয়ে গেল। এমনকি উটের রাখালকে হত্যা করে উটগুলো নিয়ে পলায়ন

(পূর্বের বাকী অংশ) বাকী এমন সম্ভাবনা সৃষ্টি করা যা শব্দের মূল অর্থ তথা ব্যাপকতা থেকে আ'মকে অন্যদিকে ধাবিত করা বোঝায়। তা দলিল বিহীন উক্তি মাত্র। এর কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। কেননা দলিল বিহীন প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে সম্ভাবনা সৃষ্টি করা যায়। যেমন আমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে এমন একটি অবাস্তব সম্ভাবনা ধরে নিলাম যে, হতে পারে আমরা অন্য কিছু দেখছি। তবে আ'ম এর উদ্দেশ্য থেকে যদি কোনো একককে সুনিশ্চিতরূপে খাছ করা হয় তাহলে এ সম্ভাবনাটি দলিল ভিত্তিক হবে। তখন তা গ্রহণযোগ্য হবে। অর্থাৎ عام مخصوص منه البعض জন্নী হবে।

সারকথা এই যে, সাধারণভাবে আ'ম শব্দ আমাদের মতে অকাট্য ও একীনের ফায়দা দেয়। অতএব তা খাছ এর পর্যায়ে গণ্য হবে।

করল। রাসূলুল্লাহ (স) তাদের পেছনে একটি দল পাঠালেন। তারা তাদের ধরে ফেলল। রাসূলুল্লাহ (স) তাদের হাত-পা কর্তন করতে ও তাদের চক্ষু উৎপাটন করতে এবং তিব্র গরমে ছেড়ে দিতে নির্দেশ দিলেন, এক পর্যায়ে তারা মৃত্যুবরণ করল"।

এটা উটের পেশাবের ব্যাপারে একটা খাস হাদীস, যা পেশাবকে পবিত্র ও হালাল প্রমাণ করে। এর ওপর ভিত্তি করে ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, যে সমস্ত প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল সেসবের পেশাব পাক এবং চিকিৎসা ও অন্যান্য প্রয়োজনে তা পান করা বৈধ।

আর শায়খাইন তথা ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, উল্লেখিত হাদীসটি মানসূখ হয়েছে রাসূল (স)-এর বাণী- "اِسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ" 'তোমরা পেশাব থেকে বেঁচে থাক; দ্বারা। এটি একটি عام হাদীস, যা ماكول اللحم ও غير ماكول اللحم উভয়কে শামিল করে। সুতরাং এ আ'ম দ্বারা খাস রহিত হয়ে গেছে। তাই যার গোশত খাওয়া হয় ও যার গোশত খাওয়া হয় না সবই নাপাক এবং হারাম। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তা পান করা ও চিকিৎসা বা অন্য কোন প্রয়োজনে ব্যবহার করা বৈধ নয়। আর ইমাম আবু ইউসূফ (র)-এর মতে চিকিৎসার জন্যে প্রয়োজনে পান করা জায়েয যেমন বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله مَتٰى يَجُوْزُ نَسْخُ الْخَاصِ الخ : মুসান্নিফ (র) বলেন আমাদের আহনাফের মতে আ'ম এবং খাছ অকাট্য ও একীনের ফায়দা দেয়ার ব্যাপারে সমপর্যায়ের। এর দলিল এই যে, খাছকে আ'ম দ্বারা মানসূখ করা জায়েয। অথচ নাসিখের জন্য মানসূখের সমপর্যায়ের হওয়া কিংবা তার চাইতে অধিক শক্তি সম্পন্ন হওয়া শর্ত। সুতরাং বোঝা গেলো যে, আ'ম ন্যূনতম পক্ষে খাছ এর সমপর্যায়ের। আর খাছ সবার মতে قطعى তথা অকাট্য সুতরাং আমও قطعى অকাট্য হবে। **উদাহরণ :** উরাইনা সংক্রান্ত হাদীসটি খাছ তা اِسْتَنْزِهُوْا عَنِ الْبَوْلِ আ'ম হাদীস দ্বারা মানসূখ হয়েছে। এর বিশ্লেষণ এই যে, আরাফার একটি অঞ্চলের নাম হলো উরনা। এর তাসগীর হলো উরাইনা। উরাইনা দ্বারা একটি গোত্র বোঝায়।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) এর বর্ণনা মতে ঘটনার বিবরণ এই যে– উরাইনার কিছু ব্যক্তি মদীনায় আগমন করে। মদীনার আবহাওয়া তাদের উপযোগী না হওয়ার ফলে তাদের রং ফ্যাকাশে হয়ে গেলো এবং পেট ফুলে গেলো। রাসূলুল্লাহ (স) এ ব্যাপারে জানতে পেরে তাদেরকে সাদকার উটের দুধ ও পেশাব পান করার নির্দেশ দিলেন। তা পান করার ফলে তারা সুস্থ হয়ে গেলো। কিন্তু এরপরে তারা মুরতাদ হয়ে রাখালদেরকে হত্যা করে সাদকার উট নিয়ে পালিয়ে যেতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ (স) তাদের এ অন্যায় আচরণের কারণে কিছু সাহাবীকে তাদের ধরার জন্য প্রেরণ করেন। তারা তাদেরকে ধরে রাসূলুল্লাহ (স) এর দরবারে হাজির করলেন। রাসূল (স) তাদের হাত এবং পাত কর্তন করার এবং তাদের চোখ উৎপাটন করে প্রখর গরমে ফেলে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। সুতরাং এমনই করা হলো ফলে তারা মারা গেলো।

উরাইনার এ লোকেরা যেহেতু ডাকাত ও ছিনতাইকারী ছিলো। এ কারণে তাদের ১ হাতও ১ পা কেটে হত্যা করা হলো। কারণ এটাই ডাকাত ও ছিনতাইকারীর শাস্তি। অপর এক হাদীসের বর্ণনা মোতাবেক তারা যেহেতু রাসূলুল্লাহ (স) এর রাখালদেরকে মুসলা তথা নাক-কান ইত্যাদি কেটে ছিলো। এর কারণে সমান শাস্তিস্বরূপ তাদের সাথে এরূপ আচরণ করা হয়েছিলো।

সারকথা এই যে, হাদীসটি উটের পেশাব পান করার ব্যাপারে এবং তা পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ বহন করে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) এই হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করে বলেন– যে সকল পশুর গোশত খাওয়া হয় তাদের পেশাব পবিত্র এবং চিকিৎসা ইত্যাদির উদ্দেশ্যে তা পান করা হালাল। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসূফ (র) এর মতে এই হাদীসটি মানসূখ। এর নাসিখ হলো اِسْتَنْزِهُوا عَنِ الْبَوْلِ হাদীস।

وَقِصَّةُ هٰذَا الْحَدِيْثِ النَّاسِخِ مَا رُوِىَ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ لَمَّا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ صَحَابِىِّ صَالِحٍ اُبْتُلِىَ بِعَذَابِ الْقَبْرِ جَاءَ اِلَى اِمْرَأَتِهِ فَسَأَلَهَا عَنْ اَعْمَالِهِ فَقَالَتْ كَانَ يَرْعَى الْغَنَمَ وَلَا يَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلِهِ فَحِيْنَئِذٍ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِسْتَنْزِهُوْا مِنَ الْبَوْلِ فَاِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ فَهُوَ بِحَسْبِ شَانِ النُّزُوْلِ اَيْضًا خَاصٌّ بِبَوْلِ مَا يُوْكَلُ لَحْمُهُ كَمَا كَانَ الْمَنْسُوْخُ خَاصًّا بِهِ لٰكِنَّ الْعِبْرَةَ لِعُمُوْمِ اللَّفْظِ وَالَّذِىْ يَدُلُّ عَلٰى كَوْنِ حَدِيْثِ الْعُرَنِيِّيْنَ مَنْسُوْخًا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنَّ الْمُثْلَةَ الَّتِىْ تَضَمَّنَهَا حَدِيْثُ الْعُرَنِيِّيْنَ مَنْسُوْخٌ بِالْاِتِّفَاقِ لِاَنَّهَا كَانَتْ فِىْ اِبْتِدَاءِ الْاِسْلَامِ -

অনুবাদ॥ এ নাসেখ হাদীসটির বিবরণ যা নবী করিম (স) হতে বর্ণিত, তা এই যে, রাসূল (স) একদা একজন নেককার সাহাবীর দাফন শেষ করার পর দেখলেন কবরে তার আযাব হচ্ছে. তিনি তাঁর স্ত্রীর নিকট এসে তার আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। মহিলা বললেন, তিনি বকরী চরাতেন, কিন্তু বকরীর পেশাব হতে পবিত্র থাকতেন না। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন 'তোমরা পেশাব হতে পবিত্রতা অবলম্বন করে থাক। কেননা, কবরের অধিকাংশ শাস্তি পেশাবের কারণে হয়। এ হাদীসটিও শানে নুযূল হিসেবে যে সব প্রাণীর গোশত খাওয়া যায় সে ব্যাপারে খাস, যেমনভাবে منسوخ হাদীসটি খাস। কিন্তু শব্দের ব্যাপকতাই ধর্তব্য হয়। (খাস سبب ধর্তব্য হয় না।)

উরায়না সংক্রান্ত হাদীসটি এ হাদীস তথা اِسْتَنْزِهُوْا مِنَ الْبَوْلِ দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। তার দলিল এই যে, مثلة তথা কান, নাকা, চোখ ইত্যাদি উৎপাটন করে আকৃতি বিকৃত করা সংশ্লিষ্ট উরায়না গোত্র সম্পর্কীয় হাদীসটি সর্বসম্মতিক্রমে রহিত হয়ে গেছে। কেননা, ইসলামের প্রথম যুগে مثلة এর বিধান ছিল।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ হাদীসের পটভূমি : একবার রাসূলুল্লাহ (স) জনৈক নেককার সাহাবীকে দাফন করলেন। হঠাৎ দেখা গেলো তাকে কবরের মধ্যে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। রাসলুল্লাহ (স) তার স্ত্রীর নিকট গমন করে তার দিন রাতের আমল সমূহের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। স্ত্রী বললো– আমার স্বামী ছাগল চরাতেন। তবে ছাগলের পেশাব থেকে সতর্কতা অবলম্বন করতেন না। রাসলুল্লাহ (স) এ কথা শুনে বললেন– হে লোক সকল তোমরা পেশাব থেকে সতর্ক থাকো। কারণ স্বাভাবিকভাবে পেশাবের থেকে সতর্ক না থাকার দরুন কবরে আযাব দেয়া হয়ে থাকে।

এই হাদীসটি তার প্রেক্ষাপটের দিক দিয়ে যদিও হালাল গোশত সম্পন্ন প্রাণী তথা ছাগলের পেশাবের সাথে খাছ। যেমন– পূর্বের হাদীসটি উটের পেশাবের ব্যাপারে খাছ। কিন্তু শব্দের দিক দিয়ে আ'ম। আর শব্দের ব্যাপকতাই ধর্তব্য হয়ে থাকে। বিশেষ কারণ ধর্তব্য হয় না। সুতরাং اِسْتَنْزِهُوا عَنِ الْبَوْل হাদীসটি যদিও سبب نزول এর দিক দিয়ে খাছ কিন্তু শব্দের দিক দিয়ে আ'ম। কারণ রাসলুল্লাহ (স) মুতলাকভাবে পেশাব থেকে সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। চাই হালাল পশুর পেশাব হোক বা হারাম পশুর পেশাব হোক।

মোটকথা এ হাদীসটি আ'ম এবং নাসিখ। আর উরাইনার হাদীসটি খাছ এবং মানসূখ। সুতরাং আ'মের মাধ্যমে খাছ মানসুখ হওয়া সাব্যস্ত হলো। এ নাসিখ হাদীসের কারণে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে সব ধরনের পেশাবই

নাপাক। তা পান করা এবং চিকিৎসা স্বরূপ ব্যবহার করা নাজায়েয। لَا شِفَاءَ فِيْمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ হাদীসটিও এ ব্যাপারে সহায়ক ভূমিকা রাখে। সুতরাং পেশাব যখন হারাম এবং নাপাক। কাজেই এই হাদীস মোতাবেক এর মধ্যে কোনো শেফা বা রোগমুক্তি নেই। অতএব চিকিৎসা স্বরূপ তা পান করা বা ব্যবহার করা অনর্থকও নাজায়েয। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে চিকিৎসা ইত্যাদির উদ্দেশ্যে পেশাব পান করার অনুমতি রয়েছে। তিনি উপরোক্ত হাদীসের উত্তরে বলেন যে, হারাম বস্তুর মধ্যে শেফা নেই একথা অনিবার্য। তবে প্রয়োজনের তাগিদে যখন পেশাব পান করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কাজেই তা হারাম নয়।

নুরুল আনওয়ার গ্রন্থকার وَالَّذِىْ يَدُلُّ عَلٰى كَوْنِ حَدِيْثِ الْعُرَنِيِّيْنَ الخ ইবারত দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

প্রশ্ন : উরাইনা সংক্রান্ত হাদীসকে মানসূখ এবং اِسْتَنْزِهُوْا عَنِ الْبَوْلِ হাদীসকে নাসিখ সাব্যস্ত করা ঐ সময়ই গ্রহণযোগ্য হবে যখন উরাইনার হাদীসটি আগের এবং اِسْتَنْزِهُوْا الخ হাদীসটি পরের হওয়া প্রমাণিত হবে। অথচ কোনো হাদীসের ব্যাপারে আগে পরে হওয়া প্রমাণিত নেই।

উত্তর : উরাইনা সংক্রান্ত হাদীসটি মানসুখ হওয়া অপর এক দলিল দ্বারা প্রমাণিত। দলিল এই যে, উরাইনা সংক্রান্ত হাদীস মুসলা তথা নাক-কান কর্তন বিষয়ে শামিল রয়েছে। অথচ পরবর্তীতে এ হুকুম সর্বসম্মতিক্রমে মানসূখ হয়ে যায়। অতএব উরাইনা সংক্রান্ত হাদীসের এক অংশ যখন মানসূখ হলো। কাজেই অপর অংশ তথা হালাল পশুর পেশাব পাক ও হালাল হওয়াও নিশ্চিতরূপে মানসূখ। অন্যথায় একই হাদীসের অর্ধেক মানসূখ ও অর্ধেক মানসূখ নয় তা কিভাবে হতে পারে?

মোটকথা উরাইনা সংক্রান্ত হাদীস মানসূখ হওয়া প্রমাণিত হলো। অতএব اِسْتَنْزِهُوْا عَنِ الْبَوْلِ হাদীস অনিবার্যরূপে নাসিখ হবে।

কোনো কোনো আলিম এ উত্তরকে পছন্দ করেননি। তারা বলেন উরাইনা সংক্রান্ত হাদীস ২টি বিষয় সম্বলিত। ১. মুসলা করা, ২. উটের পেশাব পাক ও হালাল হওয়া। আর এক হুকুম মানসূখ হওয়ার দ্বারা অপর হুকুম মানসূখ হওয়া অপরিহার্য হয় না। সুতরাং মুসলা মানসূখ হওয়ার দ্বারা উটের পেশাব পাক ও হালাল হওয়া মানসূখ হবে না।

বরং উৎকৃষ্ট উত্তর এই যে, اِسْتَنْزِهُوْا عَنِ الْبَوْلِ হাদীস হলো محرم বা হারামকারী। আর উরাইনা সংক্রান্ত হাদীস হলো محلل যা বৈধকারী। আর উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব হলে محرم দলিল প্রাধান্য পায়। অতএব استنزهوا عن البول হাদীস নাসিখ ও উরাইনা সংক্রান্ত হাদীস মানসূখ হবে।

وَاذا اَوصٰى بِخَاتِمٍ لِاِنسَانٍ ثُمَّ بِالفَصِّ مِنهُ لِاٰخَرَ اَنَّ الحَلْقَةَ لِلاَوَّلِ وَالفَصَّ بَينَهُمَا تَاْيِيدٌ لِمُقَدِّمَةٍ مفهومةٍ مِمَّا قَبلُ وهِيَ اَنَّ العَامَّ مُسَاوٍ لِلخَاصِّ بِمَسْأَلَةٍ فِقْهِيَّةٍ وهِيَ اَنَّهٗ اذا اَوصٰى احدٌ بِخَاتَمِه لِاِنسَانٍ ثُمَّ اَوصٰى بِكَلامٍ مَفصُولٍ بَعدَه بِفَصِّ ذٰلِك الخَاتَمِ بِعَيْنِه لِاِنسَانٍ اٰخَرَ فتكُونُ الحَلْقَةُ لِلمُوْصٰى لهٗ الاَوَّلِ خاصَّةً والفَصُّ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الاَوَّلِ وَالثَّانِي علَى السَّواءِ - وذٰلك لِاَنَّ الخَاتَمَ عامٌّ اي كَالعامِّ -لِاَنَّ العَامَّ المُصْطَلَحَ هُو مايَشْمَلُ افرادًا والخَاتَمُ لا يَصْدُقُ اِلَّا علَى فَرْدٍ واحدٍ ولكنَّه كالعامِّ يَشْمَلُ الحَلقَةَ والفَصَّ كِلَيْهِما وَالفَصُّ خاصٌّ بِمَدْلُولِه فقطْ فَاِذا ذَكَرَ الخاصَّ بَعْدَ العامِّ بِكَلامٍ مَفْصُولٍ وَقَعَ التَّعارُضُ بَيْنَهُمَا فِي حَقِّ الفَصِّ فَيَكُونُ الفَصُّ لِلمُوْصٰى لهُمَا جميعًا تَسْوِيَةً لِلعامِّ مَعَ الخاصِّ بِخلافِ مَا اذا اَوصٰى بالفَصِّ بِكَلامٍ مَوْصُولٍ فَاِنَّه يكُونُ بَيانًا لِاَنَّ المُرادَ بِالخاتَمِ فِيمَا سَبَقَ الحَلْقَةُ فقطْ فتكُونُ الحلقةُ لِلاَوَّلِ والفصُّ لِلثَّانِي وعندَ اَبِي يوسفَ رح يكُونُ الفصُّ لِلثَّانِي اَلْبَتَّةَ سواءٌ اَتٰى بكلامٍ مَوْصُولٍ اوْ مَفْصُولٍ لِاَنَّ الوَصِيَّةَ اِنَّمَا تَلْزَمُ بَعْدَ مَماتِه لا فِي حياتِه فكانَ المَوصولُ والمَفصولُ سَواءٌ كَما فِي الوَصِيَّةِ بِالرَّقَبَةِ لِاِنْسانٍ وبِخِدْمَتِها لِاٰخَرَ قُلنا الوَصِيَّةُ بالرَّقَبةِ لا تَتَناوَلُ الخِدمةَ لِاَنَّهُما جِنْسانِ مُختَلِفانِ بِخلافِ الخاتَمِ فانَّه يتناوَلُ الفصَّ لا مُحالةَ فتكُونُ كالقياسِ مَعَ الفارِقِ

অনুবাদ॥ ***"যদি কেউ কোন ব্যক্তির জন্যে আংটির অসিয়ত করে এবং দ্বিতীয় জনের জন্যে আংটির নগ/চাঁদীর অসিয়ত করে, তাহলে প্রথম লোকটি আংটির বৃত্তের মালিক হবে, আর নগটি উভয়ের মাঝে বন্টন করা হবে"।*** এটা পূর্বোক্ত আলোচনা হতে যা বুঝে আসে তাকে শক্তিশালী করে। তা এই যে, একটি ফিকহী মাসআলায় আম-খাসের সমকক্ষ; আর তা হলো- যদি কেউ অন্য কারোর জন্য কোন আংটির অসিয়ত করে। অতঃপর যদি অন্য একটি স্বতন্ত্র কথা দ্বারা দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য আংটির নগ বা চাঁদীর অসিয়ত করে, তাহলে আংটির বৃত্ত হবে প্রথম موصى له (যার জন্য অসিয়ত করেছে) এর জন্য বিশেষভাবে, আর বৃত্ত প্রথম ও দ্বিতীয় উভয়েই সমানভাবে অংশীদার হবে। কারণ আংটি তথা الخاتم শব্দ হলো عام অর্থাৎ عام এর মত।

কেননা, পরিভাষায় عام এমন শব্দকে বলে যা অনেক একককে শামিল করে। আর الخاتم শব্দটি শুধু একটি এককের ওপর প্রযোজ্য হয়। কিন্তু তা আমের মত, বৃত্ত ও তার নগ উভয়কেই শামিল করে। আর فص শুধু নগের জন্য খাস। যখন স্বতন্ত্র কোন বাক্য দ্বারা খাসকে عام এর পরে উল্লেখ করা হয়, তখন فص তথা নগের অধিকারের ব্যাপারে উভয়ের মাঝে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। সুতরাং فص হবে উভয় অসিয়তকৃতের জন্যে, যাতে عام কে খাসের সমমর্যাদা দান করা হয়। তবে তা এ অবস্থার বিপরীত যখন অসিয়তকারী কোন সংযুক্ত বাক্য দ্বারা فص এর অসিয়ত করবে, তখন তা বয়ান হবে। কেননা, পূর্বোক্ত বাক্য الخاتم দ্বারা শুধুমাত্র বৃত্তকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং, তা হবে প্রথম জনের জন্যে, আর নগ হবে দ্বিতীয় জনের জন্য।

ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, নগটি দ্বিতীয় موصى له এর জন্যে হবে, চাই সংযুক্ত বা পৃথক যে বাক্যেই অসিয়ত করুক। কেননা, অসিয়ত বাস্তবায়ন হবে অসিয়তকারীর মৃত্যুর পর, তার জীবদ্দশায় নয়।

সুতরাং, সংযুক্ত ও পৃথক উভয় হুকুম সমান হবে। যেমন- কোন লোকের জন্যে গোলামের رقبة (মালিকানার) ও অন্য লোকের জন্যে গোলামের খেদমত এর অসিয়ত করলো। কেননা. উভয়টি স্বতন্ত্র বস্তু. আর আংটি এর বিপরীত। কেননা, তা (আংটি) নিঃসন্দেহে তাকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং তা (উল্লেখিত মাসয়ালাটিকে رقبه ও খেদমতের অসিয়তের ওপর কিয়াস করা) قياس مع الفارق হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ قوله وَإِذَا أَوْصَى بِخَاتِمٍ لِإِنْسَانٍ الخ : ব্যাখ্যাকার বলেন– পূর্বে যে ভূমিকা উল্লেখ করা হয়েছে যে, আ'ম খাছ এর সমপর্যায়ে হয়ে থাকে। এটাকে একটি ফিকহী মাসআলা দ্বারা মজবুত করা হয়েছে।

মাসআলা এই যে, এক ব্যক্তি অপরব্যক্তির জন্য তার আংটির অছিয়ত করলো। এর কিছুক্ষণ পরে সে উক্ত আংটির চাদি বা (নগ) অন্য ব্যক্তিকে দেয়ার অছিয়ত করলো। তাহলে আংটির বৃত্ত প্রথম অছিয়তকৃত ব্যক্তি পাবে। আর চাদি প্রথম অছিয়তকৃত ও দ্বিতীয় অছিয়তকৃত উভয়ের মাঝে সমানভাবে বণ্টিত হবে।

দলিল : خاتم তথা আংটি শব্দটি আ'ম -এর ন্যায়। কারণ পরিভাষায় আ'ম বলা হয় যা একাধিক একককে শামিল করে। আর خاتم শব্দ যেহেতু একটি একককে শামিল করে কাজেই পারিভাষিকভাবে এটা আ'ম নয়। বরং আ'মের মত। কারণ বৃত্ত ও চাদি উভয়ের সমন্বয়কে আংটি বলে। সুতরাং উভয়কে শামিল হওয়ার দিক দিয়ে فص শব্দটি আ'মের মত হলো। আর خاتم শব্দটি চাদি অর্থের সাথে খাছ। অন্য কোনো অর্থ বোঝায় না।

সারকথা এই যে, خاتم কথা আ'ম এর ন্যায়। আর فص শব্দ হলো খাছ। অছিয়তকারী আ'ম এর পরে অর্থাৎ خاتم শব্দের পরে ভিন্ন কথা দ্বারা খাছ উল্লেখ করেছেন। এ কারণে চাদির ব্যাপারে প্রথম অছিয়তকৃত এবং দ্বিতীয় অছিয়তকৃত উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়ে গেলো। অর্থাৎ প্রথম অছিয়তকৃত ব্যক্তির জন্য خاتم তথা আংটির অছিয়তের দাবি এই যে, বৃত্ত ও চাদি উভয়ই সে পাবে। আর দ্বিতীয় অছিয়তকৃত ব্যক্তির জন্য বিশেষভাবে চাদির অছিয়তের দাবি এই যে, সে চাদির অধিকারী হবে। অতএব আ'ম তথা প্রথম অছিয়তকে খাছ তথা দ্বিতীয় অছিয়তের সমপর্যায়ে করার জন্য বলা হয়েছে যে, চাদি উভয়ের মধ্যে অর্ধাঅর্ধি হারে বণ্টিত হবে। বৃত্ত কেবল প্রথম অছিয়তকৃত ব্যক্তি পাবে। কারণ তার ক্ষেত্রে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। হ্যা, যদি চাদির ব্যাপারে প্রথম অছিয়তকৃত ব্যক্তি ছাড়া মিলিত বাক্য দ্বারা অন্য কারো জন্য অছিয়ত করে। তখন প্রথম অছিয়তের জন্য দ্বিতীয় অছিয়ত তার বয়ান এবং খাছকারী হবে। এজন্য জরুরি হলো প্রথম কথার সাথে মিলিত হওয়া। আর এক্ষেত্রে মিলিত হয়েছে। এ কারণে অছিয়তকারীর দ্বিতীয় উক্তি অর্থাৎ চাদির অছিয়ত প্রথম উক্তি অর্থাৎ আংটির অছিয়তের জন্য مخصص হবে এবং বলা হবে যে, প্রথম অছিয়তে আংটি দ্বারা কেবল বৃত্ত উদ্দেশ্য। আর প্রথম অছিয়তে যেহেতু শুধু বৃত্ত উদ্দেশ্য। আর এ প্রথম অছিয়তকৃতের জন্য শুধু বৃত্ত সাব্যস্ত হবে। আর দ্বিতীয় অছিয়তকৃতের জন্য চাদি সাব্যস্ত হবে। কিন্তু উক্তি মিলিত না হওয়ার ক্ষেত্রে যেহেতু খাছ হওয়ার শর্ত (مقارنت) পাওয়া যায়নি। এ কারণে كلام مفصول এর ক্ষেত্রে প্রথম অছিয়তে বৃত্ত এবং চাদি উভয়টি উদ্দেশ্য হবে। আর দ্বিতীয় অছিয়তকৃতের জন্য চাদি অংশের ভিত্তিতে সাব্যস্ত হবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন– দ্বিতীয় অছিয়ত মিলিতভাবে হোক কিংবা বিলম্বে হোক উভয় ক্ষেত্রে বৃত্ত প্রথম অছিয়তকৃত ব্যক্তি পাবে। আর নগ বা চাদি দ্বিতীয় অছিয়তকৃত ব্যক্তি পাবে।

দলিল : অছিয়ত কার্যকর হয় অছিয়তকারীর মৃত্যুর পরে। অতএব সঙ্গে সঙ্গে হোক বা বিলম্বে হোক উভয় কথা একই পর্যায়ের। যেমন কোনো ব্যক্তি তার গোলামের ব্যাপারে অন্য একজনের জন্য অছিয়ত করলো। আর অপর এক ব্যক্তির জন্য তার সেবার অছিয়ত করলো। তাহলে প্রথম অছিয়তকৃত ব্যক্তি গোলামের رقبه তথা সত্তার মালিক হবে। আর দ্বিতীয় অছিয়তকৃত ব্যক্তি তার দ্বারা সেবাগ্রহণের মালিক হবে। দ্বিতীয় অছিয়ত পূর্বের অছিয়তের সাথে মিলিত হোক কিংবা পরে।

উত্তর : আমাদের পক্ষ থেকে এর উত্তর এই যে, গোলামের সত্তা এবং সেবা যেহেতু ভিন্ন দুই জিনস। এ কারণে সত্তার অছিয়ত খেদমতের অছিয়তকে শামিল হবে না। অতএব খেদমতের বিষয়ে উভয়ের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব হবে না। বরং যার জন্য যা অছিয়ত করবে সে তারই মালিক হবে কিন্তু আংটির ব্যাপারটি এরূপ নয়। অতএব আংটির অছিয়ত নগের অছিয়তকে শামিল করবে। আর নগের ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণে তা উভয়ের মধ্যে অর্ধাঅর্ধি হারে বণ্টিত হবে।

সারকথা : মতনের মাসআলাকে গোলামের সত্তা ও খেদমতের অছিয়তের উপর কিয়াস করা قياس مع الفارق।

ثُمَّ اَنَّ فِى هٰذَا الْمَقَامِ عَامَّيْنِ اِخْتَلَفَ فِيْهِمَا الشَّافِعِىُّ رح مَعَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ ظَنًّا مِنْهُ بِاَنَّهُمَا مَخْصُوْصَانِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح وَلَيْسَ كَذٰلِكَ ـ تَقْرِيْرُ الْاَوَّلِ : اَنَّ فِىْ قَوْلِهِ تَعَالٰى وَلَا تَاكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ كَلِمَةُ مَا عَامَّةٌ لِكُلِّ مَالَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَامِدًا اَوْ نَاسِيًا فَيَنْبَغِىْ اَنْ لَّا يَحِلَّ مَتْرُوْكَ التَّسْمِيَةِ اَصْلًا كَمَا ذَهَبَ اِلَيْهِ مَالِكٌ رح وَلٰكِنَّكُمْ خَصَّصْتُمُ النَّاسِىَ مِنْ هٰذَا وَقُلْتُمْ اِنَّهُ يَجُوْزُ مَتْرُوْكُ التَّسْمِيَةِ نَاسِيًا وَالْاٰيَةُ مَحْمُوْلَةٌ عَلَى الْعَامِدِ فَقَطْ قُلْنَا اِنَّ نَخُصُّ الْعَامِدَ مِنْهُ اَيْضًا بِالْقِيَاسِ عَلَى النَّاسِىْ وَبِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُسْلِمُ يَذْبَحُ عَلَى اسْمِ اللّٰهِ سَمّٰى اَوْ لَمْ يُسَمِّ فَلَمْ يَبْقَ فِى الْاٰيَةِ اِلَّا مَا كَانَ مَذْبُوْحًا بِاَسْمَاءِ الْاَصْنَامِ ـ

অনুবাদ ॥ বস্তুত এখানে দুটি عام রয়েছে যার মধ্যে ইমাম শাফেয়ী (র) এ ইমাম আবু হানীফা (র)-এর সাথে মতবিরোধ করেছেন এ ধারণা করে যে, ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে উভয় عام হলো خاص অথচ মূলত ব্যাপারটি তা নয়। প্রথমটার বিশ্লেষণ : আল্লাহ তা'আলার বাণী ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه (যা আল্লাহর নামে জবাই করা হয়নি তোমরা তার গোশত ভক্ষণ করোনা) এখানে ما শব্দটি عام এটা যার ওপর আল্লাহর নাম ইচ্ছায় বা ভুলবশতঃ নেয়া হয়নি সবগুলোকেই অন্তর্ভুক্ত করে।

সুতরাং, উচিৎ হলো যা জবাই করার সময় মোটেও আল্লাহর নাম উল্লেখ করা হয়নি তা হালাল না হোক। যেমন ইমাম মালেক (র) বলেন, কিন্তু আপনারা হানাফীগণ তো ناسى তথা ভুলে বিসমিল্লাহ ত্যাগকারীকে খাস করেছেন। বলেছেন ভুলবশতঃ বিসমিল্লাহ ত্যাগ করলে তা (ভক্ষণ) জায়েয হবে। আর আয়াতটি কেবল স্বেচ্ছায় (বিসমিল্লাহ ত্যাগকারীর) জন্যে প্রযোজ্য। আমরা এর উত্তরে বলি যে, আমরা এ থেকে স্বেচ্ছায় বিসমিল্লাহ ত্যাগকারীকে খাস করছি ناسى তথা ভুলবশতঃ বিসমিল্লাহ ত্যাগকারীর ওপর কিয়াস করে এবং খবরে ওয়াহিদের ওপর ভিত্তি করে। তা হলো রাসূল (স)-এর বাণী المسلم يذبح الخ (মুসলমান আল্লাহর নামে জবাই করে চাই মুখে তা উচ্চারণ করুক অথবা না করুক) সুতরাং, আয়াতের অধীনে কেবল ঐগুলোই বাকি থাকবে যেগুলো প্রতিমার নামে জবাই করা হয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله ثُمَّ اَنَّ فِى هٰذَا الْمَقَامِ عَامَّيْنِ الخ : ব্যাখ্যাকার বলেন– এখানে এমন দুটি আ'ম রয়েছে যে ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র) আবু হানীফা (র) এর সাথে মতবিরোধ করেন। ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতভেদের ভিত্তি হলো তার এ ধারণার উপর যে, আবু হানীফা (র) এর মতে উভয় আ'ম মাখসূস অর্থাৎ উভয় থেকে কিছু একককে খাছ করা হয়েছে। অথচ বাস্তবে তা নয়।

প্রথম আ'মের বিশ্লেষণ এই যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী وَلَا تَاكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ যে সকল পশুর উপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি তা ভক্ষণ করো না"। এর মধ্যে ما শব্দটি ঐ সকল প্রাণীকে শামিল করে যেসব প্রাণী জবাইকালে ইচ্ছাপূর্বক বা ভুলবশত আল্লাহর নাম বলা হয়নি। অতএব ما এর ব্যাপকতার দাবি এই যে, বিসমিল্লাহ বর্জিত সকল পশু হারাম হোক। তা ইচ্ছাপূর্বক পরিত্যাগ করা হোক বা ভুলবশত। ইমাম মালিক (র) এর মাযহাবও এটাই।

কিন্তু হানাফীগণ এ থেকে ভুলে বিসমিল্লাহ্ তরককারীকে খাছ করেন। তারা বলেন ভুলবশত বিসমিল্লাহ তরক করলে উক্ত প্রাণী খাওয়া জায়েয। তাদের মতে আয়াত কেবল ইচ্ছাবশত পরিত্যাগকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অতএব হানাফীগণ যেহেতু এই আ'ম থেকে ভুলবশত ত্যাগকারীকে খাছ করেছেন। অতএব আমরা শাফেয়ীগণ এর থেকে স্বেচ্ছায় বিসমিল্লাহ ত্যাগকারীকেও খাছ করবো। অর্থাৎ স্বেচ্ছায় বিসমিল্লাহ ত্যাগ করলেও উক্ত প্রাণী খাওয়া জায়েয।

দলিল : স্বেচ্ছায় বিসমিল্লাহ ত্যাগকারীর জবাইকৃত পশু হালাল হওয়ার ব্যাপারে এক দলিল হলো কিয়াস, অর্থাৎ متروك التسمية عامدا কে متروك التسمية ناسيا এর উপর কিয়াস করা হয়েছে। অতএব متروك التسمية ناسيا এর ন্যায় متروك التسمية عامدا ও হালাল হবে।

দ্বিতীয় দলিল : দ্বিতীয় দলিল হলো খবরে ওয়াহিদ। রাসূলুল্লাহ (স) এরশাদ করেছেন– মুসলমানগণ আল্লাহর নামেই জবাই করে। চাই বিসমিল্লাহ উচ্চারণ করুক বা না করুক। অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে মুসলমানের জবাইকৃত পশু হালাল।

قوله فَلَمْ يَبْقَ فِى الْأَيَةِ الخ : এটা একটি প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি ইমাম শাফেয়ী (র) এর উপর আরোপিত হয়েছে।

প্রশ্ন : উল্লেখিত আয়াত وَلَاتَاكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ ২টি একককে শামিল করে। ১. স্বেচ্ছায় বিসমিল্লাহ ত্যাগকারী, ২. ভুলবশত বিসমিল্লাহ ত্যাগকারী। ইজমা মতে ভুলবশত ত্যাগকারীকে আয়াত থেকে খাছ করা হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র) এর উপর কিয়াস করে স্বেচ্ছায় ত্যাগকারীকেও খাছ করেছেন। অতএব বর্তমান কেউই আয়াতের অধীনে থাকলো না। সুতরাং এ আয়াতের উপর আমল করা কিভাবে **সম্ভব?** অথচ সকল আয়াত আমলযোগ্য থাকা আবশ্যক। তবে যদি কোনো আয়াত মানসূখ হয়ে থাকে তা স্বতন্ত্র।

উত্তর : ইমাম শাফেয়ী (র) এর পক্ষ থেকে এর উত্তর এই যে, স্বেচ্ছায় বা ভুলে বিসমিল্লাহ ত্যাগকারীকে খাছ করার পরও উল্লেখিত আয়াতটি আমলযোগ্য থাকে। তা এভাবে যে, আয়াতে সে সকল পশু উদ্দেশ্য যাদেরকে দেবদেবীর নামে জবাই করা হয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন لَاتَاكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এ উত্তরে পরে ইমাম শাফেয়ী (র) এর উপর আয়াতটি আমলযোগ্য না থাকার কোনো প্রশ্ন উঠে না।

আহনাফের উত্তর : আমাদের পক্ষ থেকে ইমাম শাফেয়ী (র) এর উল্লেখিত মতভেদের উসূলি উত্তরের পূর্বে উল্লেখিত আয়াত দ্বারা স্বেচ্ছায় বিসমিল্লাহ ত্যাগ করার ব্যাপারে যে ২টি দলিল পেশ করেছিলেন আগে তার উত্তর দেয়া হচ্ছে।

প্রথম দলিলের উত্তর এই যে, স্বেচ্ছায় ত্যাগকারীকে ভুলবশত ত্যাগকারীর উপর কিয়াস করা বৈধ নয়। যেমন– কিয়ামের উপর সক্ষম ব্যক্তিকে কিয়ামে অক্ষম ব্যক্তির উপর কিয়াস করা বৈধ নয়। দ্বিতীয় দলিল তথা হাদীসের উত্তর এই যে, আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী (র) হেদায়ার শরাহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, দারকুতনীর বর্ণনার মতে হাদীসটি এরূপ اَلْمُسْلِمُ يَذْبَحُ عَلٰى اِسْمِ اللّٰهِ سَمّٰى اَوْ لَمْ يُسَمِّ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ অর্থাৎ "মুসলমান আল্লাহর নামেই জবাই করে তা বিসমিল্লাহ পড়ুক বা না পড়ুক; যতোক্ষণ সে বিসমিল্লাহ ত্যাগের ইচ্ছা না করে"। এর উদ্দেশ্য এই যে, কোনো মুলমান যদি জবাইকালে স্বেচ্ছায় বিসমিল্লাহ না পড়ে তাহলে সে আল্লাহর নামের উপর জবাইকারী সাব্যস্ত হবে না এবং তা ভক্ষণ করা জায়েয হবে না। ما لم يتعمد বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এ হাদীসটি আমাদের হানাফীদের দলিল হবে।

وَتَقْرِيْرُ الثَّانِى أَنَّ فِى قَوْلِهِ تَعَالٰى "وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا" كَلِمَةُ مَن ايضًا عامَّةٌ شاملةٌ لِمَنْ دَخلَ فِى البَيْتِ بعدَ قتلِ انسانٍ او بعدَ قطعِ اَطرافِه او دَخلَ فى البيتِ ثم قَتَلَ فيه احدًا فينبغى ان يكونَ كلٌّ مِّن هٰؤلاءِ اٰمِنًا وأَنْتُم خَصَّصْتُمْ مِن هٰذا مَنْ قَتَلَ فى البَيْتِ بَعْدَ الدُّخُوْلِ وَمَنْ دَخل فيه بَعْدَ قطعِ اطرافِه وقُلْتُمْ اِنَّه يُقْتَصُّ مِن هٰذيْنِ فِى البَيْتِ - قُلْنا اِنَّ نَخُصُّ الصُّوْرَةَ الثَّالِثَة ايضًا ومَنْ دخل فى البَيْتِ بعدَ انْ قتَلَ اِنسانًا فيُقتَصُّ مِنْه بالقِياسِ علَى الصُّوْرَتَيْنِ الأوْلَيَيْنِ وبِخَبْرِ الواحِدِ وهُو قولُه عليه السلام الحَرَمُ لا يُعِيْذُ عاصيًا ولا فارًّا بِدَمٍ ولمْ يبقَ تحتَ هٰذا العامِّ اِلاَّ الاٰمِنُ مِنْ عذابِ النَّارِ

অনুবাদ ॥ দ্বিতীয় عام এর বিবরণ : আল্লাহ তা'আলার বাণী ومن دخله كان امنا ('যে তথায় প্রবেশ করবে সে নিরাপদ হবে' এর মধ্যে من শব্দটি عام এটা যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করে বা কারো হাত-পা কর্তন করে সেখানে প্রবেশ করবে, সবাইকে নিরাপত্তায় শামিল করে। অথবা যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহয় প্রবেশ করল, অতঃপর কাউকে হত্যা করল, তাদের প্রত্যেকই (বাইতুল্লাহয়) নিরাপদ থাকা উচিত। অথচ আপনারা এ عام থেকে ঐ ব্যক্তিকে خاص করেছেন যে প্রবেশ করার পর হত্যা করে এবং যে কারো হাত-পা কর্তন করার পরে প্রবেশ করে। আপনারা– এই দুপ্রকারের লোক হতে বায়তুল্লাহর অভ্যান্তরেও কিসাস নেয়া হবে বলেন– আমরা উত্তরে বলবো যে, এমনিভাবে আমরা তৃতীয় প্রকারকেও খাস করি। আর তা হলো, কেউ যদি কোন লোককে হত্যা করার পর বায়তুল্লাহয় প্রবেশ করে, তাহলে প্রথম দুটি অবস্থার ওপর কিয়াস করে ও খবরের ওয়াহিদের ওপর ভিত্তি করে তার থেকে কিসাস নেয়া হবে। খবরে ওয়াহিদ এই যে, রাসূল (স)-এর বাণী اَلحَرَمُ لا يُعِيْذُ عاصِيًا ولاَ فارًّا بِدَمٍ ('হারাম কোন অপরাধী ও খুনীকে আশ্রয় দেয় না')। আর الاٰمِنُ مِنْ عَذابِ النَّارِ (জাহান্নাম হতে নিরাপত্তা লাভকারী) ছাড়া এ عام এর অধীনে আর কেউ বাকি থাকে না।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله وتقريرُ الثَّانى اَنَّ فِى الخ : **দ্বিতীয় আ'মের বর্ণনা :** আল্লাহ তা'আলার বাণী وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا "যে বায়তুল্লাহয় প্রবেশ করবে সে নিরাপদ হবে"। এর মধ্যে من শব্দটি আ'ম। এর অধীনে ৩টি সূরত বা অবস্থা শামিল রয়েছে।

১. কোনো ব্যক্তি কাউকে হত্যা করার পরে কা'বা শরীফে প্রবেশ করেছে।

২. কেউ কারো হাত পা কর্তনের পরে কা'বা শরীফে প্রবেশ করেছে।

৩. কেউ কা'বা শরীফে প্রবেশ করার পরে কাউকে হত্যা করেছে। من শব্দের ব্যাপকতা দাবি করে যে, এই তিনো ধরনের ব্যক্তি নিরাপদ হোক। অথচ হানাফীগণ দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যক্তিকে এই আ'ম থেকে খাছ করে থাকেন। তারা বলেন কেউ বায়তুল্লায় প্রবেশ করে কাউকে হত্যা করলে বা কারো হাত পা কর্তন করার পরে বায়তুল্লাহয় প্রবেশ করলে তারা নিরাপদ হবে না। বরং কা'বার অভ্যান্তরে তাদের থেকে কিসাস নিতে হবে।

শাফেয়ীগণ বলেন– আপনারা হানাফীগণ দুই ব্যক্তিকে আয়াত থেকে খাছ করেছেন। আর তৃতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ যে কাউকে হত্যা করে বায়তুল্লায় প্রবেশ করেছে তাকে আমরা খাছ করি এবং বলি যে, উক্ত ব্যক্তি নিরাপদ হবে না। বরং তার থেকে কিসাস গৃহীত হবে।

শাফেয়ীগণের দলিল : এ ব্যাপারে আমাদের একটা দলিল হলো কিয়াস। অর্থাৎ অন্য ২ ব্যক্তির উপর প্রথম ব্যক্তিকে কিয়াস করে আমরা তার কিসাসের বিধান দিয়ে থাকি।

দ্বিতীয় দলিল : দ্বিতীয় দলিল হলো খবরে ওয়াহেদ اَلْحَرَمُ لَا يُعِيْذُ عَاصِيًا وَلَا فَارًّا بِدَمٍ "মক্কার হেরেম কখনো কোনো নাফরমান এবং হত্যাকারীকে পলায়ন করে কা'বার অভ্যান্তরে আসলে তাকে আশ্রয় দেয় না"। অতএব বোঝা গেলো যে, অবশ্যই তার থেকে কিসাস নিতে হবে।

প্রশ্ন : শাফেয়ীগণের উপর এই প্রশ্ন আরোপিত হয় যে, আয়াতের অধীনে ৩ ধরনের ব্যক্তি ছিলো। তার মধ্য থেকে ২ ধরনের ব্যক্তিকে ইজমা দ্বারা খাছ করা হয়েছে। আর বাকী ১ ব্যক্তিকে আপনারা খাছ করেছেন। অতএব এখন আয়াতের অধীনে কি অবশিষ্ট থাকলো এবং আয়াতের উপর আমল করা কিভাবে সম্ভব?

উত্তর : শাফেয়ীগণের পক্ষ থেকে এর উত্তর এই যে, এই আয়াতের অধীনে দোযখের আযাব থেকে নিরাপদ ব্যক্তি রয়ে গেলো। অর্থাৎ যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহয় প্রবেশ করবে সে দোযখের আযাব থেকে নিরাপদ হয়ে গেলো। তবে এর জন্য শর্ত হলো ঈমানদার হওয়া।

ইমাম শাফেয়ী (র) এর উল্লেখিত মতভেদের উসূলি উত্তর সামনে বর্ণনা করা হবে। তবে কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করার পরে বায়তুল্লাহয় প্রবেশকারী ব্যক্তিকে আয়াতের ব্যাপকতা থেকে খাছ করার উপর যে দুটি দলিল পেশ করা হয়েছিলো এখন তার উত্তর দেয়া হচ্ছে।

প্রথম দলিল তথা কিয়াসের উত্তর : বায়তুল্লায় প্রবেশ করে কাউকে হত্যাকারী ব্যক্তিকে হত্যার পরে বায়তুল্লাহয় প্রবেশকারীর উপর কিয়াস করা قِيَاس مع الفارق কেননা যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহয় প্রবেশ করে কাউকে হত্যা করে সে বায়তুল্লাহর মর্যাদা ধূলিস্যাৎ করলো। সে এমন যোগ্য নয় যে, তার নিরাপত্তা লাভ হোক। এ কারণে সে নিরাপত্তার অধিকারী হবে না। বরং তার থেকে কিসাস নিতে হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর অদূরে কাউকে হত্যা করে বায়তুল্লাহর আশ্রয় কামনা করে এবং তার যথাযথ মর্যাদা দান করে তার থেকে কিসাস গ্রহণ করা আদৌ মুনাসিব নয়। এ কারণে সে নিরাপদ থাকবে।

দ্বিতীয় দলিলের উত্তর : এর বিশ্লেষণ এই যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) এবং তার সাথীগণ যখন ইয়াযিদের হাতে বায়আত হওয়া থেকে বিরত ছিলেন তখন আমর ইবনে সা'দ যিনি ইয়াযিদের গভর্ণরদের অন্যতম। ইবনে যুবাইরের সাথে সংঘর্ষের জন্য মক্কায় একটি বাহিনী প্রেরণের সংকল্প করলেন। তখন ইবনে শুরাইহ বললেন– রাসূলুল্লাহ (স) এরশাদ করেছেন– মক্কা হলো হরম। এর মধ্যে শিকার করা এবং এর গাছগাছালি কাটা জায়েয নয়। অর্থাৎ যখন কোনো পশুকে হত্যা করা এবং গাছগাছালি কর্তন করা জায়েয নয়। কাজেই মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করা কিভাবে জায়েয হতে পারে?

আমর ইবনে সা'দ উত্তরে বললেন– إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيْذُ عَاصِيًا وَلَا فَارًّا بِدَمٍ "হরম কোনো নাফরমান এবং খুন থেকে পলায়নকারীকে আশ্রয় দেয় না"। অর্থাৎ ইবনে যুবাইর এবং তার সাথীগণ ইয়াযিদের হাতে বায়আত না হওয়ার কারণে তারা যেহেতু অবাধ্য। এ কারণে হরম তাদেরকে নিরাপত্তা দিবে না। ফলে তাদের সাথে যুদ্ধ করা জায়েয। মোটকথা إن الحرم الخ হলো আমর ইবনে সা'দ এর উক্তি। মক্কায় সৈন্য প্রেরণের কারণে সে জালিম। আর জালিমের উক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং إن الحَرَمَ لَا يُعِيْذُ الخ উক্তিও গ্রহণযোগ্য হবে না।

অন্যান্য রেওয়ায়াত দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, ইবনে শুরাইহ إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيْذُ عَاصِيًا وَلَا فَارًّا بِدَمٍ রাসূলুল্লাহ (স) এর হাদীস হওয়াকে অস্বীকার করেছেন। অতএব এর দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র) এর খাছ করার ব্যাপারে দলিল গ্রহণ করা গ্রহণযোগ্য নয়।

فَاَجَابَ الْمُصَنِّفُ رح عَنْ جَانِبِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح بِقَوْلِه و لَا يَجُوْزُ تَخْصِيْصُ قَوْلِه تَعَالٰي وَلَا تَاكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا بِالْقِيَاسِ وَخَبَرِ الْوَاحِدِ اى لَا يجوزُ تَخْصِيْصُ الشَّافِعِيِّ رح الْعَامِدَ عَنْ قوله تَعَالٰى وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ بِالْقِيَاسِ عَلَى النَّاسِيْ و قوله عليه السلام الْمُسْلِمُ يَذْبَحُ عَلٰى اِسْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى سَمّٰى اَوْ لَمْ يُسَمِّ - وَتَخْصِيْصُ الدَّاخِلِ فِى الْبَيْتِ بَعْدَ مَا قتل عن قوله تَعَالٰى وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا بِالْقِيَاسِ عَلَى الْقَاتِلِ بَعْدَ الدُّخُوْلِ وَعَلَى الْاَطْرَافِ وقوله عليه السلام الْحَرَمُ لَا يُعِيْذُ عَاصِيًا ولا فَارًّا بِدَمٍ لِاَنَّهُمَا لَيْسَا بِمَخْصُوْصَيْنِ اوّلًا كَمَا زَعَمْتُمْ حَتّٰى يُخَصَّ ثَانِيًا بِالْقِيَاسِ وَخَبَرِ الْوَاحِدِ لِاَنَّ النَّاسِيَ لَيْسَ بِدَاخِلٍ فِى قَوْلِهِ تَعَالٰى مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ اَصْلًا اِذْ هُوَ فِى مَعْنَى الذَّاكِرِ فَلَمْ يُخَصَّ مِنَ الْاٰيَةِ حَتّٰى يُقَاسَ عَلَيْهِ الْعَامِدُ - وكذا الَّذِىْ عَلَيْهِ قِصَاصٌ فِى الطَّرْفِ لَمْ يُخَصَّ مِنَ الْاَمْنِ اِذِ الْمُرَادُ بِالْاَمْنِ اَمْنُ الذَّاتِ وَالْاَطْرَافُ كَاَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الذَّاتِ بَلْ مِنَ الْمَالِ - وَكَذَا الْقَاتِلُ بعدَ الدُّخُوْلِ فِيْهِ اذ مَعْنٰى قَوْلِه وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا مَنْ دَخَله بَعْدَ مَا صَارَ مُبَاحَ الدَّمِ بِرِدَّةٍ او زِنًا او قِصَاصٍ لِاَنَّه بَاشَرَ هٰذه الامُورَ بعدَ الدَّخولِ فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ مَضمونِ الْاٰيَةِ لَا اَنَّه مخصوصٌ مِنْهَا

অনুবাদ ॥ মুসান্নিফ (র) ইমাম আবু হানীফা (র)-এর পক্ষ হতে ইমাম শাফেয়ী (র)-এর উল্লেখিত প্রশ্নের উত্তরে বলেন, *আল্লাহর বাণী* وَلَا تَاكُلُوْا مِمَّا الخ *এবং আল্লাহর বাণী* ' وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا *আয়াতদ্বয়কে কিয়াস এবং খবরে ওয়াহিদের ওপর ভিত্তি করে* خاص *করা জায়েয হবে না।* অর্থাৎ, ناسى (ভুলবশতঃ বিসমিল্লাহ ত্যাগকারী)- এর উপর কিয়াস করে এবং রাসূল (স)-এর বাণী الْمُسْلِمُ يَذْبَحُ عَلٰى اِسْمِ اللّٰهِ سَمّٰى اَوْ لَمْ يُسَمِّ এর দ্বারা عامدا তথা স্বেচ্ছায় বিসমিল্লাহ ত্যাগকারীকে আল্লাহর বাণী وَلَا تَاكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ হতে ইমাম শাফেয়ী (র) যে খাস করেন তা জায়েয নেই। এমনিভাবে আল্লাহর বাণী ومن دخله كان امنا- এর থেকে হত্যা করার পর বায়তুল্লাহয় প্রবেশকারীকে অঙ্গ কর্তন করার পর বাইতুল্লাহয় প্রবেশকারী অথবা বাইতুল্লাহয় প্রবেশের পর হত্যাকারীর ওপর কিয়াস করা ও রাসূল (স)-এর বাণী الْحَرَمُ لَا يُعِيْذُ عَاصِيًا وَلَا فَارًّا بِدَمٍ এর উপর ভিত্তি করে تخصيص করা বৈধ হবে না। কারণ উভয়টা عام। এ বাক্যটি গ্রন্থকারের উক্তি لا يجوز এর تعليل তথা ইল্লত জ্ঞাপক। অর্থাৎ, এ উভয়টি عام প্রথমতঃ খাস নয়। যেমন আপনারা (শাফেয়ী (র)) ধারণা করেছেন যে, যাতে পুনরায় কিয়াস ও খবরে ওয়াহিদের দ্বারা خاص করা যায়। কেননা, ناسى তথা ভুলবশতঃ বিসমিল্লাহ ত্যাগকারী, আল্লাহ তা'আলার বাণী- لَا تَاكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ الخ এর অন্তর্ভুক্তই নয়। ناسى ভুলে বিসমিল্লাহ ত্যাগকারী ذاكر এর বিধানেগণ্য হয়। সুতরাং তাকে আয়াত হতে খাস করা যাবে না। যাতে তার ওপর عامد স্বেচ্ছায় বিসমিল্লাহ ত্যাগকারীকে কিয়াস করা যায়।

আর এমনিভাবে হাত-পা কর্তন করার কারণে যার ওপর قصاص অনিবার্য হয়েছে তাকে امن। তথা নিরাপত্তা লাভকারী হতে খাস করা হয়নি। কারণ امن দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, اَمن بِالذَّات তথা সত্তাগতভাবে নিরাপত্তা লাভকারী। আর اطراف তথা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ذات এর অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং মালের শ্রেণীভুক্ত।

এমনিভাবে বায়তুল্লাহয় প্রবেশ করার পর হত্যাকারী (সেও امن হতে খাস নয়) যেহেতু আল্লাহ তা'আলার বাণী- ومن دخله كان امنا এর অর্থ হলো- যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্মত্যাগের কারণে, অথবা ব্যভিচারের কারণে, অথবা قصاص ওয়াজিব হওয়ার কারণে مباح الدم হয়ে তথায় প্রবেশ করেছে। এ অর্থ নয় যে, সে বায়তুল্লাহয় প্রবেশের পর এই কাজগুলো সংঘটিত করেছে। অতএব প্রবেশের পর হত্যাকারী আয়াতের মূল উদ্দেশ্য হতে খারিজ। এটা ঐ আয়াত হতে খাস নয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ قوله فَاَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْ جَانِبِ الخ : ব্যাখ্যাকার বলেন- মুসান্নিফ (র) ইমাম আবু হানীফা (র) এর পক্ষ থেকে ইমাম শাফেয়ী (র) এর এ উত্তর দিয়েছেন যে, কিয়াস এবং খবরে ওয়াহিদ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার বাণী وَلَاتَاكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কে খাছ করা জায়েয নয় এবং وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا কেও খাছ করা জায়েয নয়। অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ী (র) স্বেচ্ছায় বিসমিল্লাহ তরককারীকে ভুলবশত তরককারীর উপর কিয়াস করেন। এভাবে اَلْمُسْلِمُ يَذْبَحُ عَلٰى اِسْمِ اللّٰهِ سَمّٰى اَوْ لَمْ يُسَمِّ হাদীসের কারণে আল্লাহ তা'আলার বাণী وَلَاتَاكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কে খাছ করেন যা জায়েয নয়। এভাবে ইমাম শাফেয়ী (র) কর্তৃক হত্যার পরে বায়তুল্লাহয় প্রবেশকারীকে বায়তুল্লাহয় প্রবেশ করার পরে কতলকারীর উপরে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করার পরে বায়তুল্লাহয় প্রবেশকারীর উপর কিয়াস করা এভাবে اَلْحَرَمُ لَا يُعِيْذُ عَاصِيًا وَلَا فَارًّا بِدَمٍ হাদীসের কারণে وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا আয়াত দ্বারা খাছ করা জায়েয নয়। কারণ এ দুয়োটি আ'ম। অর্থাৎ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এবং وَمَنْ دَخَلَهُ الخ মাখসূস নয়। যেমন আপনারা শাফেয়ীগণ ধারণা করে থাকেন। অর্থাৎ যখন এ দুটো আ'ম মাখসূস নয় তখন আপনাদের কিয়াস এবং খবরে ওয়াহেদ দ্বারা দ্বিতীয়বার খাছ করাও জায়েয হবে না।

এ উভয়টি এ কারণে নয় আ'ম মাখছুস যে, ভুলবশত বিসমিল্লাহ তরককারী যার ব্যাপারে আপনারা শাফেয়ীগণ মনে করে থাকেন যে, হানাফীগণ তাকে مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ থেকে খাছ করেছেন। অথচ এ ধারণা ভুল। শুরু থেকে আল্লাহ তা'আলার বাণী اَلْمُسْلِمُ يَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর মধ্যে শামিলই নয়। কেননা ভুলে তরককারী বিধানগতভাবে বিসমিল্লাহ উল্লেখকারীর ন্যায়। কারণ ভুল করা একটি ওযর। শরীআতে এটা ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। আর তার মুসলমান হওয়াটা আল্লাহর নাম উল্লেখ করার দাবী করে। সুতরাং ভুলের ওযরে তার মুসলমান হওয়াকে বিসমিল্লাহ উল্লেখের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। অতএব সে مما لم يذكر এর আফরাদের মধ্যে থাকলো না। আর আয়াতের অধীনে না থাকার কারণে তার খাছ করার কোনো কথাই উঠতে পারে না। সুতরাং আপনাদের জন্য এর উপর কিয়াস করে স্বেচ্ছায় তরককারীকে খাছ করার অনুমতি থাকতে পারে না।

★ এভাবে যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিকে হাত পা কর্তনের পরে বায়তুল্লাহয় প্রবেশ করলো তাকে وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا আয়াত থেকে খাছ করা হয়নি। কেননা সে আয়াতের মধ্যে শামিলই নয়। কারণ আয়াতে নিরাপদ দ্বারা উদ্দেশ্য সত্তাগতভাবে নিরাপদ। অর্থাৎ যে বায়তুল্লাহয় প্রবেশ করে তার সত্তা নিরাপদ হয়ে যায়। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেহেতু তার সত্তার মধ্যে দাখিল নয় বরং তার মালের পর্যায়ে। সুতরাং সে যখন বায়তুল্লাহয় প্রবেশ করে সত্তাগতভাবে নিরাপদ হয়ে গেলো কিন্তু তার মাল বা তার অঙ্গ নিরাপদ নয়। অতএব অঙ্গ কর্তন করে বায়তুল্লাহয় প্রবেশকারী ব্যক্তি من دخله الخ আয়াতের অধীনে শামিল থাকবে না। সুতরাং তাকে খাছ করার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। ফলে এর উপরে অন্য কাউকে কিয়াস করাও গ্রহণযোগ্য হবে না।

★ এভাবে যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহয় প্রবেশ করে কাউকে হত্যা করে সেও وَمَنْ دَخَلَه الخ আয়াতের অধীনে দাখিল নয়। কারণ وَمَنْ دَخَلَهُ الخ এর অর্থ হলো যে ব্যক্তি مُبَاحُ الدمِ তথা মুর্তাদ বা যিনা, স্বেচ্ছায় হত্যা ইত্যাদি কাজে জড়িত হয়ে বায়তুল্লাহয় প্রবেশ করে সে নিরাপদ। কিন্তু যে বায়তুল্লাহয় প্রবেশ করে এসকল কাজে জড়িত হয় সে নিরাপদ নয়। অতএব এই আয়াত থেকে সে খারিজ হবে। এমন নয় যে, সে দাখিল ছিলো পরে তাকে খারিজ করা হয়েছে। সুতরাং এর উপর কিয়াস করে বায়তুল্লাহয় প্রবেশ করার পরে হত্যাকারীকে খাছ করা জায়েয হবে না।

لاَ يُقَالُ اِنَّ ضَمِيْرَ دَخَلَهُ رَاجِعٌ اِلَى الْبَيْتِ وَالْمَقْصُوْدُ بَيَانُ اَمْنِ الْحَرَمِ لاَنَّا نَقُوْلُ اِنَّ حُكْمَهُمَا وَاحِدٌ بِدَلِيْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا - ثُمَّ اَنَّ الْمُصَنِّفَ رح لَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ الْعَامِّ الْغَيْرِ الْمَخْصُوْصِ شَرَعَ فِىْ بَيَانِ الْعَامِّ الْمَخْصُوْصِ وَ اَوْرَدَ فِيْهِ ثَلٰثَةَ مَذَاهِبَ وَبَيَّنَ كُلَّ مَذْهَبٍ بِدَلِيْلٍ وَشَبَّهَهُ بِمَسْاَلَةٍ فِقْهِيَّةٍ فَقَالَ فَاِنْ لَحِقَهُ خُصُوْصٌ مَعْلُوْمٌ اَوْ مَجْهُوْلٌ لاَ يَبْقَى قَطْعِيًّا لٰكِنَّهُ لاَ يَسْقُطُ الْاِحْتِجَاجُ بِهِ اى اِنْ لَحِقَ هٰذَا الْعَامَّ الَّذِى كَانَ قَطْعِيًّا مَخْصُوْصٌ مَعْلُوْمُ الْمُرَادِ اَوْ مَجْهُوْلُ الْمُرَادِ فَالْمُخْتَارُ اَنَّهُ لاَ تَبْقَى قَطْعِيَّتُهُ وَلٰكِنْ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ كَمَا هُوَ شَانُ سَائِرِ الدَّلاَئِلِ الظَّنِّيَّةِ مِنْ خَبَرِ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسِ -

অনুবাদ ॥ একথা বলা যাবে না যে, دخله এর "ه" যমীর البيت তথা বায়তুল্লাহ-এর দিকে ফিরেছে। অথচ উদ্দেশ্য হলো- হারাম শরীফ যে নিরাপদ স্থান তা বর্ণনা করা। আমরা তার উত্তরে বলবো যে, بيت ও حرم এর হুকুম এক ও অভিন্ন এর দলিল হলো আল্লাহর বাণী اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا (তারা কি দেখে না যে, আমি হারামকে নিরাপদ বানিয়েছি)। অতঃপর গ্রন্থকার (র) العام الغير المخصوص এর আলোচনা শেষ করে العام المخصوص এর আলোচনা করেছেন। এ ব্যাপারে তিনটি মাযহাব উল্লেখ করেছেন। আর প্রত্যেক মাযহাবের দলিলও তার দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন একটি ফিকহী মাসআলার মাধ্যমে। তিনি বলেন ***"যদি তার সাথে কোন স্পষ্ট বা অস্পষ্ট খাস সংযুক্ত হয়, তাহলে তা অকাট্যরূপে বহাল থাকবে না, তবে তা দ্বারা দলিল পেশ করা যাবে"***। অর্থাৎ, যদি উক্ত আ'মের অকাট্যতাকে খাস করা হয়, যদিও উদ্দেশ্য জ্ঞাত হয়, অথবা অজ্ঞাত হয়। তাবে পছন্দনীয় মত এই যে, তা আর অকাট্যরূপে বহাল থাকবে না। তবে তার ওপর আমল করা আবশ্যক হবে, যদ্রূপ অন্যান্য ظنى দলিল তথা خبر واحد ও قياس এর ওপরও আমল ওয়াজিব হয়ে থাকে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ নূরুল আনওয়ার গ্রন্থকার বলেন- এখানে প্রশ্ন করা সমীচীন হবে না যে, وَمَنْ دَخَلَهُ এর মধ্যে মাফঊলের যমীরটি বায়তুল্লাহর প্রতি ফিরেছে। কেননা পূর্বে اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ এর মধ্যে বায়তুল্লাহ উল্লেখ রয়েছে। এ যমীরটি حرم এর প্রতি ফিরেনি। কারণ আগে حرم শব্দ উল্লেখ নেই। সুতরাং আয়াত দ্বারা বায়তুল্লাহর নিরাপত্তার বর্ণনা হবে; হরমের নিরাপত্তা নয়। অথচ হরমের নিরাপত্তা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য।

এর উত্তর এই যে, আয়াতে মাফঊলের যমীর যদিও বায়তুল্লাহর প্রতি ফিরেছে তবে হরমের বিধান বায়তুল্লাহর বিধানের অনুরূপই। যেমন- অপর আয়াত اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا দ্বারা প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ তাদের কি জানা নেই যে, আমি তাদের জন্য মক্কা শহরের হরমকে নিরাপদ বানিয়েছি। এক্ষেত্রে হরম এবং কা'বা উভয়ই নিরাপদ হওয়া সাব্যস্ত হয়। অতএব ومن دخله এর জমীর দ্বারা বায়তুল্লাহ উদ্দেশ্য নেয়ায় কোনো ক্ষতি নেই।

قوله ثم ان المصنف لما فرغ الخ : ব্যাখ্যাকার বলেন- عام ২ প্রকার। ১. عام مخصوص منه البعض ২. عام غير مخصوص منه البعض মুসান্নিফ (র) عام غير مخصوص منه البعض এর বর্ণনা শেষ করে এখান থেকে عام مخصوص منه البعض এর বর্ণনা শুরু করেছেন। عام مخصوص منه البعض এর বিষয়ে ৩টি মাযহাব এবং তাদের প্রমাণাদি উল্লেখিত হয়েছে। প্রত্যেক মাযহাবের উদাহরণ স্বরূপ একটি ফিকহী মাসআলাও উল্লেখিত হয়েছে।

প্রথম মাযহাব : যে عام শব্দটি قطعى الدلالت হয়ে থাকে। এর জন্য যদি উদ্দেশ্য নির্দিষ্টকারী বা উদ্দেশ্য অজ্ঞাত কোনো مخصص পাওয়া যায় তাহলে তা قطعى الدلالت থাকবে না। অবশ্য তার উপর আমল করা ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ তা দ্বারা দলিল গ্রহণ করা গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন- খবরে ওয়াহেদ এবং কিয়াস দ্বারা দলিল গ্রহণ করা গ্রহণযোগ্য। ব্যাখ্যাকার বলেন- এটাই পছন্দনীয় অভিমত।

التَّخْصِيْصُ فِى الْاِصْطِلَاحِ هُوَ قَصْرُ الْعَامِّ عَلٰى بَعْضِ مُسَمَّيَاتِهٖ بِكَلَامٍ مُسْتَقِلٍّ مَوْصُوْلٍ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ كَلَامًا بِاَنْ كَانَ عَقْلًا اَوْ حِسًّا اَوْ عَادَةً اَوْ نَحْوَهٗ لَمْ يَكُنْ تَخْصِيْصًا اِصْطِلَاحًا وَلَمْ يَصِرْ ظَنِّيًّا وَكَذَا اِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَقِلًّا بَلْ كَانَ بِغَايَةٍ اَوْ شَرْطٍ اَوِ اسْتِثْنَاءٍ اَوْ صِفَةٍ وَسَيَجِيْئُ تَفَاصِيْلُهَا وَكَذَا اِنْ لَمْ يَكُنْ مَوْصُوْلًا بَلْ كَانَ مُتَرَاخِيًا لَا يُسَمّٰى تَخْصِيْصًا بَلْ نَسْخًا عَلٰى مَا سَيَجِيْئُ هٰكَذَا قَالُوْا

অনুবাদ ॥ পরিভাষায় تخصيص বলা হয় কোন সংযুক্ত স্বতন্ত্র বাক্যের মাধ্যমে তাকে কিছু এককের মধ্যে সীমাবদ্ধ করাকে। مخصص যদি বাক্য না হয়ে বরং বিবেক, ইন্দ্রিয় অথবা, অভ্যাস অথবা, অনুরূপ কিছু হয়, তাহলে পরিভাষায় তাকে تخصيص বলা যাবে না এবং তা ظني (ধারণাবশতঃ)ও হবে না। এভাবে যদি স্বতন্ত্র কোন বাক্য দ্বারা তাখসীস না হয়। বরং غايت অথবা, شرط অথবা, استثنا, অথবা, গুণবাচক কোন শব্দ দ্বারা হয়, তাহলেও একই হুকুম হবে। শিঘ্র এর বিস্তারিত বিবরণ আসছে। এমনিভাবে যদি সংযুক্ত বাক্য না হয়, বরং متراخي তথা বিচ্ছিন্ন বাক্য দ্বারা হয়, তাহলে তাকে تخصيص বলা যাবে না, বরং তাকে نسخ বলা হবে। যা অচিরেই আসছে। উসূলবিদগণ এটাই বলেছেন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ تخصيص এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : আ'মকে তার কিছু আফরাদের উপর মিলিত ভিন্ন বাক্য দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হলো তাখসীস। অর্থাৎ মিলিত كلام مستقل ভিন্ন বাক্য দ্বারা আ'মের কিছু একককে খারিজ করা এবং কিছু তার অধীনে বাকী রাখাকে تخصيص বলে। كلام مستقل দ্বারা এমন বাক্য উদ্দেশ্য যা حكم এর ফায়েদা দেয়। এ ব্যাপারে অন্য কিছুর মুখাপেক্ষী থাকে না। মিলিত বাক্য দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, আ'ম শব্দ এবং مخصص উভয়ের উচ্চারণ একই সাথে হবে। যদি আ'মের উচ্চারণ একবার হয় আর مخصص এর উচ্চারণ অন্যবারে হয় তাহলে পরিভাষায় তা تخصيص হবে না বরং নসখ হবে।

فوائد قيود : ব্যাখ্যাকার تخصيص এর সংজ্ঞার فوائد قيود বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন– মুখাসসিস যদি প্রথম থেকে কোন কথা-ই না হয় বরং বিবেক, ইন্দ্রিয়, স্বভাব কিংবা কোনো অসম্পূর্ণ একক বা অতিরিক্ত একক হয় তাহলে এ সকল ক্ষেত্রে পারিভাষিক تخصيص হয় না। অর্থাৎ কোনো আ'মের মধ্যে যদি বিবেক দ্বারা খাছ করা হয় তাহলে পরিভাষায় তাকে تخصيص বলা হবে না। যেমন خالق كل شيء আয়াতে كل شيء হলো আ'ম। কিন্তু বিবেক দ্বারা বোঝা যায় যে, এখানে এর দ্বারা আল্লাহ ছাড়া বাকী সকল বস্তু উদ্দেশ্য। সুতরাং বিবেক দ্বারা আল্লাহকে সকল বস্তু থেকে খারিজ করাকে পরিভাষায় تخصيص বলা হবে না। এভাবে শরয়ী বিধান থেকে নাবালেগ শিশু ও পাগলদেরকে বিবেক দ্বারা খারিজ করা পরিভাষিক تخصيص নয়। যেমন আয়াত وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ এতে النَّاس শব্দটি সকল মানুষকে শামিল করে। কিন্তু বিবেক দ্বারা এ থেকে নাবালেগ শিশু ও পাগলদেরকে খারিজ করা হয়েছে। এভাবে ইন্দ্রিয় দ্বারা কিছু সংখ্যক একককে আ'ম থেকে খারিজ করাও পরিভাষায় تخصيص হবে না। যেমন اُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ বাক্যটি বিলকীসের ব্যাপারে হুদহুদ পাখি সোলায়মান (আ) কে লক্ষ্য করে বলেছিলো যে, "বিলকীস সাবা জাতির উপর রাজত্ব করছে। তাকে সর্ব প্রকারের সামগ্রী দান করা হয়েছে"। এখানে كل شيء শব্দটি আ'ম। কিন্তু ইন্দ্রিয় বা অনুভূতির মাধ্যমে প্রমাণিত যে, দুনিয়ার কোনো মানুষকে দুনিয়ার সকল বস্তুর মালিক বানানো হয়নি। এমন অনেক বস্তু রয়েছে বিলকীস যার মালিক ছিলো না। তবে পরিভাষায় কারো রাজত্বের বর্ণনা দানকালে বলা হয় যে, সেতো বাদশা। সব জিনিস তার কাছে আছে। মোটকথা এখানে كل شيء এর মধ্যে অনুভূতি ও ইন্দ্রিয় দ্বারা খাছ করা হয়েছে। কিন্তু পরিভাষায় এটাকে تخصيص বলা হবে না।

غايت কিংবা স্বভাব দ্বারা আ'ম থেকে কিছু একককে খারিজ করলেও পরিভাষায় তা تخصيص গণ্য হবে না। যেমন কেউ বললো والله لا اكل راسا, "আল্লাহর শপথ আমি মাথা খাবো না"। তাহলে পরিভাষায় এর দ্বারা প্রচলিত মাথা উদ্দেশ্য হবে। অর্থাৎ গরু, ছাগল, মহিষ ও উটের মাথা বোঝাবে। ফড়িং এর ন্যায় প্রাণীর মাথা বোঝাবে না। সুতরাং স্বাভাবিক প্রচলন দ্বারা কিছু সংখ্যক মাথাকে খারিজ করা হয়েছে। পরিভাষায় এটাকেও تخصيص বলা হয় না

এভাবে কিছু একক অসম্পূর্ণ হওয়ার কারণে আ'ম থেকে খারিজ হওয়াও পরিভাষায় تخصيص নয়। যেমন কেউ বললো كُلُّ مَمْلُوكٍ لِّيْ حُرٌّ "আমার সকল মালিকানাধীন বস্তু আযাদ"। এর দ্বারা মুকাতাব গোলাম আযাদ হবে না। কারণ মুকাতাবের ক্ষেত্রে মণিবের মালিকানা অসম্পূর্ণ। যদিও সে তার সত্তার মালিক কিন্তু তার ব্যাপারে অধিকার প্রয়োগ করার মালিক নয়।

কিছু সংখ্যক আফরাদ অতিরিক্ত হওয়ার কারণে আ'ম থেকে খারিজ হওয়াও পারিভাষিক تخصيص নয়। যেমন কেউ বললো والله لا اكل فاكهة, "আল্লাহর শপথ আমি ফাকেহা (ফল) খাবো না"। সে কোনো নিয়ত করলো না তাহলে তার এ শপথে খেজুর শামিল হবে না। যদিও পরিভাষায় এবং শাব্দিকার্থে খেজুরও فاكهة এর অন্তর্গত। তবে এর মধ্যে যেহেতু তৃপ্তি থেকে অতিরিক্ত অর্থ রয়েছে। অর্থাৎ আহারযোগ্য হওয়া। এজন্য অতিরিক্ত অর্থের কারণে খেজুর فاكهة থেকে খারিজ হয়ে যাবে।

মোটকথা যদি কথা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে খাছ করা হয় তাহলে পরিভাষায় তাকে تخصيص বলা হবে না এবং এর দ্বারা আ'ম জন্নী তথা সন্দেহজনক হবে না।

নুরুল আনওয়ার গ্রন্থকার বলেন- যদি কথার মাধ্যমে تخصيص করা হয় তবে তা ভিন্ন বাক্য না হয়। অর্থাৎ حكم এর ফায়েদা না দেয় তবে তাকেও পরিভাষায় تخصيص বলা হবে না। যেমন غايت দ্বারা تخصيص করা হলো: أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ এর মধ্যে صيام শব্দটি রাত-দিন শামিল করে। কিন্তু الى الليل দ্বারা صيام কে দিনের সাথে খাছ করা হয়েছে এবং রাতকে এর থেকে খারিজ করা হয়েছে। কাজেই এটা পরিভাষায় تخصيص হবে না।

এভাবে যদি শর্তের দ্বারা تخصيص হয় তাহলেও তা পারিভাষিক تخصيص হবে না। যেমন বলা হলো- أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ এর মধ্যে أَنْتِ طَالِقٌ আ'ম। কারণ যদি إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ না বলতো তাহলে সাথে সাথেই স্ত্রী তালাক হয়ে যেত। কিন্তু إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ বলে তালাককে ঘরে প্রবেশের সময়ের সাথে খাছ করা হয়েছে। এভাবে যদি استثنا এর দ্বারা تخصيص করা হয় তাহলে সেটাও পারিভাষিক تخصيص হবে না। যেমন বললো جَاءَنِيْ الْقَوْمُ اِلَّا زَيْدًا এর মধ্যে قوم শব্দটি আ'ম। তবে لا দ্বারা কওমের আফরাদের আগমন থেকে জায়েদের আগমনকে খারিজ করা হয়েছে। এভাবে যদি সিফাতের দ্বারা تخصيص করা হয় তাও পারিভাষিক تخصيص হবে না। যেমন في الابل السائمة زكوة হাদীসে ابل শব্দটি আ'ম। কিন্তু سائمة সিফাতের কারণে غير سائمة উটগুলোকে খারিজ করা হয়েছে।

হাশিয়া লেখক বলেন- ভিন্ন বাক্যকে غايت ইত্যাদি উল্লেখিত ৪ বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ করা ঠিক নয়। বরং পঞ্চম একটি প্রকার রয়েছে بدل البعض যেমন جَاءَنِي الْقَوْمُ اَكْثَرُهُمْ এর মধ্যে কওম শব্দটি আ'ম কিন্তু بدل البعض তথা اكثرهم শব্দ এসে তার কিছু সংখ্যক একককে খারিজ করে দিয়েছে। এটাও পারিভাষিক تخصيص নয়।

ব্যাখ্যাকার বলেন- মুখাসসিস যদি ভিন্ন বাক্য হয় তবে তা আ'মের সাথে মিলিত না হয় বরং পরে হয়। অর্থাৎ প্রথমে আ'ম উচ্চারণ করে। এরপর অন্য কোনো সময় মুখাসসিস উচ্চারণ করে। তাহলে তা تخصيص বিবেচিত হবে না। বরং নসখ বিবেচিত হবে। কারণ تخصيص এর জন্য কোনো বিষয়ের শুরুতেই আ'ম থেকে কিছু সংখ্যককে খাছ করার উদ্দেশ্য থাকা জরুরি। কিন্তু নসখের মধ্যে জরুরি নয়। আর পরবর্তী কোনো কথা দ্বারা تخصيص করলে তা যেহেতু নসখ গণ্য হয়। এ কারণে উলামায়ে আহনাফ এটাকে নসখ বলে থাকেন। এর পূর্ণ বিবরণ সামনে আসবে।

وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رح كُلُّ ذٰلِكَ يُسَمّٰى تخصيصًا لِاَنَّه عِنْدَه هُو قصرُ العامِّ على بَعْضِ الْمُسَمَّيَاتِ مُطلقًا وكثيرًا مَّا يُطلقُ التخصيصُ على الْمُتراخِيْ مَجازًا عِنْدَنا ايضًا - ونظيرُ الخُصوصِ المَعلوم والمَجهولِ قولُه تعالٰى وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا فَاِنَّ البيعَ لفظٌ عامٌّ لِدُخولِ اللامِ الجِنْسِيَّةِ وقد خَصَّ اللّٰهُ منهُ الربٰوا وهو في اللغةِ الفَضْلُ ولَمْ يُعْلَمْ اَيُّ فضلٍ يُراد بِه لِاَنَّ البَيْعَ لم يُشْرَعْ اِلَّا لِلْفَضْلِ فهُو حِيْنَئِذٍ نظيرُ الخُصوصِ المَجهول ثم بَيَّنَه النبيُّ عليه السلام بقولِه اَلْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ والمِلْحُ بالمِلْحِ والذَّهَبُ بالذَّهَبِ والفِضَّةُ بالفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ والفَضْلُ رِبٰوا فهو حينئذٍ نظيرُ الخصوصِ المَعلوم ولكن لَم يُعْلَمْ حَالُ ما سِوى الاشياءِ السِّتَّةِ البَتَّةَ - ولهٰذا قال عُمَرُ (رض) خَرَجَ النبيُّ ﷺ عَنَّا ولَمْ يُبَيِّنْ لنا اَبْوابَ الرِّبٰوا اي بَيانًا شافيًا فَاحْتاجُوا اِلَى التَّعليلِ وَالْاِسْتِنْباطِ فَعَلَّلَ ابُو حنيفةَ رح بِالقَدْرِ والجِنْسِ والشافِعيُّ رح بالطُّعْمِ والثَّمَنِيَّةِ ومَالِك رح بِالْاِقْتِيَاتِ وَالْاِدِّخار فعَمِلَ كُلٌّ بِمُقتَضٰى تَعْلِيْلِه في تحريمِ اشياءٍ وتحليلِ اشياءٍ على ما يَاتِيْ في بابِ القِياسِ اِنْ شاءَ اللّٰهُ تَعالٰى

অনুবাদ ॥ ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে তাকে تخصيص বলা হয়। কেননা তার নিকট تخصيص হলো عام কে কোন নির্দিষ্ট এককের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা। আমাদের (হানাফীদের) মতে, অনেক ক্ষেত্রেই রূপকার্থে متراخى বাক্যের ওপর تخصيص প্রয়োগ হয়।

خصوص المعلوم (জ্ঞাত খাস) ও خصوص المجهول (অজ্ঞাত খাস)-এর উদাহরণ হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا (আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন) البيع এর الف لام جنسى প্রবেশ করার কারণে তা হলো عام অথচ আল্লাহ তা'আলা তা হতে ربوا তথা সুদকে خاص করেছেন। ربوا শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো বাড়তি বা অতিরিক্ত। এই অতিরিক্ত দ্বারা কেমন অতিরিক্ত বুঝানো হয়েছে তা জানা যায়নি। কেননা, ব্যবসাও বৃদ্ধি তথা অতিরিক্তের জন্যে সূচিত হয়েছে। এ বিচারে তা خصوص المجهول (অজ্ঞাত খাস)-এর উদাহরণ হবে। অতঃপর নবী (স) তার বাণী দ্বারা তার বিশ্লেষণ করেছেন, তা হলো গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রূপার বিনিময়ে রূপা সমপরিমাণে এবং নগদ ক্রয়-বিক্রয় করবে। আর অতিরিক্ত গ্রহণ করা সুদ হবে। এ বিশ্লেষণের পর এটা خصوص المعلوم জ্ঞাত খাস এর উদাহরণ হবে।

অবশ্য হাদীসে উল্লেখিত ছয়টি বস্তু ব্যতীত বাকি অন্যান্য বস্তুর অবস্থা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। এজন্যে হযরত উমর (রা) বলেছিলেন যে, রাসূল (স) আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন, কিন্তু আমাদের জন্যে সুদের পরিপূর্ণ বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে গেলেন না। এ কারণে ইমামগণ ইল্লত নির্ধারণ ও মাসআলা বের করার প্রতি মুখাপেক্ষী হয়েছেন। ইমাম আবু হানীফা (র) ইল্লত নির্ধারণ করেছেন, قدر (পরিমাপ) এবং جنس (জাতীয়তা)কে, ইমাম শাফেয়ী (র) طعام (খাদ্যজাত) ও ثمن কে আর ইমাম মালেক اِقْتِيَات ও اِدِّخَار (গুদামজাতযোগ্য হওয়া)কে। সারকথা প্রত্যেক ইমামই হাদীসে বর্ণিত বস্তু ব্যতীত অপরাপর বস্তুসমূহের تحليل ও تحريم এর ক্ষেত্রে নিজ নিজ ইল্লত অনুযায়ী আমল করেছেন, আল্লাহ চাহে তো কিয়াস অধ্যায়ে এর বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন– মুখাসসিস যদি বাক্য ছাড়া অন্যকিছু হয় অথবা বাক্য তবে তা ভিন্ন বাক্য কিংবা ভিন্ন নয় তবে পরবর্তীকালে উচ্চারিত এ সকল ক্ষেত্রে এটাকে تخصيص-ই বলা হবে। কারণ ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে تخصيص বলা হয় মুতলাকভাবে আ'মকে তার কিছু সংখ্যক এককের উপর সীমাবদ্ধ করাকে ; চাই তা ভিন্ন বাক্য দ্বারা হোক এবং পরবর্তীকালে হোক বা বাক্য ছাড়া অন্যকিছু হোক।

মোল্লা জুয়ুন (র) বলেন– প্রায় সময় আমাদের অর্থাৎ হানাফীদের কাছেও মাজাযভাবে বিলম্বের উপরও تخصيص প্রয়োগ করা হয়। যেমন বলা হয় অমুক আয়াতকে অমুক আয়াত থেকে খাছ করা হয়েছে। অথচ মুখাসসিস আয়াতটি প্রথম আয়াতের সাথে মিলিত হয়নি। কোথাও কিতাবুল্লাহকে সুন্নাহ দ্বারাও খাছ করা হয়েছে। অথচ উভয়ের কাল এক নয়।

قوله ونَظِيرُ الْخُصُوصِ الْمَعْلُومِ الخ : ব্যাখ্যাকার বলেন– مخصص مجهول ও مخصص معلوم এর দৃষ্টান্ত আল্লাহ তা'আলার বাণী احل الله البيع وحرم الربوا -তা এভাবে যে, আয়াতে البيع শব্দটি লামে জিনসের কারণে আ'ম তথা ব্যাপকতা বোধক। এটা সবধরনের বেচা-কেনা হালাল বোঝায়। কিন্তু حرم الربوا বলার দ্বারা এ থেকে সুদকে খাছ করা হয়েছে। অর্থাৎ সুদ হালাল নয়। আর অভিধানে ربوا এর অর্থ হলো অতিরিক্ত বা বর্ধিত বস্তু। কিন্তু আয়াতে এর দ্বারা কোন ধরনের অতিরিক্ত উদ্দেশ্য তা অজানা রয়েছে। কারণ অতিরিক্ত তথা লাভের জন্যই বেচা-কেনা হয়ে থাকে। এ কারণে এ 'অতিরিক্ত' বিষয়টি অনির্দিষ্ট বা অজ্ঞাত। আর وحرم الربوا বর্ণনার পূর্বে এটা মাজহূল বা অজ্ঞাত মুখাসসিস এর দৃষ্টান্ত হবে। এরপর রাসূলুল্লাহ (স) কিছুটা বিশ্লেষণের সাথে এর বর্ণনা দিয়েছেন। ৬টি বস্তু গম, যব, খেজুর, লবণ, সোনা ও রুপার ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন যে, এগুলোর বেচা-কেনা যদি সমজাতীয় বস্তুর বিনিময়ে হয় তাহলে সমপরিমাণে হওয়া শর্ত এবং উভয় বিনিময় বেচা-কেনার মজলিসেই করায়ত্ত করাও শর্ত। যেমন مِثْلاً بِمِثْلٍ ও يَدًا بِيَدٍ দ্বারা প্রতিভাত হয়। অতএব এ হাদীস বর্ণিত হওয়ার পরে أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا এর জন্য معلوم তথা জ্ঞাত মুখাসসিসের দৃষ্টান্ত হবে।

ব্যাখ্যাকার বলেন– হাদীসে যেহেতু ৬টি জিনিসের উল্লেখ রয়েছে। এ কারণে এ ৬টি ছাড়া অন্যান্য বস্তুর ব্যাপারে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। এ কারণেই হযরত ওমর (রা) রাসূলুল্লাহ (স) এর তিরোধানের পরে বলেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) তো চলে গেলেন। অথচ সুদের মাসআলা পূর্ণ-স্পষ্টভাবে বর্ণিত হলো না। এ কারণেই সুদের মাসআলার ক্ষেত্রে ইমামগণ তার ইল্লত বের করার ব্যাপারে বিভিন্নরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।

ربوا এর ইল্লতে ইমামগণের মতভেদ :

ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন– সুদের ইল্লত হলো কদর, (পরিমাপ) এবং জিনস (জাতীয়তা)। অর্থাৎ জিনস যদি পরিমাপের সাথে একত্রিত হয় বা ওজনের সাথে একত্রিত হয় তাহলে অতিরিক্ত অংশ হারাম হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন– সুদের ইল্লত হলো খাদ্য জাতীয় দ্রব্যে খাদ্য জাতীয় হওয়া এবং সোনারুপার মধ্যে ثمنيت বা মূল্য জাতীয় হওয়া। সুতরাং লোহাকে লোহার বিনিময়ে কমবেশি বিক্রি করা তার মতে জায়েয। কারণ এর মধ্যে طُعم ও ثمنيت কোনোটিই নেই। কিন্তু হানাফীগণের মতে নাজায়েয। কারণ লোহা পরিমাপীয় বস্তুর অন্তর্গত। সুতরাং সুদের ইল্লত তথা جنس وقدر বিদ্যমান রয়েছে। তবে ১টি ডিম ২টি ডিমের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় আমাদের মতে জায়েয। কারণ এর মধ্যে قدر বিদ্যমান নেই। কিন্তু শাফেয়ী (র) এর মতে নাজায়েয। কারণ তার মতে সুদের ইল্লত طُعم এখানে বিদ্যমান রয়েছে।

ইমাম মালিক (র) বলেন– সুদের ইল্লত হলো اِقْتِيَات ও اِدِّخَار অর্থাৎ খাদ্যজাত হওয়া এবং গুদামজাতযোগ্য হওয়া। অন্যথায় কমবেশি বিনিময় নাজায়েয হবে না। অতএব তরমুজ ইত্যাদি ফল যা শুকিয়ে গুদামজাত করা যায় না। এর মধ্যে যদিও একই জিনস পাওয়া যায় তথাপি তার মতে ১টি তরমুজকে ২টি তরমুজের বিনিময়ে বিক্রি করা জায়েয।

মোটকথা ইমামগণ সুদের ইল্লত বের করে প্রত্যেকে নিজ নিজ ইল্লত অনুযায়ী আমল করেছেন। এর বিস্তারিত বর্ণনা কিয়াস অধ্যায়ে আসবে ইনশাআল্লাহ।

عَمَلاً لِشِبْهِ الْاِسْتِثْنَاءِ، وَالنَّسْخِ تَعْلِيْلٌ لِمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ وَبَيَانُه اَنَّ دَلِيْلَ التَّخْصِيْصِ وَهُوَ قَوْلُه تَعَالٰى حَرَّمَ الرِّبٰوا يُشْبِهُ الْاِسْتِثْنَاءَ بِاعْتِبَارِ حُكْمِه وَهُوَ اَنَّ الْمُسْتَثْنٰى كَمَا لَمْ يَدْخُلْ فِيْمَا قَبْلُ كَذٰلِكَ الْمَخْصُوْصُ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ الْعَامِّ - وَيُشْبِهُ النَّاسِخَ بِاعْتِبَارِ صِيْغَتِه وَهُوَ اَنَّ صِيْغَتَه مُسْتَقِلَّةٌ كَالنَّاسِخِ فَيَجِبُ عَلَيْنَا اَنْ نُرَاعِيَ كِلَا الشِّبْهَيْنِ وَنُوَفِّرَ حَظَّ كُلٍّ مِّنْهُمَا عَلٰى تَقْدِيْرِ كَوْنِ الْخُصُوْصِ مَعْلُوْمًا وَمَجْهُوْلًا لَا اَنْ نَقْتَصِرَ عَلَى الشِّبْهِ الْاَوَّلِ كَمَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ اَهْلُ الْمَذْهَبِ الثَّانِيْ وَلَا اَنْ نَقْتَصِرَ عَلَى الشِّبْهِ الثَّانِيْ كَمَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ اَهْلُ الْمَذْهَبِ الثَّالِثِ - فَقُلْنَا اِذَا كَانَ دَلِيْلُ الْخُصُوْصِ مَعْلُوْمًا فَرِعَايَةُ شِبْهِ الْاِسْتِثْنَاءِ تَقْتَضِيْ اَنْ يَّبْقَى الْعَامُّ قَطْعِيًّا عَلٰى حَالِه لِاَنَّ الْمُسْتَثْنٰى اِذَا كَانَ مَعْلُوْمًا كَانَ الْمُسْتَثْنٰى مِنْهُ فِي الْاَفْرَادِ الْبَاقِيَةِ عَلٰى حَالِه وَرِعَايَةُ شِبْهِ النَّاسِخِ تَقْتَضِيْ اَنْ لَّا يَصِحَّ الْاِحْتِجَاجُ بِالْعَامِّ اَصْلًا - لِاَنَّ النَّاسِخَ مُسْتَقِلٌّ وَكُلُّ مُسْتَقِلٍّ يَقْبَلُ التَّعْلِيْلَ وَاِنْ لَمْ يَقْبَلِ النَّاسِخُ بِنَفْسِه التَّعْلِيْلَ لِئَلَّا تَلْزَمَ مُعَارَضَةُ التَّعْلِيْلِ النَّصَّ وَاِذَا قَبِلَ التَّعْلِيْلَ فَلَا يُدْرٰى كَمْ يَخْرُجُ بِالتَّعْلِيْلِ وَكَمْ بَقِيَ فَيَصِيْرُ مَجْهُوْلًا وَجَهَالَتُه تُؤَثِّرُ فِيْ جَهَالَةِ الْعَامِّ فَلِرِعَايَةِ الشِّبْهَيْنِ جَعَلْنَا الْعَامَّ بَيْنَ بَيْنَ وَقُلْنَا لَا يَبْقٰى قَطْعِيًّا وَلٰكِنْ يَصِحُّ التَّمَسُّكُ بِه .

অনুবাদ ॥ "এটা استثناء ও نسخ এর সাদৃশ্যের অনুযায়ী আমল করে", এটা পছন্দনীয় মাযহাবের ইল্লত। এর বর্ণনা এই যে, تخصيص এর দলিল হল আল্লাহর বাণী- وحرم الربوا (আর তিনি ربوا-কে হারাম করেছেন) হুকুমের দৃষ্টিকোণ হতে এটা استثناء এর সাথে সাদৃশ্য রাখে, আর তা হলো مستثنى যদ্রূপ مستثنى منه এর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হয় না, তেমনি مخصوص (যাকে খাস করা হয়েছে তা)ও عام এর অধীনে শামিল হয় না।

আর صيغة (শব্দরূপ)- এর দিক দিয়ে ناسخ-এর অনুরূপ। আর তা (مخصص) এই যে, এর صيغة (শব্দরূপটা) ناسخ এর ন্যায় স্বতন্ত্র। সুতরাং আমাদের উপর উভয় সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক এবং প্রত্যেকটির সম্পূর্ণ হক বা প্রাপ্য আদায় করা অত্যাবশ্যক। চাই مخصص জ্ঞাত হোক বা অজ্ঞাত হোক। সুতরাং আমরা তাকে প্রথম تشبيه-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করার পক্ষপাতী নই, যেরূপ দ্বিতীয় মাযহাবের অনুসারীগণ করেছেন। আমরা দ্বিতীয় তাশবীহ এর মধ্যেও সীমাবদ্ধ করবো না, যদ্রূপ তৃতীয় মাযহাবের অনুসারীরা করেছেন। অতএব আবার বলে থাকি যে, যখন تخصيص এর দলিল জানা থাকবে, তখন استثناء এর সাদৃশ্য কামনা করবে যে, عام স্বীয় অবস্থায় قطعى (অকাট্য) হিসেবে বহাল থাকুক। কারণ, مستثنى জানা থাকলে مستثنى منه তার অবশিষ্ট এককের মধ্যে বহাল থেকে যাবে। পক্ষান্তরে ناسخ এর সাদৃশ্য কামনা করে যে, عام দ্বারা দলিল পেশ করা মোটেই সহীহ না হোক।

কেননা ناسخ হলো مستقل বা স্বয়ংসম্পূর্ণ, আর প্রত্যেক مستقل বিষয় তা'লীল গ্রহণ করে। যদিও ناسخ নিজে তা'লীল গ্রহণ করে না। যাতে করে তা'লীলের সাথে نص তথা দলিলের বিরোধ অনিবার্য না হয়ে পড়ে। আর مخصوص যখন তা'লীল কবুল করবে, তখন একথা জানা থাকে না যে, কি পরিমাণ একক বের হবে, আর কি পরিমাণ একক অবশিষ্ট থাকবে। সুতরাং مخصوص এর দলিল অজ্ঞাত হয়ে পড়বে। আর দলিলের অজ্ঞতা আমের অজ্ঞতার মাঝে প্রভাব ফেলবে। তাই আমরা উভয় সাদৃশ্যের বিবেচনায় عام কে মধ্যবর্তী পর্যায়ে রেখেছি এবং বলেছি যে, এ অবস্থায় عام অকাট্য থাকবে না। তবে তার দ্বারা দলিল পেশ করা বৈধ হবে। আর যখন خاص করণের দলিল অজ্ঞাত হবে, তখন জ্ঞাত বিষয়ের বিপরীত পাল্টে যাবে। অর্থাৎ استثناء এর সাদৃশ্যের বিবেচনা এই কামনা করে যে, عام দ্বারা দলিল পেশ মোটেই শুদ্ধ না হোক। কেননা, مستثنى এর অজ্ঞতা مستثنى منه এর অজ্ঞতার মধ্যে প্রভাব ফেলে। আর বস্তুর অজ্ঞতা কারো উপকার দেয় না।

পক্ষান্তরে ناسخ -এর সাদৃশ্যতা عام অকাট্য হিসেবে অবশিষ্ট থাকা কামনা করে। কেননা অজ্ঞাত ناسخ নিজেই বাদ পড়ে যায়। সুতরাং উভয় সাদৃশ্যের বিবেচনায় আমরা এখানেও عام কে মাঝামাঝি পর্যায় স্থান দিয়েছি এবং বলেছি যে, عام আর অকাট্য থাকবে না। তবে তা দিয়ে দলিল গ্রহণ করা যাবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله عَمَلاً بِشِبْهِ الْاِسْتِثْنَاءِ الخ : ব্যা খ্যাকার বলেন– মতনের ভাষা عملا لشبه الاستثناء والنسخ প্রথম মাযহাব (যা আমাদের নিকট পছন্দনীয় এর দলিল)

দলিলের সার : মুখাসসিস অর্থাৎ সুদ সম্পর্কীয় আল্লাহ তা'আলার বাণী حرم الربوا। হুকুমের দিক দিয়ে ইস্তেসনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর সীগার দিক দিয়ে নাসিখের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

হুকুমের দিক দিয়ে ইস্তেসনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এ কারণে যে, মুসতাসনা যেভাবে মুসতাসনা মিনহুর হুকুমে দাখিল থাকে না। তদ্রূপ মাখসুস তথা যে আফরাদকে খাছ করা হয় তা আ'মের হুকুমের মধ্যে দাখিল থাকে না। আর সীগার দিক দিয়ে নাসিখের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এ কারণে যে, যেভাবে নাসিখের শব্দ ভিন্ন হয় তদ্রূপ মুখাসসিসের শব্দও ভিন্ন হওয়া জরুরি।

মোটকথা مخصص ইস্তেসনা এবং নাসিখ উভয়ের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। অতএব উভয়ের উপর আমল করা জরুরি। মুখাসসিস নির্দিষ্ট হোক বা অনির্দিষ্ট হোক উভয় ক্ষেত্রে উভয়কে সমানভাবে অধিকার দিতে হবে। শুধু ইস্তেসনার সামঞ্জস্যতার উপর যথেষ্ট করা যাবে না। যেমন– দ্বিতীয়পক্ষ করে থাকেন। তাদের মতে عام مخصوص منه البعض দলিলযোগ্যই থাকে না। এভাবে তৃতীয় মাযহাবের মতালম্বীগণ বলেন– যে তাখসীসের পরেও আ'ম অকাট্য থাকে। তারা কেবল নাসিখের সামঞ্জস্যতার উপর যথেষ্ট করেন। মোটকথা আমাদের মতে উভয় সামস্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরি। এ কারণে আমরা বলে থাকি যে, যদি دليل خصوص তথা মুখাসসিস নির্দিষ্ট থাকে তাহলে ইস্তেসনার সামঞ্জস্যতার দাবী এই যে, আ'ম তাখসীসের পরেও অকাট্য থাকবে। যেমন পূর্বে ছিলো। কারণ মুসতাসনা যদি জানা থাকে তাহলে মুসতাসনা মিনহু বাকী আফরাদের মধ্যে পূর্বের অবস্থায় قطعى الدلالت থাকবে। এভাবে মাখসুসও যখন জানা থাকবে তখনো আ'ম তার বাকী আফরাদের ক্ষেত্রে قطعى الدلالت থাকবে।

আর নাসিখের সাথে সামঞ্জস্যতার দাবি এই যে, তাখসীস করার পরে আ'ম দলিলযোগ্য থাকবে না। কারণ নাসিখ مستقل تام হয়ে থাকে। আর সকল مستقل তা ইল্লতকে কবুল করে। কারণ শরীআতের বিধানে নীতি এই যে, তা معلل হবে।

মোটকথা যখন প্রত্যেক مستقل تام ইল্লত কবুল করে, আর নাসিখও مستقل تام সুতরাং নাসিখও ইল্লত কবুল করবে। মুখাসসিস যেহেতু নাসিখের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। এ কারণে মুখাসসিসও ইল্লত কবুল করবে। এক্ষেত্রে এটা জানা যাবে না যে, ইল্লতের কারণে আ'মের অধীন থেকে কত সংখ্যক একক বের হয়েছে এবং কি পরিমাণ বাকী রয়েছে। এটা অজানা হওয়ার কারণে মুখাসসিস অজানা থেকে গেলো। আর মুখাসসিস অজানা থাকা আ'ম অজানার ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল হবে। অর্থাৎ সেটাও অজানা হয়ে যাবে। আর অজানা বস্তু দ্বারা দলিল পেশ করা গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব তাখসীসের পরেও আ'ম দ্বারা দলিল পেশ করা গ্রহণযোগ্য হবে না।

মোটকথা مخصص معلوم ইস্তেসনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া এ বিষয়ের দাবি করে যে, তাখসীসের পরে আ'ম قطعى الدلالت বহাল থাকুক। আর নাসিখের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া এ বিষয়ের দাবি করে যে, তা দলিলযোগ্য না হোক। এ কারণে আমরা عام مخصوص منه لبعض কে মাঝামাঝি সাব্যস্ত করি এবং বলে থাকি যে, তাখসীসের পরে আ'ম قطعى الدلالت থাকবে না। তবে তা দ্বারা দলিল পেশ করা গ্রহণযোগ্য এবং তার উপর আমল করা ওয়াজিব হবে।

قوله لِاَنَّ النَّاسِخَ مُسْتَقِلٌّ الخ : নূরুল আনওয়ার গ্রন্থকার বলেন- নাসিখ শব্দ যেহেতু স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়। এ কারণে তা সীগার দিক দিয়ে তা'লীল কবুল করে। তবে বিধানের দিক দিয়ে তা'লীল কবুল করে না। কারণ নাসিখের বিধান এই যে, তা সাব্যস্ত হওয়ার পরে কোনো বিধানকে معارضة স্বরূপ উঠিয়ে দেয়া। আর তা'লীল যেহেতু নস থেকে নিম্নমানের হয়। এ কারণে তা'লীল নস এর প্রতিদ্বন্দ্বী বা সাংঘর্ষিক হতে পারে না। এ কারণে তা নসকে মানসূখ করতে পারে না। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, নাসিখ সত্তাগতভাবে অর্থাৎ হুকুমের দিকদিয়ে তা'লীল কবুল করে না। ব্যাখ্যাকার এটাকেই বলেছেন যে, নাসিখ সীগার দিক দিয়ে مستقل (স্বয়ং সম্পূর্ণ) হওয়ার কারণে তা'লীল গ্রহণ করে না। যদিও প্রকৃতভাবে তা'লীল কবুল করে না। যাতে নসের সাথে সাংঘর্ষিকতা জরুরি না হয়।

মোল্লা জুয়ুন (র) বলেন- মুখাসসিস যদি অজ্ঞাত হয় তাহলে ইস্তেসনার সাথে সামঞ্জস্যতা এ বিষয়ের দাবি করে যে, তাখসীসের পরে আ'ম দ্বারা দলিল গ্রহণ করা সম্পূর্ণ অবৈধ হোক। কারণ মুসতাসনা অজ্ঞাত হওয়া মুসতাসনা মিনহু অজ্ঞাত হওয়ার মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়। অর্থাৎ তা অজ্ঞাত হয়ে যায়। আর অজ্ঞাত বস্তু কোনো কিছুর ফায়েদা দিতে পারে না। সুতরাং মুখাসসিস অজানা থাকার দ্বারা যে আ'ম থেকে কিছু সংখ্যককে খাছ করা হয় তাও অজ্ঞাত হয়ে যায়। অতএব তাখসীসের পরে আ'মও حكم এর ফায়েদা দিবে না। এবং তা দ্বারা দলিল গ্রহণ করা বৈধ হবে না।

নাসিখের সাথে সামঞ্জস্যতা এ বিষয়ের দাবি করে যে, তাখসীসের পরে আ'ম قطعى এর উপর বহাল থাকুক। অতএব আমরা উভয় সামঞ্জস্যতার উপর আমল করি এবং এ কথা বলি যে, তাখসীসের পরে আ'ম অকাট্য থাকে না। তবে তা দলিলযোগ্য থাকে।

পছন্দনীয় মতের উল্লেখিত দলিলের উপর একটি প্রশ্ন এই যে, ২টি কিয়াসের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে মুজতাহিদ যে কোনো একটির উপর আমল করার এখতিয়ার রাখে। উভয়ের উপর আমল করা জরুরি হয় না। কাজেই এখানেও কোনো একটির উপর আমল করা মুনাসিব। যেমন দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাযহাবের অনুসারীগণ একেকটির উপর আমল করেছেন।

এর উত্তর এই যে, এই বিধান ঐ কিয়াসের ক্ষেত্রে যা কিতাবুল্লাহ, সুন্নাহ ও ইজমা থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। কিয়াসে শিবহীর মধ্যে যা শরয়ী কোনো দলিল নয় তার মধ্যে এটা কার্যকর নয়। কারণ এখানে যে কিয়াস করা হয়েছে তা কিয়াসে শিবহীর অন্তর্গত।

فَصَارَ كَمَا إِذَا بَاعَ عَبْدَيْنِ بِأَلْفٍ عَلٰى أَنَّه بِالْخِيَارِ فِىْ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِه وَسَمّٰى ثَمَنَهُ تَشْبِيْهُ لِدَلِيْلِ الْخُصُوْصِ الْمَذْكُوْرِ بِمَسْأَلَةٍ فِقْهِيَّةٍ اى صَارَ دَلِيْلُ الْخُصُوْصِ عَلٰى هٰذَا الْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ نَظِيْرُ هٰذِه الْمَسْأَلَةِ الْفِقْهِيَّةِ هِى اَنْ يُعَيِّنَ الْخِيَارَ فِىْ اَحَدِ الْعَبْدَيْنِ الْمَبِيْعَيْنِ وَسَمّٰى ثَمَنَهُ عَلٰى حِدَةٍ وَذٰلِكَ لِاَنَّ هٰذِه الْمَسْأَلَة عَلٰى اَرْبَعَةِ اَوْجُهٍ اَحَدُهَا اَنْ يُعَيِّنَ مَحَلَّ الْخِيَارِ وَيُسَمّٰى ثَمَنَه وَالثَّانِىْ اَنْ لَا يُعَيِّنَ وَلَا يُسَمّٰى وَالثَّالِثُ اَنْ يُعَيِّنَ وَلَا يُسَمّٰى وَالرَّابِعُ اَنْ يُسَمّٰى وَلَا يُعَيِّنَ -

فَالْعَبْدُ الَّذِىْ فِيْهِ الْخِيَارُ دَاخِلٌ فِى الْعَقْدِ غَيْرُ دَاخِلٍ فِى الْحُكْمِ فَمِنْ حَيْثُ اَنَّهُ دَاخِلٌ فِى الْعَقْدِ يَكُوْنُ رَدُّ الْمَبِيْعِ بِخِيَارِ الشَّرْطِ تَبْدِيْلاً فَيَكُوْنُ كَالنَّسْخِ وَمِنْ حَيْثُ اَنَّهُ غَيْرُ دَاخِلٍ فِى الْحُكْمِ يَكُوْنُ رَدُّه بَيَانُه اَنَّه لَمْ يَدْخُلْ فَيَكُوْنُ كَالْاِسْتِثْنَاءِ فَيَكُوْنُ كَالْمُخَصِّصِ الَّذِىْ لَهُ شِبْهٌ بِالْاِسْتِثْنَاءِ وَشِبْهٌ بِالنَّسْخِ فَرِعَايَةُ شِبْهِ النَّسْخِ تَقْتَضِى صِحَّةَ الْبَيْعِ فِى الصُّوَرِ الْاَرْبَعِ لِاَنَّ كُلًّا مِنَ الْعَبْدَيْنِ بِالنَّظَرِ اِلَى الْاِيْجَابِ مَبِيْعٌ بِبَيْعٍ وَاحِدٍ فَلَا يَكُوْنُ بَيْعًا بِالْحِصَّةِ اِبْتِدَاءً بَلْ بَقَاءً، وَرِعَايَةُ شِبْهِ الْاِسْتِثْنَاءِ تَقْتَضِى فَسَادَ الْبَيْعِ فِى الصُّوَرِ الْاَرْبَعِ لِجَعْلِ مَالَيْسَ بِمَبِيْعٍ شَرْطًا لِقَبُوْلِ الْمَبِيْعِ. فَلِرِعَايَةِ الشِّبْهَيْنِ قُلْنَا اِنْ عُلِمَ مَحَلُّ الْخِيَارِ وَثَمَنُه وَهُوَ الْمَذْكُوْرُ فِى الْمَتْنِ صَحَّ الْبَيْعُ لِشِبْهِ النَّاسِخِ - وَلَمْ يُعْتَبَرْ هٰهُنَا جَعْلُ قَبُوْلِ مَالَيْسَ بِمَبِيْعٍ شَرْطًا لِقَبُوْلِ الْمَبِيْعِ كَمَا اُعْتُبِرَ اِذَا جُمِعَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَفَصَّلَ الثَّمَنَ لِاَنَّ الْحُرَّ لَمْ يَكُنْ مَحَلًّا لِلْبَيْعِ -وَاشْتِرَاطُ قَبُوْلِه لَيْسَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْعَقْدِ وَ فِىْ مَسْأَلَتِنَا الْعَبْدُ الَّذِىْ فِيْهِ الْخِيَارُ دَاخِلٌ فِى الْعَقْدِ فَلَا يَكُوْنُ ضَمُّه مُخَالِفًا لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَاِنْ جُهِلَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا لَا يَصِحُّ لِشِبْهِ الْاِسْتِثْنَاءِ فَفِىْ صُوْرَةِ جَهْلِ كِلَيْهِمَا يَصِيْرُ كَاَنَّهُ قَالَ بِعْتُ هٰذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ بِاَلْفٍ اِلَّا اَحَدَهُمَا بِحِصَّةِ ذٰلِكَ وَذٰلِكَ بَاطِلٌ وَفِىْ صُوْرَةِ جَهْلِ الْمَبِيْعِ يَصِيْرُ كَاَنَّهُ قَالَ بِعْتُ هٰذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ بِاَلْفٍ اِلَّا اَحَدَهُمَا بِخَمْسِ مِائَةٍ وَفِىْ صُوْرَةِ جَهْلِ الثَّمَنِ يَصِيْرُ كَاَنَّهُ قَالَ بِعْتُهُمَا بِاَلْفٍ اِلَّا هٰذَا بِحِصَّةٍ مِنَ الْاَلْفِ وَلَمْ يُعْتَبَرْ فِىْ هٰذِه الصُّوَرِ شِبْهُ النَّاسِخِ لِاَنَّ النَّاسِخَ الْمَجْهُوْلَ يَسْقُطُ بِنَفْسِه فَيَبْطُلُ شَرْطُ الْخِيَارِ وَيَلْزَمُ الْعَقْدُ فِى الْعَبْدَيْنِ وَهُوَ خِلَافُ مَا قَصَدَه الْقَائِلُ -

অনুবাদ ॥ *"সুতরাং এর উদাহরণ এরূপ হলো যে, যখন দুটি গোলাম এক হাজার দিরহামে এই শর্তে বিক্রি করা হলো যে, দুটির নির্দিষ্ট একটিতে এখতিয়ার থাকবে, আর গোলামের মূল্য উল্লেখ থাকবে"*। এ ইবারতে উল্লেখিত خصوص এর দলিলকে একটি ফিকহী মাসআলার সাথে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, পছন্দনীয় মাযহাব অনুযায়ী خصوص এর দলিল এ ফিকহী মাসআলার তুল্য হয়েছে।

মাসআলাটি এই যে, যদি কেউ বিক্রিত দুটি গোলামের মধ্য হতে একটির মধ্যে خيار কে নির্দিষ্ট করে দেয় এবং পৃথকভাবে তার মূল্যও নির্ধারণ করে। আর তা এজন্যে যে, এই মাসআলাটির মোট চারটি সূরত রয়েছে। যথা–

১. محل خيار ও মূল্য নির্দিষ্ট হবে।

২. محل خيار ও মূল্য কিছুই নির্ধারণ করা হবে না।

৩. محل خيار নির্দিষ্ট হবে তবে মূল্য নির্দিষ্ট হবে না।

৪. محل خيار এর নির্দিষ্ট তবে محل বা ক্ষেত্র নির্দিষ্ট হবে না।

৩৫৫. অনুবাদ ॥ অতএব যে গোলামের মধ্যে خيار রাখা হয়েছে তা عقد বা চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে, তবে হুকুমের বহির্ভূত থাকবে। কাজেই عقد এর মধ্যে দাখিল হিসেবে خيار এর শর্তের দ্বারা مبيع কে ফেরত দেয়ার অর্থ হবে চুক্তিতে পরিবর্তন করা। সুতরাং তা نسخ এর মতো হবে। আর গোলাম হুকুমের মধ্যে দাখিল না হওয়ার দিক বিবেচনায় مبيع কে ফেরত দেয়া এ কথার বর্ণনা বুঝাবে যে, তা অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং তা استثناء এর সদৃশ্য হবে। সুতরাং এটা ঐ مخصص এর উদাহরণ হবে যা, استثناء এবং فسخ সদৃশ্য। অতএব شبه نسخ এর বিবেচনায় তা চার অবস্থায় বিক্রি শুদ্ধ হওয়াকে কামনা করে। কেননা ايجاب তথা প্রস্তাবের প্রতি দৃষ্টি দিলে দু গোলামের প্রত্যেকটাই একই বিক্রি দ্বারা বিক্রি হয়েছে বোঝা যায়। কাজেই প্রাথমিক অবস্থায় এটা بيع الحصة হবে না। বরং বহাল থাকা বিবেচনায় بيع بالحصة হবে। পক্ষান্তরে استثناء এর সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য করলে চারো অবস্থায় বিক্রি অশুদ্ধ হওয়ার কামনা করে। কেননা যা مبيع নয়, তাকে مبيع হিসেবে গ্রহণ করার শর্তারোপ করা হয়েছে। তাই উভয় তাশবীহ এর বিবেচনা করে আমরা বলি যে, যদি خيار -এর محل ও মূল্য জানা থাকে তাহলে ناسخ-এর সদৃশ্য হওয়ার কারণে বিক্রি শুদ্ধ হবে, যা মূল কিতাবে উদ্ধৃত রয়েছে। আর এখানে যা مبيع নয় তাকে مبيع হিসেবে কবুল করার শর্ত গ্রহণযোগ্য হবে না। যেভাবে ঐ স্থলে ধর্তব্য হয়েছিল যখন আযাদকে ও গোলামকে একত্রিত করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটির মূল পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা স্বাধীন ব্যক্তি বিক্রয়ের বস্তু বা পণ্য নয়।

আর তা গ্রহণ করার শর্ত عقد এর চাহিদার অন্তর্ভুক্ত নয়। অথচ আমাদের আলোচ্য মাসআলায় যে গোলামের মধ্যে خيار রয়েছে সে চুক্তির অন্তর্ভুক্ত। তাই তাকে عقد এর সাথে যুক্ত করলে তা عقد এর চাহিদার পরিপন্থী হবে না। আর যদি দুটোর একটি অথবা উভয়টি অজ্ঞাত থাকে, তা হলে استثناء এর সাথে সাদৃশ্য হওয়ার কারণে বিক্রি শুদ্ধ হবে না।

সুতরাং মূল্যও محل خيار উভয়টি অজ্ঞাত থাকা অবস্থায় মাসআলাটি এমন হবে যে, বিক্রেতা বললো, بِعْتُ هٰذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ بِأَلْفٍ إِلَّا أَحَدَهُمَا بِحِصَّةِ ذٰلِكَ আমি এ দুটি গোলাম এক হাজার টাকায় বিক্রি করলাম, তবে একটি তার অংশ হারে (বিক্রি করলাম না)। সুতরাং এ বিক্রি বাতিল হবে। আর কেবল

مبيع তথা বিক্রিত মাল অজ্ঞাত থাকা অবস্থায় সে (বিক্রেতা) বললো- بِعْتُ هٰذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ بِالْفٍ اِلَّا اَحَدَهُمَا بِخَمْسِ مِائَةٍ আমি এ দুটি গোলাম এক হাজার টাকায় বিক্রি করলাম, তবে দুটির একটি পাঁচশত টাকার বিনিময়ে (বিক্রয় করলাম না)। মূল্য অজ্ঞাত থাকার সূরত এমন হবে যে, সে (বিক্রেতা) বললো, بِعْتُهُمَا بِالْفٍ اِلَّا هٰذَا بِحِصَّةٍ مِنَ الْاَلْفِ অর্থাৎ আমি তোমার নিকট এ দুটোকে এক হাজারের বিনিময়ে বিক্রি করলাম, তবে এটি এক হাজারের অংশের অনুপাতে (বিক্রি করলাম না), উপরোক্ত অবস্থাগুলো نسخ তথা রহিতকরণের সাদৃশ্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় নি। কেননা অজ্ঞাত ناسخ নিজের থেকেই বাদ পড়ে যায়। সুতরাং خيار এর শর্ত বাতিল হয়ে যাবে এবং উভয় গোলামের মধ্যে عقد অত্যাবশ্যক হয়ে যাবে। অথচ তা বক্তা (বিক্রেতা)র উদ্দেশ্যের পরিপন্থী।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله فَصَارَ كَمَا اِذَا بَاعَ عَبْدَيْنِ الخ : ব্যাখ্যাকার বলেন– মতনের ফিকহী মাসআলা পছন্দনীয় মাযহাবের ভিত্তিতে মুখাসসিসের দৃষ্টান্ত নাকি মুখাসসিস উক্ত মাসআলার দৃষ্টান্ত?

মাসআলা এই যে, এক ব্যক্তি ১ হাজার টাকার বিনিময়ে এই শর্তে ২টি গোলাম ক্রয় করলো যে, তাদের একজনের ব্যাপারে বিক্রেতার ৩ দিন পর্যন্ত এখতিয়ার থাকবে। এ বেচাকেনার মধ্যে প্রত্যেকের মূল্য উল্লেখ করলো।

ব্যাখ্যাকার বলেন– এ মাসআলাটির ৪টি সূরত হতে পারে।

১. محل خيار নির্দিষ্ট হবে এবং তার মূল্যও উল্লেখিত হবে। অর্থাৎ এক ব্যক্তি বললো আমি ওয়াসিফ এবং আরিফ উভয় গোলামকে একই বিক্রির অধীনে ১ হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রি করলাম। তাদের প্রত্যেকের মূল্য ৫০০ টাকা তবে শর্ত এই যে, আরিফের ব্যাপারে আমার ৩ দিন পর্যন্ত এখতিয়ার থাকবে।

২. محل خيار নির্দিষ্ট হবে না এবং মূল্যও উল্লেখিত হবে না। যেমন এক ব্যক্তি বললো আমি ওয়াসিফ ও আরিফকে ১ হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রি করলাম এ শর্তে যে, তাদের ১ জনের ব্যাপারে আমার ৩ দিনের এখতিয়ার থাকবে।

৩. محل خيار নির্দিষ্ট তবে মূল্য উল্লেখিত হবে না। যেমন ১ ব্যক্তি ওয়াসিফ ও আরিফ নামে তার ২ গোলামকে ১ হাজার টাকার নিনিময়ে বিক্রি করলো। প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন মূল্য উল্লেখ করলো না এবং এ শর্ত করলো যে, আরিফের ব্যাপারে আমার ৩ দিন এখতিয়ার থাকবে।

৪. মূল্য নির্দিষ্ট তবে محل خيار নির্দিষ্ট নয়। যেমন– কেউ বললো আমি ওয়াসিফ ও আরিফ নামক আমার ২ গোলামকে ১ হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রি করলাম। এভাবে যে, প্রত্যেকের মূল্য ৫০০টাকা। তবে শর্ত এই যে, তাদের যে কোনো ১ জনের ব্যাপারে আমার ৩ দিন পর্যন্ত এখতিয়ার থাকবে।

ব্যাখ্যাকার বলেন– উভয় গোলামের উপর যেহেতু বিক্রির প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। এ কারণে যে গোলামের ব্যাপারে এখতিয়ার রাখা হয়েছে সেও বিক্রি চুক্তির অধীনে দাখিল থাকবে। তবে সে বিক্রির বিধান তথা ক্রেতার মালিকানার বিধানে শামিল থাকবে না। কারণ বিক্রেতার এখতিয়ার থাকলে সে তার মালিকানামুক্ত হয় না এবং ক্রেতার মালিকানায়ও প্রবেশ করে না। সুতরাং ক্রেতার মালিকানায় প্রবেশ না করার দরুন বলা হবে যে, সে বিক্রির বিধানে শামিল নয়। তবে যেহেতু উক্ত গোলাম محل خيار এবং সে বিক্রি চুক্তির মধ্যে শামিল রয়েছে। এ কারণে خيار شرط এর দরুন উক্ত গোলামের মধ্যে বিক্রেতার জন্য বিক্রি চুক্তিকে রদ করা এবং নষ্ট করা বিক্রি চুক্তিকে পরিবর্তন ধর্তব্য হবে। আর এটা নসখের মতোই। অর্থাৎ নসখের মধ্যে যেভাবে বিধানকে উঠিয়ে দেয়া হয় তদ্রূপ যে গোলামের মধ্যে এখতিয়ার থাকবে তার ব্যাপারে বিক্রি রদ করা বিক্রির বিধানকে উঠিয়ে দেয়া এবং নষ্ট করার ন্যায় হবে। মোটকথা এদিক দিয়ে মতনের মাসআলা তথা عبد مخير فيه এর মধ্যে বিক্রিকে রদ করা নসখের সাথে

সামঞ্জস্য রাখে। আর সে যেহেতু বিক্রির বিধানে শামিল নয়। এ কারণে خيار شرط এর দরুন বিক্রেতার জন্য উক্ত গোলামের ক্ষেত্রে বিক্রিকে প্রত্যাখ্যান করা এ বিষয়ে বর্ণনা করা সাব্যস্ত হবে যে, এ গোলামটি বিক্রি চুক্তির অধীনে শামিল নয়। অতএব তার ক্ষেত্রে বিক্রি চুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করা ইস্তেসনার ন্যায় হবে। অর্থাৎ যেভাবে ইস্তেসনা দ্বারা মুস্তাসনার আফরাদ মুসতাসনা মিনহুর মধ্যে দাখিল না থাকা বুঝায়। তা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হবে। এভাবেই عبد مخير فيه এর মধ্যেও বিক্রি রদ করা এ বিষয় বর্ণনা করা বোঝাবে যে, عبد مخير فيه বিক্রির মধ্যে দাখিল নয়। এদিক দিয়ে মতনের মাসআলাটি ইস্তেসনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলো।

মোটকথা এ মাসআলা তথা عبد مخير فيه এর মধ্যে বিক্রিকে রদ করা উক্ত মুখাসসিসের ন্যায় যা ইস্তেসনা এবং নসখ উভয়ের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। নসখের সাথে সামঞ্জস্যতার কারণে এটা এ বিষয়ের দাবি করে যে, উল্লেখিত চারো সূরতে বিক্রি বৈধ হোক। কারণ উভয় গোলাম বিক্রেতার প্রস্তাবের দিক দিয়ে একই বিক্রির সাথে বিক্রিত দ্রব্য বিবেচিত হচ্ছে। এবং একই আকদে উভয়কে বিক্রি করা হয়েছে। অতএব একজনের ক্ষেত্রে বিক্রি বহাল রাখা এবং অপরজনের ক্ষেত্রে ফসখ করার দ্বারা দ্বিতীয়জনের বিক্রির মধ্যে কোনো ত্রুটি সৃষ্টি হবে না। বরং দ্বিতীয় গোলামের বিক্রি বৈধ হবে। অতএব চারো সূরতে দ্বিতীয় গোলামকে বিক্রি করা বৈধ হবে।

তবে এখানে প্রশ্ন এই যে, যখন خيار شرط এর কারণে একজনের ক্ষেত্রে বিক্রিকে রদ করা হলো এবং অপরজনের ক্ষেত্রে বিক্রি কার্যকর হলো। তাহলে উভয়ের মূল্য স্বরূপ যে ১ হাজার টাকা নির্ধারিত হয়েছিলো। তাকে উভয় গোলামের মূল্যের উপর বন্টন করতে হবে এবং সে অনুপাতে ক্রেতার উপর মূল্য পরিশোধ জরুরি হবে। এটাকে بيع بالحصة বলে। আর শরীআতে بيع بالحصة বাতিল। কারণ এতে মূল্য অজ্ঞাত থেকে যায়। ফলে বিক্রি বাতিল গণ্য হয়।

এর উত্তর এই যে, بيع بالحصة ২ প্রকার। ১. بيع بالحصة ابتداء. ২. بيع بالحصة بقاء.

بيع بالحصة بقاء. ঐ বায়ঈ যা প্রশ্নের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। আর بيع بالحصة ابتداء. দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, যেমন কেউ বললো আমি আমার শাহেদ নামক গোলামকে ১ হাজার টাকা থেকে তার অংশের বিনিময়ে বিক্রি করলাম যে ১ হাজার টাকা শাহেদ এবং হামেদ নামক গোলামের মূল্যের উপর বণ্টিত হবে। সারকথা এই যে, আমাদের উল্লেখিত মাসআলা بيع بالحصة بقاء. সংক্রান্ত যা বাতিল নয়। কাজেই কোনো প্রশ্ন আরোপিত হবে না।

সুতরাং একথা প্রমাণিত হলো যে, নসখের সামঞ্জস্যতার দিক দিয়ে এটা দাবি করে যে, চারো সূরতে বিক্রি বৈধ হোক। আর ইস্তেসনার সামঞ্জস্যতা দাবি করে যে, চারো সূরত ফাসেদ হোক। কেননা বিক্রেতা একই প্রস্তাবে ২ জন গোলামকে শামিল করেছে। এ কারণে বিক্রেতা কেমন যেন উভয়ের মধ্যে থেকে প্রত্যেকের ব্যাপারে বিক্রি চুক্তি কবুল করার জন্য দ্বিতীয় গোলামের মধ্যে কবুল করার শর্ত স্থির করেছে। অতএব ক্রেতার এ এখতিয়ার থাকবে না যে, ১ জনকে কবুল করবে, আর ১ জনকে প্রত্যাখ্যান করবে। অতএব কেমন যেন বিক্রেতা যে গোলামকে বিক্রি করবে তার ক্ষেত্রে বিক্রি চুক্তি গ্রহণ করার জন্য عبد مخير فيه তথা যাকে বিক্রির ব্যাপারে এখতিয়ারাধীন রাখবে তাকে শর্ত স্থির করলো। আর এমনটা বৈধ নয়। কাজেই এ বিক্রি ফাসেদ গণ্য হবে।

অতএব উল্লেখিত চারো ক্ষেত্রে বিক্রি চুক্তি ফাসেদ গণ্য হবে। এটা এমন হয়ে গেলো যেমন এক ব্যক্তি একই চুক্তির মধ্যে আযাদ এবং গোলাম ২ জনকে একত্র করে বিক্রি করলো এবং প্রত্যেকের মূল্যও বর্ণনা করলো। তাহলে ইমাম সাহেব (র) এর মতে গোলামের ক্ষেত্রে বিক্রি ফাসেদ বিবেচিত হবে। কারণ আযাদ ব্যক্তি বিক্রি مبيع বা পণ্য হতে পারে না। আর গোলাম হলো مبيع বা বিক্রি পণ্য।

সারকথা নাসিখের সাথে সামঞ্জস্যতার কারণে এ বিষয়ের দাবি করে যে, উল্লেখিত চারো সূরতে বিক্রি বৈধ হোক। আর ইস্তেসনার সামঞ্জস্যতার কারণে বৈধ না হওয়ার দাবি করে। উভয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে আমরা বলি যদি محل

خيار এবং তার মূল্য সুনির্দিষ্ট হয় তাহলে তার ক্ষেত্রে বিক্রি বৈধ হবে। মতনে এই সূরতটি উল্লেখিত হয়েছে। আর যে গোলামের ব্যাপারে বিক্রেতা এখতিয়ার বাকী রেখেছে সে বিক্রির বিধানে শামিল হবে না। এ কারণে এখতিয়ারভুক্ত গোলামকে বিক্রির দ্বারা কবুল করার জন্য عبد مخير فيه অর্থাৎ যার ব্যাপারে এখতিয়ার রাখা হয়েছে বিক্রি কবুল করার জন্য শর্ত করা সাব্যস্ত হবে। আর এমন শর্ত করা ফাসিদ তথা অবৈধ। এ কারণে গোলামের বিক্রি অবৈধ হবে।

এর উত্তর এই যে, স্বাধীন ব্যক্তি محل بيع (বিক্রির ক্ষেত্র) নয়। কারণ বিক্রির ক্ষেত্র হলো متقوم তথা মূল্য যোগ্য বস্তু। স্বাধীন ব্যক্তি মূল্যযোগ্য বস্তু নয়। এ কারণে স্বাধীন ব্যক্তি বিক্রির অধীনে শামিল হবে না এবং বিধানেও শামিল হবে না। অতএব নিশ্চিতভাবে সে বিক্রি পণ্য বর্হিভূত হবে। আর বিক্রির পণ্য তথা গোলামের বিক্রি কবুল করার জন্য যা مبيع তথা বিক্রির পণ্য নয় তাকে কবুল করার শর্তারোপ করা সাব্যস্ত হবে। যা বিক্রি-চুক্তির পরিপন্থী। ফলে চুক্তি ফাসেদ হবে। এ কারণে এক্ষেত্রে বিক্রি চুক্তি ফাসেদ বিবেচিত হবে।

উল্লেখিত মাসআলায় যে গোলামের ব্যাপারে বিক্রেতা এখতিয়ার রেখেছিলো যদিও সে বিক্রির বিধানে শামিল নয় কিন্তু মূল বিক্রির মধ্যে শামিল ছিলো। আর এখতিয়ারভুক্ত গোলাম যেহেতু মূল বিক্রির মধ্যে শামিল। কাজেই তা غير مبيع হবে না। বরং مبيع হবে। আর এখতিয়ারভুক্ত গোলামের মধ্যে বিক্রি কবুল করার জন্য এখতিয়ারভুক্ত গোলামের বিক্রি কবুল করার শর্তারোপ করা সাব্যস্ত হবে। যা বিক্রি চুক্তির পরিপন্থী নয়। এ কারণে মতনে উল্লেখিত মাসআলায় বিক্রি ফাসেদ হবে না।

ব্যাখ্যাকার বলেন– যদি محل خيار ও মূল্য উভয়ের কোনো একটি অনির্দিষ্ট থাকে অথবা উভয়টি অনির্দিষ্ট থাকে তাহলে এই তিন ক্ষেত্রে ইস্তেসনার সামঞ্জস্যতা ধর্তব্য হবে। সুতরাং বিক্রি বৈধ হবে না। محل خيار এবং মূল্য উভয় অনির্দিষ্ট হওয়ার সূরত এই যে, বিক্রেতা বললো আমি ওয়াসিফ এবং আরিফ উভয়কে ১ হাজার টাকার বিনিময়ে এ শর্তে বিক্রি করলাম যে, তাদের ১জনের ব্যাপারে তার মূল্যের অংশের বিনিময় ৩ দিনের এখতিয়ার থাকবে। শরীআতে এটা বাতিল। কারণ এখানে অনির্দিষ্ট গোলামের মধ্যে খেয়ারের যে শর্ত লাগানো হলো তাতে দ্বিতীয় গোলামের ক্ষেত্রে চুক্তি কার্যকরী হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় গোলামটি হলো অজ্ঞাত। সারকথা এই যে, এখানে مبيع ও অজ্ঞাত এবং মূল্যও অজ্ঞাত। অথচ এর কোনো একটি অজ্ঞাত থাকলেই চুক্তি ফাসেদ হয়ে যায়। অতএব উভয়টি অজ্ঞাত থাকার ক্ষেত্রে আরও উত্তমরূপে চুক্তি ফাসেদ হবে।

مبيع অজ্ঞাত হওয়ার সূরত : বিক্রেতা বললো– আমি ওয়াসিফ এবং আরিফ উভয় গোলামকে ১ হাজার টাকার বিনিময়ে এই শর্তে বিক্রি করলাম যে, তাদের ২ জনের মধ্য থেকে ১ জনের ব্যাপারে আমার ৩ দিনের এখতিয়ার থাকবে। আর তার মূল্য হলো ৫০০ টাকা।

মূল্য অজ্ঞাত থাকার সূরত : বিক্রেতা বললো আমি ওয়াসিফ ও আরিফ উভয়কে ১ হাজার টাকার বিনিময়ে এই শর্তে বিক্রি করলাম যে, আরিফের ক্ষেত্রে তার মূল্যের অংশের বিনিময়ে ৩ দিনের এখতিয়ার থাকবে। প্রথম সূরতে مبيع অজ্ঞাত হওয়ার কারণে বিক্রি ফাসেদ। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মূল্য অজ্ঞাত হওয়ার কারণে বিক্রি ফাসেদ।

ব্যাখ্যাকার বলেন– উল্লেখিত তিনো সূরতে নাসিখের সামঞ্জস্যতা ধর্তব্য হবে না। কারণ নাসিখের সামঞ্জস্যতা ধর্তব্য করলে যেহেতু مبيع কিংবা মূল্য অথবা উভয়টি অজ্ঞাত হয়ে যায়। এ কারণে নাসেখও অজ্ঞাত থেকে যায়। আর পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, নাসিখ অজ্ঞাত হলে তা নিজেই বাদ পড়ে যায়। অতএব তার مشابه হওয়ার কারণে খেয়ারে শর্তও বাতিল হয়ে যাবে। আর خيار شرط বাতিল হওয়ার কারণে উভয় গোলামের ব্যাপারে বিক্রি চুক্তি কার্যকর হবে। কিন্তু স্বাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিক্রি কার্যকর হওয়া মূলনীতির পরিপন্থী। কারণ সে বিক্রির পাত্রই নয়। মোটকথা নাসিখের সামঞ্জস্যতা ধর্তব্য করলে যেহেতু বিক্রির উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হওয়া সাব্যস্ত হয়। এ কারণেই আমরা উল্লেখিত তিনো সূরতে কেবল ইস্তেসনার সামঞ্জস্যতা ধর্তব্য করেছি; নাসিখের সামঞ্জস্যতা ধর্তব্য করিনি।

وَقِيلَ اِنَّه يَسْقُطُ الْاِحْتِجَاجُ بِه كَالْاِسْتِثْنَاءِ الْمَجْهُوْلِ لِاَنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنْهُمَا لِبَيَانِ اَنَّه لَمْ يَدْخُلْ هٰذا هُوَ الْمَذْهَبُ الثَّانِيْ واِلَيْه ذَهَبَ الْكَرْخِيُّ وعِيْسٰى بْنُ ابانَ وهٰؤُلاءِ قد فَرَّطُوا فِيْ هٰذا الْعامِّ الْمَخْصُوْصِ الْبَعْض ويَقُولُوْنَ لايَبْقٰى العامُّ قَابِلاً لِلتَّمَسُّكِ اصلاً سواءٌ كانَ الْمخصوصُ معلومًا كما اذا قِيْلَ اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْن ولاَ تَقْتُلُوا اَهْلَ الذِّمَّة او مَجْهُوْلاً كمَا إذا قِيْلَ اقْتُلُوْا الْمُشْرِكِيْن ولاَ تَقْتُلُوْا بَعْضَهُمْ وشَبَّهُوْهُ بِالْاِسْتِثْنَاءِ فَقط لِاَنَّهُم لَمْ يُرَاعُوا جَانِبَ الصِّيْغَة بَلْ اعْتَبَرُوا الْمَعْنٰى فقطْ وهو عَدَمُ الدُّخُوْلِ – وانَّما شَبَّهُوْه بِالْاِسْتِثْنَاءِ الْمَجْهولِ لِاَنّه اذا كانَ دلِيْلُ الْخُصُوْصِ مَجْهُوْلاً فظاهِرٌ انَّه كَالْمَجْهول وانْ كَانَ مَعلُوْمًا فبِالتَّعْلِيْلِ يَصِيْرُ مَجْهولاً وان كَانَ الْاِسْتِثْنَاءُ فِى نَفْسِه مِمَّا لا يَقْبَلُ التَّعْلِيْلَ –

অনুবাদ ॥ আর কেউ কেউ বলেন- عام مخصوص منه البعض দ্বারা দলিল পেশ করা অজ্ঞাত استثناء এর ন্যায় পরিত্যক্ত হয়ে যায়। কেননা এ দুটোর প্রত্যেকটি এ কথা বর্ণনা করার জন্যে আসে যে, তা আমের অন্তর্ভুক্ত নয়। এটা হলো দ্বিতীয় মাযহাব। ইমাম আবুল হাসান কারখী ও ঈসা বিন আবান (র) অনুরূপ মত পোষণ করেন। এই মাখসূস عام مخصوص منه البعض এর ব্যাপারে তারা চরম পন্থা অবলম্বন করেছেন। তারা বলেন, এরূপ عام মূলত দলিলের যোগ্যতা রাখে না। চাই উল্লেখিত খাসটা জ্ঞাত হোক। যেমন- যখন বলা হবে "তোমরা মুশরিকদের হত্যা করো, তবে যিম্মিদেরকে হত্যা করো না", অথবা خاص যদি অজ্ঞাত হয়। যেমন– যদি বলা হয় যে, "তোমরা মুশরিকদেরকে হত্যা করো তবে তাদের কিছুকে হত্যা করো না"। তারা সেটাকে কেবল استثناء এর সাথে তুলনা করেছেন। কারণ তারা শব্দের দিক বিবেচনা না করে কেবল অর্থের দিকটাই বিবেচনা করেছেন। আর তা হলো অন্তর্ভুক্ত না হওয়া। তারা مخصصকে অজ্ঞাত দলিলের সাথে তাশবীহ দিয়েছেন যে, خصوص এর দলিল যখন অজ্ঞাত হয় তখন استثناء مبهم এর সাদৃশ্য হয়ে যায়। আর যদি خصوص এর দলিল জ্ঞাত হয় তাহলে تعليل এর কারণে তা অজ্ঞাত হয়ে যায়। যদিও استثناء প্রকৃতপক্ষে تعليل কবুল করে না।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله وقِيلَ اِنَّه يَسْقُطُ الْاِحْتِجَاجُ بِه الخ : মুসান্নিফ (র) এই ইবারতে عام مخصوص منه البعض এর ব্যাপারে দ্বিতীয় মাযহাব বর্ণনা করছেন। দ্বিতীয় মাযহাবের প্রবক্তা হলেন– ইমাম কারখী ও ঈসা ইবনে আবান (র)। তারা বলেন– তাখসীসের পরে আ'ম দলিলযোগ্য থাকে না। অকাট্যরূপেও নয় এবং সন্দেহজনকভাবেও নয়। যেমন– استثناء مجهول এর পরে মুস্তাসনা মিনহু মোটেই দলিলযোগ্য থাকে না। আর মুখাসসিস হলো استثناء مجهول এর ন্যায়। কেননা এ দুটোর প্রত্যেকটি এ বিষয় বর্ণনা করে যে, সে এর অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ ইস্তেসনা এ বিষয় বর্ণনা করে যে, মুস্তাসনাটা মুস্তাসনা মিনহুর মধ্যে দাখিল নয়। আর মুখাসসিসও একথা বোঝায় যে, মাখসুস আ'মের অধীনে দাখিল নয়।

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

فَصَارَ كَالْبَيْعِ الْمُضَافِ إِلَى حُرٍّ وَعَبْدٍ بِثَمَنٍ واحدٍ تشبِيهٌ لِدلِيلِ هٰذا الْمَذْهَبِ . بِمَسْأَلَةٍ فِقْهِيَّةٍ مذكورةٍ فإنّه اذا باعَ العَبْدَ والحُرَّ بِثَمَنٍ واحدٍ بِأَنْ يَّقُولَ بِعْتُهُمَا بِالألفِ فَالحُرُّ لا يَدْخُلُ فِى البَيْعِ فيكونُ إستثناءً وبيعًا لِلعَبْدِ بالحِصَّةِ مِنَ الألفِ إبتداءً فالحُرُّ لا يَدْخُلُ إبتداءً وهُو باطِلٌ لِجَهالةِ الثَّمنِ بِخِلافِ مَا اذا فَصَّلَ الثَّمَنَ بِأَنْ يَقُولَ بِعتُ هٰذا بِخَمسِ مِائَةٍ فإنّه يَجوزُ عِندَهُما خِلافًا لِأَبِى حنيفةَ لِجَعْلِ قبولِ مَالَيْسَ بِمَبِيعٍ شرطًا لِقبولِ المَبِيعِ -

অনুবাদ॥ ***সুতরাং তা ঐ বিক্রয়ের ন্যায় হয়ে গেলে যা স্বাধীন ও গোলামের দিকে একই মূল্যের দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত হয়েছে।'*** এ মাযহাবের দলিলকে একটি পূর্বোল্লিখিত ফিকহী মাসআলার সাথে তাশবীহ দেয়া হয়েছে। কারণ যখন একজন স্বাধীন ও গোলামকে একই মূল্যের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে যেমন বললো আমি উভয়কে (দাস ও স্বাধীনকে) এক হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রি করলাম। তাহলে 'স্বাধীন' লোকটি বিক্রির অন্তর্ভুক্ত হবে না। সুতরাং এটা হবে استثناء। আর গোলামের জন্য এক হাজারের মধ্য থেকে এর প্রাথমিক অবস্থায় হাজারের অংশের বিনিময়ে গোলামটি বিক্রি হয়ে যাবে। সুতরাং আযাদ লোকটি প্রথমেই অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর মূল্য অজ্ঞাত থাকার কারণে بيع بالحصه ابتداءً বাতিল হবে। এটা ঐ

পূর্বের বাকী অংশ)

ব্যাখ্যাকার বলেন– এই সকল ব্যক্তি عام مخصوص منه البعض কে দলিল অযোগ্য সাব্যস্ত করে অতিরঞ্জন করেছেন। কারণ তারা বলেন যে, তাখসীসের পরে আ'ম মোটেই দলিলযোগ্য থাকে না। চাই মাখসূস নির্দিষ্ট হোক বা অনির্দিষ্ট। যেমন বলা হলো যে, মুশরিকদেরকে হত্যা করো; জিম্মিদেরকে হত্যা করো না। এখানে জিম্মিগণ নির্দিষ্ট। অথবা বলা হলো যে, মুশরিকদেরকে হত্যা করো এবং তাদের কিছু সংখ্যককে হত্যা করো না। এখানে দ্বিতীয় কিছু সংখ্যক অজ্ঞাত। ব্যাখ্যাকার বলেন– তারা মুখাসসিসকে কেবল এস্তেসনার সাথে সামঞ্জস্য সাধন করেছেন। কারণ তারা সীগার প্রতি লক্ষ্য করেননি। বরং শুধু অর্থের প্রতি লক্ষ্য করেছেন। আর অর্থ হলো দাখিল না হওয়া। অর্থাৎ যেভাবে ইস্তেসনা এ বিষয় দলিল বহন করে যে, মুস্তাসনাটা মুসতাসনা মিনহুর মধ্যে দাখিল নয়। তদ্রূপ মুখাসসিসও এ বিষয়ের দলিল বহন করে যে, মাখসুস আ'মের অধীনে দাখিল নয়। তবে মনে রাখতে হবে যে, তারা মুখাসসিসকে অনির্দিষ্ট ইস্তেসনার সাথে তুলনা করেছেন। এর উপর প্রশ্ন জাগে যে, অনির্দিষ্ট ইস্তেসনার সাথে তুলনা করা ঐ সময়ই বৈধ হবে যখন মুখাসসিস অনির্দিষ্ট হবে। কেননা নির্দিষ্ট মুখাসসিস এবং অনির্দিষ্ট ইস্তেসনার মধ্যে কোনো মিল নেই।

এর উত্তর এই যে, মুখাসসিস অনির্দিষ্ট হলে তা অনির্দিষ্ট ইস্তেসনার সাথে সামঞ্জস্য রাখার ব্যাপারটি স্পষ্ট। যেমন আপনিও বলেছেন। কিন্তু মুখাসসিস যদি নির্দিষ্ট হয় তাহলে তা মুস্তাকিল হওয়ার কারণে যেহেতু ইল্লতকে কবুল করে। কাজেই জানা যাবে না যে, আ'মের অধীন থেকে কি পরিমাণ একক বের হয়ে গেছে এবং কি পরিমাণ রয়ে গেছে। এভাবে ইল্লতের কারণে জানা মুখাসসিসও অজানা হয়ে যায়। সুতরাং তাকে استثناء مجهول এর সাথে সামঞ্জস্য দেয়ার মধ্যে কোনো ক্ষতি নেই। ব্যাখ্যাকার বলেন– ইস্তেসনার শব্দ যেহেতু غير مستقل এই কারণে প্রকৃত অর্থে তা ইল্লতকে কবুল করে না। কিন্তু মুখাসসিস মুস্তাকিল সীগার কারণে ইস্তেসনা কবুল করে।

অবস্থার পরিপন্থী যখন প্রত্যেকটির মূল্য পৃথকভাবে বর্ণনা করা হবে। যেমন- সে (বিক্রেতা) বললো, আমি এটা পাঁচশত টাকার বিনিময়ে ও ঐটা পাঁচশত টাকার বিনিময়ে বিক্রি করলাম। এ ধরনের বিক্রি সাহেবাইনের নিকট বৈধ, তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর বিরোধিতা করেছেন। কারণ এর মধ্যে যা مبيع নয় তাকে مبيع হিসেবে গ্রহণ করার জন্যে শর্তারোপ করা সাব্যস্ত হয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ قوله فصار كالبيع المضاف الخ : মুসান্নিফ (র) এই ইবারতে দ্বিতীয় মাযহাবের দলিলের দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি ফিকহী মাসআলা উল্লেখ করেছেন।

মাসআলার সার : কোনো ব্যক্তি একই চুক্তির মধ্যে একই মূল্যের বিনিময় গোলাম এবং আযাদ ব্যক্তিকে বিক্রি করলো। যেমন বললো- "আমি তাদের উভয়কে ১ হাজার টাকার বিনিময় বিক্রি করলাম"। এক্ষেত্রে স্বাধীন লোকটি শুরু থেকেই বিক্রির অধীনে পড়বে না। এটা ইস্তেসনার ন্যায় হবে। অর্থাৎ যেভাবে ইস্তেসনা মুস্তাসনাটা মুস্তাসনা মিনহুর মধ্যে দাখিল না থাকা বোঝায় তদ্রূপ গোলামের সাথে স্বাধীন ব্যক্তিকে মিলিত করলে এ বিষয় বোঝায় যে, স্বাধীন ব্যক্তি বিক্রেতার প্রস্তাবের অধীনে দাখিল নয়। কাজেই এটা بيع بالحصة ابتداء হবে। কেননা সে যেহেতু শুরুতেই বিক্রির অধীনে দাখিল থাকে না। এ কারণে ১ হাজার টাকাকে শুরু থেকেই বিক্রিত গোলামের মূল্যের উপর এবং স্বাধীন ব্যক্তিকে গোলাম ধরে নিয়ে তার মূল্যের উপর বণ্টন করতে হবে। এক্ষেত্রে ৫০০ টাকা মূল্য হবে। অতএব এটাকেই "بيع بالحِصَّةِ اِبْتِدَاءً" বলা হয় যা বাতিল। কেননা এর দ্বারা মূল্য অনির্দিষ্ট হওয়া বোঝা যায়।

যদি স্বাধীন ও গোলামের প্রত্যেকের মূল্য ভিন্ন ভিন্ন উল্লেখ করে তাহলে সাহেবাইনের মতে গোলামের ক্ষেত্রে বিক্রি শুদ্ধ হবে। ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে গোলামের ক্ষেত্রেও বিক্রি শুদ্ধ হবে না।

সাহেবাইনের দলিল : ফাসেদ হওয়াটা مُفْسِد অনুপাতে হয়। আর مُفْسِد কেবল স্বাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে। সুতরাং ফাসেদ হওয়াটা স্বাধীন ব্যক্তির সাথেই খাছ হবে। গোলামের প্রতি তা ধাবিত হবে না।

আবু হানীফা (র) এর দলিল : এক্ষেত্রে মূল্য যদিও অনির্দিষ্ট নয় তবে স্বাধীন ব্যক্তি غير مبيع আর গোলাম হলো مبيع বিক্রেতা যেহেতু উভয়কে একই আকদে এবং একই প্রস্তাবের অধীনে বিক্রি করেছে। কাজেই তার উদ্দেশ্য এই হবে যে, বিক্রেতা مبيع তথা গোলাম বিক্রয়ের জন্য غير مبيع (স্বাধীন) বিক্রয়কে শর্ত করেছেন। আর এটা ফাসেদ। কাজেই বিক্রিও ফাসেদ হবে।

وَقِيْلَ اِنَّه يَبْقٰى كَمَا كَانَ اِعْتِبَارًا بِالنَّاسِخِ لِاَنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنْهُمَا مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِه بِخِلَافِ الْاِسْتِثْنَاءِ هٰذا هُوَ الْمَذْهَبُ الثَّالِثُ فَهٰؤُلَاءِ قَدْ اَفْرَطُوْا فِى حَقِّ الْعَامِّ بِاِبْقَائِه قَطْعِيًّا كَمَا كَانَ وشَبَّهُوه بِالنَّاسِخِ فَقَط مِنْ حَيْثُ اِسْتِقْلَالِ الصِّيْغَةِ ولَمْ يَلْتَفِتُوا اِلٰى رِعَايَةِ جَانِبِ الْاِسْتِثْنَاءِ قَطُّ فَاِنْ كَانَ دَلِيْلُ الْخُصُوْصِ مَعْلُوْمًا فَظَاهِرٌ اَنَّ النَّاسِخَ الْمَعْلُوْمَ لَا يُؤَثِّرُ فِى تَغْيِيْرِ مَا بَقِىَ مِنَ الْاَفْرَادِ الْغَيْرِ الْمَنْسُوْخَةِ وَاِنْ كَانَ مَجْهُوْلًا فَالنَّاسِخُ الْمَجْهُوْلُ يَسْقُطُ بِنَفْسِه وَلَا تُؤَثِّرُ جَهَالَتُه فِى تَغَيُّرِ مَا قَبْلَه

অনুবাদ॥ *"আর কেউ কেউ বলেন–* ناسخ *এর দিক বিবেচনা করে তা যদ্রূপ ছিল তদ্রূপ থেকে যাবে। (*ناسخ *ও* مخصص*) উভয়ের প্রত্যেকটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ যা* استثناء *এর বিপরীত।* এটা হলো তৃতীয় মাযহাব। আর এ মতাবলম্বীগণ সীমালংঘন করেছেন আ'মকে অকাট্যরূপে বহাল রাখার ব্যাপারে যেমনভাবে (অকাট্য) ছিল। তারা শব্দের স্বাতন্ত্রতার দিক বিবেচনা করে তাকে শুধু ناسخ এর সাথে তুলনা করেছেন। استثناء এর দিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ করেননি। আর যদি خصوص এর দলিল জ্ঞাত হয়, তাহলে এটা সুস্পষ্ট যে, জ্ঞাত ناسخ অবশিষ্ট এককগুলো পরিবর্তনে কোন প্রভাব বিস্তার করবে না। আর যদি خصوص এর দলিল অজ্ঞাত থাকে তাহলে অজ্ঞাত ناسخ নিজেই বাদ পড়ে যায় এবং তার অজ্ঞতা তার পূর্ববর্তীর মাঝে পরিবর্তন সাধনে কোন প্রভাব ফেলে না।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ قوله وَقِيْلَ اِنَّه يَبْقٰى كَمَا الخ : মুসান্নিফ (র) এই ইবারতে عام مخصوص منه البعض বিষয়ক তৃতীয় মাযহাব বর্ণনা করেছেন।

মাসআলার সার : তাখসীসের পরে আ'মটা قطعى الدلالت থাকে যেমন পূর্বে ছিলো। ব্যাখ্যাকার বলেন– এই সকল ব্যক্তি افراط এর দ্বারা কাজ নিয়েছেন। তারা মুখাসসিসকে কেবল নাসিখের সাথে তাশবীহ দিয়েছেন; ইস্তেসনার সাথে তাশবীহ দেননি। নাসিখের সাথে তাশবীহ দিয়েছেন এ কারণে যে, মুখাসসিস এবং নাসিখ উভয়টি শব্দের দিক দিয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণ। আর ইস্তেসনা হলো অপূর্ণাঙ্গ। বরং তা তার পূর্ববর্তীর জন্য قيد হয়ে থাকে। এ কারণেই তাকে এর সাথে তাশবীহ দেননি।

মোটকথা মুখাসসিস যদি নির্দিষ্ট হয় তাহলে তাখসীসের পরে আ'মটা বাকী আফরাদের বিষয়ে قطعى الدلالت হওয়া সুস্পষ্ট। কেননা মুখাসসিস নাসিখের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। আর নাসিখ যদি নির্দিষ্ট হয় তাহলে অবশিষ্ট আফরাদ যেগুলোকে মানসূখ করা হয়নি সেগুলোকে অকাট্যতা দ্বারা পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল হয় না। অর্থাৎ قطعى الدلالت হওয়া থেকে খারিজ হয় না। এভাবে মুখাসসিস নির্দিষ্ট হলেও আ'ম বাকী আফরাদের মধ্যে অকাট্যতাকে পরিবর্তন করে না। বরং তা অকাট্য থেকে যায়। মুখাসসিস যদি অনির্দিষ্ট হয় তাহলে আ'ম এ কারণেই قطعى الدلالت হয় যে, নাসিখের আগে মুখাসসিস নির্দিষ্ট থাকে। আর নাসিখ যদি অনির্দিষ্ট হয় তাহলে তা নিজেই পতিত হয়ে যায়। কারণ তা দলিলযোগ্য হতে পারে না। আর যা নিজেই দলিলযোগ্য নয় তা অন্য কোনো দলিলের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে না। কাজেই তা নাসিখও হতে পারে না। সুতরাং অনির্দিষ্ট বিষয় নাসিখ হবে না বরং তা নিজেই পতিত হয়ে যাবে। অতএব তা তার পূর্ববর্তীকে পরিবর্তন করার ব্যাপারে ক্রিয়াশীল হবে না। এভাবে অনির্দিষ্ট মুখাসসিস নিজেই পতিত হয়ে যাবে। আর আ'ম পূর্বের ন্যায় قطعى الدلالت থাকবে। পূর্বের কথার প্রতি তার অনির্দিষ্টতা ধাবিত হবে না।

فَصَارَ كَمَا اِذَا بَاعَ عَبْدَيْنِ وهلك اَحَدُهُمَا قَبْلَ التَّسْلِيْمِ تشبيهٌ لِدَلِيْلِ هٰذَا الْمَذْهَبِ بِمَسْئَلَةٍ فِقْهِيَّةٍ مذكورةٍ -فَانَّه اِذَا بَاعَ عَبْدَيْنِ بِثَمَنٍ واحِدٍ بِاَنْ قَالَ بِعْتُهُمَا بِالف ومات اَحَدُ الْعَبْدَيْنِ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ يَبْقَى الْبَيْعُ فِى الْاٰخَرِ بِحِصَّةٍ مِّنَ الْاَلْفِ لِاَنَّهُ بَيْعٌ بِالْحِصَّةِ بَقَاءً فَكَاَنَّهُ نَسْخُ الْبَيْعِ فِي الْعَبْدِ الْمَيِّتِ بعدَ اِنْعِقَادِهِ وهُوَ جائزٌ وهٰهُنَا مذهبٌ رابعٌ مذكورٌ فِي التَّوضِيْحِ وغيرِهِ ولم يَذْكُرْه الْمُصَنِّفُ رح وهُوَ اَنَّ دليلَ الْخُصُوْصِ اِنْ كَانَ مَجْهُولًا يَسْقُطُ الْاِحْتِجَاجُ بِه عَلٰى مَا قَالَه الْكَرْخِي رح وانْ كانَ معلومًا فَكَالْاِسْتِثْنَاءِ وهُوَ لَا يَقْبَلُ التَّعْلِيْلَ فَيَبْقَى الْعَامُّ قَطْعِيًّا علٰى مَاكَانَ قَبْلَ ذٰلِكَ -

অনুবাদ॥ *সুতরাং তা এমন হলো, যেমন কেউ দুটি দাসকে বিক্রি করলো। আর দুটির একটি অর্পণ করার পূর্বে মারা গেলো।* এখানে উল্লিখিত ফিকহী মাসআলার সাথে এই মাযহাবের দলিলকে তুলনা করা হয়েছে। কেননা যখন দুটি গোলাম একই মূল্য দ্বারা বিক্রি করল, যেমন বিক্রেতা বলল بعتهما بالف (আমি উভয়টি এক হাজারের বিনিময়ে বিক্রি করলাম) আর একটি গোলাম অর্পণ করার পূর্বেই মরেগেলো। তাহলে অপরটির মধ্যে হাজারের অংশের বিনিময়ে بيع বহাল থাকবে। কেননা তা بيع بالحصة بقاء। (আংশিক মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি হিসেবে) গণ্য। কেমন যেন বিক্রি সংঘটিত হওয়ার পর মৃত গোলামের মধ্যে বিক্রিটা রহিত করা হয়েছে। আর এমনটা বৈধ। এ স্থলে একটি চতুর্থ মাযহাব রয়েছে যা توضيح ও অন্যান্য গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। গ্রন্থকার (র) উক্ত মাযহাবটি উল্লেখ করেননি। তা এই যে, خصوص এর দলিল যদি অজ্ঞাত হয়, তাহলে এর দ্বারা দলিল রহিত হয়ে যাবে। যেমন ইমাম কারখী (র) বলেছেন। পক্ষান্তরে خصوص এর দলিল যদি জ্ঞাত হয় তাহলে استثناء এর ন্যায় হবে। তা তা'লীল গ্রহণ করবে না। সুতরাং عام টা অকাট্যরূপে বহাল থাকবে যেরূপ পূর্বে ছিল।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ قوله فصار كما اذا باع الخ : এই ইবারতে ফিকহী মাসআলার সাথে তৃতীয় মাযহাবের দলিলের একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে।

মাসআলার সার : এক ব্যক্তি একই চুক্তির অধীনে একই মূল্যে দুটি গোলাম ক্রয় করলো। যেমন সে বললো "আমি এক হাজার টাকার বিনিময় এ ২টি গোলাম বিক্রয় করলাম।" আর ক্রেতা তা কবুল করলো। কিন্তু ক্রেতার নিকট অর্পণের আগেই একটি গোলাম মারা গেলো। তাহলে এই দ্বিতীয় গোলামের ব্যাপারে ১ হাজারের মধ্য থেকে তার অংশ পরিমাণ বিনিময়ে বিক্রি বহাল থাকবে। কারণ এটা بيع بالحصة ابتداء নয়। বরং بيع بالحصة بقاء। আর প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ বায়ঈ জায়েয। অতএব জীবিত গোলামের বিক্রি জায়েয হয়ে যাবে। এটা কেমন যেন বিক্রি সম্পাদনের পরে মৃত্যু গোলামের বিক্রি মানসূখ হওয়ার ন্যায় হলো।

ব্যাখ্যাকার বলেন– এখানে চতুর্থ একটি মাযহাব রয়েছে। যেমন তাওযীহ্ প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। মাতিন (র) তা উল্লেখ করেননি। উক্ত মাসআলাটি এই যে, মুখাসসিস অনির্দিষ্ট হলে আ'ম কোনোরূপ দলিলযোগ্য থাকে না। যেমন পূর্বে ইমাম কারখী (র) বলেছেন। কেননা অনির্দিষ্ট মুখাসসিস অনির্দিষ্ট ইস্তেসনার ন্যায়। আর অনির্দিষ্ট ইস্তেসনার পরে যেভাবে মুসতাসনা মিনহুর আফরাদ অজ্ঞাত থাকে তদ্রূপ অনির্দিষ্ট মুখাসসিসের পরে আ'মের অবশিষ্ট আফরাদ অজ্ঞাত থেকে যায়। আর অনির্দিষ্ট বস্তু দলিলযোগ্য হতে পারে না। সুতরাং আ'মও অবশিষ্ট আফরাদের ব্যাপারে দলিলযোগ্য থাকবে না। মুখাসসিস যদি নির্দিষ্ট হয় তাহলে তা নির্দিষ্ট ইস্তেসনার ন্যায় হবে। আর ইস্তেসনা ইল্লত হওয়াকে কবুল করে না। অতএব মুখাসসিসও علت হওয়াকে কবুল করবে না। সুতরাং মাখসুস আফরাদ ছাড়া বাকী আফরাদের ক্ষেত্রে আ'ম পূর্বের ন্যায় قطعى الدلالت থাকবে।

وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ رح عَنْ بَيَانِ تَخْصِيْصِ الْعَامِّ شَرَعَ فِى ذِكْرِ أَلْفَاظِهِ فَقَالَ وَالْعُمُوْمُ إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ بِالصِّيْغَةِ وَالْمَعْنٰى اَوْ بِالْمَعْنٰى لَا غَيْرُ كَرِجَالٍ وقَوْمٍ يعنى أَنَّ العَامَّ عَلٰى نَوْعَيْنِ اَحَدُهُمَا مَاتَكُوْنُ الصِّيْغَةُ وَالْمَعْنٰى كِلَاهُمَا عَامًّا دَالًّا عَلَى الشُّمُوْلِ بِاَنْ تَكُوْنَ الصِّيْغَةُ صِيْغَةَ جَمْعٍ وَالْمَعْنٰى مُسْتَوْعِبًا فِى الْفَهْمِ مِنْه وَالْاٰخَرُ أَنْ لَّا تَكُوْنَ الصِّيْغَةُ دَالَّةً عَلَى الْعُمُوْمِ وَيَكُوْنُ الْمَعْنٰى مَدْلُوْلًا بِالْاِسْتِيْعَابِ وَلَا يُتَصَوَّرُ عَكْسُهٗ - لِاَنَّ اِخْلَاءَ الْمَعْنٰى عَنِ اللَّفْظِ الْعَامِّ الْمَوْضُوْعِ غَيْرُ مَعْقُوْلٍ اِلَّا بِالتَّخْصِيْصِ وَذٰلِكَ شَيْءٌ اٰخَرُ فَالْاَوَّلُ مِثَالُه رِجَالٌ وَنِسَاءٌ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْجُمُوْعِ الْمُنَكَّرَةِ وَالْمُعَرَّفَةِ وَالْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ لٰكِنَّ فِى الْقِلَّةِ مِنَ الثَّلٰثَةِ اِلَى الْعَشَرَةِ وَفِى الْكَثْرَةِ قِيْلَ مِنَ الثَّلٰثَةِ وَقِيْلَ مِنَ الْعَشَرَةِ اِلٰى مَالَا يَتَنَاهٰى لٰكِنَّ هٰذَا مُخْتَارُ فَخْرِ الْاِسْلَامِ لِاَنَّه لَا يَشْتَرِطُ الْاِسْتِيْعَابَ فِى مَعْنَى الْعَامِّ بَلْ يَكْفِى بِانْتِظَامِ جَمْعٍ مِّنَ الْمُسَمَّيَاتِ -

অনুবাদ ॥ মুসান্নিফ (র) تخصيص العام এর বর্ণনা শেষ করে عام এর শব্দসমূহের আলোচনা শুরু করেছেন। তিনি বলেন- عام ***হয়তো শব্দ ও অর্থগতভাবে হবে, অথবা শুধু অর্থগতভাবে হবে, অন্যভাবে নয়। যেমন-*** رجال ও قوم অর্থাৎ عام হলো দু প্রকার। ১. যা শব্দ ও অর্থ হয় উভয় দিক দিয়ে عام তথা বহু একককে অন্তর্ভুক্ত করা বুঝায়। এভাবে যে, শব্দটি বহুবচনের শব্দ হবে। আর তার যে অর্থ হবে তা সমস্ত একককে শামিল করবে। ২. শব্দ عموم বুঝাবে না, তবে অর্থ عموم বুঝাবে। আর এর বিপরীত কল্পনা করা যায় না। কেননা عام এর জন্যে গঠিত শব্দকে تخصيص ছাড়া অর্থ হতে খালি করা অযৌক্তিক। আর তা ভিন্ন বিষয়। প্রথম (প্রকার আমের) উদাহরণ যেমন- رجال ও نساء এ দুটো ছাড়া جمع منكر (অনির্দিষ্ট বহুবচন) جمع معرف (নির্দিষ্ট বহুবচন) ও جمع قلة এবং جمع كثرة -এর শব্দসমূহ। কিন্তু جمع قلة এর মধ্যে তিন হতে দশ পর্যন্ত এবং جمع كثرة এর ক্ষেত্রে কেউ কেউ বলেন, তিন হতে, কারো মতে দশ হতে অগণিত সংখ্যা পর্যন্ত عموم এর উপর প্রয়োগ হয়ে থাকে। এটা ইমাম ফখরুল ইসলাম বযদবী (র)-এর পছন্দনীয় মত। কেননা, তিনি عام এর অর্থের মধ্যে সমস্ত এককের অন্তর্ভুক্তীকে শর্ত মনে করেন না। বরং তার মতে عام এর আওতাধীন এক জামাআতের অন্তর্ভুক্তিই যথেষ্ট।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ عَنْ بَيَانِ الخ : ব্যাখ্যাকার (র) বলেন- আ'মের তাখসীসের বর্ণনা শেষ করে মুসান্নিফ (র) এ সকল শব্দ উল্লেখ করেছেন যা ব্যাপকতা বোঝায়। তিনি বলেন- আ'ম দু প্রকার : ১. যা সীগা এবং অর্থ উভয় দিক দিয়ে ব্যাপকতা বোঝায়। ২. যা কেবল অর্থের দিক দিয়ে ব্যাপকতা বোঝায়; সীগার দিক দিয়ে ব্যাপকতা বোঝায় না।

সীগার দিক দিয়ে ব্যাপকতার উদ্দেশ্য এই যে, শব্দটি গঠনগতভাবে ব্যাপকতা বোঝাবে। যেমন- বহুবচন শব্দ গঠনের দিক দিয়ে ব্যাপকতা বোঝায়। আর অর্থের দিক দিয়ে ব্যাপক হওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, শব্দের দ্বারা যে অর্থ বুঝে আসে তা বহু আফরাদকে শামিল ও বেষ্টন করে। দ্বিতীয় প্রকারের সীগার দিক দিয়ে ব্যাপক না হওয়ার উদ্দেশ্য হলো ব্যাপকতা না বোঝানো। অর্থাৎ শব্দটি বহুবচন না হওয়া। বরং একবচন হওয়া। আর অর্থের দিক দিয়ে ব্যাপক হওয়ার উদ্দেশ্য হলো শব্দের দ্বারা যে অর্থ বুঝে আসে তা সকল আফরাদকে বেষ্টন করার ফায়দা দেয়া।

ব্যাখ্যাকার বলেন- এমন হতে পারে যে, শব্দটি আ'ম নয় কিন্তু অর্থ আ'ম। কিন্তু এর বিপরীতে শব্দ আ'ম কিন্তু অর্থ সকল আফরাদকে শামিল করে না এমনটি হতে পারে না। কারণ এক্ষেত্রে আ'ম শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে তা থেকে খালি করা সাব্যস্ত হয়। যেমন পোশাক পরিহিত রয়েছে কিন্তু শরীর নেই, এটা অযৌক্তিক বিষয়। কাজেই শব্দ আ'ম থাকবে কিন্তু অর্থ সকল আফরাদকে শামিল করবে না তা হতে পারে না। যদি আ'ম শব্দের অর্থ থেকে কিছু অংশকে খাছ করে নেয়া হয় তাও সম্ভব। কিন্তু তা ভিন্ন কথা। আমাদের কথা হলো শুরু থেকে এমন না হওয়া যে, শব্দ আ'ম রয়েছে কিন্তু তার অর্থ ব্যাপকতা ও বেষ্টন করা বোঝায় না।

মোটকথা প্রথম প্রকারের উদাহরণ হলো رجال এবং نساء এছাড়াও جمع كثرت وجمع قلت، جمع معرف جمع منكر ইত্যাদি। কারণ رجال ونساء শব্দ এবং অন্যান্য বহুবচন শব্দ শব্দগতভাবে আ'ম। কারণ তা বহুবচন এবং অর্থের দিক দিয়েও আ'ম। কেননা তার অর্থ সকল আফরাদকে বেষ্টন করে যা এর অর্থ দ্বারা বোঝা যায়। সুতরাং رجال শব্দটি পুরুষের সকল একককে এবং نساء শব্দটি মহিলাদের সকল একককে শামিল করে।

মোল্লা জুয়ুন (র) جمع قلت ও جمع كثرت এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তিনি বলেন- جمع قلت ৩ থেকে ১০ পর্যন্ত এবং এর মধ্যকার সকল সংখ্যা বোঝায়। আর جمع كثرت ৩ থেকে অসংখ্য সংখ্যা বোঝায়। কারো মতে ১০ থেকে অসীম সংখ্যা বোঝায়। جمع قلت এর ওজন ৪টি। যথা-

১. افعل যেমন اكلب এর একবচন হলো كلب

২. افعال যেমন افراس এর একবচন হলো فرس

৩. افعلة যেমন ارغفة এর একবচন হলো رغيف

৪. فعلة যেমন غلمة এর একবচন হলো غلام এছাড়া যতো ওজন আছে সব جمع كثرت এর ওজন।

নুরুল আনওয়ার গ্রন্থকার বলেন- جمع مذكر ইত্যাদি সকল বহুবচন আ'মের অন্তর্গত হওয়া আল্লামা ফখরুল ইসলাম (র) এর পছন্দনীয় মত। কেননা তার মতে আ'মের সংজ্ঞায় সকল আফরাদকে বেষ্টন করে নেয়া শর্ত নয়। বরং আফরাদকে শামিল হওয়াই যথেষ্ট। তবে তাওযীহ গ্রন্থকার প্রমুখের মতে আ'মের সংজ্ঞায় সকল আফরাদকে বেষ্টন করে নেয়া শর্ত। তাদের মতে جمع منكر আমের অন্তর্গত নয় বরং খাছ ও আ'ম উভয়ের মধ্যে এটা মাধ্যম। অর্থাৎ খাছও নয় আমও নয় বরং উভয়ের মাঝামাঝি। এর বিস্তারিত বিবরণ আ'মের সংজ্ঞার অধীনে বিস্তারিত উল্লেখিত হয়েছে।

وَامّا عِنْدَ مَنْ يَشْتَرِطُ الْاِسْتِيْعابَ وَالْاِسْتِغْراقَ فِيْهِ يَكُوْنَ الجَمْعُ المُنَكَّرُ وَاسِطَةً بَيْنَ الخاصِ وَالعامِّ على مَا ذُكِرَ فِى التَّوضِيْحِ والاٰخرُ مِثالُه قَوْمٌ ورَهْطٌ فاِنَّ القَوْم صِيْغَتُهُ صِيغةُ مفردٍ بِدَلِيلِ انّه يُثَنّٰى ويُجْمَعُ يُقال قومانِ واَقْوامٌ لكنَّ مَعناه مَعْنى العامِّ لِانّه يُطْلَقُ علَى الثَّلْثَةِ الى العَشَرَةِ كَما اَنَّ رَهْطًا يُطْلَقُ الى التِّسْعَةِ ولكنْ يُشْتَرَطُ فِى اِطْلاقِ لفظِ القَوْمِ اَنْ تَكُوْنَ الاٰحادُ مُجْتَمِعةً وانّما يصِحُّ الْاِستثناءُ لِواحِدٍ فِى قولِكَ جاءَنِى القَومُ الاّ زيدًا بِاعْتِبارِ اَنَّ مَجِيءَ المَجْمُوْعِ لا يكونُ الاّ بِاعْتِبارِ مَجِيءِ كُلِّ احدٍ - بخلافِ مَا اِذا قِيلَ يُطِيْقُ رفعَ هٰذا الحَجَرِ القَومُ الاّ زيدًا لانّ الحُكمَ هِنا متَعلّق بِالمَجموعِ مِنْ حَيْثُ المَجْمُوْعِ ولهٰذا يَصِحُّ جاءَ العَشَرَةُ الاّ واحدًا ولا يَصِحُّ العَشَرَةُ زَوْجٌ اِلاّ واحدًا

অনুবাদ ॥ আর যারা عام এর মধ্যে সমস্ত এককের অন্তর্ভুক্তিকে শর্ত মনে করেন তাদের মতে, جمع منكر (অনির্দিষ্ট বহুবচন) عام ও خاص এর মাঝে واسطة তথা মাধ্যম। যেমন توضيح গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। আর عام এর দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ যেমন- قوم ও رهط কেননা, قوم শব্দটি তিন থেকে দশ পর্যন্ত মানুষের সমষ্টিকে বুঝায়। যেমনিভাবে رهط শব্দটি তিন হতে নয় পর্যন্ত সংখ্যার জন্যে প্রযোজ্য হয়, তবে قوم শব্দটি ব্যবহারের শর্ত হলো এর সমস্ত একক একত্রিত থাকা। তবে তোমার এই কথা جَائَنِى الْقَوْمُ اِلاَّ زَيْدًا (আমার নিকট যায়েদ ছাড়া সবাই এসেছে) এ বাক্যের মধ্যে একটি একককে استثناء করা এ বিবেচনায় শুদ্ধ হয়েছে যে, সকলের আগমন প্রত্যেক ব্যক্তির আগমনের দ্বারাই হয়ে থাকে।

তবে এটা এ কথার বিপরীত যেমন– বলা হল, يُطِيْقُ رَفْعَ هٰذَا الْحَجَرِ الْقَوْمُ اِلاَّ زَيْدًا (যায়েদ ছাড়া قوم এ পাথরটি উত্তোলনের ক্ষমতা রাখে।) কেননা, এক্ষেত্রে حكم সকলের সাথে সামগ্রিকভাবে সম্পর্ক রাখে। আর جَاءَ الْعَشَرَةُ اِلاَّ وَاحِدًا বলা শুদ্ধ হবে। পক্ষান্তরে الْعَشَرَةُ زَوْجٌ اِلاَّ وَاحِدًا বলা সহীহ হবে না।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله وَالْاٰخَرُ مِثَالُه قَوْمٌ وَرَهْطٌ الخ : ব্যাখ্যাকার বলেন– আ'মের দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ হলো– قوم ও رهط শব্দ। কারণ قوم শব্দটি মুফরাদ। এর দলিল এই যে, এর দ্বিবচন আসে قومان এবং বহুবচন আসে اقوام। আর এটা সুস্পষ্ট যে, মুফরাদ তথা একবচন শব্দেরই দ্বিবচন ও বহুবচন হয়ে থাকে। অতএব قوم শব্দটি শব্দগতভাবে আ'ম হবে না।

প্রশ্ন : বহুবচনেরও দ্বিবচন ও বহুবচন আছে। যেমন رماح শব্দটি رمح এর বহুবচন। অর্থ বর্শা। কিন্তু এর দ্বিবচন আসে رماجان এবং বহুবচন আসে رماحات. সুতরাং এর দ্বিবচন এবং বহুবচন আসাটা মুফরাদ হওয়ার দলিল হতে পারে না।

উত্তর : جمع এর বহুবচন ও দ্বিবচন আসাটা شاذ তথা বিরল। আর مفرد এর দ্বিবচন ও বহুবচন আসা বিরল নয়। আর বিরল বস্তু ধর্তব্য হয় না। কাজেই প্রশ্ন সংগত হবে না।

মোটকথা جمع শব্দের দ্বিবচন ও বহুবচন আসা গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু قوم শব্দের দ্বিবচন ও বহুবচন হওয়া তা মুফরাদ হওয়ার দলিল। অতএব قوم শব্দটি যেহেতু মুফরাদ। কাজেই শব্দগতভাবে তা আ'ম হবে না। কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে আ'ম। কারণ قوم দ্বারা ৩ থেকে ১০ পর্যন্ত সংখ্যক বোঝায়। যেমন رهط দ্বারা ৩ থেকে ৯ পর্যন্ত আফরাদ বোঝায়। তবে এর জন্য শর্ত এই যে, رهط এর সকল আফরাদ পুরুষ হয়ে থাকে। তার মধ্যে কেউ মহিলা থাকে না। আর قوم শব্দের জন্য শর্ত এই যে, তার সকল আফরাদ সমবেত থাকবে। অর্থাৎ قوم শব্দের ক্ষেত্রে সমষ্টির উপর বিধান আরোপিত হয়। প্রত্যেক্যের উপর ভিন্ন ভিন্ন হুকুম আরোপিত হয় না। যেমন– কোনো বাদশা যদি ঘোষণা দেন যে, যে কওম এ কেল্লায় প্রবেশ করবে তাদের এ পরিমাণ পুরস্কার দেয়া হবে। উক্ত কেল্লায় যদি কওমের সকলেই প্রবেশ করে তাহলে সকলেই পুরস্কারের অধিকার হবে। কিন্তু যদি দুই একজন প্রবেশ করে তাহলে পুরস্কারের অধিকার হবে না।

قوله وَاِنَّمَا يَصِحُّ الْاِسْتِثْنَاءُ الخ : ইবারতে একটি প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে।

প্রশ্ন : قوم শব্দের ক্ষেত্রে যেহেতু তার সকল আফরাদ এবং একক একত্রিত হওয়ার শর্ত। কাজেই جَائَنِى الْقَوْمُ اِلَّا زَيْدًا এর মধ্যে কওম থেকে একজনকে ইস্তেসনা করা কিভাবে বৈধ হতে পারে? কারণ এর দ্বারা বোঝা যায় যে, আসার হুকুমটি কওমের সমষ্টির উপর নয়। বরং প্রত্যেক ফরদের উপর ভিন্ন ভিন্নরূপে হয়েছে। সবার উপরে হলে যায়েদ যেহেতু কওমের মধ্যে শামিল ছিলো। কাজেই তার উপর আসার হুকুম বর্তাবে। আর এক্ষেত্রে ইস্তেসনা করাই সম্ভব হয় না।

উত্তর : এখানে ইস্তেসনা বিশুদ্ধ হওয়া খারেজী قرينة দ্বারা বোঝা যায়। আর তা হলো আসা ক্রিয়া। অর্থাৎ আসার বিধান নিঃসন্দেহে কওমের সবার উপরেই প্রযোজ্য হয়েছিলো। কিন্তু সকলের আসা যেহেতু প্রত্যেকের আসার মাধ্যমে হয়ে থাকে। এ কারণে তাদের এক فرد অর্থাৎ যায়েদকে ইস্তেসনা করা বৈধ। হ্যা, যদি এমন বলা হয় "এই কওম এ পাথরকে বহন করতে পারে যায়েদ ছাড়া" তাহলে ইস্তেসনা করা ঠিক হবে না। কারণ পাথর উঠানোর বিষয়টি কওমের সমষ্টির উপর সমষ্টিগতভাবেই সংশ্লিষ্ট। তাদের মধ্যে যায়েদও শামিল রয়েছে। সুতরাং যায়েদকে কওম থেকে খারিজ করা কিভাবে ঠিক হতে পারে? এ কারণেই যদি বলে جَائَنِى الْعَشَرَةُ اِلَّا وَاحِدًا তাহলে তা সঠিক। কারণ ১০ জনের উপর আসার বিষয়টি প্রত্যেকের আসার সাথে সংশ্লিষ্ট। অতএব ১ জনকে বাদ দেয়ার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা নেই। আর যদি اَلْعَشَرَةُ زَوْجٌ اِلَّا وَاحِدٌ বলে তাহলে তা ঠিক হবে না। কারণ عشرة এর উপর زوج এর হুকুম সমষ্টিগতভাবে সংশ্লিষ্ট। কাজেই ১ জনকে বাদ দিলে তা ঠিক হবে না। কারণ সেও তাদের মধ্যে দাখিল রয়েছে।

وَمَنْ وَمَا يَحْتَمِلَانِ الْعُمُوْمَ وَالْخُصُوْصَ وَاَصْلُهُمَا الْعُمُوْمُ يَعْنِى اَنَّهُمَا فِى اَصْلِ الْوَضْعِ لِلْعُمُوْمِ وَيُسْتَعْمَلَانِ فِى الْخُصُوْصِ بِعَارِضِ الْقَرَائِنِ سَوَاءٌ اُسْتُعْمِلَا فِى الْاِسْتِفْهَامِ اَمِ الشَّرْطِ اَوِ الْخَبَرِ وَمَا قِيْلَ اِنَّ الْخُصُوْصَ يَكُوْنُ فِى الْاَخْبَارِ فَمُنْتَقَضٌ لَا يَطَّرِدُ -

অনুবাদ ॥ আর من ও ما এ দুটি عام ও خاص উভয়ের সম্ভাবনা রাখে। তবে উভয়ের মৌলিকত্ব হলো عموم তথা ব্যাপকতা। অর্থাৎ এ দুটি গঠনগতভাবে عموم এর জন্যে গঠিত। তবে কোন قرينة সাপেক্ষে এ দুটো খাসের অর্থেও ব্যবহার হয়। চাই استفهام (প্রশ্নবোধক)-এর মধ্যে হোক অথবা شرط এর মধ্যে অথবা খবরের মধ্যে হোক। আর ইমাম ফখরুল ইসলাম বযদবীর মতে যা বলা হয়েছে যে, خصوص খবরসমূহের মধ্যে হয়ে থাকে। উক্ত বক্তব্যটি খণ্ডিত, বহুল প্রচলিত নয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله وَمَنْ وَمَا يَحْتَمِلَانِ الْعُمُوْمَ الخ : মুসান্নিফ (র) ব্যাপকতাবোধক শব্দসমূহের মধ্য থেকে من ও ما উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন– উভয় শব্দ আ'ম এবং খাছ উভয়ের সম্ভাবনা রাখে। যেমন– কেউ যদি من فى الدار প্রশ্ন করে। আর উত্তরে কেবল এক ব্যক্তি যথা– খালেদ বলা হয়, তাহলে তা সঠিক। এভাবে যদি কয়েকজন সম্পর্কে উল্লেখ করে। যেমন বললো– ঘরে খালেদ, হামেদ ও শাহেদ রয়েছে। তাহলে এ উত্তরও সঠিক। যদি শর্তের অর্থ উল্লেখ করে বলে مَنْ زَارَنِى فَلَهُ دِرْهَمٌ তাহলে যে ব্যক্তি তার সাথে সাক্ষাৎ করবে সেই দিরহামের যোগ্য হবে। যদি একজন সাক্ষাৎ করে সে অধিকারী হবে ও একাধিক ব্যক্তি সাক্ষাৎ করলে প্রত্যেকে অধিকারী হবে

যদি খবরের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে বলে أُعْطِىَ مَنْ زَارَنِىْ دِرْهَمٌ যে আমার সাথে সাক্ষাৎ করলো তাকে দেরহাম দান করা হয়েছে। যদি একজন ব্যক্তি সাক্ষাৎ করে তাহলে একজনকে-ই দেয়া হয়েছে। আর একাধিক ব্যক্তি সাক্ষাৎ করে থাকলে তাদের সবাইকে দেয়া উদ্দেশ্য হবে। মোটকথা مَنْ ও مَا শব্দ দুটি আ'ম হওয়ার এবং খাছ হওয়ার উভয়ের সম্ভাবনা রাখে। গঠনগতভাবে ব্যাপকতার জন্য গঠিত হয়েছে। আর মাজায স্বরূপ করীনা সাপেক্ষে খাছ এর অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

মুসান্নিফের ভাষ্যের ব্যাখ্যা : مَنْ ও مَا উভয়টি ব্যাপকতা এবং খাছ বোঝানোর জন্য গঠিত। অর্থাৎ উভয় শব্দ উভয় অর্থে মুশতারিক। মুসান্নিফের ভাষ্য وَاَصْلُهُمَا الْعُمُوْمُ এর উদ্দেশ্য এই যে, শব্দ দুটির ব্যবহার ব্যাপকতার অর্থেই অধিক; খাছ হওয়ার অর্থে কম।

ব্যাখ্যাকার বলেন– من এবং ما খাছ হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হওয়া সর্বক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। চাই উভয়টি জিজ্ঞাসা অর্থে ব্যবহৃত হোক চাই শর্তের অর্থে, চাই খবরের অর্থে। যেমন উদাহরণ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। ব্যাখ্যাকার বলেন– কোনো কোনো উসূলবিদ বলেন যে, مَنْ এবং مَا শর্ত ও জিজ্ঞাসা অর্থে ব্যবহৃত হলে তা কেবল ব্যাপকতা বোঝায়। খাছ হওয়া বোঝায় না। আর খবরের মধ্যে ব্যবহৃত হলে উভয়টি আ'মও বোঝায়, খাছ হওয়াও বোঝায়। অর্থাৎ খবরের ক্ষেত্রে উভয় খাছ হওয়া অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অন্যথায় জিজ্ঞিসা ও শর্তের ক্ষেত্রে শুধু ব্যাপকতা বোঝায়, খাছ হওয়া বোঝায় না।

বস্তুত তাদের এ উক্তিটি ত্রুটিপূর্ণ। কেননা কেউ যদি বলে مَنْ اَبُوْكَ তোমার পিতাকে? তাহলে উত্তরে ঐ ব্যক্তির নাম বলা হয় যে তার পিতা। লক্ষ্য করুন এখানে من শব্দটি জিজ্ঞাসা বোধক। কিন্তু খাছ অর্থ বোঝাচ্ছে। এভাবে مَادِيْنُكَ তোমার ধর্ম কি? এর উত্তরে মুমিন ব্যক্তি ইসলাম উল্লেখ করবে। কাজেই এখানেও ما প্রশ্ন বোধক হওয়া স্বত্ত্বে খাছ বোঝাচ্ছে। এ কারণে বিশুদ্ধ মত এই যে, উভয় শব্দ জিজ্ঞাসা, শর্ত ও খবর তিনো ক্ষেত্রে عموم ও خصوص বোঝায়।

وَمَنْ فِي ذَوَاتِ مَنْ يَعْقِلُ كَمَا فِي ذَوَاتِ مَالَا يُعْقَلُ اى الْاَصْلُ فِيْ مَنْ اَنْ يكون لِذواتِ مَن يعقِلُ كقوله عليه السّلام مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ وقد يُسْتعمَلُ فى غيرِ من يَعْقِل مجازًا كما فِيْ قوله تعالى فمِنْهُمْ مَن يَّمْشِى عَلٰى بَطْنِه وَالْاَصْلُ فِيْ مَا انْ يكون فِيْ ذواتِ مَالَا يَعْقِل يُقَال مَا فِى الدَّارِ فالجَوابُ دِرهمٌ او دِينارٌ لا زيدٌ او عمروٌ وقد يُسْتَعْمَل فِى غيرِها كمَا سَيَاتِى -

অনুবাদ ॥ من ***(যে) শব্দটি*** ذوى العُقول ***তথা বিবেক সম্পন্ন বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমনিভাবে*** ما (যা) শব্দটি غير ذوى العُقول তথা বিবেকহীন প্রাণী বা বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। من এর মৌলিকত্ব হলো তা জ্ঞানবানদের জন্যে ব্যবহৃত হবে। যেমন- রাসূল (স)-এর বাণী مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَه سَلَبُهٗ 'যে ব্যক্তি কোন হত্যাকৃতকে (কাফিরকে) হত্যা করবে সে তার দ্রব্য-সামগ্রীর মালিক হবে'। তবে কখনো কখনো রূপকভাবে জ্ঞানহীনের জন্যেও ব্যবহৃত হয়। যেমন- মহান আল্লাহর বাণী, فَمِنْهُمْ مَنْ يَّمْشِىْ তাদের মধ্যে কিছু আছে যারা পেটের ওপর চলাফেরা করে"। আর مَا এর মৌলিকত্ব হলো বিবেকহীনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হওয়া। যেমন বলা হয়- ما فى الدار ঘরের মধ্যে কি আছে? এর উত্তর হবে- غير ذوى العقول ছাড়া درهم দিরহাম دينار দীনার (ইত্যাদি)। যায়েদ অথবা আমর বলা যাবে না। তবে কখনো কখনো ভিন্ন অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যেমন অচিরেই আসছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله ومَنْ فِى ذَوَاتِ مَنْ يَعقِلُ الخ : মুসান্নিফ (র) বলেন- من শব্দের প্রকৃত ব্যবহার ذوى العُقول তথা বিবেক সম্পন্ন প্রাণীর ক্ষেত্রে হয়। কিন্তু মাজাযভাবে কখনো غير ذوى العُقول এর জন্যও ব্যবহৃত হয়। প্রথমটির উদাহরণ যেমন রাসূলুল্লাহ (স) এরশাদ করেছেন مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فله سَلَبُه এই হাদীসে من শব্দটি ذوى العُقول এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলার বাণী فَمِنْهُمْ مَنْ يَّمْشِىْ عَلٰى بَطْنِه এর মধ্যে من - غير ذوى العُقول তথা প্রাণীদের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

ما শব্দের মূল হলো غير ذوى العُقُول এর জন্য ব্যবহৃত হওয়া। কিন্তু মাজাযভাবে কখনো কখনো ذوى العُقول এর জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে এটা কিছু সংখ্যক আলিমের অভিমত। কারণ সংখ্যা গরিষ্ঠের মতে ما শব্দটি উভয়ের ক্ষেত্রে আ'ম। غير ذوى العقول এর ক্ষেত্রে ব্যবহারের উদাহরণ যেমন مَا فِى الدَّارِ এর উত্তরে দিরহাম, দীনার ইত্যাদি শব্দ বলা হয়। যায়েদ বা আমর বলা হয় না। আর ذوى العقول এর ক্ষেত্রে ব্যবহারের উদাহরণ আল্লাহ তা'আলার বাণী وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا আয়াতে ما দ্বারা আল্লাহ তা'আলা উদ্দেশ্য। যিনি ذوى العقول এর অন্তর্গত।

فَاذا قَالَ مَنْ شَاءَ مِنْ عَبِيْدِيْ العِتْقَ فَهُوَ حُرٌّ فَتَشَاؤا عُتِقُوا تفريعٌ لِكَوْنِ كَلِمَةِ مَنْ عَامَّةً وذٰلك لِاَنَّ مَعْنَاه كُلُّ مَنْ شَاءَ الْعِتْقَ مِنْ بَيْنِ عَبِيْدِيْ فَهو حُرٌّ وكَلِمَة مَنْ فِيْ نَفْسِهَا عامّةٌ و وُصِفَتْ بِصِفَةٍ عامّةٍ وهِي الْمَشِيْئَةُ ومَنْ يَحْتَمِلُ البيانَ فَاِنْ شَاءَ الكلُّ لابُدَّ ان يَعْتِقُوا جميعًا عَمَلًا بِعُمُوْمِ كَلِمةِ مَنْ بِخِلافِ مَا اذا قال مَنْ شِئْتَ مِنْ عَبِيْدِي عِتْقَه فَاَعْتِقْهُ بِاِسْنَادِ الْمَشِيْئَةِ اِلَى الْمَخَاطَبِ فانَّ لَهُ حِيْنَئِذٍ اَنْ يُّعْتِقَهُمْ اِلاَّ واحِدًا عند ابى حنيفة رح لِاَنَّ كَلِمَةَ مَن لِلْعُمُوم ومِنْ لِلتَّبْعِيْضِ فَلا يَسْتَقِيْمُ الْعَمَلُ بِهِمَا اِلاَّ اذا بَقِيَ واحِدٌ مِّنْهُمْ غَيْرُ مُعْتَقٍ وكَذا الْمَشِيْئَةُ صِفَةٌ خَاصَّةٌ لِلْمُخَاطَبِ وقِيْل كَلِمَةُ مِنْ لِلتَّبْعِيْضِ فِيْ كلٍّ مِنَ الْمِثَالَيْنِ لكنَّ فِى الْمِثَالِ الاَوَّلِ كُلٌّ مِّنَ الْعَبْدِ الشَّائِي بَعْضٌ مَعَ قطعِ النَّظْرِ عَن غيرِه فيَعْتِقُ الكُلُّ وفي الْمِثَالِ الثَّانِي الشَّائِيْ واحِدٌ يتعلَّقُ مَشِيْئَتُه بالكُلِّ دَفْعَةً فلاَ يَسْتَقِيْمُ اِلاَّ بِتَخْصِيْصِ الْبَعْضِ ولٰكِنْ يَرِدُ عَلَيْه اَنَّه اِنْ شَاءَ الكلُّ علىَ التَّرْتِيْبِ فحِيْنَئِذٍ يصدُقُ على كُلِّ واحدٍ انَّه شاءَ عِتْقَه حالَ كونِه بعضًا مِّن العَبِيْدِ فتَامَّلْ فِيْه -

অনুবাদ॥ ***সুতরাং যখন কেউ বলবে,*** الخ مَنْ شَاءَ مِنْ عَبِيْدِيْ ***আমার দাসদের মধ্য হতে যে আযাদ হতে চায় সে স্বাধীন, অতঃপর সকলেই আযাদ হতে চাইল তাহলে সকলেই আযাদ হয়ে যাবে।'*** من শব্দটি عام হওয়ার ক্ষেত্রে এটি একটি শাখা মাসআলা। কারণ এর অর্থ হলো আমার গোলামদের মধ্য হতে যে কেউ স্বাধীনতা কামনা করবে সেই স্বাধীন হবে। من শব্দটি নিজেই عام তাকে একটি صفة عامة (ব্যাপক সিফাত) দ্বারা গুণান্বিত করা হয়েছে। আর তা হলো, (المشيئة) ইচ্ছা প্রকাশ করা। من শব্দটি عموم (ব্যাপকতা) এর সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং যদি সকলেই স্বাধীন হতে চায়, তাহলে من শব্দের عموم এর ওপর عمل এর নিমিত্তে সকলেই স্বাধীন হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে একথাটি مَنْ شِئْتَ مِنْ عَبِيْدِيْ عِتْقَهُ فَاَعْتِقْه (আমার দাসদের মধ্য হতে যাকে তুমি স্বাধীন করতে চাও তাকে স্বাধীন কর) এক্ষেত্রে مشيئت তথা ইচ্ছাকে مخاطب (সম্বোধিত)-এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। এ অবস্থায় তার জন্যে একজন ব্যক্তি ব্যতিত সকলকে তার জন্যে আযাদ করে দেয়া জায়েয আছে। এটা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত। কেননা مَن শব্দটি عموم এর জন্যে ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে مِنْ - تبعيض তথা আংশিক বুঝানোর জন্যে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং একজনকে আযাদহীন (গোলাম অবস্থায়) না রাখা পর্যন্ত উভয় শব্দ (ما ও مَن) এর ওপর আমল করা সম্ভব হবে না। অনুরূপভাবে مشيئت (ইচ্ছা) হলো مخاطب-এর خاص সিফাত। আর কেউ কেউ বলেন, مِنْ শব্দটি উভয় উদাহরণেই আংশিক অর্থ বুঝানোর জন্যে। কিন্তু প্রথম উদাহরণে অন্যের প্রতি লক্ষ্য না করে প্রত্যেক আযাদকারী গোলাম بعض হিসেবে গণ্য। কাজে সবাই আযাদ হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় উদাহরণে আযাদকামী হলো একজন। আর একজনের ইচ্ছা সকলের সাথে সংশ্লিষ্ট। কাজেই কিছু সংখ্যককে خاص করা ছাড়া তা সহীহ হবে না। তবে এর ওপর প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, مخاطب যদি ধারাবাহিকভাবে সকলের আযাদী চায় তাহলে প্রত্যেকের ব্যাপারে এ কথা প্রযোজ্য হবে সে প্রত্যেক গোলামের بعض হওয়া অবস্থায় তার আযাদী চায়। সুতরাং গভীরভাবে চিন্তা করো।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله فاذا قال من شاء من عبيدى الخ :: ব্যাখ্যাকার বলেন- মুসান্নিফ (র) من শব্দ আ'ম হওয়ার বিষয়ে শাখা মাসআলা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন- কেউ যদি বলে مَنْ شَاءَ مِنْ عَبِيْدِي الْعِتْقَ فَهُوَ حُرٌّ আমার গোলামদের মধ্য থেকে যে আযাদ হতে চায় সে আযাদ। এর মধ্যে مَنْ শব্দটি আ'ম। আর مشيت হলো আ'মের সিফত। এটা আ'ম এ কারণে যে, সেটা من এর প্রতি সম্বন্ধিত হয়েছে। আর مَنْ হলো আ'ম অর্থাৎ মুসনাদ ইলায়হে আ'ম হওয়ার দ্বারা মুসনাদ তথা مشيت ও আ'ম হবে।

মোটকথা مَنْ শব্দটি প্রকৃত অর্থে আ'ম। আর مشيت যা একটি আ'ম সিফাত। তার সাথে বিশেষিত হয়েছে। বাকী مَنْ عبيدى এর مِن এটা تبعيض তথা অংশজ্ঞাপক হওয়াই অধিক প্রচলিত। তবে এর জন্য শর্ত হলো এর পরবর্তী অংশ এমন বস্তু হওয়া যা অংশ ও খণ্ড করা সম্ভব। অতএব যতোক্ষণ পর্যন্ত এর বিপরীত قرينه উল্লেখ না থাকবে ততোক্ষণ পর্যন্ত مِنْ শব্দটি تبعيض তথা অংশজ্ঞাপক হবে। কিন্তু মতনের মাসআলায় এর বিপরীত আলামত বিদ্যমান রয়েছে। কারণ مشيت টা من শব্দের প্রতি সম্বন্ধিত। আর مَنْ শব্দটি ব্যাপকতাবোধক। অতএব مشيت যা আ'ম সিফত তাও ব্যাপকতার অর্থকে দৃঢ় করবে। অতএব مشيت ব্যাপকতাবোধক সিফাতের আলামতের ভিত্তিতে সাব্যস্ত হলো যে, مِن عبيدى এর مِنْ শব্দটি تبعيضية (অংশ জ্ঞাপক) নয়। বরং তা বয়ানের জন্য। এ সময় অর্থ হবে- আমার যে সকল গোলামরা স্বাধীনতা চায় তারা সকলে স্বাধীন। এখন যদি সকল গোলামই স্বাধীনতা চায় তাহলে مَن শব্দের ব্যাপকতার ভিত্তিতে সকলেই স্বাধীন হয়ে যাবে। এর বিপরীতে কেউ যদি বলে مَنْ شِئْتَ مِنْ عَبِيْدِي عِتْقَهُ فَاعْتِقْهُ তুমি আমার গোলামদের মধ্যে থেকে যাকে স্বাধীন করতে চাও তাকে স্বাধীন করো। এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন- উক্ত ব্যক্তি একজন ছাড়া বাকী সকল গোলামকে স্বাধীন করার অনুমতি লাভ করবে। এখন যদি সে সকল গোলামকে একবারে স্বাধীন করে দেয় তাহলে একজন ছাড়া বাকী সকলে স্বাধীন হয়ে যাবে। আর এ একজন গোলাম নির্দিষ্ট করার এখতিয়ার থাকবে মণিবের। সাহিবাইনের মতে অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তি এখতিয়ারের ক্ষমতা লাভ করবে।

সাহেবাইন (র) এর দলিল এই যে, এক্ষেত্রে مَنْ شِئْتَ এর মধ্যে উল্লেখিত مَن শব্দটির ব্যাপকতার উপর আমল হয়ে যাবে। তাদের মতে مِنْ عبيدى এর مِن শব্দটি বয়ানের জন্যে নয়।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলিল ঃ উল্লেখিত উদাহরণে مَن শব্দটি ব্যাপকতার জন্যে। আর مِن হলো অংশ জ্ঞাপক (تبعيضية)। কারণ এখানে এর বিপরীত কোনো করীনা নেই। কেননা مَنْ شئت এর মধ্যে مشيت বিশেষভাবে মুখাতাবের প্রতি সম্বন্ধিত। আ'মের প্রতি সম্বন্ধিত নয়। যেমন من شاء এর মধ্যে ছিলো। কাজেই مَنْ شِئْتَ مِنْ عَبِيْدِي এর ব্যাপকতা موكد হবে না। সুতরাং এটা تبعيض বোঝানোর বিপরীতে কোনো করীনা থাকবে না। অতএব যখন বয়ানের কোনো করীনা নেই কাজেই এটা تبعيض এর জন্যে হবে।

মোটকথা مَن শব্দ যেহেতু ব্যাপকতা বোঝায়। আর مِن - تبعيض এর জন্য। কাজেই উভয়ের উপর **আমল করা** জরুরি হবে। আর আমল তখনই সম্ভব যখন একজন গোলাম স্বাধীন না হবে এবং বাকী সকলে স্বাধীন হয়ে যাবে।

তাওযীহ গ্রন্থকার বলেন- مَنْ شَاءَ مِنْ عَبِيْدِي এবং مَنْ شِئْتَ مِنْ عَبِيْدِي উভয় উদাহরণে مِن শব্দটি تبعيض এর জন্য; কিন্তু প্রথম উদাহরণে সকল গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। কারণ তাদের স্বাধীনতাকে তাদের ইচ্ছার সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। কাজেই সকলে স্বাধীনতা চাইলে তাদের প্রত্যেক গোলাম অন্যের প্রতি দৃষ্টি না করে "কিছু অংশ" সাব্যস্ত হবে। এই ক্ষেত্রে مِنْ تبعيضية এর উপরও আমল হয়ে যাবে। আর যেহেতু এক এক করে সকল গোলাম আযাদ হয়ে গেলো। কাজেই مَن এর ব্যাপকতার উপরও আমল হয়ে গেলো।

দ্বিতীয় উদাহরণ তথা مَنْ شئت من عبيدى এর মধ্যে কেবল একজনের ইচ্ছার প্রতি সম্বন্ধ করা হয়েছে। কাজেই তার ইচ্ছাটা সকল গোলামের সাথে একবারেই সংশ্লিষ্ট হবে। সুতরাং من تبعيضية এর অর্থ তখনই বৈধ হবে যখন কিছু সংখ্যক গোলামকে খাছ করা হয়। অর্থাৎ এক গোলাম স্বাধীন হবে না, বাকী সকলে স্বাধীন হবে। (অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

فَانْ قَالَ لِاَمَتِهِ اِنْ كَانَ مَافِىْ بَطْنِكِ غُلَامًا فَانْتِ حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ غُلَامًا وجَارِيَةً لَمْ تُعْتَقْ تفريعٌ لِكَوْنِ كلمة ما عامَّةٌ لانّ الْمَعْنٰى حِيْنَئِذٍ اِنْ كَانَ جَمِيْعُ مَا فِى بطنِكِ غلامًا فانتِ حُرّةٌ ولَمْ يَكُنْ كَذٰلِكَ بَلْ كَانَ بَعْضُ مَا فِى بطنِهَا غلامًا وبعضُهُ جاريةً فلم يُوْجَدُ الشرطُ لايُقال فحِيْنَئِذٍ يَنْبَغِى اَنْ يَجِبَ قِرأةُ جَمِيْعِ ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرانِ فِى الصَّلٰوةِ عملاً بقوله تعالٰى فَاقْرَؤُا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرانِ لِاَنَّا نقولُ بِناءُ الْاَمْرِ على التَّيَسُّرِ يُنافِى ذٰلكَ ومَا يَجِئُ بِمَعْنٰى مَنْ مجازًا كقوله تعالٰى وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ولم يتعرَّضْ لِمثلِ ذٰلك فِىْ مَنْ عَلٰى ما ذَكَرْتُ لِقِلَّتِه ويَدْخُلُ فِى صِفَاتِ مَنْ يَعْقِلُ اَيْضًا تقولُ مَا زيدٌ فجوابُه الكريمُ وقال اللّٰه تعالٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ اى الطَّيِّبَاتِ لَكُمْ -

অনুবাদ ॥ ***কেউ যদি তার দাসীকে বলে, তোমার পেটে যা আছে যদি ছেলে হয়, তাহলে তুমি আযাদ। অতঃপর সে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে প্রসব করল; তাহলে সে আযাদ হবে না।"*** ما শব্দটি عام হওয়ার ভিত্তিতে এটা একটা শাখা মাসআলা। কারণ, এমতাবস্থায় এর অর্থ হলো, তোমার গর্ভে যা আছে তার সম্পূর্ণটা যদি ছেলে হয়, তাহলে তুমি আযাদ। অথচ অনুরূপ হয়নি; বরং তার গর্ভের অংশ বিশেষ ছেলে ও অংশ বিশেষ কন্যা হয়েছে। সুতরাং, শর্ত পাওয়া যায়নি। এ কথা বলা যাবে না যে, আল্লাহর বাণী فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ (কুরআন হতে যতটুকু সহজ তা পাঠ করো।) এ অনুযায়ী আমল করার নিমিত্তে কুরআনের যতটুকু পাঠ করা সহজ তার সম্পূর্ণটা নামাযের মধ্যে পাঠ করা ওয়াজিব হবে। কেননা, আমার উত্তরে বলবো যে, امر এর ভিত্তি تيسر তথা সহজতার ওপর। এটা (جميع ماتيسر যতটুকু সহজ তার সম্পূর্ণটা পাঠ-এর) পরিপন্থী হয়। (কেননা, এমতাবস্থায় সহজতা কঠোরতায় পরিণত হবে।)

ما ***শব্দটি রূপকার্থে*** من ***এর অর্থে আসে।*** যেমন– আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا অর্থাৎ, শপথ আকাশের এবং সেই পবিত্র সত্তার যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন। من এর ব্যাপারে এরূপ উদাহরণ দেননি। কারণ, এর সংখ্যা খুবই নগণ্য। যেমন উল্লেখ করেছি। ***আর*** ما ***শব্দটি*** ذوى العقول ***এর***

(পূর্বের বাকী অংশ) قوله ولكن يَرِدُ عَلَيْهِ الخ : এটা একটা প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন : مَنْ شِئْتَ مِنْ عَبِيْدِىْ এর মধ্যে অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তি যদি সকল গোলামকে আযাদ করতে চায় এবং ইস্তেসনা ছাড়া তারা সকলে আযাদ হয়ে যায়। তাহলেও من تبعيضيه এর উপর আমল হবে। কেননা সে গোলামদেরকে ধারাবাহিকভাবে স্বাধীন করতে চেয়েছে। অর্থাৎ প্রথমে একজনকে, পরে আরেকজনকে এভাবেই সকলকে। এক্ষেত্রে প্রত্যেক গোলামের উপর এটা প্রযোজ্য হবে যে, সে উক্ত গোলামের স্বাধীন হওয়াকে এমন অবস্থায় চেয়েছে যে, সে অন্য গোলামদের অংশ বিশেষ। এক্ষেত্রে ইস্তেসনাবিহীন সকল গোলাম আযাদ হয়ে যায় এবং من تبعيضية এর উপরও আমল হয়ে যায়। কিন্তু আবু হানীফা (র) এর প্রবক্তা নন। তার মতে من شئت এর ক্ষেত্রে এক গোলাম ছাড়া বাকী সকলে আযাদ হয়ে যাবে। একজন অবশিষ্ট থাকা জরুরি।

উত্তর : ব্যাখ্যাকার فتامل فيه দ্বারা এর উত্তরের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। উত্তরের সার এই যে, লোকটির ইচ্ছা সকল গোলামদের সাথে ক্রমানুসারে সংশ্লিষ্ট হওয়া একটি বাতিনী বিষয়। যার উপর বিধান প্রযোজ্য হওয়া সম্ভব নয়। বরং সকল গোলামকে আযাদ করার দ্বারা এটা স্পষ্ট হয় যে, তার ইচ্ছা সকল গোলামের সাথে একই বার সংশ্লিষ্ট হয়েছে। এক্ষেত্রে تبعيض এর অর্থ পাওয়া যাওয়ার জন্য কিছু অংশকে আযাদ হওয়া থেকে খারিজ করা জরুরি। এ কারণেই বলা হয় যে, একজন গোলাম আযাদবিহীন থাকা জরুরি।

সিফাতের মধ্যেও প্রবিষ্ট হয়। যথা, তুমি বলতে পার- مَا زَيْدٌ (যায়েদ কেমন?) এর উত্তরে বলা হবে- الكريم। (দানশীল)। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ (যেসব মহিলাকে তোমাদের পছন্দ হয় বিবাহ করো।) অর্থাৎ, الطَّيِّبَاتُ لَكُمْ। (যারা তোমাদের কাছে পছন্দনীয়)।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ قوله فَإِنْ قَالَ لِأَمَتِهِ الخ : ব্যাখ্যাকার বলেন- মুসান্নিফ (র) এই ইবারত দ্বারা ما আ'ম হওয়ার ব্যাপারে শাখা মাসআলা বর্ণনা করছেন।

তিনি বলেন- কোনো ব্যক্তি যদি তার কোনো বাঁদীকে লক্ষ্য করে বলে إِنْ كَانَ مَا فِى بَطْنِكِ غلامًا فانتِ حُرَّةٌ "তোমার গর্ভস্থ সন্তানটি যদি পুত্র হয় তাহলে তুমি স্বাধীন" এখন সে একটি পুত্র ও একটি কন্যা সন্তান প্রসব করলো তাহলে সে স্বাধীন হবে না। কারণ ما শব্দটি আ'ম। কাজেই এর অর্থ হবে তোমার গর্ভে যা আছে তার পূর্ণটাই যদি পুত্র সন্তান হয় তাহলে তুমি স্বাধীন। কিন্তু পুত্র ও কন্যা ভূমিষ্ট হওয়ার দ্বারা তার গর্ভস্থ গোটা অংশ পুত্র হলো না। বরং তার এক অংশ বিশেষ হলো। কাজেই এক্ষেত্রে শর্ত পাওয়া গেলো না। সুতরাং বাঁদী স্বাধীন হবে না।

কোনো ব্যক্তি প্রশ্ন করে বলেন مَا فِى بَطْنِكِ এর মধ্যে ما শব্দটি شيئ অর্থে। আর شيئ হলো নাকেরা যা হাঁ বাচক বাক্যে খাছ হওয়া বোঝায়। সুতরাং অর্থ হবে তোমার গর্ভে যদি কোনো বস্তু পুত্র হয় তাহলে তুমি স্বাধীন। কাজেই পুত্র ও কন্যা ভূমিষ্ট হলে তথাপি শর্ত পাওয়া যাবে। আর শর্ত পাওয়া যাওয়ার দরুন বাঁদী স্বাধীন হয়ে যাবে।

উত্তর : এর উত্তর এই যে, ما শব্দটি شيئ নাকেরা অর্থে নয়। বরং شيئ معرّف بلام إِسْتِغراق অর্থে যা আ'ম হওয়া বোঝায়। সুতরাং এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হবে তোমার গর্ভের গোটাটা যদি পুত্র হয় তাহলে তুমি স্বাধীন। অতএব পুত্র ও কন্যা ভূমিষ্ট হওয়ার দরুন শর্ত পাওয়া গেলো না। ফলে বাঁদী স্বাধীন হবে না।

প্রশ্ন : কোনো কোনো ব্যক্তি প্রশ্ন করে বলেন ما শব্দ যদি ব্যাপকতা বোধক হয় তাহলে فاقرؤا ماتيسر من القران। আয়াতের উপর আমল করে কোরআনের মধ্যে যে পরিমাণ সহজ হয় তা সম্পূর্ণ পাঠ করা ওয়াজিব হওয়া জরুরি সাব্যস্ত হয়। অথচ কেউ এর প্রবক্তা নয়।

উত্তর : فاقروا শব্দটি আদেশ বাচক হওয়ার কারণে এর ভিত্তি হলো সহজতার উপর। অর্থাৎ নামাযের মধ্যে কোরআন তেলাওয়াতের বিষয়ে বান্দাদের উপর সহজতা অবলম্বন করা হয়েছে। আর جميع ما تيسر এর সম্পূর্ণ পাঠ ওয়াজিব করলে তা সহজতার পরিপন্থী সাব্যস্ত হয় । এ কারণে তা ওয়াজিব নয়। আয়াতের অর্থ হলো ভিন্ন ভিন্নভাবে যেখান থেকে সম্ভব তা পাঠ করো। এমন নয় যে, সামষ্টিকভাবে যেখানে যা সহজ তা সবই পাঠ করতে হবে।

قوله وَمَا يَجِيْئُ بِمَعْنَى مَنْ الخ : মুসান্নিফ (র) বলেন- ما শব্দটি রূপকভাবে من অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী والسماء وما بناها, এখানে ওয়াও বর্ণটি শপথের জন্য। আর ما দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলা। যিনি ذوى العقول এর অন্তর্গত। ব্যাখ্যাকার বলেন- ما শব্দটি রূপকভাবে من অর্থে ব্যবহৃত হওয়া উল্লেখ করা হলো। কিন্তু এর বিপরীতে من রূপক অর্থে ما অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়নি। কেননা এটা খুবই কম ব্যবহৃত এবং প্রথমটি অধিক ব্যবহৃত। কাজেই অধিক ব্যবহৃতটি উল্লেখ করার দ্বারা কম ব্যবহৃতটি উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

মুসান্নিফ (র) বলেন- ما শব্দটি ذوى العقول এর সিফাতের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন যদি مازيد বলা হয়। তাহলে এর উত্তর হবে- সে দয়ালু ইত্যাদি। যা ذوى العقول এর সিফাত। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ এর দ্বারা ما বর্ণটি কেনায়া স্বরূপ মহিলাদেরকে বুঝিয়েছে। আর তারা ذوى العقول এর অন্তর্গত তবে এখানে মহিলাদের সত্ত্বা উদ্দেশ্য নয়। বরং তাদের طيبات বিশেষণ উদ্দেশ্য। ব্যাখ্যাকার الطيبات। لكم দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ যে সকল মহিলা তোমাদের কাছে সতী-সাধবী মনে হয় তাদেরকে বিবাহ করো।

وَكُلٌّ لِلْإِحَاطَةِ عَلَى سَبِيلِ الْإِفْرَادِ اى جَعَلَ كُلَّ فَرْدٍ كَاَنْ لَيْسَ مَعَه غَيْرُه فَهٰذَا يُسَمّٰى عُمُوْمَ الْاَفْرَادِ وَهِىَ تَصْحَبُ الْاَسْمَاءَ فَتَعُمُّهَا اى تَدْخُلُ عَلَى الْاَسْمَاءِ فَتَعُمُّهَا دُوْنَ الْاَفْعَالِ لِاَنَّه لَازِمَةُ الْاِضَافَةِ وَالْمُضَافُ اِلَيْهِ لَا يَكُوْنُ اِلَّا اَسْمَاءً فَاِنْ قَالَ كُلُّ اِمْرَأَةٍ اَتَزَوَّجُهَا فَهِىَ طَالِقٌ يَحْنَثُ بِتَزَوُّجِ كُلِّ امْرَأَةٍ وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَى امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مَرَّتَيْنِ

অনুবাদ ॥ *كل শব্দটি পৃথক পৃথকভাবে সমস্ত একককে অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে ব্যবহৃত হয়।* অর্থাৎ, প্রত্যেক একককে এমনভাবে শামিল করে যেন তার সঙ্গে অন্য কেউ নেই। এটাকে عموم الافراد বলে। *এটা (كل) اسم এর সাথে ব্যবহৃত হয়ে তাকে, عام তথা ব্যাপক করে দেয়।* অর্থাৎ كل শব্দটি اسم এর জন্যে ব্যবহৃত হয়ে তাকে عام করে দেয়, এটা فعل এর জন্যে ব্যবহৃত হয় না। কেননা, এর জন্যে اضافت (সম্বন্ধ) অত্যাবশ্যক। আর اسم ব্যতিত অন্য কোনো শব্দ مضاف اليه হয় না। সুতরাং, যদি কেউ বলে- كُلُّ اِمْرَأَةٍ اَتَزَوَّجُهَا فَهِىَ طَالِقٌ (যে সব রমণীকে আমি বিবাহ করব তারা তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে)। এমতাবস্থায় যে কোনো রমণীকে বিবাহ করবে, প্রত্যেক রমণীর বিবাহের সাথে তার শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। (অর্থাৎ স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে) এক স্ত্রীর ওপর দুবার তালাক পতিত হবে না।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله وكُلٌّ لِلْاِحَاطَةِ عَلَى سَبِيلِ الْاِفْرَادِ الخ : মুসান্নিফ (র) বলেন– كل শব্দটি এককভাবে আফরাদ বা اجزاء তথা অংশসমূহকে বেষ্টন করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, كل শব্দটি তার পরবর্তী শব্দের প্রত্যেক একককে এমন অবস্থায় করে দেয় কেমন যেন তার সাথে অন্য কোনো একক নেই। এটাকে পরিভাষায় عموم افراد বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ كل انسان حيوان বাক্যটি موجبه كلية অর্থাৎ মানুষের প্রত্যেক একক হলো প্রাণী। অর্থাৎ মানুষের এক একক অন্য একক থেকে দৃষ্টি এড়িয়ে একটি প্রাণী। এভাবে ভিন্ন একটি একক অন্য সকল এককের প্রতি দৃষ্টি এড়িয়ে একটি প্রাণী। এভাবেই প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে। এমন নয় যে, মানুষের সকল একক সামষ্টিকভাবে একটি প্রাণী। এভাবে কেউ যদি তার ৪ জন স্ত্রীর ব্যাপারে বলে كُلُّ اِمْرَأَةٍ لِّىْ تَدْخُلُ الدَّارَ فَهِىَ طَالِقٌ "আমার প্রত্যেক স্ত্রী যে ঘরে প্রবেশ করবে সে তালাক"। এরপর তাদের মধ্যে থেকে ১ স্ত্রী ঘরে প্রবেশ করলো তাহলে তার উপর তালাক পতিত হবে। অন্যদের উপর তালাক পতিত হওয়ার উপর সেই তালাকপ্রাপ্ত হওয়া মওকূফ থাকবে না। মুসান্নিফ (র) বলেন– كل শব্দটি ইসম এর উপর প্রবেশ করে তার মধ্যে ব্যাপকতা সৃষ্টি করে। ফে'লের পূর্বে كل শব্দ ব্যবহৃত হয় না। কারণ كل শব্দটি হলো لازم الاضافة আর মুযাফ ইলায়হি সব সময় ইসম হয়ে থাকে। ব্যাখ্যাকার বলেন– كل শব্দ যেহেতু ইসমের ব্যাপকতা বোঝায়। সুতরাং কেউ যদি বলে كُلُّ اِمْرَأَةٍ اَتَزَوَّجُهَا فَهِىَ طَالِقٌ প্রত্যেক সে মহিলা যার সাথে আমি বিবাহ করবো সে তালাক"। তাহলে যার সাথেই সে বিবাহ করবে সে তালাক প্রাপ্তা হবে। সে যদি এক এর পর এক ৫০ জন মহিলাকেও বিবাহ করে তথাপি বিবাহ করা মাত্রই তালাক হয়ে যাবে। কিন্তু কোনো একজনকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করলে সে তালাক প্রাপ্তা হবে না। কারণ একজনের উপর দুবার তালাক পতিত হওয়ার ক্ষেত্রে বিবাহ ক্রিয়ার মধ্যে ব্যাপকতা থাকে। ইসম এর মধ্যে ব্যাপকতা থাকে না। কারণ মহিলা একজনই। যদিও বিবাহ ২বার হচ্ছে। অথচ كل শব্দটি ইচ্ছাবশত ইসমে এর ব্যাপকতা বোঝায়। ফে'লের ব্যাপকতা বোঝায় না।

وَلَمَّا كَانَتْ كَلِمَةُ كلّ لِعُمومِ مَدْخولِها فَإِنْ دَخَلَتْ عَلَى الْمُنَكَّرِ أَوْجَبَتْ عُمُومَ أَفْرادِهِ لأنّه مَدْلُولُها لغةً وإنْ دَخَلَتْ عَلَى المُعَرَّفِ أوْجَبَتْ عُمُومَ أَجْزائِهِ لأنّه مَدْلُولُها عُرْفًا ولهذا لَوْقالَ أنتِ طالِقٌ كُلَّ تَطْلِيقَةٍ يقعُ الثَّلثُ وإنْ قالَ كلَّ التَّطْلِيقَةِ يَقعُ واحدةٌ حَتّى فَرَّقُوا بَيْنَ قَوْلِهِم كُلُّ رُمَّانٍ مَاكولٌ وكلُّ الرُّمّانِ مَاكولٌ بالصِّدقِ والكِذْبِ اى بِصِدْقِ الأولِ وكِذْبِ الثّانِىْ لأنَّ مَعْنَى الاولِ كلُّ فردٍ مِّنَ الرُّمانِ مِمّا يَصْلَحُ انْ يُؤْكَلَ وهُوَ صَادِقٌ ومَعْنى الثّانى كلّ اجزاءِ الرُّمّانِ مِمّا يُؤكلُ وهو كِذْبٌ لِأَنَّ القِشْرَ لا يُؤكَلُ قَطُّ

অনুবাদ ॥ كل শব্দটি যেহেতু তার مدخول (যার ওপর তা প্রবিষ্ট হয় তা) কে عام তথা ব্যাপক করার জন্যে আসে। *সেহেতু* نكره *এর ওপর প্রবিষ্ট হলে তার সংখ্যা (একক) সমূহকে* عام *করে* দেবে। কেননা আভিধানিক অর্থ আর (كل) معرفه এর ওপর প্রবিষ্ট হলে তার অংশসমূহের عموم বা ব্যাপকতাকে অপরিহার্য করবে। কেননা, এটাই প্রচলিত (ও পারিভাষিক) অর্থ তার। অতএব কেউ যদি বলে- أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّ تَطْلِيقَةٍ (তুমি প্রত্যেক তালাকের সাথে তালাক) তাহলে তিন তালাক হয়ে যাবে। আর যদি বলে- كُلَّ التَّطْلِيقَةِ তাহলে এক তালাক পতিত হবে। *এমনকি তারা (উসূলবিদগণ)* كل ও كُلُّ رُمَّانٍ مَاكُولٌ الرُّمَانِ مَاكُولٌ *এর মধ্যে সত্য ও মিথ্যার (দ্বারা) পার্থক্য করেছেন।* অর্থাৎ, প্রথমটি সত্য এবং দ্বিতীয়টি মিথ্যা। কারণ, প্রথম বাক্যের অর্থ হলো, প্রত্যেকটি আনার খাওয়ার উপযোগী। আর তা সম্পূর্ণ সত্য। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ হলো, আনারের প্রত্যেক অংশই খাওয়ার উপযুক্ত। অথচ তা মিথ্যা। কেননা, এর চামড়া কখনো খাওয়ার উপযোগী নয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله ولَمَّا كَانَتْ كَلِمَةُ كُلٍّ الخ : ব্যাখ্যাকার বলেন كل শব্দ যেহেতু তার পরবর্তী অংশের ব্যাপকতা বোঝায়। এ কারণে كل শব্দটি যদি নাকেরার পূর্বে আসে তাহলে নাকেরার আফরাদের ব্যাপকতা সাব্যস্ত করবে। কেননা كل শব্দ তার পরবর্তীর আফরাদের ব্যাপকতা বোঝানোই হলো তার শাব্দিক অর্থ। কাজেই এর দ্বারা ব্যাপকতা বোঝাবে। আর মা'রেফার পূর্বে আসলে মা'রেফার অংশসমূহে ব্যাপকতা সাব্যস্ত করবে। কারণ এটা তার مدلول عرفي তথা প্রচলিত অর্থ। সুতরাং এর দ্বারা প্রচলিত অর্থে উক্ত বস্তুর অংশসমূহে ব্যাপকতা সাব্যস্ত করবে।

সারকথা এই যে, كل শব্দ নাকেরার পূর্বে আসলে عموم افراد বোঝায়। আর মা'রেফার পূর্বে আসলে عموم اجزاء বোঝায়। পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, اجزاء তথা অংশসমূহের সমষ্টির নাম হলো كلى এ সমষ্টিকে একত্রে كلى বলে। كلى তার আফরাদের উপর প্রযোজ্য হয়। যেমন زيدٌ انسانٌ কিন্তু كل তার اجزاء এর উপর প্রযোজ্য হয় না। যেমন يَدُ خالدٍ خالدٌ বলা যায় না।

নাকেরা এবং মা'রেফার মধ্যে এ মাসআলায় ব্যবধান সুস্পষ্ট হবে যে, কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে أنتِ طالقٌ كُلَّ تَطْلِيقَةٍ তাহলে স্ত্রীর উপর ৩ তালাক পতিত হবে। আর যদি انتِ طالقٌ كُلَّ التَّطْلِيقَةِ বলে তাহলে ১ তালাক পতিত হবে। কারণ প্রথম ক্ষেত্রে كل শব্দের পরে নাকেরা আসার কারণে তালাকের আফরাদের মধ্যে উমূম সাব্যস্ত করবে। আর তালাকের সম্পূর্ণ আফরাদ হলো ৩। কাজেই ৩ তালাক পতিত হবে। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মা'রেফার পূর্বে, আসার কারণে তালাকের অংশসমূহে উমূম বোঝাবে। আর এর গোটা অংশের সমষ্টি হলো ১ তালাক, কাজেই ১ তালাক পতিত হবে।

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

وَاِذَا وَصَلَتْ بِمَا اَوْجَبَتْ عُمُوْمَ الاَفْعَالِ بِاَنْ يَقُوْلَ كُلَّمَا تَزَوَّجْتُ اِمْرَأَةً فَهِىَ طَالِقٌ بِمَعْنَاه كُلَّ وقتٍ اَتزوَّجُ امرأةً فهِى طَالِقٌ فَهِى قَصْدًا يَقعُ عَلٰى عُمُوْمِ التَزْوِيْجَاتِ وَيَثْبُتُ عُمُوْمُ الاَسْمَاءِ فِيْه ضِمْنًا لِاَنّ عُمُوْمَ التَزوّجِ لا يَكُوْنُ اِلَّا بِعُمُوْمِ النِّسَاءِ فَيَحْنَثُ بِكُلّ تزوّجٍ سَوَاءٌ تَزوَّجَ امرأةً مِرارًا اَوْتَزوّجَ امرأةً بَعْدَ امرأةٍ كَعُمُوْمِ الاَفْعَالِ فِىْ كُلّ اى كَمَا اَنّ عُمُوْمَ الاَفْعَالِ يَثْبُتُ فِى لَفْظِ كُلّ ضِمْنًا لِعُمُوْمِ الاَسْمَاءِ بِعَكْسِ كَلِمَةِ كُلَّمَا -

অনুবাদ ॥ ***যখন*** كل ***শব্দ*** ما ***এর সাথে যুক্ত হয় তখন*** عموم افعال ***তথা ক্রিয়ার ব্যাপকতাকে ওয়াজিব করে।*** যেমন- এভাবে বলবে যে, كُلَّمَا تَزَوَّجْتُ اِمْرَأَةً فَهِىَ طَالِقٌ (যখনই আমি কোনো মহিলাকে বিবাহ করবো সে তালাক হয়ে যাবে)। এর অর্থ হবে, যে কোনো সময় আমি কোনো মহিলাকে বিবাহ করবো, সে তালাক হয়ে যাবে। সুতরাং, এটা ইচ্ছাকৃতভাবে বিবাহের عموم (ব্যাপকতা)-এর ওপর প্রয়োগ হবে।

আর এতে আনুষঙ্গিকভাবে عموم اسماء ***সাব্যস্ত হয়।*** কেননা, মহিলাদের عموم ব্যতিত বিবাহের عموم হতে পারে না। সুতরাং, প্রত্যেক বিবাহের দ্বারাই শপথ ভঙ্গকারী হবে। চাই সে একই মহিলাকে একাধিকবার বিবাহ করুক, অথবা এক মহিলার পর আরেক মহিলাকে বিবাহ করুক। ***যদ্রূপ*** كل ***শব্দের মধ্যে*** عموم افعال ***তথা ক্রিয়ার ব্যাপকতা সাব্যস্ত হয়ে থাকে।*** অর্থাৎ যদ্রূপ عموم افعال টা كل শব্দের মধ্যে عموم اسماء এর জন্যে كلما শব্দের বিপরীত সাব্যস্ত হয়ে থাকে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله وَاِذَا وَصَلَتْ بِمَا الخ : মুসান্নিফ (র) বলেন كل শব্দ যদি ما এর সাথে মিলিত হয় তখন তা عموم افعال সাব্যস্ত করে। অর্থাৎ যে সকল ফে'লের পূর্বে كلما আসে كلما শব্দটি সেগুলোর মাসদারের মধ্যে উমূম সাব্যস্ত করে। কারণ كل শব্দটি لازم الاضافة আর ফে'ল মুযাফ ইলায়হি হয় না। এ কারণে ফে'লের পূর্বে ما مصدرية আনা হয়েছে। যাতে তা মাসদারের তাবিলে হয়ে মুযাফ ইলায়হি হতে পারে। তবে মাসদারটি সময়ের অর্থ বুঝাবে। আর كُلَّمَا تَزَوَّجْتُ امرأةً فَهِىَ طَالِقٌ বাক্যের অর্থ হবে كُلَّ وَقْتٍ اَتَزَوَّجُ امرأَةً فَهِىَ طَالِقٌ অর্থাৎ যখনই কাউকে বিবাহ করবো সে তালাক। অতএব এ বাক্যটি স্বেচ্ছায় বিবাহের ব্যাপকতার বুঝাবে। অর্থাৎ যখনই সে বিবাহ করবে তখনই তালাক হয়ে যাবে। তবে عموم افعال এর অধীনে عموم اسماء ও সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কারণ ফে'ল ইসম থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। অতএব ফে'লের মধ্যে যখন উমূম হবে তার অধীনে ইসমের মধ্যেও উমূম সাব্যস্ত হবে। আর বিবাহ ছাড়া মহিলাদের মধ্যে ব্যাপকতা হয় না। অতএব ফে'লের অধীনে যখন ইসম এর মধ্যে ব্যাপকতা সাব্যস্ত হলো তখন كُلَّمَا تَزَوَّجْتُ امرأةً فَهِى طَالِقٌ বাক্য বলার ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি প্রত্যেক বিবাহের সময় হানিস হয়ে যাবে। অর্থাৎ তার স্ত্রীর উপর তালাক বর্তাবে। চাই একজন মহিলাকে একাধিকবার বিবাহ করুক কিংবা ভিন্ন ভিন্ন মহিলাকে বিবাহ করুক। এ বিষয়টি এমন যেমন كل শব্দ ما ছাড়া عموم اسماء কে ইচ্ছাপূর্বক সাব্যস্ত করে। কিন্তু عموم اسمام এর অধীনে عموم افعال ও সাব্যস্ত হয়ে যাচ্ছে।

(পূর্বের বাকী অংশ) নাকেরা এবং মা'রেফার মাঝে পার্থক্য বর্ণনা প্রসঙ্গে মুসান্নিফ (র) বলেন কেউ যদি كل رمان ماكول বলে তাহলে এটা বৈধ হবে। আর যদি كل الرمان ماكول বলে তাহলে তা মিথ্যা হবে। কারণ প্রথম সূরতে নাকেরার আগে আসার কারণে তার অর্থ হলো আনারের প্রত্যেক ফরদ বা এককেকে খাওয়া যায়। আর এটা সঠিক কথা। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ মারেফার পূর্বে আসার সূরতে অর্থ হবে- আনারের সকল অংশ খাওয়া হয়। এটা ভুল। কেননা আনারের খোসা খাওয়া হয় না।

وكَلِمَةُ الْجَمِيْعِ تُوجِبُ عمومِ الاجْتِماعِ دُوْنَ الْاِنْفِرادِ كَمَا كَانَ فِيْ لَفْظِ كُلِّ فَيُعْتَبَرُ جَمِيْعُ مَاصَدَقَ عليهِما بَعْدَهٗ مُجْتَمِعَةً مَعًا حَتّٰى اِذَا قَالَ جَمِيْعُ مَنْ دَخَلَ هٰذَا الْحِصْنَ اَوَّلًا فَلَهٗ مِنَ النَّفْلِ كَذا فَدَخَلَ عَشَرَةٌ مَعًا اَنَّ لَهُمْ نَفْلًا واحدًا بَيْنَهُمْ جَمِيْعًا والنفلُ هُوَ ما يُعْطِيْهِ الامامُ زائدًا عَلٰى سَهْمِ الْغَنِيْمَةِ فَاِنْ دَخَلَ عشرةٌ مَعًا فِيْ صورةِ الْجَمِيْعِ يكونُ الْكُلُّ مُشْتَرِكًا بَيْنَ ذٰلِكَ النَفْلِ الْمَوْعُوْدِ عَمَلًا بِحَقِيْقَةِ وانْ دَخَلُوا فُرادٰى يَسْتَحِقُّ النَّفْلَ الاَوَّلُ خَاصَّةً عَمَلًا بِمَجَازِهٖ وهُوَ ان يُّجْعَلَ بِمَعْنٰى كُلٍّ - وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِاَنَّه يَلْزَمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيْقَةِ والْمَجَازِ حِيْنَئِذٍ والجوابُ اَنَّهٗ لا يُسْتَعَارُ بِمَعْنٰى كُلٍّ بِعَيْنِهٖ لِاَنَّه لَوْ كَانَ كَذٰلِكَ كَانَ لِلْكُلِّ نفلٌ تامٌّ فِيْ صُوْرَةِ مَا دَخَلُوْا مَعًا بَلْ هُوَ مَجازٌ عَنِ السَّابِقِ فِي الدُّخُوْلِ واحدًا كَانَ او جماعةً فَيَكُوْنُ لِلْجَمَاعَةِ نَفْلٌ واحِدٌ كَمَا هُوَ لِلْاَوَّلِ الْوَاحِدِ عَمَلًا بِعُمُوْمِ الْمَجَازِ والاَوْلٰى اَنْ يُقَالَ اِنَّ الْغَرَضَ مِنْ هٰذا الْكَلامِ هُوَ اِظْهَارُ الشَّجَاعَةِ والْجَلَادَةِ فَاِذَا اسْتَحَقَّهٗ جماعةٌ بِاعْتِبَارِ ظَاهِرِ مَعْنَاهُ الْحَقِيْقِيِّ فَاسْتِحْقَاقُ الْوَاحِدِ لَهٗ بِالطَّرِيْقِ الْاَوْلٰى بِدَلَالَةِ النَّصِّ لانّه فِيْهِ اِظْهَارُ كَمَالِ الشَّجَاعَةِ -

অনুবাদ ॥ আর جميع শব্দটি عموم اجتماع *(সামগ্রিক ব্যাপকতা) সাব্যস্ত করে।* عموم انفرادى *(এককভাবে ব্যাপকতা) সাব্যস্ত করে না।* যেমন- كل শব্দের দ্বারা عموم انفرادى সাব্যস্ত হয়। সুতরাং جميع শব্দের পরবর্তী এককগুলো যে বস্তুগুলোর জন্য প্রযোজ্য হবে, সে সবগুলো সমষ্টিগতভাবে ধর্তব্য হবে। *ফলে কোনো কমান্ডার যদি জিহাদের সময় এরূপ ঘোষণা দেন যে,* جَمِيْعُ مَنْ دَخَلَ هٰذَا الْحِصْنَ اَوَّلًا فَلَهٗ مِنَ النَّفْلِ كَذَا *(ঐ সব ব্যক্তি যারা প্রথমতঃ এ দুর্গে প্রবেশ করবে তারা গনিমতের মাল হতে এ পরিমান পাবে)। অতঃপর একই সাথে দশ ব্যক্তি প্রবেশ করল। এমতাবস্থায় এ দশজনের সবার জন্য একটি মাত্র গনিমত লাভ হবে।* আর কমান্ডার গনিমতের মাল হতে কোনো ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য অংশের অতিরিক্ত যা প্রদান করে তাকে নফল বলে। সুতরাং جميع বলার ক্ষেত্রে দশজন একই সাথে প্রবেশ করলে তারা সকলেই প্রতিশ্রুত নফলের মধ্যে অংশীদার হবে, যাতে جميع শব্দের হাকীকতের ওপর আমল হয়ে যায়। পক্ষান্তরে তারা যদি পৃথকভাবে একজন একজন করে প্রবেশ করে, তাহলে কেবল সর্বাগ্রে যে ব্যক্তি প্রবেশ করেছে সেই নফলের মালিক হবে। তাহলে جميع শব্দটির مجاز (রূপকার্থ)-এর ওপর আমল হয়ে যাবে। অর্থাৎ جميع শব্দটিকে كل এর অর্থে প্রয়োগ করা হবে।

এর ওপর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, তাহলে এমতাবস্থায় তো حقيقة ও مجاز একত্রিত হওয়া অনিবার্য হয়ে যায়। এর উত্তরে বলা হবে যে, جميع শব্দটিকে হুবহু كل শব্দের অর্থে استعارة স্বরূপ নেয়া

যায় না। কেননা তা হলে যখন তারা একই সাথে প্রবেশ করেছিল, সে অবস্থায় প্রত্যেকের জন্যে পূর্ণ একটি করে نفل সাব্যস্ত হতো; সুতরাং প্রবেশ করার মধ্যে অগ্রগামী হওয়ার অর্থে এটা مجاز হয়েছে। চাই একজন হোক বা এক দল হোক। কাজেই একদলের জন্যেও এক নফলই হবে। যদ্রূপ সর্বপ্রথমে প্রবেশকারী একজনের জন্যে হয়ে থাকে, এটা عموم مجاز এর ওপর আমল করে এরূপ হয়েছে। তবে এভাবে বলা উত্তম যে, বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রকাশ করা হলো এ বাক্যটির উদ্দেশ্য (কমান্ডারের পক্ষ হতে)। যখন এর (جميع শব্দের) হাকীকী অর্থ প্রকাশের দিক বিবেচনায় একটি দল এর (পরিপূর্ণ এক অংশের) প্রাপক হতে পারে, তখন دلالة النص এর বিবেচনায় উত্তমভাবেই একজন তার উপযুক্ত হতে পারবে; কেননা, এর মধ্যে পূর্ণ বীরত্ব প্রকাশ পেয়ে থাকে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ قوله وَكَلِمَةُ الْجَمِيعِ تُوْجِبُ الخ : মুসান্নিফ (র) বলেন– جميع শব্দটি তার পরবর্তীতে উল্লেখিত শব্দের আফরাদের মধ্যে সমষ্টিগতভাবে ব্যাপকতা সাব্যস্ত করে। ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রত্যেক ফরদের সাথে বিধান সংশ্লিষ্ট হয় না। যেমন– كل শব্দ তার মাদখুলের আফরাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্নভাবে ব্যাপকতা সাব্যস্ত করে। সুতরাং جميع শব্দের মাদখূল তথা পরবর্তী উল্লেখিত শব্দটি যে সকল বস্তুর উপর প্রযোজ্য হবে সেসকল বস্তু সমষ্টিগতভাবে একত্রিত ধর্তব্য হবে।

এ সূত্রে জিহাদ চলাকালে যদি সেনাপতি এ ঘোষণা করেন جَمِيعُ مَنْ دَخَلَ هٰذَا الْحِصْنَ اَوَّلاً فَلَهُ مِنَ النَّفْلِ كَذَا অর্থাৎ "সে সকল মানুষ যারা সর্বপ্রথম এ কিল্লায় প্রবেশ করবে তাদেরকে এ পরিমাণ পুরস্কার দেয়া হবে"। এরপর ১০ ব্যক্তি একত্রে উক্ত কিল্লায় প্রবেশ করলো তাহলে তাদের সবার জন্য ১টি পুরস্কার সাব্যস্ত হবে। তাতে তারা সকলে সমান অংশীদার হবে।

ব্যাখ্যাকার বলেন– নফল দ্বারা উদ্দেশ্য এমন মাল যে মালকে সেনাপতির পক্ষ থেকে গণিমতের অংশ ছাড়া পুরস্কার স্বরূপ অতিরিক্ত প্রদান করা হয়। অর্থাৎ কারো কর্মনৈপূর্ণের দরুন তার মূল প্রাপ্য থেকে অতিরিক্ত অংশ দেয়াকে নফল বলা হয়।

মোটকথা مَنْ دَخَلَ هٰذَا الحِصْنَ এর উপর যদি جميع শব্দ আসে। আর ১০ জন ব্যক্তি একই সময় কিল্লায় প্রবেশ করে তাহলে একই পুরস্কারের মধ্যে ১০ ব্যক্তি সমভাবে অংশীদার হবে। কারণ جميع শব্দটির হাকীকত হলো عموم اجتماع অর্থাৎ সমষ্টিগতভাবে বিধানের সমষ্টি বোঝায়। আর ১০ ব্যক্তিকে পুরস্কারের মধ্যে শামিল করার দ্বারা عموم اجتماع এর অর্থ লাভ হয়। যদি ১০ ব্যক্তি ১ জনের পর ১ জন কিল্লায় প্রবেশ করে তাহলে যে সর্বপ্রথম প্রবেশ করবে সে একই কেবল উক্ত পুরস্কারের অধিকারী হবে। এ সময় جميع শব্দের হাকিকী অর্থ عموم اجتماع এর উপর আমল সম্ভব হবে না। তবে তার রূপক অর্থের উপর আমল হয়ে যাবে।

جميع শব্দের রূপক অর্থ এই যে, তাকে كل এর অর্থে নিতে হবে। এ সময় جميع শব্দটি হবে রূপক অর্থে كل এর অর্থে। সুতরাং جَمِيعُ مَنْ دَخَلَ هٰذَا الْحِصْنَ اَوَّلاً فَلَهُ مِنَ النَّفْلِ كَذَا অর্থ হলো كل من دخل الخ হবে। আর পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, كل শব্দ এমনভাবে তার আফরাদকে বেষ্টন করে নেয়ার জন্যে ব্যবহৃত হয় যে, তার মধ্যে প্রত্যেক ফরদ ভিন্নভাবে ধর্তব্য হয়। অতএব كُلُّ مَنْ دَخَلَ هٰذَا الْحِصْنَ اَوَّلاً فَلَهُ مِنَ النَّفْلِ كَذَا এর অর্থ এই হলো যে, প্রত্যেক সে ব্যক্তি যে সবার আগে কিল্লায় প্রবেশ করবে সে এই পরিমাণ পুরস্কারের অধিকারী হবে। ১০ ব্যক্তি একা একা প্রবেশ করার ক্ষেত্রে সবার আগে যে প্রবেশ করবে সেই পুরস্কারের অধিকারী হবে। আর جميع শব্দ যেহেতু রূপক অর্থে كل এর অর্থে جَمِيعُ مَنْ دَخَلَ الخ এর সূরতেও ১০ ব্যক্তি একের পর এক প্রবেশ করলে সবার আগে প্রবেশকারী পুরস্কার পাবে। كلকে মাজাযরূপে جميع অর্থে এজন্যে নেয়া হয়েছে যে, كل এবং جميع শব্দ

উভয়ের মধ্যে মিল রয়েছে। কেননা উভয়টি আফরাদকে বেষ্টন করে নেয়ার জন্য আসে তবে পার্থক্য এতোটুকু যে, كل শব্দটি সকল আফরাদকে বেষ্টন করে ভিন্ন ভিন্নভাবে। আর جميع শব্দ সমষ্টিগতভাবে বেষ্টন করে।

মোটকথা ১০ ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্নভাবে কেল্লায় প্রবেশ করার ক্ষেত্রে جميع শব্দের হাকীকী অর্থের উপর আমল করা অসম্ভব হয়ে যায়। একারণে মাজাযী অর্থের উপর আমল করা হবে। অর্থাৎ এক ক্ষেত্রে جميع এর হাকীকী অর্থ উদ্দেশ্য। আরেক ক্ষেত্রে মাজাযী অর্থ উদ্দেশ্য অথচ হাকীকত ও মাজায একত্রিত হওয়া বৈধ নয়।

এর উত্তর এই যে, جميع শব্দটি হুবহু كل অর্থে মাজাযরূপে ব্যবহৃত হয়নি। কেননা جميع শব্দটি যদি হুবহু كل এর অর্থে আসে তাহলে ১০ ব্যক্তির একত্রে কিল্লায় প্রবেশ করার সময় প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পুরস্কার দিতে হতো। যেমন সামনের ইবারতে উল্লেখিত হয়েছে। অথচ এখানে ১০ ব্যক্তির জন্য শুধু ১টি পুরস্কার মিলছে। অতএব প্রতীয়মান হলো যে, جميع শব্দটি হুবহু كل অর্থে নয়। বরং جميع من دخل اولا মাজাজ স্বরূপ سابق في الدخول অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ যে-ই কেল্লায় প্রবেশ করার ক্ষেত্রে অগ্রগামী হবে সে পুরস্কারের অধিকারী হবে। চাই প্রবেশকারী ১ জন হোক বা গোটা দল। ১জন হলে পূর্ণ পুরস্কার সে একা পাবে। আর দল হলে তারা সকলেই ১ পুরস্কারে অধিকারী হবে। এক্ষেত্রে عموم مجاز এর উপর আমল হবে।

عموم مجاز বলা হয় শব্দ দ্বারা এমন রূপক অর্থ গ্রহণ করা যার হাকীকী অর্থও তার একটি ফরদ হয়। যেমন اسد শব্দ দ্বারা বাহাদুর উদ্দেশ্য নেয়া। বাঘও বাহাদুরের একটি ফরদ। এভাবে এখানে جميع من دخل শব্দ দ্বারা রূপক অর্থে سابق في الدخول উদ্দেশ্যে হবে। আর এর এক ফরদ جميع শব্দের হাকীকী অর্থ তথা দল। সুতরাং যখন جميع من دخل الخ এর ব্যবহার উমূমে মাজায হিসেবে سابق في الدخول অর্থে হবে। আর তা একজনও হতে পারে এবং দলও হতে পারে। সুতরাং এখন হাকীকাত ও মাজায একত্রিত হওয়া সাব্যস্ত হবে না।

ব্যাখ্যাকার বলেন– ভিন্ন ভিন্ন ১০ ব্যক্তি কিল্লায় প্রবেশ করার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যে প্রবেশ করবে। সে একাই সম্পূর্ণ পুরস্কার পাবে। এর সর্বোৎকৃষ্ট কারণ এই যে, جميع من دخل الخ বাক্য দ্বারা সেনাপতির উদ্দেশ্য হলো বীরত্ব প্রকাশ করা। অর্থাৎ সর্বাগ্রে প্রবেশকারী বীর গণ্য হবে। এ কারণেই সে পুরস্কারের অধিকারী হবে। সুতরাং যখন ১০ ব্যক্তির একই সাথে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে جميع শব্দের জাহেরী হাকীকী অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে ১০ ব্যক্তির ১ দল পুরস্কারের অধিকারী হয় তখন دلالة النص হিসেবে প্রমাণিত হয় যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রবেশের ক্ষেত্রে আরো উত্তমরূপে প্রথম প্রবেশকারী পুরস্কারের অধিকারী হবে। কারণ ১০ ব্যক্তির একত্রে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে যদি বীরত্বের প্রকাশ ঘটে তাহলে ১ ব্যক্তি সর্বাগ্রে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে পূর্ণ বীরত্ব প্রকাশ পাবে। অতএব মূল বিরত্ব প্রকাশ যেহেতু পুরস্কারের অধিকারী হওয়ার সবাব। কাজেই পূর্ণ বিরত্ব প্রকাশের ক্ষেত্রে আরো উত্তমরূপে পুরস্কারের অধিকারী হওয়ার সবাব হবে।

প্রশ্ন: কোনো কোনো ব্যক্তি এর উপর প্রশ্ন করেছেন যে, دلالت النص ধর্তব্য হয় কোরআন মজীদের মধ্যে। সাধারণ মানুষের কথার মধ্যে নয়। অতএব সেনাপতির বাক্য جميع من دخل দ্বারা دلالت النص স্বরূপ এক ব্যক্তির জন্য পুরস্কারের অধিকারী হওয়া সাব্যস্ত করা ঠিক হবে না।

উত্তর: এ প্রশ্নটি সম্পূর্ণ অনর্থক। কারণ আল্লাহর বাণীর মধ্যে যেরূপ دلالت النص ধর্তব্য হয় তদ্রূপ মানুষের কথার মধ্যেও ধর্তব্য হয়। যেমন মণিব যদি তার গোলামকে বলে لا تعط ذرة তুমি কাউকে এক যাররাও দিবে না। তাহলে এ কথার দ্বারা এক যাররার অধিক প্রদান থেকে নিষেধাজ্ঞা আরো উত্তম রূপে বোঝাবে। আর এটাই হলো دلالت النص

وَفِيْ كَلِمَةِ كُلِّ يَجِبُ لِكُلِّ مِنْهُمُ النَّفْلُ يعني إذا قالَ كُلُّ مَنْ دخل هذا الحِصْنَ أَوَّلاً فَلَهُ مِنَ النَّفْلِ كَذَا فَدَخَلَ عَشَرَةٌ معًا يَجِبُ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُم نَفْلٌ تامٌ لأَنَّ كَلِمَةَ كُلِّ لِلْاحاطَةِ عَلَى سَبِيْلِ الْإِفْرادِ فَاعْتُبِرَ كُلُّ واحِدٍ مِنَ الدَّاخِلِيْنَ كَانَ لَيْسَ مَعَه غَيْرُه وهُوَ أَوْلَى بِالنِّسْبَةِ الَى مَنْ تَخَلَّفَ مِنَ النَّاسِ وَلَمْ يَدْخُلْ ولَوْ دَخَلَ عَشَرَةٌ فُرادَى كانَ النَّفْلُ لِلاوَّلِ خاصَّةً لِأَنَّه الاوَّلُ مِنْ كلِّ وجهٍ وكلمَةُ كلٍ يَحْتَمِلُ الخُصُوصَ -

---

অনুবাদ ॥ আর كل শব্দের মধ্যে প্রত্যেকের জন্যই একটি نفل সাব্যস্ত হবে। অর্থাৎ যদি কেউ বলে كل مَنْ دَخَلَ هٰذَا الْحِصْنَ أَوَّلاً فَلَهُ مِنَ النَّفْلِ كَذَا (যারা দুর্গে সর্বপ্রথম প্রবেশ করবে তারা প্রত্যেকেই এ পরিমাণ নফল পাবে)। অতঃপর দশজন একই সঙ্গে প্রবেশ করে। এমতাবস্থায় তাদের প্রত্যেকের জন্যে একটি পূর্ণ নফল ওয়াজিব হবে। কেননা, كل শব্দটি পৃথকভাবে প্রত্যেককে অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কাজেই প্রত্যেক প্রবেশকারীকে এক্ষেত্রে এভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে যে, যেন তার সাথে আর কেউ নেই। আর যে ব্যক্তি তার পেছনে পড়ে গেছে এবং প্রবেশ করেনি তার তুলনায় সে অগ্রগামী। আর যদি দশজন লোক পৃথকভাবে প্রবেশ করে, তাহলে প্রথম প্রবেশকারীর জন্যে نفل নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। কেননা, সে সকল দিক বিচারেই প্রথম। আর كل শব্দটি خصوص এর সম্ভাবনা রাখে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قَوْلُه وَفِيْ كَلِمَةِ كُلِّ يَجِبُ الخ : মুসান্নিফ (র) বলেন– জিহাদকালে যদি মুসলিম সেনাপতি ঘোষণা দেন كُلُّ مَنْ دَخَلَ هٰذَا الْحِصْنَ أَوَّلاً فَلَهُ مِنَ النَّفْلِ كَذَا অর্থাৎ "যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম এ কিল্লায় প্রবেশ করবে সে এ পরিমাণ পুরস্কার পাবে" এরপর ১০ ব্যক্তি একই সাথে উক্ত কিল্লায় প্রবেশ করলো। তাহলে তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্য ১টি পুরস্কার মিলবে। অর্থাৎ ১০ জনকে ১০টি পুরস্কার দেয়া হবে। কারণ كل শব্দটি ভিন্ন ভিন্নভাবে তার আফরাদসমূহকে বেষ্টন করার জন্য আসে। সুতরাং যে ১০ ব্যক্তি কিল্লায় প্রবেশ করলো তাদের প্রত্যেককে মনে করতে হবে যেন তার সঙ্গে আর কেউ নেই। অর্থাৎ সে-ই প্রথমে প্রবেশ করেছে।

টীকা লেখক বলেন– ব্যাখ্যাকারের ভাষ্য وَهُوَ أَوْلَى بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ تَخَلَّفَ مِنَ النَّاسِ وَلَمْ يَدْخُلْ এর মধ্যে কিছুটা বিচ্যুতি ঘটেছে। কেননা প্রথম প্রবেশকারী ব্যক্তি দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশকারীর তুলনায় প্রথম হতে পারে। কিন্তু যারা প্রবেশ করেনি তাদের তুলনায় কিভাবে প্রথম হতে পারে? এই কারণে এমন বলা উচিত ছিলো وَهُوَ أَوَّلُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ تَخَلَّفَ مِنَ النَّاسِ الَّذِيْ يَقْدِرُ دُخُولَه بَعْدَ فَتْحِ الْحِصْنِ অর্থাৎ প্রবেশকারী ১০ জনের মধ্য থেকে প্রত্যেকে তাদের প্রতি তুলনা করে প্রথম যারা পিছনে রয়ে গেছে। আর তাদের প্রবেশ করা কিল্লা বিজীত হওয়ার পরে মেনে নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ কিল্লা বিজয়ের পরে যারা তার মধ্যে প্রবেশ করবে। তাদের তুলনায় প্রথম ১০ ব্যক্তির মধ্য থেকে প্রত্যেকেই প্রথম প্রবেশকারী। সুতরাং প্রত্যেককেই ভিন্ন পুরস্কার দিতে হবে।

মোটকথা ১০ ব্যক্তি ১০ সাথে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে ১ পুরস্কারের অধিকারী হবে। আর ১০জন একের পর এক ভিন্ন ভিন্ন প্রবেশ করলে সর্বপ্রথম যে প্রবেশ করেছে কেবল সেই পুরস্কারে অধিকারী হবে। কারণ সর্বদিক দিয়ে এই ব্যক্তিই প্রথমে কিল্লায় প্রবেশকারী। আর كل শব্দ خصوص- এরও সম্ভাবনা রাখে। কাজেই ভিন্ন ভিন্ন প্রবেশ করার ক্ষেত্রে কেবল ১জনকে পুরস্কার দেয়াতে কোনো দোষ নেই।

وَفِى كَلِمَةِ مَن يَبطُلُ النَّفلُ اى إن قالَ مَن دَخَلَ هٰذا الحِصنَ اولا فلهُ مِنَ النَّفلِ كَذا فدخل عشرةٌ مَعًا لا يَستَحِقُّ احدٌ مِنهم لِانَّ الاوَّلَ اسمٌ لِفردٍ سابِقٍ دَخَلَ اوَّلًا ولم يُوجَد بَل وُجِدَ الدّاخِلُونَ الاوَّلُونَ وكلمةُ مَن لَيسَت مُحكَمَةً فِى العُمُومِ حَتّٰى تُوَثِّرَ فِى تغيِيرِ اللَّفظِ اوَّلًا بِخِلافِ كلمةِ كُلِّ والجَمِيعِ فانَّهُ يَتَغَيَّرُ بِهِما قولُه اوَّلًا ولو دَخَلَ عشرةٌ فُرادى يَستَحِقُّ الاولُ النَّفلَ خاصَّةً دُونَ الباقِيِّينَ -

---

অনুবাদ ॥ ***"আর*** من ***শব্দ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে*** نفل ***বাতিল হয়ে যাবে"।*** অর্থাৎ, যদি কোনো দলপতি এরূপ বলে যে, مَن دَخَلَ هٰذا الحِصنَ اولا فلهُ مِنَ النَّفلِ كَذا এরপর দশজন একই সাথে প্রবেশ করে, তাহলে কেউই نفل এর অধিকারী হবে না। কেননা, প্রথম বলতে সেই অগ্রবর্তী একককেই বুঝায়, যে আগে প্রবেশ করে। অথচ এরূপ কোনো একক এখানে পাওয়া যায়নি; বরং এমন কতিপয় একক পাওয়া গেছে, যারা সবাই প্রথমে প্রবেশকারী। من শব্দটি عموم এর ব্যাপারে محكم তথা দৃঢ় নয়। তা হলে اولا শব্দটির মধ্যে পরিবর্তন সাধন করতে পারতো। এটা كل ও جميع শব্দদ্বয়ের বিপরীত। কেননা, উক্ত শব্দদ্বয়ের দ্বারা اولا শব্দটি পরিবর্তন হয়ে যায়। আর দশজন পৃথকভাবে প্রবেশ করলে কেবল প্রথমজনই نفل লাভ করে, অন্যান্যরা নয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله وفِى كَلِمَةِ مَن يَبطُلُ النَّفلُ الخ : মুসান্নিফ (র) বলেন– জিহাদকালে যদি মুসলিম সেনাপতি ঘোষণা দেন مَن دَخَلَ هٰذا الحِصنَ اولا فلهُ مِنَ النَّفلِ كَذا অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রথম এ কেল্লায় প্রবেশ করবে সে এ পরিমাণ পুরস্কার পাবে। এরপর ১০ ব্যক্তি একই সাথে কিল্লায় প্রবেশ করলে তাদের কেউই পুরস্কাররের অধিকারী হবে না। কারণ اول তথা প্রথম এমন অগ্রজ ব্যক্তিকে বলে যে সর্বাগ্রে থাকে। আর এখানে এক ফরদের প্রবেশ পাওয়া যায়নি। বরং এ ধরনের বহু একককের প্রবেশ পাওয়া গেছে। যাদের সবাই প্রথমে প্রবেশ করেছে। সুতরাং পুরস্কারে অধিকারী হওয়ার শর্ত তথা একক অগ্রগামী ব্যক্তির সর্বপ্রথম প্রবেশ করা পাওয়া গেলো না। একারণে কেউই পুরস্কারের অধিকারী হবে না।

প্রশ্ন : কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, مَن دَخَلَ هٰذا الحِصنَ اوَّلًا কে রূপকার্থে যে আগে প্রবেশ করবে সে অর্থে নিতে হবে চাই সে এক ব্যক্তি হোক বা একটি দল হোক। যেমন جميع من دخل اولا কে আগে প্রবেশ করার অর্থে নেয়া হয় তাহলে এক্ষেত্রে ১০ জনের সবাই পুরস্কারের অধিকারী হবে।

উত্তর من শব্দটি উমূমের অর্থে মুহকাম বা দৃঢ় নয়। অতএব শব্দটি অর্থ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল হবে না। পক্ষান্তরে كل ও جميع শব্দ উভয়টি عموم এর জন্য মুহকাম। অতএব উভয়ের দ্বারা প্রথমত কথাটি পরিবর্তন হয়ে যাবে। আর প্রথমটি দ্বারা উদ্দেশ্য হবে আগে প্রবেশকারী। আর যদি مَن دَخَلَ هٰذا الحِصنَ اوَّلًا فلهُ مِنَ النَّفلِ كَذا এর ক্ষেত্রে ১০ ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন প্রবেশ করে তাহলে যে সবার আগে প্রবেশ করবে সে পুরস্কারের অধিকারী হবে; অন্যান্যরা এর অধিকারী হবে না।

ثمّ لمّا فرغ عن بيانِ العامّ الصّيغي والمعنوي وضعًا ذكر مايكون عمومه عارضًا بدليلٍ خارجيّ فقال وَالنّكرة في موضع النّفي تعمّ وذلك لأنّها في أصلِ وضعِها للماهيّة اوْ لفردٍ واحدٍ غير مُعيّنٍ على اختلافِ القولين فإذا دخل عليها النّفي تعمّ إذْ نفيُ المَاهيّة و الفردِ الغيرِ المُعيّنِ لا يكون إلاّ كذلك - فإنْ تضمّن معنًى مِنَ الْاستغراقيّة كانَ نصًّا فيه كما في لَارجُلَ فِي الدّارِ وقوله لا اله الاّ اللّه وإلاّ لكان ظاهرًا فيه ومُحتملًا لِلْخُصُوصِ والدّليلُ على عمومِها الْإجماعُ والْاستعمالُ وقوله تعالى إذْ قالُوْا ما أنزلَ اللّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أنْزَلَ الْكِتَابَ الّذِيْ جَاءَ بِهِ مُوْسٰى فلَوْ لمْ يَكُنْ قوله عَلَى بَشَرٍ وقوله مِنْ شَيْءٍ مُفيدًا للسّلبِ الكُلّيّ لَما كانَ قوله قُلْ مَنْ أنْزَلَ الْكِتَابَ رَدًّا لَهُ عَلَى سَبِيْلِ الْإيجابِ الجُزْئي لِأنّ السّلبَ الجُزْئي لَا يَنْقُضُ الْايجابَ الجُزئي -

অনুবাদ ॥ মুসান্নিফ (র) عام صيغي (শব্দগত عام) ও عام معنوي (অর্থগত عام)-এর আলোচনা শেষ করে এখন এমন عام এর বর্ণনা করেছেন, যার عموم কোনো খারেজী দলিলের দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে থাকে। এ মর্মে তিনি বলেন, *نفي এর স্থলে* نكرة *(অনির্দিষ্ট শব্দ)* عموم *এর* فائده *দেয়।* এটা এ জন্যে যে, نكرة তার মূল وضع (গঠন)- এর হিসেবে ماهية (সত্তা) অথবা অনির্দিষ্ট কোনো এককের জন্যে হয়ে থাকে। সুতরাং نكرة এর মধ্যে نفي প্রবিষ্ট হলে তা عموم এর فائده দেবে। কেননা, ماهية অথবা অনির্দিষ্ট এককের نفي একই (عموم) ভাবে হয়ে থাকে। অতঃপর তা যদি استغراق এর অর্থ বিশিষ্ট অর্থকে শামিল করে, তাহলে عموم সাব্যস্ত করার ব্যাপারে نص হবে। যেমন- لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ অর্থাৎ لَا مِنْ رَجُلٍ فِي الدَّارِ (ঘরে কোনো পুরুষ নেই) এবং لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه অর্থাৎ لَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰه (আল্লাহ ব্যতিত কোনো মা'বুদ নেই)-এর মধ্যে। অন্যথায় عموم এর ক্ষেত্রে ظاهر হবে এবং خصوص এর সম্ভাবনা রাখবে। نكرة এর عام হওয়ার দলিল হল اجماع এবং استعمال (ব্যবহার)। আল্লাহর বাণী اِذْ قَالُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِيْ جَاءَ بِهٖ مُوْسٰى (সে সময়কে স্মরণ করো, যখন তারা বললো, আল্লাহ কোনো মানুষের ওপর কিছুই নাযিল করেননি। আপনি তাদেরকে বলুন, মূসা (আ) যে কিতাব নিয়ে এসেছিলেন তা কে নাযিল করেছিল?) এর মধ্যে على بشر ও شيء যদি سلب (عام نفي) كلي কে সাব্যস্ত না করে, তা হলে আল্লাহর বাণী- قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتَابَ বক্তব্য খণ্ডনে ايجاب جزئي (আংশিক সাব্যস্তকরণ) হিসেবে হতে পারতো না। কেননা, سلب جزئي (আংশিক প্রত্যাখ্যান) ايجاب جزئي (আংশিক সাব্যস্তকরণ)-এর পরিপন্থী নয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ عَنْ الخ : ব্যাখ্যাকার বলেন- গঠনের দিক দিয়ে عام এর যে ২ প্রকার ছিলো অর্থাৎ (১) শব্দ ও অর্থ উভয় দিক দিয়ে عام, (২) শুধু অর্থের দিক দিয়ে عام। উভয়ের বর্ণনা শেষ করে মুসান্নিফ (র) এখন এমন عام এর বর্ণনা করতে চাচ্ছেন যার عام হওয়াটা খারেজি দলিল দ্বারা বোঝা যায়।

তিনি বলেন- নাকেরা শব্দের পূর্বে যদি হরফে নফী প্রবিষ্ট হয় তাহলে তা উমূমের ফায়দা দিবে। চাই তা মূল নাকেরা শব্দের পূর্বে আসুক। যেমন لَارَجُلَ فِي الدَّارِ কিংবা নাকেরার পূর্বে যে ফে'ল উল্লেখিত হয় তার পূর্বে আসুক। যেমন مَا رَأَيْتُ رَجُلًا

দলিল : নাকেরা শব্দটি মূল গঠনের দিক দিয়ে কারো কারো মতে শব্দের হাকীকত বোঝায়, কারো কারো মতে অনিৰ্দিষ্ট একক বোঝায়। সুতরাং নাকেরার পূর্বে হরফে নফী আসলে হাকীকতের নফী হবে। অতএব فرد غير معين এর নফী হবে। আর উভয় নফী দ্বারা উমূম সাব্যস্ত হয়। যখন হাকীকতের নফী হবে তখন এর দ্বারা সকল আফরাদের নফী বুঝাবে। কারণ যদি একটি এককও অবশিষ্ট থাকে তাহলে হাকীকত বহাল থাকবে। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, হাকীকতের নফীর দ্বারা সকল আফরাদের নফী হয়ে যায়। কাজেই এতে উমূম সাব্যস্ত হলো। এভাবে যদি অনির্দিষ্ট এককের নফী হয়ে যায়। তাহলেও সকল আফরাদের নফী হয়ে যাবে। কেননা যদি এক ফরদও অবশিষ্ট থাকে তাহলে অনির্দিষ্ট এককের নফী হবে না। মোটকথা যখন فرد معين এর নফী দ্বারা সকল আফরাদ নফী হয়ে যায়। কাজেই এর মধ্যেও উমূম সাব্যস্ত হবে। এরপর কখনো এ উমূমটা وجوب রূপে হয়, আবার কখনো جواز রূপে হয়। ওয়াজিব রূপে ঐ সময় হয় যখন হরফে নফী নাকেরার পূর্বে আসে। আর নাকেরাটা من استغراقية এর অর্থকে শামিল হয়। যেমন لَا رَجُلَ فِى الدَّارِ এটা ঐ ব্যক্তির উত্তরের অংশ যে জিজ্ঞেস করে هَلْ مِنْ رَجُلٍ فِى الدَّارِ মূল উত্তর ছিলো لَا مِنْ رَجُلٍ فِى الدَّارِ
من استغراقية কে বিলুপ্ত করা হয়েছে কিন্তু তার অর্থ উদ্দেশ্যে রয়ে গেছে। অতএব অর্থ হলো ঘরে কোনো পুরুষ নেই। এভাবে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ কেননা এ কালিমাটি ঐ ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে আসে যে বলে هَلْ مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ আল্লাহ ছাড়া কি কোনো উপাস্য আছে? এর উত্তর হলো لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ অর্থাৎ لَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।

যদি নাকেরার পূর্বে হরফে নফী আসে কিন্তু তা من استغراقية এর অর্থ বিশিষ্ট হয় না। তখন তা جواز রূপে উমূমের ফায়দা দিবে। অর্থাৎ কখনো ব্যাপকতা বোঝাবে। যেমন لابيع ولاخلة আর কখনো ব্যাপকতা বোঝাবে না। বরং করীনার কারণে খাছ হওয়ার ফায়দা দিবে। যেমন مَا رَاَيْتُ رَجُلًا بَلْ رَجُلَيْنِ আমি ১ ব্যক্তিকে দেখিনি বরং ২ জনকে দেখেছি। এখানে رجلا দ্বারা কেবল ১ জন উদ্দেশ্য। এর করীনা হলো رجلين ব্যাখ্যাকার এটাকে এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, নাকেরা যদি من استغراقيه এর অর্থ বিশিষ্ট হয় তাহলে তা উমূমের ক্ষেত্রে নস হবে। অর্থাৎ অবশ্যম্ভাবীরূপে উমূম সাব্যস্ত হবে। অন্যথায় উমূমের ক্ষেত্রে যাহির তথা তার দ্বারা উমূম সাব্যস্ত হবে। এবং খাছ হওয়ারও সম্ভাবনা রাখবে।

ব্যাখ্যাকার বলেন– نكره منفية উমূম বোঝানোর ব্যাপারে দলিল হলো ইজমা এবং আরবদের ব্যবহার। ইজমা এভাবে যে, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ কালিমা একত্ববাদ বুঝনোর ব্যাপারে সকলে একমত। আর لااله الا الله ঐ সময়ই একত্ববাদ বোঝাবে যখন لا দ্বারা আল্লাহ ছাড়া বাকী সকল সত্য উপাস্যদেরকে নফী করা হবে। আর এটাই হলো উমূম। সুতরাং সাব্যস্ত হলো যে, نكره منفية উমূমের ফায়দা দেয়।

আরবদের ব্যবহারে অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে, তারা نكره منفية কে عموم এর জন্য ব্যবহার করে থাকে। উপরন্তু আল্লাহ তা'আলার বাণী اِذْ قَالُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِىْ جَاءَ بِهٖ مُوْسٰى ও উমূম বোঝায়। কারণ ইহুদীরা বলেছিলো– আল্লাহ তা'আলা কোনো মানুষের উপর কিছু অবতীর্ণ করেননি। এর জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন– আপনি বলুন, যে কিতাব মূসা (আ) এর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে অর্থাৎ তাওরাত মূসা (আ) এর উপর আল্লাহই অবতীর্ণ করেছিলেন। এর মধ্যে مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِىْ جَاءَ بِهٖ موسى বাক্যটি موجبه جزئيه কারণ মূসা (আ) ও على بشر এর অংশ। আর তাওরাতও من شئ এর অংশ। আর এক অংশকে অপর অংশের জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ মূসা (আ) এর জন্য তাওরাত অবতীর্ণ করা সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর محمول কে موضوع এর কিছু সংখ্যকের জন্য সাব্যস্ত করাকে موجبة جزئية বলে।

মোটকথা এ বাক্য مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِىْ جَاءَ بِهٖ مُوْسٰى কে مَا اَنْزَلَ عَلٰى بَشَرٍ এর নকীয বানিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। আর একথা স্বীকৃত যে, موجبه جزئيه টা سالبه كلية এর নকীয হয়ে থাকে سالبه جزئيه এর নয়। অতএব এটা প্রমাণিত হলো যে, مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ হলো سالبه كليه আর এর মধ্যে محمول এর প্রত্যেক ফরদ موضوع এর প্রত্যেক ফরদ থেকে নফী করা হয়। এটাই হলো উমূম। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, আয়াতে بشر এবং شئ টা ما হরফে নফীর পরে নাকেরা হওয়ার কারণে উমূম বোঝাচ্ছে।

وَفِى الْاِثْبَاتِ تَخُصُّ لٰكِنَّهَا مُطْلَقَةٌ اى اذا لَمْ تَكُنْ تَحْتَ النَّفْيِ بَلْ كَانَتْ فِى الْاِثْبَاتِ فَتَكُونُ خَاصَّةً لِفَرْدٍ واحِدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ لٰكِنَّهَا مُطْلَقَةٌ بِحَسْبِ الْاَوْصَافِ كَمَا اِذا قُلْتَ اَعْتِقْ رقبةً يدلُّ عَلٰى عتقِ رقبةٍ واحدةٍ مُحْتَمِلَةٍ لِاَوْصَافٍ كثيرةٍ بانْ يكونَ سَوداءَ اَوْ بيضاءَ او غيرَ ذٰلك واذا قُلْتَ جَاءَنِىْ رجلٌ يُفْهَمُ منهُ مَجِيءُ واحدٍ مُبْهَمٍ مجهولِ الوصفِ وليسَ المُرادُ بالمُطلقِ هٰهُنا هُوَ الدالُّ عَلَى المَاهِيَةِ مِنْ غيرِ دَلالةٍ عَلَى الوَحْدَةِ والكَثْرَةِ بَلْ هِيَ الدَّالَّةُ عَلَى الوَحْدَةِ مِنْ غَيْرِ دلالةٍ عَلٰى تعيُّنِ الْاَوْصَافِ وهٰذا هُوَ الَّذِى غَرَّ الشَّافِعِيَّ فِى ظَنِّهَا عَامَّةً - وهُوَ مَعْنٰى قولِهٖ.

অনুবাদ ॥ ***আর*** نكره ***টা*** اثبات ***(ইতিবাচক)-এর মধ্যে*** خاص ***হয়। কিন্তু তারপরও (গুণাবলি)-এর বিচারে মুতলাক থেকে যায়।*** অর্থাৎ نكره যদি نفى এর জন্যে না হয়ে اثبات এর জন্যে হয়, তাহলে তা একটি অনির্দিষ্ট এককের জন্যে خاص হবে, তবে اوصاف এর বিবেচনায় مطلق হবে। যেমন- যখন তুমি বলবে, اعتق رقبة (একটি গোলাম আযাদ করে দাও।) তাহলে তোমার এ বক্তব্যে এমন এক গোলামকে আযাদকরণ বুঝাবে যার মধ্যে বহু গুণের সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন- সে কালো, সাদা বা অন্য কোনো রং বিশিষ্ট হতে পারে। আর যখন তুমি বলবে যে, جاءنى رجل (আমার নিকট একজন পুরুষ এসেছে।) তাহলে তা দ্বারা এমন এক ব্যক্তির আগমন বুঝাবে, যার وصف (পরিচয়) অস্পষ্ট ও অজ্ঞাত। এখানে مطلق দ্বারা তা উদ্দেশ্য নয় যা وحدت (এককত্ব) এবং كثرت (বহুত্ব) না বুঝিয়ে ماهيت (সত্তা) বুঝিয়ে থাকে; বরং এর দ্বারা সেই نكره উদ্দেশ্য যা اوصف (তথা গুণ পরিচিতি)-এর নির্দিষ্টকরণ ছাড়া وحدت (এককত্ব)-বুঝায়। এটা ঐ বস্তু যা ইমাম শাফেয়ী (র)-কে হা বাচক نكره কে عام ভাবার ব্যাপারে ধোঁকায় ফেলেছে। গ্রন্থকার (র)-এর এ বক্তব্যের অর্থ এটাই।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ মুসান্নিফ (র) বলেন- نكره যদি নফীর পরে উল্লেখিত না হয় তাহলে তা فرد غير معين তথা অনির্দিষ্ট এককের জন্য খাছ হবে। অর্থাৎ তার মধ্যে عموم থাকবে না। তবে বিশেষণের দিক দিয়ে মুতলাক হবে। যেমন কেউ যদি বলে اَعْتِقْ رَقَبَةً তাহলে এর দ্বারা ১ গোলাম আযাদ হওয়া বোঝাবে। তবে অনেক বিশেষণের সম্ভাবনা রাখবে। অর্থাৎ গোলামটি কালোও হতে পারে, ফর্সাও হতে পারে। আলিম হতে পারে, জাহিলও হতে পারে। এভাবে যদি কেউ جَائَنِىْ رَجُلٌ বলে তাহলে এর দ্বারা এমন অনির্দিষ্ট ব্যক্তির আগমন উদ্দেশ্য হবে যার গুণাবলি অজানা। এভাবে আল্লাহ তা'আলার বাণী اَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً এর মধ্যে এমন একটি গাভী জবাই করা উদ্দেশ্য যার বিশেষণ অজানা।

ব্যাখ্যাকার বলেন- মতনে নাকেরাটি মুতলাক হওয়ার উদ্দেশ্য হলো তা একক বা একাধিক বোঝানো ছাড়াই কেবল হাকীকাত বোঝাবে। যেমন অধিকাংশ সময় উসূলের মধ্যে حَقِيقَتْ مِنْ حَيْثُ هِىَ هِىَ এর উপর مطلق শব্দ বলা হয়। বরং এখানে মুতলাক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হা বাচক বাক্যে নাকেরা দ্বারা নির্দিষ্ট গুণাবলী বোঝানো ছাড়াই একক বোঝানো। অর্থাৎ নাকেরাটি একটিই বোঝাবে তবে তার বিশেষণ অজ্ঞাত থাকবে। ইমাম শাফেয়ী (র) এর হা বাচক বাক্যে নাকেরা আ'ম হওয়ার ধোকা এ মুতলাক শব্দ দ্বারা-ই হয়েছিলো। মুসান্নিফ (র) এর সামনের ইবারত দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য।

وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رح تَعُمُّ حَتّٰى قَالَ بِعُمُومِ الرَّقَبَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الظِّهَارِ فَإِنَّهُ يَقُولُ إِنَّ لَفْظَ رَقَبَةٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالٰى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ عَامَّةٌ شَامِلَةٌ لِلْمُؤْمِنَةِ وَالْكَافِرَةِ وَالسَّوْدَاءِ وَالْبَيْضَاءِ وَالزَّمِنَةِ وَالْمَجْنُونَةِ وَالْعَمْيَاءِ وَالْمُدَبَّرَةِ وَغَيْرِهَا وَقَدْ خُصَّتْ مِنْهَا الزَّمِنَةُ وَالْمُدَبَّرَةُ وَنَحْوُهَا بِالْاِجْمَاعِ فَأَخُصُّ أَنَا مِنْهَا الْكَافِرَ بِالْقِيَاسِ عَلَيْهَا وَنَحْنُ نَقُولُ إِنَّ تَخْصِيصَ الزَّمِنَةِ لَيْسَ بِتَخْصِيصٍ بَلْ هُوَ غَيْرُ دَاخِلٍ تَحْتَ الرَّقَبَةِ الْمُطْلَقَةِ إِذْ هُوَ فَائِتُ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ وَالرَّقَبَةُ الْمُطْلَقَةُ مَا تَكُونُ سَلِيمَةً عَنِ الْعَيْبِ وَالْمُدَبَّرَةُ غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ مِنْ وَجْهٍ فَلَا يَتَنَاوَلُهَا اسْمُ الرَّقَبَةِ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَاسَ عَلَيْهَا الْكَافِرَةُ فِي التَّخْصِيصِ وَلَنَا فِي هٰذَا الْمَقَامِ ضَابِطَتَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمُطْلَقَ يَجْرِي عَلٰى إِطْلَاقِهِ وَالثَّانِيَةُ أَنَّ الْمُطْلَقَ - يَنْصَرِفُ إِلَى الْفَرْدِ الْكَامِلِ فَالْأَوَّلُ فِي حَقِّ الْأَوْصَافِ كَالْإِيْمَانِ وَالْكُفْرِ وَالثَّانِي فِي حَقِّ الذَّاتِ كَالزَّمَانَةِ وَالْعَمٰى - وَقَالَ صَاحِبُ التَّلْوِيحِ أَنَّ هٰذَا النِّزَاعَ لَفْظِيٌّ إِذْ لَا يَقُولُ الشَّافِعِيُّ رح بِتَحْرِيرِ رَقَبَاتٍ فِي الظِّهَارِ وَإِنَّمَا يَقُولُ بِتَحْرِيرِ رَقَبَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ وَنَحْنُ مَا قُلْنَا إِلَّا بِعُمُومِ الْأَوْصَافِ فَسَوَاءٌ أَنْ سُمِّيَ هٰذَا إِطْلَاقًا أَوْ عُمُومًا

অনুবাদ ॥ ***"আর ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, হ্যা বাচক*** نكرة ***ও*** عموم ***এর*** فائدة ***দান করে।" এমনকি যিহারের কাফ্ফারায় যে গোলামের উল্লেখ রয়েছে, তিনি তা*** عام ***হওয়ার অভিমত পোষণ করেন।*** কেননা, ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে আল্লাহর বাণী - فتحرير رقبة এর মধ্যে رقبة (গোলাম) শব্দটি عام - ঈমানদার, কাফির, কৃষ্ণাঙ্গ, শ্বেতাঙ্গ, পঙ্গু, পাগল, অন্ধ এবং مدبر ইত্যাদি সকলেই শামিল করে। অবশ্য এর মধ্যহতে পঙ্গু, مدبر অনুরূপকে اجماع দ্বারা خاص কর হয়েছে। সুতরাং, আমি (শাফেয়ী) পঙ্গুর ওপর কিয়াস করে কাফিরকেও خاص করি। আর আমাদের (হানাফীগণের) বক্তব্য হল পঙ্গুর تخصيص প্রকৃতপক্ষে تخصيص ই নয়; বরং (প্রথম হতেই) পঙ্গু مطلق গোলামের আওতাধীনই নয়; কারণ, সে কোনো উপকারে আসে না। কেননা مطلق গোলাম বললে দোষ-ত্রুটিহীন গোলামকেই বুঝায়। আর مدبر একদিকের বিবেচনায় তো মালিকানাধীনই নয়। কাজেই مطلق গোলাম বললে তাকেও অন্তর্ভুক্ত করবে না। সুতরাং এটাকে পঙ্গু গোলামের ওপর قياس করে কাফিরকে خاص করা উচিত হবে না। এ স্থলে আমাদের দুটি নীতি রয়েছে। ১. মুতলাক তার اطلاق এর ওপর জারি হয়ে থাকে; আর ২. মুতলাক فرد كامل (পূর্ণ একক)-এর প্রতি ধাবিত হয়। প্রথমটি اوصاف -এর ব্যাপারে প্রযোজ্য। যথা- ঈমান ও কুফর। আর দ্বিতীয়টি দেহের (সত্তার) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যথা- বিকলাঙ্গ ও অন্ধ হওয়া।

তালবীহ্ গ্রন্থকার (র) বলেন, এটা মৌখিক বিতর্ক মাত্র। কেননা, ইমাম শাফেয়ী (র) ظهار এর কাফ্ফারায় একাধিক গোলাম আযাদ করার কথা বলেন না; বরং তিনিও একটি গোলামই আযাদ করার কথা বলেন। আর আমরা কেবল وصف টা عام হওয়ার কথা বলে থাকি। সুতরাং চাই তাকে اطلاق বলা হোক, অথবা عموم বলা হোক, একই কথা।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله وعند الشافعي رح تعم حتى الخ : মুসান্নিফ (র) বলেন- ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে নাকেরা হা বাচক বাক্যেও উমূম বোঝায়। এ কারণে যিহারের কাফফারা প্রসঙ্গে ইমাম শাফেয়ী (র) আল্লাহ

তা'আলার বাণী فتحرير رقبة এর মধ্যে এ বিষয়ের প্রবক্তা যে, رقبة শব্দটি আ'ম। এটা মুমিন-কাফের, শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ, পঙ্গু, অন্ধ, মুদাব্বার ইত্যাদি সবাইকে শামিল করে। কিন্তু মুদাব্বার, খোড়া, উভয় হাত কর্তিত ও উম্মে উয়ালাদ ইত্যাদিকে ইজমার দ্বারা খাছ করা হয়েছে। অর্থাৎ এদের কাউকে আযাদ করলে ইজমা মতে যিহারের কাফফারা আদায় হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন– পঙ্গু, মুদাব্বার ইত্যাদিকে ইজমা দ্বারা খাছ করা হয়েছে। সুতরাং আমি কিয়াস দ্বারা কাফেরকেও খাছ করবো। অর্থাৎ আমার মতে কাফের গোলাম আযাদ করলেও যিহারের কাফফারার মধ্যে তা ধর্তব্য হবে না। হানাফীদের পক্ষ থেকে এর উত্তর এই যে, পঙ্গু ব্যক্তিকে খাছ করা মূলত তাখসীস নয় বরং পঙ্গু গোলাম মুতলাক গোলামের অধীনে দাখিল নয়। কারণ এর ক্ষেত্রে উপকারের বিষয়টি অনুপস্থিত। মুতলাক গোলাম বলতে দোষ-ত্রুটি মুক্ত কর্মক্ষম গোলাম উদ্দেশ্য। অতএব পঙ্গু শুরু থেকে এর অধীনে অন্তর্ভুক্ত নয়। কাজেই তাকে খাছ করার কোনো অর্থ হতে পারে না। বাকী মুদাব্বার যেহেতু পূর্ণরূপে আযাদ হওয়ার অধিকারী। এ কারণ সেও এক পর্যায়ে মালিকানাধীন সাব্যস্ত হবে না। কাজেই মুদাব্বারও মুতলাক গোলামের অধীনে শামিল নয়। সুতরাং তাকেও খাছ করার প্রশ্ন হতে পারে না। অতএব এদের উপর কিয়াস করে কাফেরকে رقبة থেকে খাছ করা গ্রহণযোগ্য হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র) এর দলিল : আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ অর্থাৎ "আমি যখন কোনো কিছু সৃষ্টি করার ইচ্ছা করি এ ব্যাপারে আমার উক্তি এতোটুকুই যে, আমি তাকে বলে দিই হও! তখন তা হয়ে যায়"। লক্ষ্য করুন এ আয়াতে شيء শব্দটি নাকেরা ও হা বাচক। সকল বস্তু এর মধ্যে শামিল। কারণ আল্লাহ তা'আলার কুদরত সকল বস্তুকে শামিল করে। এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, হা বাচক বাক্যেও নাকেরা উমূমের ফায়দা দেয়।

আহনাফের পক্ষ থেকে উত্তর : এখানে আয়াতে انما শব্দটি نفي ও اثبات অর্থে। সুতরাং আয়াতের অর্থ হলো لَيْسَ قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَا إِيجَادَهُ إِلَّا قَوْلُنَا كُنْ অর্থাৎ যখন আমি কোনো জিনিস সৃষ্টির ইচ্ছা করি তখন তার ব্যাপারে আমার কোনো উক্তি থাকে না। তবে আমার এ উক্তি যে, হও অর্থাৎ আমি কেবল كن শব্দ দ্বারা তাকে অস্তিত্বে আনি। এ ব্যাখ্যা দ্বারা شيء শব্দটি নাকেরা নফীর অধীনে উল্লেখিত হবে। আর নফীর অধীনে উল্লেখিত হওয়ার কারণে আ'ম হবে।

সারকথা এই যে, আয়াতে شيء শব্দটি নাকেরা ও হা বাচক বাক্যে আসার কারণে আ'ম নয়। বরং নফীর অধীনে আসার কারণে আ'ম হয়েছে। অতএব এটা ইমাম শাফেয়ী (র) এর দলিল হতে পারে না।

নূরুল আনওয়ার গ্রন্থকার বলেন– এই স্থলে আমাদের দুটি নীতি রয়েছে। ১. মুতলাক সবসময় নিজ اطلاق এর উপর চলে। ২. মুতলাক তার পূর্ণাঙ্গ এককের প্রতি ধাবিত হয়। এখানে প্রথম নীতিটি বিশেষণের ক্ষেত্রে যেমন ঈমান ও কুফর। অর্থাৎ رقبة مطلقة তার বিশেষণের দিক দিয়ে اطلاق এর উপর জারী হবে। অর্থাৎ গুণগতভাবে সর্বপ্রকার গোলামকে যিহারের কাফফারায় আযাদ করা যথেষ্ট হবে। চাই মুমিন হোক বা কাফের। আর দ্বিতীয় নীতিটি সত্তার ক্ষেত্রে অর্থাৎ সত্তা এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দিক দিয়ে رقبة مطلقة পূর্ণ এককের প্রতি ধাবিত হবে। অতএব এই নীতির আলোকে رقبة مطلقة থেকে পঙ্গু ও অন্ধ গোলাম খারিজ হয়ে যাবে। কারণ সৃষ্টিগতভাবে এরা কেউই পূর্ণাঙ্গ নয়।

তালবীহ গ্রন্থকার বলেন– বিশেষণের দিক দিয়ে মুতলাক নাকেরা হা বাচক বাক্যে আ'ম হওয়া না হওয়ার বিষয়ে হানাফী ও শাফেয়ীগণের মধ্যে যে মতভেদ রয়েছে মূলত তা শাব্দিক মতভেদ মাত্র। বাস্তবে কোনো মতভেদ নেই। কেননা হা বাচক বাক্যে যদি নাকেরা শব্দ উল্লেখিত হয় তাহলে বিশেষণের দিক দিয়ে মুতলাক হওয়ার কারণে শাফেয়ীগণ তাকে উমূম বলে থাকেন। আর হানাফীগণ তাকে উমূম না বলে মুতলাক বলে থাকেন। উভয়ের পরিণাম বা ফলাফল একই। ইমাম শাফেয়ী (র) ও فتحرير رقبة এর কারণে যিহারের কাফফারায় বিভিন্ন গোলাম আযাদ করার প্রবক্তা নন। আর হানাফীগণও তাই বলে থাকেন। আমরা হানাফীগণ কেবল عموم اوصاف এর প্রবক্তা। চাই এটাকে মুতলাক বলা হোক বা আ'ম

وَاِنْ وُصِفَتْ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ تَعُمُّ هٰذا بِمَنْزِلَةِ الْاِسْتِثْنَاءِ مِمَّا سَبَقَ كَانَّه قَالَ وَفِى الْاِثْبَاتِ تَخُصُّ اِلَّا اِذا كَانَتْ مَوْصُوفَةً بِصِفَةٍ عَامَّةٍ فَهٰهُنَا تَعُمُّ لِكُلِّ مَاوُجِدَتْ فِيهِ هٰذِهِ الصِّفَةُ وَاِنْ كَانَتْ خَاصَّةً فِى اِخْرَاجِ مَا عَدَاهَا وَهٰذا بِحَسْبِ الْعُرْفِ وَالْاِسْتِعْمَالِ وَاِلَّا فَمَفْهُوْمُ الصِّفَةِ هُوَ الْخُصُوصُ وَالتَّقْيِيدُ بِحَسْبِ الظَّاهِرِ - وَلِهٰذا لَمْ تَكُنْ عَامَّةً اِذا كَانَتْ تِلْكَ الصِّفَةُ فِى نَفْسِهَا خَاصَّةً كَقَوْلِكَ وَاللّٰهِ لَا اَضْرِبُ اِلَّا رَجُلًا وَلَدَنِى فَاِنَّ الْوَالِدَ لَا يَكُوْنُ اِلَّا وَاحِدًا وَلٰكِنْ هٰذا الْاَصْلُ اَكْثَرِىٌّ لَا كُلِّىٌّ وَاِلَّا فَقَدْ تَعُمُّ بِدُوْنِ الصِّفَةِ كَمَا فِى قَوْلِهِ تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ وَقَوْلُه عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا اَحْضَرَتْ وَعَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَقَدْ تَخُصُّ بِالصِّفَةِ كَمَا اِذا قَالَ وَاللّٰهِ لَاَتَزَوَّجَنَّ اِمْرَأَةً كُوْفِيَّةً بِتَزَوُّجِ اِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَمِثْلُ قَوْلِكَ لَقِيْتُ رَجُلًا عَالِمًا -

অনুবাদ ॥ ***আর হ্যা বাচক*** نكرہ ***যদি কোন*** عام ***সিফাতের দ্বারা*** موصوف ***হয়, তাহলে এটা*** عام ***হবে।*** এটা পূর্বের বক্তব্য হতে استثنا এর পর্যায়ে। যেন গ্রন্থকার (র) বলেছেন যে, اثبات এর মধ্যে نكرہ টা خاص হয়ে থাকে। কিন্তু যদি এটা কোনো عام সিফাতের দ্বারা موصوف হয়, তাহলে যেগুলোতে উক্ত সিফাত পাওয়া যাবে, সে সবগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করবে। যদিও তা ছাড়া অন্যান্য বিষয়কে বের করার ব্যাপারে خاص - এটা মূলত পরিভাষা ও ব্যবহার অনুসারে হয়েছে। অন্যথা বাহ্যিক বিবেচনায় সিফাতের অর্থ হবে خصوص (নির্দিষ্টকরণ) ও تقييد (শর্তারোপকরণ)।

আর এ কারণেই সিফাত যখন خاص হয় তখন এটা عام হয় না। যেমন- তোমার উক্তি والله لا اضرب الا رجلا ولدني (আল্লাহর শপথ আমি কোনো ব্যক্তিকে প্রহার করবো না, তবে ঐ ব্যক্তিকে যে আমাকে জন্ম দিয়েছে)। কেননা পিতা মাত্র একজনই হয়ে থাকে। তবে এ নিয়মটি قاعده كليه নয়। বরং قاعده اكثريه। অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্যথা কোনো কোনো সময় সিফাত ছাড়াও عام হয়ে থাকে। যেমন- কারো উক্তি تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ جَرَادَةٍ (খেজুর ফড়িং হতে উত্তম।) আর আল্লাহর বাণী- عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا اَحْضَرَتْ (প্রত্যেক ব্যক্তি যা করেছে তা জানবে) এবং عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ (প্রত্যেক ব্যক্তি যা পেশ করেছে তা জানবে) আবার কোনো সময় نكره টা ইতিবাচক বাক্যে صفة এর সাথে خاص হয়। যেমন- কেউ বললো 'আল্লাহর শপথ! আমি একজন কূফী মহিলাকে বিবাহ করবো।' তাহলে একটি মহিলাকে বিবাহ করলেই শপথ পূর্ণ হয়ে যাবে। আর যেমন তোমার উক্তি لَقِيْتُ رَجُلًا عَالِمًا (আমি একজন বিদ্বান ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেলাম।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله وَاِنْ وُصِفَتْ بِصِفَةٍ الخ ব্যাখ্যাকার বলেন- মাতিন (র) এর ইবারত وان وصفت بصفة عامة تعم পূর্বের ইবারত থেকে ইস্তেসনার পর্যায়ে। কেমন যেন তিনি বলছেন- নাকেরাটি হা বাচক বাক্যে খাছ বোঝায়। তবে যদি নাকেরা আ'ম কোনো বিশেষণে বিশেষিত হয় তাহলে যার মধ্যে এ বিশেষণ পাওয়া যাবে সে ধরনের সকল আফরাদকে শামিল করবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে নাকেরাটি উমূমের ফায়দা দিবে।

وَاِن كَانَتْ خَاصَّةً فِى اِخْرَاجِ مَا عَدَاهَا এর দ্বারা একটি وهم বা ধারণা নিরসন করা হয়েছে। তা এই যে, نكره موصوفة টি مقيدة হয়ে থাকে। অর্থাৎ নাকেরা শব্দের সিফাত উল্লেখ করলে তা উক্ত সিফাতের সাথে আবদ্ধ হয়ে যায়। আর مقيد বিষয়টি খাছ এর অন্তর্গত আ'মের প্রকারসমূহের অন্তর্গত নয়। এ কারণেই نكره موصوفة কে আ'মের প্রকারের মধ্যে গণ্য করা বাতিল। অথচ মুসান্নিফ (র) এটাকে আ'মের প্রকারসমূহের অন্তর্গত করেছেন।

উত্তর : যে নাকেরা আ'ম সিফাতের সাথে বিশেষিত যদিও তা ঐ মুতলাক নাকেরার তুলনায় খাছ যার জন্য এ সিফাত উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু যে পরিমাণ আফরাদের মধ্যে উক্ত সিফাত পাওয়া যাবে তার প্রতি লক্ষ্য করে নাকেরাটি আ'ম হবে। যদিও উক্ত আফরাদকে খারিজ করার দিক দিয়ে যেগুলোর মধ্যে সিফাত বিদ্যমান নেই نكره موصوفةটি খাছ। অর্থাৎ نكره موصوفة এদিক দিয়ে আ'ম যে, যেখানে যেখানে সিফাত পাওয়া যাবে সেখানে সেখানে উক্ত নাকেরা মুতলাক হবে। আর তা খাছ এদিক দিয়ে যে, নাকেরার যে আফরাদের মধ্যে এ সিফাত থাকবে না সেগুলোর উপর نكره موصوفة প্রযোজ্য হবে না। সারকথা এই যে, نكره موصوفة بصفة عامة এর মধ্যে عموم وخصوص টা ইযাফী বা আপেক্ষিক, হাকীকী নয়। আর একটি শব্দ বাস্তবে আ'ম ও খাছ হতে পারে না। তবে তুলনামূলক বা আপেক্ষিক আ'ম ও খাছ একত্রিত হতে পারে। মোটকথা نكره موصوفة بصفة عامة ঐ সকল আফরাদের দিক দিয়ে আ'ম যেগুলোর মধ্যে এ সিফাত বিদ্যমান রয়েছে।

ব্যাখ্যাকার এর উত্তরের প্রতি ইশারা করে বলেন– نكره موصوفة بصفة عامة আম হওয়া পরিভাষা ও আরবদের ব্যবহারের দিক দিয়ে মাত্র। অন্যথায় বাহ্যিক দৃষ্টে সিফাতের অর্থ হলো খাছ ও মুকাইয়াদ হওয়া। অর্থাৎ এটা সুস্পষ্ট যে, সিফাতের কারণে নাকেরার মধ্যে তাখসীস ও তাকয়ীদ সৃষ্টি হয়। কিন্তু পরিভাষা ও ব্যবহারের দিক দিয়ে তা عموم এর ফায়দা দেয়। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ এর মধ্যে মুমিন বান্দা মুশরিক বান্দা থেকে উত্তম হওয়া সকল মুমিনের ক্ষেত্রে আ'ম। এভাবে قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَا اَذًى এর মধ্যে উত্তম কথা এমন সাদকা থেকে উত্তম হওয়া যার পরে খোটা দেয়া হয় এটা প্রত্যেক উত্তম কথাকে শামিল করে।

ব্যাখ্যাকার বলেন– নাকেরার সিফাত যদি নিজেই খাছ হয় তাহলে তা উমূম বোঝাবে না। বরং খুসূস বোঝাবে। যেমন কোনো ব্যক্তি বললো وَاللّٰهِ لَا اَضْرِبُ اِلَّا رَجُلًا وَلَدَنِىْ আল্লাহর শপথ আমি মারবো না তবে এমন ব্যক্তিকে যে আমাকে জন্ম দিয়েছে অর্থাৎ পিতাকে। এ উদাহরণে رَجُلًا এর সিফাত হলো وَلَدَنِىْ এটা একটি খাছ সিফাত। কারণ পিতা একজনই হয়ে থাকে, একাধিক নয়। সুতরাং رَجُلًا নাকেরাটি খাছই বোঝাবে।

ব্যাখ্যাকার বলেন– পূর্বে উল্লেখিত নীতি (হা বাচক বাক্যে নাকেরা খাছের ফায়দা দেয় কিন্তু আ'ম সিফাতের সাথে বিশেষিত হলে তখন তা উমূম বোঝায়) অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সর্বক্ষেত্রে নয়। কখনো এর বিপরীতও হতে পারে। যেমন মুহরিম ব্যক্তি এহরাম অবস্থায় ফড়িং শিকার করলে ওমর (রা) তার ব্যাপারে বলেন– খেজুর সাদকা করা ফড়িং থেকে উত্তম। অর্থাৎ ফড়িং শিকার করার বিনিময়ে একটি খেজুর সাদকা করা যথেষ্ট। এখানে جرادة ও تمرة উভয়টি নাকেরা। বাক্যটি হা বাচক এবং এর কোনো সিফাত উল্লেখ হয়নি। তথাপি উমূমের ফায়দা দিচ্ছে। কেননা এর দ্বারা খেজুরের বিশেষ কোনো فرد উদ্দেশ্য নয়। এভাবে ফড়িং এরও বিশেষ فرد উদ্দেশ্য নয়। আল্লাহ তা'আলার বাণী عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا اَحْضَرَتْ এবং عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ এর মধ্যে نفس শব্দটি নাকেরা। বাক্যটি হাঁ বাচক এবং সিফাত বিহীন। তথাপি সকল নফসকে শামিল করছে। আর কখনো হা বাচক বাক্যে সিফাত উল্লেখ হওয়া সত্ত্বে নাকেরা খাছ বোঝায়। যেমন কেউ বললো وَاللّٰهِ لَا تَزَوَّجَنَّ اِمْرَاَةً كُوْفِيَةً আল্লাহর শপথ! আমি কূফী নারীকে বিবাহ করবো। তাহলে যেকোনো একজন কূফী নারীকে বিবাহ করলে সে তার শপথ পূর্ণকারী বিবেচিত হবে। এখানে যদি নাকেরার সিফাতের কারণে উমূম বোঝাতো তাহলে শপথকারী ঐ সময় পর্যন্ত শপথ পূর্ণকারী গণ্য হতো না যতোক্ষণ সে কূফার সকল নারীকে বিবাহ না করতো। অতএব এটা এ বিষয়ের দলিল যে, এখানে নাকেরা সিফাত সত্ত্বে খাছের ফায়দা দিচ্ছে। এভাবে وَاللّٰهِ لَقِيْتُ رَجُلًا عَالِمًا আল্লাহর শপথ আমি একজন আলিমের সাথে সাক্ষাৎ করবো। এর মধ্যে عالم যদিও رجل এর সিফত কিন্তু এ সত্ত্বে একজন আলিম ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করার দ্বারা শপথ পূর্ণকারী হয়ে যায়। এর দ্বারা বোঝা গেলো যে, নাকেরা কখনো হা বাচক বাক্যে সিফাত সত্ত্বে খাছ হওয়ার ফায়দা দেয়।

كَقَوْلِه وَاللّٰهِ لَا اُكَلِّمُ اَحَدًا اِلَّا رَجُلًا كُوْفِيًّا مِثَالٌ لِعُمُومِ النَّكِرَةِ الْمَوْصُوفَةِ فَاِنَّ رَجُلًا كَانَ نَكِرَةً فِي الْاِثْبَاتِ خَاصٌّ بِرَجُلٍ وَاحِدٍ لَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِقَوْلِهِ كُوْفِيًّا فَيَحْنَثُ اِنْ تَكَلَّمَ رَجُلَيْنِ وَلَمَّا قَالَ كُوْفِيًّا عَمَّ جَمِيعُ رِجَالِ الْكُوْفَةِ فَلَا يَحْنَثُ بِتَكَلُّمِ كُلِّ مَنْ كَانَ مِنْ رِجَالِ الْكُوْفَةِ وَقَوْلِهِ وَاللّٰهِ لَا اَقْرَبُكُمَا اِلَّا يَوْمًا اَقْرَبُكُمَا فِيْهِ مِثَالٌ ثَانٍ لِعُمُومِ النَّكِرَةِ الْمَوْصُوفَةِ وَهُوَ خِطَابٌ لِامْرَأَتَيْهِ فَاِنَّ قَوْلَهُ يَوْمًا نَكِرَةٌ مَوْضُوعَةٌ لِيَوْمٍ وَاحِدٍ فَلَوْ لَمْ يَصِفْهُ بِقَوْلِهِ اَقْرَبُكُمَا فِيْهِ لَكَانَ مُوْلِيًا بَعْدَ قُرْبَانِ يَوْمٍ وَاحِدٍ لِاَنَّ هٰذَا اِيْلَاءٌ مُؤَبَّدٌ وَلَيْسَ مُوَقَّتًا بِاَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ حَتّٰى تَنْقُصَ الْاَشْهُرُ الْاَرْبَعَةُ بِيَوْمٍ وَلَمَّا وَصَفَهُ بِقَوْلِهِ اَقْرَبُكُمَا فِيْهِ لَمْ يَكُنْ مُوْلِيًا اَبَدًا لِاَنَّ كُلَّ يَوْمٍ يَقْرَبُهُمَا فِيْهِ يَكُوْنُ مُسْتَثْنًى مِنَ الْيَمِيْنِ لِهٰذِهِ الصِّفَةِ الْعَامَّةِ فَلَا يَحْنَثُ بِهِ- وَكَذَا اِذَا قَالَ اَيُّ عَبِيْدِي ضَرَبَكَ فَهُوَ حُرٌّ فَضَرَبُوْهُ اَنَّهُمْ يُعْتَقُوْنَ مِثَالٌ ثَالِثٌ لِكَوْنِ النَّكِرَةِ عَامَّةً بِعُمُوْمِ الْوَصْفِ عَلٰى سَبِيْلِ التَّشْبِيْهِ لِلْقَاعِدَةِ -فَاِنَّ قَوْلَهُ اَيُّ عَبِيْدِي لَيْسَ بِنَكِرَةٍ نَحْوِيَّةٍ لِكَوْنِهِ مُضَافًا اِلَى الْمَعْرِفَةِ وَلٰكِنْ يُشْبِهُ النَّكِرَةَ فِي الْاِبْهَامِ وُصِفَ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ وَهُوَ قَوْلُهُ ضَرَبَكَ فَيَعُمُّ بِعُمُوْمِ الصِّفَةِ فَيُعْتَقُ كُلُّ مَنْهُمْ اِنْ ضَرَبُوا الْمُخَاطَبَ جُمْلَةً مُجْتَمِعِيْنَ اَوْ مُتَفَرِّقِيْنَ بِخِلَافِ مَا اِذَا قَالَ اَيُّ عَبِيْدِي ضَرَبْتَهُ فَهُوَ حُرٌّ بِاِضَافَةِ الضَّرْبِ اِلَى الْمُخَاطَبِ وَجَعْلِ الْعَبِيْدِ مَضْرُوْبِيْنَ فَاِنَّهُمْ لَا يُعْتَقُوْنَ كُلُّهُمْ اِذَا ضَرَبَ الْمُخَاطَبُ جَمِيْعَهُمْ بَلْ اِنْ ضَرَبَهُمْ بِالتَّرْتِيْبِ عَتَقَ الْاَوَّلُ لِعَدَمِ الْمُزَاحِمِ وَاِنْ ضَرَبَهُمْ دَفْعَةً يُخَيَّرُ الْمَوْلٰى فِي تَعْيِيْنِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَوَجْهُ الْفَرْقِ عَلٰى مَا هُوَ الْمَشْهُوْرُ اَنَّ فِي الْاَوَّلِ وَصَفَهُ بِالضَّارِبِيَّةِ فَيَعُمُّ بِعُمُوْمِ الصِّفَةِ وَفِي الثَّانِي قَطَعَ عَنِ الْوَصْفِيَّةِ لِكَوْنِهِ مُسْنَدًا اِلَى الْمُخَاطَبِ دُوْنَ اَيٍّ فَلَا يَعُمُّ وَيُصَارُ اِلَى اَخَصِّ الْخُصُوْصِ

অনুবাদ ॥ যেমন- ***"কারো উক্তি 'আল্লাহর শপথ! আমি কূফী লোক ছাড়া অন্য কারো সাথে কথা বলবো না"।*** এটা نكرة موصوفة (গুণ বিশিষ্ট نكرة) عام হওয়ার উদাহরণ। কেননা رجلا শব্দটি ইতিবাচক نكرة এর মধ্যে কোনো এক ব্যক্তির সাথে খাস ছিল, যদি কূফী শব্দটি না বলতো। আর এ জন্যে দুব্যক্তির সাথে কথা বললে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যখন কূফী বললো তখন কূফার সমস্ত লোককে শামিল করেছে। কাজেই কূফার প্রতিটি লোকের সাথে কথা বললে শপথ ভঙ্গ হবে না। এবং কারো উক্তি ***'আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের কাছে যাব না, তবে সে দিন যে দিন তোমাদের নিকট যাব।'*** এটা وصف বিশিষ্ট نكره টি عام হওয়ার দ্বিতীয় উদাহরণ। এটা তার দু স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলেছে। কেননা, তার উক্তি يوما অনির্দিষ্ট শব্দ, আর এটা একদিনের জন্যে গঠিত হয়েছে।

সুতরাং এটাকে যদি সম্বোধনকারী اَقْرَبُكُمَا فِيْهِ এর দ্বারা বিশেষিত না করত তাহলে সে একদিন সহবাস করার পর, ঈলাকারী সাব্যস্ত হতো। কেননা, এটা ايلاء مؤبد। (চিরস্থায়ী ঈলা), চার মাসের সাথে এটা নির্দিষ্ট (সীমাবদ্ধ) নয়, যে চার মাসের থেকে একদিন হ্রাস পাবে। আর যখন বক্তা اَقْرَبُكُمَا فِيْهِ এর

দ্বারা موصوف করেছে, তখন ايلا مويد হয়নি। প্রত্যেক সেই দিন যে দিনগুলোকে সে তার উভয় স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে তা ঐ عام সিফাত হতে مستثنى হয়ে যাবে। সুতরাং এর দ্বারা তার শপথ ভঙ্গ হবে না।

তদ্রূপ যখন কেউ বলবে 'আমার যে গোলাম তোমাকে প্রহার করবে সে আযাদ হয়ে যাবে।' অতঃপর সব গোলামই তাকে মারল তাহলে সকল গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। এটা وصف বিশিষ্ট نكره টা عام হওয়ার তৃতীয় উদাহরণ। এটাকে একটি নীতির সাথে تشبيه দেয়া হয়েছে।

কেননা, তার কথা اى عبيدى নাহ্বীগণের পরিভাষায় نكره নয়, কারণ তা معرفه এর দিকে مضاف হয়েছে। তবে অস্পষ্ট হওয়ার দিক দিয়ে এটা نكره এর তুল্য। যা عام সিফাতের দ্বারা موصوف (বিশেষিত) হয়েছে। আর তা হলো ضربك - সুতরাং صفت টা عام হওয়ার কারণে তাও عام হবে এবং প্রত্যেকটি গোলাম আযাদ হয়ে যাবে যদি তারা সম্বোধনকৃত ব্যক্তিকে সবাই একত্রে বা পৃথক পৃথকভাবে মারে। এর বিপরীতে যদি কেউ ضرب কে مخاطب –এর দিকে اسناد করে এবং عبيد কে প্রহারকৃত সাব্যস্ত করে বলে اَيَّ عَبِيْدِيْ ضَرَبْتَهُ فَهُوَ حُرٌّ (আমার যে কোনো দাসকে তুমি প্রহার করবে সে আযাদ হয়ে যাবে) কারণ, এমতাবস্থায় যদি مخاطب সকল গোলামকে প্রহার করে, তাহলে সমস্ত গোলাম আযাদ হবে না; বরং ঐ গোলামকে পালাক্রমে প্রহার করলে প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার কারণে প্রথম গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। আর যদি তাদের সকলকে একসঙ্গে প্রহার করে, তা হলে মণিবের এ এখতিয়ার থাকবে যে, সে তাদের মধ্য হতে কোন একজনকে নির্ধারণ করে দেবে।

আর ঐ দুটি উদাহরণে অর্থাৎ اَيُّ عَبِيْدِيْ ضَرَبَكَ فَهُوَ حُرٌّ وَاَيُّ عَبِيْدِيْ ضَرَبْتَهُ فَهُوَ حُرٌّ এ দুটির মাঝে প্রসিদ্ধ মতে পার্থক্য এই যে, প্রথম উদাহরণে اى কে ضاربيت (প্রহারকরণ)-এর সাথে موصوف করা হয়েছে। তাই তার সিফাত عام হওয়ার কারণে عام হবে। আর দ্বিতীয় উদাহরণে তাকে وصفيت (বিশেষণ) হতে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। কেননা, ضرب কে مخاطب এর দিকে نسبت করা হয়েছে, اى এর দিকে نسبت করা হয়নি। কাজেই তা عام হবে না বরং তাকে اخص الخصوص (সর্বাধিক খাস) অর্থাৎ এক-এর দিকে ফিরানো হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ॥ قوله كقوله وَاللّٰهِ لَاُكَلِّمُ الخ : মুসান্নিফ (র) পূর্বের নীতি উল্লেখ করেছিলেন যে, হা বাচক বাক্যে নাকেরা শব্দ যদি عام সিফাত বোঝায় তাহলে তা উমূম বোঝাবে। মুসান্নিফ (র) এ প্রথম উদাহরণে এটা উল্লেখ করেছেন যে, কেউ যদি শপথ করে وَاللّٰهِ لَا اُكَلِّمُ اَحَدًا اِلَّا رَجُلًا كُوْفِيًّا আল্লাহর শপথ আমি কূফি লোক ছাড়া কারো সাথে কথা বলবো না। এ উদাহরণে رجلا শব্দটি নাকেরা, আর বাক্যটি হা বাচক। সিফাত বিহীন, رجل واحد এর সাথে খাছ। সুতরাং শপথকারী যদি কেবল الا رجلا বলতো كوفيا না উল্লেখ করতো তাহলে কেবল ১ ব্যক্তির সাথে কথা বলার অনুমতি লাভ হতো। আর একাধিক জনের সাথে কথা বললে কছম ভঙ্গকারী হতো। কিন্তু رجلا এর পরে যখন كوفيا উল্লেখ করে এর সিফাতও উল্লেখ করলো কাজেই এখন এ কথা বলায় বিষয়টি কুফার সকল ব্যক্তিকে বেষ্টন করে নিবে। কুফার সকল মানুষের সাথে কথা বলা সত্ত্বে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। সুতরাং رجلا كوفيا শব্দ দ্বারা কুফার সকল ব্যক্তি হুকুমের অধীনে হওয়া এ বিষয়ের দলিল যে, হা বাচক বাক্যে নাকেরা আ'ম সিফাত হলে তা উমুমের ফায়দা দেয়।

قوله وَاللّٰهِ لَا اَقْرَبُكُمَا الخ : এ টা نكره موصوفه আ'ম হওয়ার দ্বিতীয় উদাহরণ। এ উদাহরণের পূর্বে এ কথাটি জেনে রাখা উচিত যে, قربان শব্দটির অর্থ নিকটবর্তী হওয়া। কেনায়া স্বরূপ এটা সহবাসও বোঝায়। আর ايلاء এর আভিধানিক অর্থ হলো শপথ করা। আর পারিভাষিক অর্থ হলো স্ত্রীসহবাস না করার শপথ করা। এরপর ايلاء ২ প্রকার। ১. ايلاء موقت ও ২. ايلاء مويد।

★ ايلاء موقت এই যে, স্বামী ৪ মাস কিংবা ততোধিক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত স্ত্রী সহবাস না করার শপথ করবে। ৪ মাস থেকে সামান্য কম এমনকি দুই-এক দিন কমের শপথ করলে ইলা হবে না।

★ إيلاءٌ مؤبّد। এই যে, স্বামী শপথ করলো, আমি কখনো স্ত্রীর সাথে সহবাস করবো না অথবা এমন শপথ করলো যে, "আমি সহবাস করবো না"।

বিধান : ইলার বিধান এই যে, ইলার মেয়াদের মধ্যে যদি স্ত্রী সহবাস না করে তাহলে সে এক তালাকে বায়েন প্রাপ্ত হয়। আর সহবাস করলে শপথ ভঙ্গের কারণে তার উপর কাফফারা দেওয়া ওয়াজিব হয়ে যায়।

উপরোক্ত ভূমিকার পরে দ্বিতীয় উদাহরণের বিশ্লেষণ : কোনো ব্যক্তি তার ২ জন স্ত্রীকে সম্বোধন করে বললো আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের ২ জনের নিকটবর্তী হবো না তবে ১ দিন যে দিনে উভয়ের নিকটবর্তী হবো এ উদাহরণে يوما শব্দটি নাকেরা। অর্থ ১ দিন। লোকটি যদি يوما শব্দকে তার أَقْرَبُكُمَا فِيهِ উক্তির সাথে বিশেষিত না করতো বরং কেবল وَاللّٰهِ لَا أَقْرَبُكُمَا إِلَّا يَوْمًا বলতো তাহলে ১ দিন বিবির নিকটবর্তী হলে লোকটি ইলাকারী গণ্য হতো। কারণ এটা হলো إيلاء مؤبد যা ৪ মাসের সাথে নির্দিষ্ট নয়। কারণ ১ দিন বাদ দেয়ার কারণে ৪ মাসের কম হওয়ায় ইলাকারী গণ্য হয় না। বরং إيلاء مؤبد এর কারণে ১ দিন নিকটবর্তী হওয়ার পরে লোকটি ইলাকারী গণ্য হবে। কিন্তু সে যখন يوما নাকেরাকে قربكما فيه এর সিফাতের সাথে বিশেষিত করলো এখন সে নিশ্চিতরূপে ইলাকারী হবে না। কারণ أَقْرَبُكُمَا فِيهِ সিফাতের কারণে এমন প্রত্যেক দিন যেদিন সে قربان করবে না তা শপথ থেকে মুসতাসনা হবে এবং কোনো দিনও قربان এর কারণে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। এখানে إِلَّا يَوْمًا যতোক্ষণ সিফাতবিহীন ছিলো ততোক্ষণ পর্যন্ত কেবল ১ দিন শপথ থেকে মুসতাসনা ছিলো। কিন্তু أَقْرَبُكُمَا فِيهِ এর সাথে বিশেষিত করার দরুন قربان এর প্রত্যেকদিন শপথ থেকে বাদ হয়ে গেলো। অতএব প্রমাণিত হলো যে, নাকেরা যদি হা বাচক বাক্যে পতিত হয় আর তা আ'ম সিফাতের সাথে বিশেষিত হয় তাহলে তা ব্যাপকতা বোঝায়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله وكذا إذا قال أي عبيدي الخ : মুসান্নিফ (র) عموم وصف এর কারণে নাকেরা আ'ম হওয়ার তৃতীয় উদাহরণ দিচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে এটা উদাহরণ নয় বরং একটি মূলনীতির পর্যায়ে (যে, প্রত্যেক নাকেরা হা বাচক বাক্যে আ'ম সিফাতের সাথে বিশেষিত হয়) এটা প্রকৃত উদাহরণ এ কারণে নয় যে, أي عبيدي এর মধ্যে أي শব্দটি যেহেতু عبيدي মা'রেফার প্রতি মুযাফ হয়েছে। এ কারণে أي নাকেরা হবে না বরং মা'রেফা। তবে أي শব্দ যেহেতু তার অর্থ অস্পষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে নাকেরার সাথে সামঞ্জস্য রাখে। আর صفت عامه অর্থাৎ ضربك এর সাথে বিশেষিত। এ কারণে এটা عموم صفت এর কারণে আ'ম হবে। অতএব মুখাতাবকে যদি সকল গোলাম মারে তাহলে তারা সকলে আযাদ হয়ে যাবে। চাই একত্রে মারুক বা ভিন্ন ভিন্নভাবে।

মণিব যদি বলে যে, أَيُّ عَبِيدِيْ ضَرَبْتَهُ فَهُوَ حُرٌّ অর্থাৎ যদি সে মুখাতাবকে প্রহারকারী এবং গোলামদেরকে প্রহৃত স্থির করে। আর সে সকল গোলামকে মারে তাহলে আযাদ হবে না। কেবল একজন আযাদ হবে। এটা এভাবে যে, সে সকল গোলামকে একের পর এক প্রহার করলো তাহলে প্রথম প্রহৃত গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। কারণ যখন তাকে প্রহার করেছিলো তখন তার সাথে কেউ مزاحم তথা ভীড় সৃষ্টিকারী ছিলো না। বরং সে একাকী প্রহৃত ছিলো। এরপর যখন অন্যদেরকে প্রহার করা হলো তখন প্রথম প্রহৃত গোলাম এদের সাথে مزاحم হলো। অতএব مزاحمت এর কারণে প্রথম প্রহৃত গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। আর যদি সকল গোলামকে একবারে মারে তাহলে আযাদ হওয়ার জন্য কোনো একজন গোলামকে নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে মণিবের এখতিয়ার থাকবে। কারণ আযাদ করার অধিকার মনিবেরই থাকে।

পার্থক্য : ব্যাখ্যাকার বলেন أَيُّ عَبِيدِيْ ضَرَبَكَ فَهُوَ حر এবং أَيُّ عَبِيدِيْ ضَرَبْتَهُ فَهُوَ حُرٌّ এর মধ্যে প্রসিদ্ধ পার্থক্য এই যে, প্রথম উদাহরণে أي শব্দকে ضاربيت এর সাথে বিশেষিত করা হয়েছে। এটা হলো صفت عامة। একারণে মওসূফ আ'ম হবে। অর্থাৎ সকল গোলামের প্রহারকারী হওয়ার কারণে সকল গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় উদাহরণে أي কে وصفيت তথা ضاربيت থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। কারণ এ উদাহরণে প্রহার মুখাতাবের প্রতি সম্বন্ধিত أي এর প্রতি নয়। সুতরাং এ উদাহরণে أي কে যখন ضاربيت এর সাথে বিশেষিত করা হলো না কাজেই صفت عامة না হওয়ার কারণে মওসূফ আ'ম হবে না। বরং তা সর্বাধিক খাছ অর্থাৎ একের প্রতি ধাবিত হবে। কারণ এটাই সুনিশ্চিত। কাজেই একজন গোলাম আযাদ হবে।

وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِاَنَّكُمْ اِنْ اَرَدْتُّمُ الْوَصْفَ النَّحْوِيَّ فَلَيْسَ شَيْءٌ مِّنَ الْمِثَالَيْنِ مِنْ قَبِيْلِ الْوَصْفِ لِاَنَّ اَيًّا مَوْصُوْلَةٌ اَوْ شَرْطِيَّةٌ وَاِنْ اَرَدْتُّمُ الْوَصْفَ الْمَعْنَوِيَّ فَفِيْ كُلٍّ مِنَ الْمِثَالَيْنِ حَاصِلٌ -لِاَنَّه فِي الْاَوَّلِ وَصَفَه بِالضَّارِبِيَّةِ وَفِي الثَّانِيْ بِالْمَضْرُوْبِيَّةِ اَلَا تَرٰى اَنَّ فِيْ قَوْلِهِ اِلَّا يَوْمًا اَقْرَبُكُمَا فِيْهِ وُجِدَ الْعُمُوْمُ مَعَ اَنَّ يَوْمًا وَقَعَ مَفْعُوْلًا فِيْهِ لَا فَاعِلًا فَيَنْبَغِيْ اَنْ يَكُوْنَ فِي الْمَفْعُوْلِ بِه كَذٰلِكَ وَاُجِيْبَ بِاَنَّ الضَّرْبَ يَقُوْمُ بِالضَّارِبِ فَلَا يَقُوْمُ بِالْمَضْرُوْبِ وَالْمَفْعُوْلُ بِه فَضْلَةٌ لِاَنَّه عِبَارَةٌ عَنِ الْحَدَثِ مَعَ الزَّمَانِ فَيَتَلَازَمَانِ وَقِيْلَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا اِنَّ فِي الصُّوْرَةِ الْاُوْلٰى لَمَّا عَلَّقَ الْعِتْقَ بِضَرْبِ الْعَبِيْدِ يُسَارِعُ كُلٌّ مِنْهُمْ اِلٰى ضَرْبِه لِاَجْلِ عِتْقِه فَلَا يُمْكِنُ التَّخْيِيْرُ فِيْهِ لِلْمَوْلٰى بِلَا مُرَجِّحٍ فَيَعُمُّ بِخِلَافِ الصُّوْرَةِ الثَّانِيَةِ فَاِنَّه عَلَّقَ فِيْهَا عَلٰى ضَرْبِ الْمُخَاطَبِ فَلَا يَنْبَغِيْ لَهٗ اَنْ يَضْرِبَهُمْ جَمِيْعًا لِيَعْتِقُوْا فَيُخَيَّرُ فِيْهِ الْمَوْلٰى بَيْنَ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ -

---

অনুবাদ ॥ পার্থক্যের এ কারণের ওপর এভাবে আপত্তি করা হয়েছে। যে, যদি তোমাদের মতে, وصف এর দ্বারা নাহুবিশারদগণের وصف উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে জেনে রেখো যে, ঐ দুটি উদাহরণের কোনোটিই وصف এর শ্রেণীভুক্ত নয়। কেননা, اى হয়তো موصوله হবে অথবা شرطيه হবে। কাজেই اى এরপর صله হবে অথবা شرط হবে। আর যদি তোমরা وصف এর দ্বারা وصف معنوى বুঝিয়ে থাকো তাহলে উভয় উদাহরণে এ সিফাত বিদ্যমান রয়েছে।

কেননা, প্রথমটির মধ্যে وصف ضاربيّت এর দ্বারা এবং দ্বিতীয়টিতে وصف مضروبيّت এর দ্বারা موصوف কর হয়েছে। তুমি কি দেখনি যে, তার উক্তি يَوْمًا اَقْرَبُكُمَا فِيْهِ এর মধ্যে عموم পাওয়া গেছে অথচ يوما শব্দটি مفعول فيه হয়েছে, فاعل হয়নি। কাজেই مفعول به এর মধ্যেও অনুরূপ হওয়া উচিত।

এর উত্তর এভাবে দেয়া হয়েছে যে, প্রহারকারীর দ্বারাই মূলত প্রহার বাস্তবে পরিণত হয়ে থাকে, যাকে প্রহার করা হয় তার দ্বারা নয়। আর معلول به তো অতিরিক্ত বিষয়। তার ওপর فعل নির্ভরশীল নয়। আর يوما এর বিপরীত। কারণ, يوما হলো مفعول فيه, ফায়েল নয়। কেননা তা فعل এর অংশ বিশেষ। কারণ এর দ্বারা সময়ের সাথে معنى حُدوث পাওয়া যাওয়া উদ্দেশ্য থাকে। সুতরাং একটি অপরটির জন্যে অত্যাবশ্যক।

কেউ কেউ পার্থক্য করতে গিয়ে বলেছেন, প্রথম অবস্থায় যেহেতু গোলামের আযাদীকে প্রহার করার সাথে اضافت করা হয়েছে, সেহেতু প্রতিটি গোলাম ঐ ব্যক্তিকে প্রহার করার জন্যে ছুটবে, তার আযাদী অর্জনের জন্যে। অতএব, অগ্রাধিকার দেয়ার কারণ না থাকার কারণে মণিবকে এখতিয়ার দেয়া অসম্ভব। কাজেই হুকুম عام হবে। এটা দ্বিতীয় অবস্থার বিপরীত। কেননা, তাতে مخاطب এর প্রহার করার সাথে আযাদীকে اضافت করা হয়েছে। সুতরাং مخاطب এর জন্যে সকলকে প্রহার করা বাঞ্ছনীয় হবে না, যাতে তারা সকলেই আযাদ হয়ে যায়। অতএব, এমতাবস্থায় তাদের মধ্য হতে মণিবকে একজনকে নির্দিষ্ট করে দেয়ার এখতিয়ার দেয়া হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّكُمْ الخ : ব্যাখ্যাকার বলেন– উভয় উদাহরণে উল্লেখিত পার্থক্যের সূত্রের উপর প্রশ্ন এই যে, আপনি বলেছেন প্রথম উদাহরণে أَيٌّ - ضَارِبَتُ বিশেষণে বিশেষিত। আর দ্বিতীয় উদাহরণে اى কে সিফাত বিশেষণ শূন্য করা হয়েছে। আমাদের জিজ্ঞাস্য যে, সিফাত দ্বারা আপনার উদ্দেশ্য কি? নাহবী সিফাত নাকি অর্থগত সিফাত? নাহবী সিফাত এমন তাবে' শব্দকে বলে যা এমন অর্থ বোঝায় যা মাতবূর মধ্যে পাওয়া যায়। তাবে'টি মাতবু'র পরে আসে। আর অর্থগত সিফাত قائم بالغير কে বলা হয়। মোটকথা আপনি যদি নাহবী সিফাত উদ্দেশ্য নেন তাহলে উভয় উদাহরণে কোনো সিফাত নেই। কারণ اى শব্দটি موصولة অথবা شرطية হবে। موصوله হওয়ার ক্ষেত্রে اى এর পরে صلة হবে। আর শর্তিয়া হলে اى এর পরে শর্ত থাকবে।

সারকথা এই যে, اى এর পরে সিলা রয়েছে বা শর্ত রয়েছে; কিন্তু সিফত নেই।

আর আপনি যদি অর্থগত সিফত উদ্দেশ্য নেন তাহলে উভয় উদাহরণে তা বিদ্যমান রয়েছে। কারণ প্রথম উদাহরণ أَيُّ عَبِيْدِيْ ضَرَبَكَ فَهُوَ حُرٌّ এর মধ্যে ضاربيت হলো অর্থগত সিফাত। আর দ্বিতীয় উদাহরণ أَيُّ عَبِيْدِيْ ضَرَبْتَهُ فَهُوَ حُرٌّ এর মধ্যে مضروبيت হলো অর্থগত সিফাত। কেননা অর্থগত সিফাতের জন্য ফায়েল হওয়া শর্ত নয়। বরং ফায়েল ছাড়াও হতে পারে। যেমন– পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। إِلَّا يَوْمًا أَقْرَبُكُمَا فِيْهِ এর মধ্যে صفت عامة এর কারণে উমূম পাওয়া গেছে। অথচ يومًا হলো মাফউলে ফীহ, ফায়েল নয়। অতএব মুনাসিব এই যে, মাফউলে বিহীও صفتِ عَامَّة এর কারণে আ'ম হোক। আর দ্বিতীয় উদাহরণে মাফউলে বিহী وصف مضروبيت এর সাথে বিশেষিত হয়েছে। কাজেই এ উদারহরণেও আ'ম হওয়া উচিত। আর মুখাতাবের সকল গোলামকে প্রহারের ক্ষেত্রে সবাই আযাদ হওয়া উচিত। যেমন প্রথম উদাহরণে সবাই আযাদ হয়ে যায়।

উত্তর : وصف ضرب টি ضارب এর সাথে কায়েম হয়। অতএব مضروب এর সাথে কায়েম হবে না। কেননা এক সিফাত ২ জনের সাথে কায়েম হওয়া অসম্ভব। সুতরাং যখন ضرب বিশেষণ مضروب তথা মাফউলে বিহীর সাথে কায়েম হয় না কাজেই দ্বিতীয় উদাহরণে মাফউলে বিহী اى عبيدى এর জন্য কোনো সিফাত থাকবে না। اى عبيدى নাকেরা হা বাচক বাক্যে সিফাত বিহীন হবে। কাজেই তা খাছ হওয়ার ফায়দা দিবে। অতএব এ উদাহরণে বিশেষভাবে এক গোলাম আযাদ হবে। বাকী মাফউলে বিহীকে মাফউলে ফীহ এর উপর কিয়াস করা এটা قياس مع الفارق যা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা মাফউলে বিহী হলো فضلة বা অতিরিক্ত। ফে'লে লাযিম মাফউলে বিহীর উপর মওকূফ ও তার প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে না। পক্ষান্তরে فعل متعدى হলো মাফউলে ফীহ যা ফে'লের অংশ হয়ে থাকে। কারণ ফে'ল ৩ বস্তুর সমন্বয়ের নাম। ১. معنى حدوث ২. زمانه বা কাল ৩. نسبت الى الفاعل ফায়েলের প্রতি সম্বন্ধ। আর মাফউলে ফীহ যেহেতু কাল বোঝায় যা ফে'লের অংশ। কাজেই মাফউলে ফীহ ফে'লের অংশ হলো। আর كل ও جزء পরস্পরে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। অতএব ফে'ল ও মাফউলে ফীহ পরস্পরে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত হবে। প্রত্যেক ফে'ল মাফউলে ফীহ এর উপর মওকূফ হবে। অতএব মাফউলে বিহীকে মাফউলে ফীহ এর উপর কিয়াস করা সঙ্গত নয়।

কিছু সংখ্যক আলিম উভয় উদাহরণের মধ্যে পার্থক্য করত বলেন– প্রথম উদাহরণ অর্থাৎ أَيُّ عَبِيْدِي ضَرَبَكَ فهو حُرٌّ এর মধ্যে গোলামদের আযাদ হওয়া এ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট যে, তারা মুখাতাবকে প্রহার করবে। কাজেই প্রত্যেকে আযাদী লাভের জন্য তাকে প্রহরের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করবে। আর তাড়াহুড়া করলে তখন مرجع বিহীন মণিবকে এক গোলাম নির্দিষ্ট করার এখতিয়ার দেয়া সম্ভব হবে না। ফলে সকল গোলামদের ব্যাপারে আযাদ হওয়ার বিধান আ'ম হবে। আর দ্বিতীয় উদাহরণ অর্থাৎ أَيُّ عَبِيْدِى ضربْتَه فهو حُرٌّ এর মধ্যে গোলামদের আযাদ হওয়া মুখাতাবের প্রহারের উপর ঝুলন্ত নয়। অতএব গোলামদেরকে প্রহার করা মুখাতাবের জন্য উচিত হবে না। তখন মণিব একজন গোলামকে নির্দিষ্ট করার এখতিয়ার রাখবে। যাকে সে নির্দিষ্ট করবে সেই আযাদ হবে। তবে এটা ঐ সময় যখন মুখাতাব একই সময় সবাইকে মারবে। কারণ যদি পর্যায়ক্রমে একেকজনকে মারে তাহলে প্রথমজনই আযাদ হবে; অন্যরা নয়।

وَكَذا اِذا دَخلتْ لامُ التَعرِيف فِيما لا يَحْتَمِلُ التَعريفُ بِمَعْنى العَهْدِ اَوْجَبَتِ العُمُومُ يعني كَما اَنَّ النَكرةَ اذا وُصِفتْ بِصفةٍ عامّةٍ تَعُمُّ كذلك اذا دَخلَتْ لامُ المَعرِفةِ فِي صُورةٍ لا يَسْتقيمُ التَعرِيفُ العَهْدِى اَوْجَبَتِ العمومَ سواءٌ كانَ العُمومُ لِلجنْسِ كَما ذَهَبَ اليه فخرُ الاسلامِ وتابِعُوه اوْ لِلْاِسْتِغراقِ كمَا ذَهَبَ اليه اهلُ العَرِبيّةِ وجُمْهورُ الاُصُولِيّيْنَ وفيْه تنبيهٌ على اَنَّ العَهْدَ هُوَ الاَصْلُ فِي اللاّمِ فمادامَ يَسْتَقِيمُ العَهْدُ لا يُصارُ الى مَعْنًى اٰخرَ سواءٌ كانَ عهدًا خارجيًّا او ذهنيًّا كما ذَهَبَ اليه البعضُ وقِيل عَهدًا خارجيًّا فقط فاِنّه الاَصْلُ فِي التَعرِيْفِ والمَعهُودِ الذِّهنىّ فِي المَعْنى كالنّكرةِ فاِن لَّمْ يَستقِمِ العهدُ باَن لَّمْ يكنْ ثَمّه افرادٌ معهودةٌ او لَمْ يجرِ ذكرُه فيما سَبَقَ حُمِلَ على الجِنْسِ فيُحْتَمِلُ الاَدْنىٰ والكلُّ على حَسْبِ قابليّةِ المَقامِ او على الاِسْتِغراقِ فيَستوعِبُ الكُلَّ يَقِيْنًا كما فِي قولِه تَعالىٰ اِنّ الاِنْسانَ لفى خُسرٍ اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحَاتِ وقولِه السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِى وامثالِه–

অনুবাদ ॥ ***"আর তদ্রূপ لام تعريف যখন এমন স্থানে হবে যা تعريف عهدى এর সম্ভাবনা রাখে না"***, তাহলে عموم কে ওয়াজিব করবে। অর্থাৎ عام সিফাত বিশিষ্ট نكره যেভাবে عموم সাব্যস্ত করে; তদ্রূপ لام تعريف যখন এমন ক্ষেত্রে হবে, যেখানে تعريف عهدى সহীহ নয়, তখন সেখানে عموم সাব্যস্ত করবে। চাই এ عموم টা جنس এর জন্যে হোক, যেমন আরববাসীগণ এবং অধিকাংশ উসূলবিদগণের মাযহাব। গ্রন্থকার (র)-এর উক্তি فيما لا يحتمل এর মধ্যে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, لام এর মধ্যে لام عهدى ই হলো আসল। সুতরাং যতোক্ষণ পর্যন্ত عهدى হওয়ার অবকাশ থাকবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত অন্য অর্থের দিকে ফিরানো যাবে না। চাই عهد خارجى হোক অথবা عهد ذهنى হোক। যেমন- কোনো কোনো উসূলবিদের মাযহাব রয়েছে। কোন কোন উসূলবিদের মতে, এর দ্বারা কেবল عهد خارجى উদ্দেশ্য। কেননা تعريف এর মধ্যে এটাই মূল। আর معهود ذهنى টা نكره এর অর্থে হয়ে থাকে। মোটকথা যদি عهدى না হতে পারে, এ কারণে যে, সেখানে কোনো নির্দিষ্ট একক নেই, অথবা এ জন্যে যে, পূর্বে معهود উল্লেখ হয়নি, তাহলে তাকে جنس এর ওপর প্রয়োগ করা হবে। অতএব স্থানের উপযোগিতা অনুপাতে সর্বনিম্ন এবং সর্বমোটের সম্ভাবনা রাখবে। অর্থাৎ যদি مطلق টা কোন প্রকার দলিল হতে খালি হয়, তা হলে নিম্নতম সংখ্যক বুঝাবে। আর যদি কোনো দলিল পাওয়া যায় তা হলে সবগুলোকেই বুঝাবে।

অথবা استغراق এর ওপর প্রয়োগ করা হবে। তখন নিশ্চিতভাবে সবগুলো একককে শামিল করবে। যেমন- আল্লাহর এ বাণীসমূহের মধ্যে اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (সব মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত কেবল তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে) এবং السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ (পুরুষ চোর ও নারী চোর) এবং اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ (ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী) ও এর ন্যায় আরো অন্যান্য আয়াতসমূহ।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله وكذا اذا دخلت الخ : ব্যাখ্যাকার বলেন- নাকেরা যেভাবে وصف عامة এর সাথে বিশেষিত হয়ে উমূম বোঝায় তদ্রূপ معرف باللام ও উমূম বোঝায়। তবে শর্ত এই যে, এক্ষেত্রে تعريف عهدى বৈধ না হতে হবে। অর্থাৎ لام تعريف যদি عهدى না হয় তাহলে তা উমূম বোঝাবে।

বিশ্লেষণ : لام প্রথমত ২ প্রকার। ১. زائدة ২. غيرزائدة

زائده যা নামের পূর্বে আসে। যেমন- الحسن الحسين যা غير زائدة নয় তা আবার দু প্রকার। ১. اسمى ২. حرفى

اسمى ঐ লামকে বলে যা ইসমে ফায়েল ও ইসমে মাফঊলের পূর্বে এসে الذى এর অর্থ দেয়। যেমন - الضارب المضروب আবার ৪ প্রকার। (১) جنسى (২) استغراقى (৩) عهد ذهنى (٤) عهد خارجى حرفى

جنسى ঐ লামকে বলে যা তার পরবর্তী শব্দের হাকীকত বোঝায়, আফরাদ বোঝায় না। যেমন الرجل خير من المرأة

استغراقى এমন লামকে বলে যা তার পরবর্তী শব্দের সকল আফরাদ বোঝায়। যেমন إن الإنسان لفي خسر

عهد خارجى ঐ লামকে বলে যা তার মাদখুলের অনির্দিষ্ট আফরাদ বোঝায়। যেমন أخاف أن يأكله الذئب

عهد ذهنى ঐ লামকে বলে যা তার মাদখুলের নির্দিষ্ট আফরাদ বোঝায়। যেমন فعصى فرعون الرسول

মোটকথা যদি কোনো শব্দের উপর لام تعريف প্রবিষ্ট হয়- আর সেখানে عهدى অর্থ নেয়া সঙ্গত না হয় তাহলে তা উমূমের ফায়দা দিবে। চাই তা জিনসের জন্য হোক যেমন আল্লামা ফখরুল ইসলাম এবং তার অনুসারীগণ বলে থাকেন। চাই ইস্তেগরাকী হোক যেমন জুমহুর ও আরবগণের মাযহাব।

ব্যাখ্যাকার বলেন- মুসান্নিফ (র) এর উক্তি فيما لا يحتمل التعريف بمعنى العهد এর মধ্যে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, লামের মধ্যে لام عهدى হলো আসল। অতএব যতোক্ষণ পর্যন্ত عهدى হওয়া সঙ্গত হবে ততোক্ষণ অন্য অর্থের প্রতি ধাবিত হওয়া যাবে না। চাই عهد خارجى হোক কিংবা ذهنى যেমন কিছু সংখ্যকের অভিমত। অর্থাৎ তাদের মতে মুতলাক عهدى হলো আসল। কারো মতে মতে عهد দ্বারা عهد خارجى উদ্দেশ্য। কেননা মা'রেফার ক্ষেত্রে عهد خارجى ই আসল। বাকী معهود ذهنى অর্থের দিক দিয়ে নাকেরার মতো। মা'রেফা হওয়ার ব্যাপারে এর কোনো ভূমিকা নেই। এ কারণে معهود ذهنى কে নাকেরার সাথে বিশেষিত করা যায়। আর جملة বা বাক্য যা নাকেরার হুকুমে গণ্য হয় তার সাথেও বিশেষিত হতে পারে। যেমন ولقد أمر على اللئيم يسبني ۞ فمضيت ثم قلت لا يعنيني এর মধ্যে يسبني বাক্য اللئيم এর সিফাত হয়েছে। শেরটির অর্থ হলো- "আমি এমন ইতর ব্যক্তির কাছ দিয়ে অতিক্রম করেছি যে আমাকে গালি দিচ্ছিলো। আমি সেখান থেকে একথা বলতে বলতে অতিক্রম করলাম যে, সে আমাকে উদ্দেশ্য নিচ্ছে না"।

মোটকথা লামে তা'রীফ দ্বারা যদি عهد উদ্দেশ্য নেয়া সঙ্গত না হয় কারণ সেখানে তার কোনো معهودة افراد নেই বা পূর্বে তা উল্লেখিত হয়নি। তাহলে লাম জিনসের উপর প্রযোজ্য হবে এবং ক্ষেত্রের যোগ্যতা অনুসারে নিম্নতম অর্থাৎ হাকীকী ফরদেরও সম্ভাবনা রাখবে এবং গোটাটারও সম্ভাবনা রাখবে। সুতরাং معرف باللام যদি করীনা ও দলিলশূন্য হয় তাহলে তাকে নিম্নতম অর্থাৎ হাকীকী ফর্দের উপর প্রয়োগ করা হবে। কারণ এটাই সুনিশ্চিত। আর যদি দলিল ও করীনা থাকে যেমন নিয়ত ইত্যাদি তাহলে তাকে ফরদে হুকমী তথা গোটা আফরাদের উপর প্রয়োগ করতে হবে। অথবা عهد এর অর্থ সঙ্গত না হলে তা দ্বারা ইসতেগরাক গণ্য করতে হবে। আর লামে ইসতেগরাক নিশ্চিতরূপে সকল আফরাদকে বেষ্টন করে নেয়। যেমন إن الإنسان لفي خسر এর মধ্যে মানুষের সকল আফরাদ উদ্দেশ্য। এর দলিল হলো إلا الذين آمنوا দ্বারা ইসতেসনা বৈধ হওয়া। কারণ মানুষের মধ্যে সকল একক শামিল থাকলে তখন ইসতেসনা করা শুদ্ধ হবে। মোটকথা লামটি জিনসের উপর প্রযোজ্য হবে। অথবা ইসতেগরাকের উপর। আর উভয় ক্ষেত্রেই উমূম বোঝাবে।

حَتّٰى يَسْقُطَ اِعْتِبَارُ الْجَمْعِيَّةِ اذا دَخلتْ على الْجَمْعِ عَمَلًا بِالدَّلِيلَيْنِ تفريعٌ على قوله اَوْجَبَتِ الْعُمُومَ اى هٰذا القدرُ اذا كانَ دُخولُ اللَّامِ فِى الْمُفْرَدِ واَمّا اِذا كان عِلَّةَ الجَمْعِ فثمرةُ عُمومِهِ اَنّه يَسْقُطُ مَعْنَى الْجَمْعِ فلا يكونُ اَقلّه الثَّلٰثُ اِذ لَوْ بَقِىَ جَمْعًا لَمْ يَظْهَرْ لِلّامِ فائدةٌ اذْ لَا عَهْدَ ولَا اِسْتِغراقَ ولَا جِنْسَ فَيَجِبُ اَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْجِنْسِ لِيكونَ ما دُونَ الثَّلٰثةِ مَعْمولًا لِلْجِنْسِ وما فَوْقَه لِلْجَمْعِ فَيَحْنَثُ بِتزوّجِ امرأةٍ واحدةٍ اِذاحلفَ لا يَتزوَّجُ النِّساءَ ولو كانَ مَعْنَى الجمعِ باقيًا لَما حَنثَ بِما دُونَ الثَّلٰثةِ ومثلُه قوله تعالى لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاۤءُ مِنْ بَعْدُ وقوله تعالى اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسَاكِيْنِ الاٰية فتَكْفِى الصَّدَقةُ لِجِنْسِ الْفَقِيْرِ وَالْمِسْكِيْنِ وعِنْدَ الشّافِعىّ رح لابُدّ اَنْ يُصْرَفَ اِلَى الفُقراءِ الثَّلٰثةِ والْمَساكِيْنِ الثلثةِ عَمَلًا بالجَمْعِ هٰذا غايةُ مَا قِيل فى هٰذا المَقامِ وفيْه تامُّل

অনুবাদ ॥ *এমনকি* لام *যখন* جمع*-এর ওপর ব্যবহৃত হয় তখন* جمع *হওয়ার দিক বিবেচিত হয় না, দলিলদ্বয়ের ওপর আমল করার কারণে।* এটা গ্রন্থকার (র)-এর উক্তি اوجبت العموم এর ওপর একটি শাখা মাসআলা। অর্থাৎ, لام যদি مفرد-এর ওপর প্রবিষ্ট হয়, তাহলেই কেবল তা عموم সাব্যস্ত করবে। আর لام বহুবচনের ওপর দাখিল হলে তখন তার عموم এর ফলে جمع এর অর্থ বাদ পড়ে যাবে। সুতরাং اقل جمع (বহুবচনের সর্বনিম্ন সংখ্যা) তিন হবে না। কেননা, جمع অবশিষ্ট থেকে গেলে لام এর কোন প্রভাব পড়বে না। কারণ, সে অবস্থায় তা না عهدى হবে, আর না استغراقى বা جنسى হবে। অতএব لام কে جنس এর ওপর প্রয়োগ করা ওয়াজিব হবে। যাতে তিনের কম হলে جنس এর ওপর এবং তিনের বেশি হলে جمع এর ওপর আমল হয়ে যায়। *সুতরাং যখন কেউ শপথ করে বলে-* لَا اَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ *(আমি কোনো মহিলাকে বিবাহ করবো না।) তখন একজন মহিলাকে বিবাহ করলেও শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে।* সুতরাং جمع-এর অর্থ অবশিষ্ট থাকলে তিনের কম সংখ্যক মহিলাকে বিবাহ করার দ্বারা শপথ ভঙ্গ হতো না। এর উদাহরণ হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاۤءُ مِنْ بَعْدُ (অর্থাৎ, এরপর আপনার জন্যে কোনো মহিলাকে বিবাহ করা জায়েয হবে না) এবং অন্য আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে (الاية) اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسَاكِيْنِ (সাদকা কেবল গরিব ও মিসকীনদের জন্যে)। কাজেই যে কোনো ফকির ও মিসকীনকে সাদকা করলেই যথেষ্ট হবে। তবে ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে جمع এর ওপর আমল করার নিমিত্তে কমপক্ষে তিনজন ফকির ও তিনজন মিসকীনকে দান করা ওয়াজিব। এ স্থলে যা বলা হয়েছে এটাই চূড়ান্ত কথা বস্তুত এ চিন্তার অবকাশ রয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله حَتّٰى يَسْقُطَ اِعْتِبَارُ الخ : মুসান্নিফ (র) তার উক্তি اَوْجَبَتِ الْوُجُوْبَ এর উপর শাখা মাসআলা বর্ণনা করেছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন– লামে তা'রীফ عهد এর সম্ভাবনা না রাখলে তখন উমূম বোঝাবে। সুতরাং তা বহুবচন শব্দের উপর ব্যবহৃত হলে তার বহুবচন ধর্তব্য হওয়া রহিত হয়ে যাবে। যাতে উভয় দলিল অর্থাৎ লামে তা'রীফ ও বহুবচন উভয়ের উপর আমল হয়ে যায়। ব্যাখ্যাকার বলেন লামে তা'রীফ যদি মুফরাদের উপর প্রবিষ্ট হয় তাহলে তা উমূম বোঝানো সুস্পষ্ট। আর বহুবচনের উপর প্রবিষ্ট হলে তা উমূম বোঝানোর ফল এই যে, লামের কারণে বহুবচনের সংখ্যাধিক্যতা রহিত হয়ে যায়। অর্থাৎ বহুবচন ৩ থেকে শুরু হয়। আর এক্ষেত্রে ১ থেকেই শুরু হবে। কেননা লাম প্রবিষ্ট হবার পরে যদি جمع বহাল থাকে তাহলে লামের উপকারীতা

সুস্পষ্ট হবে না। কেননা যে লাম বহুবচনের উপর প্রবিষ্ট হয় তা عمرو এর জন্য হতে পারে না। কারণ এখানে ঐ লাম সম্পর্কে কথা যা تعريف عهدى এর সম্ভাবনা রাখে না এবং ইসতেগরাকও হতে পারে না। কারণ এক্ষেত্রে কোনো উপকারীতা নেই। কেননা সামনের উদাহরণ لا اَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ এর মধ্যে লাম যদি استغراق এর জন্য হয় তাহলে এ শপথের উদ্দেশ্য হবে দুনিয়ার সকল মহিলাদের সাথে বিবাহ করা থেকে বিরত থাকা। অথচ এটা মানুষের ক্ষমতার বাইরে। অতএব তা থেকে বিরত থাকার জন্য শপথ করা অনর্থক।

এভাবে اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ এর মধ্যে الصدقات، الفقراء এর লাম যদি استغراق এর জন্য হয়। তাহলে উদ্দেশ্য হবে দুনিয়ার সকল সাদকা সকল ফকিরদের প্রাপ্য। অথচ দুনিয়ার সকল সাদকা সকল ফকিরদেরকে দেয়া অসম্ভব। সুতরাং বুঝা গেলো যে এখানেও استغراق এর কোনো উপকারীতা নেই। মোটকথা উপকার না থাকার কারণে বহুবচনের উপর প্রবিষ্ট লাম استغراق এর জন্য হবে না। যদি লাম প্রবিষ্ট হওয়ার পূর্বে বহুবচন হওয়াকে বহাল রাখা হয় তাহলে উক্ত লামটি জিনসের জন্যও হতে পারে না। কারণ জিনস নিম্নতম অর্থাৎ কমপক্ষে ১টি এককেরও সম্ভাবনা রাখে। কিন্তু বহুবচনের মধ্যে ১টি একক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। অতএব লাম প্রবিষ্ট হওয়ার পরে যদি বহুবচন হওয়া বহাল থাকে তাহলে লাম জিনসের জন্য হতে পারে না। আর আমাদের কথা যেহেতু ঐ লামের ব্যাপারে যা تعريف عهد এর সম্ভাবনা রাখে না। কাজেই لام جمع - عهد এর জন্য হবে না।

আর استغراق এর উপর প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে যেহেতু অনর্থ কাজে জড়িত হওয়া সাব্যস্ত হয়। এ কারণে لام جمع টা استغراق এর জন্যও হবে না।

বহুবচন শব্দের বহুবাচনিক বহাল রাখা অবস্থায় لام جمع কে জিনসের উপর প্রযোজ্য করা যেতে পারে না। সারকথা এই যে, যখন لام جمع তিনো অর্থের উপর প্রযোজ্য হয় না। কাজেই তার কোনো উপকারীতা প্রকাশ পাবে না। এই কারণে আমরা লামকে উপকারী সাব্যস্ত করার জন্য জিনসের উপর প্রয়োগ করা জরুরি বলি। এর দ্বারা উভয় দলিল অর্থাৎ لام تعريف ও বহুবচনের শব্দ উভয়ের উপর আমল হয়ে যাবে। এবং বলা হবে যে, جمع معرف باللام বিশিষ্ট বহুবচন তিনের কম অর্থাৎ ১, ২ এককের উপর লামে জিনসের কারণে বোঝাবে। অর তিনের অতিরিক্তের উপর বহুবচন হবার করণে বোঝাবে।

قوله فيحنث بتزوج اِمْرَاةٍ الخ : পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, যদি বহুবচনের উপর لام تعريف প্রবিষ্ট হয় তাহলে বহুবচনের বহুবাচনিক রহিত হয়ে যায়। তখন ৩ এর স্থলে ১ থেকে তার অর্থ প্রকাশ পায়। অতএব কেউ যদি শপথ করে وَاللهِ لَا اَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ তাহলে শপথকারী ১ জন মহিলার সাথে বিবাহ করলে শপথ ভঙ্গকারী হবে। এখানে যদি বহুবচনের অর্থ অক্ষুণ্ন থাকতো তাহলে ৩ জনের কম মহিলার সাথে বিবাহ করলে শপথ ভঙ্গকারী হতো না। এর বিপরীতে যদি লাম বিহীন وَاللهِ لَا اَتَزَوَّجُ نِسَاءَ বলে। তাহলে বহুবচনের কারণে ৩ জনের সাথে বিবাহ করলে শপথ ভঙ্গকারী হবে। এর কমের ক্ষেত্রে শপথভঙ্গকারী হবে না। অতএব প্রমাণিত হলো যে, لام جنس এর কারণে বহুবচন শব্দের বহুবাচনিক রহিত হয়ে যায়। এর দৃষ্টান্ত আল্লাহ তা'আলার বাণী لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ আয়াতে রাসূলুল্লাহ (স) কে সম্বোধন করে বলেন– হে নবী! আপনার জন্য বর্তমান নারীদের ওপরে কোনো স্ত্রীগ্রহণ করা বৈধ নয়। রাসূলুল্লাহ (স) এর ব্যাপারে ৯ জন স্ত্রী বৈধ হওয়া আমাদের জন্য ৪ জন স্ত্রী বৈধ হওয়ার ন্যায়। সুতরাং যেভাবে আমাদের জন্য ৪ এর পরে পঞ্চম স্ত্রী গ্রহণ করা বৈধ নয়। তদ্রূপ রাসূলুল্লাহ (স) এর জন্য ৯ স্ত্রীর পরে ১০ম মহিলার সাথে বিবাহ করা বৈধ নয়। এর দৃষ্টান্ত আল্লাহ তা'আলার বাণী اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ অর্থাৎ সাদকা যদি ১ জন ফকির কিংবা ১ জন মিসকীনকে দেয়া হয় তাহলে তা যথেষ্ট হবে। উভয় আয়াতে লামের কারণে বহুবাচনিক অর্থ রহিত হয়ে যাওয়া প্রমাণিত হয়। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন– فقراء এবং مساكين বহুবচন হওয়ার দাবির উপর আমল করে কমপক্ষে ৩ জন ফকির কিংবা ৩ জন মিসকীনকে সাদকা করা জরুরি।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর বর্ণনা অনুযায়ী যার কাছে কিছু সম্বল আছে সে হলো ফকির। আর যে একেবারে নিঃস্ব অর্থাৎ কিছুই যার নেই সে হলো মিসকীন।

ইমাম যুহরী (র) এর বর্ণনা মোতাবেক যে নিজ ঘরে অবস্থান করে, মানুষের কাছে ভিক্ষা কর বেড়ায় না সে হলো ফকির। আর যে ঘর থেকে বের হয়ে মানুষের কাছে ভিক্ষা চায় সে হলো মিসকীন। ব্যাখ্যাকার বলেন– এই স্থলে এতটুকুই শেষ তাহকীক। বস্তুত জায়গাটি গভীর প্রণিধানযোগ্য।

ثُمَّ انَّه لَمَّا ذَكَرَ اِفَادَةَ النَّكِرَةِ وَالْمَعْرِفَةِ التَّعْمِيْمَ اَوْرَدَ فِىْ تَقْرِيْبِه بَيَانَ مَا وَرَدَ النَّكِرَةُ وَالْمَعْرِفَةُ فِىْ مَقَامٍ وَاحِدٍ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ ذٰلِكَ مِنْ مَبَاحِثِ الْعَامِ فَقَالَ. اَلنَّكِرَةُ اِذَا اُعِيْدَتْ مَعْرِفَةً كَانَتِ الثَّانِيَةُ عَيْنَ الْاَوْلٰى وَهٰذَا لَا يُتَصَوَّرُ اِلَّا فِى التَّعْرِيْفِ بِاللَّامِ اَوِ الْاِضَافَةِ دُوْنَ الْاِعْلَامِ وَنَحْوِهَا فَاِذَا اُعِيْدَتْ بِاللَّامِ كَانَ ذٰلِكَ اِشَارَةً اِلٰى مَاسَبَقَ فَيَكُوْنُ عَيْنَهُ كَقَوْلِه تَعَالٰى اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ

অনুবাদ ॥ গ্রন্থকার (র) نكره এবং معرفة উভয় عموم কে সাব্যস্ত করে, এখন এ বর্ণনাকে আরো বোধগম্য করে তোলার জন্যে معرفه ও نكره একই স্থলে হওয়ার বর্ণনা শুরু করেছেন, যদিও এটা عام এর আলোচনার বিষয় নয়।

গ্রন্থকার (র) বলেন ***যখন*** نكره ***কে*** معرفه ***দ্বারা পুনরাবৃত্তি করা হয়, তখন দ্বিতীয়টি হুবহু প্রথমটিই হয়ে থাকে।*** আর এ অর্থ শুধু لام এবং اضافت এর দ্বারা معرفه হলে সাব্যস্ত করা যেতে পারে, নামবাচক বিশেষ্য বা অনুরূপ অন্যান্য معرفه এর মধ্যে তা হতে পারে না। যখন لام এর দ্বারা পুনরায় উল্লেখ করা হবে, তখন পূর্বে نكره এর দিকে ইশারা করা হবে। সুতরাং, তা হুবহু পূর্বের نكره হবে। যথা اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ (নিশ্চয়ই আমি ফেরাউনের নিকট রাসূল পাঠিয়েছি। অতঃপর ফেরাউন সে রাসূলের নাফরমানী করেছে)।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله ثم انه لما ذكر افادة الخ : ব্যাখ্যাকার বলেন– পূর্বে মা'রেফা ও নাকেরা উমূমের ফায়দা দেয়ার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে আলোচ্য বিষয় এই যে, নাকেরা এবং মা'রেফা উভয়টি যদি একই স্থানে উল্লেখিত হয় তাহলে তার বিধান কি হবে? যদিও এটা আ'ম সংক্রান্ত আলোচনার অন্তর্গত নয়।

মুসান্নিফ (র) বলেন– নাকেরাকে যদি মা'রেফা বানিয়ে উল্লেখ করা যায় অর্থাৎ ১ শব্দকে প্রথমে নাকেরা উল্লেখ করে পরে উক্ত শব্দকে মা'রেফারূপে উল্লেখ করা হয় তাহলে এর দ্বিতীয়টা হুবহু প্রথমটাই বোঝাবে। এমনকি যদি প্রথমটি আ'ম থাকে তাহলে দ্বিতীয়টি আ'ম হবে এবং প্রথমটি যদি খাছ থাকে তাহলে দ্বিতীয়টি খাছ হবে।

মোল্লা জুয়ূন (র) বলেন এ বিষয়টি معرف باللام ও معرف بالاضافت এর মধ্যেই হতে পারে। অন্যথায় যদি علم, ইসমে মওসূল বা ইসমে ইশারা এর মাধ্যমে মা'রেফা হয় তাহলে পূর্বের নীতি কার্যকর হবে না। ব্যাখ্যাকার বলেন–যে শব্দকে নাকেরা উল্লেখ করা হয়েছিলো। যদি হুবহু সেই শব্দকে মা'রেফা বানিয়ে উল্লেখ করা হয় তাহলে তার দ্বারা পূর্বের কথার দিকে ইঙ্গিত হবে। আর যদি লাম দ্বারা পূর্বের অংশ বোঝানো হয় তাহলে মা'রেফাটি হুবহু নাকেরা বোঝাবে। যেমন– আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর মধ্যে اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ প্রথমে নাকেরা উল্লেখিত হয়েছে। অতপর তাকে লামসহ মা'রেফা বানিয়ে পুনঃ উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব উভয়টি দ্বারা একই সত্তা তথা মূসা (আ) উদ্দেশ্য হবে। টীকা লেখক বলেন– اِنَّا اَرْسَلْنَا কাতিবের ভুলক্রমে লিখিত হয়েছে। কারণ কোরআনের মধ্যে كَمَا اَرْسَلْنَا রয়েছে।

وَاِذَا اُعِيدَت نَكِرَةً كَانَتِ الثَّانِيَةُ غَيرَ الأُولٰى لاَنَّهَا لَوْ كَانَتْ عَيْنَ الأُولٰى لَتَعَيَّنَتْ نَوعُ تَعَيُّنٍ وَلَمْ تَبْقَ فِيْهَا نَكَارَةٌ وَالْمُقَدَّرُ خِلَافُه وَالْمَعْرِفَةُ اِذَا اُعِيدَتْ مَعْرِفَةً كَانَتِ الثَّانِيَةُ عَيْنَ الأُولٰى لاَن اللاَّمَ يُشِيْرُ اِلَى مَعْهُوْدٍ مَذْكُوْرٍ فِيْمَا سَبَقَ وَمِثَالُ هَاتَيْنِ الْقَاعِدَتَيْنِ قَوله تَعَالٰى فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَاِنَّ الْعُسْرَ اُعِيْدَ مُعَرَّفًا فَيَكُوْنُ عَيْنَ الاَوَّلِ وَالْيُسْرُ اُعِيْدَ مُنَكَّرًا فَيَكُوْنُ غَيْرَ الاَولِ فَعُلِم اَنَّ مَعَ كُلِّ عُسْرٍ وَاحِدٍ يُسْرَيْنِ وَهُوَ مَعْنٰى قَوْلِ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رض) مَرْوِيًّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ وَقَالَ الشَّاعِر شِعْر : اِذَا اشْتَدَّتْ بِكَ الْبَلْوٰى فَفَكِّرْ فِيْ اَلَمْ نَشْرَحْ * فَعُسْرٌ بَيْنَ يُسْرَيْنِ اِذَا فَكَّرْتَهُ فَافْرَحْ -وَقَال فَخْرُ الاسلامِ عِنْدِيْ فِيْ هٰذَا الْمَقَامِ نَظَرٌ لاَنّه يَحْتَمِلُ اَنْ تَكُوْنَ الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ تَاكِيْدًا لِلاُوْلٰى كَمَا اَنَّ قَوْلَنَا اِنَّ مَعَ زَيْدٍ كِتَابًا وَاِنَّ مَعَ زَيْدٍ كِتَابًا لَا يَدُلُّ عَلٰى اَنَّ مَعَه كِتَابَيْنِ فَيَكُوْنُ الْعُسْرُ وَاحِدًا وَالْيُسْرُ وَاحِدًا

অনুবাদ ॥ ***আর যখন نكره কে نكره রূপে পুনরাবৃত্তি করা হয়, তখন দ্বিতীয়টি প্রথমটির ভিন্ন উদ্দেশ্য হয়।*** কেননা, দ্বিতীয় نكره যদি হুবহু প্রথম نكره হয়, তাহলে نكره এক প্রকার নির্দিষ্ট হয়ে যায়। তখন نكره হওয়ার অর্থ অবশিষ্ট থাকে না। অথচ এ স্থলে যা মেনে নেয়া হয়েছিল তা এর বিপরীত। ***আর معرفه কে যখন পুনরায় معرفه হিসেবে উল্লেখ করা হয়, তখন দ্বিতীয়টি হুবহু প্রথমটি হবে।*** কেননা عام নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। উপরোক্ত দুটি قاعده (نكره পুনঃ উল্লেখ ও معرفه এর পুনঃ উল্লেখ)-এর উদাহরণ হলো আল্লাহর বাণী- فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا এ আয়াতে عسر শব্দটিকে পুনরায় معرفه রূপে পুনঃ উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এর দ্বারা প্রথমটিই উদ্দেশ্য হবে। আর يسر শব্দকে পুনরায় نكره রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই দ্বিতীয়টি প্রথমটি হবে। অতএব এর দ্বারা সাব্যস্ত হলো যে, একটি عسر (দুঃখ)-এর সাথে দুটি يسر (সুখ) বিদ্যমান। এটাই ইবনে আব্বাস (রা)-এর বাণীর অর্থ যা তিনি রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একটি عسر (কষ্ট) দুটি يسر (সহজতা)-এর ওপর কোনো দিনই বিজয়ী হতে পারবে না। জনৈক কবি বলেছেন, অর্থ যখন তোমার ওপর কোনো বিপদ এসে পড়ে তখন তুমি সূরায়ে اَلَمْ نَشْرَحْ এর মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করো। যখন চিন্তা করবে তখন বুঝতে পারবে একটি বিপদের সাথে দুটি সহজতা রয়েছে। কাজেই তুমি আনন্দিত হয়ে যাও।

ইমাম ফখরুল ইসলাম বযদবী (র) বলেন, আমার মতে এ স্থলে একটু দুর্বলতা রয়েছে। কারণ দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্যের تاكيد হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। যেমন আমাদের কথা, اِنَّ مَعَ زَيْدٍ كِتَابًا وَاِنَّ مَعَ زَيْدٍ كِتَابًا এতে যায়েদের নিকট দুটি কিতাব থাকা বুঝায় না। সুতরাং বিপদও একটি এবং আছানীও একটি হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله واذا اعيدت نكرة الخ : মুসান্নিফ (র) দ্বিতীয় নীতি বর্ণনা করেছেন যে, নাকেরা যদি দ্বিতীয়বার নাকেরারূপেই উল্লেখিত হয় তাহলে দ্বিতীয়টা দ্বারা প্রথমটার ভিন্ন উদ্দেশ্য হবে।

দলিল : দলিল এই যে, যদি দ্বিতীয় নাকেরা হুবহু পূর্বের নাকেরা হয় তাহলে নাকেরার মধ্যে এক পর্যায়ের নির্দিষ্টতা চলে আসে। ফলে তা নাকেরা হওয়া বাকী থাকে না। অথচ বিষয়টি এর বিপরীত। কারণ কথা হলো নাকেরাকে দ্বিতীয়বার নাকেরারূপেই উল্লেখ করা প্রসঙ্গে। কিন্তু প্রথমটি হুবহু উদ্দেশ্য হওয়ার ক্ষেত্রে যেহেতু নির্দিষ্টতা সৃষ্টি হয় ফলে তা নাকেরা থাকে না।

তৃতীয় নীতি এই যে, মা'রেফাকে দ্বিতীয়বার মা'রেফারূপে উল্লেখ করলে দ্বিতীয়টা দ্বারা হুবহু প্রথমটিই উদ্দেশ্য হবে। কারণ দ্বিতীয়টির উপর যে, لام تعريف রয়েছে তা উক্ত معهود এর প্রতি ইঙ্গিতকারী হবে। পূর্বে এর আলোচনা চলে গেছে। এক্ষেত্রে স্পষ্ট যে, উভয় মা'রেফার উদ্দেশ্য এক হবে। ফলে উভয়ের মধ্যে عينيت সাব্যস্ত হবে।

ব্যাখ্যাকর বলেন– ২ ও ৩ নম্বর নীতির উদাহরণ আল্লাহ তা'আলার বাণী إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا এর মধ্যে العسر কে দ্বিতীয়বারও মা'রেফা রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব ৩ নম্বর নীতি অনুসারে দ্বিতীয় العسر হুবহু প্রথম العسر হবে। অর্থাৎ উভয়টি দ্বারা একই উদ্দেশ্য হবে। আর আয়াতে يسر নাকেরা দ্বিতীয়বারও নাকেরারূপে উল্লেখিত হয়েছে। সুতরাং ২ নম্বর নীতি অনুযায়ী দ্বিতীয় يسر প্রথম يسر এর ভিন্ন হবে। অতএব প্রতীয়মান হলো যে, আয়াতে ১টি عسر এবং ২টি يسر উল্লিখিত হয়েছে। يسر দু'টি দ্বারা উদ্দেশ্য নবী করীম (স) এর যুগের বিজয়সমূহ ও খোলাফায়ের রাশেদীনের যুগের বিজয়সমূহ। অতপর দুনিয়া ও আখেরাতের সহজতা উদ্দেশ্য। আয়াতের মধ্যে ২ বার يسر হওয়া ইবনে আব্বাস (রা) এর উক্তি দ্বারা প্রমাণিত।

ইবনে আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক يسر দুই عسر এর উপর কখনো প্রাধান্য পাবে না। ইবনে আব্বাস (রা) এদিকে ই'শারা করেছেন যে, এটাকেই কবি এভাবে চিত্রিত করেছেন যে, إذا اشتدت بك البلوا الخ (অর্থ) হে ব্যক্তি! তোমার উপর যখন দুঃখ কষ্টের পরীক্ষা কঠিন আকার ধারণ করে তখন أَلَمْ نَشْرَحْ সূরার প্রতি মনোযোগী হও। তুমি মনোযোগী হলে বুঝতে পারবে যে, ২ সহজতার মাঝে রয়েছে এক কাঠিন্য। অতএব এটা চিন্তা করে তুমি সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হয়ে যাও।

ব্যাখ্যাকার বলেন– আল্লামা ফখরুল ইসলাম (র) বলেছেন যে, আমার কাছে এ জায়গাটি বেশ প্রণিধানযোগ্য। কারণ হতে পারে যে, আয়াতে দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্যের তাকীদ। যেমন إِنَّ مَعَ زَيْدٍ كِتَابًا إن مع زيد كتابا এর মধ্যে দ্বিতীয় বাক্য প্রথম বাক্যের তাকীদ হয়েছে। এটা একথা বোঝায় না যে, যায়েদের নিকট দুটি কিতাব রয়েছে। অতএব এভাবে আয়াতে عسر ও একটি হবে এবং يسر ও একটি হবে। এ সময় উল্লেখিত আয়াত পূর্বের নীতির উদাহরণ হবে না।

وإذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى لأنها لو كانت عين الأولى لتعينت بلا اشارة حرف يدل عليه وهو باطل ولم يوجد لهذا مثال في النص وقد جعلوا في مثاله ما إذا أقر بألف مقيد بصك بحضرة شاهدين في مجلس ثم بألف غير مقيد بصك بحضرة شاهدين أخرين في مجلس أخر يكون الثاني غير الأول ويلزمه ألفان وينبغي أن يعلم أن هذا كله عند الإطلاق وخلو المقام عن القرائن وإلا فقد تعاد النكرة معرفة مع المغايرة كقوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا فالكتاب الأول القران والثاني التوراة والانجيل وقد تعاد النكرة نكرة مع عدم المغايرة كقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله - وقد تعاد المعرفة معرفة مع المغايرة كقوله تعالى وهو الذي إنزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب وقد تعاد المعرفة نكرة مع عدم المغايرة كقوله تعالى إنما إلهكم إله واحد وامثال ذلك

অনুবাদ ॥ *আর نكرة কে যখন পুনরায় نكرة রূপে উল্লেখ করা হবে, তখন দ্বিতীয়টি প্রথমটি হবে না।* কারণ, তা হলে এক ধরনের নির্দিষ্টতা এসে যায়, এমন حرف اشارة ব্যতিত যা নির্দিষ্টতা বুঝিয়ে থাকে। আর এটা জায়েয নেই। نص এর মধ্যে এর কোনো উদাহরণ পাওয়া যায়না।

তবে আলিমগণ এ মাসআলাটিকে এর উদাহরণ হিসেবে পেশ করেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি এক বৈঠকে দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে এমন এক হাজারের কথা স্বীকার করে, যা একটি চেকের সাথে যুক্ত। অতঃপর সে একই ব্যক্তি অন্য একটি মজলিসে অন্য দুজন সাক্ষীর সামনে এমন এক হাজারের স্বীকৃতি দেয় যা চেকের সাথে যুক্ত নয়, তাহলে এমতাবস্থায় মাসআলাটির দ্বিতীয় অংশ প্রথমাংশের ভিন্নবস্তু হিসেবে গণ্য হবে। আর স্বীকারোক্তিকারীর ওপর দুহাজার পরিশোধ অপরিহার্য হবে। জেনে রাখা উচিৎ যে, এটা قاعده كليه নয়; বরং যখন مطلق এবং قرائن মুক্ত হবে, তখন প্রযোজ্য হবে। অন্যথায় ভিন্নতা সত্ত্বেও نكرة ও معرفة হিসেবে পুনঃ উল্লেখ করা হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহর বাণী, وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا (এটা আল্লাহর নাযিলকৃত বরকতময় গ্রন্থ। সুতরাং এর অনুসরণ করো এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তবেই তোমরা করুণা লাভ করবে। যাতে তোমরা বলতে না পারো যে, কিতাব তো কেবল আমাদের পূর্ববর্তী দু দলের ওপরই নাযিল হয়েছিল)। উক্ত আয়াতে প্রথমোক্ত কিতাবের দ্বারা কুরআনে কারীম এবং পরবর্তী কিতাবের দ্বারা তাওরাত ও ইঞ্জিলকে বুঝানো হয়েছে। আবার কখনো কখনো অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও نكرة কে نكرة দ্বারা পুনঃ উল্লেখ করা হয়ে থাকে। যেমন, আল্লাহর বাণী- وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله (তিনি সে পবিত্র সত্তা যিনি আকাশমণ্ডলেরও মাবুদ এবং ভূমণ্ডলেরও মাবুদ।)-এর মধ্যে।

আবার কখনো ভিন্ন হওয়া সত্ত্বে معرفه কে পুনঃ معرفه হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। যেমন, আল্লাহর এ বাণীর মধ্যে, وهو الذي انزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب (তিনি সে মহান সত্তা যিনি আমাদের ওপর এমন কিতাব নাযিল করেছেন, সত্যতার সাথে যা এর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী)। আবার কখনো অভিন্ন হওয়া অবস্থায় معرفه কে نكرة রূপে পুনঃ উল্লেখ করা হয়। যেমন কুরআনে কারীমে রয়েছে, انما الهكم اله واحد। (নিশ্চয়ই তোমাদের মা'বুদ এক।) এবং এরূপ বহু উদাহরণ রয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله وَإِذَا أُعِيدَتْ نَكِرَةً الخ : মুসান্নিফ (র) চতুর্থ নীতি বর্ণনা করছেন যে, যদি মা'রেফাকে দ্বিতীয়বার নাকেরা বানিয়ে উল্লেখ করা হয় তাহলে নাকেরা মা'রেফার ভিন্ন হবে। অর্থাৎ উভয়টি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য হবে। এর দলিল এই যে, দ্বিতীয় অর্থাৎ নাকেরাকে প্রথমটির غير সাব্যস্ত করা হবে। তাহলে এক্ষেত্রে এমন কোনো হরফ এর ইশারা ছাড়া যা নির্দিষ্টতা বোঝায় নাকেরা নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। অথচ নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক হরফে ইশারা ছাড়া নাকেরা নির্দিষ্ট হওয়া বাতিল। অতএব মা'রেফাকে নাকেরা বানিয়ে পুনঃউল্লেখের ক্ষেত্রে নাকেরা মা'রেফার ভিন্ন হবে।

ব্যাখ্যাকার বলেন– চতুর্থ নীতির জন্য নসের মধ্যে কোনো দৃষ্টান্ত মিলে না। উলামায়ে কেরাম এর উদাহরণে এ মাসআলা পেশ করে থাকেন যে, এক ব্যক্তি একই মজলিসে ২ জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে চেকের সাথে সংশ্লিষ্ট ১ হাজার টাকার স্বীকারোক্তি করলো। যেমন– স্বীকার করলো যে, আমার জিম্মায় অমুক ব্যক্তির এমন ১ হাজার টাকা রয়েছে যা চেক ও স্ট্যাম্পের মধ্যে লিখিত। এরপর উক্ত লোকটি দ্বিতীয় মজলিসে অন্য সাক্ষীদের উপস্থিতিতে এমন ১ হাজার টাকার স্বীকারোক্তি করলো যা চেকের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্বীকারোক্তি প্রথম স্বীকারোক্তির ভিন্ন হবে। ফলে তার উপর ২ হাজার টাকা পরিশোধ করা জরুরি হবে।

ব্যাখ্যাকার বলেন– দ্বিতীয় স্বীকারোক্তির জন্য মজলিস ভিন্ন হবে এবং সাক্ষীও ভিন্ন হবে। কারণ মজলিস যদি ভিন্ন হয় কিন্তু সাক্ষী পূর্বের ব্যক্তিরাই হয় তাহলে দ্বিতীয় স্বীকারোক্তি প্রথম স্বীকারোক্তির তাকীদ হবে। আর দ্বিতীয় স্বীকারোক্তির সময় সাক্ষীগণ যদি ভিন্ন ব্যক্তি হয় কিন্তু মজলিস পূর্বেরটাই হয় তাহলেও দ্বিতীয় স্বীকারোক্তি প্রথম স্বীকারোক্তির তাকিদ হবে। কেননা এক মজলিস বিভিন্নরূপ কথাবার্তাকে একত্র সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল হয়। অথচ একই মজলিসে সকল কথা একই কথার বিধানে শামিল হয়। অতএব এক্ষেত্রে উভয় স্বীকারোক্তি দ্বারা একই স্বীকারোক্তি গণ্য হবে।

ব্যাখ্যাকার বলেন– উল্লেখিত নীতি ৪টি ঐ সময় উপকারী হবে যখন বাক্য মুতলাক এবং করীনামুক্ত হবে। অন্যথায় কখনো কখনো এর বিপরীত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ

★ প্রথম নীতি এই যে, নাকেরাকে মা'রেফা বানিয়ে দ্বিতীয়বার উল্লেখ করলে তার দ্বারা হুবহু পূর্বেরটাই উদ্দেশ্য হয়। কিন্তু দ্বিতীয়টি প্রথমটির ভিন্নও হয়। যেমন নূরল আনওয়ারে উল্লেখিত আয়াতে كتاب শব্দটি প্রথমত নাকেরা উল্লেখিত হয়েছে। এরপর মা'রেফারূপে উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু এ প্রথমটি দ্বারা কোরআন মজীদ উদ্দেশ্য। আর দ্বিতীয় কিতাব দ্বারা তাওরাত ও ইঞ্জিল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে।

★ দ্বিতীয় নীতি এই যে, নাকেরাকে দ্বিতীয়বার নাকেরা স্বরূপ উল্লেখ করলে দ্বিতীয়টা দ্বারা প্রথমটার ভিন্ন উদ্দেশ্য হয়। কিন্তু কখনো এমন না হয়ে বরং দ্বিতীয়টা দ্বারা হুবহু প্রথমটাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلٰهٌ এর মধ্যে উভয় জায়গায় كتاب শব্দটি নাকেরা কিন্তু এ সত্ত্বে উভয়ের উদ্দেশ্য এক।

★ তৃতীয় নীতি হলো মা'রেফাকে দ্বিতীয়বার মা'রেফা স্বরূপ উল্লেখ করলে দ্বিতীয়টা দ্বারা হুবহু প্রথমটা উদ্দেশ্য হয়। তবে কখনো এর বিপরীত দ্বিতীয়টা দ্বারা প্রথমটার ভিন্ন উদ্দেশ্য হয়। যেমন–আল্লাহ তা'আলার বাণী هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ এর মধ্যে উভয় জায়গায় الكتاب মা'রিফা কিন্তু প্রথমটি দ্বারা কোরআন মজীদ এবং দ্বিতীয়টি দ্বারা তাওরাত ও ইঞ্জিল উদ্দেশ্য।

★ চতুর্থ নীতি হলো মা'রেফাকে দ্বিতীয়বার নাকেরা স্বরূপ উল্লেখ করলে দ্বিতীয়টা দ্বারা প্রমটার ভিন্ন উদ্দেশ্য হয়। কিন্তু কখনো এর বিপরীত দ্বিতীয়টা দ্বারা হুবহু প্রথমটা উদ্দেশ্য হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী إِنَّمَا إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَاحِدٌ এর মধ্যে প্রথম إِلٰهُكُمْ ইযাফতের কারণে মা'রিফা। আর দ্বিতীয়টি নাকেরা। কিন্তু এ সত্ত্বে দ্বিতীয়টা দ্বারা হুবহু প্রথমটা উদ্দেশ্য। ব্যাখ্যাকার বলেন– এ ধরনের অনেক উদাহরণ রয়েছে।

ثمّ بعد ذلك ذكر المصنّف رح اقصى ما ينتهى اليه التخصيص فى العامّ وكان ينبغى ان يذكره فى مباحث التخصيص ولكن لمّا كان موقوفا على بيان الفاظه اخّر عنها فقال وما ينتهى اليه الخصوص نوعان اى المقدار الّذى لا يتعدّى الى ما تحته نوعان النوع الاوّل الواحد فيما هو فرد بصيغته كمن وما والطّائفة واسم الجنس المعرّف باللام -او ملحق به كالجموع المعرّفة بلام الجنس فانّهما لو خليا عن الواحد ايضا لفات اللفظ عن مدلوله كالمرأة والنّساء نشر على ترتيب اللّفّ فالمرأة فرد بصيغته معرّفة باللام والنّساء جمع لا واحد له محلّى بلام الجنس وينتهى تخصيصهما الى الواحد البتّة - والنوع الثانى الثلاثة فيما كان جمعا صيغة ومعنى كرجال ونساء منكّرا ممّا لم يدخله لام الجنس ويلحق به ما كان معنى فقط كقوم ورهط وانّما ينتهى تخصيص هؤلاء كلّهم الى الثّلاثة لانّ ادنى الجمع الثلاثة باجماع اهل اللغة فلو لم يبق تحته ثلثة افراد لفات اللفظ عن مقصوده .

অনুবাদ ॥ অতঃপর গ্রন্থকার (র) عام এর মধ্যে تخصيص এর শেষ সীমা বর্ণনা করেছেন। তবে تخصيص এর আলোচনায় তাকে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু তা তার শব্দসমূহের বর্ণনার ওপর মওকূফ, এ কারণে তাকে পরে উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, *আর* خصوص *যে সীমা পর্যন্ত পৌঁছে শেষ হয় তা দু প্রকার।* অর্থাৎ, যে পরিমাণের নিচের দিকে خصوص অতিক্রম করতে পারে না তা আবার দু প্রকার। ***প্রথম প্রকার হল 'এক'*** (احد) ***এটা ঐ*** عام ***এর মধ্যে যা তার*** صيغه ***হিসেবে একবচন।*** যথা- من ، ما ও طائفة শব্দগুলো এবং ঐ اسم جنس যা الف ও لام দ্বারা معرفة হয়েছে।

অথবা এমন جمع ***যা*** مفرد ***এর সাথে যুক্ত হয়েছে*** বা ঐ সব جمع এর صيغه যা لام جنس এর দ্বারা معرفه হয়ে থাকে। কেননা, এটা একবচন ও এর সংশ্লিষ্ট শব্দ যদি احد, হতেও খালি হয়ে যায় তাহলে শব্দ এর مدلول (অর্থ) হতে পৃথক হয়ে যায়। যথা- ধারাবাহিকভাবে المرأة ও النساء ইত্যাদি শব্দগুলো। এর মধ্যে المرأة শব্দটি صيغه এর দিক হতে فرد (একবচন) এবং لام এর দ্বারা معرفه হয়েছে। আর النساء বহুবচনের صيغه এর واحد নেই। এটাকে لام جنس এর দ্বারা معرفه করা হয়েছে। তবে এটা নিশ্চিত যে, واحد পর্যন্ত পৌঁছে এতদুভয়ের تخصيص শেষ হয়ে যায়। ***আর দ্বিতীয় প্রকার হল*** ثلثة ***(তিন) ঐ*** عام ***এর মধ্যে যা শব্দ ও অর্থ উভয়ের দিক বিবেচনায়*** جمع ***(বহুবচন)। যথা–*** رجال ও نساء ***যখন*** এটা اسم نكره হবে এবং এগুলোর মধ্যে لام جنس না থাকবে। এ দ্বিতীয় প্রকারের সাথে ঐ সব শব্দ যুক্ত হবে যেগুলো অর্থের দিক হতে جمع। যথা قوم ও رهط ইত্যাদি। এ শব্দগুলোর تخصيص তিন পর্যন্ত পৌঁছে শেষ হয়ে যাবে। ***কেননা, অভিধান প্রণেতাগণের ঐকমত্য অনুযায়ী*** جمع ***এর নিম্নতম স্তর হল তিন।*** সুতরাং, এর অধীনে যদি তিনটি সংখ্যাও না থাকে তাহলে শব্দের উদ্দেশ্যই নিঃশেষ হয়ে যাবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله ثم بعد ذالك ذكر المصنف : মুসান্নিফ (র) এ ইবারত দ্বারা এমন সংখ্যা বর্ণনা করেছেন যার উপর عام এর মধ্যে তাখসীস শেষ হয়ে যায়।

ব্যাখ্যাকার বলেন- এই আলোচনা যদিও তাখসীসের আলোচনার জন্য মুনাসিব ছিলো কিন্তু এ সম্পর্ক আলোচনা করা عام এর শব্দসমূহ বর্ণনা করার উপর মওকুফ। এ কারণে মুসান্নিফ (র) প্রথমে عام এর শব্দসমূহ উল্লেখ করেছেন। এরপরে এ আলোচনা এনেছেন।

তিনি বলেন- এমন পরিমাণ যার পরে তাখসীস করা সম্ভব নয় তা ২ প্রকার। প্রথম প্রকার হলো- ১ সংখ্যক আর ১ পর্যন্ত তাখসীস ঐ আ'মের মধ্যে হবে যা সীগার দিক দিয়ে মুফরাদ। যেমন ما ও من শব্দ বা طائفة ও ইসমে জিনস, অথবা যে বহুবচন মুফরাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যেমন লামে জিনসসহকারে মা'রেফা। কেননা বহুবচনের উপর লামে জিনস প্রবিষ্ট হলে তার বহুবাচনিক হওয়া বাতিল হয়ে তা মুফরাদের মতো হয়ে যায়। সুতরাং মুফরাদ এবং মুফরাদের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার মধ্যে ১ পর্যন্ত তাখসীস হবে। এজন্য যে, যদি তার অধীনে ১ও অবশিষ্ট না থাকে বরং এটাকেও খাছ করে নেয়া হয় তখন শব্দ অর্থশূন্য হয়ে যায়; অথচ তা বাতিল। মুসান্নিফ (র) ধারাবাহিকভাবে উভয়ের বর্ণনা পেশ করেছেন। যেমন المرأة ও النساء।

المرأة শব্দটি সীগার দিক দিয়ে মুফরাদ ও معرف باللام আর النساء শব্দ যার উক্ত শব্দ থেকে কোনো মুফরাদ নেই তার উপর লামে জিনস প্রবিষ্ট হয়েছে। উভয়ের মধ্যে ১ পর্যন্ত তাখসীস হতে পারে। অর্থাৎ কমপক্ষে ১ ফরদ অবশিষ্ট থাকতে হবে। এটাই অধিকাংশ আলিমের অভিমত। তবে কাশশাফ গ্রন্থকার বলেন- جمع معرف بلام جنس টা لام جنس বিহীন جمع এর মতো। অর্থাৎ তার তাখসীস ৩ পর্যন্ত গিয়ে শেষ হবে। এর পরে আর তাখসীস বৈধ হবে না। কারণ বহুবচনের মধ্যে কমপক্ষে ৩ আফরাদ অবশিষ্ট থাকা জরুরি।

২. قوله والنوع الثاني الثلثة الخ : عام এর মধ্যে তাখসীসের শেষ পরিমাণ হলো ৩। এটা দ্বিতীয় প্রকার। অর্থাৎ এমন আ'ম যা সীগা ও অর্থের দিক দিয়ে বহুবচন। আর তার উপর লামে জিনস প্রবিষ্ট হয়নি। যেমন رجال ও نساء এবং এমন আ'ম যা অর্থের দিক দিয়ে বহুবচন। যেমন رهط ও قوم এসব শব্দের তাখসীস ৩ পর্যন্ত গিয়ে শেষ হবে। অর্থাৎ তাখসীসের পরে কমপক্ষে ৩ আফরাদ বাকী থাকতে হবে।

দলিল : ইজমা মতে ভাষাবিদগণ বহুবচনের সর্বনিম্ন স্তর ৩ বলে থাকেন। অতএব তাখসীসের পরে যদি ৩ আফরাদ অবশিষ্ট না থাকে তাহলে শব্দটি উদ্দেশ্যবিহীন সাব্যস্ত হয়। আর বহুবচন শব্দ তার অর্থবিহীন পাওয়া যাওয়া জরুরি হয়ে যায়। অথচ এমনটা বাতিল।

وَقَالَ بَعْضُ اَصْحَابِ الشَّافِعِىِّ رح وَمَالِكٍ رح اِنَّ اَقَلَّ الْجَمْعِ اِثْنَانِ فَيَنْتَهِى التَّخْصِيْصُ اِلَيْهِ تَمَسُّكًا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْاِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ -فَاَجَابَ عَنْهُ الْمُصَنِّفُ رح بِقَوْلِهِ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْاِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَوَارِيْثِ وَالْوَصَايَا فَاِنَّ فِىْ بَابِ الْمِيْرَاثِ لِلْاِثْنَيْنِ حُكْمُ الْجَمَاعَةِ اِسْتِحْقَاقًا وَحَجْبًا فَاِنَّ لِلْبِنْتَيْنِ وَالْاُخْتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ كَمَا لِلْبَنَاتِ وَالْاَخَوَاتِ وَيَحْجُبُ الْاَخَوَانِ لِلْاُمِّ مِنَ الثُّلُثِ اِلَى السُّدُسِ كَالْاِخْوَةِ الثَّلٰثَةِ وَالْوَصِيَّةُ اُخْتُ الْمِيْرَاثِ فِىْ كَوْنِهِمَا اِسْتِخْلَافًا بَعْدَ الْمَوْتِ وَتَتَبُّعُ الْمِيْرَاثَ تَبْعِيَّةَ النَّفْلِ لِلْفَرْضِ فَاِنْ اَوْصَى لِمَوَالِىْ فُلَانٍ وَلَهُ مَوْلَانِ اَوْ لِاِخْوَةِ زَيْدٍ وَلَهُ اَخَوَانِ يَسْتَحِقَّانِ الْكُلَّ اَوْ عَلَى سُنَّةِ تَقَدُّمِ الْاِمَامِ اَىْ اِذَا كَانَ الْمُقْتَدِىْ اِثْنَيْنِ يَتَقَدَّمُهُمَا الْاِمَامُ كَمَا يَتَقَدَّمُ عَلَى الثَّلٰثَةِ خِلَافًا لِاَبِىْ يُوْسُفَ فَاِنَّهُ عِنْدَهُ يَتَوَسَّطُهُمَا -وَذٰلِكَ لِاَنَّ الْاِمَامَ مَحْسُوْبٌ فِى الْجَمَاعَةِ كُلِّهَا اِلَّا فِى الْجُمُعَةِ فَاِنَّ فِيْهَا تُشْتَرَطُ ثَلٰثَةُ رِجَالٍ سِوَى الْاِمَامِ خِلَافًا لِاَبِىْ يُوْسُفَ رح اِذْ عِنْدَهُ يَكْفِىْ اِثْنَانِ سِوَى الْاِمَامِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُصَنِّفُ رح الْجَوَابَ الثَّالِثَ الَّذِىْ ذَكَرَهُ غَيْرُهُ وَهُوَ اَنَّهُ مَحْمُوْلٌ عَلَى الْمُسَافَرَةِ بَعْدَ قُوَّةِ الْاِسْلَامِ فَاِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى اَوَّلًا عَنْ مُسَافَرَةِ الْوَاحِدِ وَالْاِثْنَيْنِ لِضُعْفِ الْاِسْلَامِ وَغَلَبَةِ الْكُفَّارِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْوَاحِدُ شَيْطَانٌ وَالْاِثْنَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلٰثَةُ رَكْبٌ اَىْ جَمَاعَةٌ كَافِيَةٌ ثُمَّ لَمَّا قَوِىَ الْاِسْلَامُ رَخَّصَ لِلْاِثْنَيْنِ وَبَقِىَ الْوَاحِدُ عَلَى حَالِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْاِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ وَبَاقِىْ تَمَسُّكَاتِ الْمُخَالِفِ بِاَجْوِبَتِهَا مَذْكُوْرَةٌ فِى الْمُطَوَّلَاتِ -

---

অনুবাদ॥ ইমাম শাফেয়ী (র) ও ইমাম মালিক (র)-এর শিষ্যগণের মধ্য হতে কোন কোন ব্যক্তি বলেছেন যে, جمع এর নিম্নতম সংখ্যা হল দুই। সুতরাং, দুই পর্যন্ত পৌছে تخصيص শেষ হয়ে যাবে। তারা নবী করীম (স)-এর বাণী– اَلْاِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ (দুই ও তদুর্ধ্ব جمع হিসেবে গণ্য হবে)-এর দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন।

মুসান্নিফ (র) তাঁর এ ভাষ্য দ্বারা তাঁদের দলিলের উত্তর প্রদান করেছেন, *"যে, রাসূল (স)-এর হাদীস* اَلْاِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ *এটা মীরাস ও অসিয়তের আহকামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।* কেননা, মিরাসের

ব্যাপারে হকদার ও প্রতিবন্ধক হওয়ার ক্ষেত্রে দুজনের জন্যে জামাতের হুকুম প্রদান করা হয়েছে। কারণ দুকন্যা ও দুবোন ঠিক তদ্রূপই দুই-তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হবে, যদ্রূপ দুই-এর অধিক কন্যা ও বোনেরা দুই-তৃতীয়াংশ লাভ করে থাকে। আর দুই মাতাকে এক তৃতীয়াংশ হতে বাধা প্রদান করে এক-ষষ্ঠাংশের দিকে নিয়ে যায়, যদ্রূপ তিন ভাইও নিয়ে যায়। অসিয়ত হলো মীরাসের ভগ্নি তুল্য। (কারণ) মৃত্যুর পর স্থলাভিষিক্ত বানানোর ব্যাপারে অসিয়্যত মিরাসের মতো। এটা ঠিক তদ্রূপই মিরাসের অনুসরণ করে, যদ্রূপ নফল ফরযের অনুসরণ করে থাকে। সুতরাং, যদি কেউ কারো মাওয়ালীগণের জন্যে কোনো কিছুর অসিয়ত করে, আর সে ব্যক্তির মাত্র দুজন মাওলা থাকে, কিংবা অসিয়তকারী ব্যক্তি যায়েদের তিন ভাইয়ের জন্যে অসিয়ত করে, আর যায়েদের মাত্র দুজন ভাই থাকে, তাহলে দুজনই (দুই মাওলা অথবা দুই ভাই) সম্পূর্ণ অসিয়তকৃত বস্তুর হকদার সাব্যস্ত হবে। অথবা বলবো ***এটা নামাযের মধ্যে ইমামের অগ্রবর্তী হওয়ার বিধানের ওপর প্রযোজ্য।*** অর্থাৎ যখন মুক্তাদী দুজন হবে, তখন ইমাম তাদের সম্মুখে দাঁড়াবেন। যদ্রূপ মুক্তাদী তিনজন হওয়া অবস্থায় তাঁদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকেন। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর বিপরীত মতপোষণ করেছেন। তাঁর মতে ইমাম দুই মুক্তাদীর মাঝখানেই দাঁড়াবেন।

এটা এজন্যে যে, জুমুআর নামায ব্যতীত ইমামও জামাআতের মধ্যে গণ্য। কেননা জুমুআর নামাযে ইমাম ছাড়া তিন জন পুরুষ মুক্তাদী হওয়া আবশ্যক। ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর বিপরীত মতপোষণ করেন। তাঁর মতে, ইমাম ছাড়া দু জন পুরুষ হওয়াই যথেষ্ট। মুসান্নিফ (র) তৃতীয় উত্তর উল্লেখ করেননি যা অন্যান্য গ্রন্থকারগণ উল্লেখ করেছেন। তা এই যে, এ হাদীসটি ইসলাম শক্তিশালী হওয়ার পর ভ্রমণের ব্যাপারে প্রযোজ্য। কেননা, রাসূল (স) ইসলামের প্রথম দিকে ইসলামের দুর্বলতা ও কাফিরদের প্রভাবের কারণে একজন দুজনের সফর করাকে নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি এরশাদ করেছেন, একজন শয়তান এবং দুজন দু শয়তান, আর তিনজন হলো জামাআত। অতঃপর ইসলাম শক্তিশালী হওয়ার পর দুজনের জন্যে অনুমতি দেয়া হয়। আর একজন পূর্বাবস্থায় থেকে যায়। কাজেই রাসূল (র) বলেছেন দুজনও ততোধিক হলো জামাআত। প্রতিপক্ষের অন্যান্য দলিল ও সে সবের উত্তর বড় বড় কিতাবাদিতে উল্লেখিত আছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الخ : ব্যাখ্যাকার মোল্লা জুয়ূন (র) বলেন– ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালিক (র) এর কতিপয় শিষ্য বলেন বহুবচনের সর্বনিম্ন স্তর হলো ২। অতএব ২ পর্যন্ত গিয়ে তাখসীস শেষ হবে। এ ব্যাপারে তাদের দলিল হলো রাসূলুল্লাহ (স) এর উক্তি الاثنان فما فوقهما جماعة। অর্থাৎ হাদীসে ২ কে এভাবে জামাআত সাব্যস্ত করা হয়েছে যেভাবে ২ এর অধিককে জামাআত সাব্যস্ত করা হয়। অতএব বোঝা গেলো যে, বহুবচনের নিম্নস্তর হলো ২।

মুসান্নিফ (র) এ দলিলের ২টি উত্তর দিয়েছেন। **প্রথম উত্তর :** এই হাদীসটি মীরাস ও অছিয়তের বিধানের উপর প্রযোজ্য অর্থাৎ মীরাসের অধিকারী ও অন্তরায় হওয়ার ক্ষেত্রে ২ জনের জন্য ঐ বিধান রয়েছে যা ২ এর অধিকজনের বিধান। সুতরাং মৃত্যু ব্যক্তির সম্পদের মধ্য থেকে তার ৩ ও তিনের অধিক কন্যা ও ভগ্নিদেরকে যে ক্ষেত্রে দুই তৃতীয়াংশ সম্পদ দেয়া হয় যেমন আয়াত فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ দ্বারা বোঝা যায়। সেই ক্ষেত্রে মৃতের ২ কন্যা ও ২ ভগ্নিকেও দুই তৃতীয়াংশ সম্পদ দেয়া হয়। যেমন فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয়। মৃত ব্যক্তি যদি নিঃসন্তান হয় তাহলে তার মাতা এক তৃতীয়াংশ সম্পদ পায়। কিন্তু যদি তার ৩ বা ৩ এর অধিক ভাই থাকে তখন তারা মৃতের মায়ের এক তৃতীয়াংশকে কমিয়ে এক ষষ্ঠাংশ করে দেয়। যেমন فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ দ্বারা প্রতিভাত হয়।

এভাবে যদি মৃতের ২ ভাই থাকে তাহলেও তারা মৃতের মায়ের অংশ কমিয়ে দুই তৃতীয়াংশ থেকে এক ষষ্ঠাংশ করে দেয়। এ উভয় মাসআলা দ্বারা বোঝা গেলো যে, দুজনের ব্যাপারে জামাআতের বিধান রয়েছে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (স) এর বাণী اَلْاِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ মীরাস সংক্রান্ত। এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই আমাদের কথা হলো বহুবচন শব্দ ২এর জন্য গঠিত কি না তা নিয়ে।

ব্যাখ্যাকার বলেন– অছিয়ত হলো মীরাসের ভগ্নি বা তার দৃষ্টান্ত। কারণ যেভাবে ওয়ারিস মৃতের স্থলাভিষিক্ত হয় তদ্রূপ موصى له ও মৃতের স্থলাভিষিক্ত হয়। অছিয়ত এভাবে মীরাসের তাবে' যেভাবে নফল ফরযের তাবে'। কারণ মীরাস دليل قطعى দ্বারা সাব্যস্ত। এর মধ্যে বান্দার কোনো এখতিয়ার নেই। আর অছিঅত হলো নফল ও এখতিয়ারী বিষয়। অতএব অছিয়ত মীরাসের তাবে' বা অনুগামী হবে, যেমন নফল ফরযের তাবে' হয়ে থাকে। আর মাতবু তথা মীরাসের মধ্যে ২ কে বহুবচনের স্থান দেয়া হয়েছে। অতএব তাবে' তথা অছিয়তের মধ্যেও ২ কে বহুবচনের স্থান দেয়া হবে। সুতরাং কেউ যদি খালেদের موالى এর জন্য কিছু মালের অছিয়ত করে। আর খালেদের কেবল ২ জন موالى থাকে। তাহলে তাদের উভয়কে অছিয়তের পূর্ণমাল দিতে হবে। যেমন ৩ বা ৩ এর অধিকের ক্ষেত্রে পূর্ণ অছিয়তের মাল প্রদান করা হয়। এভাবে যদি যায়েদের ভায়েদের জন্য বহুবচন শব্দ দ্বারা অছিয়ত করে, আর তার ভাই থাকে ২ জন। তাহলে তারা সম্পূর্ণ অছিয়তের মালের অধিকারী হবে।

মোটকথা এ হাদীস দ্বারা কেবল এই কথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, মীরাস ও অছিয়তের মধ্যে ২ কে বহুবচন তথা জামাআতের বিধান দেয়া হয়েছে। এর দ্বারা এটা জরুরি হয় না যে, বহুবচনের সর্বনিম্ন স্তর হলো ২। সুতরাং এ হাদীস দ্বারা এ ব্যাপারে দলিল পেশ করা সঙ্গত হবে না।

দ্বিতীয় উত্তর : এই হাদীসটি ইমাম অগ্রগামী হওয়া সুন্নত হওয়ার উপর প্রযোজ্য। অর্থাৎ اَلْاِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جماعة হাদীসের উদ্দেশ্য হলো যেমন মুকতাদী ৩ জন হওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম মুকতাদীদের সামনে দাঁড়ানো সুন্নত। তদ্রূপ মুকতাদী ২ জন হলেও ইমামের জন্য সামনে দাঁড়ানো সুন্নত। যদিও এব্যাপারে ইমাম আবু ইউসূফ (র) এর দ্বিমত রয়েছে। তার মতে ২ জন মুকতাদী হলে ইমাম ২জনের মাঝে দাঁড়াবে।

ব্যাখ্যাকার বলেন– মুকতাদী ২ জন হওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম সামনে দাঁড়ানো এজন্য সুন্নত যে, ইমাম জুমুআ ছাড়া বাকী সকল জামাআতে محسوب হয়। অতএব ইমাম যখন محسوب কাজেই ২ জন মুকতাদী ও ইমাম মিলে জামআত সাব্যস্ত হয়ে গেলো। অতএব জামাআতের বিধান তথা ইমাম সামনে দাঁড়ানোও সাব্যস্ত হবে। আর জুমআর ক্ষেত্রে যেহেতু ইমাম জুমআ আদায় করা সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত। এ কারণে ইমামকে জামাআতের অন্তর্গত গণ্য করা হবে না। বরং ইমাম ছাড়া জামাআত তথা ৩ জন পুরুষ হওয়া জরুরি। পক্ষান্তরে অন্যান্য নামাযের মধ্যে নামায আদায় সহীহ হওয়ার জন্য ইমাম থাকা শর্ত নয়। এ কারণে ইমামকে জামাআতের মধ্যে গণ্য করা ঠিক হবে।

জুমুআর নামায আদায় সহীহ হওয়ার জন্য ইমাম ছাড়া ৩ ব্যক্তি হওয়া শর্ত হওয়ার কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ - অতএব জুমুআর নামাযের জন্য سعى কারীদের ছাড়া ১জন উপদেশদাতা থাকা জরুরি। আর তিনি হলেন খতিব। সুতরাং খতিব ছাড়া فاسعوا সীগা বহুবচন হওয়ার কারণে ৩ জন পুরুষ হওয়া শর্ত ও ওয়াজিব। ইমাম আবু ইউসূফ (র) বলেন– জুমুআর নামায সহীহ হওয়ার জন্য ইমাম ছাড়া ২ জন মুকতাদী থাকা যথেষ্ট।

ব্যাখ্যাকার বলেন– মুসান্নিফ (র) তৃতীয় কোনো উত্তর উল্লেখ করেননি। অথচ অন্যান্যরা তা উল্লেখ করেছেন। এর তা এই যে, اَلْاِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ হাদীস ইসলাম শক্তিশালী হওয়ার পরে সফর করার বিষয়ে প্রযোজ্য।

ব্যাখ্যা এই যে, রাসূলুল্লাহ (স) ইসলামের দুর্বলতা এবং কাফেরদের প্রাধান্যের কারণে প্রাথমিককালে ১ জন বা ২ জনকে সফর করতে নিষেধ করেছিলেন। তিনি এরশাদ করেছেন–

اَلْوَاحِدُ شَيْطَانٌ وَالْاِثْنَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلٰثَةُ رَكْبٌ "১ জন মানুষও শয়তান, ২ জনও শয়তান, আর ৩ জন হবো জামাআত"।

১ জনকে শয়তান স্থির করার কারণ এই যে, সফরে ১ জন হলে তাকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়।

আর ২ জনকে শয়তান বলার কারণ– যদি সফরকালে একজন মারা যায় কিংবা অসুস্থ হয় তাহলে অপরজন অত্যান্ত পেরেশান হয়ে যায়।

আর ৩ জনকে জামাআত বলা হয়েছে এইজন্য যে, যদি একজন কোনো প্রয়োজনে চলে যায় তাহলে অবশিষ্ট ২জন নিশ্চিন্তে থাকতে পারে। যদি তার আগমনে বিলম্ব ঘটে তাহলে তাদের ১জন তাকে খোঁজ করতে যেতে পারে। আর ১জন মাল সামানা পাহারা দিবে।

মোটকথা ৩ সংখ্যক হওয়া জামাআতের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যখন ইসলামকে শক্তিশালী করেছেন। তখন ২ জন ব্যক্তিকে সফর করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। আর ১ জন স্বঅবস্থায় বহাল রয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে اَلْاِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ অথচ ইসলাম শক্তিশালী হওয়ার পরে যেভাবে জামাআতের জন্য সফর করার অনুমতি রয়েছে সেভাবে ২ জনের জন্যও সফর করার অনুমতি রয়েছে। কারণ ১ জন মৃত্যুবরণ করলে বা অসুস্থ হলে অপরজন সর্বক্ষেত্রে তার সাহায্যকারী থাকবে। ফলে তার কোনো কষ্ট হবে না। সুতরাং এই হাদীস এই বিষয়ের উপর প্রযোজ্য। এর দ্বারা বহুবচনের নিম্নস্তর ২ হওয়ার উপর দলিল পেশ করা ঠিক হবে না।

قوله وبـاقـي تمسكات الخ : ব্যা খ্যাকর বলেন– এ মাসআলায় প্রতিপক্ষের অনেক দলিল এবং তার বিভিন্ন উত্তর বড়ো বড়ো কিতাবে উল্লিখিত হয়েছে। তার মধ্যে হতে একটি এই যে, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ অর্থাৎ এরা ২ জন বাদী। তারা তাদের প্রতিপালকের ব্যাপারে বিবাদে লিপ্ত হয়েছে। লক্ষ্য করুন এ আয়াতে اِخْتَصَمُوْا শব্দ টি বহুবচন। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, ২ এর নিম্নস্তর হলো বহুবচনের সর্বনিম্ন স্তর।

এর উত্তর এই যে, خصم শব্দটি একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচনের উপর প্রযোজ্য হয়। এ কারণেই তাদের সবার জন্য اِخْتَصَمُوْا বহুবচন সীগা উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা বহুবচনের সর্বনিম্নস্তর ২ হওয়া প্রমাণিত হয় না।

দ্বিতীয় দলিল এই যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম ও হাওয়া (আ)কে সৃষ্টি করে বলেছিলেন اِهْبِطُوْا مِنْهَا লক্ষ্যকরুন! এখানে ২ জনের জন্য বহুবচন শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা বহুবচনের সর্বনিম্ন স্তর ২ হওয়া প্রমাণিত হয়।

উত্তর : আদম ও হাওয়া (আ) যেহেতু সকল মানুষের মূল। এ কারণে মেনে নেয়া হয়েছে যে, সকল মানুষের উৎস তারাই। এ হিসেবে বহুবচন যমীরের মারজা ২ না হয়ে সকল মানুষ হবে।

দ্বিতীয় উত্তর এই যে, এ আয়াতে আদম, হাওয়া ও ইবলিস ৩ জনকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। এ কারণেই বহুবচন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। মোটকথা এর দ্বারাও বহুবচনের সর্বনিম্ন স্তর ২ হওয়া প্রমাণিত হবে না।

ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ عَنْ بَحْثِ الْعَامِّ شَرَعَ فِىْ بَيَانِ الْمُشْتَرِكِ فَقَالَ وَاَمَّا الْمُشْتَرِكُ فَمَا يَتَنَاوَلُ اَفْرَادًا مُخْتَلِفَةَ الْحُدُوْدِ عَلٰى سَبِيْلِ الْبَدَلِ اَرَادَ بِالْاَفْرَادِ مَافَوْقَ الْوَاحِدِ لِيَتَنَاوَلَ الْمُشْتَرِكَ بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ فَقَطْ وَهُوَ يُخْرِجُ الْخَاصَّ وقوله مُخْتَلِفَةَ الْحُدُوْدِ يُخْرِجُ الْعَامَّ عَلٰى ما مَرَّ وقوله عَلٰى سَبِيْلِ الْبَدَلِ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ او اِحْتِرَازٌ عَنْ قَوْلِ الشَّافِعِىِّ رح اَنَّهُ عَلٰى سَبِيْلِ الشُّمُوْلِ كما سَيَأْتِىْ وقِيْلَ اِنَّهُ اِحْتِرَازٌ عَنْ لَفْظِ الشَّيْئِ فَاِنَّهُ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ بِمَعْنَى الْمَوْجُوْدِ مُشْتَرِكٌ مَعْنَوِىٌّ خَارِجٌ عَنْ هٰذَا الْمُشْتَرِكِ وَبِاعْتِبَارِ كَوْنِ اَفْرَادِهِ مُخْتَلِفَةَ الْحَقَائِقِ دَاخِلٌ فِى الْمُشْتَرِكِ اللَّفْظِىِّ كَالْقُرْءِ لِلْحَيْضِ وَالطُّهْرِ فَاِنَّهُ مُشْتَرِكٌ بَيْنَ هٰذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ الْمُتَضَادَّيْنِ لا يَجْتَمِعَانِ وقد اَوَّلَهُ الشَّافِعِىُّ رح بِالطُّهْرِ وابو حنيفة رح بِالْحَيْضِ كما عَرَفْتَ -

مشترك - এর আলোচনা

অনুবাদ ॥ مشترك প্রসঙ্গ : মুসান্নিফ (র) عام এর আলোচনা শেষ করে এখন مشترك এর বর্ণনা শুরু করেছেন। তিনি বলেন, (সংজ্ঞা:) مشترك ***হলো এমন শব্দ যা বিভিন্ন সংজ্ঞা বিশিষ্ট বহু এককককে বদলের ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করে।*** গ্রন্থকার أفراد দ্বারা একাধিক বিষয়কে বুঝিয়েছেন কেমন যেন مشترك কমপক্ষে দু'টি অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর এ কথাটি خاص কে (সংজ্ঞা থেকে) বের করে দিয়েছে।

তাঁর উক্তি مُخْتَلِفَةَ الْحُدُوْد দ্বারা আ'মকে বের করে দিয়েছে। যেমনটি আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থকারের উক্তি عَلٰى سَبِيْلِ الْبَدَلِ হলো বাস্তব অবস্থার বর্ণনা অথবা ইমাম শাফেয়ী (র)-এর বক্তব্যকে খারিজ করার জন্যে। কারণ তিনি বলেন– مشترك (বদলের ভিত্তিতে নয় বরং) شُمُوْل বা ব্যাপকতার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। যেমন অচিরেই আসছে। আবার বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা شيئ শব্দকে বাদ দেয়া হয়েছে। কেননা এটা বিদ্যমান থাকার অর্থের ভিত্তিতে مشترك معنوى যা مشترك এর বহির্ভূত। আর شئ এর افراد বিভিন্ন হাকীকত বিশিষ্ট হওয়ার দিক থেকে তা مشترك لفظى এর অন্তর্ভুক্ত। ***যেমন- قرء শব্দটি حيض এবং طهر অর্থে ব্যবহৃত হয়।*** এ দুটি বিপরীতমুখী দু অর্থে مشترك -এ দু'টি অর্থ কখনো একত্রিত হয় না। ইমাম শাফেয়ী (র) একে طهر অর্থে ব্যাখ্যা করেন। আর আবু হানীফা (র) حيض অর্থে নেন। যেমনটা তুমি জেনেছ।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ عَنْ بَحْثِ الْعَامِّ الخ : মুসান্নিফ (র) عام এর আলোচনা শেষ করে এখান থেকে মুশতারিকের আলোচনা শুরু করছেন।

مشترك এর সংজ্ঞা : এ প্রসঙ্গে মুসান্নিফ (র) বলেন– مشترك এমন শব্দকে বলে যা পর্যায়ক্রমে এমন আফরাদকে শামিল করে যেসবের হাকীকত ভিন্ন ভিন্ন। মোল্লা জুয়ুন (র) বলেন– সংজ্ঞায় আফরাদ দ্বারা উদ্দেশ্য مَافَوْقَ الْوَاحِد অর্থাৎ ১ এর অধিক। তাহলে এ সংজ্ঞাটি এমন শব্দকেও শামিল করবে যা ২ অর্থে মুশতারিক।

ব্যাখ্যাকার বলেন– يَتَنَاوَلُ اَفْرَادًا দ্বারা মুশতারিকের সংজ্ঞা থেকে খাছ বেরিয়ে গেলো। কেননা খাছ আফরাদকে শামিল করে না। বরং ১ ফরদকে শামিল করে। আর مُخْتَلِفَةَ الْحُدُوْد দ্বারা عام বের হয়ে গেলো। কেননা যে

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

وَحُكْمُهُ التَّوَقُّفُ فِيْهِ بِشَرْطِ التَّامُّلِ لِيَتَرَجَّحَ بَعْضُ وُجُوْهِهِ لِلْعَمَلِ بِهِ يَعْنِى التَّوَقُّفُ عَنْ اِعْتِقَادِ مَعْنًى مُعَيَّنٍ مِنَ الْمَعَانِى وَالتَّامُّلُ لِاَجْلِ تَرَجُّحِ بَعْضِ الْوُجُوهِ لِاَجْلِ الْعَمَلِ لَا لِعِلْمِ الْقَطْعِىِّ - كَمَا تَأَمَّلْنَا فِى الْقَرْءِ لِعِدَّةِ اَوْجُهٍ اَحَدُهَا بِصِيْغَةِ ثَلْثَةٍ وَالثَّانِى بِكَوْنِ اقَلِّ الْجَمْعِ ثَلْثَةٌ عَلَى ما مر وَالثَّالِثُ بِانَّه بِمَعْنَى الْجَمْعِ وَالْاِنْتِقَالِ وَالْمُجْتَمِعُ هُوَ الدَّمُ فِى ايَامِ الطُّهْرِ وكَذَا الْمُنْتَقِلُ هُوَ الدَّمُ فِى اَيَامِ الْحَيْضِ وتحقيقُه اَنَّ الْحَيْضَ اِنْكَانَ هُوَ الدَّمُ فَهُوَ الْمُجْتَمِعُ وَالْمُنْتَقِلُ وانْ لَمْ يَكُنْ جامعًا بِخِلَافِ الطُّهْرِ فانّه لَيْس بِجَامِعٍ ولا مُجْتَمِعٍ ولا مُنْتَقِلٍ وانْ كَانَ ايَام الدَّمِ فَهِى مَحَلُّ الْاِجْتِمَاعِ وَالْاِنْتِقَالِ بِخِلَافِ ايَامِ الطُّهْرِ فَاِنَّهَا لَيْسَتْ بِمَحَلِّ الْاِنْتِقَالِ وانْ كَانَتْ مَحَلًّا لِلْاِجْتِمَاعِ فِىْ بَادِى الرَّاْىِ وقَدْ اَوْضَحْتُ ذٰلِكَ فِى التَّفْسِيرِ الاَحْمَدِىِّ وهٰهُنَا لَايَسَعُه الْمَقَامُ -

অনুবাদ॥ مشترك এর হুকুম বা বিধান : توقف ***তথা নিরবতা অবলম্বন করা এ শর্তে যে, আমলের জন্যে তার কোন একটিকে প্রাধান্য দেয়ার উদ্দেশ্যে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে।*** অর্থাৎ অর্থসমূহের মধ্যে যেকোন একটিকে নির্দিষ্ট করার বিষয়ে নিশ্চিত বিশ্বাস হতে বিরত থাকা। আর কোন একটিকে আমলের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়ার উদ্দেশ্যে চিন্তা করা। তবে নিশ্চিত বিশ্বাসের জন্যে নয়। যেমনিভাবে আমরা قرء শব্দ নিয়ে বিভিন্নভাবে চিন্তা-ভাবনা করেছি। এর মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে ثلثة শব্দ নিয়ে চিন্তা করা, দ্বিতীয় হচ্ছে বহুবচনের সর্বনিম্ন পরিমাণ তিন নিয়ে। যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে, তৃতীয় হলো قرء শব্দটি جمع (একসাথে করা) ও انتقال (স্থানান্তরিত হওয়া) অর্থে ব্যবহৃত হওয়া সম্পর্কে। مجتمع একত্রিত হওয়ার জিনিস হলো পবিত্রতার দিনগুলোর রক্ত, একইভাবে منتقل বা স্থানান্তরিত হওয়ার জিনিস হলো ঋতুস্রাবের দিনগুলোর রক্ত। এর বিশ্লেষণ এই যে, حيض যদি রক্ত হয়ে থাকে, তবে তা

(পূর্বের বাকী অংশ)

আফরাদকে عام শামিল করে সে সবের হাকীকত এক হয়ে থাকে। সংজ্ঞায় উল্লেখিত عَلٰى سَبِيْلِ الْبَدَلِ বয়ান স্বরূপ অথবা ইমাম শাফেয়ী (র) এর উক্তিকে বাদ দেয়ার জন্য উল্লেখ করেছেন। কেননা ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে মুশতারিক তার আফরাদকে পর্যায়ক্রমে শামিল করে না। বরং عَلٰى سَبِيْلِ الْاِجْتِمَاعِ ও على الشُّمول শামিল করে। আর কারো মতে এর দ্বারা شئ শব্দকে বাদ দেয়া উদ্দেশ্য। কারণ شئ শব্দটি موجود এর অর্থের দিক দিয়ে তার সকল আফরাদের মধ্যে অর্থগত বা مشترك معنوى এর কারণে মুশতারিক। আর সকল আফরাদকে على سبيل الاجتماع শামিল। যেমন حيوان একটা মুশতারিক শব্দ। এর দ্বারা শাব্দিক মুশতারিক খারিজ হয়ে যাবে। কিন্তু شئ এর আফরাদ ভিন্ন ভিন্ন হাকীকত বিশিষ্ট হওয়ার দিক দিয়ে شئ শাব্দিক মুশতারিকের মধ্যে দাখিল হয়ে যাবে।

মুসান্নিফ (র) মুশতারিকেব উদাহরণ স্বরূপ বলেন যেমন قرء মুশতারিক শব্দ। কেননা এ শব্দটি হায়েয ও তুহর উভয়কে শামিল করে। অথচ উভয়ের অর্থের মধ্যে সম্পূর্ণ বৈপরিত্ব বিদ্যমান। উভয়টি কখনো একত্রিত হতে পারে না। ইমাম শাফেয়ী (র) এর দ্বারা তুহর উদ্দেশ্য নেন। আর আবু হানীফা (র) হায়েয উদ্দেশ্য নেন। এর বিস্তারিত আলোচনা খাছের প্রাথমিক আলোচনায় অতিবাহিত হয়েছে।

একত্রিত হওয়ার উপযোগী ও স্থানান্তরযোগ্য, যদিও একত্রকারী নয়। কিন্তু طهر হচ্ছে এর বিপরীত। কারণ এটা একত্রিতকারী নয়, একত্রিত হবার যোগ্যও নয় এবং স্থানান্তর যোগ্যও নয়। আর যদি ঋতুস্রাবের দিনসমূহ উদ্দেশ্য হয় তাহলে قرء হবে একত্রিত হওয়ার ও স্থানান্তরিত হওয়ার ক্ষেত্র। তবে পবিত্রতার (طهر) দিনগুলো এর বিপরীত। এটা স্থানান্তরের ক্ষেত্র নয়। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে একত্রিত হবার স্থান হতে পারে। এ বিষয়টি আমি তাফসীরে আহমদীতে ব্যাখ্যা করেছি। এটা ব্যাখ্যার উপযুগী জায়গা নয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله وَحُكْمُهُ التَّوَقُّفُ الخ : মুসান্নিফ (র) বলেন– মুশতারিকের বিধান হলো التوقف -এর কোনো একটিকে প্রাধান্য দেয়ার এবং তার উপর আমল করার জন্য গভীর চিন্তাভাবনা করা শর্ত। মুসান্নিফের ইবারতে لِيَتَرَجَّحَ - تَأَمُّلُ এর সাথে মুতাআল্লিক। আর لِلْعَمَلِ - شرط এর সাথে মুতাআল্লিক। উদ্দেশ্য এই যে, মুশতারিকের কোনো এক অর্থকে প্রাধান্য দেয়ার জন্য চিন্তাভাবনা করা তার উপর আমল করার জন্যে শর্ত।

ব্যাখ্যাকার বলেন– মুশতারিকের বিধানের মধ্যে ২টি বিষয় রয়েছে। ১ মুশতারিকের অর্থসমূহের মধ্য থেকে ১টি নির্দিষ্ট অর্থের উপর বিশ্বাস রাখার ক্ষেত্রে تَوَقُّف করতে হবে। কেননা আমাদের মতে মুশতারিকের সকল অর্থ উদ্দেশ্য নেয়া বৈধ নয়। যে কোনো একটি অর্থ উদ্দেশ্য নিতে হবে। আর তা অনির্দিষ্ট। এর কোনোটির অন্যটির উপর প্রাধান্য থাকে না। অতএব এ ব্যাপারে বিরত থাকা ওয়াজিব।

দ্বিতীয় এই যে, কোনো এক অর্থকে প্রাধান্য দেয়ার জন্য চিন্তাভাবনা করা জরুরি। এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, চিন্তা-ভাবনা করা জরুরি হওয়া তার উপর আমল করার জন্য; বিশ্বাস ও একীনের জন্য নয়। যেমন আমরা পূর্বে قَرْءٌ শব্দের মধ্যে কয়েকভাবে চিন্তা গবেষণা করেছি। তার মধ্য হতে একটি এই যে, ثَلٰثَة শব্দের অর্থে চিন্তা করে বলেছি যে, যদি قرء দ্বারা হায়েয উদ্দেশ্য নেয়া হয় তাহলে ثلثة শব্দের موجب এর উপর কমবেশি ছাড়া আমল করা হয়ে যায়। আর তুহর উদ্দেশ্য নেয়া হলে কমবেশি ছাড়া এর উপর আমল করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় পদ্ধতি এই যে, وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ আয়াতে قُرُوْءٌ শব্দটি বহুবচন। এর সর্বনিম্ন স্তর হলো ৩। এর বিস্তারিত আলোচনা এবং এর উপর প্রশ্ন চতুর্থ শাখা মাসআলার অধীনে উল্লেখিত হয়েছে।

তৃতীয় পদ্ধতি এই যে, قَرْءٌ শব্দটি বিপরীত অর্থমূলক শব্দ। অর্থাৎ এর অর্থ جمع তথা একত্রিকরণ হতে পারে। যেমন قَرَأْتُ الشَّيْءَ আমি বস্তুকে সমবেত করেছি এবং তার কিছু অংশকে অপর কিছু অংশের সাথে মিলিয়েছি। এবং স্থানান্তর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন قَرْءُ النَّجْمِ ঐ সময় বলা হয় যখন নক্ষত্র এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হয়। মোটকথা قَرْءٌ শব্দের অর্থ সমবেত হওয়া এবং স্থানান্তর হওয়া উভয়টি হতে পারে। আর উভয় অর্থই বাস্তব। কেননা তুহরকালে রক্ত একত্রিত হয়। আর হায়েযের সময় তা স্থানান্তরিত হয়।

ব্যাখ্যাকার বলেন– قَرْءٌ অর্থ হলো হায়েয। এখন হায়েয দ্বারা যদি রক্ত উদ্দেশ্য হয় তাহলে তা একত্রে জমাও হয় এবং স্থানান্তরিতও হয়। পক্ষান্তরে তুহর একত্রিত হয় না এবং স্থানান্তরিত হয় না। হায়েয দ্বারা যদি স্রাবের দিনসমূহ উদ্দেশ্য হয় তাহলে স্রাবের দিনসমূহ জমা হওয়ার ক্ষেত্র এবং স্থানান্তরিত হওয়ার ক্ষেত্র উভয়টিই পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে তুহরের দিনসমূহ স্থানান্তরের ক্ষেত্র নয়। যদিও দৃশ্যত জমা হওয়ার ক্ষেত্র হয়। মোটকথা হায়েয দ্বারা উদ্দেশ্য রক্ত হোক কিংবা রক্তের দিনসমূহ। হায়েযের মধ্যে قَرْءٌ শব্দের উভয় অর্থ পাওয়া যায়। আর তুহরের মধ্যে কোনোটিই পাওয়া যায় না। এ কারণেও قَرْءٌ শব্দ দ্বারা হায়েয উদ্দেশ্য নেয়া মুনাসিব। ব্যাখ্যাকার বলেন– আমি এ মাসআলার বিস্তারিত আলোচনা তাফসীরে আহমদী গ্রন্থে উল্লেখ করেছি। কারো প্রয়োজন হলে সেখানে দেখে নিবে।

وَلَا عُمُوْمَ لَهٗ اى لِمُشْتَرِكِ عِنْدَنَا فَلَا يَجُوزُ ارادةُ مَعْنَيَيْهِ مَعًا وقال الشَّافِعِيُّ رح يَجُوْزُ اَنْ يُرَادَ بِهِ الْمَعْنَيَانِ مَعًا كما فِيْ قوله تعالى اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ فالصَّلٰوةُ مِنَ اللّٰهِ رحمةٌ ومِنَ الْمَلٰئِكَةِ اسْتِغْفَارٌ وقد اُرِيْدَ بِلَفْظٍ واحدٍ وهو قوله تعالى يُصَلُّوْنَ ونحن نقول سَبَقَتِ الْاٰيَةُ لِاِيْجَابِ اقتداءِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ ولَا يَصْلُحُ ذٰلِكَ اِلَّا بِاَخْذِ معنًى عامٍّ شاملٍ لِلْكُلِّ وهو الْاِعْتِنَاءُ بِشَانِهِ فَيَكُوْنُ الْمَعْنٰى اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهٗ يَعْتَنُوْنَ بِشَانِهِ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِعْتَنُوْا اَيْضًا بِشَانِهِ وذٰلك الْاِعْتِنَاءُ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى رَحْمَةٌ وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ اِسْتِغْفَارٌ وَمِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ دُعَاءٌ

অনুবাদ ॥ আর ***"এর জন্যে ব্যাপকতাই নেই"।*** অর্থাৎ আমাদের মতে مشترك এর জন্যে কোন عمومية নেই। তাই একই সাথে তার দু অর্থ উদ্দেশ্য নেয়া বৈধ নয়। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, এর দ্বারা একই সাথে দু অর্থ উদ্দেশ্য নেয়া বৈধ। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী ان الله وملائكته يصلون على النبى এর মধ্যে صلوة আল্লাহর পক্ষ হতে রহমত, ফেরেশতাদের পক্ষ হতে ইসতেগফার, অথচ একই শব্দ দ্বারা দুটি উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। আর তা হচ্ছে আল্লাহর বাণী– يصلون

আর আমরা বলি- আয়াতটি নেয়া হয়েছে মুমিনগণ কর্তৃক আল্লাহ ও ফেরেশতাদের অনুসরণ আবশ্যক করার জন্যে। আর এটা এমন ব্যাপক অর্থ গ্রহণ ছাড়া প্রযোজ্য নয়, যা সবগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর তা হচ্ছে রাসূল (স) মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখা। অতএব এর অর্থ দাঁড়ায়– নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবী (স)-এর মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখেন, সুতরাং হে ঈমানদারগণ! যারা ঈমান এনেছ, তোমরাও তাঁর মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখো। আর তা আল্লাহর পক্ষ থেকে হলো রহমত বর্ষণ, ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে হলো ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং মুমিনদের পক্ষ থেকে হলো দোয়া করা।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله وَلَا عُمُوْمَ لَهُ الخ : মুসান্নিফ (র) বলেন– আমাদের আহনাফের মতে عموم مشترك বৈধ নয়। অর্থাৎ একই মুতলাক দ্বারা একই সময়ে মুশতারিকের ২ অর্থ উদ্দেশ্য নেয়া জায়েয নয়। ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে عموم مشترك জায়েয।

ইমাম শাফেয়ী (র) এর দলিল : তিনি اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ আয়াত দ্বারা দলিল পেশ করে বলেন এ আয়াতে صلاة শব্দটি মুশতারিক। কেননা صلاة যদি আল্লাহর প্রতি সম্বন্ধিত হয় তাহলে তা রহমত বোঝায়। ফেরেশতাদের প্রতি সম্বন্ধ হলে ইসতেগফার বোঝায়। আর এখানে আয়াতে صلاة শব্দ দ্বারা একই সময়ে উভয় অর্থ উদ্দেশ্য। অতএব প্রমাণিত হলো যে, عموم مشترك জায়েয।

উত্তর : এ আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মুমিনদের উপর আল্লাহ ও ফেরেশতাদের অনুসরণ করা ওয়াজিব। আর এটা তখনই সম্ভব যখন صلاة দ্বারা এমন উদ্দেশ্য নেয়া হবে যা সবকে শামিল করে। আর তা হলো اِعْتِنَاء شان অতএব আয়াতের অর্থ হলো- আল্লাহ এবং ফেরেশতাগণ রাসূলুল্লাহ (স) এর شان তথা মর্যাদার প্রতি متوجه হন। অতএব হে মুসলমানগণ! তোমরাও রাসূলুল্লাহ (স) এর প্রতি متوجه থাকো। আর এ اعتناء আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের উপায়ে হয় এবং ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে ইসতেগফারের মাধ্যমে হয়। আর মুমিনদের পক্ষ থেকে দোয়ার মাধ্যমে হয়। সারকথা এই যে, আয়াতের মধ্যে صلاة শব্দের এমন ব্যাপক অর্থ উদ্দেশ্য নিতে হবে যা সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং এটা عموم مجاز এর অন্তর্গত হবে না। বরং عموم مشترك এর অন্তর্গত হবে। অতএব এ আয়াত দ্বারা দলিল পেশ করা গ্রহণযোগ্য নয়।

وَتحرِيْرُ مَحلِّ النِّزاعِ اَنَّهٗ هَل يَجوزُ ان يُّرادَ بِلفظٍ واحِدٍ فِي زمانٍ واحِدٍ كُلٌّ مِن الـمَعْنَيَيْنِ على اَنْ يَكون مُرادًا ومَناطًا لِلحُكمِ امْ لَا ؟ فَعِندَنا لايَجوزُ ذٰلِك لِاَنَّ الوَاضِعَ خَصَّصَ اللَّفظَ لِلمَعْنى بِحيْثُ لايُرَاد بِه غَيْرُه بِاِعْتِبارِ وَضْعِه لِهٰذا الـمَعْنى يُوجِبُ ارادتُه خاصَّةً وبِاعْتِبارِ وَضْعِه لِذٰلكَ الـمَعْنى يُوْجِبُ اِرادتُه خاصَّةً فَيلزَمُ اَنْ يَكوْنَ كُلٌّ مِنْهُما مُرادًا وغَيْرَ مُرادٍ فَلايكونُ ذٰلك اِلاَّ بِاَنْ يُرادَ اَحدُ الـمَعْنَيَيْنِ علىٰ اَنَّهٗ نَفْسُ الـمَوْضُوعِ لَهٗ وَالاٰخرُ علىٰ انَّه يُناسِبُه فَيَكونُ جَمْعًا بَيْنَ الحَقِيْقةِ والـمَجازِ وهو باطِلٌ وعِنده يَجوزُ ذٰلك بِشرطِ اَنْ لَّايكونَ بينَهُما مَضادَّةُ الْمَجموعِ مِنْ حيثُ هُو مجموعٌ بِالْاتِّفاقِ وتحقيقُ كُلِّ ذٰلكَ فِى التلويح -

অনুবাদ ॥ বিতর্কিত বিষয়টির বর্ণনা এই যে, হুকুমের জন্যে একই শব্দ দ্বারা একই সময়ে দু'টি অর্থ উদ্দেশ্য নেয়া কি বৈধ, নাকি বৈধ নয়? এক্ষেত্রে আমাদের আহনাফের অভিমত হলো এমনটা বৈধ নয়। কারণ অভিধানবিদ শব্দটিকে অর্থের জন্যে গঠন করেছেন যাতে তা দ্বারা অন্য অর্থ উদ্দেশ্যে না হতে পারে। সুতরাং শব্দটির গঠনগত দিক, তার উদ্দেশ্যকে এ অর্থের জন্যে বিশেষভাবে ওয়াজিব করে দেয়। আর উক্ত অর্থের জন্যে শব্দটি গঠিত হওয়ার ভিত্তিতেই অর্থটি তার উদ্দেশ্যকে নির্দিষ্টভাবে আবশ্যক করে দেয়। তাই দুটি অর্থই উদ্দেশ্য হওয়া অথবা উদ্দেশ্য না হওয়ার দিক থেকে আবশ্যক। ফলে ব্যাপারটি এরূপ ছাড়া কিছুই নয় যে, দুটি অর্থের একটি হচ্ছে স্বয়ং موضوع له (যে অর্থের জন্যে শব্দ গঠিত) আর অপরটি হচ্ছে তার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়। অতএব حقيقة ও مجاز এর মধ্যে একত্রিকরণ হয়ে যায়। অথচ এমনটা বাতিল। আর ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, এমনটা বৈধ তবে শর্ত হচ্ছে, অর্থ দুটির মধ্যে কোন বৈপরিত্য থাকতে পারবে না। যদি উভয়ের মাঝে বৈপরিত্য থাকে, তাহলে যেমন حيض ও طهر অর্থ তাহলে সর্বসম্মতভাবে তা বৈধ হবে না। অনুরূপভাবে একসাথে সব কটি অর্থ উদ্দেশ্য নেয়াও সর্বসম্মতভাবে বৈধ নয়। এ সব বিষয়ের বিশ্লেষণ তালবীহ গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله وَتَحْرِيْرُ مَحَلِّ النِّزاعِ الخ : নূরুল আনওয়ার গ্রন্থকার বলেন- عموم مشترك এর বৈধতা ও অবৈধতার বিষয়ে হানাফী ও শাফেয়ীগণের মধ্যকার মতবিরোধের সার এই যে, একই সময়ে ১ শব্দ দ্বারা ২ অর্থের কোনো ১ অর্থ এমনভাবে উদ্দেশ্য নেয়া যে, তা দ্বারা উভয় অর্থ উদ্দেশ্য ও বিধানের নির্ভরশীলতার হওয়ার দিক দিয়ে জায়েয কি না? আহনাফের মতে এটা নাজায়েয। আর ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে জায়েয।

আহনাফের দলিল : মুশতারিক শব্দ যে পরিমাণ অর্থের জন্য গঠিত তার প্রত্যেকটি অর্থে শব্দটি ভিন্নভাবে গঠিত হয়। অর্থাৎ অর্থ যদি বিভিন্ন হয় তাহলে তার গঠনও বিভিন্ন হয়ে থাকে। অর্থাৎ ১জন এক অর্থে উক্ত শব্দ গঠন করে থাকে, অপর জন ভিন্ন অর্থ গঠন করে। সুতরাং যখন ১ জন উক্ত শব্দকে ১ অর্থে গঠন ও খাছ করলো তখন তা দ্বারা উক্ত অর্থই উদ্দেশ্য হবে। অন্য অর্থ উদ্দেশ্য হবে না। এভাবেই অপরজন যখন ভিন্ন অর্থের জন্য উক্ত শব্দকে গঠন ও খাছ করলো তখন উক্ত গঠনের দিক দিয়ে দ্বিতীয় অর্থই উদ্দেশ্য হবে। প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য হবে না। আর মুশতারিক শব্দ দ্বারা যখন উভয় অর্থ উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। তখন উভয় অর্থের মধ্য থেকে প্রত্যেকটি উদ্দেশ্যগত ও উদ্দেশ্যহীন হওয়া জরুরি হয় যা বাতিল। অতএব উভয় অর্থে উদ্দেশ্য নেয়াও বাতিল বিবেচিত হবে।

মোটকথা موضوع له হওয়ার দিক দিয়ে উভয় অর্থ উদ্দেশ্য নেয়া বাতিল হয়ে গেলো। এখন কেবল এক অর্থ উদ্দেশ্য নেয়াই নিশ্চিত হলো। অর ১ অর্থ উদ্দেশ্য নেয়াটা موضوع له এর কারণে মাজায হওয়ার সূত্রে সাব্যস্ত হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে جمع بين الحقيقت والمجاز অপরিহার্য হয়। আর এটাও বাতিল সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, মুশতারিক শব্দ দ্বারা উভয় অর্থ উদ্দেশ্য নেয়া কোনোভাবে সঙ্গত নয়।

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ رح بعده الْمُؤَوَّلَ فقال وأمَّا الْمُؤَوَّلُ فَمَا تُرُجِّحَ مِنَ الْمُشْتَرِكِ بعضُ وُجُوهِهِ بِغَالِبِ الرَّايِ يَعْنِي اَنَّ الْمُشْتَرِكَ ما دام لَمْ يُتَرَجَّحْ احدُ مَعْنَيَيْهِ عَلَى الْاٰخَرِ فَهُوَ مشتركٌ واذا تُرجّح احدُ مَعْنَيَيْهِ بتاويلِ الْمُجْتَهِدِ صارَ ذٰلكَ الْمُشتركُ بعَيْنِه مُؤَوَّلًا وانّما عَدّ مِن اقسامِ النَّظْمِ وانْ حَصَلَ بِفعلِ التّاويلِ لِاَنّ الحُكْمَ بَعْدَ التّاويلِ يُضافُ الى الصِّيغَةِ فكانَ النَّصُّ وَرَدَ بهٰذا -وانّما قيّد بقوله مِن الْمُشْتَرِكِ لِاَنَّ الْمُرَادَ هٰهنا هُوَ هٰذا الْمُؤَوَّلُ الّذِى بعدَ الْمُشْتَرِكِ والّا فالْخَفِيُّ وَالْمُشْكِلُ والْمُجْمَلُ اذا زالَ خَفاؤُها بدليلٍ ظَنّيّ صار مُؤَوَّلًا ايضًا ولٰكنَّهُ مِن اقسامِ البيانِ والمُرادُ بغالب الرّاى الظَّنُّ الغالبُ سواءٌ حصَلَ بخبرِ الواحدِ او القياسِ او نحوِه فلا يُقال اِنّه لا يَشْمَلُ مَا اذا حَصَلَ التاويلُ بخَبَرِ الوَاحِدِ بَل بالقِيَاسِ فقَطْ ثمّ الترجح من المشترك قد يكون بالتامُّلِ فِى الصِّيغَةِ وقد يَكونُ بالتامُّلِ فِى السِّيَاقِ كَمَا قُلْنا فِى القَرْءِ بالنَّظَرِ الى نفسِهِ وبالنّظَرِ الى ثَلٰثةٍ وقد يَكونُ بالنّظرِ الى السّياقِ كَما فِىْ قولِهِ تَعالٰى اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ عُرِف اَنّه مِن الحِلِّ وفِى قولِه اَحَلَّنا دارَ الْمُقامَةِ عُرِفَ اَنّه مِن الحُلُوْلِ وَحُكْمُهُ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى اِحْتِمَالِ الْغَلَطِ اى حُكْمُ الْمُؤَوّلِ وُجُوْبُ الْعَمَلِ بِمَا جاءَ فِى تَاوِيلِ الْمُجْتَهِدِ مَعَ اِحْتِمالِ انه غَلَطٌ ويكونُ الصّوابُ فِى الجَانِبِ الْاٰخرِ وَالحاصِلُ انّه ظَنّيٌّ واجبُ الْعَمَلِ غيرُ قطعِيّ فِى العِلْمِ فلا يُكَفَّرُ جَاحِدُه -

---

مؤول-এর আলোচনা

অনুবাদ ॥ موول প্রসঙ্গ : *মুসান্নিফ (র) مشترك এর পরে* مؤول *এর বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।* তিনি বলেন, (সংজ্ঞা) مؤول ***হলো এমন বিষয় যা নির্ভরযোগ্য ধারণার মাধ্যমে*** مشترك ***এর একটি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত দিক"।*** অর্থাৎ مشترك যতোক্ষণ পর্যন্ত তার কোন একটি অর্থ অন্য অর্থের ওপর প্রাধান্য না পায়, ততোক্ষণ مشترك থাকে। যখন মুজতাহিদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি অর্থ প্রাধান্য পায়,

(পূর্বের বাকী অংশ) তবে ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে মুশতারিক শব্দ দ্বারা উভয় অর্থ উদ্দেশ্য নেয়া এ শর্তে সঙ্গত যে, উভয় অর্থের মধ্যে কোনো সাংঘর্ষিকতা থাকবে না। যদি সাংঘর্ষিকতা থাকে যেমন হায়েয এবং তুহরের মধ্যে রয়েছে। তাহলে ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতেও উভয় অর্থ উদ্দেশ্য নেয়া বৈধ হবে না। এভাবে মুশতারিক শব্দ দ্বারা উভয় অর্থের সমন্বিত অর্থ উদ্দেশ্য নেয়াও সর্বসম্মতিক্রমে অসঙ্গত। مَجْمُوْعَة مِنْ حَيْثُ الْمَجْمُوْعَة তথা সমন্বিত অর্থ উদ্দেশ্য নেয়া বাস্তবে তো সঙ্গত নয় এবং রূপক অর্থেও সঙ্গত নয়। বাস্তব বা হাকীকী অর্থে এ কারণে যে, শব্দ مَجْمُوْعَة مِنْ حَيْثُ الْمَجْمُوْعَة সমন্বিত অর্থের জন্য গঠিত নয়। আর রূপক অর্থে এ জন্য সঙ্গত নয় যে, সমন্বিত অর্থ এবং দুই অর্থের মধ্য থেকে প্রত্যেক অর্থের মাঝে কোনো মিল নেই। অথচ রূপকের জন্য অর্থের মধ্যে মিল থাকা আবশ্যক। ব্যাখ্যাকার বলেন- এ মাসআলার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা তালবীহ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

তখন সে مشترك টি مُؤَوَّل এ পরিণত হয়। مُؤَوَّلকে نظم এর প্রকারের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে যদিও তা تاويل করার মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে, কারণ تاويل এর পর হুকুমটি صيغة তথা نظم এর দিকে ধাবিত হয়। সুতরাং, কেমন যেন نص টি এ অর্থের জন্যে বর্ণিত হয়েছে।

মুসান্নিফ (র) مؤول কে مشترك এর সাথে مقيد করেছেন এ জন্যে যে, এখানে সে مؤول উদ্দেশ্য যা مشترك এর পরে হয়। অন্যথায় خفى، مشكل ও مجمل এর অস্পষ্টতা যখন কোন ظنى দলিলের মাধ্যমে দূর হয়ে যায় তখন এগুলোও مؤول হয়ে যায়। অথচ এগুলো بيان এর প্রকার। আর غالب الراى দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রবল ধারণা, চাই তা خبر واحد বা قياس কিংবা এরূপ অন্য কিছুর মাধ্যমে অর্জিত হোক। সুতরাং, একথা বলা যাবে না যে, مؤول সে বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করবে না যখন خبر واحد এর মাধ্যমে تاويل সাব্যস্ত হবে। বরং قياس এর মধ্যে تاويل করে (যা সাব্যস্ত করা হয়েছে তা অন্তর্ভুক্ত হবে)।

অতঃপর مشترك হতে অগ্রাধিকার প্রদান কখনো শব্দের মধ্যে তথ্যানুসন্ধানের মাধ্যমে হয়ে থাকে। কখনো পূর্ববর্তী বিষয়ে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে হয়ে থাকে, যেমনটা আমরা قرء শব্দের ক্ষেত্রে বলেছি। স্বয়ং قروء শব্দটির দিকে দৃষ্টি রেখে এবং ثلثة শব্দের দিকে দৃষ্টি রেখে। আবার কখনো পরবর্তী বিষয়ের প্রতি লক্ষ করে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। যেমন- আল্লাহ তা'আলার বাণীতে أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ (তোমাদের জন্যে রোযার রাত্রিতে সহবাস বৈধ করা হল)। বোঝা গেল যে, احل শব্দটি حل শব্দ হতে গঠিত। আর আল্লাহর বাণী أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ (আমাদেরকে তিনি স্থায়ী বাসস্থানে অবতরণ করিয়েছেন) এর أَحَلَّنَا শব্দটি حُلُوْل শব্দ হতে গঠিত তা বোঝা যায়।

مؤول **এর হুকুম বা বিধান :** ***এর হুকুম এই যে, ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আমল করতে হবে।*** অর্থাৎ مؤول এর হুকুম হচ্ছে মুজতাহিদের ব্যাখ্যা দ্বারা যে অর্থ সাব্যস্ত হবে তার ওপর আমল করা ওয়াজিব। এ সম্ভাবনা থাকে যে, উক্ত ব্যাখ্যাটি ভুল এবং শুদ্ধতা তার বিপরীত দিকে থাকতে পারে। সারকথা হচ্ছে এই যে, مؤول টি ظنى বিষয়। এর ওপর আমল করা ওয়াজিব, তবে قطعى বা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হয় না, ফলে مؤول অস্বীকারকারী কাফির হয় না।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ॥ قوله ثم ذكر المصنف بعده المؤول الخ : মুসান্নিফ (র) মুশতারিক বর্ণনার পরে مؤول এর বর্ণনা শুরু করেছেন। তিনি বলেন- (সংজ্ঞা:) مؤول এমন শব্দকে বলে যার কোনো এক অর্থ মুজতাহিদের ব্যাখ্যা সাপেক্ষে প্রাধান্য পেয়ে নির্দিষ্ট হয়। অর্থাৎ যতোক্ষণ পর্যন্ত মুশতারিকের অর্থসমূহের মধ্য থেকে কোনো এক অর্থকে প্রাধান্য দেয়া না হয় ততোক্ষণ পর্যন্ত তাকে মুশতারিক বলা হবে। আর কোনো এক অর্থকে মুজতাহিদের ব্যাখ্যা সাপেক্ষে প্রাধান্য দেয়া হলে উক্ত মুশতারিকই مؤول হয়ে যাবে।

قوله ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ بَعْدَهُ الْمُؤَوَّلَ الخ : এর দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে। **প্রশ্ন :** مؤَوَّل কে গঠনের দিক দিয়ে نظم এর প্রকারভেদসমূহের মধ্যে গণ্য করা সঙ্গত নয়। কারণ مؤول প্রবল ধারণা দ্বারা সূচিত হয়। আর প্রবল ধারণা نظم এর অন্তর্গত নয়। কাজেই مؤول ও نظم এর প্রকারসমূহের এর অন্তর্গত হবে না।

উত্তর : مؤول যদিও ব্যাখ্যার দ্বারা হাসিল হয় কিন্তু তা সত্ত্বে مؤول কে نظم এর প্রকারসমূহের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। কারণ ব্যাখ্যার পরে হুকুম বা বিধান শব্দের প্রতি সম্বন্ধিত হয়। আর শব্দ نظم এর অন্তর্গত। অতএব এটা نظم এর প্রকারসমূহের অন্তর্গত হবে। এটা কেমন যেন নস তার বিধানের সাথেই অবতীর্ণ হওয়ার ন্যায় হলো।

ব্যাখ্যাকার বলেন– মুসান্নিফ (র) مؤول এর সংজ্ঞায় مِنَ الْمُشْتَرَكِ এই জন্য উল্লেখ করেছেন যে, এর দ্বারা একথাটি প্রতীয়মান হবে যে, এখানে مؤول দ্বারা মুশতারিক থেকে সৃজিত مؤول উদ্দেশ্য। অন্যথায় যদি مشكل خفى ও مجمل এর অস্পষ্টতা কোনো জন্নি দলিল দ্বারা তিরোহিত হয় তাহলে তাকেও مؤول বলা হয়। কিন্তু এটা বয়ানের প্রকারসমূহের অন্তর্গত। نظم এর প্রকারসমূহের অন্তর্গত নয়।

قوله وَامَّا الْمُرَادُ بِغَالِبِ الرَّاى الخ : এটাও একটা প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন : মতনের সংজ্ঞাটি সকল আফরাদকে শামিল করে না। কারণ মুশতারিকের এক অর্থকে কখনো খবরে ওয়াহিদ দ্বারা প্রাধান্য দেয়া হয়। অথচ غالب راى- তথা প্রবল ধারণা উল্লেখের দ্বারা এ সংজ্ঞায় তা শামিল হয় না।

উত্তর : মতনে উল্লেখিত غالب راى দ্বারা প্রবল ধারণা উদ্দেশ্য। চাই তা খবরে ওয়াহিদ দ্বারা হোক কিংবা কিয়াস দ্বারা। অথবা চিন্তা-ভাবনা ইত্যাদি দ্বারা। অতএব এখন কোনো প্রশ্ন হবে না।

মোটকথা ব্যাখ্যা যদি প্রবল ধারণা দ্বারা অর্জিত হয় তাহলে তাকে مؤول বলা হবে। আর دليل قطعى দ্বারা কোনো এক অর্থ নির্দিষ্ট হলে তাকে মুফাসসার বলা হবে। مؤول বলা হবে না। ব্যাখ্যাকার বলেন– মুশতারিকের কয়েকটি অর্থের মধ্য থেকে কোনো এক অর্থ প্রাধান্য পাওয়া কখনো সীগা ও শব্দের মধ্যে চিন্তা গবেষণার দ্বারা লাভ হয়। যেমন বলা হয় যে, قروء শব্দ দ্বারা হায়েযের অর্থ উদ্দেশ্য। কারণ এটা বহুবচন। আর বহুবচনের নিম্নতম স্তর হলো ৩। হায়েযের অর্থ উদ্দেশ্য নিলেই এর উপর আমল করা সম্ভব হয়। তুহুর অর্থ উদ্দেশ্য নিলে তা সম্ভব হয় না। আর কখনো শব্দের অগ্রপশ্চাতে চিন্তাভাবনার দ্বারা অর্জিত হয়।

سباق ও سياق তথা অগ্র-পশ্চাতের মধ্যে পার্থক্য এই যে, سباق শব্দটি قرينة لفظية متقدمة এর উপর বলা হয়। আর سياق টা قرينة لفظية متاخرة এর উপর বলা হয়। অর্থাৎ শাব্দিক করীনা যদি মুশতারিক শব্দের পূর্বে হয় তাহলে তাকে سباق বলে। আর পরে হলে তাকে سياق বলে। سباق এর উদাহরণ যেমন– আল্লাহ তা'আলার বাণী وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ এর মধ্যে قروء শব্দের পূর্বে উল্লেখিত ثلثة হলো শাব্দিক করীনা বা আলামত। سياق এর উদাহরণ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ এবং أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ আয়াত। প্রথম আয়াতে احل এবং দ্বিতীয় আয়াতে أَحَلَّنَا মুশতারিক শব্দ। কারণ এর অর্থ অবতরণ করা এবং হালাল করা। প্রথম আয়াতে الرَّفَثُ অর্থ সঙ্গম। এটা মুশতারিক শব্দের পরে উল্লেখিত হয়েছে। এটা এ বিষয়ের আলামত যে, أُحِلَّ - حِلٌّ হালাল করা অর্থ থেকে নিষ্পন্ন, حُلُوْل (প্রবেশ) থেকে নয়। দ্বিতীয় আয়াতে دَارَ الْمُقَامَةِ অর্থ বেহেশত। এটা أَحَلَّنَا মুশতারিক শব্দের পরে উল্লেখ রয়েছে। এটা حُلُوْل (অবতরণ করা) থেকে নিষ্পন্ন হওয়ার আলামত বোঝায়। حل থেকে নয়।

قوله وحُكْمُهُ الْعَمَلُ بِهِ الخ : مؤول এর حكم বা বিধান ঃ মুসান্নিফ (র) বলেন– مؤول এর বিধান এই যে, মুজতাহিদের তাবীল বা ব্যাখ্যা দ্বারা যে অর্থ নির্দিষ্ট হবে তার উপর আমল করা ওয়াজিব হবে। তবে এ সম্ভাবনার সাথে যে, এ অর্থ ভুল হওয়ার অবকাশ রাখে। অর্থাৎ অন্য অর্থ সঠিক হতে পারে। কারণ মুজতাহিদ ভুলও করতে পারেন এবং ঠিকও করতে পারেন। সারকথা এই যে, مؤول হলো জন্নি তথা সন্দেহজনক অকাট্য নয়। এ কারণেই এর অস্বীকারকারী কাফের হয় না। তবে তার উপর আমল করা অপরিহার্য হয়।